ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

দ্বিতীয় পত্র

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি

- অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান
- অধ্যাপক ড. এ. টি. এম. সামছুজ্জোহা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত
সিলেবাসের আলোকে রচিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত সিলেবাসের আলোকে
একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক হিসেবে রচিত

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

দ্বিতীয় পত্র

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি

রচনা

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান
বিএ (অনার্স) ২য় শ্রেণিতে ১ম, এমএ ১ম শ্রেণিতে ১ম,
পিএইচডি
অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ডীন, কলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক ড. এ. টি. এম. সামছুজ্জোহা
বিএ (অনার্স) ১ম শ্রেণিতে ১ম, এমএ ১ম শ্রেণিতে ১ম,
পিএইচডি
অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রাক্তন প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

অক্ষর-পত্র প্রকাশনী
৪৩, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক
(পুরাতন ১৬ শান্তিনগর), ঢাকা

প্রকাশনা
অক্ষর-পত্র প্রকাশনী
৪৩, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক
(পুরাতন ১৬ শান্তিনগর), ঢাকা ১২১৭
ফোন: ০৯৬৬৬-৭৮৭৯৮০
ই-মেইল: info@akkharpatra.com
ওয়েবসাইট: www.akkharpatra.com
ফেসবুক: facebook.com/AkkharPatraProkashoni

© লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

পরিবেশনা : পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি.
৩৮/৮ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন: ০২-৯৫১১৭২৭, ০১৩১৩৭৭০৯৫৭

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০১৪
একাদশ সংস্করণ : আগস্ট ২০২৫

গবেষণা : ইতিহাস দপ্তর
গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ

পণ্য ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় : সাবিকুন নাহার আনিকা

প্রচ্ছদ : মানব

গ্রাফিক্স : নকশা দপ্তর

অঙ্কন : অঙ্কন দপ্তর

অঙ্গসজ্জা : প্রি-প্রেস দপ্তর

বর্ণবিন্যাস : অক্ষর-পত্র কম্পিউটার সিস্টেমস

মুদ্রণ ও বাঁধাই : বারতোপা প্রিন্টার্স লি.

বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি নির্ধারিত
সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয়মূল্য (MRP):
২৯০.০০ (দুই শ নব্বই) টাকা

ঘরে বসে বই পেতে অর্ডার করুন
pbs.com.bd
অথবা কল/হোয়াটসঅ্যাপ করুন
01313 770 770

ভূমিকা

ইতিহাস কালের প্রতিচ্ছবি, যুগ-যুগান্তরের সাক্ষী ও মানবসভ্যতার আলেখ্য। ইতিহাসের দর্পণেই আমরা অতীতকে প্রত্যক্ষ করি, বর্তমানকে গড়ি এবং ভবিষ্যতের চিন্তা করি। ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি মূলত ইতিহাসেরই একটি বিশেষায়িত ক্ষেত্র। এটি একদিকে মুসলমানদের গৌরবোজ্জ্বল অতীত সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে সংযোগ ঘটায়, অন্যদিকে অতীত ঐতিহ্যের অনুসন্ধান ও জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি সচেতন ও শ্রদ্ধাশীল হতে অনুপ্রাণিত করে।

বর্তমান শিক্ষাক্রমে পূর্বের ইসলামের ইতিহাস বিষয়টিকে 'ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি' নামকরণ করে এর বিষয়বস্তুতে আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বিভিন্ন উপাদান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা ইসলামের মহান মানবতাবোধ, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, উদার মনোভাব, পরমতসহিষ্ণুতা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, নারীর প্রতি সম্মানবোধ, দেশপ্রেম ইত্যাদি গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে সামাজিক, মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারবে। এছাড়া মহান ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, জাতীয়তাবোধ, দেশপ্রেম ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চেতনায় উজ্জীবিত হবে এবং মানবসেবায় অংশগ্রহণ করে শান্তিপূর্ণ সমাজ ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করবে। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা প্রস্তুতির সুবিধার্থে এতে বংশতালিকা, মানচিত্র এবং সৃজনশীল প্রশ্নাবলি সন্নিবেশ করা হয়েছে। সৃজনশীল পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম হচ্ছে ক্লাসেই গ্রুপ করে বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কাজ তৈরি করে শিক্ষককে দেখানো। এক্ষেত্রে সম্মানিত শিক্ষক মহোদয়গণ যেন শিক্ষার্থীদের সহায়তা করতে পারেন তার জন্য প্রতিটি অধ্যায়ের প্রতিটি পাঠে 'কাজ' এবং 'পাঠ মূল্যায়ন' সংযোজন করে দেওয়া হয়েছে।

বইটি রচনা করতে দেশি-বিদেশি অনেক সম্মানিত লেখকগণের বই এবং বিভিন্ন ওয়েবসাইটের সহায়তা নেওয়া হয়েছে। এজন্য তাঁদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা রইল। সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বইটি মুদ্রিত হয়েছে এবং মুদ্রণের ব্যাপারে কম্পোজ থেকে শুরু করে সম্পাদনা পর্যন্ত যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। এরপরও যদি কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যায় তাহলে তা পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের আশা রাখি। তবে বইটির মানোন্নয়নে যেকোনো প্রকার গঠনমূলক সমালোচনা ও পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে। পরিশেষে, যাদের জন্য আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস সেসব শিক্ষার্থী যদি বইটির দ্বারা উপকৃত হয়, তাহলে আমাদের এ চেষ্টা সার্থক হবে। সবাইকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা।

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান (০১৭৪৯৩৫৮৩৫২) | অধ্যাপক ড. এ. টি. এম সামছুজ্জোহা (০১৬৭৮১৪২৯২৪)

বইটির বৈশিষ্ট্য

- ✓ প্রতিটি অধ্যায়ের পাঠভিত্তিক উপস্থাপন
- ✓ শিখনফলের আলোকে প্রতিটি বিষয়বস্তুর সহজ উপস্থাপন
- ✓ প্রতিটি পাঠের শেষে 'পাঠ মূল্যায়ন' সংযোজন
- ✓ পাঠভিত্তিক জেনে রাখো, বাড়ির কাজ, দলীয় ও একক কাজ সংযোজন
- ✓ ঐতিহাসিক বংশতালিকা রেখাচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন
- ✓ মানচিত্রের মাধ্যমে সহজবোধ্যভাবে ইতিহাস উপস্থাপন
- ✓ ইতিহাসের উল্লেখ্যযোগ্য ঘটনা ও সময় ছক আকারে উপস্থাপন
- ✓ অধ্যায়ভিত্তিক প্রধান প্রধান শব্দের ব্যাখ্যা সংযোজন
- ✓ অনুশীলনের জন্য পর্যাপ্তসংখ্যক জ্ঞান, অনুধাবন ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন সংযোজন
- ✓ অনুশীলনীতে সৃজনশীল প্রশ্নের পাশাপাশি সমন্বিত অধ্যায়ের প্রশ্ন সংযোজন
- ✓ বিগত সালের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সংযোজন

পাঠ্যসূচি

প্রথম অধ্যায়: ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা (২৫ পিরিয়ড)

ভারতবর্ষ পরিচিতি ও আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের অবস্থা; ভারতবর্ষে আরবদের প্রাথমিক সামরিক অভিযানসমূহ; মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু অভিযান; গজনি রাজবংশ ও সুলতান মাহমুদ (৯৯৭-১০৩০ খ্রি.); সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানসমূহ; সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানে সাফল্যের কারণ ও ফলাফল; সুলতান মাহমুদের চরিত্র ও কৃতিত্ব মূল্যায়ন; সুলতান মাহমুদ পরবর্তী গজনি রাজবংশের শাসকগণ ও এ রাজবংশের পতন; ঘুরি রাজবংশ: পরিচয় ও উত্থান; সুলতান মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরি (১২০৩-১২০৬ খ্রি.): ভারতে মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠা; মুহাম্মদ ঘুরির ভারত অভিযানের উদ্দেশ্য বা কারণ; মুহাম্মদ ঘুরির ভারত অভিযান; ভারতে মুহাম্মদ ঘুরির সাফল্যের কারণ; মুহাম্মদ ঘুরির চরিত্র ও কৃতিত্ব; মুহাম্মদ ঘুরি ও সুলতান মাহমুদের তুলনা

দ্বিতীয় অধ্যায়: দিল্লি সালতানাত যুগ (৩০ পিরিয়ড)

মামলুক বা তথাকথিতা দাস বংশের পরিচয়; সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক (১২০৬-১২১০ খ্রি.) তথাকথিত দাস বংশ ও দিল্লি সালতানাত প্রতিষ্ঠা; সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ; সমস্যা মোকাবিলা ও দিল্লি সালতানাত সুদৃঢ়ীকরণে সুলতান ইলতুৎমিশ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ; সুলতান ইলতুৎমিশের চরিত্র ও কৃতিত্ব মূল্যায়ন; সুলতান রাজিয়া (১২৩৬-১২৪০ খ্রি.): সিংহাসন লাভ, কার্যক্রম, চরিত্র ও কৃতিত্ব মূল্যায়ন; সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন (১২৬৬-১২৮৭ খ্রি.): পরিচয় ও সিংহাসনে আরোহণ; সুলতান হিসেবে বলবনের কার্যাবলি; দিল্লির সালতানাত সুদৃঢ়ীকরণে বলবনের পদক্ষেপসমূহ; বলবনের কৃতিত্ব ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য; খলজি বংশ (১২৯০-১৩২০খ্রি.); সুলতান আলাউদ্দিন খলজি (১২৯৬-১৩১৬ খ্রি.): পরিচয় ও সিংহাসনে আরোহণ; সুলতান আলাউদ্দিন খলজির প্রাথমিক সংকটসমূহ; সুলতান আলাউদ্দিন খলজির সাম্রাজ্য বিস্তার; সুলতান আলাউদ্দিন খলজির শাসনব্যবস্থা ও শাসননীতি; সুলতান আলাউদ্দিন খলজির মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা; আলাউদ্দিন খলজির চারিত্রিক গুণাবলি ও কৃতিত্ব বিচার; তুঘলক বংশ (১৩২০-১৪১৩ খ্রি.); সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক (১৩২৫-১৩৫১ খ্রি.); সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক (১৩৫১-৮৮ খ্রি.); সৈয়দ ও লোদী বংশ (১৪১৪-১৫২৬ খ্রি.): উত্থান ও পতন; দিল্লি সালতানাতের ক্রমাবনতি ও পতন

তৃতীয় অধ্যায়: ভারত উপমহাদেশে মুঘল শাসন (৩৫ পিরিয়ড)

জহিরউদ্দিন মুহাম্মদ বাবর (১৫২৬-১৫৩০ খ্রি.): ভারতে মুঘল রাজবংশের প্রতিষ্ঠা; সম্রাট বাবরের চরিত্র ও কৃতিত্ব বিচার; নাসিরউদ্দিন মুহাম্মদ হুমায়ুন (১৫৩০-১৫৫৬ খ্রি.): মুঘল-আফগান দ্বন্দ্ব; শেরশাহ (১৫৪০-১৫৪৫ খ্রি.): শাসনব্যবস্থা ও জনহিতকর কার্যাবলি; শেরশাহের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা; শেরশাহের চরিত্র ও কৃতিত্ব মূল্যায়ন; জালালউদ্দিন মুহাম্মদ আকবর (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রি.): পরিচয় ও সিংহাসনে আরোহণ; সম্রাট আকবরের রাজ্য বিজয়; সম্রাট আকবরের রাজপুত নীতি; সম্রাট আকবরের ধর্মীয়নীতি; আকবরের শাসনব্যবস্থা ও মনসবদারি ব্যবস্থা; সম্রাট আকবরের চরিত্র ও কৃতিত্ব; সম্রাট নূরউদ্দিন মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর (১৬০৫-১৬২৭ খ্রি.); সম্রাট জাহাঙ্গীরের চরিত্র ও কৃতিত্ব মূল্যায়ন; সম্রাট শিহাবউদ্দিন মুহাম্মদ শাহজাহান (১৬২৭-১৬৫৮ খ্রি.): পরিচয় ও প্রাথমিক জীবন; সম্রাট শাহজাহানের সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ নীতি; সম্রাট শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকার সংগ্রাম; স্থাপত্য ও চিত্রশিল্পের বিকাশে সম্রাট শাহজাহানের অবদান; সম্রাট শাহজাহানের চরিত্র ও কৃতিত্ব বিচার; সম্রাট মুহিউদ্দিন মুহাম্মদ আওরঙ্গজেব (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রি.): পরিচয় ও প্রাথমিক কার্যাবলি ও সাম্রাজ্য বিস্তার; সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজপুত নীতি; সম্রাট আওরঙ্গজেবের ধর্মীয় নীতি; সম্রাট আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি; সম্রাট আওরঙ্গজেবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্ব পর্যালোচনা; মুঘল সাম্রাজ্যের পতন: কারণ ও ফলাফল; মুঘল আমলে ভারতেবর্ষের শাসন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা

চতুর্থ অধ্যায়: বাংলায় কোম্পানি ও ঔপনিবেশিক শাসন (২০ পিরিয়ড)

বাংলায় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আগমনের প্রেক্ষাপট ও কোম্পানির দিওয়ানি; লর্ড ক্লাইভ ও দ্বৈত শাসনব্যবস্থা; তিতুমীরের বিদ্রোহ: বাংলায় ব্রিটিশ শাসনবিরোধী সংগ্রামে শহীদ তিতুমীর এর অবদান; হাজি শরীয়তুল্লাহ ও ফরায়েজি আন্দোলন; ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লব: বিপ্লবের কারণ, ঘটনা ও ফলাফল; সংস্কার আন্দোলন: হাজি মুহম্মদ মোহসিন;

নবাব আবদুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩) ও সমাজ সংস্কার; সৈয়দ আমীর আলী; রাজনৈতিক দল গঠন ও সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫ খ্রি.); মুসলিম লীগ (১৯০৬ খ্রি.) ও মুসলিম প্রতিনিধিত্ব; বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫): বঙ্গভঙ্গের কারণ, ঘটনা ও ফলাফল; বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়া ও বঙ্গভঙ্গ রদ; খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন; দ্বি-জাতি তত্ত্ব ও লাহোর প্রস্তাব (১৯৪০ খ্রি.); ভারত বিভক্তি ১৯৪৭: পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম

পঞ্চম অধ্যায়: বাংলার ইতিহাস (পাকিস্তান আমল) (২০ পিরিয়ড)

ভাষা আন্দোলনের পটভূমি; ভাষা আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি; ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য; ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন ও যুক্তফ্রন্ট; ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের ফলাফল এবং যুক্তফ্রন্টের বিজয় ও মুসলিম লীগের পরাজয়ের কারণ; পূর্ব বাংলার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক নীতি; পূর্ব বাংলার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক নীতি: অর্থনৈতিক; পূর্ব বাংলার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক নীতি: সামরিক ও অন্যান্য; ঐতিহাসিক ছয় দফা (১৯৬৬); ঐতিহাসিক ছয়দফা দাবিসমূহ এবং এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য; ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা (১৯৬৮ খ্রি.); উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান; গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ষষ্ঠ অধ্যায়: স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় (২০ পিরিয়ড)

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন; ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলসমূহ ও তাদের নির্বাচনি তৎপরতা; ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন ও এর ফলাফল; ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয় ও এর প্রতিক্রিয়া; বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ: প্রেক্ষাপট ও বিষয়বস্তু; ২৫ মার্চের কাল রাতের গণহত্যা; বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা ও মুক্তিযুদ্ধের সূচনা; মুজিবনগর সরকার: গঠন ও কার্যক্রম; মহান মুক্তিযুদ্ধ: মুক্তিবাহিনী গঠন; মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা; মুক্তিযুদ্ধে বিদেশি শক্তির ভূমিকা; মহান মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তিসমূহের তৎপরতা; স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়

মানবণ্টন

সৃজনশীল প্রশ্ন: ৭০ নম্বর	
মোট ১১টি প্রশ্ন থাকবে। ৭টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেকটি প্রশ্নের মান ১০।	১০ ×৭ = ৭০
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন: ৩০ নম্বর	
মোট ৩০টি প্রশ্ন থাকবে। সব কয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেকটি প্রশ্নের মান ১।	১ ×৩০ = ৩০
মোট	১০০

মানবণ্টন পরিবর্তনশীল; এর সাথে প্রশ্নের ধরনের তেমন সম্পর্ক নেই। মানবণ্টনের আপডেট দেখতে ব্রাউজারের অ্যাড্রেস বারে টাইপ করো—
akkharpatra.com/hsc/ishmdn25.pdf

সূচিপত্র

অধ্যায় ও বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়: ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা	**১-৫৬**
ভারতবর্ষ পরিচিতি	২
আরবদের সিন্ধু এবং মুলতান বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা	৪
আরবদের সিন্ধু এবং মুলতান বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের সামাজিক, ধর্মীয়, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থা	৬
ভারতবর্ষে আরবদের প্রাথমিক সামরিক অভিযানসমূহ	৮
মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু ও মুলতান অভিযানের কারণ	৯
মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু ও মুলতান অভিযানের ঘটনাবলি এবং সাফল্যের কারণ	১১
আরবদের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ের ফলাফল	১৩
সিন্ধুতে পরবর্তী আরব শাসনের ইতিহাস	১৬
গজনি রাজবংশ ও সুলতান মাহমুদ	১৭
ভারতে সুলতান মাহমুদের সামরিক অভিযানের কারণ বা উদ্দেশ্য	১৯
ভারতে সুলতান মাহমুদের অভিযানসমূহ	২২
ভারত অভিযানে সুলতান মাহমুদের সাফল্যের কারণ এবং এর ফলাফল	২৫
সুলতান মাহমুদের চরিত্র ও কৃতিত্ব এবং গজনি রাজবংশের পতন	২৮
সুলতান মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরি: ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা (১২০৩-১২০৬ খ্রি.) এবং মুহাম্মদ ঘুরির অভিযানের প্রাক্কালে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা	৩১
মুহাম্মদ ঘুরির ভারত অভিযানের উদ্দেশ্য বা কারণ	৩৪
মুহাম্মদ ঘুরির ভারত অভিযানসমূহ	৩৫
ভারত অভিযানে মুহাম্মদ ঘুরির সাফল্যের কারণ	৩৮
মুহাম্মদ ঘুরির চরিত্র ও কৃতিত্ব	৪০
মুহাম্মদ ঘুরি ও সুলতান মাহমুদের তুলনা এবং ঘুরি বংশের পতন	৪১
এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ	৪৪
সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর	৪৬
অনুশীলনী	৫১

অধ্যায় ও বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
দ্বিতীয় অধ্যায়: দিল্লি সালতানাত যুগ	**৫৭-১৪৮**
মামলুক বা দাস বংশের পরিচয়	৫৮
সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক: দাস বংশ প্রতিষ্ঠা (১২০৬-১২১০ খ্রি.)	৬০
কুতুবউদ্দিন আইবেকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্ব	৬৩
সুলতান ইলতুৎমিশ: ক্ষমতায় আরোহণ ও প্রাথমিক সমস্যা এবং সমস্যা মোকাবিলা ও দিল্লি সালতানাত সুদৃঢ়ীকরণে সুলতান ইলতুৎমিশের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ (১২১১-১২৩৬ খ্রি.)	৬৫
দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে সুলতান ইলতুৎমিশ	৬৯
সুলতান রাজিয়া: পরিচয় ও কৃতিত্ব (১২৩৬-১২৪০ খ্রি.) এবং রাজিয়া পরবর্তী সুলতান ইলতুৎমিশের অন্য উত্তরাধিকারী	৭১
সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন: প্রাথমিক জীবন ও গৃহীত কার্যাবলি (১২৬৬-১২৮৭ খ্রি.)	৭৪
দিল্লি সালতানাত সুদৃঢ়ীকরণে সুলতান বলবনের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ এবং তার মোঙ্গল নীতি	৭৬
সুলতান বলবনের কৃতিত্ব ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং বলবনের শাসন নীতির সমালোচনা	৭৯
সুলতান জালালউদ্দিন খলজি: খলজি বংশের প্রতিষ্ঠা (১২৯০-১২৯৬ খ্রি.)	৮১
আলাউদ্দিন খলজি: প্রাথমিক জীবন, সংকটসমূহ ও সংকট নিরসনে গৃহীত পদক্ষেপ (১২৯৬-১৩১৬ খ্রি.)	৮৪
সুলতান আলাউদ্দিন খলজির সাম্রাজ্য বিস্তার: উত্তর ভারত বিজয়	৮৭
সুলতান আলাউদ্দিন খলজির দক্ষিণ ভারত অভিযান	৮৯
সুলতান আলাউদ্দিন খলজির শাসন ব্যবস্থা এবং সংস্কারসমূহ	৯২
সুলতান আলাউদ্দিন খলজির মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও এর ফলাফল	৯৪
আলাউদ্দিন খলজির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্ব এবং খলজি বংশের পতন	৯৭
সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক: তুঘলক বংশ প্রতিষ্ঠা (১৩২০-১৩২৫ খ্রি.)	১০০

অধ্যায় ও বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক: প্রাথমিক জীবন, সিংহাসনে আরোহণ এবং উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা প্রণয়ন (১৩২৫-১৩৫১ খ্রি.)	১০৪
সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা	১০৬
সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজ্য বিস্তার পরিকল্পনা এবং পরিকল্পনা ব্যর্থতার কারণ ও এর প্রতিক্রিয়া	১০৯
মুহাম্মদ বিন তুঘলকের চরিত্র ও কৃতিত্ব	১১২
সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক: প্রাথমিক জীবন এবং সমর অভিযান ও বিদ্রোহ দমন (১৩৫১-১৩৮৮ খ্রি.)	১১৫
ফিরোজ শাহ তুঘলকের শাসন ব্যবস্থা ও জনহিতকর কার্যাবলি	১১৭
সৈয়দ বংশ: উত্থান ও পতন (১৪১৪-১৪৫১ খ্রি.)	১২২
লোদি বংশ: উত্থান ও পতন (১৪৫১-১৫২৬ খ্রি.)	১২৫
দিল্লি সালতানাতের ক্রমাবনতি ও পতন	১২৯
এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ	১৩৩
সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর	১৩৫
অনুশীলনী	১৪১
তৃতীয় অধ্যায়: ভারত উপমহাদেশে মুঘল শাসন	**১৪৯-২৬২**
মুঘলদের পরিচয় এবং সম্রাট বাবরের প্রাথমিক জীবন	১৫০
সম্রাট বাবর: ভারতে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠা (১৫২৬-১৫৩০ খ্রি.)	১৫২
সম্রাট বাবর পরিচালিত অন্যান্য যুদ্ধ এবং তার চরিত্র ও কৃতিত্ব	১৫৬
সম্রাট হুমায়ুন: প্রাথমিক জীবন ও সমস্যাবলি এবং মুঘল-আফগান দ্বন্দ্ব (১৫৩০-১৫৫৬ খ্রি.)	১৬০
মুঘল-আফগান সংঘর্ষে হুমায়ুনের পরাজয়ের কারণ, রাজ্য পুনরুদ্ধার এবং তার চরিত্র ও কৃতিত্ব	১৬৪
শেরশাহ: প্রাথমিক জীবন ও রাজ্য বিজয় (১৫৪০-১৫৪৫ খ্রি.)	১৬৭
শেরশাহের শাসন ব্যবস্থা ও জনহিতকর কার্যাবলি	১৭০
শেরশাহের চরিত্র ও কৃতিত্ব	১৭৫
সম্রাট আকবর: প্রাথমিক জীবন ও রাজ্য বিজয় (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রি.)	১৭৭
সম্রাট আকবরের রাজপুত নীতি	১৮৩
সম্রাট আকবরের ধর্মীয় নীতি	১৮৫
সম্রাট আকবরের শাসন ব্যবস্থা এবং তার প্রবর্তিত মনসবদারি প্রথা	১৮৮
সম্রাট আকবরের চরিত্র ও কৃতিত্ব	১৯১
সম্রাট জাহাঙ্গীর: প্রাথমিক জীবন ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি (১৬০৫-১৬২৭ খ্রি.)	১৯৪
সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজ্য বিস্তার	১৯৭
সম্রাট জাহাঙ্গীরের ওপর নূরজাহানের প্রভাব এবং সম্রাট জাহাঙ্গীরের চরিত্র ও কৃতিত্ব	২০০
সম্রাট শাহজাহান: প্রাথমিক জীবন ও বাধা-বিপত্তি (১৬২৭-১৬৫৮ খ্রি.)	২০৩
সম্রাট শাহজাহানের সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ নীতি	২০৫
সম্রাট শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যকার উত্তরাধিকার সংগ্রাম	২০৮
স্থাপত্য ও চিত্রশিল্পের বিকাশে সম্রাট শাহজাহানের অবদান	২১২
সম্রাট শাহজাহানের চরিত্র ও কৃতিত্ব এবং সম্রাজ্ঞী মমতাজমহল	২১৪
সম্রাট আওরঙ্গজেব: প্রাথমিক জীবন ও সাম্রাজ্য বিস্তার (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রি.)	২১৭
সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজপুত নীতি	২২১
সম্রাট আওরঙ্গজেবের ধর্মীয় নীতি	২২৩
সম্রাট আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি	২২৫
সম্রাট আওরঙ্গজেবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্ব	২৩০
সম্রাট আওরঙ্গজেব পরবর্তী মুঘল সম্রাটগণ	২৩২
মুঘল সাম্রাজ্যের পতন: কারণ ও ফলাফল	২৩৪
মুঘল আমলের প্রশাসন	২৩৮
মুঘল আমলে ভারতের আর্থ-সামাজিক অবস্থা	২৪০
এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ	২৪৫
সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর	২৪৭
অনুশীলনী	২৫৫
চতুর্থ অধ্যায়: বাংলায় কোম্পানি ও ঔপনিবেশিক শাসন	**২৬৩-৩২৪**
বাংলার শাসনতান্ত্রিক প্রেক্ষাপট এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আগমন	২৬৪
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভ	২৬৬
লর্ড ক্লাইভ ও দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা	২৬৮
ফরায়েজি আন্দোলন	২৭১
তিতুমীরের বিদ্রোহ	২৭৪
১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ	২৭৭
১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের ফলাফল	২৮০

অধ্যায় ও বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
সংস্কার আন্দোলন: হাজি মুহম্মদ মোহসিন (১৭৩২-১৮১২ খ্রি.)	২৮২
নবাব আবদুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩ খ্রি.): সংস্কার আন্দোলনে ভূমিকা	২৮৪
সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮): মুসলমানদের রাজনৈতিক জাগরণে ভূমিকা	২৮৭
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস	২৮৯
নিখিল ভারত মুসলিম লীগ	২৯১
বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫): কারণ ও ঘটনা	২৯৩
বঙ্গভঙ্গের ফলাফল	২৯৫
খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন	২৯৭
লাহোর প্রস্তাব ও দ্বিজাতি তত্ত্ব (১৯৪০)	৩০০
ভারত বিভক্তি (১৯৪৭): পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম	৩০৩
এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ	৩০৭
সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর	৩০৯
অনুশীলনী	৩১৮
পঞ্চম অধ্যায়: বাংলার ইতিহাস (পাকিস্তান আমল)	**৩২৫-৩৭৪**
ভাষা আন্দোলনের পটভূমি এবং গতি-প্রকৃতি	৩২৬
একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনা ও প্রতিক্রিয়া	৩২৯
বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষে ভাষা আন্দোলনের ভূমিকা	৩৩২
১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন	৩৩৪
১৯৫৪ সালের নির্বাচনের ফলাফল, গুরুত্ব ও তাৎপর্য	৩৩৭
১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয় ও মুসলিম লীগের পরাজয়ের কারণ	৩৩৯
পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বৈষম্য	৩৪১
পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্য	৩৪৪
পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার সামরিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্য	৩৪৬
ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবির পটভূমি	৩৪৮
ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবিসমূহ, প্রতিক্রিয়া এবং ছয় দফার গুরুত্ব ও তাৎপর্য	৩৫০

অধ্যায় ও বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
আগরতলা মামলা (১৯৬৮)	৩৫৩
আগরতলা মামলার বিচার প্রক্রিয়া এবং এর ফলাফল ও গুরুত্ব	৩৫৫
উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের পটভূমি, কারণ এবং লক্ষ্য	৩৫৭
উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের ঘটনাবলি, ফলাফল ও গুরুত্ব	৩৫৯
এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ	৩৬২
সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর	৩৬৪
অনুশীলনী	৩৬৯
ষষ্ঠ অধ্যায়: স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়	**৩৭৫-৪৩১**
১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন: প্রেক্ষাপট এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলসমূহ	৩৭৬
১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন ও এর ফলাফল	৩৭৮
১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় ও এর প্রতিক্রিয়া	৩৮০
১৯৭০ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য	৩৮২
অসহযোগ আন্দোলন (২-২৫ মার্চ, ১৯৭১)	৩৮৪
শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণ এবং এর তাৎপর্য	৩৮৬
২৫ মার্চের কালরাতের গণহত্যা	৩৮৮
বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা ও মহান মুক্তিযুদ্ধের সূচনা	৩৯০
মুজিবনগর সরকার (অস্থায়ী সরকার)	৩৯৩
মুজিবনগর বা অস্থায়ী সরকারের কার্যক্রম	৩৯৫
মুক্তিবাহিনী গঠন	৩৯৮
মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা এবং মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিসমূহের কার্যক্রম	৪০১
মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভূমিকা	৪০৪
একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন দেশ ও জাতিসংঘের ভূমিকা	৪০৭
স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়	৪১০
এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ	৪১৪
সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর	৪১৭
অনুশীলনী	৪২৪

সহায়ক গ্রন্থসমূহ	**৪৩২**
পরিশিষ্ট	**৪৩৩-৪৪৮**
বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র	৪৩৩

১

ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা

Foundation of Muslim Rule in India

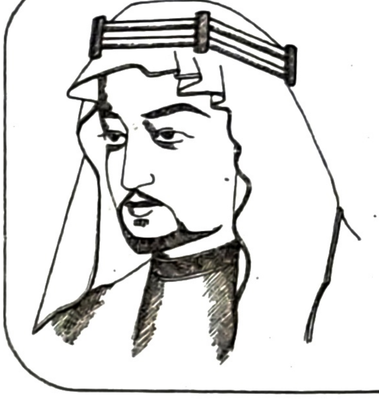

মুহাম্মদ বিন কাসিম

প্রধান প্রধান শব্দ

- উপমহাদেশ
- নৃতত্ত্বের জাদুঘর
- জাতিভেদ প্রথা
- জওহর ব্রত
- নিষ্ফল বিজয়
- সোমনাথ অভিযান
- জাহানসুজ
- শাহনামা
- স্বর্গীয় বধূ
- কনফেডারেসি
- তরাইনের যুদ্ধ

অষ্টম শতাব্দীর শুরুর দিকে মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ের মধ্য দিয়ে ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রায় ৫০০ বছর পর তৃতীয় পর্যায়ে অভিযান চালিয়ে মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরি ভারতে স্থায়ী মুসলিম সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। মূলত ইসলামের আবির্ভাবের (৬১০ খ্রি.) পর থেকে আরবদের ধর্ম, রাজনীতি, বাণিজ্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক মহাবিপ্লব সূচিত হয়।। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মক্কা-মদিনা বিজয়ের পর ইসলামের সুবাতাস বিশ্বের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। এ পথ ধরে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা) (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.)-এর আমলে প্রথম এবং তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা) (৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.)-এর আমলে ভারতীয় উপকূলে মুসলমানদের দ্বিতীয় অভিযান পরিচালিত হয়। তবে উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদের ক্ষমতারোহণের (৭০৫-৭১৫ খ্রি.) সাথে সাথে মুসলমানদের দিগ্বিজয়ের ইতিহসে এক নতুন অধ্যায়ের সংযোজন ঘটে। এ সময় (৭১২ খ্রি.) তরুণ সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে মুসলমানরা সিন্ধু জয় করে এবং এখানে সুষ্ঠু, উদার ও ন্যায়নিষ্ঠ শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে বিশ্বে উৎকৃষ্ট প্রশাসনিক কাঠামোর উদাহরণ তৈরি করেছে।

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখব

- মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়: কারণ, ঘটনা ও ফলাফল
- গজনির সুলতান মাহমুদ: সামরিক অভিযান, চরিত্র ও কৃতিত্ব
- মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরি: উত্তর ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা, চরিত্র ও কৃতিত্ব

পাঠ পরিকল্পনা	
পাঠ ১	ভারতবর্ষ পরিচিতি
পাঠ ২	আরবদের সিন্ধু এবং মুলতান বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা
পাঠ ৩	আরবদের সিন্ধু এবং মুলতান বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের সামাজিক, ধর্মীয়, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থা
পাঠ ৪	ভারতবর্ষে আরবদের প্রাথমিক সামরিক অভিযানসমূহ
পাঠ ৫	মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু ও মুলতান অভিযানের কারণ
পাঠ ৬	মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু ও মুলতান অভিযানের ঘটনাবলি এবং সাফল্যের কারণ
পাঠ ৭ ও ৮	আরবদের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ের ফলাফল
পাঠ ৯	সিন্ধুতে পরবর্তী আরব শাসনের ইতিহাস
পাঠ ১০	গজনি রাজবংশ ও সুলতান মাহমুদ
পাঠ ১১ ও ১২	ভারতে সুলতান মাহমুদের সামরিক অভিযানের কারণ বা উদ্দেশ্য
পাঠ ১৩ ও ১৪	ভারতে সুলতান মাহমুদের অভিযানসমূহ
পাঠ ১৫	ভারত অভিযানে সুলতান মাহমুদের সাফল্যের কারণ এবং এর ফলাফল
পাঠ ১৬ ও ১৭	সুলতান মাহমুদের চরিত্র ও কৃতিত্ব এবং গজনি রাজবংশের পতন
পাঠ ১৮ ও ১৯	সুলতান মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরি: ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা (১২০৩-১২০৬ খ্রি.) এবং মুহাম্মদ ঘুরির অভিযানের প্রাক্কালে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা
পাঠ ২০	মুহাম্মদ ঘুরির ভারত অভিযানের উদ্দেশ্য বা কারণ
পাঠ ২১ ও ২২	মুহাম্মদ ঘুরির ভারত অভিযানসমূহ
পাঠ ২৩	ভারত অভিযানে মুহাম্মদ ঘুরির সাফল্যের কারণ
পাঠ ২৪	মুহাম্মদ ঘুরির চরিত্র ও কৃতিত্ব
পাঠ ২৫	মুহাম্মদ ঘুরি ও সুলতান মাহমুদের তুলনা এবং ঘুরি বংশের পতন

পাঠ ১

ভারতবর্ষ পরিচিতি
Introduction to India

ভারতবর্ষ নামকরণ (The Naming of India)

এশিয়া মহাদেশের মধ্য দক্ষিণে অবস্থিত ভারতবর্ষ সাধারণভাবে 'ভারত উপমহাদেশ' নামে পরিচিত। বস্তুত বিশাল আয়তন, বিপুল জনসংখ্যা এবং প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের কারণে ভারতবর্ষকে উপমহাদেশ বলা হয়। ভারতবর্ষের নামকরণ নিয়ে ঐতিহাসিক ও গবেষকদের মধ্যে নানা মতদ্বৈততা রয়েছে। জনশ্রুতি অনুযায়ী পৌরাণিক যুগে 'ভরত' নামে এদেশে একজন হিন্দু রাজা ছিলেন। এ রাজার নামানুসারেই এদেশের নামকরণ হয়েছে ভারতবর্ষ। কোনো কোনো সূত্র মতে, প্রাচীন ফারসি সাহিত্যে সিন্ধু শব্দটি 'হিন্দ' এবং 'সিন্দ' এ উভয় নামে উল্লেখ করা হয়েছে। কালক্রমে সমগ্র উপমহাদেশের জন্য এ 'হিন্দ' নামটির প্রচলন হয়। অন্য একটি বর্ণনা মতে, গ্রিকরা ভারত আক্রমণ করতে এসে প্রথমে সিন্ধু অঞ্চলের সাথে পরিচিত হয়ে এ অঞ্চলকে 'ইন্ডাস' নামে অভিহিত করে। ধীরে ধীরে তারা সমগ্র ভারতবর্ষের পরিচিতি হিসেবে 'ইন্ডাস' বা 'ইন্ডিয়া' নামের প্রচলন করে। আবার সিন্ধু নদের ইংরেজি 'ইন্ডাস' (Indus) থেকে 'ইন্ডিয়া' (India) নামের উৎপত্তির কথাও কেউ কেউ বলে থাকেন। মধ্যযুগের মুসলিম বিবরণীগুলোতে ভারতবর্ষকে হিন্দুদের বাসভূমি হিসেবে 'হিন্দুস্থান' নামে অভিহিত করা হয়েছে। ধারণা করা হয় যে, হিন্দুদের বাসভূমি হওয়ায় এ অঞ্চলটি আজও হিন্দুস্থান নামে পরিচিত।

ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অবস্থান (The Geographical Location of India)

ভারতবর্ষ একটি বিশাল ভূখণ্ড। রাশিয়াকে বাদ দিলে আয়তনে এটি সমগ্র ইউরোপ মহাদেশের সমান। ভারতবর্ষের উত্তর, উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব দিকে হিমালয় পর্বত, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পূর্বে ব্রহ্মদেশ (মিয়ানমার), পশ্চিমে পারস্য (ইরান) ও আরব সাগর। বর্তমান বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটানের বিস্তৃত অঞ্চল এর অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবীর প্রায় এক-পঞ্চমাংশ লোক এ উপমহাদেশে বাস করে। ভৌগোলিক দিক দিয়েও ভারতবর্ষ একটি বিচিত্র অঞ্চল। ভারতবর্ষের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বিন্ধ্য পর্বত দেশটিকে দুটি অসমান অংশে বিভক্ত করেছে। বিন্ধ্য পর্বতের উত্তর অংশ 'আর্যাবর্ত' বা উত্তর ভারত এবং দক্ষিণাংশ 'দাক্ষিণাত্য' নামে পরিচিত।

ভারতবর্ষে নৃ-তাত্ত্বিক বিবর্তন (Ethnical Evolution in India)

দ্রাবিড় জাতি ভারতবর্ষের প্রাচীনতম অধিবাসী। এরপর আর্য, শক, কুষাণ ও হুনরা পর্যায়ক্রমে ভারতে আসে। অনেকের মতে, রাজপুত, জাঠ এবং গুর্জররা হুন জাতির বংশধর। হিন্দু ও ইসলাম ভারতের প্রধান ধর্ম। তবে এখানে বৌদ্ধ, খ্রিস্ট, জৈন, শিখ, অগ্নি উপাসক ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীও রয়েছে। ভারতে বর্তমানে ২,০০০-এর অধিক উপভাষা (Dialect) প্রচলিত আছে। এ কারণেই আইরিশ ইতিহাসবিদ ভিন্সেন্ট স্মিথ (Vincent Arthur Smith) ভারত উপমহাদেশকে 'নৃতত্ত্বের জাদুঘর' (Ethological Museum) বলে অভিহিত করেছেন।[১] কালবিভাজন অনুযায়ী ভারতবর্ষের ইতিহাসকে তিনটি পর্যায়ে বিন্যস্ত করা যায়। এগুলো হলো— ১. প্রাচীন যুগ, ২. মধ্যযুগ এবং ৩. আধুনিক যুগ। মুসলিম বিজয়ের আগে হিন্দু ও বৌদ্ধ শাসনামলকে ভারতীয় ইতিহাসের প্রাচীন যুগ বলা হয়। ভারতবর্ষে মুসলিম অভিযান ও আরবদের সিন্ধু ও মুলতান বিজয় থেকে ভারতে মধ্যযুগের সূচনা হয় বলে ঐতিহাসিকেরা মনে করেন। মুঘল শাসনের শেষ পর্যন্ত এ যুগের বিস্তৃতি। ১৭৫৭ সালে পলাশি যুদ্ধের মাধ্যমে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে আধুনিক যুগের সূচনা হয়। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে এবং ভারতবর্ষে 'পাকিস্তান' ও 'ভারত' নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। ১৯৭১ সালে বাঙালির মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তান বিভক্ত হয় এবং স্বাধীন 'বাংলাদেশ' রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এভাবে ভারত উপমহাদেশ বর্তমানে ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান নামে তিনটি দেশে বিভক্ত।

---

[১] Vincent Arthur Smith, *The Oxford History of India*, Oxford 1956

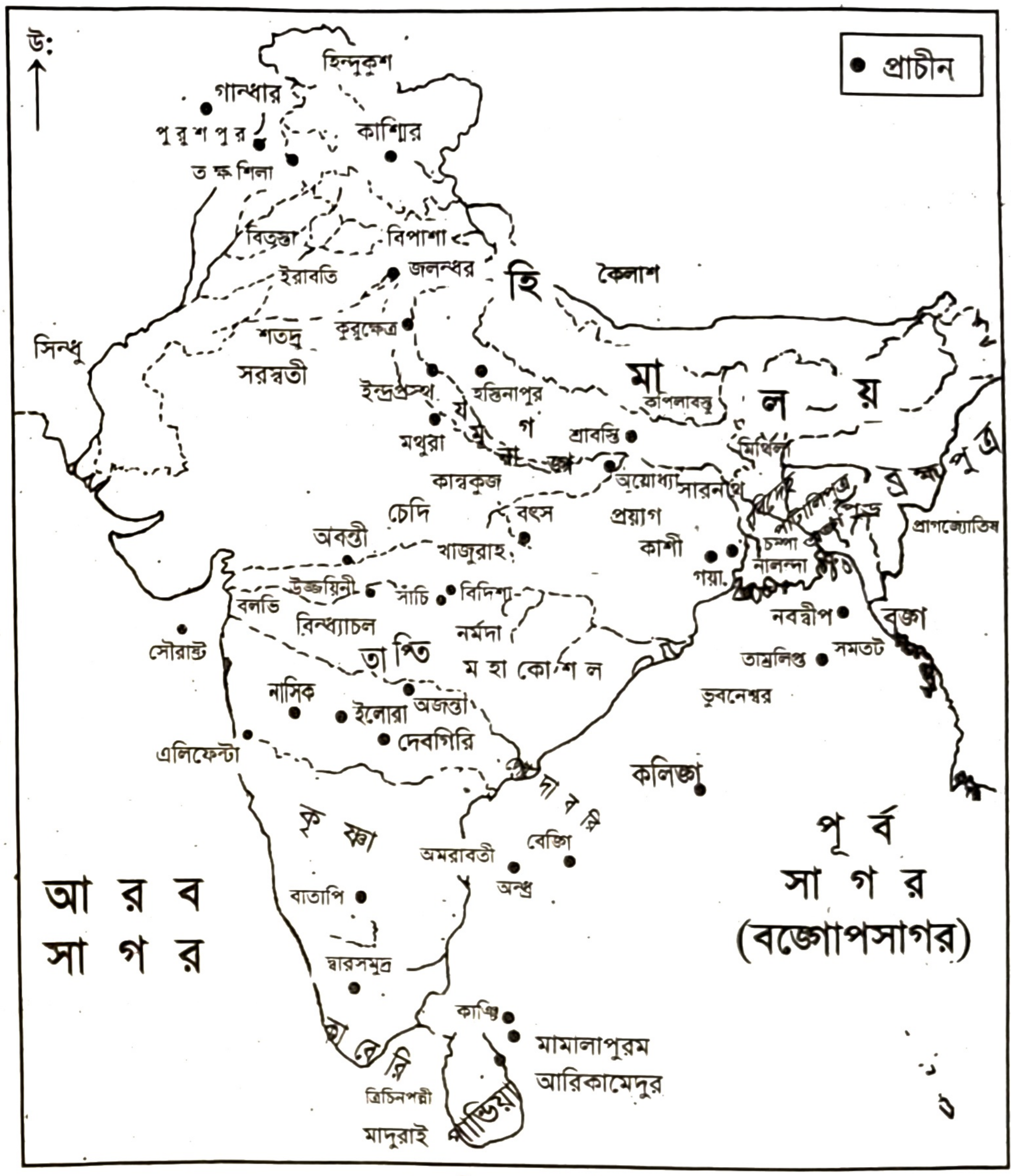
উ:
● প্রাচীন
হিন্দুকুশ
গান্ধার
পুরুশপুর
তক্ষশিলা
কাশ্মির
বিতস্তা
বিপাশা
ইরাবতি
জলন্ধর
হিমালয়
কৈলাশ
সিন্ধু
শতদ্রু
সরস্বতী
কুরুক্ষেত্র
ইন্দ্রপ্রস্থ
হস্তিনাপুর
মথুরা
যমুনা
গঙ্গা
কপিলাবস্তু
শ্রাবস্তি
মিথিলা
অয়োধ্যা
সারনাথ
কান্যকুজ
চেদি
বৎস
প্রয়াগ
কাশী
পাটলিপুত্র
চম্পা
নালন্দা
গয়া
ব্রহ্মপুত্র
প্রাগজ্যোতিষ
অবন্তী
খাজুরাহ
উজ্জয়িনী
সাঁচি
বিদিশা
বলভি
বিন্ধ্যাচল
নর্মদা
নবদ্বীপ
বঙ্গ
সৌরাষ্ট্র
তাপ্তি
মহাকোশল
তাম্রলিপ্ত
সমতট
ভুবনেশ্বর
নাসিক
ইলোরা
অজন্তা
দেবগিরি
এলিফেন্টা
কলিঙ্গ
গোদাবরি
কৃষ্ণা
অমরাবতী
বেঙ্গি
অন্ধ্র
পূর্ব সাগর (বঙ্গোপসাগর)
আরব সাগর
বাতাপি
দ্বারসমুদ্র
কাঞ্চি
মামালাপুরম
আরিকামেদুর
কাবেরি
ত্রিচিনপল্লী
মাদুরাই
সিংহল

প্রাচীন ভারতবর্ষ

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ভারতবর্ষ এশিয়া মহাদেশের কোন দিকে অবস্থিত?
২. কারা ভারতকে প্রথম 'ইন্ডাস' নামে অভিহিত করে?
৩. ভারতবর্ষের কেন্দ্রস্থলে কোন পর্বত অবস্থিত?
৪. ভারতবর্ষের প্রাচীনতম অধিবাসী কারা? *[সকল বোর্ড ২০২১; ২০১৮; ২০১৭]*
৫. ভারত উপমহাদেশকে 'নৃতত্ত্বের জাদুঘর' বলেছেন কে?
৬. মুসলিম বিজয়ের আগে হিন্দু ও বৌদ্ধ শাসনামলকে ভারতীয় ইতিহাসের কোন যুগ বলা হয়?

উত্তরের জন্য ৪৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. যুগবিভাজন অনুযায়ী ভারতবর্ষের শাসনকাল সম্পর্কে একটি চার্ট তৈরি করো।

পাঠ ২

আরবদের সিন্ধু এবং মুলতান বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা

Political, Administrative and Economical Conditions of North-Western India at the Eve of Arab Conquest of Sindh and Multan

রাজনৈতিক অবস্থা (Political Conditions)

মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতে কোনো রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস থেকে জানা যায়, মৌর্য সম্রাট মহারাজ অশোক (২৭৩-২৩২ খ্রি.পূ.) ভারতে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু ২৩২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে তার মৃত্যুর পর ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য দুর্বল হয়ে পড়ে। কোনো হিন্দু রাজা বা রাজনৈতিক নেতা এমনকি সমুদ্রগুপ্ত (সম্ভবত ৩৩০—৩৮১ খ্রি.পূ.) এবং চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের (৩৮১—৪১৩ খ্রি.পূ.) মতো খ্যাতিমান শাসকেরাও সমগ্র উপমহাদেশকে নিজেদের শাসনভুক্ত করতে পারেননি। সপ্তম শতকে সম্রাট হর্ষবর্ধন (৬০৬-৬৪৭ খ্রি.) উত্তর-পশ্চিম ভারতে একটি বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক চালুক্য রাজা দ্বিতীয় পুলকেশি সমগ্র দাক্ষিণাত্য মালভূমির ওপর তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। কিন্তু এ দুই মহান সম্রাটের মৃত্যুর পর ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়ে। যোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাবে তাদের সাম্রাজ্য ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায় এবং ভারতবর্ষে অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়। একে অন্যের ওপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা এবং শক্তি বৃদ্ধির জন্য ক্ষুদ্র এ রাজ্যগুলো পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকত। ফলে এ সময় রাজনৈতিক ঐক্য ও সংহতি একেবারেই বিনষ্ট হয়ে যায়। ভারতীয় ঐতিহাসিক ও গবেষক ভি. ডি. মহাজনের (Vidha Dhar Mahajan) মতে, "রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেশে কোনো সার্বভৌম কর্তৃত্ব ছিল না। কেন্দ্রীয় কোনো শক্তি না থাকায় এসব রাজ্যে অনৈক্য ও পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা কাজ করত। ফলে আরব সিন্ধু বিজয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ভারতীয়রা একটি সুসংহত ও সংঘবদ্ধ শক্তি হিসেবে দাঁড়াতে ব্যর্থ হয়।

প্রশাসনিক অবস্থা (Administrative Conditions)

আরব বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় রাজতন্ত্র জনপ্রিয়তা লাভ করে। এ সময় বংশানুক্রমিক রাজা নিযুক্তির প্রথা চালু হয়। রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। ঈশ্বরের প্রতিভূ হিসেবে রাজা আইন প্রণয়ন, শাসনকাজ পরিচালনা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব পালন করতেন। রাজকার্য পরিচালনায় 'মন্ত্রিজ' এবং 'সচিব' নামক দু'শ্রেণির মন্ত্রী রাজাকে সহায়তা করতেন। 'উপরিক' পদবিধারী শাসনকর্তা প্রাদেশিক শাসনকাজ পরিচালনা করতেন। উত্তর ভারতে প্রদেশকে 'ভুক্তি' এবং দক্ষিণ ভারতে 'মণ্ডল' বলা হতো। প্রদেশগুলো কোথাও কোথাও 'রাষ্ট্র' এবং 'দেশা' নামেও পরিচিত ছিল। বিষয় বা জেলার প্রধান কর্মকর্তার পদবি ছিল 'বিষয়পতি'। শাসনব্যবস্থার সর্বনিম্ন স্তর ছিল 'গ্রাম'। 'পঞ্চায়েত' গ্রামের শাসনকাজ পরিচালনা করত।

অর্থনৈতিক অবস্থা (Economical Conditions)

প্রাচীনকাল থেকেই বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ ও ঐশ্বর্যের জন্য ভারতবর্ষের বিশ্বজোড়া খ্যাতি ছিল। প্রাচীন অর্থশাস্ত্রবিদ কৌটিল্যের বিবরণ অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় আয়ের মুখ্য উৎস ছিল তিনটি, যথা: (ক) ভূমি রাজস্ব (খ) সামন্ত প্রভু ও সাধারণ মানুষের কাছ থেকে প্রাপ্ত কর এবং (গ) আবগারি ও বাণিজ্য শুল্ক। ভারতবর্ষ ছিল একটি কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষককে তার উৎপাদিত ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ রাষ্ট্রকে কর হিসেবে দিতে হতো। এ করকে বলা হতো 'ভাগ'। ঐতিহাসিক বিবরণ মতে, মৌর্য ও গুপ্ত যুগে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই সমৃদ্ধ ছিল। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ভারত পরিভ্রমণকারী চীনা পর্যটক ফা-হিয়েন গুপ্ত যুগে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বিবরণ দিয়েছেন। তার বর্ণনা মতে, মগধের লোক সমৃদ্ধিশালী ও ধনী ছিল এবং তাদের মধ্যে সৎকাজ করার প্রবণতা ছিল। এ যুগে বঙ্গদেশের তাম্রলিপ্তি বা তাম্রলিপ্ত বন্দর একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। এখান থেকে বঙ্গদেশের বণিকেরা বড় বড় জাহাজে সিংহল, মালয়, যবদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে যাতায়াত করত।

প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষ অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ থাকলেও সম্পদ বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে ছিল চরম বৈষম্য ও অব্যবস্থা। সমাজের শ্রমজীবী মানুষ যেমন— কৃষক, শ্রমিক, কামার, কুমার, ছুতার, স্বর্ণকার, জেলে, তাঁতি এরা জীবিকা নির্বাহের জন্য হাড়ভাঙা পরিশ্রম করত। আর তাদের এ পরিশ্রমের সুফল ভোগ করত অভিজাতশ্রেণির লোকেরা।

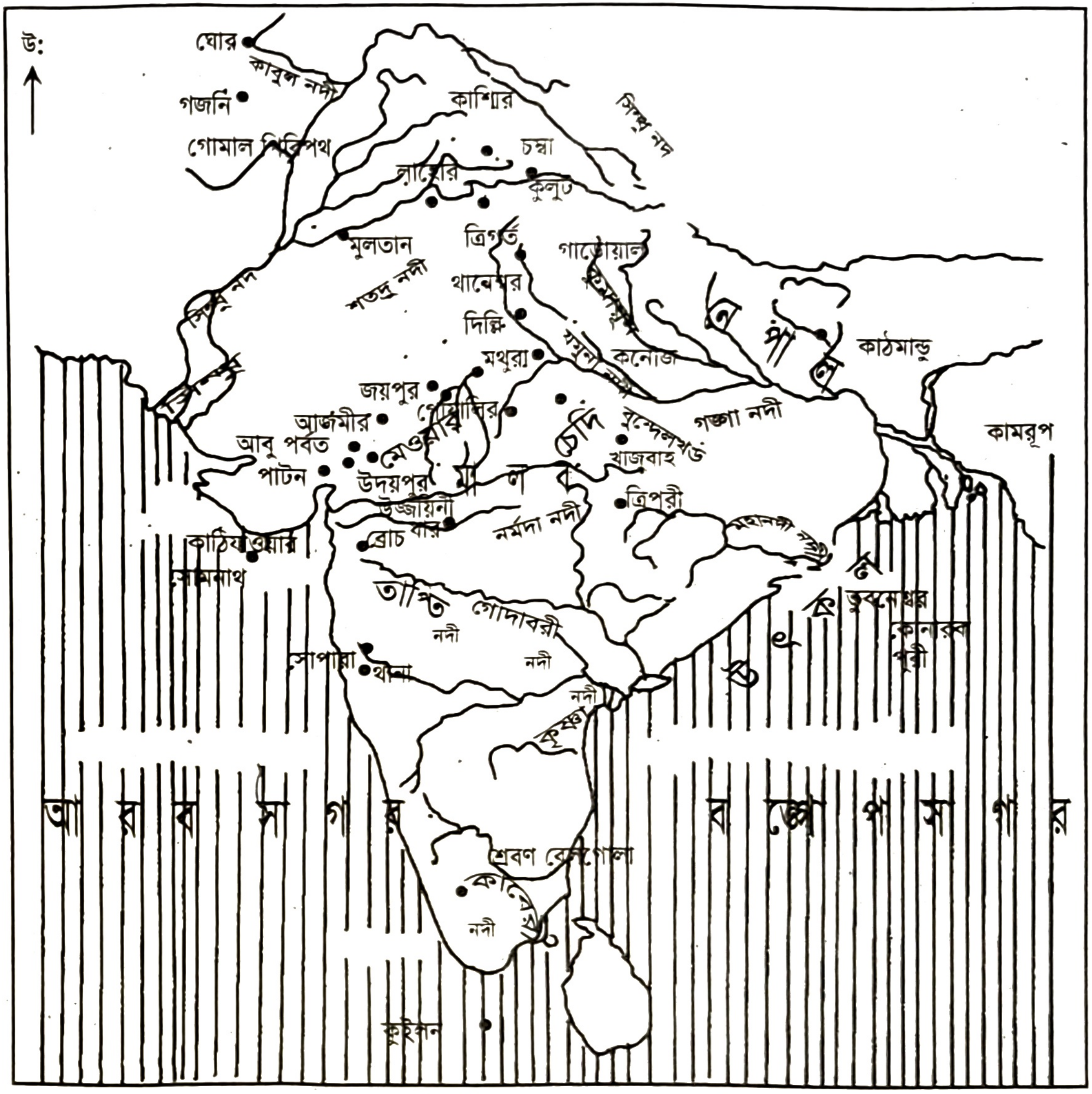
উ:
ঘোর
কাবুল নদী
গজনি
গোমাল গিরিপথ
কাশ্মির
সিন্ধু নদ
চম্বা
লাহোর
কুলুত
মুলতান
ত্রিগর্ত
গাড়োয়াল
শতদ্রু নদী
থানেশ্বর
সিন্ধু নদ
দিল্লি
যমুনা নদী
কনোজ
নেপাল
কাঠমান্ডু
মথুরা
জয়পুর
গোয়ালিয়র
আজমীর
চেদি
বুন্দেলখণ্ড
গঙ্গা নদী
কামরূপ
আবু পর্বত
মেওয়ার
খাজুরাহ
পাটন
উদয়পুর
মালব
ত্রিপুরী
উজ্জয়িনী
ধার
নর্মদা নদী
কাথিয়াওয়ার
ব্রোচ
মহানদী নদী
সোমনাথ
তাপ্তি নদী
গোদাবরী নদী
উৎকল
ভুবনেশ্বর
কোনারক
পুরী
সোপারা
থানা
কৃষ্ণা নদী
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
শ্রবণ বেলগোলা
কাবেরী নদী
কুইলন

মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতবর্ষ

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. প্রাচীন ভারতে কোন সম্রাট রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন?
২. প্রাচীন ভারতের শাসন ব্যবস্থার সর্বনিম্ন স্তর কী ছিল?
৩. অর্থশাস্ত্রবিদ কৌটিল্যের বিবরণ অনুযায়ী প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রীয় আয়ের মুখ্য উৎস কয়টি ছিল?
৪. 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থের রচয়িতা কে? *[রাবি ২০১০-১১]*
৫. ভারত পরিভ্রমণকারী চীনা পর্যটক ফা-হিয়েন ভারতবর্ষের কীসের বিবরণ দিয়েছেন?
৬. প্রাচীন ভারতবর্ষে কোন ক্ষেত্রে চরম বৈষম্য ও অব্যবস্থা ছিল?

উত্তরের জন্য ৪৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

আরবদের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার একটি তালিকা তৈরি করো।

পাঠ ৩

আরবদের সিন্ধু এবং মুলতান বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের সামাজিক, ধর্মীয়, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থা
Social, Religious, Educational and Cultural Conditions of North-Western India at the Eve of Arab Conquest of Sindh and Multan

সামাজিক অবস্থা (Social Conditions)

সমসাময়িক বিভিন্ন দলিল-দস্তাবেজ, শিলালিপি এবং চীনা ও আরব পর্যটকদের বিবরণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য মতে, আরব বিজয়ের প্রাক্কালে তখন ভারতের সামাজিক অবস্থা সন্তোষজনক ছিল না। নানা কুসংস্কার, অমানবিক প্রথায় সমাজ জর্জরিত ছিল। সমাজে আর্থ-সামাজিক বৈষম্য ছিল প্রকট। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্ম ছিল হিন্দু। কালক্রমে হিন্দুসমাজে সংকীর্ণ জাতিভেদ প্রথা বিস্তার ও প্রাধান্য লাভ করে। প্রাচীন হিন্দু সমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এ চারটি বর্ণে বিভক্ত ছিল। চারটি বর্ণের মধ্যে সমাজে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি এবং তারা অন্যদের থেকে বেশি সুবিধা ভোগ করত। এ সময় ক্ষত্রিয়রা যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং শাসনদণ্ড পরিচালনা, বৈশ্যরা ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শূদ্ররা কৃষি ও অন্যান্য সাধারণ বৃত্তি ও পেশায় নিয়োজিত ছিল। সামাজিক পদমর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধার বিবেচনায় বৈশ্য এবং বিশেষ করে শূদ্ররা ছিল বঞ্চিত, অধঃপতিত ও নিগৃহীত। শূদ্ররা সমাজে অপবিত্র ও অস্পৃশ্য বলে বিবেচিত হতো। তৎকালীন সমাজে বহু বিবাহ প্রচলিত থাকলেও অসমবর্ণ বা আন্তঃসাম্প্রদায়িক বিবাহ এবং বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। সহমরণ বা সতীদাহ প্রথা, নরবলি এবং গঙ্গায় শিশু সন্তান বিসর্জন ইত্যাদি অমানবিক কাজকে ধর্মীয়ভাবে পুণ্যের কাজ বলে বিবেচনা করা হতো। গ্রিকদের বিবরণ থেকে জানা যায়, মৌর্য যুগে সমাজে নারীদের মর্যাদা ছিল এবং তারা সাহিত্য ও দর্শনে বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী ছিল। 'কিতাব-উল-হিন্দ' গ্রন্থের প্রণেতা আল বিরুনি বৈদিক যুগে ভারতে নারীর উচ্চ মর্যাদার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তার বর্ণনা মতে, সে সময় মেয়েদের উদারভাবে নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা হতো এবং শাসনক্ষেত্র ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীদের গৃহে আবদ্ধ হয়ে থাকতে হতো এবং তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ছিল না। মৌর্য যুগে ভারতে দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। এটি তখন সামাজিক অনুশাসনে পরিণত হয়েছিল।

জেনে রাখো

সতীদাহ প্রথা প্রাচীন হিন্দু সমাজে প্রচলিত একটি সামাজিক রীতি। এ প্রথায় স্বামীর মৃতদেহের সাথে বিধবা স্ত্রীকে একই চিতায় পুড়িয়ে মারা হতো। তখন স্বামীর মৃত্যু হলে চূড়ান্ত আনুগত্য দেখাতে বিধবা স্ত্রী স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েই স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি দিত। কিন্তু কালক্রমে এটি হিন্দু সমাজে ধর্মীয় বাধ্যবাধকতায় রূপ নেয়। ১৮২৯ সালে সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহন রায়ের উদ্যোগে ভারতের তখনকার গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক আইন পাস করে এ জঘন্য ও নিষ্ঠুর প্রথা উচ্ছেদ করেন।

ধর্মীয় অবস্থা (Religious Conditions)

প্রাক-মুসলিম ভারতে প্রধানত হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন এ তিনটি ধর্ম প্রচলিত ছিল। প্রকৃতপক্ষে মুসলিম বিজয়ের আগে হিন্দুধর্মই ছিল ভারতের প্রধান ধর্ম। ভারতের অধিকাংশ রাজাই ছিলেন হিন্দু। প্রাচীন ভারতের অন্য দুটি প্রধান ধর্ম হলো বৌদ্ধ ও জৈন। বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক ছিলেন গৌতম বুদ্ধ। তিনি সিদ্ধার্থ নামেও পরিচিত। তিনি বিহারের বুদ্ধগয়ায় মোক্ষলাভ করে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। মৌর্য সম্রাট মহামতি অশোকের সময় বৌদ্ধধর্ম ভারতে ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। তবে গুপ্ত শাসনামল থেকে বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য লোপ পেতে থাকে এবং হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণ সূচিত হয়। অন্যদিকে মহাবীর নামক এক ক্ষত্রিয় সন্ন্যাসী জৈনধর্মের প্রবর্তন করেন। অহিংসা ও সংযম জৈন ধর্মের প্রধান শিক্ষা।

হিন্দু ধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ বেদে একেশ্বরবাদের উল্লেখ থাকলেও দেব-দেবীর মূর্তি তৈরি করে পূজা করা এ ধর্মের আচরণ-অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ। বৈষম্যমূলক জাতিভেদ প্রথা ছিল হিন্দু সমাজের মূলভিত্তি। পুরোহিত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ব্রাহ্মণরা ছিলেন সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদা ও ক্ষমতার অধিকারী। একই ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও সবচেয়ে নিম্নস্তরের শূদ্ররা ছিল নির্যাতিত এবং নিষ্পেষিত। তাদের ধর্মীয় শাস্ত্র পাঠ এমনকি শোনারও অধিকার ছিল না। মন্দিরে প্রবেশ তাদের জন্য

নিষিদ্ধ ছিল। অধ্যাপক মোহাম্মদ হাবীব বলেন, "ব্রাহ্মণেরা ইচ্ছা করে সাধারণ জনগণকে অজ্ঞ রাখতেন। দুর্নীতিপরায়ণ ব্রাহ্মণেরা জনসাধারণের দুর্বলতা ও ভীতির সুযোগ নিয়ে কেবল জীবিকা নির্বাহই করতেন না, নিজেদের আধিপত্যও প্রতিষ্ঠা করতেন।"[২] ড. দীনেশ চন্দ্র সেনও ব্রাহ্মণদের অত্যাচারী ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন।

শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থা (Educational and Cultural Conditions)

প্রাচীন ভারতে গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাসহ বিজ্ঞান, দর্শন ও বিভিন্ন মানবিক শাখা জ্ঞানের উচ্চ শিখরে পৌছে। ভারতীয়রাই গণিতের শূন্য ও দশমিক চিহ্নের প্রচলন করে। বৌদ্ধ ও হিন্দু শাসনাধীনে দেশের সর্বত্র শিক্ষার বিস্তার ঘটে। মঠ, টোল, পাঠশালা, কলেজ এমনকি কোথাও কোথাও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পশ্চিম ভারতের বল্লভী এবং বিহারের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও উদন্তীপুর, বিক্রমশীলা এবং বারানসীতে উচ্চশিক্ষার সুব্যবস্থা ছিল।

জেনে রাখো

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচীন ভারতের মগধ রাজ্যে অবস্থিত। এর অবস্থান বিহারের রাজধানী পাটনার ৯৫ কি. মি. দক্ষিণ-পূর্বে বিহার শরিফের কাছে। খ্রিষ্টীয় ৫ম শতকে নালন্দা বৌদ্ধ মহাবিহার নির্মাণ করা হয়েছিল। খ্রিষ্টীয় ৭ম শতাব্দী থেকে ১২শ শতাব্দী পর্যন্ত এটি ছিল ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ উচ্চশিক্ষাকেন্দ্র। সম্ভবত ১২০০ খ্রিষ্টাব্দে বখতিয়ার খলজির নেতৃত্বে মামলুক (দাস) বাহিনী নালন্দা বিহার ধ্বংস করেছিল। ১৯১৫ সালে খননকাজ চালিয়ে এ বিহার আবিষ্কার করা হয়। ৮০০ বছর পর ২০১৪ সালের ১ সেপ্টেম্বর আবার নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় চালু করা হয়। বর্তমানে এটি ইউনেস্কোর তালিকায় বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী একটি স্থান।

বর্তমান পাকিস্তানে অবস্থিত তক্ষশীলায় বিশ্বের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটি প্রতিষ্ঠিত হয়, যেখানে বিদেশ থেকেও শিক্ষার্থীরা আসত। মালব ও আজমিরে সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়েছিল। এসব প্রতিষ্ঠানে ধর্মশাস্ত্র ও বেদান্ত ছাড়াও দর্শন, বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। এছাড়া প্রাক-মুসলিম ভারতবর্ষে হিন্দু কাব্য, নাটক, উপন্যাস ও গদ্য সাহিত্য বিকাশ লাভ করে। কবি-সাহিত্যিক হিসেবে ভগবতি, বাহমান, জয়দেব, রাজশেখর, শ্রীহর্ষ, কালিদাস প্রমুখ বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত ও নাগার্জুন জ্যোতির্বিদ্যা, গণিতশাস্ত্র ও চিকিৎসাবিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। স্থাপত্য ও ভাস্কর্যশিল্পেও ভারতীয়দের নৈপুণ্য ছিল বিস্ময়কর। কৈলাশ মন্দির, ভুবনেশ্বর ও কোনারকের মন্দির ছাড়াও ইলোরা, অজন্তা, খাজুরাহ, গান্ধার ও সাঁচির চিত্র ও স্থাপত্যকীর্তি ভারতীয়দের উচ্চমানের শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় বহন করে। এ সময় সংগীতবিদ্যায়ও ভারতীয়রা কৃতিত্বের পরিচয় দেয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. প্রাচীন হিন্দু সমাজ কয়টি বর্ণে বিভক্ত ছিল?
২. ক্ষত্রিয়দের পেশা কী ছিল? */সকল বোর্ড ২০১৫/*
৩. প্রাচীন ভারতীয় সমাজে অপবিত্র ও অস্পৃশ্য বলে বিবেচিত হতো কারা?
৪. মুসলিম বিজয়ের আগে ভারতের প্রধান ধর্ম কী ছিল?
৫. শূন্য ও দশমিক চিহ্নের প্রচলন করে কারা?
৬. নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় কোন শতকে? */বেরোবি, রংপুর ২০১১-১২/*

উত্তরের জন্য ৪৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

আরবদের সিন্ধু বিজয়ের আগে ভারতবর্ষের সামাজিক অবস্থার নেতিবাচক দিক এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থার ইতিবাচক দিকগুলো ছক আকারে লেখো।

---

[২] Ref. Prof. Mohammad Habib, *Sultan Mahamud of Ghazni*

পাঠ ৪

ভারতবর্ষে আরবদের প্রাথমিক সামরিক অভিযানসমূহ
Early Arab Expeditions to India

সত্য ও ন্যায়ের ধর্ম হিসেবে আরবভূমিতে ইসলামের আবির্ভাবের পর মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর অনুসারী ও উত্তরাধিকারী মুসলমানরা নতুন ধর্ম চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ধর্ম ও রাজ্য বিস্তার এবং বাণিজ্য বিকাশে বিশেষ তৎপর হয়ে ওঠে। হযরত মুহাম্মদ (স) ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মদিনায় ইসলামি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর মাত্র এক শতাব্দীর মধ্যে মুসলমানরা পশ্চিম এশিয়া, আফ্রিকা, স্পেন, মধ্য এশিয়া এমনকি ভারত উপমহাদেশের পশ্চিমাঞ্চল পর্যন্ত দখল করে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন এবং ইসলামি রাষ্ট্র গড়ে তোলেন। মূলত সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে আরব মুসলমানরা বিজয় অভিযানে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

ইসলামের আবির্ভাবের অনেক আগ থেকেই বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে আরব বণিকেরা ভারতের উপকূলীয় বন্দর বিশেষ করে পশ্চিম উপকূলীয় বন্দরসমূহে যাতায়াত করত। ভারতবর্ষের মালাবারে সর্বপ্রথম আরব ব্যবসায়ীদের আগমন ঘটে। ভারত উপমহাদেশের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলে সাগরতীরের হিন্দু রাজাদের সহনশীল নীতির ফলে তারা উপকূলীয় অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে থাকে। তাদের মাধ্যমে ভারতীয় পণ্যদ্রব্য আরব, মধ্য এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা এমনকি ইউরোপের বাজারেও পৌঁছে যেত। ইসলামের আবির্ভাবের পরও আরব মুসলিম বণিকেরা ভারতের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য অব্যাহত রাখে। আরব বণিকেদের যাপিত জীবন এবং তাদের সাথে আগত সুফি-দরবেশদের প্রচেষ্টায় ভারতের উপকূলবর্তী অঞ্চলসমূহ ইসলাম ধর্মের সাথে পরিচিত হয়। জাতিভেদ প্রথার নির্মম জাঁতাকলে নিষ্পেষিত এবং আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় নিপীড়নে অতিষ্ঠ হিন্দুরা ইসলামের সাম্য ও শান্তির বাণীতে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। কোনো কোনো সূত্র মতে, কালিকটের হিন্দু রাজা জামোরিনের পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহে সেখানকার নিম্নশ্রেণির বিশেষ করে মৎস্যজীবী ধীবর সম্প্রদায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এখানকার নবদীক্ষিত মুসলমানদের মাধ্যমে মালাবার ও করমণ্ডল উপকূলে ইসলামের সুমহান বাণী প্রচারিত হয়। আরব বণিকদের সংস্পর্শে এসে মালাবারের হিন্দু রাজা চেরামন পেরুমলও ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নেন বলে ভারতীয় মুসলিম ঐতিহাসিক আবুল কাশিম ফিরিস্তা উল্লেখ করেন।

ঐশ্বর্যপূর্ণ ভারতবর্ষের প্রতি বিশেষ আকর্ষণের কারণে মুসলিম বিশ্বের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা)-এর সময় (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.) মুসলমানরা প্রথম ভারত জয়ের চেষ্টা করে। কিন্তু ৬৩৬-৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে পরিচালিত এ অভিযান সফল হয়নি। ইসলামের তৃতীয় খলিফা উসমান (রা)-এর সময় ৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দে আব্দুল্লাহ বিন উমরের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানও ব্যর্থ হয়। চতুর্থ খলিফা আলি (রা)-এর সময় ৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দে এবং উমাইয়া খলিফা মুয়াবিয়ার সময় ৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দে পরিচালিত অভিযানসমূহও সফলতা লাভ করেনি। পরবর্তী কয়েক বছর ভারত অভিযানে মুসলিম বাহিনী আর উৎসাহ দেখায়নি। সম্ভবত দূরাভিযানের বিপদ এবং নানা প্রতিকূলতার জন্য ভারতে অভিযান পরিচালনা সম্ভব হয়নি।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ইসলামের আবির্ভাবের আগে ভারতীয়দের সাথে আরবের কাদের যোগাযোগ ছিল? *[সকল বোর্ড ২০১৭]*
২. ভারতবর্ষের কোথায় সর্বপ্রথম আরব ব্যবসায়ীদের আগমন ঘটে?
৩. কোন রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় কালিকটের মৎস্যজীবী ধীবর সম্প্রদায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে?
৪. কোন খলিফার সময় মুসলমানরা প্রথম ভারত জয়ের চেষ্টা করে?
৫. কোন শতাব্দীর শুরুতে ভারতবর্ষে আরবদের বিজয় অভিযান পরিচালিত হয়?
৬. কোন অঞ্চল বিজয়ের মধ্য দিয়ে ভারতে মুসলমানদের সামরিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়?

উত্তরের জন্য ৪৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

ভারতবর্ষে আরবদের প্রাথমিক অভিযান পরিচালনার পাঁচটি কারণ চিহ্নিত করে ছকে উপস্থাপন করো।

পাঠ ৫

মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু ও মুলতান অভিযানের কারণ
Causes of the Expeditions to Sindh & Multan by Muhammad bin Quasim

উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিকের (৭০৫-৭১৫ খ্রি.) খিলাফত লাভের পর মুসলিম সাম্রাজ্যে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। ওয়ালিদের বিখ্যাত সেনাপতি মুসা বিন নুসায়ের সমগ্র উত্তর আফ্রিকা এবং তারিক বিন জিয়াদ স্পেন জয় করেন। সেনাপতি কুতায়বা বিন মুসলিমের প্রচেষ্টায় মধ্য এশিয়ায় ইসলামের বিজয় পতাকা উত্তোলিত হয়। প্রায় একই সময় পূর্বাঞ্চলীয় শাসনকর্তা হাজ্জাজ বিন ইউসুফের উৎসাহ ও প্রেরণায় সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে আরবরা ভারতে সিন্ধু অভিযান প্রেরণ করে।[৩]

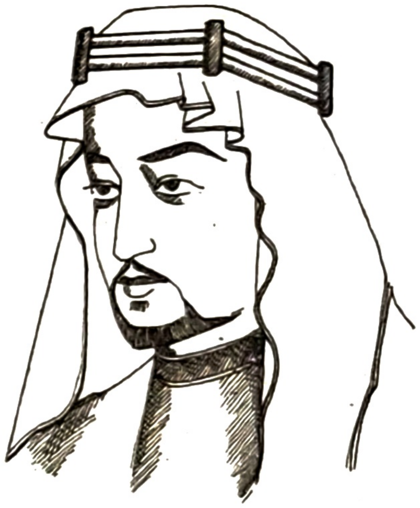
মুহাম্মদ বিন কাসিম

সিন্ধুর অবস্থান ও পরিচিতি
(The Location and Introduction of Sindh)

আরবদের সিন্ধু বিজয় সম্পর্কিত ঐতিহাসিক গ্রন্থ *'চাচনামা'*এর তথ্যানুসারে সপ্তম শতাব্দীতে সিন্ধু ছিল ভারতের অন্যতম এক শক্তিশালী ও ক্ষমতাধর রাজ্য। এ রাজ্যটি পূর্বে কাশ্মির, পশ্চিমে মাকরান, দক্ষিণে সমুদ্রোপকূল এবং উত্তরে কিকানন্ পর্বত দিয়ে পরিবেষ্টিত ছিল। সিন্ধু রাজ্যের রাজধানী ছিল আলোর এবং দেবল ছিল এ রাজ্যের প্রধান বন্দর। রাজা রায় সহসির পুত্র সহিরসের সময় এ রাজ্যের সমৃদ্ধি সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে। তখন রাজ্যটি ব্রাহ্মণাবাদ, সিস্তান, ইস্কান্দা ও মুলতান এ চারটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। রাজা সহিরস পারস্য রাজের সাথে যুদ্ধে নিহত হলে তার পুত্র দ্বিতীয় রায় সহসি সিন্ধুর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তার মৃত্যুর পর চাচ নামে জনৈক প্রভাবশালী ব্রাহ্মণ মন্ত্রী সিংহাসন দখল করেন। তার মৃত্যুর পর সিংহাসন নিয়ে উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বে পুত্র দাহির জয়লাভ করে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। এ দাহিরই ছিলেন মুসলিম অভিযানের সময় সিন্ধুর রাজা।

সিন্ধু ও মুলতান অভিযানের কারণসমূহ (Causes of the Expeditions to Sindh and Multan)

মুসলিম ইতিহাসে আরবদের সিন্ধু ও মুলতান বিজয় এক যুগান্তকারী ও চমকপ্রদ ঘটনা। অধ্যাপক ড. শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার মুসলমানদের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়কে পরবর্তী যুগের ওপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তারকারী ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনাসমূহের অন্যতম বলে অভিহিত করেছেন।[৪] ঐতিহাসিকেরা আরবদের সিন্ধু ও মুলতান অভিযানের পেছনে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ দু'ধরনের কারণই ক্রিয়াশীল ছিল বলে মনে করেন।

পরোক্ষ কারণ (Indirect Causes)

আরবদের সিন্ধু ও মুলতান অভিযানের পেছনে একাধিক কারণ ছিল। যেমন—

রাজ্য বিস্তার নীতি: আরবদের সিন্ধু ও মুলতান বিজয় ছিল উমাইয়াদের সম্প্রসারণবাদ রাজ্যবিস্তার নীতিরই অংশ। বস্তুত খলিফা আল ওয়ালিদ এবং তার পূর্বাঞ্চলীয় শাসনকর্তা হাজ্জাজ বিন ইউসুফ উভয়েই মনে-প্রাণে সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন। রাজ্যবিস্তারের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা তাদেরকে সিন্ধু আক্রমণে প্ররোচিত করে।

ধন-সম্পদ অর্জন: ধন-সম্পদ ও ঐশ্বর্য-বৈভবে সমৃদ্ধ ভারতবর্ষের সাথে অনেক আগে থেকেই আরবদের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। ইসলামের আবির্ভাবের পরও এ যোগাযোগ অব্যাহত থাকে। ধনৈশ্বর্য লাভ করার জন্য মুসলিম খলিফারা এর আগেও ভারতে বেশকিছু অভিযান পরিচালনা করেন। অষ্টম শতাব্দীর শুরুতে মেকরান এবং বেলুচিস্তান আরবদের হস্তগত হয়। এ বিজয়ের মাধ্যমে তাদের যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জিত হয় তাতে তারা আরও প্রলুব্ধ হয় এবং নিজেদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির প্রত্যাশায় সিন্ধু ও মুলতানে অভিযান পরিচালনা করে।

---

[৩] It was during the time of the Umayyads that the Arabs took up the Indian expeditions seriously:– Dr. Md. Mohar Ali, *A Brief Survey of Muslim Rule in India*, P. 04, Dacca, 1969

[৪] Ref. R.C. Majumdar, *An Advanced History of India*, P.275

ইসলাম প্রচার: উমাইয়া সম্প্রসারণবাদ নীতির ফলে মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমা বেলুচিস্তান ও মেকরান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। সিন্ধুরাজসহ ভারতীয় রাজন্যবর্গের মুসলিমবিরোধী বৈরী মনোভাব ও সামরিক উস্কানি মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমান্ত নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই তারা সিন্ধুতে অভিযান পরিচালনা করে।

ব্যর্থতার প্রতিশোধ: মুসলমানদের পারস্য অভিযানকালে সিন্ধুরাজ সৈন্য দিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে পারসিকদের সহযোগিতা করেছিলেন। সিন্ধুরাজের এ কাজের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মুসলমানরা সিন্ধু ও মুলতান আক্রমণ করে।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কঠোর নীতি: খলিফা ওয়ালিদের পূর্বাঞ্চলীয় শাসনকর্তা হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ছিলেন অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির। তার কঠোর শাসনের প্রতিবাদে বিদ্রোহী হয়ে কিছু আরব সীমান্ত অতিক্রম করে সিন্ধুরাজ দাহিরের কাছে আশ্রয় নেয়। হাজ্জাজ তাদের ফেরত পাঠানোর দাবি জানালে দাহির তা প্রত্যাখ্যান করেন। এতে হাজ্জাজ রাজা দাহিরকে সমুচিত শাস্তিদানের লক্ষ্যে সিন্ধু ও মুলতানে অভিযান পরিচালনা করেন।

ধর্মীয় কারণ: সিন্ধু ও মুলতান অভিযানের পেছনে ধর্মীয় অনুপ্রেরণাও বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল ছিল বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন। প্রাথমিক যুগে বিজেতা আরবদের বিজিত অঞ্চলে ইসলাম প্রচার ও বিস্তারের প্রচেষ্টা বিবেচনা করলে সিন্ধু বিজয়ের পেছনে ধর্মীয় উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করা যায় না।

রাজ্যের সীমান্ত রক্ষা: *'চাচনামা'* গ্রন্থ এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য সূত্র থেকে জানা যায়, মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে দাহির এবং তার ভাই দাহারসিয়ারের মধ্যে রাজ্য ভাগ নিয়ে দ্বন্দ্ব, রাজা দাহিরের কুশাসন এবং রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ফলে রাজ্যটির সার্বিক অবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। প্রতিবেশী কাশ্মিরের সাথে সংঘাতে সিন্ধুর রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। এ প্রেক্ষাপটে সাফল্যের সম্ভাবনায় আরব মুসলমানরা সিন্ধু ও মুলতান অভিযানে উৎসাহী হন।

প্রত্যক্ষ কারণ (Direct Cause)

উপরের কারণগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে সাম্রাজ্যবাদী শাসনকর্তা হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সিন্ধু আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ঠিক সে সময় একটি ঘটনা তাকে সিন্ধুরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সুযোগ এনে দেয়। আর এ ঘটনাটি হলো সিন্ধুর দেবল বন্দরে জলদস্যু কর্তৃক মুসলমানদের ৮টি জাহাজ লুট। জানা যায়, সিংহলের (বর্তমান শ্রীলঙ্কা) রাজা আটটি উপঢৌকনপূর্ণ জাহাজ খলিফা ওয়ালিদ ও হাজ্জাজের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, সিংহলে বাণিজ্যরত নিহত আরব বণিকদের পরিবার-পরিজনও সে জাহাজগুলোতে ছিল। যাত্রাপথে জাহাজগুলো সিন্ধুর দেবল বন্দরে উপস্থিত হলে সেগুলো জলদস্যুরা লুট করে। হাজ্জাজ রাজা দাহিরের কাছে এর প্রতিকার ও ক্ষতিপূরণ দাবি করলে দাহির সে দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। দাহিরের উদ্ধত আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সিন্ধু ও মুলতান অভিযানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আরবদের সিন্ধু অভিযানের সময় উমাইয়া খলিফা কে ছিলেন?
২. মুসলমানদের অভিযানের সময় সিন্ধু ও মুলতানের শাসনকর্তা কে ছিলেন? *[ঢা., রা., চ. বো. ২০১৭]*
৩. কোন মুসলিম সেনাপতি সর্বপ্রথম সিন্ধু বিজয় করেন? *[সকল বোর্ড ২০২১]*
৪. মুহাম্মদ বিন কাসিমকে সিন্ধু অভিযানের নির্দেশ দেন কে?
৫. মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে সিন্ধুর রাজধানী কোথায় ছিল? *[ঢা. বো., রা. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫]*
৬. আরব জাহাজ লুট হয়েছিল কোথায়?

উত্তরের জন্য ৪৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

আরবদের সিন্ধু অভিযানের জন্য কোন কারণগুলোকে তুমি যৌক্তিক বলে মনে কর? এগুলোর একটি তালিকা তৈরি করো।

পাঠ ৬

মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু ও মুলতান অভিযানের ঘটনাবলি এবং সাফল্যের কারণ (Events of the Expeditions to Sindh and Multan of Muhammad bin Quasim and Causes of the Success)

মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু ও মুলতান অভিযানের ঘটনাবলি (Events of the Expeditions to Sindh and Multan of Muhammad bin Quasim)

খলিফা ওয়ালিদের অনুমতি নিয়ে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ৭১০ খ্রিষ্টাব্দে ওবায়দুল্লাহ ও বুদায়েল নামে দুজন সেনাপতির নেতৃত্বে সিন্ধুরাজের বিরুদ্ধে পরপর দুটি অভিযান প্রেরণ করেন। কিন্তু তার দুটি অভিযানই ব্যর্থ হয়। কিন্তু দুবার ব্যর্থতায় হতোদ্যম না হয়ে হাজ্জাজ ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে তার জামাতা সতেরো বছর বয়সী তরুণ সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে পুনরায় অভিযান প্রেরণ করেন। আরবীয় সাহসী বীর সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিম ৬,০০০ সিরীয় ও ইরাকি সৈন্য, ৬০০০ উষ্ট্রারোহী এবং ৩,০০০ রসদবাহী উট নিয়ে ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে সিন্ধুর দিকে যাত্রা করে মেকরানে উপস্থিত হন। মেকরানের শাসনকর্তা হারুন মুহাম্মদ বিন কাসিমকে আরও সৈন্য দিয়ে অভিযানে সাহায্য করেন। সমন্বিত সামরিক বাহিনী নিয়ে মুহাম্মদ বিন কাসিম ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে সিন্ধুর দেবল বন্দর আক্রমণ করেন। এ সময় রাজা দাহিরের নির্যাতনে অতিষ্ঠ স্থানীয় জাঠ ও মেঠদের অনেকেই আরব বাহিনীতে যোগ দিয়ে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করেন। মুসলিম বাহিনী 'আল আক্‌স' বা 'বধূ' (Manjanik) নামে একটি (দুর্গ ধ্বংস করার বিশেষ যন্ত্র) অস্ত্রের সাহায্যে প্রস্তর নিক্ষেপ করে দেবল দুর্গটি ধ্বংস করে এটি হস্তগত করেন। দেবল অধিকারের পর মুসলিম বাহিনী প্রায় বিনা বাধায় নিরুন, সিওয়ান এবং সিসাম জয় করে। আরব বাহিনীর ক্রমাগত বিজয়ে রাজা দাহির বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি ৫০,০০০ সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে মুসলিম বাহিনীকে প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে রাওয়ারে উপস্থিত হন। ৭১২ খ্রিষ্টাব্দের ২০ জুন মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী ও দাহিরের বাহিনীর চূড়ান্ত শক্তি পরীক্ষা হয়। যুদ্ধে রাজা দাহির পরাজিত ও নিহত হন। মুসলিম বাহিনীর হাতে রাওয়ার দুর্গের পতন ঘটলে দাহিরের স্ত্রী রানি বাঈ প্রাসাদের অন্য নারীদের নিয়ে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে 'জওহর ব্রত' পালন করেন। রাজা দাহিরের অন্য এক স্ত্রী রানি লাদি এবং মেয়ে সূর্যদেবী ও পরিমল দেবী মুহাম্মদ বিন কাসিমের হাতে বন্দি হন। এভাবে ব্রাহ্মণাবাদ ও সিন্ধুর রাজধানী আলোর আরবদের অধিকারে আসে।

সিন্ধুর রাজধানী আলোর দখলের পর সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধু শক্তির শেষ উৎস মুলতান নগরী অবরোধ করেন। তীব্র প্রতিরোধ মোকাবিলা করে ৭১৩ খ্রিষ্টাব্দে মুসলিম বাহিনী মুলতান জয় করে। ভি. ডি. মহাজন বলেন, "মুলতান থেকে আরব বাহিনী এত বেশি স্বর্ণ করায়ত্ত করেছিল যে তারা একে স্বর্ণ শহর হিসেবে আখ্যায়িত করে।"[৫] মুলতান বিজয়ের পর মুহাম্মদ বিন কাসিম কনৌজ জয়ের পরিকল্পনা নেন। কিন্তু অভিযান সম্পন্নের আগে খলিফা সুলায়মান তাকে রাজধানী দামেস্কে (বর্তমান সিরিয়ায় অবস্থিত) প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেন। তাই তার পক্ষে আর অভিযান পরিচালনা সম্ভব হয়নি।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের মৃত্যু (Death of Muhammad bin Quasim)

ঐতিহাসিক ঈশ্বরী প্রসাদের ভাষায়, "তার পতন উত্থানের মতোই আকস্মিক।" *চাচনামা'* গ্রন্থের বিবরণ মতে, মুহাম্মদ বিন কাসিম রাজা দাহিরের দুই মেয়ে সূর্যদেবী ও পরিমল দেবীকে বন্দি করে দামেস্কের খলিফা সুলায়মানের কাছে প্রেরণ করেন। তারা খলিফার কাছে অভিযোগ করেন যে, দামেস্কে প্রেরণের আগে মুহাম্মদ বিন কাসিম তাদের শ্লীলতাহানি করেছেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে খলিফা মুহাম্মদ বিন কাসিমকে লবণমিশ্রিত গরুর চমড়ার থলিতে পুরে রাজধানীতে পাঠানোর নির্দেশ দেন। ঐতিহাসিক গ্রন্থ *তারিখ-ই-মাসুমি'*-এর বর্ণনা মতে, চামড়ার থলিতে আবদ্ধ অবস্থায় তিন দিন পরে তার মৃত্যু ঘটে। মৃতদেহ খলিফার দরবারে উপস্থাপন করা হলে অভিযোগকারী রাজকুমারীরা খলিফাকে বলেন যে, মুহাম্মদ বিন কাসিমের বিরুদ্ধে তাদের করা অভিযোগ মিথ্যা। কেবল পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই তারা এরূপ অভিযোগ করেছেন। এতে খলিফা অনুতপ্ত হন এবং মিথ্যা অভিযোগের অপরাধে রাজকুমারীদেরকে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত ঘোড়ার লেজের সাথে বেঁধে টানার নির্দেশ দেন। প্রকৃতপক্ষে মুহাম্মদ বিন কাসিমের মৃত্যু সম্পর্কে উপরে বর্ণিত ঘটনাটির কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। ঐতিহাসিক বালাজুরি তার *'ফতুহুল বুলদান'* এবং ইবনে খালদুন তার *'আল মুকাদ্দিমা'* গ্রন্থে কাসিমের মৃত্যু সম্পর্কিত উপরে বর্ণিত কাহিনিকে

---

[৫] "The Arabs got so much gold that they named Multan as the 'City of Gold."– V. D. Mahajan , *The Sultanate of Delhi*, P.18

মিথ্যা, অতিরঞ্জিত ও বিভ্রান্তিকর বলে আখ্যায়িত করেছেন। বস্তুত হাজ্জাজ বিন ইউসুফের প্রতি খলিফা সুলায়মানের ব্যক্তিগত আক্রোশের কারণে তার জামাতা মুহাম্মদ বিন কাসিমকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। *'ফুতুহুল বুলদান'*-এ উল্লেখ করা হয়েছে, খলিফার নির্দেশে মুহাম্মদকে রাজধানী দামেস্কে এনে কারারুদ্ধ করে খলিফার আদেশেই তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

আরবদের সাফল্যের কারণ (Causes of the Success of the Arabs)

সিন্ধু ও মুলতান অভিযানে আরবদের সাফল্যের বেশকিছু কারণ ছিল। যেমন—

সিন্ধু ও মুলতানের রাজশক্তির দুর্বলতা: সিন্ধুর রাজশক্তির দুর্বলতা ও মানুষের মধ্যে অনৈক্য আরবদের সহজ বিজয়ের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল। ক্ষমতা দখলকে কেন্দ্র করে বিরোধের কারণে সংকটকালে রাজ্যের সামন্ত নেতারা রাজা দাহিরকে কোনো সহযোগিতা করেননি। প্রাদেশিক শাসকদের কাছ থেকেও তিনি কোনো সাহায্য পাননি।

রাজা দাহিরের দুঃশাসনের প্রতিক্রিয়া: রাজা দাহির ছিলেন স্বৈরাচারী ও প্রজা-নিপীড়ক। তার নিপীড়নে বিক্ষুব্ধ জনতা রাজাকে কোনো সহযোগিতা তো করেইনি, উপরন্তু জাঠ ও মেঠ সম্প্রদায় মুহাম্মদ বিন কাসিমকে স্বাগত জানায় এবং তার সাথে যোগ দিয়ে দাহিরের কুশাসনের অবসান ঘটাতে সাহায্য করে।

সিন্ধু ও মুলতানের ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা: ভৌগোলিক অবস্থানগত দিক থেকে সিন্ধু ভারতের অন্যান্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। আর এ কারণে প্রয়োজনের মুহূর্তে সিন্ধুরাজ ভারতের অন্য রাজাদের কাছ থেকে কোনো সহযোগিতা পাননি।

রাজা দাহিরের সামরিক দুর্বলতা ও অদূরদর্শিতা: রাজা দাহিরের অদূরদর্শিতা ও রণনীতি নির্ধারণে অপরিপক্বতা তার পরাজয় এবং আরব মুসলমানদের বিজয়কে সহজ করেছিল। কারণ মুসলমানদের মেকরান বিজয়ের পরও তিনি সীমান্ত সুরক্ষার কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। তাছাড়া আগে থেকেই মুসলিম বাহিনী প্রায় বিনা বাধায় নিরুন, সিওয়ান ও সিসাম জয় করে। এতে মুসলিম বাহিনীর মনোবল বৃদ্ধি পায় এবং তারা চূড়ান্ত সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়।

আরবদের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব: সিন্ধু ও মুলতান বাহিনীর সামরিক দুর্বলতা ও মুসলিম বাহিনীর উন্নত সামরিক কৌশল আরব মুসলমানদের সাফল্যের অন্যতম কারণ ছিল। এছাড়াও সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা ও নৈতিকতাবোধ, উন্নত অস্ত্রের ব্যবহার আরব বাহিনীর সাফল্যের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। তাছাড়া মুহাম্মদ বিন কাসিমের ব্যক্তিগত সামরিক নৈপুণ্য এবং দক্ষ সৈন্য পরিচালনা সিন্ধুতে আরব বিজয়কে সহজতর করেছিল। অন্যদিকে সিন্ধুর সামরিক বাহিনীর অনুন্নত অস্ত্রশস্ত্র, ত্রুটিপূর্ণ যুদ্ধ কৌশল ইত্যাদি আরব বিজয়কে সহজ করেছিল।

দেশজয়ের নেশা ও ধর্ম প্রচার: দেশজয়ের নেশা এবং ধর্ম প্রচারের প্রেরণা মুসলিম বাহিনীকে সিন্ধু বিজয়ে অতিরিক্ত শক্তি জুগিয়েছিল বলে ভি. ডি. মহাজন মনে করেন।[৬]

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মুহাম্মদ বিন কাসিম কত খ্রিষ্টাব্দে সিন্ধু জয় করেন? *[ঢা: বো., রা. বো., কু. বো., চ. বো.; সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫; সকল বোর্ড ২০২১; ২০১৬]*
২. মুসলিম বাহিনী কোন অস্ত্রের সাহায্যে দেবল দুর্গ ধ্বংস করে?
৩. অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে 'জওহরব্রত' পালন করেন কে?
৪. স্বর্ণশহর বলা হয় কোনটিকে?
৫. মুহাম্মদ বিন কাসিম কত খ্রিষ্টাব্দে মুলতান জয় করেন?
৬. কোন সম্প্রদায় সিন্ধু অভিযানে মুহাম্মদ বিন কাসিমকে সমর্থন দিয়েছিল?

উত্তরের জন্য ৪৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

সিন্ধু ও মুলতান অভিযানে আরবদের সফলতার কারণগুলো চিহ্নিত করে ছক আকারে লেখো।

---

[৬] "The Spirit of adventure and fanaticism also helped the Arabs to win. They were inspired to fight harder as they felt that they were fighting for the cause of Islam."–V.D. Mahajan, *The Sultanate of Delhi*. P.25

পাঠ ৭ ও ৮

আরবদের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ের ফলাফল
Results of the Arab's Conquest of Sindh and Multan

আরবদের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ের ফলাফল ও গুরুত্ব সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক টড (Todd Gray) তার *'Annals and Antiquities of Rajasthan'* গ্রন্থে আরবদের সিন্ধু বিজয়কে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা বলে মন্তব্য করেছেন। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারও একে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[৭] কিন্তু অনেক ঐতিহাসিক এ বক্তব্যের সাথে একমত নন। ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত মুসলিম দার্শনিক স্ট্যানলি লেনপুল (Stanley Lanepoole) বলেন, "আরবরা সিন্ধু জয় করেছিল। কিন্তু ভারতবর্ষ ও ইসলামের ইতিহাসে এ বিজয় ছিল একটি উপাখ্যান মাত্র, একটি নিষ্ফল বিজয়।"[৮] রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ বিবেচনায় মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয় সম্পর্কে লেনপুলের মন্তব্যের কিছুটা যথার্থতা থাকলেও এর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ফলাফলের ক্ষেত্রে তার মন্তব্য প্রযোজ্য নয়। সার্বিকভাবে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের ফলাফল ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

রাজনৈতিক ফলাফল: সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ের রাজনৈতিক ফলাফল বিবেচনা করলে স্ট্যানলি লেনপুলের উল্লিখিত বক্তব্য সত্য বলে মনে হয়। ঈশ্বরী প্রসাদও এ সত্য স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, "এ সত্য স্বীকার করতে হবে যে, রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আরবদের সিন্ধু বিজয় ইসলামের ইতিহাসে একটি তাৎপর্যহীন ঘটনা।"[৯] এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয় ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিশেষ কোনো পরিবর্তন সাধন করতে পারেনি। আরব আধিপত্য কেবল সিন্ধু ও মুলতানের মধ্যেই সীমাবন্ধ ছিল। উত্তর ভারতের অপরাপর অঞ্চল ও সম্পূর্ণ দক্ষিণ ভারত আরব প্রভাবের আওতার বাইরে ছিল। এসব অঞ্চলে মুসলিম বিজয়ের প্রত্যক্ষ কোনো প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। বস্তুত– ১. মুহাম্মদ বিন কাসিমের আকস্মিক অকাল মৃত্যু, ২. খলিফাদের বৈদেশিক নীতির পরিবর্তন, ৩. মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট এবং ৪. উত্তর ভারতে শক্তিশালী রাজপুত ও গুর্জর-প্রতিহারদের প্রতিরোধ ইত্যাদি কারণে ভারতবর্ষে মুসলিম অভিযানে আর অগ্রগতি হয়নি। সম্ভবত এজন্য ঐতিহাসিক এ. বি. এম. হবিবুল্লাহও সিন্ধু বিজয়কে রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যহীন বলেছেন। তার ভাষায়, "আরবরা ভারতে ইসলামকে রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত করার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেননি। এর সাংস্কৃতিক প্রভাব যাই থাকুক না কেন, রাজনৈতিক দিক দিয়ে সিন্ধুর ঘটনা একটি নেতিবাচক প্রয়াস মাত্র।"[১০] তা সত্ত্বেও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সিন্ধু বিজয়কে ভারতের ইতিহাসে 'উপাখ্যান' বলাটা একেবারে সংগত বলে মনে হয় না। কেননা, সিন্ধু ও মুলতান বিজয় তাৎক্ষণিকভাবে ভারতের বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে প্রভাব বিস্তার করতে না পারলেও আরব বিজয়ের পথ অনুসরণ করেই গজনভি ও ঘুরিরা ভারতে মুসলিম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল।

ধর্মীয় ফলাফল: ভারতীয় ইতিহাসবিদ এ. এল. শ্রীবাস্তব (Ashirbadi Lal Srivastava) তার *'The Sultanate of Delhi'* গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, "সিন্ধু বিজয়ের সূত্র ধরে ভারতবর্ষে ইসলামের বীজ রোপিত হয়েছিল।"

ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ ও ঐতিহাসিক টমাস আরনল্ড (Thomas Arnold) বলেন, "ধর্ম প্রচারক ও বণিকদের নীরব প্রচ্ছন্ন প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষে ইসলামের প্রসার ঘটে।" বহুকাল আগে থেকেই ভারতবর্ষে আরব বণিক ও ধর্ম প্রচারকদের আগমন ঘটে। সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ের পর ভারতবর্ষে অনেক সুফি-দরবেশের আগমন ঘটে। তাদের প্রচারিত ইসলামের শাশ্বত বাণী সাম্য, মৈত্রী, সহিষ্ণুতা, উদারতা বর্ণপ্রথার কঠিন নিগড়ে নির্যাতিত হিন্দু সম্প্রদায়কে আকৃষ্ট করে। ফলে তারা বিপুল সংখ্যায় ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়।

---

[৭] "The Muhammadan Conquest of India is one of those epoch making events-which have left a permanent impress on subsequent ages." Md. Mohar Ali, *A Brief Survey of Muslim Rule in India*. P.2

[৮] "The Arabs conquest of Sindh but the conquest was only as episoder in the history of India and of Islam." Stanley Lanepoole, *Mediaeval India*, p.1

[৯] "It may be conceded at once that the Arab conquest of Sindh from the political point of view was an insignificant event in the history of Islam. – Ishwari Prasad, *A Short History of Muslim Rule in India*, p.37

[১০] "The Arabs were not destined to raise Islam to be a political force in India. Whatever its cultural implications, politically the Sindh affaired to a dead end." –A B M Habibullah, *The Foundation of Muslim Rule in India*, P. 2.

অর্থনৈতিক ফলাফল: ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় সিন্ধু ও মুলতান ছিল অপেক্ষাকৃত অনুর্বর। এখান থেকে সরাসরি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব ছিল না সত্য, তবে এ বিজয়ের ফলে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের সাথে তাদের বাণিজ্যিক লেনদেনের পরিধি আরও বৃদ্ধি পায়। দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় উপকূলে আরবদের সামুদ্রিক বাণিজ্য সুদূরপ্রসারী হয়, যা তাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে ভূমিকা রাখে।

সামাজিক ফলাফল: আরবদের সিন্ধু বিজয়ের ফলে মুসলমানরা হিন্দুদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে এবং দু'সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আরব মুসলমানদের অনেকে বিজিত অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে এবং স্থানীয় নারীদের বিয়ে করে। আরব বসতি ও আন্তঃবিবাহের ফলে আরবদের মধ্যে সিন্ধুর লোকাচার ও সামাজিক রীতিনীতি প্রবেশ করে। অন্যদিকে সিন্ধুবাসীর জীবনেও অনেক আরবীয় বৈশিষ্ট্যের প্রভাব পড়ে। আর্য ও সেমিটিক জাতির সংমিশ্রণে এক নতুন জাতির উদ্ভব ঘটে। আর এ জাতিই প্রকৃতপক্ষে ইন্দো-সারাসেনীয় সভ্যতা ও কৃষ্টির ধারক ও বাহক হিসেবে ইতিহাসে খ্যাতি অর্জন করে।

সাংস্কৃতিক ফলাফল: আরবদের সিন্ধু বিজয়ের সাংস্কৃতিক ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, "মুসলিম সংস্কৃতির ওপর এ বিজয়ের ফলাফল ছিল গভীর ও সুদূরপ্রসারী।"[১১] এ. বি. এম. হবিবুল্লাহও সিন্ধু বিজয়ের সাংস্কৃতিক গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে ব্রিটিশ ঐতিহাসিক হ্যাভেল বলেন, "রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আরবদের সিন্ধু বিজয় তুলনামূলকভাবে তাৎপর্যহীন ঘটনা ছিল। কিন্তু সামগ্রিক ইসলামি সংস্কৃতির ওপর প্রভাব বিবেচনায় এ বিজয়ের গুরুত্ব অপরিসীম।"[১২] প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষ ছিল উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির লীলাভূমি। দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, চিকিৎসাবিদ্যা, সংগীত, স্থাপত্য ও চিত্রশিল্পে ভারতীয়দের বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। ভারতীয় বেদান্ত দর্শন মুসলিম দর্শনের অন্যতম উৎস হিসেবে ভূমিকা পালন করে। বেদ ও বৌদ্ধধর্মের নির্বাণ মুসলিম সুফি মতাদর্শকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। ভারতীয় পণ্ডিত ব্রহ্মগুপ্ত রচিত গ্রন্থ 'সিন্ধান্ত'-এর প্রভাবে ইসলামে জ্যোতির্বিদ্যার ওপর বৈজ্ঞানিক গবেষণা শুরু হয়। গণিতবেত্তা আল ফারাবি সংস্কৃত ভাষার এ গ্রন্থটি আরবিতে অনুবাদ করেন এবং এর নামকরণ হয় 'সিন্দ-হিন্দ'।

আব্বাসি শাসনামলে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বহু ভারতীয় গ্রন্থ আরবিতে অনূদিত হয়। খলিফা মামুনের আমন্ত্রণে মানকা ও দুবান নামের দু'জন ভারতীয় পণ্ডিত বাগদাদে এসে অনুবাদ কাজে অংশ নেন। এ সময় যেসব ভারতীয় সংস্কৃত গ্রন্থ আরবিতে অনূদিত হয় সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ব্রহ্মগুপ্তের 'সিন্ধান্ত' ও 'খণ্ড খাদ্যক', চিকিৎসা বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ 'চরক' ও শুশ্রুত' এবং ভারতীয় পণ্ডিত বিদপাই রচিত একটি গ্রন্থ। বিদপাই রচিত গ্রন্থটি আরবিতে অনুবাদ করেন ইবনে আল মুকাফ্ফা এবং এর নামকরণ হয় 'কালিলা ওয়া দিমনা'। গ্রন্থটি আরবি সাহিত্য ও চিত্রশিল্পে দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাছাড়া মুসলমানরা ভারতীয় ভেষজ শাস্ত্রের সাথেও পরিচিত হয়ে ওঠে। গণিতশাস্ত্রেও মুসলমানরা ভারতীয়দের কাছে ঋণী। আরবরা ভারতীয়দের কাছ থেকেই 'শূন্যের' ব্যবহার শেখে। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্য বহু মুসলিম পণ্ডিত ভারতে এসেছিলেন। বারানসী ছিল ভারতের হিন্দু সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল। জ্যোতির্বিদ আবু মাশার বারানসীতে এসে দশ বছর জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা করেন। ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে 'কিতাবুল হিন্দ'-এর রচয়িতা প্রখ্যাত মনীষী আল বিরুনি ভারতে এসে লাহোরে বহু বছর জ্ঞান সাধনা করেন।

জেনে রাখো

আবু রায়হান আল বিরুনি ছিলেন মধ্যযুগের বিখ্যাত মুসলিম শিক্ষাবিদ ও গবেষক। তিনি ৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে মধ্য এশিয়ার খাওয়ারিজমে (আফগানিস্তানে অবস্থিত) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। দর্শন, ভূগোল, ইতিহাস, জ্যোতিষশাস্ত্রে তিনি বিশেষ বুৎপত্তি অর্জন করেন। তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'কিতাবুল হিন্দ'। আল বিরুনি সুলতান মাহমুদের দরবারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী ছিলেন। তিনি ১০৪৮ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

আরবরা ভারতীয় হিন্দুদের কাছ থেকেই প্রথম দাবা খেলা শেখে। তাছাড়া আরবীয় সংগীত, চারু ও কারুশিল্পেও ভারতীয় প্রভাব লক্ষণীয়। ভারতীয় হিন্দু স্থাপত্যরীতি মুসলিম স্থাপত্যশিল্পের বিকাশে বিশেষভাবে ভূমিকা রেখেছিল। ঐতিহাসিক হ্যাভেল

---

[১১] "The effects of this conquest upon Muslim culture profound and far-reaching." –Ishwari Prasad, *A Short History of Muslim Rule in India, p-39.*

[১২] "From a political point of view, Arab conquest of Sindh was a comperatively insignificant event but its importance on account of its effects upon the whole culture of Islam was great." – Havell, *Aryan Rule in India, P-248*

যথার্থই বলেছেন, "ইসলামের শৈশবকালে গ্রিসের কাছ থেকে নয়, বরং ভারতবর্ষ থেকে দর্শন, সাহিত্য, চিত্রকলা ও স্থাপত্যের নানা বিষয়ে আরবরা শিক্ষা লাভ করেছে।" উল্লেখ্য যে, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির যেসব উপাদান আরবীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল, সেগুলো পরবর্তীকালে আরবদের মাধ্যমে ইউরোপে বিস্তার লাভ করে।

আরব মুসলমানরা কেবল ভারতীয়দের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন তা নয়, বরং ভারতীয়রাও আরবদের ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান ও সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। সিন্ধু বিজয়ের আগেই আরব মুসলমানরা গ্রিক, মিসরীয়, মেসোপটেমীয় এবং পারসিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হয়েছিল। আরবরা এসব সংস্কৃতির উপাদানগুলোর সমন্বয় সাধন করে ভারতীয়দের কাছে নিয়ে আসে। মুসলমানদের মাধ্যমে ভারতীয়দের সামনেও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের এক সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয়। হিন্দু-মুসলমানদের পারস্পরিক ভাববিনিময় ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে নতুন সংস্কৃতির উত্থান ঘটে। মুসলমানদের সাম্য, মৈত্রী, ন্যায়নীতি ও উদারতার প্রভাবে ভারতীয় সমাজে বর্ণবাদের কঠোরতা এবং অস্পৃশ্যতা হ্রাস পায়। ধর্মীয় সহিষ্ণুতার নীতি গ্রহণ এবং একেশ্বরবাদের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে মুসলমানরা হিন্দু সমাজে ধর্মীয় চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। এর ফলে ভারতে ভক্তি আন্দোলন এবং পরবর্তী সময়ে ব্রাহ্মসমাজ গড়ে ওঠে।

জেনে রাখো

বাংলায় হিন্দু ধর্মের পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মসমাজ পুরোধা হিসেবে কাজ করেছে। ১৮২৮ সালে সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসভা (পরবর্তী সময়ে ব্রাহ্মসমাজ নামে পরিচিতি লাভ করে) গঠন করেন। ব্রাহ্ম সমাজের সদস্যরা একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাদের উপাস্য ছিল 'নিরাকার ব্রহ্ম'। এ থেকেই তারা তাদের ধর্মের নাম দেন ব্রাহ্ম। প্রতিটি ধর্মের সর্বজনীন নৈতিক শিক্ষা ও ভালো দিকগুলো নিয়ে রাজা রামমোহন রায় একটি আধুনিক ধর্মীয় সমাজ গড়ার প্রত্যয়ে ব্রাহ্ম সমাজ গড়ে তোলেন। এটি ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারমূলক আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ ও নারী মুক্তি আন্দোলনে এর ভূমিকা ছিল জোরালো।

সিন্ধু বিজয়ের উল্লিখিত ফলাফল পর্যালোচনা করে অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদারের সাথে একমত হয়ে বলা যায়, 'মুসলমানদের ভারত বিজয় ইতিহাসের অন্যতম যুগান্তকারী ঘটনা, যা পরবর্তী সময়ের ওপর একটি স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছে। আর্যদের আক্রমণের পর ভারতবর্ষের ইতিহাসে একে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। কেননা এ ঘটনা ভারতবর্ষের ইতিহাসের চেহারাকে এমনভাবে বদলে দিয়েছে যে আজ পর্যন্ত কোনো ঘটনা তা করতে পারেনি।'

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ভারতের কোন অঞ্চলে সর্বপ্রথম মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়? *[সকল বোর্ড ২০২৫]*
২. 'আরবদের সিন্ধু বিজয় একটি নিষ্ফল উপাখ্যান মাত্র'— উক্তিটি কোন ঐতিহাসিকের? *[সকল বোর্ড ২০২১; ২০১৯]*
৩. সিন্ধু বিজয়ে আরবরা কোন ক্ষেত্রে বেশি লাভবান হয়েছে? *[সকল বোর্ড ২০২৫]*
৪. 'সিদ্ধান্ত' গ্রন্থের রচয়িতা কে?
৫. আরবরা কাদের কাছ থেকে 'শূন্যের' ব্যবহার শেখে?
৬. 'কিতাবুল হিন্দ'-এর রচয়িতা কে?

উত্তরের জন্য ৪৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

আরবদের সিন্ধু বিজয়ের দশটি ইতিবাচক ফলাফল চিহ্নিত করে ছক আকারে লেখো।

গ. দলীয় কাজ

'আরবদের সিন্ধু বিজয় নিষ্ফল ছিল' — দুটি দলে বিভক্ত হয়ে বিষয়টির পক্ষে-বিপক্ষে পাঁচটি করে যুক্তি দাও।

পাঠ ৯

সিন্ধুতে পরবর্তী আরব শাসনের ইতিহাস
Subsequent History of Arab Rule in Sindh

সিন্ধু বিজয়ী সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিমের মৃত্যুর পর খলিফা সুলায়মান ইয়াজিদ বিন মুহাল্লাব এবং হাবিবকে যথাক্রমে সিন্ধু ও মুলতানের গভর্নর নিযুক্ত করেন। খলিফা হিশামের (৭২০-৭৪৪ খ্রি.) সময় গভর্নর আল জুনায়েদ মালব ও রাজপুতনায় আরব আধিপত্য সম্প্রসারণ করেন। অবশ্য তার উত্তরাধিকারী প্রদেশপাল তামিনের সময় মুলতানের মধ্যেই আরব অধিকার সংকুচিত হয়ে পড়ে। আব্বাসি খলিফা আল মনসুরের (৭৫৪-৭৭৫ খ্রি.) সময় আরব প্রাধান্য বেলুচিস্তানে সম্প্রসারিত হয়। খলিফা মামুনের সময় পর্যন্ত সেখানে কেন্দ্রীয় শাসন বলবৎ ছিল। তবে এরপর সিন্ধু ও মুলতানের আরব মুসলমানদের মধ্যে আত্মকলহ প্রবল আকার ধারণ করে। কালক্রমে মুলতান ও মানসুরায় দুটি পৃথক স্বাধীন আরব রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। একাদশ শতকের সূচনাপর্বে ১০১০ খ্রিষ্টাব্দে গজনির সুলতান মাহমুদ মুলতান বিজয় করলে সেখানে আরব শাসনের ইতি ঘটে।

সিন্ধু ও মুলতানে আরবদের শাসন ব্যবস্থা (The Administrative System of Arab in Sindh and Multan)
সিন্ধু ও মুলতানে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর ইসলামের সাম্য ও মৈত্রী নীতির আলোকেই সেখানে শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবার ধর্মপালনের অধিকার, জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মুহাম্মদ বিন কাসিম এ অঞ্চলকে কয়েকটি ইকতায় বিভক্ত করেন। সেগুলোকে আবার জেলায় বিন্যস্ত করে তিনি প্রতি জেলায় 'দিওয়ান' পদবিধারী কর্মচারী নিয়োগ করেন। প্রতিটি প্রদেশে নাজির নিয়োগ দেওয়া হয়। দখলি অঞ্চলের রাজস্ব নিশ্চিত করার জন্য জিজিয়া (নিরাপত্তা কর) ও খারাজ (অমুসলিমদের প্রদেয় ভূমিকর) নির্ধারণ করে দিওয়ানকে তা আদায়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়। মুসলমানদের কাছ থেকে আদায় করা যাকাত, গনিমত প্রভৃতি ছিল রাজস্বের উৎস। দুই-পঞ্চমাংশ ও এক-পঞ্চমাংশ ভূমিকর হিসেবে আদায় হতো। দিওয়ানগণ প্রাদেশিক গভর্নর এবং গভর্নরগণ খলিফার কাছে দায়বদ্ধ ছিলেন। সিন্ধু ও মুলতানে বার্ষিক দেড় কোটি দিরহাম রাজস্ব আদায় হতো বলে ভি. ডি মহাজন উল্লেখ করেছেন। এ সময় স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় এবং স্থানীয়দের সাহায্য গ্রহণ করে একটি সর্বজনীন প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলা হয়, যা আরব প্রশাসনে রাজা দাহিরের প্রধানমন্ত্রী এবং ভ্রাতুষ্পুত্রের নিয়োগ লাভের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়। প্রশাসনের সুবিধার্থে এ সময় ইসলামি আইনের আলোকে বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে কাজী-উল-কুজ্জাত বা প্রধান বিচারপতি এবং মুফতি (আইনের ব্যাখ্যা দানকারী) নিয়োগ দেওয়া হয়। তাছাড়া মীর আদল বিচারের রায় ঘোষণা করে কাজীকে নির্ভীক ও নিরপেক্ষভাবে বিচারকার্য সম্পন্ন করতে সহায়তা করতেন। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে হিন্দুদের বিচারকার্য সম্পন্ন হতো। আইনের চোখে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হতো না। অধ্যাপক ড. বেনী প্রসাদ মুহাম্মদ বিন কাসিমের পরমতসহিষ্ণুতা ও সুবিচারের ভিত্তিতে সিন্ধুর শাসনকার্য পরিচালনার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ড. ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, 'তুর্কিদের মতো আরবদের মধ্যে ধর্মীয় গোঁড়ামি ছিল না।' প্রকৃতপক্ষে আরবরা সিন্ধুতে সুষ্ঠু, উদার ও ন্যায়নিষ্ঠ শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে বিশ্বে সুশাসন ও উৎকৃষ্ট প্রশাসনিক কাঠামোর উদাহরণ তৈরি করেছে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মুহাম্মদ বিন কাসিম কত বছর সিন্ধু শাসন করেন?
২. আরব বিজয়ের পর সিন্ধু ও মুলতানে কীসের ভিত্তিতে শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়?
৩. মুহাম্মদ বিন কাসিমের মৃত্যুর পর কাকে সিন্ধুর শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়?
৪. আরব শাসনামলে সিন্ধু ও মুলতানে বার্ষিক কত কোটি দিরহাম রাজস্ব আদায় হতো?
৫. আইনের ব্যাখ্যা দানকারীকে কী বলা হয়?
৬. আরব প্রশাসনে সিন্ধুতে কীসের মাধ্যমে হিন্দুদের বিচারকার্য সম্পন্ন হতো?

উত্তরের জন্য ৪৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

সিন্ধুতে শাসনকার্য পরিচালনায় মুহাম্মদ বিন কাসিম ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছিলেন— বিষয়টি যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করো।

পাঠ ১০

গজনি রাজবংশ ও সুলতান মাহমুদ
Ghazni Dynasty and Sultan Mahmud

ভারতবর্ষে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রায় তিন'শ বছর পর দ্বিতীয় পর্যায়ে মুসলমানদের ভারত অভিযান শুরু হয়। এ পর্যায়ে ভারত অভিযানের প্রধান নায়ক গজনির তুর্কি বীর সুলতান মাহমুদ। তিনি ছিলেন গজনি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সবুক্তগীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র। আব্বাসি রাজবংশের দুর্বলতার সুযোগে যেসব রাজবংশের শাসনের উদ্ভব হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে সামানিদ বংশ অন্যতম। এ বংশের একজন দাস ছিলেন আলপ্তগীন। আলপ্তগীন তার পৃষ্ঠপোষক সামানিদ শাসনকর্তা আবদুল মালিকের মৃত্যুর পর আফগানিস্তানে আসেন এবং গজনিতে ৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেন। তবে তিনি সামানিদদের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করেই শাসনকাজ পরিচালনা করেন। তার মৃত্যুর পর ৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে তার বিশ্বস্ত ক্রীতদাস ও জামাতা সবুক্তগীন গজনির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি নিজ রাজ্যে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। আর তার প্রতিষ্ঠিত রাজবংশটিই ইসলামের ইতিহাসে 'গজনি রাজবংশ' নামে পরিচিত। গজনি রাজবংশ ৯৭৭ থেকে ১১৮৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত শাসনকাজ পরিচালনা করে। সিংহাসনে আরোহণের পরপরই সবুক্তগীন আফগানদের নিয়ে একটি দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী গঠন করেন এবং খোরাসান, সিস্তান ও লামঘান জয় করে ভারতীয় উপমহাদেশের দিকে দৃষ্টি দেন। এ সময়ে ভারতের সীমান্তে হিন্দুশাহি বংশ রাজত্ব করত। এখানকার রাজা ছিলেন জয়পাল। সবুক্তগীন জয়পালের সীমান্তের দুর্গ, নগর ও গ্রামগুলো আক্রমণ করলে জয়পাল তাকে শাস্তি দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেন। এদিকে, সবুক্তগীনের আক্রমণাত্মক মনোভাবের কারণে জয়পাল একটি শক্তিশালী সেনাদল নিয়ে ৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে গজনি আক্রমণের জন্য এগিয়ে যান। খুজাক নামের স্থানে উভয় পক্ষের সেনবাহিনী মুখোমুখি হয়। প্রবল তুষাড়ঝড়ে জয়পালের সৈন্যবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং সবুক্তগীনের কাছে পরাজিত হয়। জয়পাল সন্ধিতে সম্মত হয়ে তার রাজ্যের কিছু অংশ, দশ লক্ষ মুদ্রা এবং পঞ্চাশটি হাতি সবুক্তগীনকে ছেড়ে দিতে প্রতিশ্রুতিবন্ধ হন। কিন্তু জয়পাল প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে রাজপুত রাজাদের নিয়ে মৈত্রী জোট গঠন করে সবুক্তগীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। সবুক্তগীন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের দায়ে পেশোয়ারের কাছে যুদ্ধক্ষেত্রে পুনরায় জয়পালকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন এবং লামঘান থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত দখল করেন। জয়পাল তার রাজ্যের ভেতর দিয়ে খাইবার পর্যন্ত অঞ্চলের যোগাযাগের জন্য রাস্তা তৈরি করে দিতে বাধ্য হন। পরবর্তী সময়ে এ পথ ধরেই সুলতান মাহমুদ ভারত আক্রমণ করেন। এভাবে সবুক্তগীন ভারত অভিযানে তার পরবর্তী উত্তরাধিকারীদের জন্য পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেন।

গজনি বংশের তালিকা (৯৭৭ — ১১৮৬ খ্রি.)

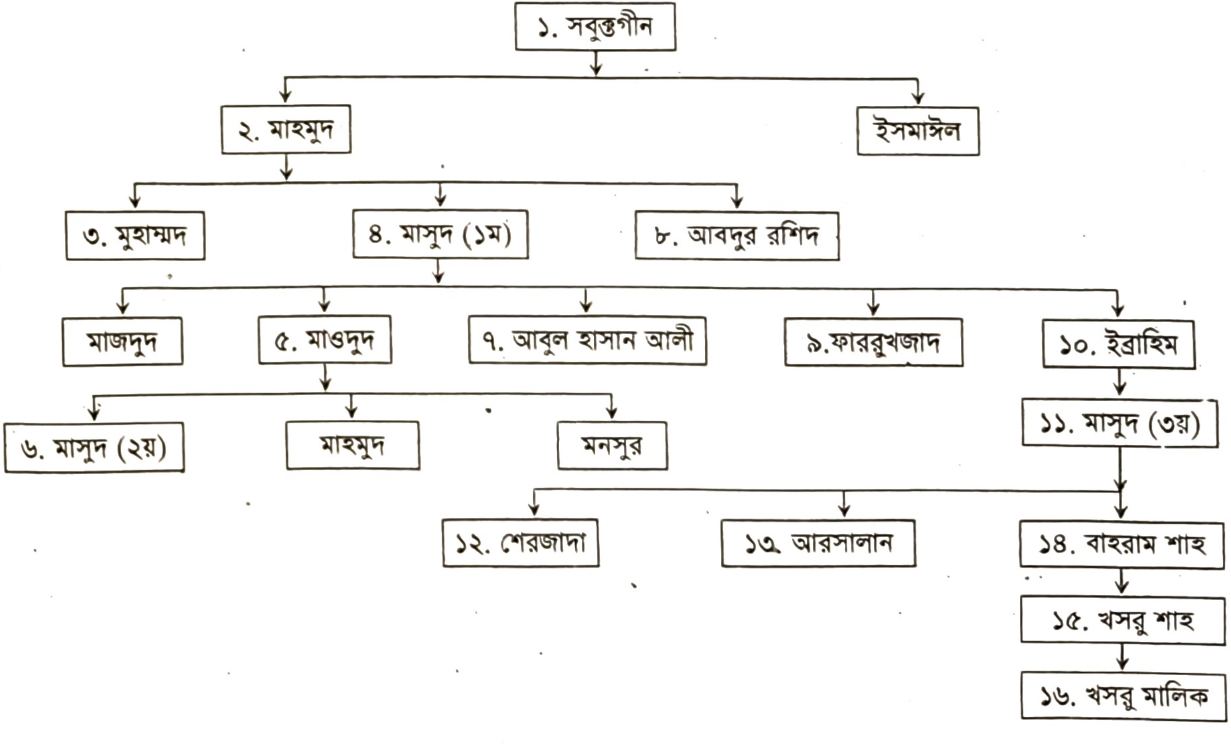

সুলতান মাহমুদের পরিচয় ও ক্ষমতা লাভ: গজনির সিংহাসনে আরোহণ করে সবুক্তগীন একটি স্বাধীন, স্থায়ী ও সুষ্ঠু রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলেন। তিনি ছিলেন সুযোগ্য শাসক। তার বিশ বছরের রাজত্বকালে (৯৭৭-৯৯৭ খ্রি.) গজনি রাজ্যের সংহতি বিধান এবং এর সীমানা সম্প্রসারণ করে তিনি ইতিহাসে নিজের স্থায়ী আসন নিশ্চিত করেন। কর্মদক্ষতা আর প্রভুভক্তির গুণে তিনি আলপ্তগীনের কাছ থেকে 'আমির-উল-উমরাহ' উপাধি লাভ করেন। আমির সবুক্তগীন ৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর আগে তিনি পুত্র ইসমাইলকে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন। কিন্তু তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মাহমুদ এ মনোনয়ন মেনে নিতে পারেননি। ফলে সিংহাসনকে কেন্দ্র করে দু'ভাইয়ের মধ্যে সংঘাত শুরু হয়। এ সংঘাতে মাহমুদের কাছে ইসমাইল পরাজিত হন। মাহমুদ ইসমাইলকে কারারুদ্ধ ও নির্বাসন দিয়ে ৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে ২৬ বছর বয়সে গজনির সিংহাসনে আরোহণ করেন।

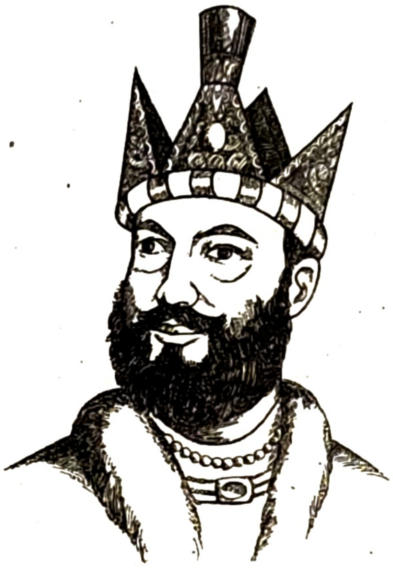
সুলতান মাহমুদ

প্রাথমিক কার্যাবলি: সিংহাসনে আরোহণের আগেই সুলতান মাহমুদ সমরবিদ্যা, শাসনপদ্ধতি এবং রাজনীতিতে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। পিতার সময়ে মাহমুদ খোরাসানের শাসনকর্তা হিসেবে সাফল্যের স্বাক্ষর রাখেন। সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি বিদ্রোহী গোত্রগুলোকে দমন করে নিজের অবস্থান সুসংহত করেন। আইনগতভাবে গজনির শাসকেরা তখনও সামানিদদের আনুগত্যাধীনে ছিলেন। গজনির মসনদে আরোহণের পর সামানিদদের কেন্দ্রীয় শক্তির অবক্ষয় ও দুর্বলতার সুযোগে মাহমুদ তাদের আনুগত্য অস্বীকার করে পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং পূর্বসূরিদের ব্যবহৃত 'আমির' পদবি ত্যাগ করে 'সুলতান' পদবি গ্রহণ করেন। তিনি সমসাময়িক আব্বাসি খলিফা কাদির বিল্লাহর (৯৯১-১০৩১ খ্রি.) আনুগত্য স্বীকার করেন। খলিফা তাকে 'ইয়ামিন-উদ-দৌলা' (সম্রাটের দক্ষিণ হাত) ও 'আমিন-উল-মিল্লাত' (ধর্মবিশ্বাসের রক্ষক) উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। এজন্য গজনি বংশ 'ইয়ামিনি বংশ' নামেও পরিচিত।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. দ্বিতীয় পর্যায়ে মুসলমানদের ভারত অভিযানের প্রধান নায়ক কে?
২. সুলতান মাহমুদের পিতার নাম কী? *[সকল বোর্ড ২০১৬]*
৩. সুলতান মাহমুদ কোন রাজবংশের শাসক ছিলেন? *[সকল বোর্ড ২০১৮]*
৪. সুলতান মাহমুদ কত খ্রিষ্টাব্দে গজনির সিংহাসনে আরোহণ করেন?
৫. 'ইয়ামিন-উদ-দৌলা' ও 'আমিন-উল-মিল্লাত' উপাধি ছিল কার?
৬. সুলতান মাহমুদ কোন আব্বাসি খলিফার আনুগত্য স্বীকার করেন?

উত্তরের জন্য ৪৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

গজনি বংশের শাসকদের একটি ধারাবাহিক তালিকা তৈরি করো।

পাঠ ১১ ও ১২

ভারতে সুলতান মাহমুদের সামরিক অভিযানের কারণ বা উদ্দেশ্য
Causes or Intentions of Sultan Mahmud's Military Expeditions to India

সুলতান মাহমুদ ছিলেন সাহসী ও সমরপ্রিয়। ১০০০ থেকে ১০২৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি মোট ১৭ বার ভারত আক্রমণ করেন। লক্ষণীয় যে, সুলতান মাহমুদ ভারতের বিরুদ্ধে পরিচালিত সতেরোটি অভিযানেই বিস্ময়করভাবে জয়লাভ করেন। তবে একমাত্র পাঞ্জাব ছাড়া বিজিত আর কোনো অঞ্চলকে সাম্রাজ্যভুক্ত না করায় তার ভারত অভিযানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ঐতিহাসিকেরা ঐকমত্যে উপনীত হতে পারেননি। কারও কারও মতে, "সুলতান মাহমুদ ছিলেন একজন গোঁড়া ধর্ম প্রচারক। হিন্দু দেব-দেবীর মন্দির ও বিগ্রহাদি ধ্বংস করে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি ভারত অভিযান করেছিলেন।" ঈশ্বরী প্রসাদের মতে, 'সমসাময়িক মুসলমানদের কাছে তিনি ছিলেন গাজী, যিনি পৌত্তলিকদের দেশ থেকে মূর্তিপূজা উৎখাত করতে প্রচেষ্টা চালান। বর্তমান কাল পর্যন্ত হিন্দুদের কাছে তিনি একজন সত্যিকারের হূন, যিনি তাদের পবিত্র মন্দিরগুলো ধ্বংস করেছিলেন ও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিয়েছিলেন।' আবার কেউ কেউ মনে করেন, "তিনি ছিলেন অর্থলোভী একজন দস্যু সর্দার'। ভারতের বিপুল ধনৈশ্বর্যে প্রলুব্ধ হয়ে 'তিনি আসেন, পোড়ান, মারেন, লুটপাট করেন, অধিকার করেন এবং চলে যান।"[১৩] কারও কারও অভিমত, বীরযোদ্ধা উচ্চাভিলাষী বিজেতার আকাঙ্ক্ষা পূরণের উদ্দেশ্যেই সুলতান মাহমুদ বারবার ভারত আক্রমণ করেন। ঐতিহাসিকদের এরূপ পরস্পরবিরোধী মতামতের ভিত্তিতে সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের প্রকৃত কারণ ও উদ্দেশ্য নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করা হলো—

ধর্মীয় উদ্দেশ্য (Religious Intentions)

কোনো কোনো ঐতিহাসিকের ধারণা, পৌত্তলিকতার বিনাশ সাধন এবং ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যেই সুলতান মাহমুদ বারবার ভারতে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। তাদের মতে, আব্বাসি খলিফা কাদির বিল্লাহ তাকে ভারতে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। সুলতান মাহমুদের মথুরা, বৃন্দাবন, নাগরকোট ও সোমনাথসহ বেশকিছু মন্দির ধ্বংস এবং কিছু হিন্দু রাজাসহ বহু সংখ্যক হিন্দুকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার বিষয়টিকে তারা নিজেদের মতের পক্ষে যুক্তি হিসেবে উপস্থাপন করেন। তবে নিরপেক্ষ পর্যালোচনায় ঐতিহাসিকদের এ মত সঠিক বলে প্রমাণিত হয় না। কারণ—

প্রথমত: 'ইসলাম প্রচার শাসকের জন্য অবশ্য কর্তব্য'— সুলতান মাহমুদের যুগে এ ধারণার অবসান ঘটেছিল। ধর্মের জন্য জেহাদ করার যুগ বহু আগেই শেষ হয়েছিল। বাস্তব যুগে ধর্মের স্বরূপ বিবেচনা করলে সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের পেছনে ধর্মীয় উদ্দেশ্য পরিলক্ষিত হয় না। অধ্যাপক এম হাবিব বলেন, "তার ভারত অভিযানসমূহের পেছনে ধর্মীয় উদ্দেশ্য সন্ধান করা যৌক্তিক নয়।"[১৪] তার ভারত আক্রমণকে জেহাদ বলে মনে করলে ভুল হবে বলে ঐতিহাসিক এস এম জাফরও মনে করেন।

দ্বিতীয়ত: সুলতান মাহমুদ একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান ছিলেন সত্য, তবে তার দ্বারা বলপূর্বক কোনো অমুসলিমকে ইসলামে দীক্ষিত করার কোনো প্রমাণ নেই। অধ্যাপক মুহাম্মদ নাজিম বলেন, "কোনো কোনো রাজা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন বলে বলা হয়, সম্ভবত বিজেতার ক্রোধ থেকে রক্ষা পাওয়ার রাজনৈতিক কৌশল হিসেবেই তারা তা করেছিলেন।"[১৫]

তৃতীয়ত: ঐতিহাসিকদের মতে, সুলতান মাহমুদ পরধর্মসহিষ্ণু ছিলেন। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক স্যার ডব্লিউ হেইগ (Sir Thomas Wolseley Haig) বলেন, "ইসলাম ধর্মের প্রতি অনুরাগী হলেও তিনি একটি বিশাল হিন্দু বাহিনী প্রতিপালন

---

[১৩] "He came, burnt, killed, plundered, captured and went".– H. Mohar Ali, *A Brief Survey of Muslim Rule in India, p-13*

[১৪] "It is impossible to read a religious motive in them.) –M. Habib, *Sultan Mahmud of Gazni, p.77.*

[১৫] "Some Rajas are said to have embraced Islam, but they did so most probably, as political shift to escape the fury of the conqueror." – M. Nazim, *The Life and Times of Sultan Mahmud of Gazni, p.162.*

করতেন এবং ধর্মান্তরিত হওয়া চাকরির শর্ত ছিল— একথা বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই।"[১৬] যুদ্ধ ছাড়া তিনি কোনো হিন্দুকে অযথা হয়রানি এবং প্রাণদণ্ড দিয়েছেন বলে কোনো প্রমাণ নেই বরং হিন্দুদের পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগের প্রমাণ আছে। গজনিতে হিন্দুদের জন্য পৃথক কলোনি স্থাপন এবং হিন্দু সংস্কৃতি ও সাহিত্যচর্চার জন্য কলেজ স্থাপন তার উদার মানসিকতার দৃষ্টান্ত।

চতুর্থত: ধর্মীয় বিদ্বেষ নয় বরং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণেই সুলতান মাহমুদ নাগরকোট ও সোমনাথসহ কয়েকটি মন্দিরে অভিযান পরিচালনা করেন। ভারতের হিন্দুদের মন্দির ধ্বংস করা তার সমর তালিকাভুক্ত ছিল। কারণ এ মন্দিরগুলো ছিল যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত ধনরত্নের ভাণ্ডার। তাছাড়া তিনি শান্তিপূর্ণ অবস্থায় কখনো মন্দির আক্রমণ করেননি। কেবল যুদ্ধের সময়ই মন্দির ধ্বংস করেছেন। এ প্রসঙ্গে ভারতীয় ঐতিহাসিক ঈশ্বরী টোপ্পা বলেন, "ভারতে যে মন্দিরগুলো মাহমুদ আক্রমণ করেছিলেন সেগুলোতে বিপুল এবং বর্ণনাতীত ধন-সম্পদ সঞ্চিত ছিল এবং এগুলোর মধ্যে কয়েকটি ছিল রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্রস্থল।"

পঞ্চমত: স্বীয় সাম্রাজ্য ও রাজনৈতিক স্বার্থে সুলতান মাহমুদ শুধু ভারতীয় হিন্দু রাজ্য নয়, এখানকার দুটি মুসলিম রাজ্য এবং মধ্য এশিয়ার ট্রান্স অক্সিয়ানার মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধেও অভিযান প্রেরণ করেন।

ষষ্ঠত, ধর্ম প্রচারের জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রয়োজন। কিন্তু মাহমুদের আক্রমণের পেছনে ভারতে স্থায়ী রাজ্য প্রতিষ্ঠার কোনো আকাঙ্ক্ষা ছিল বলে প্রমাণ নেই। বরং ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাসের কথা যে তখনও তুর্কিরা চিন্তা করেনি অতুলচন্দ্র রায়সহ অনেক ঐতিহাসিক তা উল্লেখ করেছেন।

রাজনৈতিক উদ্দেশ্য (Political Intentions)

অধিকাংশ ঐতিহাসিকই মনে করেন, সুলতান মাহমুদের ভারত আক্রমণের পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই প্রধান ছিল। অধ্যাপক এম. হাবিবের মতে, "তার প্রধান সংকল্প ছিল একটি তুর্কি-পারস্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা এবং এর বাস্তবায়নেই ভারতবর্ষে অভিযান প্রেরিত হয়।" বস্তুত সুলতান মাহমুদের সাম্রাজ্যের প্রান্তসীমায় ছিল ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল। ভৌগোলিক ও রণচাতুর্যিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা গজনি রাজ্যের নিরাপত্তার সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত ছিল। এ বিবেচনা থেকে আমির সবুক্তগীনের সময় থেকেই তুর্কিরা ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল জয়ের চেষ্টা করে। বস্তুত আমির সবুক্তগীন ছিলেন ভারতবর্ষে যুদ্ধাভিযানের নতুন পথপ্রদর্শক। পাঞ্জাবের হিন্দুশাহি রাজা জয়পালের বিরুদ্ধে দু'বার মুখোমুখি হলেও সবুক্তগীনের পক্ষে ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা সম্ভব হয়নি। তবে তিনি তার উত্তরাধিকারীর জন্য পথনির্দেশ করে যান। সুলতান মাহমুদ ছিলেন উচ্চাভিলাষী সমরনেতা। বিজেতার সম্মানলাভের আকাঙ্ক্ষা এবং সাম্রাজ্যের সীমান্ত নিরাপত্তার কথা ভেবে পিতার পথ অনুসরণ করে তিনি ভারত আক্রমণ করেন। এক্ষেত্রে হিন্দুশাহি রাজা জয়পালের সাথে সেনা জোট গঠনকারী সক্রিয় হিন্দু রাজাদের শাস্তিদানের বিষয়টিও সুলতান মাহমুদের বিবেচনায় থাকতে পারে। তবে পাঞ্জাব ও মুলতান ছাড়া ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে স্থায়ী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা তার উদ্দেশ্য ছিল না। অবশ্য তখনকার বাস্তব পরিস্থিতিতে তা সম্ভবও ছিল না।

প্রকৃতপক্ষে মধ্য এশিয়ায় একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করাই ছিল সুলতান মাহমুদের উদ্দেশ্য। আর এ সাম্রাজ্যকে নিরাপদ করার জন্যই তিনি এশিয়ার পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের এলাকাগুলোকে বিকল্প প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম উৎস হিসেবে বিবেচনা করতেন। হিন্দুরাজাদের চুক্তি লঙ্ঘন, সুলতানের প্রতি তাদের আনুগত্য ত্যাগ, তার শত্রুকে সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে তাদের রাজনৈতিক বিশ্বাসঘাতকতা, মাহমুদের মিত্রদের ওপর শত্রু ভাবাপন্ন প্রতিবেশী রাজাদের হামলা এবং তার আশ্রিত ভারতীয় রাজন্যবর্গের বিদ্রোহ ঘোষণার ফলেই তাকে বার বার ভারতে অভিযান পরিচালনা করতে হয়েছিল।

---

[১৬] Though zealous for Islam, he maintained a large body of Hindu troops and there was no reason to believe that conversion was a condition of their services."–*M. Mohar Ali, A Brief Survey of Muslim Rule in India*, p.15

অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য (Economic Intentions)

নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, সুলতান মাহমুদের ভারত আক্রমণের পেছনে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যই মুখ্য ছিল। অধ্যাপক এম হাবিব, এস এম জাফর, ভি এ স্মিথ প্রমুখ ঐতিহাসিকেরা সুলতান মাহমুদের ভারত আক্রমণের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। অধ্যাপক এম হাবিব ভারতীয় রাজন্যবর্গের সাথে সুলতান মাহমুদের যুদ্ধকে ধর্মযুদ্ধ নয় বরং গৌরব ও স্বর্ণের লোভে পরিচালিত পার্থিব যুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন। *An Advanced History of India* গ্রন্থেও 'ভারতীয় ধনৈশ্বর্য' সংগ্রহ সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানগুলোর মুখ্য উদ্দেশ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইতিহাসবিদ এম মোহর আলীর মতে, "সদ্য প্রতিষ্ঠিত গজনি রাজ্যের সুদৃঢ়ীকরণ, রাজ্যে নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং মুসলিম নৃপতিদের মধ্যে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ, বিশাল সেনাবাহিনীর ব্যয় নির্বাহ, মধ্য এশিয়া অভিযান, রাজধানী গজনিকে সমৃদ্ধিশালী ও সুসজ্জিতকরণ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা ইত্যাদি কারণে সুলতান মাহমুদের প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল।" একথা সর্বজনবিদিত যে, ভারতবর্ষ ছিল ধনৈশ্বর্য সমৃদ্ধ একটি দেশ। সুলতান মাহমুদ ভারতকে তার প্রয়োজনীয় অর্থের ভাণ্ডার মনে করেছিলেন। তাই তার মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি বার বার ভারত আক্রমণ করেন এবং বিপুল অর্থ নিয়ে স্বদেশে ফিরে যান।

এ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, ধর্মীয় কারণে নয় বরং রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যেই সুলতান মাহমুদ ১৭ বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিলেন। আরও স্পষ্টভাবে বলা যায়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ভারতবর্ষের নৃপতিদের দুর্বল করে রেখেই সুলতান মাহমুদ মধ্য এশিয়ায় একটি নির্বিঘ্ন ও নিষ্কণ্টক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলেন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সুলতান মাহমুদ মোট কত বার ভারত আক্রমণ করেন?
২. কোন মুসলিম বীর মথুরা, বৃন্দাবন, নাগরকোট ও সোমনাথ মন্দিরে অভিযান চালান?
৩. মধ্য এশিয়ার ট্রান্স অক্সিয়ানার মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন কে?
৪. সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্য কী ছিল? */সকল বোর্ড ২০১৯/*
৫. সুলতান মাহমুদের অভিযানের সময় পাঞ্জাবের রাজা কে ছিলেন?
৬. সাম্রাজ্যের সীমান্ত নিরাপত্তার কথা ভেবে সুলতান মাহমুদ কোথায় অভিযান প্রেরণ করেন?

উত্তরের জন্য ৪৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের পেছনে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের যৌক্তিকতা ছক আকারে লেখো।

গ. বাড়ির কাজ

তৈমুর লং সমরকন্দের সিংহাসন বসেই দিগ্বিজয়ের নেশায় মেতে ওঠেন। তিনি সিস্তান, হামদান, রাই, ইস্পাহান, ফারস, সিরাজ এবং চীনের বিভিন্ন এলাকা দখল করে একটি বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বহু রাজবংশের পতন ঘটিয়ে সেখান থেকে বিলাসবহুল সামগ্রী এনে রাজধানী সমরকন্দকে অনিন্দ্যসুন্দর নগরীতে পরিণত করেন। মধ্য এশিয়ায় একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাই ছিল তার লক্ষ্য এবং এ জন্য তিনি এসব এলাকা দখল করেন।

ক. উদ্দীপকে বর্ণিত তৈমুর লংয়ের অভিযানের সাথে সুলতান মাহমুদের অভিযানের কী মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
খ. উদ্দীপকের আলোকে তৈমুর লং এবং সুলতান মাহমুদের অভিযানের প্রকৃত উদ্দেশ্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো।

পাঠ ১৩ ও ১৪

ভারতে সুলতান মাহমুদের অভিযানসমূহ
Sultan Mahmud's Expeditions to India

সুলতান মাহমুদ ২৭ বছরে মোট ১৭ বার ভারতবর্ষে অভিযান পরিচালনা করেন এবং একমাত্র কাশ্মির অভিযান ছাড়া তিনি অন্য প্রতিটি অভিযানেই জয়লাভ করেন। নিচে তার অভিযানগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো-

১. **সীমান্তবর্তী শহর ও দুর্গ দখল:** সুলতান মাহমুদ ১০০০ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে প্রথম ভারতে অভিযান পরিচালনা করেন। ঐতিহাসিক ফিরিস্তা ও নিজামউদ্দিনের মতে, মাহমুদ তার রাজ্যের সীমান্ত নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে প্রথম অভিযানে খায়বার পাস সীমান্তের কতকগুলো দুর্গ ও শহর দখল করেন। বিজয়ী মাহমুদ এ এলাকা থেকে পর্যাপ্ত ধন-সম্পদও লাভ করেন।

২. **রাজা জয়পালের বিরুদ্ধে অভিযান:** সুলতান মাহমুদ ভারতে দ্বিতীয় অভিযান পরিচালনা করেন পিতৃশত্রু পাঞ্জাবের রাজা জয়পালের বিরুদ্ধে। ঈশ্বরী প্রসাদের মতে, "ধর্মের পতাকা উচ্চে উত্তোলন, স্বীয় কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সত্য, ন্যায় ও সুবিচারের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মাহমুদ ১০০১ খ্রিষ্টাব্দে এ অভিযান পরিচালনা করেন।" ১০০১ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ নভেম্বর পেশোয়ারের যুদ্ধে সুলতান মাহমুদ ও রাজা জয়পালের বাহিনী পরস্পর মুখোমুখি হন। যুদ্ধে রাজা জয়পাল পরাজিত হয়ে পুত্র, পৌত্র, নিকটাত্মীয় এবং উচ্চ রাজকর্মচারীসহ বন্দি হন। পরে একটি সন্ধি মোতাবেক ২,৫০,০০০ দিনার অর্থ ও অন্যান্য কয়েকটি শর্তে জয়পালকে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু পরাজয়ের অপমান ও আত্মগ্লানি সহ্য করতে না পেরে পুত্র আনন্দপালের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে ১০০২ খ্রিষ্টাব্দে রাজা জয়পাল জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি দেন।

৩. **বিজয় রায়ের বিরুদ্ধে অভিযান:** সুলতান মাহমুদ তৃতীয় অভিযান পরিচালনা করেন ঝিলাম নদীর পশ্চিম তীরবর্তী ভিরা রাজ্যের বিরুদ্ধে। ১০০৪—১০০৫ খ্রিষ্টাব্দে পরিচালিত এ অভিযানে ভিরার রাজা বিজয় রায় পরাজিত হন এবং পরে তিনি আত্মহত্যা করেন। ভিরা গজনির অঙ্গরাজ্যে পরিণত হয়।

৪. **মুলতান অধিকার:** ১০০৬ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান মাহমুদ মুলতানের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। মুলতানের শিয়া কারামাতিয়া সম্প্রদায়ের শাসক আবুল ফাতাহ দাউদ ভারতে সুলতান মাহমুদের রাজ্য সম্প্রসারণ প্রতিহত করার জন্য পাঞ্জাবের রাজা আনন্দপালের সাথে মৈত্রী স্থাপন করে সুলতানের বিরাগভাজন হন। এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ সুলতান মাহমুদ ১০০৬ খ্রিষ্টাব্দে মুলতান অবরোধ করেন। সাতদিন অবরুদ্ধ থাকার পর দাউদ বশ্যতা স্বীকার করেন এবং নিষ্ঠার সাথে ইসলামি শরিয়তের অনুশাসন পালন ও বার্ষিক বিশ হাজার দিরহাম করদানের অঙ্গীকার করে নিজ রাজ্য রক্ষা করেন।

৫. **সুখপালের বিরুদ্ধে অভিযান:** সুলতান মাহমুদের মুলতান অবরোধের সুযোগে কাশগড়ের রাজা ইলাক খান তার রাজ্য আক্রমণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভারতে বিজিত অঞ্চলগুলো নাওয়াজ শাহ'র (পাঞ্জাবের রাজা জয়পালের দৌহিত্র সুখপাল ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নাওয়াজ শাহ নাম গ্রহণ করেছিলেন) শাসনাধীনে অর্পণ করে গজনি ফিরে যান। সুলতান মাহমুদ যখন কাশগড় রাজার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত, সে সময় নাওয়াজ শাহ (সুখপাল) বিদ্রোহ করেন এবং ইসলাম ত্যাগ করে পুনরায় হিন্দুধর্মে প্রত্যাবর্তন করেন। সুখপালের এরূপ ধৃষ্টতায় ক্ষুব্ধ হয়ে মাহমুদ ১০০৭ খ্রিষ্টাব্দে তার বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে তাকে পরাজিত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন।

৬. **আনন্দপালের বিরুদ্ধে অভিযান:** সুলতান মাহমুদের ষষ্ঠ অভিযান ছিল রাজা আনন্দপালের বিরুদ্ধে। ১০০৮ খ্রিষ্টাব্দে এ অভিযান পরিচালিত হয়। তুর্কি বাহিনীর প্রবল গতিস্রোত প্রতিহত করা, দেশরক্ষা এবং স্বীয় স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখার লক্ষ্যে রাজা আনন্দপাল উজ্জয়িনী, গোয়ালিয়র, কালিঞ্জর, কনৌজ, দিল্লি ও আজমিরের হিন্দু রাজাদের নিয়ে একটি মহাজোট গঠন করেন। পাঞ্জাবের দুর্ধর্ষ 'খোক্কার' জাতিও মহাজোট সৈন্যদের সাথে যোগ দেয়। কিন্তু পেশোয়ার ও ওয়াইহিন্দের মধ্যবর্তী স্থানে সংঘটিত তুমুল যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত সুলতান মাহমুদ বিজয়ী হন। মহাজোট বাহিনীর বিশৃঙ্খল আচরণ তাদের পরাজয় এবং উন্নত যুদ্ধকৌশল মুসলিম বাহিনীর বিজয়কে সুনিশ্চিত করে।

৭. **নাগরকোট ও মুলতান বিজয়:** আনন্দপালের বিরুদ্ধে সাফল্যে উদ্দীপ্ত হয়ে সুলতান মাহমুদ কাংড়া পাহাড়ের 'নাগরকোট' বা 'ভীমনগর' দুর্গ আক্রমণ করেন। ১০০৯ খ্রিষ্টাব্দে নাগরকোট দুর্গ অধিকৃত হয়। এ দুর্গ দখল করে মাহমুদ ৭ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা, দু'শ মণ খাঁটি সোনা, সাতশ মণ সোনা ও রূপার, ২ হাজার মণ অপরিশোধিত রূপা এবং ২০ মণ মণিমুক্তা সংগ্রহ করেন। এ অবিশ্বাস্য ধন-রত্ন দেখে মাহমুদ নিজেও অভিভূত হয়ে পড়েন।

৮. **দাউদের বিদ্রোহ দমন:** এরপর মুলতানের শাসনকর্তা আবুল ফাতাহ দাউদ আবার বিদ্রোহ করলে সুলতান মাহমুদ ১০১০ খ্রিষ্টাব্দে তার বিরুদ্ধে পুনরায় অভিযান চালিয়ে দাউদকে ঘোর দুর্গে কারারুদ্ধ করেন।

৯. **ত্রিলোচনপালের বিরুদ্ধে অভিযান:** সুলতান মাহমুদ ভারতে তার নবম অভিযান পরিচালনা করেন রাজা আনন্দপালের পুত্র রাজা ত্রিলোচনপালের বিরুদ্ধে। ১০১৪ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান মাহমুদ ত্রিলোচনের বিরুদ্ধে অতর্কিতে আক্রমণ চালালে তিনি পরাজিত হন এবং কাশ্মির রাজা তুঙ্গারের কাছে আশ্রয় নেন। সুলতান মাহমুদ ত্রিলোচনের রাজধানী নন্দনা দখল করে কাশ্মির আক্রমণ করেন। মাহমুদের কাছে সম্মিলিত বাহিনী পরাজিত হয়। ত্রিলোচন পিতৃরাজ্যে ফিরে যান এবং বুন্দেলখণ্ডের চান্দেলা বংশীয় রাজা বিদ্যাধরের সাথে মৈত্রী চুক্তি করেন। তবে তাতেও শেষ রক্ষা হয়নি। সুলতান মাহমুদ পুনরায় আক্রমণ করে ত্রিলোচনপালকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেন। কিন্তু ১০২৬ খ্রিষ্টাব্দে রাজা ভীম পালের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পাঞ্জাবের বিখ্যাত এ হিন্দুশাহি রাজবংশের পতন ঘটে।

১০. **থানেশ্বর বিজয়:** থানেশ্বরের বিরুদ্ধে সুলতান মাহমুদের দশম অভিযানকে ঐতিহাসিক ঈশ্বরী প্রসাদ গুরুত্বপূর্ণ বলে অভিহিত করেছেন। হিন্দু শক্তির তীব্র প্রতিরোধ সত্ত্বেও ১০১৪ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান মাহমুদ থানেশ্বর দুর্গ অধিকার-করেন। থানেশ্বরের হিন্দুদের পবিত্র স্থান চক্রস্বামী মন্দিরটি ধ্বংস করে মাহমুদ প্রচুর ধনরত্ন ও ব্রোঞ্জের তৈরি 'চক্রস্বামী' বিগ্রহ নিয়ে গজনি ফিরে যান।

১১. **কাশ্মিরের বিরুদ্ধে অভিযান:** সুলতান মাহমুদের একাদশ অভিযান ছিল কাশ্মিরের বিরুদ্ধে। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি এবং সর্বোপরি দুর্ভেদ্য লৌহকপাট থাকায় দুর্গ জয়ে ব্যর্থতার কারণে ১০১৫ খ্রিষ্টাব্দে পরিচালিত মাহমুদের এ অভিযানটি সফল হয়নি।

১২. **মথুরা ও কনৌজ বিজয়:** সুলতান মাহমুদের দ্বাদশ অভিযানটিও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি ১০১৮ খ্রিষ্টাব্দে মথুরা ও কনৌজ জয়ের উদ্দেশ্যে গজনি ত্যাগ করেন। পথে বারানে (আধুনিক বুলন্দ শহর) তিনি রাজা হরদত্তকে পরাজিত করেন। ১০,০০০ অনুচরসহ রাজা হরদত্ত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। যমুনা তীরবর্তী মেবার রাজ্যের রাজা কুলবন্দরও মাহমুদের নিকট পরাজিত হন। এখান থেকে বিপুল ধনরত্ন সংগ্রহ করে সুলতান মথুরার দিকে অগ্রসর হন। মন্দিরপ্রধান মথুরা হিন্দুদের একটি পবিত্র নগরী। একরকম বিনা যুদ্ধেই মথুরা বিজিত হয়। মথুরার মন্দির ও বিগ্রহাদিতে রক্ষিত প্রচুর ধনরত্ন মুসলিম বাহিনী করায়ত্ত করে। সুরক্ষিত দুর্গঘেরা বৃন্দাবন নগরীও মাহমুদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। ১০১৯ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কনৌজ নৃপতি রাজ্যপালকে পরাস্ত করে সুলতান মাহমুদ কনৌজ অধিকার করেন। কনৌজ থেকেও প্রচুর পরিমাণ অর্থ-সম্পদ মাহমুদের হস্তগত হয়। গজনি ফিরে যাওয়ার পথে তিনি মুঞ্জা, অসনি এবং শার্বা দুর্গ দখল করেন।

১৩. **চান্দেলারাজের বিরুদ্ধে অভিযান:** কনৌজ নৃপতি রাজ্যপাল সুলতান মাহমুদের বশ্যতা স্বীকার করায় পার্শ্ববর্তী পরাক্রমশালী রাজপুত রাজন্যবর্গ অপমানবোধ করেন। কালিঞ্জরের চান্দেলা রাজা গোণ্ডা গোয়ালিয়র রাজের সাথে চুক্তিবন্ধ হয়ে কনৌজ আক্রমণ করে রাজা রাজ্যপালকে হত্যা করেন। মিত্র রাজার এ হত্যাকাণ্ডে সুলতান মাহমুদ ক্ষুব্ধ হন এবং প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ১০১৯ খ্রিষ্টাব্দে চান্দেলা রাজাকে আক্রমণ করেন। রাজা গোণ্ডা পরাজিত হলে বিজয়ী বাহিনী তার রাজধানীতে প্রবেশ করে।

১৪. **গোয়ালিয়র আক্রমণ:** ভারতবর্ষে সুলতান মাহমুদ চতুর্দশ অভিযান প্রেরণ করেন গোয়ালিয়রের বিরুদ্ধে। ১০২১—১০২২ খ্রিষ্টাব্দে পরিচালিত এ অভিযানে গোয়ালিয়র অধিপতি সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করে কর প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন।

১৫. **কালিঞ্জর বিজয়:** গোয়ালিয়র পদানত করে সুলতান মাহমুদ ১০২৩ খ্রিষ্টাব্দে কালিঞ্জর অভিমুখে যাত্রা করেন। এ সময় তিনি রাজা গোণ্ডার বিখ্যাত দুর্গটি অবরোধ করেন। কালিঞ্জরের রাজা গোণ্ডা তার দুর্গ রক্ষায় ব্যর্থ হয়ে সুলতানের সাথে সন্ধি স্থাপনে সম্মত হন। ঐতিহাসিক নিজামউদ্দিন ও ফিরিস্তার বর্ণনা মতে, চান্দেলারাজ সুলতান মাহমুদকে প্রভূত পরিমাণ ধন-রত্ন দিয়ে মুক্তি পান।

১৬. **সোমনাথ মন্দির বিজয়:** সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানসমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য ছিল সোমনাথ মন্দির আক্রমণ। ড. মো. মোহর আলী বলেন, "সোমনাথ অভিযান ছিল মাহমুদের সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অভিযান।"[১৭] সোমনাথ মন্দিরটি ভারতের গুজরাটের কাথিওয়াড়ের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত। মন্দিরটি ভারতের ছিল প্রভূত ধনৈশ্বর্যে পরিপূর্ণ। মুসলিম ঐতিহাসিকদের মতে, মন্দিরের পুরোহিতদের ধারণা ছিল এ মন্দির আক্রমণ ও বিজয় মাহমুদের সাধ্যের বাইরে। কিন্তু মন্দিরে গচ্ছিত বিপুল ধনরাজির সংবাদ পেয়ে সুলতান মাহমুদ সোমনাথ আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। ১০২৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সোমনাথের দ্বারে পৌঁছান। গুজরাটের রাজা ভীমদেবের নেতৃত্বে স্থানীয় জনগণ ও পুরোহিতদের প্রবল বাধা সত্ত্বেও এ অভিযানে সুলতান মাহমুদ জয়লাভ করেন। মন্দিরসহ ৩০০ বিগ্রহ ধ্বংস করা হয়। এ মন্দির থেকে মাহমুদ দু'কোটিরও বেশি স্বর্ণমুদ্রা ও বিগ্রহাদির অলংকার থেকে দু'শ মণ মূল্যবান মণিমুক্তা নিয়ে স্বদেশে ফিরে যান। ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, "সোমনাথ বিজয় মাহমুদের ললাটে নতুন বিজয়-গৌরব সংযুক্ত করে।"[১৮] এ বিজয় তাকে মুসলমানদের অনেকের কাছে মহানায়করূপে চিহ্নিত করে।

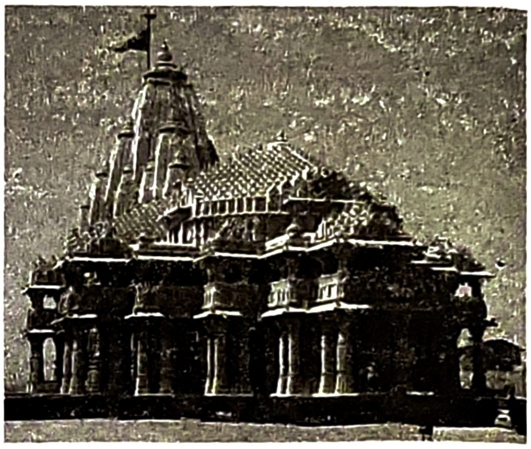
সোমনাথ মন্দির

১৭. **জাঠদের বিরুদ্ধে অভিযান:** সুলতান মাহমুদের সপ্তদশ এবং ভারতে শেষ অভিযান পরিচালিত হয় জাঠদের বিরুদ্ধে। সোমনাথ বিজয় শেষে গজনি আসার পথে মাহমুদের তুর্কি বাহিনী লাহোরে জাঠদের উৎপীড়নের শিকার হয়। এ ঘটনার প্রতিশোধ নিতে মাহমুদ ১০২৭ খ্রিষ্টাব্দে ভারতে তার শেষ অভিযান পরিচালনা করেন। তুর্কি বাহিনীর কাছে জাঠরা চরমভাবে পরাজিত হয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সুলতান মাহমুদ কত খ্রিষ্টাব্দে প্রথম ভারতে অভিযান পরিচালনা করেন?
২. সুলতান মাহমুদের দ্বিতীয় অভিযান ছিল কার বিরুদ্ধে?
৩. সুলতান মাহমুদের বিরুদ্ধে হিন্দু রাজাদের নিয়ে মহাজোট গঠন করেন কে?
৪. 'চক্রস্বামী' বিগ্রহটি কোথায় ছিল?
৫. সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানসমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনটি?
৬. সোমনাথ মন্দিরটি কোথায় অবস্থিত? *(সকল বোর্ড ২০২২, ২০২১, ২০১৯)*

উত্তরের জন্য ৪৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

ছকটি সঠিক করে সাজাও।

সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযান	সময় (খ্রি.)
মথুরা ও কনৌজ বিজয়	১০২৬
সোমনাথ অভিযান	১০১৮
থানেশ্বর বিজয়	১০০৬
কাশ্মিরের বিরুদ্ধে অভিযান	১০১৪

---

[১৭] "The Somnath expedition was the last important military operation of Mahmud."–Dr. Md. Mohar Ali, *A Brief Survey of Muslim Rule in India, Dacca-1969, P-19,*

[১৮] The victory of Somnath added fresh laurels to Mahamud's brow. – *Mediaeval India, p-89*

পাঠ ১৫

ভারত অভিযানে সুলতান মাহমুদের সাফল্যের কারণ এবং এর ফলাফল
Causes of the Success of Sultan Mahmud's Expeditions to India and Its Results

সুলতান মাহমুদের সাফল্যের কারণ (Causes of the Success of Sultan Mahmud)

সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযান ইসলামের ইতিহাসে এক বিস্ময়কর ঘটনা। তিনি ছিলেন সুদক্ষ সেনানায়ক ও সাহসী বিজেতা। সমসাময়িক কোনো নৃপতি বা বিজেতাই তার সমকক্ষ ছিলেন না। তিনি তার ১৭ বার ভারত অভিযানের প্রায় প্রতিটিতেই জয় লাভ করেন। তার এ সাফল্যের পেছনে বেশকিছু কারণ ছিল।

প্রথমত: গজনি এবং ভারতের তৎকালীন বাস্তব পরিস্থিতি সুলতান মাহমুদের সাফল্যের অনুকূলে ছিল। ঈশ্বরী প্রসাদের মতে "সামানিদ বংশের পতন, হিন্দু রাজাদের মধ্যে চিরস্থায়ী বিবাদ ও মতবিরোধ, অভিন্ন শত্রুর বিরুদ্ধে জোট গঠনে তাদের ব্যর্থতা, পারস্যের ক্ষমতা হ্রাস, তুর্কিদের অসীম উদ্দীপনা প্রভৃতি উপাদান মাহমুদের সাফল্যের অনুকূলে কাজ করেছে, তার প্রতিটি অভিযানকে সার্থক করেছে এবং তার ধর্মের জন্য এনে দিয়েছে অসামান্য বিজয়।"

দ্বিতীয়ত: এস. লেনপুলের (Stanley Lanepoole) মতে, "রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিভক্তি এবং প্রাকৃতিক কারণে স্বভাবত দুর্বল ভারতীয়রা মাহমুদের ঐক্যবন্ধ দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে জয়লাভে অসমর্থ হয়ে পড়ে।" বস্তুত সংখ্যায় বেশি হওয়া সত্ত্বেও অনৈক্য ও অরাজকতার কারণে হিন্দু রাজন্যবর্গ তুর্কি বাহিনীর মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়।

তৃতীয়ত: সুলতান মাহমুদের মোকাবিলায় ভারতীয়রা 'কনফেডারেসি' গঠন করে সত্য; তবে জাতিভেদ, বর্ণবাদ, ধর্মীয় কুসংস্কার ও পারস্পরিক কোন্দলের কারণে কনফেডারেসি 'আত্মাবিহীন ভূত' (Soulless ghost)-এ পরিণত হয়।

চতুর্থত: সুলতান মাহমুদ নিজে একজন অসাধারণ সমরকুশলী সেনানায়ক ছিলেন। প্রাবন্ধিক ও লেখক এস. আর. শর্মা (Sita Ram Sharma) বলেন, "মাহমুদ ছিলেন দক্ষ সৈনিক, তাঁর হৃদয়ে কখনও ভয় উদ্রেক হতো না।" (Mahmud was a seasoned soldier. Fear did not find any place in his heart.) অপূর্ব রণচাতুর্য, কূটনীতি এবং সেনাবাহিনী সংগঠন ও সৈন্য পরিচালনায় দক্ষতা ভারতীয় অভিযানে তার সাফল্যের অন্যতম কারণ।

পঞ্চমত: যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতীয় নেতৃত্ব ছিল ত্রুটিপূর্ণ ও দুর্বল। তাদের যুদ্ধকৌশল ছিল পুরোনো ও সনাতন এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীও ছিল বিশৃঙ্খল। অন্যদিকে সুলতান মাহমুদের সেনাবাহিনী ছিল তুর্কি, আফগান, পারসিক ও ভারতীয়দের সমন্বয়ে গঠিত সুশৃঙ্খল, সুসজ্জিত, রণনিপুণ ও অমিততেজি। তাদের যুদ্ধকৌশল ছিল ভারতীয়দের তুলনায় অনেক উন্নত। তাদের অশ্বারোহী বাহিনীর মোকাবিলায় ভারতীয়দের পদাতিক ও হস্তিবাহিনী ছিল অনেক পশ্চাৎপদ। এছাড়াও জেহাদের প্রেরণা ছাড়াও যুদ্ধে জয় লাভ শেষে গনিমত (booty) প্রাপ্তির প্রত্যাশা মুসলিম বাহিনীকে অজেয় করে তুলেছিল। অধ্যাপক এম. হাবিব বলেন, "সুলতানের অসামান্য মেধা এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ফলে এটি (সামরিক বাহিনী) দ্বিধাবিভক্ত শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে অপরাজেয় এবং দুর্ধর্ষ শক্তিতে পরিণত হয়।"

জেনে রাখো

যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের কাছে থেকে প্রাপ্ত সম্পদকে গনিমত বলা হয়। পরাজিত সৈন্যদের অস্ত্রশস্ত্র, ঘোড়া, খাদ্যশস্য, পোশাক, দাস-দাসী, স্বর্ণ-রৌপ্য, পশু প্রভৃতি গনিমতের অন্তর্ভুক্ত। মহানবি (স)-এর সময় এসব সম্পদের পাঁচ ভাগের চারভাগ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হতো। অবশিষ্ট এক ভাগ বায়তুল মালে জমা রাখা হতো। এই অংশকে বলা হয় 'আল-খুমস'। খুমসের তিন ভাগের এক ভাগ মহানবি (স)-এর পরিবারবর্গকে দেওয়া হতো। খলিফা ওমর (রা) এ নিয়ম রদবদল করে মহানবি (স)-এর পরিবারের অংশটুকু দিয়ে সৈন্যদের সাজ-সরঞ্জাম ক্রয় করার নির্দেশ দেন।

সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের ফলাফল (Results of Sultan Mahmud's Expeditions to India)

ভারত অভিযানে অসামান্য সাফল্য সত্ত্বেও পাঞ্জাব ছাড়া আর কোনো অঞ্চলকে সুলতান মাহমুদ নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেননি। তাই কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন, তার ভারত অভিযানের বিশেষ কোনো রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল না। অবশ্য নিরপেক্ষ বিচারে সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের গুরুত্ব সুদূরপ্রসারী বলে প্রতীয়মান হয়।

ক. **রাজনৈতিক ফলাফল:** সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযান রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থবহ ও ফলপ্রসূ ছিল। তার ভারত অভিযানের কোনো স্থায়ী রাজনৈতিক প্রভাব নেই এ ধারণা করা ভুল হবে। কারণ—

প্রথমত: এ কথা সত্য যে, তিনি ভারতের বিজিত অঞ্চলকে তার সাম্রাজ্যভুক্ত করেননি এবং এ অভিপ্রায় তার মধ্যে ছিলও না। পাঞ্জাবকে মাহমুদের সাম্রাজ্যভুক্তকরণ সীমিতভাবে হলেও তাকে ভারত নৃপতির মর্যাদা দিয়েছে। ভি. এ. স্মিথ (Vincent Arthur Smith) বলেন, "এ সংযোজনই মাহমুদের ভারতবর্ষের নৃপতি হওয়ার একমাত্র দাবি।"[১৯] তার পরবর্তী উত্তরাধিকারীরা আফগানিস্তান ও মধ্য এশিয়া থেকে বিতাড়িত হয়ে এ পাঞ্জাবেই আশ্রয় নিয়েছিলেন।

দ্বিতীয়ত: সুলতান মাহমুদের পাঞ্জাব অধিকার পরবর্তী সময়ে ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্য স্থাপনে সহায়ক হয়েছিল। অধ্যাপক আর. সি. মজুমদার (Ramesh Chandra Majumder) বলেন, "গজনভিদের পাঞ্জাব অধিকার ছিল ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশের চাবিকাঠিস্বরূপ।"[২০]

তৃতীয়ত: এ অভিযানে ভারতের হিন্দু সামরিক শক্তির দুর্বলতা, রাজন্যবর্গের অনৈক্য প্রকাশ হয়ে পড়ে। ফলে তুর্কি পরাক্রমের মুখে ভারতীয়দের নৈতিক মনোবল ভেঙে যায়, যা পরবর্তী মুসলিম বিজয়কে সহজতর করে।

খ. **অর্থনৈতিক ফলাফল:** সুলতান মাহমুদের ভারত আক্রমণের ফলে ভারতে যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত সম্পদের মারাত্মক ক্ষতি হয়। উত্তর ভারতীয় রাজ্যসমূহ বড় রকমের আর্থিক বিপর্যয়ে পড়ে। অন্যদিকে ভারত থেকে লুণ্ঠিত বিপুল ধনৈশ্বর্য দিয়ে মাহমুদ গজনির উন্নতি ও সমৃদ্ধি করেন। ফলে গজনি ইতিহাসের প্রসিদ্ধ নগরীতে পরিণত হয়।

গ. **ধর্মীয় ফলাফল:** পরোক্ষভাবে হলেও সুলতান মাহমুদের অভিযানসমূহ ভারতবর্ষে ইসলাম প্রসারের পথ উন্মুক্ত করেছিল। ডব্লিউ হেগ বলেন, "তিনিই প্রথম যিনি ভারতের অনেক অভ্যন্তরে ইসলামের বিজয় পতাকা বহন করে নিয়ে যান।" তাছাড়া এসব বিজয়াভিযানের সময় আগত পির-দরবেশ ও পণ্ডিতদের মাধ্যমে ভারতীয় সমাজে ইসলামের বিস্তার ঘটেছিল বলে অধ্যাপক এস. এম. জাফর উল্লেখ করেছেন।

ঘ. **সাংস্কৃতিক ফলাফল:** সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের সাংস্কৃতিক ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তার অভিযানসমূহে ভারতীয় অনেক মন্দির ও শহর ধ্বংস হয়। ভারতীয় শিল্পকলা ও স্থাপত্যের ব্যাপক ক্ষতি হয়। তবে এর কিছু ইতিবাচক সাংস্কৃতিক প্রভাবও লক্ষণীয়। এসব অভিযানের মাধ্যমে হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির আদান-প্রদানের সুযোগ ঘটে। ফলে উভয়ের সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে এক নবঅধ্যায়ের সূচনা হয় এবং ইন্দো-মুসলিম কৃষ্টি বিকাশ লাভ করে। ভারত থেকে সংগৃহীত ধন-সম্পদ দিয়ে মাহমুদ গজনির সার্বিক উন্নয়ন ছাড়াও সেখানে শিল্প-সাহিত্যের বিকাশ ঘটান। গজনিকে তিনি মধ্যযুগের একটি শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত করেন।

---

[১৯] "The annexation constitutes the sole claim of Mahmud to be counted as an Indian sovereign." - V.A Smith, *The Oxford History of India, p-90*

[২০] "The Gaznavids occupation of the Punjab serves as the key to unlock the gates of the Indian interior.: – R. C. Majumdar, *An Advanced History of India, p-268.*

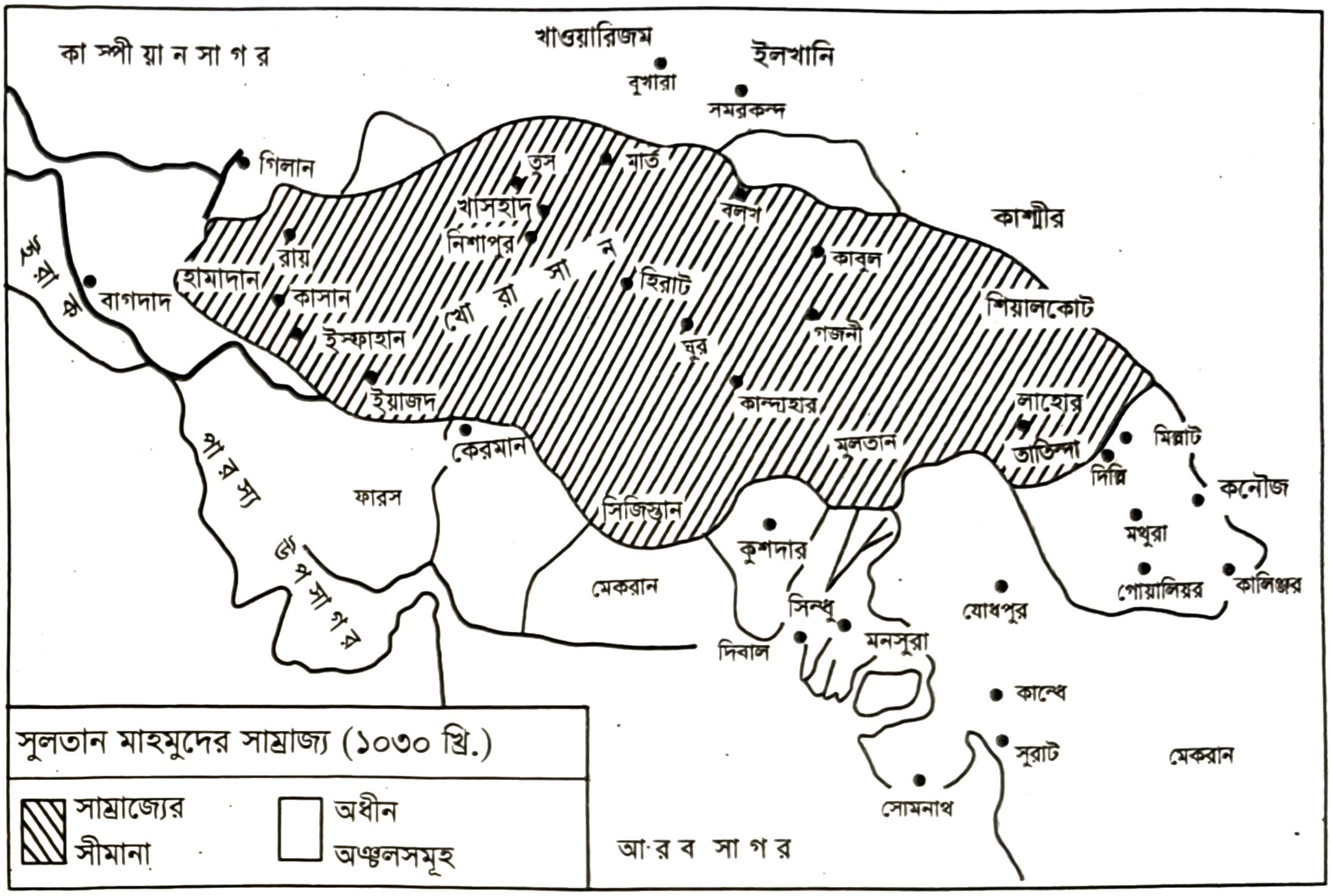
কাস্পীয়ান সাগর
খাওয়ারিজম
বুখারা
ইলখানি
সমরকন্দ
গিলান
তুস
মার্ভ
খাসহাদ
বলখ
কাশ্মীর
নিশাপুর
রায়
হামাদান
বাগদাদ
কাসান
খোরাসান
হিরাট
কাবুল
ইস্ফাহান
ঘুর
গজনী
শিয়ালকোট
ইয়াজদ
কান্দাহার
লাহোর
কেরমান
মুলতান
তাভিন্দা
মিরাট
দিল্লি
কনৌজ
পারস্য উপসাগর
ফারস
সিজিস্তান
কুশদার
মথুরা
মেকরান
গোয়ালিয়র
কালিঞ্জর
সিন্ধু
যোধপুর
দিবাল
মনসুরা
কাম্বে
সুরাট
মেকরান
সোমনাথ
আরব সাগর
সুলতান মাহমুদের সাম্রাজ্য (১০৩০ খ্রি.)
সাম্রাজ্যের সীমানা
অধীন অঞ্চলসমূহ

সুলতান মাহমুদের সাম্রাজ্য (১০৩০ খ্রি.)

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ভারতে পরিচালিত অভিযানে প্রায় প্রতিটিতে কে জয়লাভ করেন?
২. সুলতান মাহমুদ বিজিত কোন অঞ্চলকে তার সাম্রাজ্যভুক্ত করেন?
৩. সুলতান মাহমুদের তুর্কি বাহিনীর মোকাবিলায় হিন্দু রাজন্যবর্গের ব্যর্থ হওয়ার কারণ কী?
৪. সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানে কোনটি মুসলিম বাহিনীকে অজেয় করে তুলেছিল?
৫. ভারত থেকে সংগৃহীত ধন-সম্পদ দিয়ে সুলতান মাহমুদ কোন অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন করেন?
৬. মধ্যযুগের একটি শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ছিল কোনটি?

উত্তরের জন্য ৪৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. ভারত অভিযানে সুলতান মাহমুদের সাফল্যের মূল কারণটি চিহ্নিত করো।
২. সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযান কোন কোন ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছিল দুটি করে উদাহরণ দিয়ে ছক আকারে লেখো।

পাঠ ১৬ ও ১৭

সুলতান মাহমুদের চরিত্র ও কৃতিত্ব এবং গজনি রাজবংশের পতন
Character and Achievements of Sultan Mahmud and The Fall of the Ghaznavid Dynasty

ভারত অভিযানের পরও সুলতান মাহমুদ মধ্য এশিয়ার আরও কয়েকটি রাজ্য জয় করেন। অক্লান্ত পরিশ্রমে তার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। শেষ পর্যন্ত ১০৩০ খ্রিষ্টাব্দে ৬০ বছর বয়সে তিনি গজনিতে মৃত্যুবরণ করেন। অনন্যসাধারণ চরিত্র ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের জন্য ঐতিহাসিক গিবন সুলতান মাহমুদকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক হিসেবে অভিহিত করেছেন। ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, "মাহমুদ ছিলেন একজন বড় মাপের নৃপতি। তিনি ছিলেন অসামান্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, আত্মমর্যাদাবোধ সচেতন, উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি। হিন্দুদের কাছে তিনি ছিলেন সংকীর্ণচিত্ত, ধর্মান্ধ ও মূর্তিভঙ্গকারী।" তবে সমসাময়িক ঐতিহাসিক বিবরণ মতে, সুলতান মাহমুদ ছিলেন একজন ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান। ধর্মান্ধতার জন্য নয়, ধনলিপ্সার জন্যই তিনি ভারতীয় মন্দির লুট ও বিগ্রহাদি ধ্বংস করেন। তার পরধর্মসহিষ্ণুতার দৃষ্টান্তও ইতিহাসে পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ, প্রতিভাবান, সুবিচারক। শিল্প-সাহিত্যের প্রতিও তার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। সুলতান মাহমুদ প্রায় ৩২ বছর রাজত্ব করেন। শৌর্য-বীর্য, বীরত্ব, তেজস্বিতার জন্য ঐতিহাসিকেরা তাকে বিখ্যাত বীর আলেকজান্ডার, হানিবল, সিজার ও নেপোলিয়নের সাথে তুলনা করেছেন। একটি ছোট পার্বত্য রাজ্যকে তিনি একটি বিশাল ও সমৃদ্ধিশালী রাজ্যে রূপ দেন। মৃত্যুকালে তিনি খোরাসান, ইরাক, পারস্য, আফগানিস্তান, সিন্ধু, পাঞ্জাব প্রভৃতি দেশের সমন্বয়ে একটি বিশাল সাম্রাজ্য রেখে যান।

সমরনেতা: সুলতান মাহমুদ ছিলেন জন্মগত সৈনিক। ড. শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার সুলতান মাহমুদকে 'বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমরনায়ক', স্ট্যানলি লেনপুল 'উঁচু মানের সৈনিক' এবং ঈশ্বরী প্রসাদ 'বড় মাপের দিগ্বিজয়ী বীর' বলে আখ্যায়িত করেছেন। ঈশ্বরী টোপ্পার মতে, সুলতান মাহমুদ ছিলেন 'গজনির নেপোলিয়ন'। সামরিক দক্ষতা, বীরত্ব ও তীক্ষ্ণতা বিবেচনায় কেউ কেউ তাকে গ্রিকবীর আলেকজান্ডারের সাথে তুলনা করেছেন। সামরিক সংগঠক হিসেবেও সুলতান মাহমুদ অনন্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। একজন দক্ষ সমরসংগঠক হিসেবে তিনি বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের লোকদের সমন্বয়ে গঠিত তার সেনাবাহিনীকে ঐক্যবদ্ধ এবং দুর্জেয় সামরিক শক্তিতে পরিণত করেন।

সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা: ক্ষুদ্র গজনি রাজ্যকে সুলতান মাহমুদ বিশাল সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত করেন। ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, "সুলতান মাহমুদ ছিলেন বড় মাপের নৃপতি। একটি পার্বত্য ক্ষুদ্র রাজ্যকে শুধু বাহুবলে বিশাল ও সমৃদ্ধ সাম্রাজ্যে পরিণত করা অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচায়ক।" আরব-তুর্কি শাসকদের মধ্যে তিনিই প্রথম শাসক, যিনি হিরাত, কাবুল ও গজনির সীমা অতিক্রম করে সমগ্র আফগানিস্তানের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি যে বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, তা বাগদাদের সমসাময়িক আব্বাসি খলিফার সাম্রাজ্য অপেক্ষা বিশাল ছিল বলে মনে করা হয়। তিনি উত্তরসূরি ঘুরি শাসকদের জন্য ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেন। কারণ, তার প্রদর্শিত পথ ধরেই ভারতে ঘুরিরা মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্রেষ্ঠ শাসক: ঐতিহাসিক গিবনের মতে, সুলতান মাহমুদ নিঃসন্দেহে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন। তবে ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ এলফিন স্টোন ও স্ট্যানলি লেনপুল শাসক হিসেবে সুলতান মাহমুদের গঠনমূলক প্রতিভা ও দূরদৃষ্টির অভাব ছিল বলে মনে করেন। তাদের মতে, তিনি শাসনব্যবস্থার উন্নয়নে কোনো মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেননি। রাজ্যের শাসনব্যবস্থার সংগঠন ও সংহতি বিধানে তার কোনো পরিকল্পনা ছিল না। নিরপেক্ষ বিশ্লেষণে সমালোচকদের বক্তব্য সম্পূর্ণ সত্য বলে মনে হয় না। বস্তুত একজন সুশাসক, ন্যায়বিচারক ও প্রজারঞ্জক নৃপতি হিসেবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তার শাসন-প্রকৃতি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য-প্রমাণ পাওয়া না গেলেও তিনি যে, একটি সুসংগঠিত ও সুসংহত সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ তার সময়ে গজনি রাজ্য যে সমৃদ্ধি ও গৌরবের উচ্চশিখরে আরোহণ করেছিল, তা একটি সুসংগঠিত, সুনিয়ন্ত্রিত সরকার ছাড়া সম্ভব ছিল না। একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে তিনি বিশেষ যত্নশীল ছিলেন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় তিনি কোনো আপস করতেন না। সুশাসন ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি তিনি কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির দিকেও নজর দিয়েছিলেন।

শিল্প ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক: শিল্পকলা এবং জ্ঞানচর্চার পৃষ্ঠপোষকতার জন্য মাহমুদ ইতিহাসে স্থায়ী আসন তৈরি করতে পেরেছেন বলে অধ্যাপক মফিজুল্লাহ কবীর মনে করেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন, সুলতান মাহমুদ নিজেও একজন সুপণ্ডিত ছিলেন। 'তাফরিদুল ফুরু' নামক ফিকাহশাস্ত্রের গ্রন্থটি তার রচিত বলেও কথিত আছে। সুলতান মাহমুদ শিল্পকর্মের প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। কোনোরকম কার্পণ্য না করে তিনি বিদ্বান, পণ্ডিত ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন বলে ঈশ্বরী প্রসাদের মত। সমকালীন প্রাচ্য জগতের প্রথম সারির বহু বিদ্বান, পণ্ডিত ব্যক্তি তার দরবারে সমাদৃত হয়েছিলেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন গণিতবিদ, দার্শনিক, জ্যোতির্বিদ এবং সংস্কৃত পণ্ডিত আল বিরুনি, ইতিহাসবিদ উৎবি, দার্শনিক আল ফারাবি এবং 'তারিখ-ই-সবুক্তগীন' গ্রন্থপ্রণেতা বায়হাকি, যাকে এস লেনপুল 'প্রাচ্যের পেপিস' (Oriental Pepys) নামে অভিহিত করেছেন। আল বিরুনি ছিলেন সুলতান মাহমুদের দরবারের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি মুসলিম বিশ্বের ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। আল বেরুনি ছিলেন বহুশাস্ত্রবিদ। তিনি 'আসার আল বাকিয়া', 'তাহফিম' এবং 'কানুন-ই-মাসুদী'সহ অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তবে যে গ্রন্থটি আল বেরুনিকে ইতিহাসে অমরত্ব দান করেছে তা হলো 'কিতাব-উল-হিন্দ'। এ গ্রন্থটি ভারতের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনধারার এক মহামূল্যবান দলিল হিসেবে পণ্ডিত মহলে সমাদৃত হয়েছে।

ঈশ্বরী প্রসাদ সুলতান মাহমুদের যুগকে 'কবিতার যুগ' বলে অভিহিত করেছেন। সে সময় গোটা এশিয়া মহাদেশে সুপরিচিত বেশ কয়েকজন কবি সুলতান মাহমুদের দরবারে স্থান লাভ করেন। এদের মধ্যে কবি উজারি, আসাদ তুসি, আসজাদি, পারুখি ছিলেন অন্যতম। সুলতানের সভাকবি ছিলেন আনসারি। সুলতান তাকে 'মালেক উশ-শুয়ারা' উপাধি দিয়েছিলেন। তবে ঐ যুগের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন আবুল কাসেম ফেরদৌসি। 'প্রাচ্যের হোমার' নামে খ্যাত এ কবি সুলতান মাহমুদের অনুরোধে জগদ্বিখ্যাত 'শাহনামা' মহাকাব্য রচনা করেন।

সুলতান মাহমুদ ভারত থেকে সংগৃহীত বিপুল ধনৈশ্বর্যের বিপুলাংশ ব্যয়ে গজনিকে অতুলনীয় ও সমৃদ্ধ স্বপ্নপুরীতে পরিণত করার চেষ্টা করেন। তার চেষ্টায় গজনি মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। সুলতান গজনিতে একটি বিশ্ববিদ্যালয়, একটি পাঠাগার ও একটি জাদুঘর স্থাপন করেন। বিশ শতকের মধ্যভাগে ফরাসি প্রত্নতাত্ত্বিকগণ একাদশ শতকে নির্মিত গজনি সুলতানদের যে প্রাসাদটি আবিষ্কার করেন, তাতে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদি গজনি সুলতানদের সুরুচির পরিচয় বহন করে। সুলতান মাহমুদ গজনিতে 'স্বর্গীয় বধূ' (Celestial Bride) নামে পরিচিত যে অনিন্দ্যসুন্দর মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন ঐতিহাসিকেরা এটিকে 'প্রাচ্যের বিস্ময়' (Wonder of the East) বলে বর্ণনা করেন। জন মার্শালের মতে, স্থাপত্য ও ইসলামি শিল্পকলার উন্নয়ন ও বিকাশে গজনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ইতিহাসে সুলতান মাহমুদের স্থান নির্ণয় করা কঠিন কাজ। সমকালীন মুসলমানদের কাছে তিনি ছিলেন একজন বিজয়ী ধর্মযোদ্ধা বা গাজী। অন্যদিকে হিন্দুদের কাছে তিনি মনুষ্যত্বহীন অত্যাচারী এবং প্রাচীন যুগের বর্বর জাতি হুনদের প্রতিচ্ছায়া। এ পরস্পরবিরোধী মূল্যায়নের প্রেক্ষাপটে ঈশ্বরী প্রসাদ মন্তব্য করেন, "একজন নিরপেক্ষ অনুসন্ধানী তার সম্পর্কে ভিন্ন রায় দেবেন। তিনি নিশ্চিতই মাহমুদকে অনন্যসাধারণ জননায়ক হিসেবে গণ্য করবেন। তিনি ন্যায়বান এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শাসক, একজন অকুতোভয় ও প্রতিভাবান সৈনিক, নীতিনিষ্ঠ ও বিদ্যোৎসাহী এবং পৃথিবী শ্রেষ্ঠ নৃপতিদের অন্যতম গণ্য হওয়ার যোগ্য।"

সুলতান মাহমুদের উত্তরসূরি গজনভি শাসকগণ

The Ghaznavid Successors of the Sultan Mahmud

১০৩০ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান মাহমুদের মৃত্যুর পর গজনির সিংহাসনকে কেন্দ্র করে তার পুত্র মুহাম্মদ ও মাসুদের মধ্যে উত্তরাধিকার যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে মুহাম্মদ পরাজিত হন। মাসুদ বড় ভাই মুহাম্মদকে অন্ধ ও কারারুদ্ধ করে পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ১০৪০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ঈশ্বরী প্রসাদের মতে, "মাসুদ ছিলেন পিতার মতোই উচ্চাভিলাষী, সাহসী এবং যুদ্ধোন্মাদ, অকুতোভয় এবং স্পষ্টভাষী।" ১০৩৭ খ্রিষ্টাব্দে রাজধানীতে তার অনুপস্থিতির সুযোগে সেলজুক তুর্কিরা গজনির বিভিন্ন প্রদেশ আক্রমণ ও লুটতরাজ করতে থাকে। ১০৪০ খ্রিষ্টাব্দে মার্ভের কাছে এক যুদ্ধে মাসুদ তুর্কিদের হাতে পরাজিত হয়ে ভারতবর্ষে আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হন। কিন্তু পথে হিন্দু ও তুর্কি ক্রীতদাসদের বিদ্রোহে তিনি বন্দি হন ও এবং পরে তাকে হত্যা করা হয়। মাসুদের মৃত্যুর পর তার পুত্র মাওদুদ পিতার হত্যাকারী চাচা মুহাম্মদকে পরাজিত করে গজনির

সিংহাসনে আরোহণ করেন। তারপর আরও কয়েকজন দুর্বল শাসক গজনির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তবে ১০৫৯ খ্রিষ্টাব্দে বাহরামের সিংহাসনে আরোহণের মধ্য দিয়ে গজনি সাম্রাজ্য তার লুপ্ত গৌরব কিছুটা ফিরে পায়। ৪০ বছর রাজত্ব করার পর ১০৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ইব্রাহিমের মৃত্যুর পর আলাউদ্দিন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। এ সময় ভ্রাতৃঘাতী সংঘাতে গজনি সাম্রাজ্য আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। ১১১৭ খ্রিষ্টাব্দে সেলজুকদের সহায়তায় বাহরাম সিংহাসন অধিকার করেন। বাহরামের নির্দেশে ঘুর অধিপতি কুতুবউদ্দিন নিহত হলে তার ভাই সাইফুদ্দিন ১১৪৮ খ্রিষ্টাব্দে গজনি আক্রমণ করে বাহরামকে পরাজিত করেন। অবশ্য পরে তিনি গজনি পুনরুদ্ধার করেন। সাইফুদ্দিনকে হত্যা করা হয়। বাহরামের পর খসরু মালিক গজনির সুলতান পদে অভিষিক্ত হন। তিনি ছিলেন ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও অযোগ্য শাসক। ঘুরিদের হাতে গজনির পতন ঘটলে তিনি লাহোরে আশ্রয় নেন। ১১৮৬ খ্রিষ্টাব্দে গজনির মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ বিন সাম (মুহাম্মদ ঘুরি নামে সমধিক পরিচিত) খসরু মালিককে পরাজিত করে লাহোর অধিকার করেন। আর এর মধ্য দিয়ে সবুক্তগীনের প্রতিষ্ঠিত গজনি সালতানাতের পরিসমাপ্তি ঘটে।

গজনি রাজবংশের পতনের কারণ (The Causess of Fall of the Ghaznavid Dynasty)

প্রথমত, ঈশ্বরী প্রসাদ এবং লেনপুল গজনি সাম্রাজ্যের পতনের জন্য সুলতান মাহমুদকে দায়ী করেছেন। তাদের মতে, সুলতান মাহমুদের রাজ্যজয়ের সাথে এর সংহতি বিধান সমান তালে চলেনি। শাসন বা সরকার পরিচালনায়ও তিনি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেননি। ফলে সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের উপাদানসমূহ নিঃশব্দে শক্তি সঞ্চয় করে এবং সুলতান মাহমুদের মৃত্যুর পর সাম্রাজ্যে বিরুদ্ধবাদী শক্তি সচল হয়।

দ্বিতীয়ত, সুলতান মাহমুদের শক্তিধর সাম্রাজ্য তার দুর্বল উত্তরাধিকারীদের হাতে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায় এবং দ্রুত পতনের দিকে ধাবিত হতে থাকে। ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, "গজনি সাম্রাজ্য ছিল নানা জাতির সমষ্টি, এদের নিয়ন্ত্রণে রাখা কেবল সুযোগ্য সুলতানের পক্ষেই সম্ভব ছিল।" দুর্ভাগ্যজনকভাবে সুলতান মাহমুদের পর এরূপ সাহসী ও দূরদর্শী সুলতান না থাকায় গজনি সাম্রাজ্যকে রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

তৃতীয়ত, সুলতান মাহমুদ ভারত থেকে এনে গজনিতে যে বিপুল বিত্তের পাহাড় গড়েন তার উত্তরাধিকারী অযোগ্য শাসকেরা তা ভোগ-বিলাসে ব্যয় করে। বিলাসিতায় গা-ভাসিয়ে দিয়ে তারা অকর্মণ্য হয়ে পড়ে এবং সাম্রাজ্য রক্ষার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

চতুর্থত, বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর মধ্যে স্বার্থ-সংঘাত, বিদ্রোহ, হত্যা ও ষড়যন্ত্রের ফলে গজনি সাম্রাজ্যের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। তদুপরি সেলজুকদের সাথে তাদের দীর্ঘ সংগ্রামের সুযোগে ঘুরিরা শক্তি সঞ্চয় করে মাথা তুলে দাঁড়ায়। সবলের কাছে দুর্বলের পরাজয় ইতিহাসের রায়। গজনি সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ছোট পার্বত্য রাজ্য গজনিকে একটি বিশাল ও সমৃদ্ধিশালী রাজ্যে রূপ দেন কে?
২. 'গজনির নেপোলিয়ন' বলা হয় কাকে?
৩. 'কিতাব-উল-হিন্দ' গ্রন্থের রচয়িতা কে? *[ম. বো. ২০২৩]*
৪. 'শাহনামা' মহাকাব্য রচনা করেন কে? *[ম. বো., দি. বো. ২০২৫; ঢা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৩; ঢা. বো., ম. বো., দি. বো., চ. বো., সি. বো., ব. বো. ২০২২; সি. বো., ব. বো. ২০২১]*
৫. সুলতান মাহমুদ 'স্বর্গীয় বধূ' মসজিদ নির্মাণ করেন কোথায়?
৬. কাদের আক্রমণে গজনি সালতানাতের পরিসমাপ্তি ঘটে?

উত্তরের জন্য ৪৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. সুলতান মাহমুদের কৃতিত্বপূর্ণ দিকগুলো চিহ্নিত করে একটি চার্ট তৈরি করো।
২. গজনি রাজবংশের পতনের কারণগুলো চিহ্নিত করে ছক আকারে লেখো।

পাঠ ১৮ ও ১৯

সুলতান মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরি: ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা (১২০৩-১২০৬ খ্রি.) এবং মুহাম্মদ ঘুরির অভিযানের প্রাক্কালে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা [Sultan Muizuddin Muhammad Ghuri: Foundation the Muslim Rule in India (1203–1206 AD) and Political and Social Conditions of India at the Eve of the Expeditions of Muhammad Ghuri]

ঘুরিদের পরিচয়: আফগানিস্তানের হিরাত ও গজনির মধ্যবর্তী পর্বতসংকুল স্থানে ঘুর রাজ্যটি অবস্থিত ছিল। এ রাজ্যের অধিপতিরা 'ঘুরি' নামে খ্যাত। ঘুরিদের পরিচয় সম্পর্কে ইতিহাসবিদদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। স্ট্যানলি লেনপুলসহ কোনো কোনো ঐতিহাসিক ঘুরিদের 'আফগান জাতিসম্ভূত' বলে অভিহিত করেছেন। তবে অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে, ঘুরিরা ছিল পূর্বাঞ্চলীয় পারসিক জাতি থেকে উদ্ভূত। ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজ ঘুরি বংশকে তাদের পূর্ব পুরুষ শাসনাব-এর নামানুসারে, 'শাসনাবি' বংশ বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুলতান মাহমুদের উত্তরাধিকারী গজনি সুলতানদের মধ্যে গৃহবিবাদ, আন্তঃকলহ ও সেলজুক তুর্কিদের সাথে যুদ্ধের ফলে গজনি সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। এ সুযোগে ঘুরিরা পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করে এবং তারা গজনির সুলতানদের আনুগত্য অস্বীকার করে তাদের সাথে ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়। ক্ষমতার লড়াইয়ে ঘুরি সর্দার মালিক কুতুবউদ্দিন হাসান ও সাইফউদ্দিন ঘুরি গজনির সুলতান বাহরাম শাহের (১১১৭-১১৫২ খ্রি.) কাছে পরাজিত ও নির্মমভাবে নিহত হন। এ ঘটনা ঘুরিদের মধ্যে প্রতিশোধ স্পৃহা জাগিয়ে তোলে। নিহত ঘুরি ভ্রাতৃদ্বয়ের অনুজ আলাউদ্দিন হুসাইন ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে গজনি আক্রমণ করে সুলতান বাহরাম শাহকে বিতাড়িত করেন। আলাউদ্দিন এক সপ্তাহ ধরে লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ করে গজনির ইমরাতসমূহ ধ্বংস এবং অধিকাংশ অধিবাসীদের হত্যা করে ইতিহাসে 'জাহানসুজ' বা 'পৃথিবীদাহক' হিসেবে পরিচিতি পান। ১১৬১ খ্রিষ্টাব্দে আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পর তার পুত্র সাইফউদ্দিন ঘুর রাজ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ সময় ঘুজরা সুলতান খসরু শাহকে পরাজিত করে গজনি দখল করে নেয়। সাইফুদ্দিনের পর তার চাচাতো ভাই গিয়াসউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরি উত্তরাধিকারী হন। ঘুজদের পরাজিত করে তিনি গজনি অধিকার করেন। হিরাত ও কিরমানেও তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। খোরাসানের অংশবিশেষ তার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১১৭৩ খ্রিষ্টাব্দে গিয়াসউদ্দিন তার ভাই মুইজউদ্দিনকে 'শিহাবউদ্দিন' (ধর্মের অগ্নিশিখা) উপাধি দিয়ে গজনির শাসনভার অর্পণ করেন।

সুলতান মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরির পরিচয়: মুহাম্মদ ঘুরির প্রকৃত নাম মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ বিন সাম। তবে তিনি শিহাবউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরি বা মুহাম্মদ ঘুরি নামেই সমধিক পরিচিত। তার সাম্রাজ্যের কেন্দ্র ছিল বর্তমান আফগানিস্তানের ঘুর প্রদেশ। মুহাম্মদ ঘুরি অনন্যসাধারণ সমর প্রতিভাধর ও ক্ষমতাবান শাসক ছিলেন। তার মধ্যে প্রবল উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকলেও বড় ভাই গিয়াসউদ্দিনের প্রতি তার প্রবল আনুগত্য ছিল। তাই ভাইয়ের জীবদ্দশায় গজনির শাসনকর্তার পদ লাভেই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন। ১২০৩ খ্রিষ্টাব্দে গিয়াসউদ্দিনের মৃত্যুর পর তিনি ঘুর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। অবশ্য গজনির শাসনকর্তা থাকা অবস্থায়ই তিনি রাজ্যজয়ে মনোনিবেশ করেন এবং ভারতে অভিযান শুরু করেন। তিনি তৃতীয় পর্যায়ে অভিযান পরিচালনা করে ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম স্থায়ী মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব অর্জন করেন। সংগত কারণেই ইতিহাসবিদরা তাকে ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতার (The real Founder) মর্যাদা দেন।

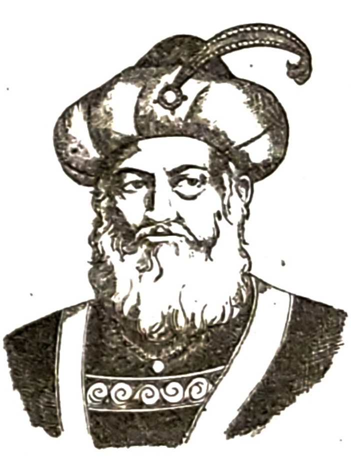

মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরি

মুহাম্মদ ঘুরির অভিযানের প্রাক্কালে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা (Political and Social Conditions of India at the Eve of the Expeditions of Muhammad Ghuri)

মুহাম্মদ ঘুরির অভিযানের সময় ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সন্তোষজনক ছিল না। দ্বন্দ্ব-সংঘাত, রাজনৈতিক অনৈক্য, সামাজিক অসাম্য দেশটিকে চরম বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। এ বিশৃঙ্খল অবস্থার সুযোগ নিয়ে মুহাম্মদ ঘুরি ভারতে অভিযান চালান এবং সফল হন।

রাজনৈতিক অবস্থা (Political Conditions)

মুহাম্মদ ঘুরির আক্রমণের প্রাক্কালে ভারতের রাজনৈতিক অঙ্গনে চরম বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা বিরাজমান ছিল। সমগ্র ভারতে বেশকিছু ক্ষুদ্র রাজ্যের উদ্ভব ঘটে। এর মধ্যে উত্তর-পশ্চিম ভারতে তিনটি মুসলিম ও বেশ কয়েকটি রাজপুত রাজ্যের উপস্থিতি দেখা যায়। তখন শতদ্রু নদী থেকে শোন নদী পর্যন্ত উত্তর ও উত্তর -পশ্চিম ভারতের সমগ্র অঞ্চল রাজপুতদের অধীনে ছিল। সে সময় ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতায় ছিল আজমির ও সম্ভরের চৌহান, মালবের পরমার, চেঁদির কালাচুর, বুন্দেলখণ্ডের চান্দেলা, গুজরাটের চালুক্য, কনৌজের গহরওয়াল, মগধের পাল ও বাংলার সেন বংশ।

পাঞ্জাব: মুহাম্মদ ঘুরির আক্রমণকালে পাঞ্জাব গজনি বংশের শাসক খসরু মালিকের শাসনাধীনে ছিল। সেলজুক তুর্কিদের হাতে গজনির পতনের পর খসরু মালিক পাঞ্জাবে আশ্রয় নেন এবং লাহোরকে রাজধানী করেন। ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও অকর্মণ্য খসরু মালিককে পরাজিত করে মুহাম্মদ ঘুরি পাঞ্জাব জয় করেন।

মুলতান: মুলতান ছিল শিয়া কারামতিয়া মুসলিমদের শাসনাধীনে। সুলতান মাহমুদ মুলতান জয় করেন। তবে তার মৃত্যুর পর কারামতিয়ারা পুনরায় স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

সিন্ধু: তখন সুমার নামক একটি স্থানীয় রাজবংশ সিন্ধু শাসন করত। তারা ছিল শিয়া কারামতিয়া ধর্মমতের অনুসারী।

দিল্লি ও আজমির: মুহাম্মদ ঘুরির আক্রমণের প্রাক্কালে দিল্লি ও আজমির ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী রাজ্য। রাজপুত চৌহান রাজবংশ দিল্লি ও আজমির শাসন করত। চৌহান রাজ বিশালদেবের সময় 'হারাকেলি' ও 'ললিতা বিগ্রহ রাজা' নামের দুটি বিখ্যাত নাটক রচিত হয়েছিল।

কনৌজ: কনৌজ ছিল তদানীন্তন ভারতের অন্যতম শক্তিশালী রাজ্য। এ রাজ্যের রাজপুত শাসকগোষ্ঠী গহরওয়াল বংশ প্রতিবেশী দিল্লি ও আজমির রাজ্যের চৌহান রাজপুতদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল।

বুন্দেলখণ্ড: মুহাম্মদ ঘুরির আক্রমণের প্রাক্কালে চান্দেলা বংশ স্বাধীন বুন্দেলখণ্ড রাজ্য শাসন করত। ঝাঁসি, অজয়গর, কালিঞ্জর এবং মাহবো অঞ্চলগুলো চান্দেলা বংশের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। পরমার্দি দেব দ্বিপেন ছিলেন এ বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা।

গুজরাট: পশ্চিম ভারতের গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য ছিল গুজরাট। এ রাজ্যের শাসকদের বংশ রাজপুত চালুক্য সমকালীন ভারতের অন্যতম শক্তিশালী রাজশক্তি হিসেবে গণ্য হতো। গুজরাটের রাজধানী ছিল আনহিলওয়ার। সামুদ্রিক বাণিজ্যের সুবাদে পশ্চিম উপকূলীয় এ রাজ্যটির অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ছিল। মুহাম্মদ ঘুরির আক্রমণকালে এ রাজ্যের রাজা ছিলেন দ্বিতীয় ভীমদেব।

বিহার: পূর্ব ভারতের বিহার তখন পাল বংশের শাসনাধীনে ছিল। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল বংশ একাদশ শতক থেকে অবক্ষয়ের দিকে যেতে থাকে এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে পতনের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়। এ সময় কর্নাটক থেকে আগত সেনরা পালদের অধিকৃত অঞ্চল দখল করে নিতে থাকে এবং মুহাম্মদ ঘুরির ভারত আক্রমণের সময় পাল শাসন বিহারের একটি ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

বাংলা: এ সময় বাংলা ছিল সেন বংশের শাসনাধীনে। কর্নাটক থেকে আগত সেনরা ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু। বিজয় সেন, বল্লাল সেন ছিলেন এ বংশের খ্যাতিমান শাসক। মুহাম্মদ ঘুরির আক্রমণের সময় লক্ষ্মণ সেন বাংলার শাসক ছিলেন।

মুহাম্মদ ঘুরির অভিযানের প্রাক্কালে উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের রাজ্যগুলো পরস্পর কলহ-বিবাদে লিপ্ত ছিল। রাজনৈতিক অনৈক্য, ভারতীয় রাজন্যবর্গের পারস্পরিক শত্রুতা মুহাম্মদ ঘুরির বিজয় এবং ভারতে স্থায়ী মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকে সহজ করেছিল।

সামাজিক অবস্থা (Social Conditions)

মুহাম্মদ ঘুরির অভিযানের প্রাক্কালে ভারতের সামাজিক অবস্থাও ছিল বিশৃঙ্খল ও অরাজকতাপূর্ণ। অনাচার, পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ও কোন্দলে তখনকার সামাজিক পরিবেশ কলুষিত হয়ে ওঠে। এ সময় বর্ণ ও জাতিভেদ প্রথা হিন্দু সমাজে প্রবল আকার ধারণ করে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এ চারটি প্রধান বর্ণে বিভক্ত হিন্দু সমাজে ঐক্য ও সংহতি চরমভাবে বিনষ্ট হয়। জাত্যাভিমানী উচ্চবর্ণ হিন্দুদের চরম নিপীড়নের ফলে নিম্নবর্ণ হিন্দুদের মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ধর্মীয় ও সামাজিক নিপীড়ন থেকে মুক্তি পেতে নিম্নবর্ণের অনেক হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। উল্লেখ্য যে, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার পাশাপাশি সামাজিক অবক্ষয়ের ফলে ভারতীয়দের মধ্যে ঐক্য চেতনা ও দেশাত্মবোধ গড়ে ওঠেনি। ফলে তারা বহিরাগত আক্রমণকারীদের মোকাবিলায় সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়।

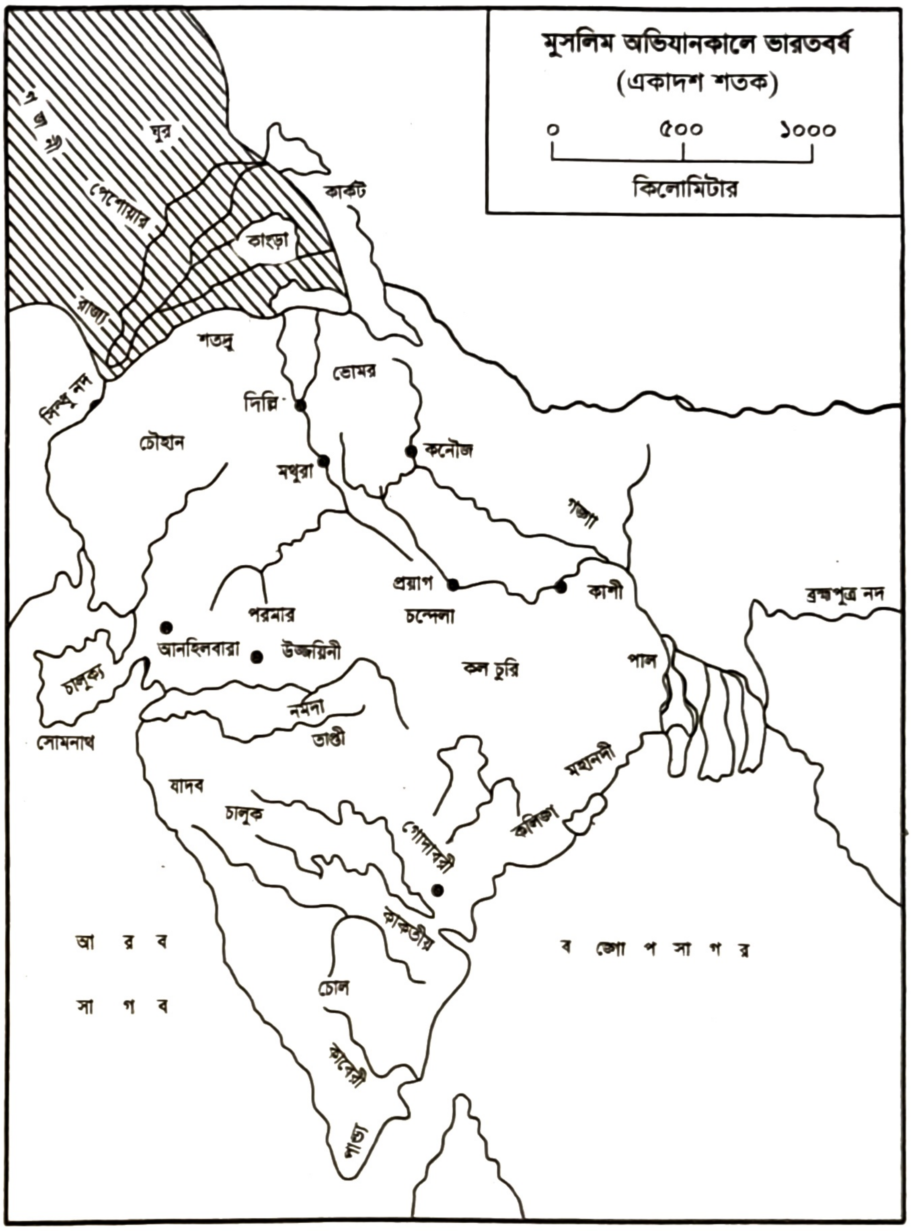
মুসলিম অভিযানকালে ভারতবর্ষ
(একাদশ শতক)
০
৫০০
১০০০
কিলোমিটার
গজনী
ঘুর
পেশোয়ার
রাজ্য
কাংড়া
কাশ্ট
শতদ্রু
সিন্ধু নদ
তোমর
দিল্লি
চৌহান
মথুরা
কনৌজ
গঙ্গা
প্রয়াগ
কাশী
ব্রহ্মপুত্র নদ
পরমার
চন্দেলা
আনহিলবারা
উজ্জয়িনী
কল চুরি
পাল
চালুক্য
সোমনাথ
নর্মদা
তাপ্তী
মহানদী
যাদব
চালুক
গোদাবরী
কলিঙ্গ
কৃষ্ণা
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
চোল
কাবেরী
পান্ড্য

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আফগানিস্তানের হিরাত ও গজনির মধ্যবর্তী পর্বতসংকুল স্থানে কোন রাজ্যটি অবস্থিত ছিল?
২. 'জাহানসুজ' বা 'পৃথিবীদাহক' হিসেবে পরিচিতি পান কে? *[ঢা. বো., ম. বো., দি. বো., চ. বো., সি. বো., ব. বো. ২০২২]*
৩. মুহাম্মদ ঘুরির প্রকৃত নাম কী? *[ম. বো., দি. বো. ২০২৫]*
৪. ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে?
৫. মুহাম্মদ ঘুরির আক্রমণকালে পাঞ্জাব কার শাসনাধীনে ছিল?
৬. মুহাম্মদ ঘুরির অভিযানের সময় দিল্লি ও আজমিরে কোন বংশ শাসন করত?

উত্তরের জন্য ৪৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

মুহাম্মদ ঘুরির অভিযানের সময় ভারতবর্ষের ছোট ছোট রাজ্যগুলোর একটি তালিকা তৈরি করো।

পাঠ ২০

মুহাম্মদ ঘুরির ভারত অভিযানের উদ্দেশ্য বা কারণ
Causes or Intentions of Muhammad Ghuri's Expeditions to India

মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরি ছিলেন একজন সুনিপুণ যোদ্ধা ও বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ। গজনিতে স্বীয় ক্ষমতা সুসংহত করার পর তিনি ভারতে রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। তার ভারত অভিযান পরিকল্পনার পেছনে বিশেষ কিছু উদ্দেশ্য ছিল।

প্রথমত: গজনভিদের মতো ঘুরিদেরও প্রথম বিবেচনা ছিল মধ্য এশিয়ায় সাম্রাজ্য স্থাপন। এ লক্ষ্যে তিনি কয়েকবার খোরাসান আক্রমণ করেন। তবে খাওয়ারিযম শাহের রাজশক্তির কাছে সামরিক ও কূটনৈতিকভাবে পর্যায়ক্রমিক পরাজয়ে হতাশ হয়ে মুহাম্মদ ঘুরি ভারত অভিযানে মনোযোগী হন।

দ্বিতীয়ত: ঘুরিদের কাছে পরাজিত হয়ে গজনি ছেড়ে সুলতান মাহমুদের উত্তরসূরি গজনভিরা খসরু মালিকের নেতৃত্বে পাঞ্জাবে আশ্রয় নিয়ে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। পাঞ্জাবে তাদের উপস্থিতি ভবিষ্যতে ঘুর রাজ্যের বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে বলে মুহাম্মদ ঘুরি মনে করেন। কাজেই নিজ রাজ্যের নিরাপত্তার স্বার্থে মুহাম্মদ ঘুরির জন্য পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল।

তৃতীয়ত: মুহাম্মদ ঘুরির সময় ছিল বীরত্বের যুগ। নতুন ভূখণ্ড অধিকার ও অর্থ-সম্পদ সংগ্রহের মাধ্যমে ব্যক্তিগত বীরত্ব প্রকাশের অভিলাষও তার মধ্যে ছিল। ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, "মুইজউদ্দিনের সহজাতপ্রবণতা ছিল দুঃসাহসিক অভিযান এবং যুদ্ধবিগ্রহের অনুকূলে।" তৎকালীন ভারত ছিল তার অভিলাষ পূরণের এক চমৎকার উর্বর ক্ষেত্র।

চতুর্থত: তদানীন্তন ভারতের হিন্দু রাজন্যবর্গের মধ্যে রাজনৈতিক অনৈক্য, কলহ-বিবাদ, অর্থনৈতিক ও সামরিক দুর্বলতা, শাসকদের মধ্যে নৈতিক মনোবলের অভাব ইত্যাদি লক্ষ করে মুহাম্মদ ঘুরি তার সাফল্যের উজ্জ্বল সম্ভাবনায় উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন। মুহাম্মদ ঘুরি ভারতের বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক অবস্থা ও সামাজিক অবক্ষয়ের প্রেক্ষাপটে সেখানে একটি স্থায়ী রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন বলে ঈশ্বরী প্রসাদ উল্লেখ করেছেন।

পঞ্চমত: সমসাময়িক মুসলিম বিশ্ব বিশেষ করে মধ্য এশিয়ার রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ তথা মোঙ্গল (মোঙ্গলিয়ার অধিবাসী) ভীতি মুহাম্মদ ঘুরিকে ভারত অভিযানে উৎসাহিত করেছিল। মোঙ্গল আক্রমণের আশঙ্কায় শঙ্কিত মুহাম্মদ ঘুরি একটি নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে ভারতকে বিবেচনায় এনেছিলেন বলে অনেক ঐতিহাসিকের মত।

ষষ্ঠত: কোনো কোনো ঐতিহাসিক মুহাম্মদ ঘুরির ভারত আক্রমণের পেছনে ধর্মীয় উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন। তাদের মতে, একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান হিসেবে তিনি হিন্দু অধ্যুষিত ভারতে ইসলাম ধর্মের বিকাশ এবং ভারতে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রকৃত তথ্য বিশ্লেষণ এবং নিরপেক্ষ বিচারে প্রতীয়মান হয় যে, ধর্ম নয় বরং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণেই তিনি ভারত আক্রমণ করেছিলেন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মুহাম্মদ ঘুরি কোথায় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন?
২. কত খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ ঘুরি গজনির শাসনকর্তা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন?
৩. মুহাম্মদ ঘুরি মধ্য এশিয়ায় কার কাছে পরাজিত হন?
৪. মুহাম্মদ ঘুরির অভিযানের সময় পাঞ্জাবের শাসনকর্তা কে ছিলেন?
৫. মুহাম্মদ ঘুরির সময় কীসের যুগ ছিল?
৬. কাদের আক্রমণের ভীতি মুহাম্মদ ঘুরিকে ভারত অভিযানে উৎসাহিত করেছিল?

উত্তরের জন্য ৪৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

মুহাম্মদ ঘুরির ভারত অভিযানের উদ্দেশ্যগুলো চিহ্নিত করে ছক আকারে লেখো।

পাঠ ২১ ও ২২

মুহাম্মদ ঘুরির ভারত অভিযানসমূহ
Muhammad Ghuri's Expeditions to India

মুহাম্মদ ঘুরির উদ্দেশ্য ছিল ভারতে একটি স্থায়ী মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা। এ লক্ষ্যে তিনি সুপরিকল্পিতভাবে ভারতে কিছু অভিযান পরিচালনা করেন। তার অভিযানগুলো হলো—

মুলতান ও সিন্ধু অভিযান: মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরি ১১৭৫ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের মুলতান রাজ্যের বিরুদ্ধে তার প্রথম অভিযান পরিচালনা করেন। মুলতান তখন ইসমাঈলীয় শিয়া কারামতিয়াদের শাসনাধীনে ছিল। মুহাম্মদ ঘুরি তার পূর্বসূরি সুলতান মাহমুদের ব্যবহৃত খাইবার গিরিপথ ব্যবহার না করে গোমেল গিরিপথ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন এবং মুলতান আক্রমণ করে তা দখল করেন। এরপর তিনি ভাট্টি রাজাদের নিয়ন্ত্রণাধীন সিন্ধুর উচ আক্রমণ করে তা দখল করেন।

গুজরাট অভিযান: ১১৭৮ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ ঘুরি সম্পদে সমৃদ্ধ এবং ভারতীয় পশ্চাদভূমির প্রবেশ দ্বার হিসেবে বিবেচিত গুজরাট আক্রমণ করেন। তবে তার এ অভিযান সফল হয়নি। গুজরাটের রাজা দ্বিতীয় ভীমদেবের কাছে মুহাম্মদ ঘুরি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। সৌভাগ্যক্রমে তিনি তার পরাজিত বাহিনী নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।

পাঞ্জাব অধিকার: গুজরাট অভিযানে পরাজিত হয়ে মুহাম্মদ ঘুরি বুঝতে পারেন যে, ভারত আক্রমণে সাফল্যের জন্য খায়বার গিরিপথ ব্যবহার অপরিহার্য। আর এ গিরিপথ ব্যবহারের জন্য মুহাম্মদ ঘুরির কাছে যুদ্ধকৌশলগত কারণে গজনভিদের পাঞ্জাব অধিকার অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হলো। ১১৭৯ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ ঘুরি পেশোয়ার অধিকার করেন। পাঞ্জাবের শাসক খসরু মালিক মুহাম্মদ ঘুরির সাথে চুক্তি সম্পাদন করলে শিয়ালকোটে একটি সেনা ছাউনি স্থাপন করে তিনি গজনি ফিরে যান। ১১৮৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি পুনরায় পাঞ্জাব অধিকারে অগ্রসর হন এবং জম্মুরাজ চক্রদেবের সহায়তায় ১১৮৬ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ ঘুরি কৌশলে খসরু মালিককে পরাজিত করে পাঞ্জাব অধিকার করেন।

রাজপুত রাজাদের সাথে সংঘর্ষ (War with the Rajput Kings)

সিন্ধু, মুলতান ও পাঞ্জাব অধিকার এবং সেখান থেকে বিপুল ধনসম্পদ হস্তগত হওয়ায় মুহাম্মদ ঘুরি বেশ আশান্বিত হন। এমতাবস্থায় তিনি ভারতের মূল ভূখণ্ডে প্রবেশের পরিকল্পনা করেন। এর অংশ হিসেবে তিনি দিল্লি ও আজমিরের চৌহান রাজপুত শক্তির সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন।

তরাইনের প্রথম যুদ্ধ: পাঞ্জাব অধিকার করার পর ভারতে স্থায়ী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুহাম্মদ ঘুরি দিল্লি ও আজমিরের রাজপুত চৌহান বংশের রাজা পৃথ্বিরাজের মুখোমুখি হন। ১১৮৯ খ্রিষ্টাব্দে ভাতিন্দা দখল করে মুহাম্মদ ঘুরি চৌহান রাজের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলে তাকে মোকাবিলার উদ্দেশ্যে পৃথ্বিরাজ উত্তর ভারতের হিন্দু রাজাদের সমন্বয়ে একটি 'কনফেডারেসি' বা ঐক্যজোট গঠন করেন। কনৌজ রাজা জয়চাঁদ ছাড়া প্রায় সব হিন্দু রাজন্য এতে যোগ দেন। ১১৯১ খ্রিষ্টাব্দে থানেশ্বরের কাছাকাছি তরাইনের রণক্ষেত্রে সম্মিলিত বাহিনী ও মুহাম্মদ ঘুরির বাহিনীর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী পরাজিত হয় এবং মুহাম্মদ ঘুরি আহত হয়ে পালিয়ে যান।

তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ: তরাইনের প্রথম যুদ্ধের পরাজয়ের গ্লানি মুহাম্মদ ঘুরিকে প্রতিশোধ স্পৃহায় উদ্দীপ্ত করে তোলে। এ অবস্থায় ১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে ১,২০,০০০ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে তিনি পুনরায় যুদ্ধযাত্রা করেন। মুসলিম বাহিনীর মোকাবিলায় পৃথ্বিরাজ তিন লক্ষ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী সংগঠিত করেন। তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রায় দেড়শ রাজপুত রাজা পৃথ্বিরাজের পতাকাতলে সমবেত হয়েছিলেন বলে ঈশ্বরী প্রসাদ উল্লেখ করেছেন। তরাইন প্রান্তরে উভয় বাহিনী মুখোমুখি হয়। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও মুহাম্মদ ঘুরির উন্নত রণকৌশলের কাছে সম্মিলিত রাজপুত বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। পালিয়ে যাওয়ার সময় রাজা পৃথ্বিরাজ ধরা পড়েন ও পরে নিহত হন।

তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের গুরুত্ব ও ফলাফল: ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ 'এক যুগান্তকারী ঘটনা' (A Land Mark in the History of India)। ভি. এ. স্মিথের মতে, "১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধকে চূড়ান্ত সংঘর্ষ হিসেবে গণ্য করা যায়, যা হিন্দুস্থানের ওপর মুসলিম আধিপত্যের চরম সাফল্যের সূচনা করে।" বস্তুত তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে রাজপুতদের রাজনৈতিক শক্তি খর্ব হয় এবং তারা মুসলমানদের প্রতিরোধ করার শক্তি হারিয়ে ফেলে। ফলে ভারতীয় রাজ্যগুলোর ওপর মুহাম্মদ ঘুরির চূড়ান্ত কর্তৃত্ব সুনিশ্চিত হয় এবং উত্তর ভারতের দিল্লি পর্যন্ত সব শহরের তোরণ তার জন্য উন্মোচিত হয়। বিজয়ী মুহাম্মদ ঘুরি অনায়াসে সামানা, সিরসুত, কুহরাম ও হাঁসি দখল করেন। আনুগত্য প্রকাশ এবং নিয়মিত কর প্রদানের শর্তে আজমিরের শাসনভার পৃথ্বিরাজের পুত্র গোলার ওপর ন্যস্ত করা হয়।

কুতুবউদ্দিন আইবেককে প্রতিনিধি নিয়োগ ও তার বিজয়াভিযান: মুহাম্মদ ঘুরি ভারতে অধিকৃত অঞ্চলগুলোর শাসনভার তার নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত সেনাপতি কুতুবউদ্দিন আইবেককে দিয়ে গজনিতে ফিরে যান। সেনাপতি হিসেবে কুতুবউদ্দিন ছিলেন অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন। তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মিরাট, দিল্লি এবং কোইল (আলীগড়ের নিকটবর্তী) অধিকার করেন। এ সময় লাহোরের পরিবর্তে উপযুক্ত ভৌগোলিক অবস্থান এবং ঐতিহাসিক ঐতিহ্যমণ্ডিত ভারতের দিল্লি নগরীকে মুসলিম রাজ্যের রাজধানী করা হয়।

রাজা জয়চাঁদের বিরুদ্ধে অভিযান: উত্তর ভারতের গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য কনৌজের রাজা ছিলেন জয়চাঁদ। ১১৯৪ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ ঘুরি রাজা জয়চাঁদকে দমনের উদ্দেশ্যে পুনরায় ভারতে আসেন এবং কুতুবউদ্দিন আইবেকের সহায়তায় চান্দওয়ারের (আগ্রা জেলার ফিরোজাবাদের নিকটবর্তী) যুদ্ধজয়ের মাধ্যমে বারানসি ও আসনি (সম্ভবত কনৌজের পূর্বদিকে অবস্থিত) দখল করেন। চান্দওয়ার যুদ্ধে বিজয়ের ফলে সুদূর মুঙ্গের পর্যন্ত বিস্তৃত আরও একটি বৃহৎ রাজ্য ঘুরি সাম্রাজ্যের সাথে যুক্ত হয়।

গোয়ালিয়র ও গুজরাট অধিকার: রাজা জয়চাঁদের বিরুদ্ধে অভিযান শেষে মুহাম্মদ ঘুরি গজনি ফিরে গেলেও তার প্রতিনিধি কুতুবউদ্দিন আইবেক ভারতবর্ষে বিজয়াভিযান অব্যাহত রাখেন। ১১৯৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি প্রতিহার শাসক সুলক্ষ্মণ পালকে পরাজিত করে গোয়ালিয়র দুর্গ অধিকার করেন। অতঃপর তিনি গুজরাটরাজ দ্বিতীয় ভীমদেবকে পরাস্ত করে রাজধানী আনহিলওয়ার হস্তগত করেন।

কালিঞ্জর জয়: কুতুবউদ্দিন আইবেক ১২০২ খ্রিষ্টাব্দে বুন্দেলখণ্ডের রাজপুত চান্দেলারাজ পরমার্দি দেবের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। রাজা পরমার্দি দেব পরাজিত হলে তার সামরিক রাজধানী কালিঞ্জর মুসলিম অধিকারে আসে। মাহাবো ও খাজুরাহো মুসলিম বাহিনীর দখলে আসায় প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতে মুসলিম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাংলা ও বিহার বিজয়: কুতুবউদ্দিন আইবেক যখন উত্তর ভারতে রাজ্য বিস্তারে ব্যস্ত তখন তার সুদক্ষ তুর্কি সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি পূর্ব ভারতের বিহার ও বাংলা অধিকার করেন। ১১৯৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি পাল বংশের শাসক ইন্দ্রমানকে পরাজিত করে বিহারের উদন্তপুর দখল করেন। উদন্তপুর ছিল মূলত একটি বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র। বিহার জয়ের পর ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন নদিয়া আক্রমণ করে সেন বংশের রাজা লক্ষ্মণ সেনকে বিনা বাধায় পরাজিত করে বাংলা জয় করেন। বখতিয়ারের বাংলা জয়ের মধ্য দিয়েই সর্বপ্রথম বাংলায় মুসলিম শাসনের ভিত স্থাপিত হয়। অবশ্য তার তিব্বত জয়ের দুঃসাহসিক অভিযানটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

ভারতীয় বিদ্রোহ দমন: মধ্য এশিয়ার খাওয়ারিযমের শাহ আলাউদ্দিনের কাছে মুহম্মদ ঘুরির পরাজয়জনিত পরিস্থিতিতে ভারতীয় সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে গোলযোগ দেখা দেয়। বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। তবে সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় পাঞ্জাবে। এখানকার খোক্কার জাতি বিদ্রোহী হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করলে মুহাম্মদ ঘুরি চরম বিপদসংকুল পরিস্থিতিতে পড়েন। এরূপ পরিস্থিতিতে তিনি পুনরায় ভারতে আসেন এবং বিদ্রোহীদের পরাজিত করে পাঞ্জাব ও মুলতানে কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি ভারতের অন্যান্য স্থানের বিদ্রোহ দমন করতেও সক্ষম হন।

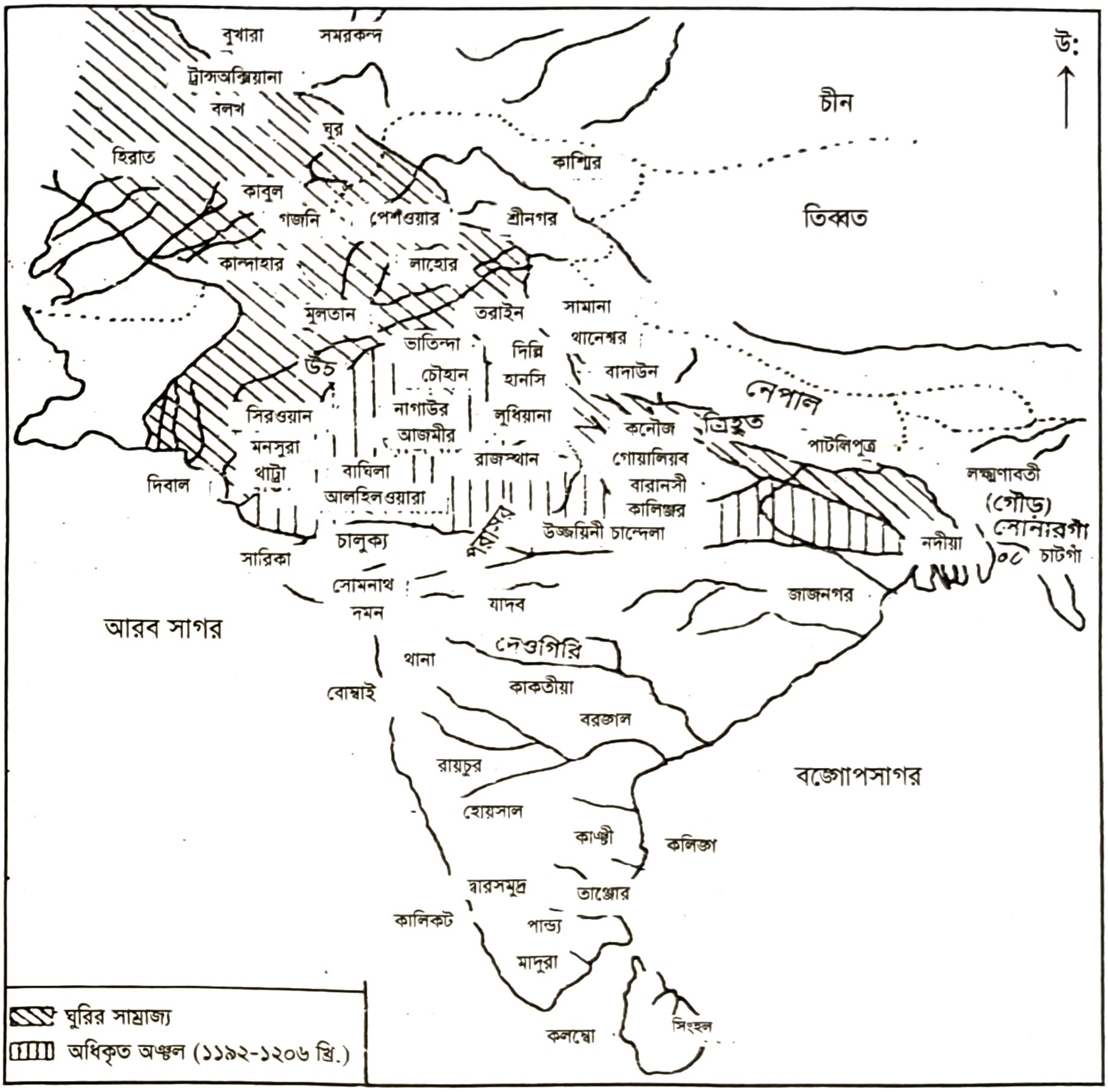
বুখারা
সমরকন্দ
ট্রান্সঅক্সিয়ানা
বলখ
ঘুর
হিরাত
কাবুল
গজনি
পেশওয়ার
কাশ্মির
শ্রীনগর
চীন
তিব্বত
উ:
কান্দাহার
লাহোর
মুলতান
তরাইন
সামানা
থানেশ্বর
ভাতিন্দা
দিল্লি
উচ
চৌহান
হানসি
বাদাউন
নেপাল
সিরওয়ান
নাগাউর
আজমীর
লুধিয়ানা
কনৌজ
ত্রিহুত
পাটলিপুত্র
মনসুরা
থাট্টা
বাঘিলা
রাজস্থান
গোয়ালিয়র
দিবাল
আলহিলওয়ারা
বারানসী
কালিঞ্জর
লক্ষ্মণাবতী
(গৌড়)
সোনারগাঁ
উজ্জয়িনী চান্দেলা
চালুক্য
সারিকা
নদীয়া
চাটগাঁ
সোমনাথ
দমন
যাদব
জাজনগর
আরব সাগর
দেওগিরি
থানা
কাকতীয়া
বোম্বাই
বরঙ্গল
রায়চুর
বঙ্গোপসাগর
হোয়সাল
কাঞ্চী
কলিঙ্গা
দ্বারসমুদ্র
তাঞ্জোর
কালিকট
পান্ড্য
মাদুরা
কলম্বো
সিংহল
▨ ঘুরির সাম্রাজ্য
▥ অধিকৃত অঞ্চল (১১৯২-১২০৬ খ্রি.)

মুহাম্মদ ঘুরির আমলে ভারতবর্ষ

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. পৃথ্বিরাজ কোন বংশের রাজা ছিলেন? *[ঢা. বো., য. বো. ২০২১]*
২. তরাইনের যুদ্ধে ভারতীয় বাহিনীর নেতৃত্ব দেন কে? *[সকল বোর্ড ২০২৫]*
৩. তরাইনের প্রথম যুদ্ধ কত খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়?
৪. কত খ্রিষ্টাব্দে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়? *[ঢা., রা., চ. বো. ২০১৭]*
৫. বখতিয়ার খলজি সেন বংশের কোন রাজাকে পরাজিত করেন? *[ঢাবি ২০১৭-১৮; ঢাবি অধিভুক্ত ৭ কলেজ ২০১৭-১৮]*
৬. বাংলায় মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠাতা কে?

উত্তরের জন্য ৪৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. ভারতে মুহাম্মদ ঘুরির সুপরিকল্পিত অভিযানসমূহের একটি তালিকা তৈরি করো।
২. ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের তাৎপর্য সম্পর্কে তোমার মতামত উপস্থাপন করো।

পাঠ ২৩

ভারত অভিযানে মুহাম্মদ ঘুরির সাফল্যের কারণ
Causes of the Success of Muhammad Ghuri's Expeditions to India

ভিনসেন্ট স্মিথ, স্ট্যানলি লেনপুল প্রমুখ ঐতিহাসিকেরা মনে করেন ভারতীয় নিরামিষভোজী হিন্দু রাজপুতদের তুলনায় আমিষভোজী তুর্কিরা শারীরিক যোগ্যতায় সামর্থ্যবান, সুদক্ষ ও কর্মঠ ছিল, যা তাদের সাফল্যের কারণ। তবে বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে এ মত গ্রহণযোগ্য নয়। মূলত মুহাম্মদ ঘুরির সাফল্য এবং ভারতীয় হিন্দু রাজন্যদের ব্যর্থতার পেছনে নানাবিধ কারণ ছিল।

প্রথমত, এ সময় ভারতে চরম রাজনৈতিক অনৈক্য এবং রাজন্যদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও কলহ বিরাজমান ছিল। দেশের এ রাজনৈতিক অনৈক্য (Lack of Political Unity) নিঃসন্দেহে মুসলিম বাহিনীর সাফল্য ও হিন্দুদের ব্যর্থতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল। ভি. ডি. মহাজন যথার্থই বলেছেন, "There was no one paramount power in the country at that time which could fight against the Muslims."[২১]

দ্বিতীয়ত, মুসলমানদের উন্নত সামরিক সংগঠন, আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র, শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা এবং ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন অশ্বারোহী বাহিনী তাদের সাফল্যের অন্যতম কারণ। সৈনিক যোদ্ধা হিসেবে সমকালীন রাজপুতদের বিশ্বজোড়া খ্যাতি ছিল, তবে তাদের ত্রুটিপূর্ণ অনুন্নত সামরিক সংগঠন, সনাতন যুদ্ধরীতি এবং একক নেতৃত্বের অভাব তাদের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। তাদের মন্থরগতির হস্তিবাহিনী ক্ষিপ্রগতির অশ্বারোহী বাহিনীর মোকাবিলায় অকার্যকর প্রমাণিত হয়। মুসলমানদের আগ্রাসী (Offensive) নীতি এবং হিন্দুদের আত্মরক্ষামূলক (Defensive) রণনীতিও তাদের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ বলে ঐতিহাসিকেরা মনে করেন।

তৃতীয়ত, ঈশ্বরী প্রসাদ রাজপুত এবং মুসলমানদের মধ্যকার যুদ্ধকে দুটি বিপরীতধর্মী সামাজিক শক্তির মধ্যকার সংঘাত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, যার একটি হচ্ছে পুরোনো অবক্ষয়ী এবং অন্যটি তারুণ্য উদ্দীপ্ত তেজস্বী ও উদ্যোগী। আর তারুণ্য উদ্দীপ্ত নতুনের কাছে জরাগ্রস্ত পুরোনো অবক্ষয়ী শক্তির পতন অনিবার্য।

চতুর্থত, জাতি ও বর্ণভেদ প্রথা ভারতীয় হিন্দুদের মধ্যে প্রচণ্ড সামাজিক বৈষম্য তৈরি করেছিল। ফলে তাদের মধ্যে অভিন্ন জাতীয় চেতনা গড়ে ওঠেনি। অন্য দিকে ইসলামের সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ মুসলমানরা সংঘবদ্ধভাবে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। ফলে তাদের বিজয় অনিবার্য হয়ে ওঠে।

পঞ্চমত, মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় প্রেরণা ও উদ্দীপনা তাদের সাফল্যের বিশেষ কারণ। মুসলিম যোদ্ধাদের কাছে হিন্দু ভারতীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ছিল ধর্মযুদ্ধস্বরূপ। এতে মৃত্যু হলে শহিদ হিসেবে পারলৌকিক মুক্তি আর বিজয়ী হলে গাজির মর্যাদা লাভের আশা তাদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। প্রতিপক্ষ হিন্দুদের সামনে এরূপ কোনো প্রেরণা ছিল না। তাছাড়া ধনৈশ্বর্যে পরিপূর্ণ ভারতে প্রতিটি অভিযানে বিপুল গনিমত পাওয়ার প্রলোভন মুসলিম তুর্কি বাহিনীকে দুর্জেয় করে তুলেছিল।

জেনে রাখো

মহান আল্লাহর মনোনীত একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হচ্ছে ইসলাম। এর অর্থ আনুগত্য, আত্মসমর্পণ, শান্তির পথে চলা। এতে মহান আল্লাহ মানুষের জীবন পরিচালনার সার্বিক দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। ইসলামের সুমহান শিক্ষা মানুষকে শান্তি, ন্যায় ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করে। মানুষের ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির জন্য ইসলামের শিক্ষা অনুসরণ করা অপরিহার্য।

ষষ্ঠত, ক্রীতদাস বাহিনী মুসলমানদের শক্তি বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছিল। মুসলমানদের মধ্যে কুতুবউদ্দিন আইবেক, বখতিয়ার খলজির মতো অনেক ক্রীতদাস সেনাপতির আবির্ভাব ঘটেছিল, যারা তাদের প্রভুদের মতো রণক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়ে মুসলমানদের বিজয় ত্বরান্বিত করেছিলেন।

---

[২১] V.D. Mahajan; *Muslim Rule in India,* P. 78.

মুহাম্মদ ঘুরির ভারত অভিযানের ফলাফল: মুহাম্মদ ঘুরির ভারত অভিযানের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। মুহাম্মদ বিন কাসিম এবং সুলতান মাহমুদের বিজয়াভিযানের মাধ্যমে ভারতবর্ষে স্থায়ী মুসলিম শাসনের পথ তৈরি না হলেও মুহাম্মদ ঘুরির ভারত অভিযানের ফলে যে মুসলিম শাসনের সূত্রপাত হয়েছিল তা সুলতানি ও মুঘল শাসনামলে প্রসারিত হয়েছিল। এ জয়ের ফলে ভারতে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে ইসলামের যাত্রা শুরু হয়। তখন থেকে ভারতে আব্বাসি প্রশাসন ও স্থানীয়দের সমন্বয় করে যে প্রশাসনব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তা এ অঞ্চলের জনগণকে সাম্যভিত্তিক শাসনের অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। এ সাম্যের কারণেই নিম্নবর্ণের হিন্দুরা দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। মুসলিম বিজয়ের ফলে শাসকবর্গের প্রয়োজন মেটাতে আরব, পারস্য, তুর্কি, অঞ্চল থেকে পণ্য আমদানি শুরু হলে এ অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ঘটে এবং নানা শিল্পের বিকাশ ঘটে। তাছাড়া মুসলমানদের উন্নত জীবনধারার প্রভাবে স্থানীয় কারিগর শ্রেণির জীবনমান উন্নত হতে থাকে। এ জয়ের ফলেই ভারতে উন্নত মুসলিম শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটে এবং নতুন ধারার স্থাপত্য নির্মাণের সূত্রপাত ঘটে। সর্বোপরি এ বিজয়ের ফলে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির সম্মিলন ঘটে এবং পরবর্তী সময়ে এ পথ ধরেই নানা ধর্মভিত্তিক আন্দোলন প্রসারিত হয়।

জেনে রাখো

একনজরে মুহাম্মদ ঘুরি

- আফগানিস্তানের হিরাত ও গজনির মধ্যবর্তী ঘুর রাজ্যের অধিপতি ছিলেন।
- ভারতে স্থায়ী মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।
- প্রকৃত নাম মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ বিন সাম।
- শাসনকাল- ১২০৩ থেকে ১২০৬ খ্রি. পর্যন্ত।
- ১১৯১ খ্রিষ্টাব্দে তরাইনের প্রথম যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং চৌহান রাজা পৃথ্বিরাজ ও সম্মিলিত রাজপুত বাহিনীর কাছে পরাজিত হন।
- ১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে চৌহান রাজা পৃথ্বিরাজ ও সম্মিলিত রাজপুত বাহিনীকে পরাজিত করেন।
- ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে ঘুরির বিশ্বস্ত সেনাপতি ও ভারতের বিজিত অঞ্চলের রাজপ্রতিনিধি কুতুবউদ্দিন আইবেকের নির্দেশে সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি বাংলা ও বিহার জয় করেন।
- ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মুহাম্মদ ঘুরির ভারত অভিযানে কোন বাহিনী মুসলমানদের শক্তি বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছিল?
২. মুহাম্মদ ঘুরির সাথে যুদ্ধে হিন্দুদের রণনীতি কীরূপ ছিল?
৩. হিন্দু ভারতীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ মুসলিম যোদ্ধাদের কাছে কী স্বরূপ ছিল?
৪. ভারতবর্ষে স্থায়ী মুসলিম শাসনের পথ তৈরি হয় কখন?
৫. ভারতে স্বাধীন মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন কে? *[রা. বো., কু. বো., য. বো. ২০২২]*
৬. সাম্যনীতির কারণে কারা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেছিল?

উত্তরের জন্য ৪৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

ভারত অভিযানে মুহাম্মদ ঘুরির সাফল্যের কারণগুলো ছক আকারে লেখো।

পাঠ ২৪

মুহাম্মদ ঘুরির চরিত্র ও কৃতিত্ব
Character and Achievements of Muhammad Ghuri

মানুষ হিসেবে মুহাম্মদ ঘুরি অনুপম চরিত্র ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। দৃঢ় মনোবল, আত্মপ্রত্যয়, ধর্মনিষ্ঠা, সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা ও দানশীলতা তার উল্লেখযোগ্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল। ঐতিহাসিক আবুল কাসিম ফিরিস্তা তাকে আল্লাহভীরু, সত্যনিষ্ঠ এবং প্রজারঞ্জক সুলতান হিসেবে অভিহিত করেছেন। ইতিহাসে তার পরধর্মসহিষ্ণুতার প্রমাণ পাওয়া যায়। সততা ও বিশ্বস্ততা তার চরিত্রের উজ্জ্বল দিক ছিল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গিয়াসউদ্দিনের প্রতি তার আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা ইতিহাসে তাকে বিশেষ পরিচিতি দিয়েছে। তার চরিত্রে কোমলতার দিকটিও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অনুচরদের প্রতি পিতৃসুলভ স্নেহ এবং শত্রুদের প্রতি প্রতিশোধ স্পৃহার পরিবর্তে দয়া প্রদর্শনের দৃষ্টান্ত ইতিহাসবিদদের দৃষ্টি এড়ায়নি। মুহাম্মদ ঘুরি গজনির ধ্বংসাবশেষের ওপর ঘুর রাজ্য এবং ভারতীয় উপমহাদেশে স্থায়ী মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। ঐতিহাসিকগণ তাকে অনন্য কৃতিত্বের অধিকারী বলে মত দিয়েছেন।

রাষ্ট্রনায়ক ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা: মুহাম্মদ ঘুরি ছিলেন একজন দূরদর্শী ও বাস্তববাদী রাজনীতিবিদ। তার লক্ষ্য ছিল ভারতে স্থায়ী মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা। তিনি ভারতের বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন এবং কোনো পরাজয়ে হতোদ্যম না হয়ে লক্ষ্য বাস্তবায়নে অবিচল দৃঢ়তার পরিচয় দেন। ফলে তিনি বাংলা থেকে আফগানিস্তান পর্যন্ত একটি বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। ভারতে তিনি যে মুসলিম সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন তা প্রায় ৭০০ বছর স্থায়ী হয়েছিল। শুধু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা নয়, একটি সুষ্ঠু ও ন্যায়সংগত শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

সমরনেতা ও সংগঠক: মুহাম্মদ ঘুরি ছিলেন অসাধারণ সামরিক প্রতিভার অধিকারী। এ.বি.এম. হবিবুল্লাহ বলেন, "শীর দরিয়া থেকে যমুনা পর্যন্ত প্রায় সাংবাৎসরিক সামরিক অভিযান তার সমরকুশলতা উল্লেখযোগ্যরূপে প্রমাণ করে।" প্রতিভা আবিষ্কারে ঘুরি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তিনি কুতুবউদ্দিন আইবেক, ইয়ালদুজ ও তুগ্রিলের মতো প্রশিক্ষিত ব্যক্তিদের তার বিজয়াভিযান ও রাজ্য সংগঠনে সাফল্যের সাথে কাজে লাগাতে সক্ষম হন। অনেকেই মনে করেন, মুহাম্মদ ঘুরি তার বিশ্বস্ত ক্রীতদাস ও সেনাপতি কুতুবউদ্দিন আইবেককে ভারতবর্ষের অধিকৃত অঞ্চলে প্রতিনিধি শাসক নিযুক্ত না করলে ভারতে তথাকথিত দাস বংশ প্রতিষ্ঠিত হতো না এবং মুসলমানদের স্থায়ী সাম্রাজ্য বা রাজনৈতিক কাঠামোও প্রতিষ্ঠিত হতো না।

শিল্প ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক: প্রখ্যাত জ্ঞানতাপস দার্শনিক ফখরুদ্দিন আল রাজি, ক্লাসিক্যাল কবি নিজামী ও উরুযী মুহাম্মদ ঘুরির দরবার অলংকৃত করেছিলেন। তার প্রতিনিধি কুতুবউদ্দিন আইবেক আজমিরে 'আড়াই দিনকা ঝোপড়া মসজিদ' এবং দিল্লিতে 'কুওয়াতুল ইসলাম' নামে যে মসজিদ নির্মাণ করেন তা ভারতে ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যরীতির সূচনা করে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. রাজনীতিবিদ হিসেবে মুহাম্মদ ঘুরি কেমন ছিলেন?
২. মুহাম্মদ ঘুরি ভারতবর্ষে যে মুসলিম সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন তা কত বছর স্থায়ী হয়েছিল?
৩. মুহাম্মদ ঘুরি ভারতবর্ষের অধিকৃত অঞ্চলে কাকে তার প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন?
৪. মুহাম্মদ ঘুরি কোথায় একটি বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন?
৫. কুতুবউদ্দিন আইবেক, ইয়ালদুজ ও তুগ্রিল-এরা কার সেনাপতি ছিলেন?
৬. ভারতে ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যরীতির সূচনা করেন কে?

উত্তরের জন্য ৪৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

তুমি কেন মুহাম্মদ ঘুরিকে একজন সফল সংগঠক হিসেবে আখ্যায়িত করবে? পাঁচটি যৌক্তিক কারণ লেখো।

পাঠ ২৫

মুহাম্মদ ঘুরি ও সুলতান মাহমুদের তুলনা এবং ঘুরি বংশের পতন Comparison between Muhammad Ghuri and Sultan Mahmud and Fall of the Ghuri Dynasty

মুহাম্মদ ঘুরি ও সুলতান মাহমুদের তুলনা
Comparison between Muhammad Ghuri and Sultan Mahmud

মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাসে গজনির সুলতান মাহমুদ ও সুলতান মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরি উভয়েই সমরনায়ক, রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে অনন্যসাধারণ প্রতিভাধর ব্যক্তি ছিলেন। অনুপম চারিত্রিক মাধুর্য বিবেচনায়ও তারা ছিলেন বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। তবে উভয়ের সামগ্রিক কীর্তি বিবেচনায় তাদের মধ্যে বিশেষ কিছু বৈসাদৃশ্য দেখা যায়।

প্রথমত, ব্যক্তিগত শৌর্যবীর্য ও রণনৈপুণ্যে সুলতান মাহমুদ ও মুহাম্মদ ঘুরির বিশেষ খ্যাতি ছিল। তবে সেনাপতি ও সমরনায়ক হিসেবে সুলতান মাহমুদ অধিকতর সফল ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন অপরাজেয় বিজেতা। মধ্য এশিয়া বা ভারত অভিযানসমূহে তাকে কখনও পরাজয়ের গ্লানি বরণ করতে হয়নি। অন্যদিকে মুহাম্মদ ঘুরি গুজরাট অভিযান, তরাইনের প্রথম যুদ্ধ এবং মধ্য এশিয়ার অভিযানে পরাজয় বরণ করেন।

দ্বিতীয়ত, সুলতান মাহমুদ ও মুহাম্মদ ঘুরির অভিযানের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। ভারত জয় করে সেখানে স্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা মাহমুদের লক্ষ্য ছিল না। ভারতের অগাধ ধনরত্ন ও ঐশ্বর্য সংগ্রহ করে গজনিকে সমৃদ্ধ করার বাসনায় তাড়িত হয়ে তিনি বার বার ভারত আক্রমণ করেন এবং ঘূর্ণিঝড়ের মতো সবকিছু তছনছ করে বিপুল পরিমাণ ধনরত্ন নিয়ে স্বদেশে ফিরে যান। অন্যদিকে মুহাম্মদ ঘুরি ছিলেন বাস্তববাদী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাষ্ট্রনায়ক। শুধু ভারতের ধনসম্পদ কুক্ষিগত করা নয়, সেখানে স্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তার মুখ্য উদ্দেশ্য। বলা আবশ্যক যে, ঘুরি সুলতান মাহমুদ অপেক্ষা অধিকতর কুশলী ছিলেন। তিনি তদানীন্তন ভারতের দুর্বলতা ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন এবং ভারতে স্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য বাস্তবায়নে সফল হন।

তৃতীয়ত, সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের পেছনে খানিকটা ধর্মীয় আবেগ ছিল বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন। এমনকি তিনি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অর্জনে ধর্মকে ব্যবহার করেন বলেও অভিযোগ করা হয়। কিন্তু মুহাম্মদ ঘুরির ক্ষেত্রে ধর্মান্ধতার অভিযোগ নেই। তিনি ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন সত্য, তবে ধর্মান্ধ ছিলেন না। ধর্ম তার রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিকে আচ্ছাদিত করতে পারেনি।

চতুর্থত, উভয় শাসকই জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলার অনুরাগী ছিলেন। তবে শিল্প, সংস্কৃতি চর্চা ও পৃষ্ঠপোষকতায় সুলতান মাহমুদ মুহাম্মদ ঘুরি অপেক্ষা অনেক বেশি সফল ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন। গজনিকে অনিন্দ্যসুন্দর নগরীতে রূপদানই এর প্রমাণ দেয়। মসজিদ, পাঠাগার, প্রাসাদ নির্মাণে তিনি বিশেষ সুরুচির পরিচয় দিয়েছেন সমরপ্রতিভা, জ্ঞান-গরিমা ও যশ-খ্যাতির সার্বিক বিবেচনায় সুলতান মাহমুদ ইতিহাসে মুহাম্মদ ঘুরি অপেক্ষা খ্যাতিমান ও শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আসীন হয়ে আছেন সন্দেহ নেই। তবে ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাসে ঘুরির অবদান সুলতান মাহমুদ অপেক্ষা অনেক বেশি। ভারতে আক্রমণকারী হিসেবে নয় বরং স্থায়ী মুসলিম সাম্রাজ্যের স্থপতি হিসেবে মুহাম্মদ ঘুরির নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ঘুরি বংশের পতন (Fall of the Ghuri Dynasty)

মুহাম্মদ ঘুরির মৃত্যু: অসাধারণ রণনিপুণতা ও দৃঢ় প্রত্যয়ে মুহাম্মদ ঘুরি গজনি, ঘুর ও দিল্লির অধিপতি হন। এরপর মধ্য এশিয়ায় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আশায় তিনি খাওয়ারিযম শাহের সাথে যুদ্ধ করে পরাজিত হন। এ সংবাদে পাঞ্জাব, মুলতান ও অন্যান্য স্থানে বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং তারা স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এরূপ পরিস্থিতিতে ঘুরি সেনাপতি কুতুবউদ্দিনের

সহায়তায় সব বিদ্রোহ দমন করেন এবং গজনি ও মুলতান পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু বিদ্রোহ দমন শেষে গজনি ফিরে যাওয়ার পথে ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ মার্চ সিন্ধুনদের তীরবর্তী দামায়াকায় মাগরিবের নামাজরত অবস্থায় একজন খোক্কার বংশীয় আততায়ীর হাতে তিনি নিহত হন।

মুহাম্মদ ঘুরি অপুত্রক ছিলেন। ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে ঘুরির মৃত্যুর পর তার ভ্রাতুষ্পুত্র মাহমুদ ঘুরি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল ও অযোগ্য শাসক। তার দুর্বলতার সুযোগে মুহাম্মদ ঘুরির সহযোগী তাজউদ্দিন ইয়ালদুজ গজনিতে, নাসিরউদ্দিন কুবাচা সিন্ধুতে এবং কুতুবউদ্দিন আইবেক দিল্লিতে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। দুর্বলচিত্ত মাহমুদ ঘুরির পক্ষে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি। তদুপরি তার মৃত্যুর পর সিংহাসনকে কেন্দ্র করে যে গৃহবিবাদ শুরু হয়, সে সুযোগে খাওয়ারিযম শাহ ঘুর রাজ্য দখল করে নেন। ফলে ঘুরি বংশের শাসনের অবসান ঘটে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মধ্য এশিয়া বা ভারত অভিযানসমূহে কখনও পরাজয়বরণ করেননি কে?
২. সুলতান মাহমুদের লক্ষ্য কী ছিল?
৩. মুহাম্মদ ঘুরির উদ্দেশ্য কী ছিল?
৪. গজনি, ঘুর ও দিল্লির অধিপতি হয়েছিলেন কে?
৫. মুহাম্মদ ঘুরি কত খ্রিষ্টাব্দে মারা যান?
৬. মুহাম্মদ ঘুরির মৃত্যুর পর কে ঘুর রাজ্য দখল করেন?

উত্তরের জন্য ৪৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

ঘুরি বংশের পতনের কারণগুলো ছকে উপস্থাপন করো।

গ. দলীয় কাজ

দুটি দলে বিভক্ত হয়ে সফল শাসক হিসেবে মুহাম্মদ ঘুরি ও সুলতান মাহমুদের কৃতিত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর আলোকে দুটি স্লাইড তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করো।

ঘ. বাড়ির কাজ

১৭৯৫ সালে ডাইরেক্টরি শাসক নিযুক্ত হয়ে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট একটি চমৎকার ফরাসি পররাষ্ট্র নীতি উপহার দেন। তিনি একে একে ইতালি, সার্ডোনিয়া, স্যান্টুয়া, লোম্বার্ডি, ভেলিশিয়া, আইওনিয়া, মিসর প্রভৃতি দেশে সফল অভিযান পরিচালনা করেন। এসব অঞ্চলে পরবর্তী সময়ে ফরাসি সংস্কৃতির ব্যাপক প্রভাব পড়ে। এছাড়া তিনি ফরাসি জাতিকে একটি সাম্রাজ্য উপহার দিয়েছিলেন। শিক্ষা, সংস্কৃতির উন্নয়ন, স্থাপত্য, মনোরম অট্টালিকা তৈরি করে তিনি প্যারিসকে একটি সংস্কৃতির আধারে পরিণত করেছিলেন। নেপোলিয়নের সামরিক সফলতার নেপথ্যে তৎকালীন রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা, দক্ষ সমরকুশলতা, সুনিপুণ সৈন্যবাহিনী ও দক্ষ নেতৃত্বই প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছিল।

১. নেপোলিয়নের সাথে সুলতান মাহমুদের কোন দিক দিয়ে সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
২. নেপোলিয়নের সামরিক সফলতার কারণগুলো মুহাম্মদ ঘুরির সামরিক সফলতার প্রতিচ্ছবি— বিশ্লেষণ করো।

পাঠ মূল্যায়নের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর

পাঠ ১: ১. মধ্য দক্ষিণে; ২. গ্রিকরা; ৩. বিন্ধ্য পর্বত; ৪. দ্রাবিড়; ৫. আইরিশ ইতিহাসবিদ ভিন্‌সেন্ট স্মিথ (Vincent Arthur Smith); ৬. প্রাচীন যুগ।

পাঠ ২: ১. মৌর্য সম্রাট মহারাজ অশোক (২৭৩-২৩২ খ্রি.পূ.); ২. গ্রাম; ৩. তিনটি; ৪. প্রাচীন অর্থশাস্ত্রবিদ কৌটিল্য; ৫. অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির; ৬. সম্পদ বন্টন ও ভোগের।

পাঠ ৩: ১. চারটি; ২. যুদ্ধ; ৩. শূদ্ররা; ৪. হিন্দু; ৫. ভারতীয়রা; ৬. খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতকে।

পাঠ ৪: ১. বণিকদের; ২. মালাবারে; ৩. হিন্দু রাজা জামোরিন; ৪. দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা); ৫. অষ্টম; ৬. সিন্ধু ও মুলতান।

পাঠ ৫: ১. আল-ওয়ালিদ; ২. রাজা দাহির; ৩. মুহাম্মদ বিন কাসিম; ৪. হাজ্জাজ বিন ইউসুফ; ৫. আলোর; ৬. সিন্ধুর দেবল বন্দরে।

পাঠ ৬: ১.৭১২; ২. আল আক্‌স বা 'বধূ' (Manjanik); ৩. দাহিরের স্ত্রী রানি বাঈ; ৪. মুলতানকে; ৫. ৭১৩; ৬. জাঠ ও মেঠ।

পাঠ ৭ ও ৮: ১. সিন্ধু; ২. স্ট্যানলি লেনপুল (Stanley Lanepoole); ৩. সাংস্কৃতিক; ৪. ভারতীয় পণ্ডিত ব্রহ্মগুপ্ত; ৫. ভারতীয়দের; ৬. আল-বিরুনি।

পাঠ ৯: ১. প্রায় তিন বছর; ২. ইসলামের সাম্য ও মৈত্রী নীতি; ৩. ইয়াজিদ বিন মুহাল্লাবকে; ৪. দেড় কোটি; ৫.মুফতি; ৬. পঞ্চায়েতের।

পাঠ ১০: ১. গজনির তুর্কি বীর সুলতান মাহমুদ; ২. সবুক্তগীন; ৩. গজনি রাজবংশ; ৪. ৯৯৭; ৫. সুলতান মাহমুদের; ৬. খলিফা কাদির বিল্লাহর (৯৯১-১০৩১ খ্রি.)।

পাঠ ১১ ও ১২: ১. ১৭ বার (১০০০-১০২৭ খ্রি.); ২. সুলতান মাহমুদ; ৩. সুলতান মাহমুদ; ৪. অর্থনৈতিক; ৫. জয়পাল; ৬. খায়বার পাস সীমান্তে।

পাঠ ১৩ ও ১৪: ১. ১০০০; ২. পিতৃশত্রু জয়পাল; ৩. রাজা আনন্দপাল; ৪. থানেশ্বর মন্দিরে; ৫. সোমনাথ মন্দির আক্রমণ; ৬. ভারতের গুজরাটে।

পাঠ ১৫: ১. সুলতান মাহমুদ; ২. পাঞ্জাব; ৩. অনৈক্য ও অরাজকতা; ৪. জিহাদের প্রেরণা; ৫. গজনি; ৬. গজনি।

পাঠ ১৬ ও ১৭: ১. সুলতান মাহমুদ; ২. সুলতান মাহমুদকে; ৩. আল-বিরুনি; ৪. মহাকবি আবুল কাসেম ফেরদৌসি; ৫. গজনিতে; ৬. ঘুরিদের।

পাঠ ১৮ ও ১৯: ১. ঘুর; ২. আলাউদ্দিন হুসাইন; ৩. মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ বিন সাম; ৪. মুহাম্মদ ঘুরি; ৫. গজনি বংশের শাসক খসরু মালিক; ৬. রাজপুত চৌহান রাজবংশ।

পাঠ ২০: ১. মধ্য এশিয়ায়; ২. ১১৭৩; ৩. খাওয়ারিযম শাহ; ৪. খসরু মালিক; ৫. বীরত্বের; ৬. মোঙ্গলদের।

পাঠ ২১ ও ২২: ১. রাজপুত চৌহান; ২.পৃথ্বিরাজ; ৩. ১১৯১; ৪. ১১৯২; ৫. লক্ষ্মণ সেন; ৬. ইখতিয়ারউদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি।

পাঠ ২৩: ১.ক্রীতদাস বাহিনী; ২. আত্মরক্ষামূলক; ৩. ধর্মযুদ্ধস্বরূপ; ৪. মুহাম্মদ ঘুরির ভারত অভিযানের পর; ৫. কুতুবউদ্দিন আইবেক; ৬. নিম্নবর্ণের হিন্দুরা।

পাঠ ২৪: ১. দূরদর্শী ও বাস্তববাদী; ২. প্রায় ৭০০ বছর; ৩. বিশ্বস্ত ক্রীতদাস ও সেনাপতি কুতুবউদ্দিন আইবেককে; ৪. বাংলা থেকে আফগানিস্তান পর্যন্ত; ৫. মুহাম্মদ ঘুরির; ৬. কুতুবউদ্দিন আইবেক।

পাঠ ২৫: ১. সুলতান মাহমুদ; ২. গজনিকে সমৃদ্ধ করা; ৩. স্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা; ৪. মুহাম্মদ ঘুরি; ৫. ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ মার্চ; ৬. খাওয়ারিযম শাহ।

৫ এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

উপমহাদেশ	উপমহাদেশ বলতে একটি সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকা অথবা রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন অঞ্চলকে বোঝায়, যা মহাদেশের অনুরূপ অথবা একটি বিশাল অঞ্চল কিংবা আরও বেশি বা কম স্বয়ংসম্পূর্ণ মহাদেশীয় উপ-বিভাগ। ইংরেজিতে উপমহাদেশ বলতে মূলত Indian Sub-continent বা ভারতীয় উপমহাদেশকে বোঝানো হয়ে থাকে। সাধারণত বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ ও শ্রীলঙ্কাকে নিয়ে ভারত উপমহাদেশ গঠিত। এ অঞ্চলে হিমালয় পর্বতমালা রয়েছে। গোবি মরুভূমি, পামির মালভূমি, বৃষ্টিস্নাত বনাঞ্চল, পাহাড়-পর্বত, সাগর-উপসাগর-মহাসাগরও এ অঞ্চলে বিদ্যমান। এখানে অজস্র ভাষা, গোত্র, ধর্ম রয়েছে যা পৃথিবীর অন্য যে কোনো মহাদেশের প্রায় অনুরূপ।
নৃতত্ত্বের জাদুঘর	ভারতবর্ষকে 'নৃতত্ত্বের জাদুঘর' বলা হয়। কারণ এখানে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও ধর্ম-বর্ণের মানুষ বসবাস করে। প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বহু জাতিগোষ্ঠীর মানুষ ভারতে প্রবেশ করেছে। প্রাচীনকালে আর্য, দ্রাবিড়, পারসিক, গ্রিক, শক, কুষাণ, হুন এবং মধ্যযুগে আরব, তুর্কি, আফগান, মুঘল প্রভৃতি জাতি এদেশে এসেছে। এছাড়া আধুনিক যুগে পর্তুগিজ, ইংরেজ, ফরাসি প্রভৃতি ইউরোপীয় বণিকগোষ্ঠীর আগমনের ফলে ভারতবর্ষ বহু জাতিগোষ্ঠীর মিলনকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। তাই ব্রিটিশ ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ ভারতবর্ষকে নৃতত্ত্বের জাদুঘর বলে অভিহিত করেছেন।
জাতিভেদ প্রথা	হিন্দু ধর্মের একটি বিশেষ দিক হলো জাতিভেদ প্রথা। নৈতিক আচরণ ও পেশার ভিত্তিতে হিন্দুধর্মে এ প্রথার সৃষ্টি হয়েছে। প্রচলিত অর্থে জাতিভেদ বলতে হিন্দু সমাজের স্তর বিভাগকে বোঝায়। তবে বিশেষভাবে একে হিন্দু ধর্মের সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের চারটি স্তর হলো— ১. ব্রাহ্মণ, ২. ক্ষত্রিয়, ৩. বৈশ্য, ৪. শূদ্র। এদের মধ্যে ব্রাহ্মণদের সর্বোচ্চ এবং শূদ্রদের সর্বনিম্ন পর্যায়ের বলে গণ্য করা হয়।
জওহর ব্রত	প্রাচীনকালে হিন্দু নারীরা নিজেদের সম্মান রক্ষার্থে অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি দিত, যেটি ইতিহাসে 'জওহর ব্রত' নামে পরিচিত। ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে 'জওহর ব্রত' পালন একটি বিশেষ ঘটনা। প্রাচীনকালে হিন্দু নারীরা (বিশেষ করে রাজপুত) নিজেদের আত্মসম্মানের পরিচয় দেওয়ার জন্য এটি পালন করত। আরবদের সিন্ধু বিজয়ের সময় (৭১২ খ্রি.) রাজা দাহিরের স্ত্রী রানীবাঈ অন্তঃপুরের অন্য নারীদের নিয়ে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ে 'জওহর ব্রত' পালন করেছিলেন।
নিষ্ফল বিজয়	আরবদের সিন্ধু বিজয়ের রাজনৈতিক ফলাফল প্রসঙ্গে ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত মুসলিম দার্শনিক স্ট্যানলি লেনপুল (Stanley Lanepoole) নিষ্ফল বিজয় শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে আরবরা সিন্ধু বিজয় করে। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে এ বিজয় ছিল 'A triumph without result' অর্থাৎ 'নিষ্ফল বিজয়'। কারণ এ বিজয় সিন্ধু ও মুলতানেই সীমাবদ্ধ ছিল। অন্যস্থানে এর কোনো প্রভাব ছিল না। তাছাড়া সিন্ধুবিজয়ী বীর মুহাম্মদ বিন কাসিম খুব অল্প সময় (৭১২-৭১৫ খ্রি.) সিন্ধু ও মুলতান শাসন করেছেন। অর্থাৎ এ বিজয় ভারতবর্ষে তাৎক্ষণিক বা স্থায়ী কোনো রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।
সোমনাথ অভিযান	ভারতে সুলতান মাহমুদের ষোড়শ তথা সবশেষ গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অভিযান ছিল সোমনাথ মন্দির বিজয়। এ মন্দির বিজয়ের মাধ্যমে সুলতান মাহমুদ প্রচুর ধন-সম্পদ আহরণ করেন। ভারতের গুজরাটের কাথিওয়াড়ের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত সোমনাথ মন্দিরটি ছিল প্রভূত ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ। মন্দিরের পুরোহিতদের ধারণা ছিল এ মন্দিরটি আক্রমণ করা সুলতান মাহমুদের সাধ্যের বাইরে। কিন্তু স্থানীয় মানুষ এবং পুরোহিতদের প্রবল বাধা সত্ত্বেও সুলতান ১০২৬ খ্রিষ্টাব্দে মন্দিরটি আক্রমণ করে জয় লাভ করেন। এ মন্দির থেকে মাহমুদ দুই কোটিরও বেশি স্বর্ণমুদ্রা এবং বিগ্রহাদির অলংকার থেকে দু'শ মণ মূল্যবান মণি-মুক্তা নিয়ে স্বদেশে ফিরে যান। এ বিপুল সাফল্যের জন্য তার এ অভিযানটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে ঐতিহাসিকেরা মত দেন।
জাহানসুজ	'জাহানসুজ' শব্দের অর্থ 'পৃথিবীদাহক' বা পৃথিবী ধ্বংসকারী। গজনি রাজ্যটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করায় ঘুর বংশীয় তৃতীয় শাহজাদা আলাউদ্দিন হুসাইন 'জাহানসুজ' উপাধি লাভ করেন। গজনির সুলতান বাহরাম শাহ ঘুর রাজ্য (হিরাত ও আফগানিস্তানের মধ্যবর্তী একটি পার্বত্য অঞ্চল) আক্রমণ করে কুতুবউদ্দিন ও সাইফউদ্দিন নামে দু'জন শাহজাদাকে হত্যা করেন। এ হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তৃতীয় শাহজাদা আলাউদ্দিন হুসাইন ১১৫১ খ্রিষ্টাব্দে গজনি আক্রমণ করে ৭ দিন ৭ রাত ধরে এ শহরটি ধ্বংস করেন।

শাহনামা	শাহনামা সুলতান মাহমুদের সভাকবি আবুল কাসেম ফেরদৌসি রচিত একটি মহাকাব্য। মহাকবি ফেরদৌসি ৯৭৭ থেকে ১০১০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ৩০ বছর ধরে শাহনামা কাব্যটি রচনা করেন। ষাট হাজার শ্লোক সংবলিত এ মহাকাব্যে ৯৯০টি অধ্যায়ে ৬২টি কাহিনি রয়েছে। শাহনামাতে ইরানের ইতিহাস-ঐতিহ্যকে তুলে ধরা হয়েছে। এ মহাকাব্যে মূলত ইসলামপূর্ব ও সপ্তম শতাব্দীতে ইসলামি শাসন ব্যবস্থা চালু হওয়ার পরের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এটি পৃথিবীর একমাত্র মহাকাব্য, যা সাক্ষী হয়ে আছে একটি নির্দিষ্ট সভ্যতা ও সংস্কৃতির।
স্বর্গীয় বধূ	স্বর্গীয় বধূ মুসলিম শাসক সুলতান মাহমুদের গজনিতে নির্মিত একটি অনিন্দ্য সুন্দর, বৃহৎ ও দৃষ্টিনন্দন মসজিদের নাম। ঐতিহাসিকেরা এটিকে 'প্রাচ্যের বিস্ময়' বলে বর্ণনা করেছেন। সুলতান মাহমুদ গজনিতে সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা নির্মাণ করেন। এছাড়াও তিনি অসংখ্য মাদ্রাসা ও মসজিদ দ্বারা সুসজ্জিত করেছিলেন এই নগরীকে। এটি এশিয়ার অন্যতম সুন্দর শহরে পরিণত হয়েছিল।
কনফেডারেসি	কনফেডারেসি বলতে রাজনৈতিক ঐক্যজোটকে বোঝানো হয়। সাধারণত কোনো যুদ্ধে জয়ের জন্য শত্রুপক্ষকে প্রতিহত করতে ছোট ছোট রাজ্যগুলো একত্র হয়ে এ জোট গঠন করে থাকে। যেমন আমেরিকান সিভিল ওয়ার্সের (Civil wars) সময় দক্ষিণ রাজ্যগুলো একত্র হয়ে উত্তর রাজ্যগুলোকে প্রতিহত করতে 'আমেরিকান কনফেডারেসি' গঠন করেছিল। আবার প্রাচীনকালে মুহাম্মদ ঘুরির আক্রমণ প্রতিহত করতে দিল্লি ও আজমিরের রাজপুত চৌহান রাজবংশের রাজা পৃথ্বিরাজ উত্তর ভারতের হিন্দু রাজাদের সমন্বয়ে 'কনফেডারেসি' গঠন করেন। মুহাম্মদ ঘুরির ভারত আক্রমণের সময় ভারতে অনেকগুলো স্বাধীন রাজ্য ছিল। কোনো একক রাজ্যের পক্ষে ঘুরির আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব ছিল না। তাই রাজপুত রাজারা জোট বা কনফেডারেসি গঠন করেছিলেন।
তরাইনের যুদ্ধ	১১৯১ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের থানেশ্বরের নিকটবর্তী তরাইনের রণক্ষেত্রে চৌহান রাজা পৃথ্বিরাজ ও সম্মিলিত রাজপুত বাহিনী এবং মুহাম্মদ ঘুরির বাহিনীর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধই তরাইনের প্রথম যুদ্ধ নামে পরিচিত। কনৌজরাজ জয়চাঁদ ছাড়া প্রায় সব হিন্দু রাজন্য এ যুদ্ধে যোগ দেন। যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী ভীষণভাবে পরাজিত হয়। মুহাম্মদ ঘুরি আহত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যান। তরাইনের প্রথম যুদ্ধের পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলার জন্য মুহাম্মদ ঘুরি ১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এ যুদ্ধে তার ১,২০,০০০ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী অংশ নেয়। এ বাহিনীর মোকাবিলায় পৃথ্বিরাজ তিন লক্ষ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী সংগঠিত করেন। তার সাথে রাজপুতরাও যোগ দেয়। কিন্তু এ যুদ্ধে পৃথ্বিরাজের সম্মিলিত বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে। মুহাম্মদ ঘুরি ও মুসলিম সৈন্যদের অসাধারণ রণদক্ষতা এ যুদ্ধে তাদের বিজয় সুনিশ্চিত করে। ফলে ভারতে স্থায়ীভাবে মুসলিম সাম্রাজ্যের ভিত প্রতিষ্ঠিত হয়।

▶ অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ সাল এবং ঘটনা

সাল	ঘটনা
৭১০	ওবায়দুল্লাহ ও বুদায়েল নামে দু'জন আরব সেনাপতির নেতৃত্বে উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদের পূর্বাঞ্চলীয় শাসনকর্তা হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সিন্ধুর রাজা দাহিরের বিরুদ্ধে পরপর দুটি অভিযান পরিচালনা করেন।
৭১১	হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তার জামাতা ১৭ বছর বয়সী তরুণ সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিমকে সিন্ধু অভিযানে পাঠান।
৭১২	মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধুর রাজা দাহিরকে পরাজিত করে সিন্ধু জয় করেন।
৭১৩	মুসলিম বাহিনী মুলতান জয় করে।
৯৭৭	আলপ্তগীনের ক্রীতদাস ও জামাতা সবুক্তগীন গজনি বংশ প্রতিষ্ঠা করেন।
১০০০	সুলতান মাহমুদ সীমান্তবর্তী শহর ও দুর্গ দখল করেন। এটি ছিল মাহমুদের ভারতে পরিচালিত প্রথম অভিযান।
১০০৬	সুলতান মাহমুদ মুলতানের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন।
১০১৪	সুলতান মাহমুদ থানেশ্বর বিজয় করেন।
১০২৬	সুলতান মাহমুদ ভারতের গুজরাটের কাথিওয়াড়ের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত সোমনাথ মন্দিরে অভিযান পরিচালনা করেন।
১১৯১	পৃথ্বিরাজের সাথে মুহাম্মদ ঘুরির তরাইনের প্রান্তরে প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে মুহাম্মদ ঘুরি পরাজিত হন।
১১৯২	পৃথ্বিরাজের সাথে তরাইনের প্রান্তরে মুহাম্মদ ঘুরির দ্বিতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে পৃথ্বিরাজ পরাজিত হন এবং ভারতে স্থায়ী মুসলিম সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।
১২০৪	ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি বাংলার শেষ রাজা লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।
১২০৬	মুহাম্মদ ঘুরি মৃত্যুবরণ করেন এবং তার প্রতিনিধি কুতুবউদ্দিন আইবেক ভারতে দিল্লি সালতানাতের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

ক. জ্ঞানমূলক

■ **ভারতবর্ষ পরিচিতি এবং আরবদের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের সার্বিক অবস্থা**

প্রশ্ন-১. ভারত উপমহাদেশ কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: এশিয়া মহাদেশের মধ্য দক্ষিণে ভারত উপমহাদেশ অবস্থিত।

প্রশ্ন-২. কারা ভারতকে ইন্ডাস নামে অভিহিত করে?
উত্তর: গ্রিকরা ভারতকে ইন্ডাস নামে অভিহিত করে।

প্রশ্ন-৩. কার নাম অনুসারে ভারতবর্ষের নামকরণ করা হয়?
উত্তর: জনশ্রুতি অনুযায়ী পৌরাণিক রাজা ভরতের নামানুসারে ভারতবর্ষের নামকরণ করা হয়।

প্রশ্ন-৪. ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ ভারতীয় উপমহাদেশকে কী বলে অভিহিত করেছেন?
উত্তর: ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ ভারতীয় উপমহাদেশকে 'নৃতত্ত্বের জাদুঘর' বলে অভিহিত করেছেন।

প্রশ্ন-৫. ভারতবর্ষের প্রাচীনতম জাতি কারা?
উত্তর: ভারতবর্ষের প্রাচীনতম জাতি দ্রাবিড়।

প্রশ্ন-৬. ভারতে প্রাচীন যুগ বলা হয় কোন সময়কে?
উত্তর: মুসলিম বিজয়ের আগে হিন্দু ও বৌদ্ধ শাসনামলকে ভারতীয় ইতিহাসের প্রাচীন যুগ বলা হয়।

প্রশ্ন-৭. ভারতবর্ষের ঐক্য কখন বিনষ্ট হয়?
উত্তর: মৌর্য সম্রাট অশোকের মৃত্যুর (খ্রি. পূ. ২৬২) পর ভারতবর্ষের ঐক্য বিনষ্ট হয়।

প্রশ্ন-৮. সম্রাট অশোক কত সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন?
উত্তর: মৌর্য সম্রাট অশোক ২৩২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন।

প্রশ্ন-৯. সম্রাট হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক বাংলার শাসনকর্তা কে ছিলেন?
উত্তর: সম্রাট হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন শশাংক।

প্রশ্ন-১০. ভারতের অধিকাংশ মানুষ কোন ধর্মাবলম্বী?
উত্তর: ভারতের অধিকাংশ মানুষ হিন্দুধর্মাবলম্বী।

প্রশ্ন-১১. সতীদাহ প্রথা কী?
উত্তর: প্রাচীন হিন্দু সমাজে প্রচলিত মৃত স্বামীর সাথে জীবিত বিধবা স্ত্রীকে একই চিতায় পুড়িয়ে মারার রীতিই সতীদাহ প্রথা নামে পরিচিত।

প্রশ্ন-১২. জাতিভেদ প্রথা কী?
উত্তর: ধর্মীয় আচরণ ও কাজের ভিত্তিতে হিন্দু সমাজে সৃষ্ট চারটি শ্রেণিই জাতিভেদ প্রথা হিসেবে পরিচিত।

■ **মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়: কারণ, ঘটনা ও ফলাফল**

প্রশ্ন-১৩. কত শতাব্দীতে ভারতে মুসলিম আধিপত্যের সূচনা হয়?
উত্তর: অষ্টম শতাব্দীতে ভারতে মুসলিম আধিপত্যের সূচনা হয়।

প্রশ্ন-১৪. আরবদের সিন্ধু অভিযানের সময় উমাইয়া খলিফা কে ছিলেন?
উত্তর: আরবদের সিন্ধু অভিযানের সময় উমাইয়া খলিফা ছিলেন আল ওয়ালিদ।

প্রশ্ন-১৫. হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কোথাকার শাসনকর্তা ছিলেন?
উত্তর: হাজ্জাজ বিন ইউসুফ উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদের শাসনকালে সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের (ইরাক) শাসনকর্তা ছিলেন।

প্রশ্ন-১৬. মুসলমানদের অভিযানের সময় সিন্ধু ও মুলতানের শাসনকর্তা কে ছিলেন? *[ঢা., রা., চ. বোর্ড ২০১৭]*
উত্তর: মুসলমানদের অভিযানের সময় সিন্ধু ও মুলতানের শাসনকর্তা ছিলেন রাজা দাহির।

প্রশ্ন-১৭. সিন্ধু বিজয়ী মুসলিম সেনাপতির নাম কী? *[ঢা. বো., রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৩; সকল বোর্ড ২০২১]*
উত্তর: সিন্ধু বিজয়ী মুসলিম সেনাপতির নাম মুহাম্মদ বিন কাসিম।

প্রশ্ন-১৮. মুহাম্মদ বিন কাসিমকে কে সিন্ধু অভিযানে পাঠিয়েছিলেন?
উত্তর: খলিফা আল-ওয়ালিদের পূর্বাঞ্চলীয় শাসনকর্তা হাজ্জাজ বিন ইউসুফ মুহাম্মদ বিন কাসিমকে সিন্ধু অভিযানে পাঠিয়েছিলেন।

প্রশ্ন-১৯. মুহাম্মদ বিন কাসিম কত খ্রিষ্টাব্দে সিন্ধু বিজয় করেন?
[ঢা. বো., রা. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫; সকল বোর্ড ২০২১, ২০১৬]
উত্তর: মুহাম্মদ বিন কাসিম ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে সিন্ধু বিজয় করেন।

প্রশ্ন-২০. মুহাম্মদ বিন কাসিম কত খ্রিষ্টাব্দে মুলতান জয় করেন?
উত্তর: মুহাম্মদ বিন কাসিম ৭১৩ খ্রিষ্টাব্দে মুলতান জয় করেন।

প্রশ্ন-২১. রাজা দাহিরের স্ত্রীর নাম কী?
[ঢা. বো., ম. বো., দি. বো., চ. বো., সি. বো., ব. বো. ২০২২]
উত্তর: রাজা দাহিরের স্ত্রীর নাম রানি বাঈ এবং রানি লাদি।

প্রশ্ন-২২. দেবল বন্দর কোথায় অবস্থিত?
[দি. বো., য. বো., কু. বো., সি. বো., ব. বো. ২০১৭]
উত্তর: দেবল বন্দর সিন্ধুতে অবস্থিত।

প্রশ্ন-২৩. মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে সিন্ধুর রাজধানী কোথায় ছিল? *[ঢা. বো., রা. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫]*
উত্তর: মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে সিন্ধুর রাজধানী ছিল আলোর।

প্রশ্ন-২৪. আরবদের সিন্ধু অভিযানের প্রত্যক্ষ কারণ কী ছিল?
উত্তর: আরবদের সিন্ধু অভিযানের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল সিন্ধুর জলদস্যু কর্তৃক আরব জাহাজ লুট করা।

প্রশ্ন-২৫. জওহর ব্রত কী?
[ঢা. বো., রা. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫]
উত্তর: প্রাচীন ভারতে নিজেদের সম্মান রক্ষার্থে হিন্দু নারী বিশেষ করে রাজপুত নারীদের আত্মাহুতি দেওয়ার রীতিই জওহর ব্রত নামে পরিচিত।

প্রশ্ন-২৬. আল-বিরুনি কে ছিলেন?
উত্তর: আল-বিরুনি ছিলেন মধ্যযুগের একজন মুসলিম গণিতবিদ, দার্শনিক, জ্যোতির্বিদ এবং গবেষক।

প্রশ্ন-২৭. সিন্ধু বিজয় সম্পর্কে আল বিরুনির লেখা গ্রন্থটির নাম কী?

উত্তর: সিন্ধু বিজয় সম্পর্কে আল বিরুনির লেখা গ্রন্থটির নাম 'কিতাবুল হিন্দ'।

প্রশ্ন-২৮. আরবরা কাদের কাছ থেকে সর্বপ্রথম দাবা খেলার প্রশিক্ষণ লাভ করে?

উত্তর: আরবরা ভারতীয়দের কাছ থেকে সর্বপ্রথম দাবা খেলার প্রশিক্ষণ লাভ করে।

প্রশ্ন-২৯. আরবরা কাদের কাছ থেকে শূন্যের ব্যবহার শেখে?

উত্তর: আরবরা ভারতীয়দের কাছ থেকে শূন্যের ব্যবহার শেখে।

■ গজনির সুলতান মাহমুদ: সামরিক অভিযান, চরিত্র ও কৃতিত্ব

প্রশ্ন-৩০. গজনি বর্তমানে কোন দেশে অবস্থিত?

উত্তর: গজনি বর্তমানে আফগানিস্তানে অবস্থিত।

প্রশ্ন-৩১. সুলতান মাহমুদ কোন রাজবংশের শাসক ছিলেন? *[সকল বোর্ড ২০১৮]*

উত্তর: সুলতান মাহমুদ গজনি রাজবংশের শাসক ছিলেন।

প্রশ্ন-৩২. গজনি বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? *[রা. বো., কু. বো., য. বো. ২০২২; সকল বোর্ড ২০১৯]*

উত্তর: গজনি বংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন সবুক্তগীন।

প্রশ্ন-৩৩. গজনি বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান কে ছিলেন?

উত্তর: গজনি বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন সুলতান মাহমুদ।

প্রশ্ন-৩৪. সুলতান মাহমুদ কোন রাজ্যের সুলতান ছিলেন? *[ম. বো. ২০২৩; ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো. ২০২১; সকল বোর্ড ২০১৬]*

উত্তর: সুলতান মাহমুদ গজনির সুলতান ছিলেন।

প্রশ্ন-৩৫. সুলতান মাহমুদের পিতার নাম কী? *[সকল বোর্ড ২০১৬]*

উত্তর: সুলতান মাহমুদের পিতার নাম সবুক্তগীন।

প্রশ্ন-৩৬. কে ভারতে ২৭ বছরে ১৭ বার অভিযান চালান?

উত্তর: গজনির সুলতান মাহমুদ ভারতে ২৭ বছরে ১৭ বার অভিযান চালান।

প্রশ্ন-৩৭. সুলতান মাহমুদ বিজিত কোন অঞ্চলকে নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন?

উত্তর: সুলতান মাহমুদ সমস্ত আফগানিস্তান এবং ঝিলাম নদীর পশ্চিম তীরবর্তী ভিরা রাজ্য নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন।

প্রশ্ন-৩৮. সুলতান মাহমুদের ষোলোতম অভিযান কোনটি?

উত্তর: গুজরাটের বিখ্যাত সোমনাথ মন্দির (১০২৬ খ্রি.) আক্রমণ ছিল সুলতান মাহমুদের ষোলোতম অভিযান।

প্রশ্ন-৩৯. সোমনাথ মন্দিরটি কোথায় অবস্থিত? *[রা. বো., কু. বো., য. বো. ২০২২; সি. বো., ব. বো. ২০২১]*

উত্তর: সোমনাথ মন্দিরটি ভারতের গুজরাটের কাথিওয়াড়ের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত।

প্রশ্ন-৪০. সুলতান মাহমুদ কত খ্রিষ্টাব্দে সোমনাথ মন্দির বিজয় করেন?

উত্তর: সুলতান মাহমুদ ১০২৬ খ্রিষ্টাব্দে সোমনাথ মন্দির বিজয় করেন।

প্রশ্ন-৪১. প্রাচ্যের হোমার বলা হয় কোন কবিকে?

উত্তর: আবুল কাসেম ফেরদৌসিকে প্রাচ্যের হোমার বলা হয়।

প্রশ্ন-৪২. 'শাহনামা' মহাকাব্যের রচয়িতা কে? *[ম. বো., দি. বো. ২০২৫; ঢা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৩; ঢা. বো., ম. বো., দি. বো., চ. বো., সি. বো., ব. বো. ২০২২; সি. বো., ব. বো. ২০২১]*

উত্তর: 'শাহনামা' মহাকাব্যের রচয়িতা মহাকবি আবুল কাসেম ফেরদৌসি।

প্রশ্ন-৪৩. কিতাব-উল-হিন্দ গ্রন্থের রচয়িতা কে? *[ম. বো. ২০২৩]*

উত্তর: কিতাব-উল-হিন্দ গ্রন্থের রচয়িতা আল বিরুনি।

■ মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরি: উত্তর ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা, চরিত্র ও কৃতিত্ব

প্রশ্ন-৪৪. ভারতে স্বায়ী মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন কে?

উত্তর: ভারতে স্বাধীন মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরি।

প্রশ্ন-৪৫. মুহাম্মদ ঘুরির প্রকৃত নাম কী? *[ম. বো., দি. বো. ২০২৫; সকল বোর্ড ২০২৩]*

উত্তর: মুহাম্মদ ঘুরির প্রকৃত নাম মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ বিন শামস।

প্রশ্ন-৪৬. ঘুর রাজ্য কোথায় অবস্থিত?

উত্তর: আফগানিস্তান ও হিরাতের মধ্যবর্তী স্থানে ঘুর রাজ্যটি অবস্থিত।

প্রশ্ন-৪৭. জাহানসুজ উপাধি কার? *[ঢা. বো., ম. বো., দি. বো., চ. বো., সি. বো., ব. বো. ২০২২]*

উত্তর: ঘুর বংশীয় তৃতীয় শাহজাদা আলাউদ্দিন হুসাইনের উপাধি ছিল জাহানসুজ বা পৃথিবীদাহক।

প্রশ্ন-৪৮. পৃথ্বিরাজ কোন বংশের রাজা ছিলেন? *[ঢা. বো., ম. বো. ২০২১]*

উত্তর: পৃথ্বিরাজ চৌহান বংশের রাজা ছিলেন।

প্রশ্ন-৪৯. তরাইনের প্রথম যুদ্ধ কত খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়?

উত্তর: তরাইনের প্রথম যুদ্ধ ১১৯১ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়।

প্রশ্ন-৫০. কত খ্রিষ্টাব্দে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়? *[ঢা., রা., চ. বো. ২০১৭]*

উত্তর: ১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

প্রশ্ন-৫১. তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে বিজয়ী হন কে?

উত্তর: তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে মুহাম্মদ ঘুরি বিজয়ী হন।

প্রশ্ন-৫২. বাংলার শেষ রাজা কে ছিলেন?

উত্তর: বাংলার শেষ রাজা ছিলেন লক্ষ্মণ সেন।

প্রশ্ন-৫৩. বাংলা জয় করেন কে?

উত্তর: ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি বাংলা জয় করেন।

প্রশ্ন-৫৪. ভারতে স্বাধীন মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন কে? *[রা. বো., কু. বো., য. বো. ২০২২]*

উত্তর: ভারতে স্বাধীন মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন কুতুবউদ্দিন আইবেক।

প্রশ্ন-৫৫. বাংলায় কত খ্রিষ্টাব্দে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়?

উত্তর: ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ. অনুধাবনমূলক

প্রশ্ন-১. ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অবস্থান ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: ভারতবর্ষ এশিয়া মহাদেশের মধ্য দক্ষিণে অবস্থিত।

ভৌগোলিক দিক থেকে ভারতবর্ষ একটি বিচিত্র অঞ্চল। এর উত্তর, উত্তর পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব দিকে হিমালয় পর্বত, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পূর্বে ব্রহ্মদেশ (মিয়ানমার), পশ্চিমে আরব সাগর অবস্থিত। বর্তমান বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান এর অন্তর্ভুক্ত। ভারতবর্ষের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বিন্ধ্য পর্বত দেশটিকে দুটি অসমান ভাগে বিভক্ত করেছে। বিন্ধ্য পর্বতের উত্তর অংশ 'আর্যাবর্ত' বা উত্তর ভারত এবং দক্ষিণাংশ 'দাক্ষিণাত্য' নামে পরিচিত।

প্রশ্ন-২. ভারতবর্ষকে 'নৃতত্ত্বের জাদুঘর' বলা হয় কেন? *[ঢা. বো., রা. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫; ম. বো. ২০২৩; ঢা. বো., ম. বো., দি. বো., চ. বো., সি. বো., ব. বো. ২০২২; সকল বোর্ড ২০১৮]*

উত্তর: ভারতীয় উপমহাদেশে অসংখ্য জাতি, গোষ্ঠী ও নানা ধর্মের মানুষের বসবাস থাকায় ভারতবর্ষকে 'নৃতত্ত্বের জাদুঘর' বলা হয়।

আর্যদের আগমন থেকে শুরু করে ইউরোপীয়দের আগমন পর্যন্ত বহু জাতি ভারতে এসেছে। প্রাচীন যুগে আর্য, দ্রাবিড়, পারসিক, গ্রিক, শক, কুষাণ, হুন; মধ্যযুগে আরব, তুর্কি, আফগান, মুঘল এবং আধুনিক যুগে পর্তুগিজ, ইংরেজ, ফরাসি প্রভৃতি ইউরোপীয় বণিকদের আগমনের ফলে ভারতবর্ষ বহু জাতিগোষ্ঠীর মহাসমাবেশে পরিণত হয়েছে। এ কারণে ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ ভারতকে 'নৃতত্ত্বের জাদুঘর' বলে অভিহিত করেছেন।

প্রশ্ন-৩. ভারতবর্ষকে 'Wealth of India' বলা হতো কেন?

উত্তর: প্রাকৃতিক ধনসম্পদে পরিপূর্ণ থাকায় ভারতবর্ষকে 'Wealth of India' বলা হতো।

প্রাচীনকাল থেকেই বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ ও ঐশ্বর্যের জন্য ভারতবর্ষ বিখ্যাত ছিল। এ অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পেরও ব্যাপক খ্যাতি ছিল। খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারত ভ্রমণকারী চীনা পর্যটক ফাহিয়েন ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বিবরণ দিয়েছেন। অর্থাৎ বিপুল ঐশ্বর্যের জন্যই ভারতবর্ষকে Wealth of India বলা হতো।

প্রশ্ন-৪. মুসলমানদের বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের সামাজিক অবস্থার বিবরণ দাও। *[দি. বো., কু. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০১৭]*

উত্তর: নানা রকম ঘৃণ্যপ্রথা ও কুসংস্কার বিদ্যমান থাকায় মুসলমানদের বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের সামাজিক অবস্থা সন্তোষজনক ছিল না।

তৎকালীন ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্ম ছিল হিন্দু। তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল সংকীর্ণ জাতিভেদ প্রথা। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এ চার শ্রেণিতে হিন্দু সমাজ বিভক্ত ছিল। এরূপ বিভেদ জাতীয় চেতনা ও শক্তি গঠনের প্রধান অন্তরায় ছিল। এ কারণে সমাজে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা নানাভাবে অবহেলিত হতো। তাছাড়া সে সময় বহুবিবাহ, সতীদাহ প্রথা, নরবলি, গঙ্গায় শিশুসন্তান বিসর্জন প্রভৃতি কু-প্রথা প্রচলিত ছিল। এমনকি দাস-দাসীও ক্রয়-বিক্রয় চলত। সব মিলিয়ে তৎকালীন ভারতের সামাজিক অবস্থা বিশৃঙ্খল ও শোচনীয় ছিল।

প্রশ্ন-৫. জাতিভেদ প্রথা বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: জাতিভেদ প্রথা বলতে ধর্মীয় আচরণ ও কাজের ভিত্তিতে হিন্দু সমাজে সৃষ্ট চারটি শ্রেণিকে বোঝায়।

অষ্টম শতাব্দীর শুরুতে হিন্দু সমাজে ধর্মীয় বিধানের নামে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারটি বর্ণের বিভক্তি প্রকট আকার ধারণ করে। সমাজের পৌরহিত্য ও সবোচ্চ সম্মানের স্থানে অধিষ্ঠিত হয় ব্রাহ্মণরা। ক্ষত্রিয়রা দায়িত্ব নেয় রাজ্য শাসনের। সমাজে বৈশ্য ও শূদ্ররা ছিল নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত। তাদের কোনো ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। নৈতিক আচরণ ও পেশার ভিত্তিতে মানুষে মানুষে সৃষ্ট এ ভেদাভেদকেই জাতিভেদ প্রথা বলা হয়।

প্রশ্ন-৬. মুসলমানদের আগমনের পূর্বে ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থা কেমন ছিল? *[ঢা. বো., রা. বো., চ. বো. ২০১৭]*

উত্তর: মুসলমানদের আগমনের আগে ভারতীয় সমাজে সার্বিকভাবে নারীর অবস্থা শোচনীয় ছিল।

প্রাক-মুসলিম ভারতীয় সমাজে সতীদাহ প্রথা ও বাল্যবিবাহের প্রচলন ছিল। তাছাড়া বিধবা বিবাহ প্রথার বিলোপ ঘটেছিল। তাই নারীরা সমাজে মূল্যহীন হয়ে পড়েছিল। তারা সব ধরনের অধিকার বঞ্চিত হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়েছিল। তবে এ চিত্র নিম্ন শ্রেণির নারীদের ক্ষেত্রে বেশি দেখা যেত। অভিজাত পরিবারের নারীরা শিক্ষাগ্রহণ ছাড়াও সামাজিক কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ পেত।

প্রশ্ন-৭. সতীদাহ প্রথা কী? ব্যাখ্যা করো। *[ঢা. বো., ম. বো., দি. বো., চ. বো., সি. বো., ব. বো. ২০২২]*

উত্তর: সতীদাহ প্রথা প্রাচীন হিন্দু সমাজে প্রচলিত একটি সামাজিক রীতি।

সতীদাহ প্রথায় স্বামীর মৃতদেহের সাথে বিধবা স্ত্রীকে একই চিতায় পুড়িয়ে মারা হতো। তখন স্বামীর মৃত্যু হলে চূড়ান্ত আনুগত্য দেখাতে বিধবা স্ত্রী স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েই স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি দিত। কিন্তু কালক্রমে এটি হিন্দু সমাজে ধর্মীয় বাধ্যবাধকতায় রূপ নেয়। একসময় ধর্মের দোহাই দিয়ে সমাজপতিরা বিধবাদের মৃত স্বামীর সাথে সহমরণ বরণ করে নিতে বাধ্য করে। ১৮২৯ সালে সমাজসংস্কারক রাজা রামমোহন রায়ের উদ্যোগে ভারতের তখনকার গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক আইন পাস করে এ জঘন্য ও নিষ্ঠুর প্রথা উচ্ছেদ করেন।

প্রশ্ন-৮. আরবদের ভারত অভিযানকালে এর অর্থনৈতিক অবস্থা কীরূপ ছিল?

উত্তর: আরবদের ভারত অভিযানকালে ভারতবর্ষ অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ থাকলেও সম্পদ বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে চরম বৈষম্য ও অব্যবস্থা ছিল।

প্রাচীনকাল থেকেই বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ ও ঐশ্বর্যের জন্য ভারতবর্ষের বিশ্বজোড়া খ্যাতি ছিল। ভারতবর্ষ ছিল একটি কৃষিপ্রধান দেশ। তবে অভিজাত শ্রেণি ও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানের মধ্যে অনেক তফাৎ ছিল। সমাজের শ্রমজীবী মানুষ যেমন— কৃষক, শ্রমিক, কামার, কুমার, ছুতার, তাঁতি এরা জীবিকা নির্বাহের জন্য হাড়ভাঙা পরিশ্রম করত। আর তাদের পরিশ্রমের সুফল ভোগ করত অভিজাত শ্রেণির লোকেরা। তারা অত্যন্ত বিলাসবহুল জীবনযাপন করত।

প্রশ্ন-৯. আরবরা সিন্ধু অভিযানে উৎসাহিত হয়েছিল কেন?

উত্তর: হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সাম্রাজ্যবাদী নীতিই আরবদের সিন্ধু অভিযানে উৎসাহিত করে।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ছিলেন উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদের পূর্বাঞ্চলীয় শাসনকর্তা। আর খলিফা ওয়ালিদের শাসনামল (৭০৫-৭১৫ খ্রি.) ছিল মুসলিম সম্প্রসারণের যুগ। ঐ সময় সিন্ধুর সার্বিক অবস্থা সিন্ধুতে মুসলিম অভিযান পরিচালনার অনুকূলে ছিল। তাই হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সিন্ধু অভিযানে মনোযোগী হন। মূলত হাজ্জাজের সম্প্রসারণ নীতির কারণেই আরবরা সিন্ধু অভিযানে উৎসাহিত হয়।

প্রশ্ন-১০. আরবদের সিন্ধু অভিযানের প্রত্যক্ষ কারণ কী ছিল? ব্যাখ্যা করো। *[ঢা. বো., রা. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫]*

উত্তর: হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কাছে সিংহলরাজের প্রেরিত আটটি জাহাজ সিন্ধুর দেবল বন্দরে জলদস্যুদের দ্বারা লুট হওয়াই ছিল আরবদের সিন্ধু অভিযানের প্রত্যক্ষ কারণ।

অষ্টম শতাব্দীর শুরুর দিকে সিংহলরাজ (শ্রীলঙ্কা) আনুগত্যের নিদর্শনস্বরূপ আটটি জাহাজে করে খলিফা আল ওয়ালিদ ও হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কাছে উপঢৌকন পাঠান। কিন্তু সিন্ধুর দেবল বন্দরে সেগুলো লুট হলে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সিন্ধুর রাজা দাহিরের কাছে এর ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। রাজা দাহির তা দিতে অস্বীকৃতি জানান। ফলে তিনি তাকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য খলিফার অনুমতি নিয়ে ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে সিন্ধুতে অভিযান পরিচালনা করেন।

প্রশ্ন-১১. রাজা দাহিরের স্ত্রী 'জওহর ব্রত' পালন করেন কেন? ব্যাখ্যা দাও। *[সকল বোর্ড ২০২৩; ঢা. বো., য. বো., রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো. ২০২১]*

উত্তর: নিজের সম্মান রক্ষার জন্য রাজা দাহিরের স্ত্রী 'জওহর ব্রত' পালন করেন।

প্রাচীনকালে হিন্দু নারীরা বিশেষ করে রাজপুত নারীরা নিজেদের আত্মসম্মানের পরিচয় দেওয়ার জন্য 'জওহর ব্রত' পালন করত। ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে আরব বাহিনী সিন্ধু আক্রমণ করে। এতে রাজা দাহির পরাজিত ও নিহত হন এবং রাওয়ার দুর্গের পতন ঘটে। এ সময় রাজা দাহিরের স্ত্রী নিজের সম্মান রক্ষার্থে অন্তঃপুরের অন্য নারীদের নিয়ে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে জওহর ব্রত পালন করেন।

প্রশ্ন-১২. আরবদের সিন্ধু বিজয়ের ধর্মীয় ফলাফল ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: আরবদের সিন্ধু বিজয়ের ধর্মীয় ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী।

আরব মুসলিমদের সিন্ধু বিজয়ের সূত্র ধরে ভারতবর্ষে ইসলামের বীজ রোপিত হয়। এ বিজয়ের ফলে অসংখ্য পির-দরবেশ ভারত উপমহাদেশে ধর্ম প্রচারের জন্য আসেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন হযরত নিজামুদ্দিন আওলিয়া, হযরত খাজা মইনুদ্দিন চিশতি প্রমুখ মনীষী। তাদের প্রচারিত ইসলামের শাশ্বত বাণী এবং সাম্য ও মৈত্রী নীতি বর্ণপ্রথার কঠিন নিগড়ে নির্যাতিত হিন্দু সম্প্রদায়কে আকৃষ্ট করে। ফলে তারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। সিন্ধু বিজয়ের ফলে ভারতে ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটে।

প্রশ্ন-১৩. আল-বিরুনির পরিচয় দাও। *[ম. বো., দি. বো., ২০২৫; ঢা. বো., রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৩; ঢা. বো., ম. বো., দি. বো., চ. বো., সি. বো., ব. বো. ২০২২]*

উত্তর: আবু রায়হান আল-বিরুনি ছিলেন মধ্যযুগের বিখ্যাত মুসলিম শিক্ষাবিদ ও গবেষক।

আল-বিরুনি ৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে মধ্য এশিয়ার খাওয়ারিজমে (আফগানিস্তানে অবস্থিত) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। দর্শন, ভূগোল, ইতিহাস, জ্যোতিষশাস্ত্রে তিনি বিশেষ বুৎপত্তি অর্জন করেন। তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'কিতাবুল হিন্দ'। আল-বিরুনি সুলতান মাহমুদের দরবারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী ছিলেন। তিনি ১০৪৮ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

প্রশ্ন-১৪. সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করো। *[সকল বোর্ড ২০১৯]*

উত্তর: সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতের বিপুল ধন-ঐশ্বর্য সংগ্রহ করা।

সুলতান মাহমুদ ১০০০-১০২৬ খ্রি. পর্যন্ত মোট ১৭ বার ভারতে অভিযান পরিচালনা করেন। গজনির শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং এটিকে সমৃদ্ধিশালী ও আকর্ষণীয় নগরীতে পরিণত করা সুলতান মাহমুদের উদ্দেশ্য ছিল। এছাড়া সমরনায়ক হিসেবে একটি বিশাল সেনাবাহিনী পোষণের জন্য তার অনেক অর্থের দরকার ছিল। ফলে ধন-ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ ভারতীয় উপমহাদেশকে তিনি তার প্রয়োজনীয় অর্থভাণ্ডার মনে করে সেখানে ১৭ বার অভিযান পরিচালনা করেন। আর ভারত থেকে সংগৃহীত অর্থ তিনি নিজ রাজ্য গজনির উন্নতিতে ব্যয় করেন। অর্থাৎ অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যেই সুলতান মাহমুদ ভারতে অভিযান পরিচালনা করেন।

প্রশ্ন-১৫. সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল অন্যতম।

পাঞ্জাবের হিন্দুশাহী বংশের রাজা জয়পাল ও তার বংশীয় রাজন্যবর্গের শত্রুতা ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ভারতের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলো ও গজনি রাজ্যের সার্বিক নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হয়। এ হুমকির কারণেই তিনি ২৭ বছরে ১৭ বার ভারতবর্ষে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, মধ্য এশিয়ায় একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই সুলতান মাহমুদ ভারতে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। তবে তিনি পাঞ্জাব ছাড়া ভারতবর্ষের অন্য কোনো এলাকা তার সাম্রাজ্যভুক্ত করেননি। কারণ সে সময় মধ্য এশিয়া ও ভারতবর্ষব্যাপী এত বিশাল একটি সাম্রাজ্য শক্তভাবে শাসন করা সম্ভব ছিল না।

প্রশ্ন-১৬. সুলতান মাহমুদের সোমনাথ মন্দির বিজয় ইতিহাসে বিখ্যাত কেন? *[ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো. ২০২১]*

উত্তর: প্রবল বাধা সত্ত্বেও সোমনাথ মন্দির বিজয়ের মাধ্যমে সুলতান মাহমুদ প্রচুর ধন-সম্পদ আহরণ করেন। তাই তার এ অভিযানটি ইতিহাসে বিখ্যাত।

ভারতের গুজরাটে অবস্থিত সোমনাথ মন্দিরটি ছিল প্রভূত ধনৈশ্বর্যে পরিপূর্ণ। মন্দিরের পুরোহিতদের ধারণা ছিল এ মন্দিরটি

আক্রমণ করা সুলতান মাহমুদের সাধ্যের বাইরে। কিন্তু স্থানীয় মানুষ এবং পুরোহিতদের প্রবল বাধা সত্ত্বেও সুলতান মাহমুদ ১০২৬ খ্রিষ্টাব্দে মন্দিরটি আক্রমণ করে জয়লাভ করেন। এ মন্দির থেকে মাহমুদ দুই কোটিরও বেশি স্বর্ণমুদ্রা এবং বিগ্রহাদির অলংকার থেকে দু'শ মণ মূল্যবান মণি-মুক্তা নিয়ে স্বদেশে ফিরে যান। এ অবিশ্বাস্য সাফল্যের জন্যই তার এ অভিযানটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে ঐতিহাসিকেরা মত দেন।

প্রশ্ন-১৭. প্রাচ্যের বিস্ময় বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: গজনিতে সুলতান মাহমুদের তত্ত্বাবধানে নির্মিত 'স্বর্গীয় বধূ' নামে পরিচিত মসজিদটিকে ঐতিহাসিকেরা 'প্রাচ্যের বিস্ময়' বলে বর্ণনা করেছেন।

সুলতান মাহমুদ ছিলেন শিল্প-সংস্কৃতির উদার পৃষ্ঠপোষক। তিনি ভারত থেকে সংগৃহীত বিপুল ধনৈশ্বর্যের বিপুলাংশ ব্যয়ে গজনিকে অতুলনীয় ও মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত করেন। বিশেষ করে সুলতান মাহমুদ গজনিতে কারুকার্যখচিত একটি অনিন্দ্যসুন্দর মসজিদ নির্মাণ করেন। 'স্বর্গীয় বধূ' নামে পরিচিত এ মসজিদটিকে ঐতিহাসিকেরা প্রাচ্যের বিস্ময় বলে অভিহিত করেছেন।

প্রশ্ন-১৮. শাহনামা কী? ব্যাখ্যা করো। *[ঢা. বো., রা. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫; সি. বো., ব. বো. ২০২১]*

উত্তর: শাহনামা সুলতান মাহমুদের সভাকবি আবুল কাসেম ফেরদৌসি রচিত একটি মহাকাব্য।

মহাকবি ফেরদৌসি ৯৭৭ থেকে ১০১০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ৩০ বছর ধরে শাহনামা রচনা করেন। ষাট হাজার শ্লোক সংবলিত এ মহাকাব্যে ৯৯০টি অধ্যায়ে ৬২টি কাহিনি রয়েছে। শাহনামাতে ইরানের ইতিহাস-ঐতিহ্যকে তুলে ধরা হয়েছে। এই মহাকাব্যে মূলত ইসলামপূর্ব ও সপ্তম শতাব্দীতে ইসলামি শাসনব্যবস্থা চালু হওয়ার পরের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এটি পৃথিবীর একমাত্র মহাকাব্য, যা সাক্ষী হয়ে আছে একটি নির্দিষ্ট সভ্যতা ও সংস্কৃতির।

প্রশ্ন-১৯. আলাউদ্দিন হুসাইনকে 'জাহানসুজ' বলা হয় কেন?
[ম. বো., দি. বো. ২০২৫; য. বো. ২০২৩; সি. বো., ব. বো. ২০২১]

উত্তর: গজনি রাজ্যটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করায় ঘুরি বংশীয় তৃতীয় শাহজাদা আলাউদ্দিন হুসাইন 'জাহানসুজ' উপাধি লাভ করেন।

গজনির সুলতান বাহরাম শাহ ঘুর রাজ্য (হিরাত ও আফগানিস্তানের মধ্যবর্তী একটি পার্বত্য অঞ্চল) আক্রমণ করে কুতুবউদ্দিন ও সাইফউদ্দিন নামে দু'জন শাহজাদাকে হত্যা করেন। এ হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তৃতীয় শাহাজাদা আলাউদ্দিন হুসাইন ১১৫১ খ্রিষ্টাব্দে গজনি আক্রমণ করে ৭ দিন ৭ রাত ধরে এ শহরটি ধ্বংস করেন। এ জন্য তিনি 'জাহানসুজ' বা 'পৃথিবীদাহক' উপাধি পান।

প্রশ্ন-২০. তরাইনের প্রথম যুদ্ধ কেন হয়েছিলেন?
[রা. বো., কু. বো., য. বো. ২০২২]

উত্তর: পাঞ্জাব অধিকার করার পর ভারতে স্থায়ী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুহাম্মদ ঘুরি দিল্লি ও আজমিরের রাজপুত চৌহান বংশের রাজা পৃথ্বিরাজের সাথে তরাইনের প্রথম যুদ্ধে অবতীর্ণ হন।

১১৯১ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের থানেশ্বরের নিকটবর্তী তরাইনের রণক্ষেত্রে চৌহান রাজা পৃথ্বিরাজ ও সম্মিলিত রাজপুত বাহিনী এবং মুহাম্মদ ঘুরির বাহিনীর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধই তরাইনের প্রথম যুদ্ধ নামে পরিচিত। ১১৮৯ খ্রিষ্টাব্দে ভাতিন্দা দখল করে মুহাম্মদ ঘুরি চৌহান রাজের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলে তাকে মোকাবিলার উদ্দেশ্যে পৃথ্বিরাজ উত্তর ভারতের হিন্দু রাজাদের সমন্বয়ে একটি 'কনফেডারেসি' বা ঐক্যজোট গঠন করেন। কনৌজরাজ জয়চাঁদ ছাড়া প্রায় সব হিন্দু রাজা এ যুদ্ধে যোগ দেন। যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী ভীষণভাবে পরাজিত হয়। মুহাম্মদ ঘুরি আহত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যান।

প্রশ্ন-২১. তরাইনের প্রথম যুদ্ধে মুহম্মদ ঘুরির পরাজয়ের কারণ ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: হিন্দু রাজাদের কনফেডারেসি বা ঐক্য জোট গঠন করে যুদ্ধে অংশগ্রহণই তরাইনের প্রথম যুদ্ধে মুহাম্মদ ঘুরির পরাজয়ের কারণ ছিল।

১১৯১ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের থানেশ্বরের কাছাকাছি তরাইনের রণক্ষেত্রে চৌহান রাজা পৃথ্বিরাজ ও সম্মিলিত রাজপুত বাহিনী এবং মুহাম্মদ ঘুরির বাহিনীর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধই তরাইনের প্রথম যুদ্ধ নামে পরিচিত। পাঞ্জাব অধিকার করার পর ভারতে স্থায়ী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুহাম্মদ ঘুরি দিল্লি ও আজমিরের রাজপুত চৌহান বংশের রাজা পৃথ্বিরাজের মুখোমুখি হন। ১১৮৯ খ্রিষ্টাব্দে ভাতিন্দা দখল করে মুহাম্মদ ঘুরি চৌহান রাজের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলে তাকে মোকাবিলার উদ্দেশ্যে পৃথ্বিরাজ উত্তর ভারতের হিন্দু রাজাদের সমন্বয়ে একটি 'কনফেডারেসি' বা ঐক্যজোট গঠন করেন। কনৌজরাজ জয় চাঁদ ছাড়া প্রায় সব হিন্দু রাজা এ যুদ্ধে যোগ দেন। যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী ভীষণভাবে পরাজিত হয়। মুহাম্মদ ঘুরি আহত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যান।

প্রশ্ন-২২. তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের কারণ ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: তরাইনের প্রথম যুদ্ধের পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলার জন্য মুহাম্মদ ঘুরি ১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

মুহাম্মদ ঘুরির উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষে স্থায়ী মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা। তাই ১১৯১ খ্রিষ্টাব্দে তরাইনের প্রথম যুদ্ধে পরাজয় বরণ করা সত্ত্বেও ১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে বিজয় অর্জনের দীপ্ত শপথ নিয়ে ১,২০,০০০ সৈন্যসহ তিনি তরাইনের প্রান্তরে উপস্থিত হন। দৃঢ় সংকল্প আর অসীম সাহসের সাথে যুদ্ধ করে তিনি সম্মিলিত রাজপুত বাহিনী এবং চৌহান রাজা পৃথ্বিরাজকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। এভাবে মুহাম্মদ ঘুরি তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে জয়লাভ করে ভারতে স্থায়ী মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রশ্ন-২৩. তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো।
[সকল বোর্ড ২০১৯]

উত্তর: তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ ভারতে স্থায়ী মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ ছিল একটি চূড়ান্ত মীমাংসাত্মক যুদ্ধ, যা হিন্দুস্থানের ওপর মুসলিম আধিপত্যের চরম সাফল্যের সূচনা করেছিল। এ যুদ্ধে মুহাম্মদ ঘুরি ও মুসলিম বাহিনী দীপ্ত শপথে যুদ্ধ করে পৃথ্বিরাজ ও সম্মিলিত রাজপুত বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে। ফলে ভারতীয় রাষ্ট্রগুলোর ওপর মুহাম্মদ ঘুরির চূড়ান্ত সফলতা সুনিশ্চিত হয় এবং ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্যের স্থায়ী ভিত প্রতিষ্ঠিত হয়।

? অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ভারত কোন মহাদেশে অবস্থিত?
ক. এশিয়া খ. ইউরোপ
গ. আমেরিকা ঘ. আফ্রিকা

২. ভারতবর্ষকে সুরক্ষা করেছে কোন পর্বত?
ক. কুনলুন পর্বত খ. আন্দিজ পর্বত
গ. পিরেনিজ পর্বত ঘ. হিমালয় পর্বত

৩. ভারতবর্ষকে নৃতত্ত্বের জাদুঘর বলা হয় কেন?
ক. বৈচিত্র্যপূর্ণ ভৌগোলিক অবস্থার জন্য
খ. বর্ণাশ্রয়ী সমাজ ব্যবস্থার জন্য
গ. বহু জাতি-গোষ্ঠীর বাসস্থান বলে
ঘ. প্রাকৃতিক সীমাবেষ্টিত ভূখণ্ড বলে

৪. কত শতাব্দীতে ভারতবর্ষে মুসলিম আধিপত্যের সূচনা হয়?
ক. অষ্টম খ. একাদশ
গ. দ্বাদশ ঘ. অষ্টাদশ

৫. আরবদের সিন্ধু বিজয়ের সময় মুসলিম বিশ্বের খলিফা ছিলেন কে?
ক. আল ওয়ালিদ খ. হাজ্জাজ বিন ইউসুফ
গ. আব্দুল মালিক ঘ. আব্দুল আজিজ

৬. সিন্ধু বিজয়ী মুসলিম বীরের নাম কী?
ক. মুহাম্মদ বিন কাসিম খ. বখতিয়ার খলজি
গ. সুলতান মাহমুদ ঘ. মুহাম্মদ ঘুরি

৭. হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সিন্ধু ও মুলতান অভিযানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কেন?
ক. রাজা দাহিরের সামরিক অভিযানের ফলে
খ. রাজা দাহিরের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের কারণে
গ. সেনাপতির ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের কারণে
ঘ. সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের কারণে

৮. 'আরবদের সিন্ধু বিজয় একটি নিষ্ফল উপাখ্যান'-এ উক্তিটি কোন ঐতিহাসিকের?
ক. ঈশ্বরী প্রসাদ খ. স্ট্যানলি লেনপুল
গ. পি. কে. হিট্টি ঘ. এ. বি. এম. হবিবুল্লাহ

৯. ভারতে দ্বিতীয় পর্যায়ে মুসলিম অভিযানে নেতৃত্ব দেন কে?
ক. সুলতান মাহমুদ খ. মুহাম্মদ বিন কাসিম
গ. মুহাম্মদ ঘুরি ঘ. কুতুবউদ্দিন আইবেক

১০. গজনি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?
ক. সুলতান মাহমুদ খ. আলপ্তগীন
গ. সবুক্তগীন ঘ. সুলতান মাসুদ

১১. সুলতান মাহমুদ কত খ্রিষ্টাব্দে ভারতে প্রথম অভিযান প্রেরণ করেন?
ক. ১০০০ খ. ১০০৪
গ. ১০০৬ ঘ. ১০০৮

১২. সুলতান মাহমুদ কতবার ভারত আক্রমণ করেন?
ক. ১৫ খ. ১৬
গ. ১৭ ঘ. ১৮

১৩. সুলতান আলাউদ্দিন খলজি দাক্ষিণাত্যের বরঙ্গাল বিজয়ের পর প্রচুর ধন-রত্নসহ দিল্লিতে ফিরে যান। তার সাথে নিচের কোন শাসকের মিল রয়েছে?
ক. মুহাম্মদ বিন কাসিম খ. সুলতান মাহমুদ
গ. কুতুবউদ্দিন আইবেক ঘ. শের শাহ খান

১৪. 'স্বর্গীয় বধূ' মসজিদটিকে ঐতিহাসিকেরা কী নামে আখ্যায়িত করেছেন?
ক. প্রাচ্যের পেপিস খ. প্রাচ্যের বিস্ময়
গ. প্রাচ্যের হোমার ঘ. প্রাচ্যের ডান্তি

১৫. 'ফতুহুল বুলদান' গ্রন্থটির প্রণেতার নাম কী?
ক. আল মাসউদি খ. আল বালাজুরি
গ. ইবনে খালদুন ঘ. আলি আত তাবারি

১৬. কার অনুরোধে আবুল কাসেম ফেরদৌসি 'শাহনামা' রচনা করেন?
ক. সুলতান মাহমুদ খ. মুহাম্মদ ঘুরি
গ. কুতুবউদ্দিন আইবেক ঘ. ইলিয়াস শাহ

১৭. 'কিতাব-উল-হিন্দ' গ্রন্থের রচয়িতা কে?
ক. ইবনে হায়সাম খ. আল বিরুনি
গ. আমির খসরু ঘ. আল রাজি

১৮. তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ কত খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়?
ক. ১১৯০ খ. ১১৯১
গ. ১১৯২ ঘ. ১১৯৩

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন

১৯. মুসলিম বিজয়ের আগে ভারতবর্ষে—
i. কোনো রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না
ii. কেন্দ্রীয় সরকারের অভাব ছিল
iii. রাজারা ঐক্যবদ্ধ ছিল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২০. সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল—
i. নিজ রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান
ii. ধন-সম্পদ সংগ্রহ
iii. হিন্দুধর্মের বিনাশ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২১ ও ২২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
অটোমান সুলতান প্রথম সেলিমের মিসর বিজয় ছিল তার রাজত্বকালের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কেননা মিসর বিজয়ের ফলে প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি আলেকজান্দ্রিয়ার ওপর অটোমানদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

২১. সুলতান সেলিমের মিসর বিজয়ের সাথে খলিফা প্রথম ওয়ালিদের কোন দেশ বিজয়ের মিল রয়েছে?
ক. গজনি খ. সিন্ধু
গ. কাশ্মির ঘ. বঙ্গ

২২. উক্ত বিজয়ের ফলে আরবরা—
i. অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করে
ii. সভ্যতা ও সংস্কৃতির নানা উপকরণ লাভ করে
iii. সাম্য ও উদার শাসনব্যবস্থার জ্ঞান লাভ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৩ ও ২৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
আব্দুল্লাপুরের যুবক ইব্রাহিম তার পারিবারিক সচ্ছলতা আনয়নের জন্য বেশ কয়েকবার বিদেশে চাকরি গ্রহণের মাধ্যমে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। এই অর্থ-সম্পদ দিয়ে তার গ্রামের বাড়িতে প্রাসাদোপম অট্টালিকা তৈরি করে বাড়িটিকে অনিন্দ্যসুন্দর করে গড়ে তোলেন।

২৩. উদ্দীপকে বর্ণিত ইব্রাহিমের কর্মকাণ্ড কোন সুলতানের কর্মকাণ্ডের অনুরূপ?
ক. মুহাম্মদ ঘুরি খ. কুতুবউদ্দিন আইবেক
গ. সুলতান মাহমুদ ঘ. সুলতান ইলতুৎমিশ

২৪. উক্ত সুলতানের কর্মকাণ্ডে প্রকাশ পেয়েছে—
i. আর্থিক লালসা
ii. সৌন্দর্যবোধ
iii. শিল্প সচেতনতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

খ. বোর্ড পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৫. ভারতবর্ষের প্রাচীনতম অধিবাসী কারা? *[সকল বোর্ড ২০২১, ২০১৮, ২০১৭]*
ক. আর্য খ. শক্
গ. হুন ঘ. দ্রাবিড়

২৬. মুসলিমদের ভারত আগমনের আগে বাংলা ও বিহারে কোন বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল? *[সকল বোর্ড ২০১৬]*
ক. পাল খ. সেন
গ. গুপ্ত ঘ. মৌর্য

২৭. ক্ষত্রিয়দের পেশা কী ছিল? *[সকল বোর্ড ২০১৫]*
ক. ব্যবসা খ. চাকরি
গ. যুদ্ধ ঘ. কৃষিকাজ

২৮. ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে ভারতীয় উপমহাদেশের সাথে কাদের যোগাযোগ ছিল? *[সকল বোর্ড ২০১৯]*
ক. আরব শেখদের খ. আরব সৈনিকদের
গ. আরব কবিদের ঘ. আরব বণিকদের

২৯. 'ক' নামক এলাকায় বহুবিবাহ প্রচলিত থাকলেও বিধবা বিবাহ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ছিল। এটি প্রাচীন ভারতের কোন অবস্থার ইঙ্গিত বহন করে? *[সকল বোর্ড ২০২১]*
ক. সামাজিক খ. রাজনৈতিক
গ. ধর্মীয় ঘ. অর্থনৈতিক

৩০. মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে সিন্ধুর রাজা কে ছিলেন? *[সকল বোর্ড ২০২১; ২০১৫]*
ক. হর্ষবর্ধন খ. শশাঙ্ক
গ. দাহির ঘ. পৃথ্বিরাজ

৩১. সিন্ধু বিজয়ের প্রত্যক্ষ কারণ কোনটি? *[সকল বোর্ড ২০২৫; ২০২২; ২০১৫]*
ক. খলিফার নির্দেশ
খ. বিদ্রোহীদের আশ্রয়দান
গ. দাহিরের দুঃশাসন
ঘ. জলদস্যু কর্তৃক আরব জাহাজ লুণ্ঠন

৩২. কত খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধু বিজয় করেন? *[সকল বোর্ড ২০২১; ২০১৬]*
ক. ৭১০ খ. ৭১১
গ. ৭১২ ঘ. ৭১৩

৩৩. সিন্ধু বিজয়ে মুসলমানরা কোন ক্ষেত্রে বেশি লাভবান হয়েছে? *[সকল বোর্ড ২০২৫]*
ক. রাজনৈতিক খ. অর্থনৈতিক
গ. সাংস্কৃতিক ঘ. সামাজিক

৩৪. নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় অবস্থিত ছিল? *[সকল বোর্ড ২০২৩]*
ক. মালবে খ. আজমিরে
গ. বিহারে ঘ. গুজরাটে

৩৫. ভারতের কোন অঞ্চলে প্রথম মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়? *[সকল বোর্ড ২০২৫]*
ক. সিন্ধু খ. পাঞ্জাব
গ. দিল্লি ঘ. বাংলা

৩৬. সোমনাথ মন্দির কোথায় অবস্থিত? *[সকল বোর্ড ২০২২; ২০২১; ২০১৯; ২০১৭]*
ক. গুজরাট খ. রাজস্থান
গ. দিল্লি ঘ. পাঞ্জাব

৩৭. প্রাচ্যের হোমার কাকে বলা হয়? *[সকল বোর্ড ২০১৯]*
ক. আল ফারাবি খ. ফেরদৌসি
গ. উনসুরি ঘ. হাফিজ

৩৮. 'শাহনামা' গ্রন্থের রচয়িতা কে? *[সকল বোর্ড ২০১৬]*
ক. আবুল কাসেম ফেরদৌসি খ. আল বিরুনি
গ. আবুল ফজল ঘ. আবুল হাসান ফিদা

৩৯. ভারতবর্ষে স্থায়ী মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? *[সকল বোর্ড ২০২২]*
ক. মুহাম্মদ বিন কাসিম খ. সুলতান মাহমুদ
গ. মুহাম্মদ ঘুরি ঘ. কুতুবউদ্দিন আইবেক

৪০. তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের বিশেষত্ব কী? *[সকল বোর্ড ২০২৫]*
ক. মুসলিম শক্তির বিজয়
খ. ভারতীয়দের অনৈক্য
গ. মুহাম্মদ ঘুরির যুদ্ধ কৌশল
ঘ. ভারতে স্থায়ী মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা

৪১. ভারতের নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়— *[সকল বোর্ড ২০২১; ২০১৯]*
i. ইসলামের সাম্য ও শান্তির বার্তা পেয়ে
ii. আরব বণিকদের সাথে ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে
iii. শাসকের নিপীড়ন থেকে মুক্তি লাভের আশায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪২. আরবদের সিন্ধু আক্রমণের পরোক্ষ কারণ ছিল— *[সকল বোর্ড ২০১৯]*
i. দেবল বন্দরে জলদস্যুদের জাহাজ লুণ্ঠন
ii. সীমান্তের নিরাপত্তা বিধান
iii. পারস্যবাসীকে রাজার সাহায্য দান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪৩. মুহাম্মদ ঘুরির ভারত অভিযানের কারণ ছিল— *[সকল বোর্ড ২০২৩]*
i. সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা
ii. ইসলাম প্রচার
iii. নিজ রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪৪. মুহাম্মদ ঘুরি ছিলেন— *[সকল বোর্ড ২০২২]*
i. উদ্যমী
ii. দক্ষ সংগঠক
iii. উচ্চাকাঙ্ক্ষী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪৫. তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের ফলে— *[সকল বোর্ড ২০১৭]*
i. ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়
ii. রাজপুতদের প্রাধান্য খর্ব হয়
iii. বাণিজ্যিক পথ সুগম হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪৬ ও ৪৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
মুসলিম বিজয়ের আগে স্পেনে বর্ণ ও জাতিভেদ প্রথা প্রবল আকার ধারণ করে। সমাজে ঐক্য ও সংহতি চরমভাবে বিনষ্ট হয়। ধর্মীয় ও সামাজিক নিপীড়ন থেকে মুক্তি পেতে নিম্নবর্ণের জনগণ মুক্তির পথ খোঁজে। ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে মুসা ও সেনাপতি তারিক বিন জিয়াদ অত্যাচারী রাজা রডারিককে পরাজিত করে স্পেনে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। *[সকল বোর্ড ২০২৩]*

৪৬. উদ্দীপকের ঘটনাটির সাথে ভারতের মুসলমানদের কোন অভিযানের সাদৃশ্য রয়েছে?
ক. সোমনাথ অভিযান খ. সিন্ধু অভিযান
গ. উত্তর ভারত অভিযান ঘ. গুজরাট অভিযান

৪৭. মুসলমানদের উক্ত অভিযানের কারণ ছিল—
i. সাম্রাজ্যবাদী নীতি
ii. রাজা দাহিরের ঔদ্ধত্য
iii. হিন্দু বিরোধী নীতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪৮ ও ৪৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
গ্রিক বীর আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণ ভারতের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। পারস্য ও আফগানিস্তান তার দখলে এলে তিনি ভারতের দিকে দৃষ্টি দেন এবং ঝিলাম নদী ও সিন্ধু নদের বেশকিছু অঞ্চল তার অধিগত হয়। *[সকল বোর্ড ২০২২]*

৪৮. উদ্দীপকের গ্রিক বীর আলেকজান্ডারের সাথে কোন শাসকের তুলনা করা যায়?
ক. সুলতান মাহমুদ খ. সবুক্তগীন
গ. আলপ্তগীন ঘ. মুহাম্মদ ঘুরি

৪৯. উক্ত শাসক ছিলেন—
i. দিগ্বিজয়ী বীর
ii. দক্ষ সমর সংগঠক
iii. শ্রেষ্ঠ শাসক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৫০ ও ৫১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
সিজার রাজ্য বিস্তারের অভিলাষে সমৃদ্ধশালী স্পেনে বারবার সামরিক অভিযান পরিচালনা করে বিজয় অর্জন করলেও সেখানে স্থায়ী শাসন প্রতিষ্ঠা করেননি। বরং সম্পদ সংগ্রহ করে চলে এসেছেন। *[সকল বোর্ড ২০২৫]*

৫০. উদ্দীপকের সিজারের সাথে ভারত বিজয়ী কোন মুসলিম বীরের সামঞ্জস্য রয়েছে?
ক. মুহাম্মদ বিন কাসিম খ. সুলতান মাহমুদ
গ. মুহাম্মদ ঘুরি ঘ. কুতুবউদ্দিন আইবেক

৫১. সিজারের মতো কর্মকাণ্ড পরিচালনার কারণে উক্ত ভারত বিজয়ী মুসলিম বীর ইতিহাসে কী হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন?
(ক) সাম্রাজ্যবাদী (খ) লুণ্ঠনকারী
(গ) অত্যাচারী (ঘ) উগ্রবাদী

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৫২ ও ৫৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
'ক' দেশে ইতোপূর্বে অনেকেই স্থায়ী শাসন প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালিয়ে ব্যর্থ হন। বাসিত কৌশলে ঐ দেশে সফল অভিযান পরিচালনায় সক্ষম হন। তিনি বিজিত দেশে সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করে স্বদেশে ফিরে যান। *[সকল বোর্ড ২০১৮]*

৫২. উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বিজেতা হলেন—
ক. মুহাম্মদ বিন কাসিম খ. সুলতান খসরু মালিক
গ. মুহাম্মদ ঘুরি ঘ. কুতুবউদ্দিন আইবেক

৫৩. উক্ত বিজেতার অভিযানের ফলাফল ছিল—
i. রাজপুতদের দুর্বলতা প্রকাশ
ii. মুসলিম সৈন্যদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ
iii. বিজিত অঞ্চলে বিজেতার প্রত্যক্ষ শাসন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৫৪ ও ৫৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
সুলতান 'A' ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠাতা। ১১৯১ সালে তার সাথে এক হিন্দু শাসকের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে 'A' সুলতান পরাজিত হয়। সুলতানের সেনাবাহিনীতে আফগান, খিলজি ও তুর্কি সৈন্য ছিল। *[সকল বোর্ড ২০১৬]*

৫৪. উদ্দীপকে কোন যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে?
ক. পানিপথের প্রথম যুদ্ধ খ. খানুয়ার যুদ্ধ
গ. তরাইনের প্রথম যুদ্ধ ঘ. তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ

৫৫. উদ্দীপকে সুলতানের সাথে তোমার পঠিত কোন মুসলিম সুলতানের মিল আছে?
ক. সুলতান মাহমুদ খ. মুহাম্মদ ঘুরি
গ. মুহাম্মদ বিন কাসিম ঘ. বখতিয়ার খলজি

উত্তরমালা

১	ক	২	ঘ	৩	গ	৪	ক	৫	ক	৬	ক	৭	খ	৮	খ	৯	ক	১০	গ	১১	ক	১২	গ
১৩	খ	১৪	খ	১৫	খ	১৬	ক	১৭	খ	১৮	গ	১৯	ক	২০	ক	২১	খ	২২	ঘ	২৩	গ	২৪	ঘ
২৫	ঘ	২৬	খ	২৭	গ	২৮	ঘ	২৯	ক	৩০	গ	৩১	ঘ	৩২	গ	৩৩	গ	৩৪	গ	৩৫	ক	৩৬	ক
৩৭	খ	৩৮	ক	৩৯	গ	৪০	ঘ	৪১	খ	৪২	গ	৪৩	ঘ	৪৪	ক	৪৫	ক	৪৬	খ	৪৭	ক	৪৮	ক
৪৯	ঘ	৫০	খ	৫১	খ	৫২	গ	৫৩	ক	৫৪	গ	৫৫	খ										

গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মুসলমানদের বিজয়ের আগে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা বিশৃঙ্খল ছিল— ব্যাখ্যা করো।
২. আরব মুসলমানদের বিজয় অভিযান চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার কারণ ব্যাখ্যা করো।
৩. সিন্ধুতে আরব শাসন দীর্ঘস্থায়ী না হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করো।
৪. আরবদের সিন্ধু বিজয়ের সাংস্কৃতিক ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী— ব্যাখ্যা করো।
৫. গজনি রাজবংশের পরিচয় দাও।
৬. ভারতে পরিচালিত সুলতান মাহমুদের দ্বাদশ অভিযানটি ব্যাখ্যা করো।
৭. সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের সাংস্কৃতিক ফলাফল ব্যাখ্যা করো।
৮. সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে সুলতান মাহমুদ সফল ছিলেন— ব্যাখ্যা করো।
৯. ঘুরি রাজবংশের পরিচয় দাও।
১০. ভারতের বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক পরিস্থিতিই মুহাম্মদ ঘুরিকে ভারত অভিযানে উৎসাহী করেছিল— ব্যাখ্যা করো।

ঘ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. রাজিব যে সমাজে বসবাস করত সে সমাজটি নানা জাতিভেদ প্রথা ও শ্রেণিবৈষম্যে বিভক্ত ছিল। যেখানে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত এর চার শ্রেণির মানুষ বাসবাস করত। সমাজে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য ছিল প্রকট। অধিকাংশ লোক নিম্নমধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণিতে বসবাস করলেও তাদের তেমন কোনো অধিকার বা সামাজিক মর্যাদা ছিল না। প্রথম দুই শ্রেণিই সমাজের সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত এবং তাদের হাতেই ছিল মূলত সকল ক্ষমতা।
[ঢা. বো., রা. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২০]
ক. মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে সিন্ধুর রাজধানী কোথায় ছিল?
খ. ভারতবর্ষকে 'নৃতত্ত্বের জাদুঘর' বলা হয় কেন?
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সমাজের সাথে প্রাক-মুসলিম ভারতের কোন সমাজের বৈষম্যের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত সমাজের অবস্থা যেন প্রাক-মুসলিম ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক চিত্র— পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

২. কৃষ্ণ সাগরে বিভিন্ন দেশের বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল করে। রাশিয়ার পণ্যবাহী জাহাজের মালামাল ও নাবিকরা অপহৃত হলে প্রতিবেশী দেশ ইউক্রেনকে দায়ী করে ক্ষতিপূরণ দাবি করা হয়। ইউক্রেন ক্ষতিপূরণে অস্বীকৃতি জানালে উক্ত ঘটনা ও অন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দুপক্ষের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। ফলে রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণ করে। *[য. বো. ২০২৩]*
ক. সুলতান মাহমুদ কোথাকার সুলতান ছিলেন?
খ. রাজা দাহিরের স্ত্রী জওহর ব্রত পালন করেন কেন? ব্যাখ্যা করো।
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনাটি তোমার পঠিত কোন ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে তোমার পঠিত ঘটনার ফলাফল বিশ্লেষণ করো।

৩. ফরাসি সরকারের সেনাপতি নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দে মিসর বিজয় করেন। কিন্তু নেপোলিয়ন ও ফরাসিরা বেশি দিন মিসরে অবস্থান করতে পারেননি।

তবে মিসরের ইতিহাসে এ বিজয় ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এর ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। *[ঢা. বো., ম. বো., দি. বো., চ. বো., সি. বো., ব. বো. ২০২২]*

ক. রাজা দাহিরের স্ত্রীর নাম কী?
খ. ভিনসেন্ট স্মিথ ভারতবর্ষকে 'নৃতত্ত্বের জাদুঘর' বলেছেন কেন? ব্যাখ্যা করো।
গ. সম্রাট নেপোলিয়নের মিসর বিজয়ের সাথে আরবদের কোন অভিযানের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উক্ত বিজয়ের ফলাফল উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

৪. রমেশ যে দেশে বসবাস করত, সে দেশটি সামাজিক ক্ষেত্রে নানা বর্ণে ও শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনৈক্য ছিল আরও প্রকট। এ পরিস্থিতির সুযোগে পার্শ্ববর্তী রাজ্যের সাম্রাজ্যবাদী শাসক তার একজন তরুণ সেনাপতির নেতৃত্বে অভিযান পরিচালনা করে দেশটি করায়ত্ত করেন। কিন্তু সেখানে বিজয়ী শক্তির দীর্ঘস্থায়ী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা সম্ভব হয়নি। তবে এ বিজয়ের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ফলাফল ছিল গভীর ও সুদূরপ্রসারী। *[সকল বোর্ড ২০১৮]*

ক. সুলতান মাহমুদ কোন রাজবংশের শাসক ছিলেন?
খ. ভারতবর্ষকে 'নৃ-তত্ত্বের জাদুঘর' বলা হয় কেন?
গ. উদ্দীপকের সেনাপতির সাথে তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন সেনাপতির মিল খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকের ফলাফল উক্ত সেনাপতির বিজয়ের ফলাফলের আংশিক প্রতিফলন— মন্তব্য করো।
ঘ. উদ্দীপকের ঘটনাটিতে তোমার পাঠ্যবইয়ের যে ঘটনার ছায়াপাত ঘটেছে ইতিহাসে তার তাৎপর্য মূল্যায়ন করো।

৫. মোঙ্গল নেতা কুবলাই খান মধ্য এশিয়ায় বারবার অভিযান পরিচালনা করতেন। কিন্তু তিনি সেসব অভিযানে বিজয়ী হয়ে সেখানে আধিপত্য বিস্তার না করে বরং সেখানকার ধন-সম্পদ লুটতরাজ করে নিয়ে রাজধানী পিকিংকে সমৃদ্ধশালী করতেন। কুবলাই খান শিল্প-সাহিত্যের সমঝদার ছিলেন। তিনি একজন কবিকে দিয়ে কাব্যগ্রন্থ লিখিয়ে তার পারিশ্রমিক ওয়াদামতো প্রদান করেননি। *[ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো. ও য. বো. ২০২১]*

ক. সুলতান মাহমুদ কোথাকার সুলতান ছিলেন?
খ. সুলতান মাহমুদের সোমনাথ মন্দির বিজয় ইতিহাসে বিখ্যাত কেন?
গ. উদ্দীপকের মহাকাব্য বিষয়ক ঘটনাটি সুলতান মাহমুদের কোন ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. তুমি কি মনে কর, কুবলাই খানের মতো সুলতান মাহমুদও একই উদ্দেশ্যে বারবার ভারত অভিযান পরিচালনা করেছিলেন? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

৬. মধ্যযুগে ধর্মাশ্রিত ইউরোপের চার্চগুলো পুরোহিতদের নির্দেশনা অনুযায়ী পরিচালিত হতো। চার্চের প্রধানরা রাজনৈতিকভাবে বেশ ক্ষমতাশীল হওয়ায় সাধারণ জনগণ তাদের কষ্টার্জিত সম্পদ চার্চের ভিতর গচ্ছিত রাখতো। চার্চগুলো জমাকৃত সম্পদের কারণে বহিঃশত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হতো। *[ম. বো. ২০২৩]*

ক. কিতাব-আল-হিন্দ গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
খ. ভিনসেন্ট স্মিথ ভারতবর্ষকে নৃতত্ত্বের জাদুঘর বলেছেন কেন?
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত চার্চগুলো বহিঃশত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার ঘটনাটির সাথে তোমার পঠিত কোন মন্দির অভিযানের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত মন্দির অভিযানের কারণ ও ফলাফল বিশ্লেষণ করো।

৭. অটোমান সিংহাসনে আরোহণ করে সুলতান সুলেমান সুসজ্জিত সামরিক বাহিনী গঠন করেন। তিনি সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি ও সীমান্ত অঞ্চলের নিরাপত্তাসহ নানা কারণে পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহে অনেকবার অভিযান পরিচালনা করেন। প্রত্যেক অভিযানে তিনি জয়লাভ করলেও স্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা না করে বরং বিপুল পরিমাণ ধনসম্পদ নিয়ে নিজ সাম্রাজ্যে ফিরে আসেন। এতে করে একদিকে যেমন তার সাম্রাজ্য নানাভাবে সমৃদ্ধশালী হয়, তেমন অন্যদিকে সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলো তার বশ্যতা স্বীকার করে নেয়।
[ঢা. বো., রা. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫]

ক. মুহাম্মদ বিন কাসিম কত খ্রিষ্টাব্দে সিন্ধু বিজয় করেন?
খ. আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রত্যক্ষ কারণ কী ছিল?
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত সুলতান সুলেমানের সাথে তোমার পঠিত কোন শাসকের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উক্ত শাসকের মতো তোমার পাঠ্যবইয়ের শাসকও একই উদ্দেশ্যে অভিযান পরিচালনা করেন— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো।

৮. মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খান নিজ রাজ্য মঙ্গোলিয়ায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর চীন, খাওয়ারিযম, রাশিয়া, তুর্কিস্তান, সিস্তান প্রভৃতি রাজ্যে অভিযান পরিচালনা করেন। এসব অঞ্চল বিজয় করে তিনি বিজিত অঞ্চলের ধন-সম্পদ দিয়ে পিতৃরাজ্য মঙ্গোলিয়াকে স্থাপত্যিক ও সামরিক সাজে সজ্জিত করেন। মঙ্গোলিয়ায় গড়ে তোলেন মনোরম অট্টালিকা। এছাড়াও তিনি বিজিত অঞ্চলে স্থায়ী শাসন প্রতিষ্ঠা করেন এবং পিকিং বিজয় করে সেখানে মোঙ্গলীয় শাসনরীতির প্রবর্তন করেন। তাছাড়া তিনি বিজিত অঞ্চলে স্থায়ী শাসন সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে সামরিক ও প্রশাসনিক রীতি-নীতি সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হতো।

ক. মুহাম্মদ বিন কাসিম কত বছর বয়সে সিন্ধুতে অভিযান পরিচালনা করেন?
খ. সিন্ধু বিজয়ের ধর্মীয় ফলাফল কীরূপ ছিল?
গ. চেঙ্গিস খানের সাথে তোমার পঠিত কোন শাসকের মিল বিদ্যমান? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. মিল থাকলেও উভয় শাসকের উদ্দেশ্য ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত— তুমি কি বক্তব্যটি সমর্থন কর? মতের পক্ষে যুক্তি দাও।

৯. আহমদ শাহ ১৭৪৮ খ্রিষ্টাব্দে সিরহিন্দ আক্রমণ করেন। কিন্তু সিরহিন্দের শাসক মইন-উল-মূলক মানপুরের প্রথম যুদ্ধে তাকে পরাজিত করেন। আহমদ শাহ ১৭৪৯ খ্রিষ্টাব্দে শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে ২য় যুদ্ধে সিরহিন্দের শাসনকর্তাকে পরাজিত করেন। আহমদ শাহ বিজয়ী অঞ্চলে তার সেনাপতিকে দায়িত্ব প্রদান করে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন। *[ম. বো. ২০২৩]*

ক. মুহাম্মদ ঘুরির প্রকৃত নাম কী?
খ. আলাউদ্দিন হোসেনকে জাহানসুজ বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত ঘটনার সাথে তোমার পঠিত কোন ঘটনার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকের আহমদ শাহর মতো মুহাম্মদ ঘুরিও বিজয়ীর বেশে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন— তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন করো।

১০. অটোমান সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে সুলতান উসমানের নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এশিয়া মাইনরে বিদ্রোহ দমনের পর তিনি একে একে সমগ্র উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল জয় করেন। এরপর তিনি নাইমিয়া, ব্রুসা, কারাসাই, পেরগোমস প্রভৃতি বিজয় করেন। আর ১৩৩৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি নিকোমেডিয়ার প্রথম যুদ্ধে সাময়িক পরাজিত হলেও ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি নিকোমেডিয়ার দ্বিতীয় যুদ্ধে বিজয় অর্জন করে সমগ্র এশিয়া মাইনরে তুর্কি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এভাবে উন্নত সামরিক কৌশল, শত্রুপক্ষের বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা প্রভৃতিই এশিয়া মাইনরে সুলতান উসমানকে স্থায়ীভাবে তুর্কি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছিল। *[ঢা. বো., রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৩]*

ক. মুহাম্মদ ঘুরির প্রকৃত নাম কী?
খ. তরাইনের প্রথম যুদ্ধ কাদের মধ্যে সংঘটিত হয়? ব্যাখ্যা করো।
গ. উদ্দীপকের শাসকের সাথে তোমার পঠিত কোন শাসকের সাথে মিল লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উক্ত শাসকের সামরিক সফলতার কারণগুলো উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

১১. অটোমান সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ ইউরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের সম্মিলিত শক্তির নেতৃত্বদানকারী হাঙ্গেরির বিখ্যাত সেনাপতি হুনিয়াদির কাছে যুদ্ধে হেরে যান এবং সন্ধি করতে বাধ্য হন। পরে ইউরোপীয় শক্তিবর্গ সন্ধি ভঙ্গ করেন এবং ভার্না নগরী অবরোধ করেন। সুলতান মুরাদ হুনিয়াদিকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার জন্য চল্লিশ হাজার সৈন্য নিয়ে ভার্নায় উপস্থিত হন। ১৪৪৪ খ্রিষ্টাব্দে উভয় বাহিনীর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হুনিয়াদি পরাস্ত হন এবং হাঙ্গেরির রাজা নিহত হন। এভাবে সুলতান মুরাদ প্রথম যুদ্ধে হুনিয়াদির কাছে হেরে যাওয়ার প্রতিশোধ নিলেন। ফলে উত্তর ইউরোপীয় অটোমান অংশ আশঙ্কামুক্ত হলো। *[ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো. ২০২১]*

ক. পৃথ্বিরাজ কোন বংশের রাজা ছিলেন?
খ. রাজা পৃথ্বিরাজের সাথে রাজা জয়চন্দ্রের দ্বন্দ্বের কারণ ব্যাখ্যা করো।
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ভার্নার যুদ্ধের সাথে মুহাম্মদ ঘুরি পরিচালিত কোন যুদ্ধের মিল খুঁজে পাও? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকের যুদ্ধের ফলাফলের সাথে মুহাম্মদ ঘুরির উক্ত যুদ্ধের ফলাফলের পার্থক্য ছিল— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো।

১২. চীন ও তিব্বতের মধ্যবর্তী একটি স্থানের নাম মঙ্গোলিয়া। এই স্থানে বিখ্যাত এক বীরের জন্ম হয়। মধ্য এশিয়ার ইতিহাসে অনন্যসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন এই মঙ্গোলিয়ান বীর হালাকু খানের নাম সর্বাগ্রে। তিনি তার পিতা টুলি খানের কাছ থেকে ১২৫৬ খ্রিষ্টাব্দে উক্ত অঞ্চলের শাসন ক্ষমতা লাভ করেন এবং ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদে অভিযান পরিচালনা করে তা ধ্বংস করেন। পরবর্তীতে সেখানে তিনি একটি নতুন এবং স্থায়ী রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। তার প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের নামকরণ করা হয় ইলখানি রাজবংশ। *[ঢা. বো., ম. বো., দি. বো., চ. বো., সি. বো., ব. বো. ২০২২]*

ক. 'জাহানসুজ' কার উপাধি?
খ. সতীদাহ প্রথা কী? ব্যাখ্যা করো।
গ. উদ্দীপকের মঙ্গোলিয়ান বীর হালাকু খানের মাধ্যমে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন বীরের/শাসকের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? আলোচনা করো।
ঘ. তোমার পঠিত উক্ত বীর/শাসক কর্তৃক ভারতে একটি স্থায়ী মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার বিবরণ দাও।

১৩. আধুনিক মালয়েশিয়া প্রতিষ্ঠার একমাত্র কৃতিত্ব তুন ড. মাহাথির মোহাম্মদের। তিনি ইতিহাসে আলেজান্ডারের মতো কিংবদন্তি কোন মহাবীর বা জাদুকর ছিলেন না। তার পরিচয় একজন সফল শাসক ও দক্ষ সংগঠক হিসেবে। জীবনে তিনি অনেক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, সবগুলোতেই সফল হতে পারেননি। তবে ব্যর্থতার গ্লানি তাকে কখনও কর্তব্যচ্যুত করেনি। মহান এ শাসকের নীতি ও আদর্শ অনুসরণ করে যাচ্ছেন তার উত্তরসূরিরা।

ক. দাহির ভারতের কোন অঞ্চলের রাজা ছিলেন?
খ. প্রাচ্যের বিস্ময় বলতে কী বোঝায়?
গ. তুন ড. মাহাথির মোহাম্মদের প্রচেষ্টার সাথে পাঠ্যবইয়ের কোন শাসকের মিল খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. মালয়েশিয়ার মতো ভারতবর্ষে স্থায়ীভাবে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও উক্ত শাসকের ভূমিকা মূল্যায়ন করো।

১৪. সুলতান শাহরিয়ার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর স্বীয় কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করে পার্শ্ববর্তী রাজাদের বিরুদ্ধে সমর প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। পার্শ্ববর্তী রাজাদের মধ্যে একজন এ আক্রমণ সম্প্রসারণকে তার রাজ্যের প্রতি হুমকিস্বরূপ মনে করেন। সুলতান পার্শ্ববর্তী রাজার বিশাল বাহিনীর নিকট প্রথম যুদ্ধে পরাজিত হলেন। পরের বছর পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলার উদ্দেশ্যে এবং রাজ্য বিস্তারের আশায় এক বিশাল বাহিনী নিয়ে রণক্ষেত্রে পুনরায় শিবির স্থাপন করেন। প্রতিপক্ষের সৈন্য সংখ্যা অধিক হওয়া সত্ত্বেও অসীম বীরত্ব, উন্নত মানের যুদ্ধ কৌশল এবং সাংগঠনিক ক্ষমতার দ্বারা বিজয়ীর গৌরব অর্জন করেন। *[ম. বো., দি. বো. ২০২০]*

ক. মুহাম্মদ ঘুরির প্রকৃত নাম কী?
খ. আলাউদ্দিন হুসাইনকে কেন 'জাহানসুজ' উপাধি দেওয়া হয়? ব্যাখ্যা করো।
গ. উদ্দীপকের শাসকের সাথে তোমার পঠিত কোন শাসকের মিল লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উক্ত শাসকের সামরিক সফলতার কারণগুলো উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

২

দিল্লি সালতানাত যুগ

Era of Delhi Sultanate

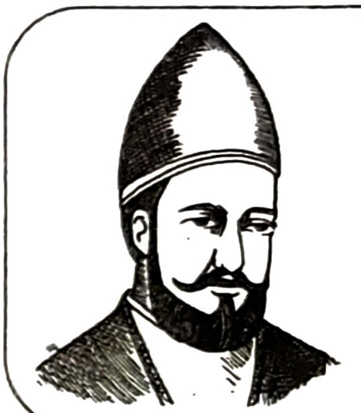

কুতুবউদ্দিন আইবেক

প্রধান প্রধান শব্দ

- সালাতানাত যুগ
- আইবেক
- লাখ বক্‌স
- কুতুব মিনার
- বন্দেগান-ই-চেহেলগান
- রক্তপাত ও কঠোর নীতি
- রাজতন্ত্র
- নওমুসলিম
- হাজার দিনারি
- মাতামহীসুলভ ব্যবস্থা

১২০৬ থেকে ১৫২৬ খ্রি. পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনকালকে দিল্লি সালতানাত বলে অভিহিত করা হয়। সুলতান মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরির মৃত্যুর পর তার অধিকৃত ভারতীয় অঞ্চলের রাজপ্রতিনিধি কুতুবউদ্দিন আইবেক ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে ভারতে স্বাধীন মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন করেন। কুতুবউদ্দিন আইবেক এবং তার পরবর্তী ভারতীয় মুসলিম শাসকবৃন্দ ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত 'সুলতান' উপাধি নিয়ে রাজকার্য পরিচালনা করতেন। তাই ভারতের মুসলিম শাসনের এ কালপর্ব 'সালতানাত যুগ' বা 'সুলতানি আমল' নামে পরিচিতি লাভ করে। এ সময়ে বিভিন্ন 'তুর্কি' ও 'আফগান' রাজবংশ দিল্লি শাসন করে। এরা মুসলিম ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং শিল্প, স্থাপত্য ও সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখেন।

✓ এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখব

- কুতুবউদ্দিন আইবেক: দাস বংশ প্রতিষ্ঠা
- ইলতুৎমিশ: দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা
- সুলতান রাজিয়া: কৃতিত্ব
- গিয়াসউদ্দিন বলবন: সালতানাত সুদৃঢ়ীকরণ
- খলজি বংশ প্রতিষ্ঠা: জালালউদ্দিন খলজি
- আলাউদ্দিন খলজি: রাজ্য বিজয়, শাসন ব্যবস্থা
- তুঘলক বংশ প্রতিষ্ঠা: গিয়াসউদ্দিন তুঘলক
- মুহাম্মদ বিন তুঘলক: মহাপরিকল্পনাসমূহ
- ফিরোজ শাহ তুঘলক: সংস্কার ও জনহিতকর কার্যাবলি
- সৈয়দ ও লোদি বংশ: উত্থান ও পতন
- দিল্লি সালতানাতের ক্রমাবনতি ও পতন

পাঠ পরিকল্পনা

পাঠ ১	মামলুক বা দাস বংশের পরিচয়
পাঠ ২	সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক: দাস বংশ প্রতিষ্ঠা (১২০৬-১২১০ খ্রি.)
পাঠ ৩	কুতুবউদ্দিন আইবেকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্ব
পাঠ ৪ ও ৫	সুলতান ইলতুৎমিশ: ক্ষমতায় আরোহণ ও প্রাথমিক সমস্যা এবং সমস্যা মোকাবিলা ও দিল্লি সালতানাত সুদৃঢ়ীকরণে সুলতান ইলতুৎমিশের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ (১২১১-১২৩৬ খ্রি.)
পাঠ ৬	দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে সুলতান ইলতুৎমিশ
পাঠ ৭ ও ৮	সুলতান রাজিয়া: পরিচয় ও কৃতিত্ব (১২৩৬-১২৪০ খ্রি.) এবং রাজিয়া পরবর্তী সুলতান ইলতুৎমিশের অন্য উত্তরাধিকারী
পাঠ ৯	সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন: প্রাথমিক জীবন ও গৃহীত কার্যাবলি (১২৬৬-১২৮৭ খ্রি.)
পাঠ ১০ ও ১১	দিল্লি সালতানাত সুদৃঢ়ীকরণে সুলতান বলবনের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ এবং তার মোজাল নীতি
পাঠ ১২ ও ১৩	সুলতান বলবনের কৃতিত্ব ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং বলবনের শাসন নীতির সমালোচনা
পাঠ ১৪	সুলতান জালালউদ্দিন খলজি: খলজি বংশের প্রতিষ্ঠা (১২৯০-১২৯৬ খ্রি.)
পাঠ ১৫	আলাউদ্দিন খলজি: প্রাথমিক জীবন, সংকটসমূহ ও সংকট নিরসনে গৃহীত পদক্ষেপ (১২৯৬-১৩১৬ খ্রি.)
পাঠ ১৬	সুলতান আলাউদ্দিন খলজির সাম্রাজ্য বিস্তার: উত্তর ভারত বিজয়
পাঠ ১৭	সুলতান আলাউদ্দিন খলজির দক্ষিণ ভারত বিজয়
পাঠ ১৮	সুলতান আলাউদ্দিন খলজির শাসন ব্যবস্থা এবং সংস্কারসমূহ
পাঠ ১৯	সুলতান আলাউদ্দিন খলজির মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও এর ফলাফল
পাঠ ২০	আলাউদ্দিন খলজির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্ব এবং খলজি বংশের পতন
পাঠ ২১	সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক: তুঘলক বংশ প্রতিষ্ঠা (১৩২০-১৩২৫ খ্রি.)
পাঠ ২২	সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক: প্রাথমিক জীবন, সিংহাসনে আরোহণ এবং উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা প্রণয়ন (১৩২৫-১৩৫১ খ্রি.)
পাঠ ২৩	সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা
পাঠ ২৪	সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজ্য বিস্তার পরিকল্পনা এবং পরিকল্পনা ব্যর্থতার কারণ ও এর প্রতিক্রিয়া
পাঠ ২৫	মুহাম্মদ বিন তুঘলকের চরিত্র ও কৃতিত্ব
পাঠ ২৬	সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক: প্রাথমিক জীবন এবং সমর অভিযান ও বিদ্রোহ দমন (১৩৫১-১৩৮৮ খ্রি.)
পাঠ ২৭	ফিরোজ শাহ তুঘলকের শাসন ব্যবস্থা ও জনহিতকর কার্যাবলি
পাঠ ২৮	সৈয়দ বংশ: উত্থান ও পতন (১৪১৪-১৪৫১ খ্রি.)
পাঠ ২৯	লোদি বংশ: উত্থান ও পতন (১৪৫১-১৫২৬ খ্রি.)
পাঠ ৩০	দিল্লি সালতানাতের ক্রমাবনতি ও পতন

পাঠ ১

মামলুক বা দাস বংশের পরিচয়
Introduction to the Slave Dynasty

পরিচয়: সুলতান মুহাম্মদ ঘুরির মৃত্যুর পর তার বিশ্বস্ত সেনাপতি ও অনুচর কুতুবউদ্দিন আইবেক ভারতে স্বাধীন মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন করেন। মুহাম্মদ ঘুরির উত্তরসূরি সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ ঘুরি আইবেককে রাজদণ্ড ও 'সুলতান' উপাধি দেন। ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ জুন আইবেক সুলতান উপাধি গ্রহণ করে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। কুতুবউদ্দিন আইবেকের সিংহাসনে আরোহণের মধ্য দিয়ে ভারতে স্বাধীন মুসলিম শাসন ও একটি নতুন রাজবংশের সূচনা হয়। তার প্রতিষ্ঠিত এ রাজবংশ ইতিহাসে 'দাস বংশ' নামে পরিচিত। কুতুবউদ্দিন আইবেক প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন বলে এ. বি. এম. হবিবুল্লাহ তার প্রতিষ্ঠিত এ রাজবংশকে 'মামলুক' বংশ নামে অভিহিত করেছেন। অবশ্য কেউ কেউ এ বংশকে 'পাঠান' বা 'আফগান বংশ' বলেও উল্লেখ করেছেন। এ বংশের মোট এগারো জন শাসক প্রায় ৮৪ বছর রাজত্ব করেন।

জেনে রাখো

তুর্কি শব্দ 'মামলুক'-এর শাব্দিক অর্থ দাস। দাস বলতে সাধারণত এমন ব্যক্তিদের বোঝায় যারা অন্যের কেনা সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত। দিল্লি সালতানাতের একটি উল্লেখযোগ্য সময় শাসন করেন দাসরা। সুলতান মুহাম্মদ ঘুরির ক্রীতদাস কুতুবউদ্দিন আইবেক ছিলেন এ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। দিল্লি সালতানাত পর্বে ১২০৬ থেকে ১২৯০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এ বংশের মোট ১১ জন শাসক ৮৪ বছর ভারত শাসন করেন। এদের অনেকেই ক্রীতদাস ছিলেন বলে এ শাসনামলকে 'মামলুক শাসন' বলে অভিহিত করা হয়।

মামলুক বা দাস বংশের সুলতানদের (প্রাথমিক যুগের দিল্লির তুর্কি সুলতান) বংশ তালিকা (১২০৬-১২৯০ খ্রি.)

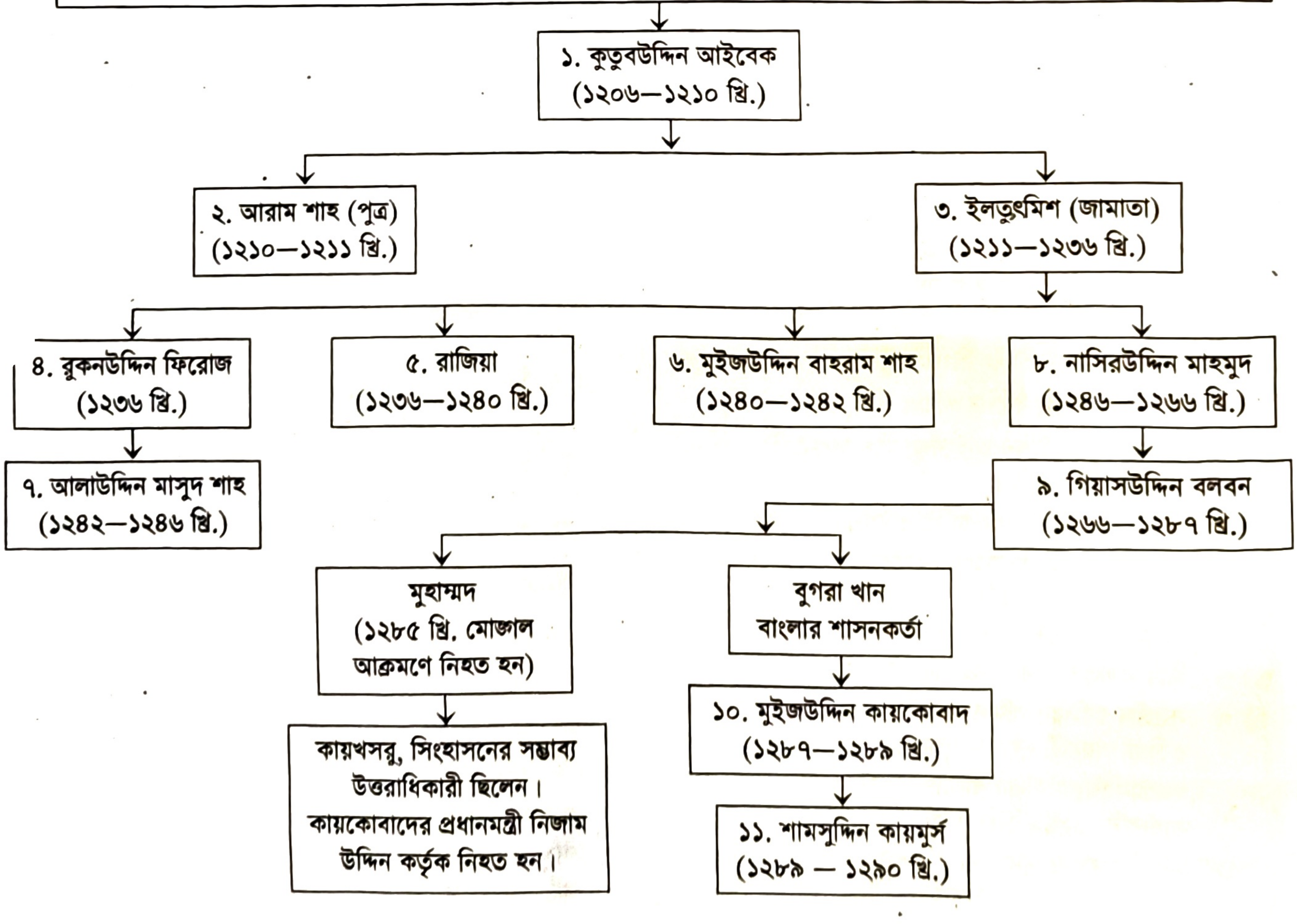
১. কুতুবউদ্দিন আইবেক (১২০৬—১২১০ খ্রি.)
২. আরাম শাহ (পুত্র) (১২১০—১২১১ খ্রি.)
৩. ইলতুৎমিশ (জামাতা) (১২১১—১২৩৬ খ্রি.)
৪. রুকনউদ্দিন ফিরোজ (১২৩৬ খ্রি.)
৫. রাজিয়া (১২৩৬—১২৪০ খ্রি.)
৬. মুইজউদ্দিন বাহরাম শাহ (১২৪০—১২৪২ খ্রি.)
৮. নাসিরউদ্দিন মাহমুদ (১২৪৬—১২৬৬ খ্রি.)
৭. আলাউদ্দিন মাসুদ শাহ (১২৪২—১২৪৬ খ্রি.)
৯. গিয়াসউদ্দিন বলবন (১২৬৬—১২৮৭ খ্রি.)
মুহাম্মদ (১২৮৫ খ্রি. মোঙ্গল আক্রমণে নিহত হন)
বুগরা খান বাংলার শাসনকর্তা
কায়খসরু, সিংহাসনের সম্ভাব্য উত্তরাধিকারী ছিলেন। কায়কোবাদের প্রধানমন্ত্রী নিজাম উদ্দিন কর্তৃক নিহত হন।
১০. মুইজউদ্দিন কায়কোবাদ (১২৮৭—১২৮৯ খ্রি.)
১১. শামসুদ্দিন কায়মুর্স (১২৮৯ — ১২৯০ খ্রি.)

নামকরণের যৌক্তিকতা বিচার: প্রকৃতপক্ষে আইবেকের প্রতিষ্ঠিত রাজবংশকে মামলুক বা দাস বংশ কিংবা পাঠান বা আফগান বংশ নামে অভিহিত করার যৌক্তিক কোনো কারণ নেই বলে আধুনিক ঐতিহাসিকেরা মনে করেন। কেননা- প্রথমত, ১২৯০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ক্ষমতাসীন সুলতানদের মধ্যে কেবল কুতুবউদ্দিন আইবেক, ইলতুৎমিশ এবং বলবন ক্রীতদাস ছিলেন। বাকি ৮ জন সুলতানের প্রত্যেকেই ছিলেন স্বাধীন এবং পরলোকগত সুলতানদের সন্তান বা বংশধর। আর যে তিনজন ক্রীতদাস ছিলেন তারা সিংহাসনে আরোহণের আগেই নিজ নিজ প্রভুর মাধ্যমে দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করেন এবং তারা সিংহাসনে অভিষিক্ত হওয়ার আগে প্রত্যেকেই উচ্চ রাজকর্মচারী পদে নিয়োজিত ছিলেন। বিশেষ করে তারা প্রত্যেকেই আগের সুলতানের সাথে বৈবাহিকভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। তারা উচ্চ রাজকর্মচারীর সম্মান লাভ করায় এবং সুলতানের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কের কারণেই দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। কাজেই তাদের ক্রীতদাস হিসেবে চিহ্নিত করা যুক্তিসংগত নয় বলে আধুনিক ঐতিহাসিকেরা মনে করেন। দ্বিতীয়ত, ভাগ্যবিড়ম্বনার শিকার হয়ে ক্রীতদাসে পরিণত হলেও উল্লিখিত তিনজন সুলতানই অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে তারা ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছিলেন। তৃতীয়ত, এ যুগের সুলতানরা সবাই একই বংশোদ্ভূত ছিলেন না। তাই একে দাস বংশ বলা যায় না।

উপরের ঐতিহাসিক তথ্য পর্যালোচনায় কুতুবউদ্দিনের প্রতিষ্ঠিত রাজবংশকে 'মামলুক' বা দাস বংশ বলা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় না। তাই অনেকেই এ বংশকে 'তথাকথিত দাস বংশ' (So-called Slave Dynasty) বলে অভিহিত করেন। অবশ্য এরূপ নামকরণের ব্যাপারেও আপত্তি আছে। এ অবস্থায় এ বংশের পরিচয় সম্পর্কে বর্তমান ঐতিহাসিকেরা 'প্রাথমিক যুগের দিল্লির তুর্কি সালতানাত' (The Early Turkish Sultanate of Delhi) কথাটি ব্যবহার করেন। বস্তুত এ অভিধাটিই যথার্থ। কারণ এ বংশের সুলতানরা বিভিন্ন পরিবারভুক্ত হলেও জাতিতে সকলেই 'তুর্কি' ছিলেন। কাজেই তাদের বংশীয় পরিচয় তুর্কি দ্বারা হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কুতুবউদ্দিন আইবেক কোথায় স্বাধীন মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন?
২. কুতুবউদ্দিন আইবেক প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ ইতিহাসে কী নামে পরিচিত?
৩. দাস বংশের মোট কত জন শাসক ছিলেন?
৪. কত খ্রিষ্টাব্দে ভারতে দিল্লি সালতানাত প্রতিষ্ঠিত হয়?
৫. কুতুবউদ্দিন আইবেককে রাজদণ্ড ও 'সুলতান' উপাধি দেন কে?
৬. দাস বংশ কত বছর দিল্লি শাসন করে?

উত্তরের জন্য ১৩২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

শাসনকালসহ মামলুক বা দাস বংশের শাসকদের নামের একটি তালিকা তৈরি করো।

পাঠ ২

সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক: দাস বংশ প্রতিষ্ঠা (১২০৬—১২১০ খ্রি.)

Sultan Qutubuddin Aibak: Establishment of the Slave Dynasty (1206-1210 AD)

প্রাথমিক জীবন: ভারতে দাস বংশ ও দিল্লি সুলতানি শাসনের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক। আইবেকের আদি নিবাস তুর্কিস্তানে। তার নামের সাথে যুক্ত 'আইবেক'-শব্দটির যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে পণ্ডিত মহলে মতানৈক্য রয়েছে। 'আইবেক' শব্দের অর্থ 'চন্দ্রদেবতা'। চন্দ্রগ্রহণকালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন বলে তাকে 'আইবেক' নামে অভিহিত করা হয় বলে ঐতিহাসিক ডব্লিউ হেগ মনে করেন। কিন্তু ঐতিহাসিক আবুল কাশিম ফিরিশতার মতে, কুতুবউদ্দিনের বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুলটি ভাঙা ছিল বলে তাকে আইবেক বলা হয়। আবার অনেকে মনে করেন, কুতুবউদ্দিনের নিজ বংশের নাম ছিল আইবেক। আর এ কারণেই তার নামের সাথে আইবেক যুক্ত করা হয়। শৈশবে ভাগ্য বিড়ম্বিত হয়ে কুতুবউদ্দিন আইবেক পারস্যের একজন দাস ব্যবসায়ীর হাতে পড়েন। উক্ত পারসিক দাস ব্যবসায়ী তাকে নিশাপুরের কাজি ফখরুদ্দিন আবদুল আজিজ কুফীর কাছে বিক্রি করে দেন। কাজি তার পুত্রদের সাথে আইবেকের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন এবং তিনি ধর্মশাস্ত্র এবং সমরবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন। কাজির মৃত্যুর পর তার পুত্ররা কুতুবউদ্দিন আইবেককে একজন দাস ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করে দেন এবং এ ব্যবসায়ী তাকে গজনির মুহাম্মদ ঘুরির কাছে বিক্রি করেন।

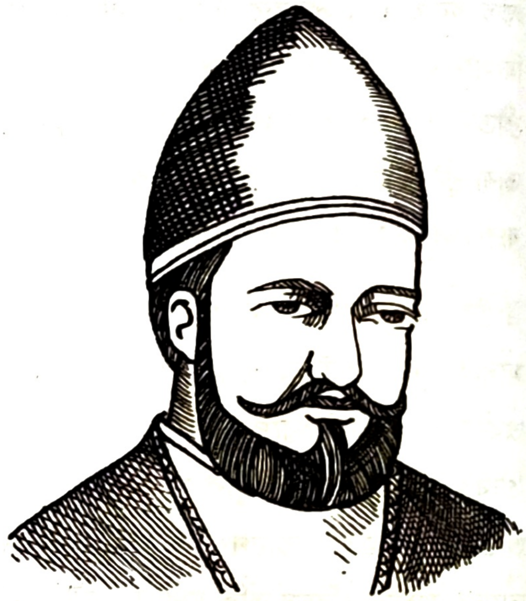

কুতুবউদ্দিন আইবেক

কুতুবউদ্দিন আইবেক দেখতে সুন্দর ছিলেন না। কিন্তু তিনি নানা প্রশংসনীয় গুণসম্পন্ন এবং আকর্ষণীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস, দূরদৃষ্টি ও সমরকুশলতার গুণে আইবেক সামান্য অবস্থা থেকে মুহাম্মদ ঘুরির সবচেয়ে বিশ্বস্ত এবং নির্ভরযোগ্য অনুচরে পরিণত হন। মুহাম্মদ ঘুরি তাকে রাজকীয় অশ্বশালার অধ্যক্ষ বা 'আমির আখুর' পদে নিয়োগ দেন।

ভারতে অধিকৃত অঞ্চলে মুহাম্মদ ঘুরির প্রতিনিধি: প্রকৃত বিচারে ভারতে কুতুবউদ্দিন আইবেকের শাসনকালকে দু'টি পর্বে বিভক্ত করা যায়। যার প্রথম পর্ব ছিল ১১৯২—১২০৬ খ্রি. পর্যন্ত। এ সময়ে তিনি স্বাধীন সুলতান না হয়েও মুহাম্মদ ঘুরির প্রতিনিধি হিসেবে ভারত শাসন ও রাজ্য বিস্তারে নিয়োজিত ছিলেন। মুহাম্মদ ঘুরির যোগ্য ও বিশ্বস্ত প্রতিনিধি ও সেনাপতি হিসেবে এ সময় তিনি মিরাট, হানসি, দিল্লি, কোইল ও রণথম্ভোর দখল করেন। মুহাম্মদ ঘুরির সহযোগী হিসেবে তিনি কনৌজ অধিকারে ভূমিকা রাখেন এবং গুজরাট, বারানসি, কালিঞ্জর, বাদাউন এবং মাহোবা পদানত করেন। আইবেকের নির্দেশে তুর্কি সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি বাংলা ও বিহার জয় করে সেখানে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এভাবে কুতুবউদ্দিন আইবেক তার সমর নৈপুণ্য, যোগ্যতা ও আন্তরিকতায় মুহাম্মদ ঘুরির রাজপ্রতিনিধি হিসেবে অল্প সময়ের মধ্যে উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তুর্কি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

মামলুক বা দাস বংশ এবং দিল্লি সালতানাত প্রতিষ্ঠা: ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান মুহাম্মদ ঘুরি অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে তার অধীন প্রতিনিধিদের মধ্যে তাজউদ্দিন ইয়ালদুজ (কেরমানের শাসনকর্তা), নাসিরউদ্দিন কুবাচা (উচের শাসনকর্তা) এবং কুতুবউদ্দিন আইবেক সার্বভৌম ক্ষমতা দখলে তৎপর হয়ে ওঠেন। এ তিনজনের মধ্যে কুতুবউদ্দিন আইবেক ছিলেন সবচেয়ে যোগ্যতাসম্পন্ন এবং মুহাম্মদ ঘুরির সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও অনুগত। ঘুরি তার জীবদ্দশাতেই কুতুবউদ্দিন আইবেককে ভারতের বিজিত অঞ্চলে রাজপ্রতিনিধি নিয়োগ ও 'মালিক' উপাধি দেন। মুহাম্মদ ঘুরির মৃত্যুর তিন মাস পর ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ জুন লাহোরে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের মুসলিম রাজ্যের সুলতান হিসেবে কুতুবউদ্দিন আইবেক ক্ষমতা গ্রহণ করেন। মুহাম্মদ ঘুরির উত্তরাধিকারী সুলতান গিয়াসউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরি কুতুবউদ্দিনকে রাজদণ্ড প্রদান ও সুলতান উপাধিতে ভূষিত করেন। মুহাম্মদ ঘুরি আইবেককে 'দাসত্ব মুক্তি সনদ' (Letter of manumission) দান করেন বলেও জানা যায়। বস্তুত এর মধ্য দিয়েই ভারতে স্বাধীন দিল্লি সালতানাত ও তথাকথিত দাস বংশ বা প্রাথমিক যুগের তুর্কি শাসনের গোড়াপত্তন ঘটে।

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর সৃষ্ট সমস্যাবলি: সুলতান হিসেবে কুতুবউদ্দিন আইবেক নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হন। মুহাম্মদ ঘুরির প্রচেষ্টায় বলতে গেলে সমগ্র উত্তর ভারত তুর্কিদের পদানত হয়েছিল। তার আকস্মিক মৃত্যুর পর তুর্কি মুসলিম প্রাধান্য কেবল ভারতের সিন্ধু, পাঞ্জাব ও গঙ্গা উপত্যকার কিছু অংশে বজায় থাকে। হিন্দু ও রাজপুত রাজন্যবর্গ তুর্কি আক্রমণের প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারে তৎপরতা শুরু করে। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই কালিঞ্জর, ফররুখাবাদ, বাদাউন ও গোয়ালিয়র তুর্কিদের হাত ছাড়া হয়। সমগ্র পারস্য ও মধ্য এশিয়া পদানত করার পর খাওয়ারিযমের জালালউদ্দিন শাহের রাজ্য লিপ্সা গজনি ছাড়িয়ে ভারত পর্যন্ত সম্প্রসারিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। এ সময় ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির হত্যাকাণ্ডের পর খলজি মালিকদের ক্ষমতার লড়াই লাখনৌতিতে (বাংলায়) বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। তাছাড়া তাজউদ্দিন ইয়ালদুজ গজনি অধিকার করে দিল্লিসহ মুহাম্মদ ঘুরির সমগ্র সাম্রাজ্যের ওপর সার্বভৌমত্ব দাবি করে আইবেকের জন্য আরও কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করেন।

জেনে রাখো

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি জাতিতে ছিলেন তুর্কি এবং পেশায় একজন ভাগ্যান্বেষী সৈনিক। আফগানিস্তানের গরমশির বা আধুনিক দশত-ই-মার্গের অধিবাসী বখতিয়ার খলজি সম্ভবত দারিদ্র্যের কারণে দেশ ত্যাগ করেন। নিজের কর্মশক্তির ওপর নির্ভর করে তিনি ভাগ্যান্বেষণে বের হন এবং সফল হন। ১২০১ সালে বখতিয়ার একটি বৌদ্ধ বিহার জয় করেন। এটি ছিল ওদন্ত বিহার বা ওদন্তপুরী বিহার। বিহার জয়ের পর বখতিয়ার খলজি অনেক ধনরত্নসহ দিল্লির সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের সাথে দেখা করেন। তার নির্দেশে ১২০৪ সালে বখতিয়ার মাত্র ১৮ জন সৈন্য নিয়ে তৎকালীন বাংলার রাজা লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করেন এবং বাংলা জয় করে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজের বর্ণনানুসারে, বখতিয়ার খলজি আলী মর্দান খলজির ছুরিকাঘাতে নিহত হন।

সমস্যা মোকাবিলায় কুতুবউদ্দিন আইবেকের গৃহীত পদক্ষেপ: বিভিন্ন সমস্যাসংকুল পরিস্থিতিতে দায়িত্ব গ্রহণের পর কুতুবউদ্দিন আইবেক রাজ্য সম্প্রসারণ নয়, বরং সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় অধিক মনোযোগী হন। তিনি প্রথমেই সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দিকে নজর দেন। মুহাম্মদ ঘুরির ভারতীয় সাম্রাজ্যের ওপর সার্বভৌমত্বের দাবিদার তাজউদ্দিন ইয়ালদুজকে (সম্পর্কে কুতুবউদ্দিন আইবেকের শ্বশুর ছিলেন) খাওয়ারিজম শাহ গজনি থেকে বের করে দিলে তিনি পাঞ্জাবে আশ্রয় নেন। আইবেক তাকে পাঞ্জাব থেকে বিতাড়িত করেন। তিনি ইয়ালদুজকে অনুসরণ করে গজনিতে যান এবং সেখান থেকেও তাকে বিতাড়িত করেন। অবশ্য মাত্র চল্লিশ দিনের মধ্যেই ইয়ালদুজ পুনরায় গজনিতে ফিরে যান এবং আইবেক গজনি ত্যাগে বাধ্য হন।

সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক হিন্দু ও রাজপুত রাজন্যবর্গের পুনরুত্থান প্রচেষ্টা নস্যাৎ করারও চেষ্টা করেছিলেন । তবে এক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্য অর্জিত হয়নি। এমনকি লাখনৌতির খলজি মালিকদের ক্ষমতার লড়াই প্রশমনেও তিনি বিশেষ মনোযোগ দিতে পারেননি। বাংলা বিজয়ী বীর বখতিয়ারের হত্যাকারী আলী মর্দানকে তিনি বঙ্গের শাসন ক্ষমতা অর্পণ করেন। সম্ভবত দিল্লি সালতানাতের রাজনৈতিক নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করেই সুলতান এ আপসকামী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

সুলতান হিসেবে মুহাম্মদ ঘুরির শাসনামল ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত। ফলে মুহাম্মদ ঘুরির পক্ষে ভারতে বেশি সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ সম্ভব হয়নি। আইবেকও নতুন কোনো অঞ্চল তার সাম্রাজ্যভুক্ত করতে পারেননি। তবে তিনি আগ্রাসী ও বিরোধী শক্তিসমূহ প্রতিহত করার পাশাপাশি নিজ নামে খুৎবা পাঠের ব্যবস্থা করেন। তাছাড়া তিনি অধিকৃত অঞ্চলে নিজের সার্বভৌম কর্তৃত্ব সুদৃঢ় করতে সক্ষম হন।

মৃত্যু: ১২১০ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে লাহোরে 'চৌগান' বা 'পলো' খেলার সময় কুতুবউদ্দিন আইবেক ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে মারাত্মক আহত হন এবং পরে তিনি মারা যান। লাহোরে তাকে সমাধিস্থ করা হয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. 'আইবেক' শব্দের অর্থ কী? *[সকল বোর্ড ২০১৯; ২০১৬]*
২. কুতুবউদ্দিন আইবেককে রাজকীয় অশ্বশালার অধ্যক্ষ বা 'আমির আখুর' পদে নিয়োগ দেন কে?
৩. ভারতের মুসলিম রাজ্যের সুলতান হিসেবে কুতুবউদ্দিন আইবেক কত খ্রিষ্টাব্দে ক্ষমতা গ্রহণ করেন?
৪. কুতুবউদ্দিন আইবেকের সময় মধ্য এশিয়ায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেন কে?
৫. বাংলা বিজয়ী বীর বখতিয়ার খলজির হত্যাকারী কে ছিলেন?
৬. কুতুবউদ্দিন আইবেক কত খ্রিষ্টাব্দে মারা যান?

উত্তরের জন্য ১৩২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. সুলতান মুহাম্মদ ঘুরির প্রতিনিধি হিসেবে কুতুবউদ্দিন আইবেক যেসব অঞ্চল জয় করেন সেগুলোর একটি তালিকা তৈরি করো।
২. প্রাথমিক সমস্যা মোকাবিলায় সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ছক আকারে লেখো।

গ. বাড়ির কাজ

মিসরের মোহাম্মদ আলী একজন সামান্য তামাক ব্যবসায়ী থেকে নিজ প্রতিভা ও যোগ্যতা বলে মিসরের শাসক পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ইংরেজ, ওয়াহাবি, মামলুক ইত্যাদি রাজশক্তিকেও তিনি কঠোর হস্তে মোকাবেলা করেন। বিদ্যা শিক্ষায় পারদর্শিতা না থাকলেও উন্নত সমর ব্যবস্থাপনা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার দ্বারা তিনি তার রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার প্রজাহিতৈষী মনোভাব ও দানশীলতাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এককথায় তাকে আধুনিক মিসরের স্রষ্টা বলা হয়।

১. উদ্দীপকে বর্ণিত মোহাম্মদ আলীর চরিত্রে দিল্লির কোন সুলতানের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা করো।
২. আধুনিক মিসরের স্রষ্টা মোহাম্মদ আলীর মতো উক্ত সুলতানকেও একটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বলা যেতে পারে— তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

পাঠ ৩

কুতুবউদ্দিন আইবেকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্ব
Characteristics and Achievements of Qutubuddin Aibak

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য (Characteristics)

কুতুবউদ্দিন আইবেক ছিলেন উন্নত চারিত্রিক গুণাবলির অধিকারী। ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, “আইবেক ছিলেন ক্ষমতাধর এবং সুযোগ্য শাসক, তিনি সর্বদা উঁচু স্তরের চারিত্রিক দৃঢ়তা বজায় রাখতেন।”[২] তিনি ছিলেন অসীম সাহসী, পরিশ্রমী ও ন্যায়পরায়ণ। ‘তারিখ-ই-মুবারক শাহী’ গ্রন্থের রচয়িতা ইয়াহিয়া বিন আহমদ আস-সরহিন্দি এবং ‘তাজুল মাসির’ গ্রন্থ প্রণেতা হাসান নিযামী আইবেকের উন্নত চারিত্রিক গুণাবলির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এ. বি. এম. হবিবুল্লাহ-এর মতে, “সুলতানের মধ্যে তুর্কির অসীম সাহসিকতার সাথে পারসিক মার্জিত রুচি ও উদারতার সমন্বয় ঘটেছিল।” অসীম উদারতা ও দানশীলতার জন্য তিনি ‘লাখ বক্স’ (লাখ টাকা প্রদানকারী) উপাধি পেয়েছিলেন। তিনি একজন ধর্মানুরাগী এবং ইসলামি অনুশাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তবে তার মধ্যে পরধর্মসহিষ্ণুতাও ছিল।

কৃতিত্ব (Achievements)

দিল্লি সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা: কুতুবউদ্দিন আইবেক ছিলেন স্বাধীন দিল্লি সালতানাতের গোড়াপত্তনকারী। মুহাম্মদ ঘুরির মৃত্যুর পর তিনি গজনির প্রভুত্ব থেকে মুসলিম অধিকৃত ভারতবর্ষকে মুক্ত করে স্বতন্ত্র শাসন কাঠামোর আওতায় নিয়ে আসেন এবং দিল্লি সালতানাতের ভিত্তি রচনা করেন। এ.এল. শ্রী বাস্তবের বর্ণনা মতে, “আইবেক ছিলেন ভারতে তুর্কি সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রায় সমগ্র হিন্দুস্থানের কার্যত প্রথম সুলতান।”[৩] বস্তুত ভারত বিজয় ও রাজ্য স্থাপনে মুহাম্মদ ঘুরি ছিলেন প্রেরণাদাতা। আইবেকই ছিলেন বিস্তারিত পরিকল্পনার উদ্যোক্তা এবং দিল্লি সালতানাতের ভিত্তিপ্রস্তরের স্থপতি।

সেনানায়ক: সেনানায়ক হিসেবে কুতুবউদ্দিন আইবেক অসাধারণ যোগ্যতার পরিচয় দেন। এ.বি.এম. হবিবুল্লাহ তাকে সমরনেতা হিসেবে অসাধারণ কর্মশক্তি ও উন্নত প্রজ্ঞার অধিকারী (A Military leader of great energy and high merit) বলে আখ্যায়িত করেছেন। সেনাপতি হিসেবে আইবেকের নিরলস কর্মপ্রচেষ্টা ও অনুগত সেবার কারণেই মুহাম্মদ ঘুরি তার ভারত বিজয়াভিযানে সফলতা অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। সুলতান হিসেবে কুতুবউদ্দিন আইবেক নতুন রাজ্য জয় করতে পারেননি সত্য, তবে এর জন্য তার সমরপ্রতিভা নয় বরং দায়ী ছিল প্রতিকূল অবস্থা।

শ্রেষ্ঠ শাসক: শুধু সমরনেতা বা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে নয় একজন যোগ্যতাসম্পন্ন শাসক হিসেবেও আইবেক খ্যাতিমান ছিলেন। স্বল্পকালীন রাজত্বে নানা প্রতিকূল পরিস্থিতিজনিত কারণে একটি উন্নত ও যুগোপযোগী শাসনকাঠামো তৈরি করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে সালতানাতের নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব বিধান, অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও প্রজাকল্যাণ নিশ্চিতকরণে তিনি সদা সচেষ্ট ছিলেন। তার রাজত্বকালে জননিরাপত্তার কোনো অভাব ছিল না। চোর ও চৌর্যবৃত্তি প্রশ্নাতীত ব্যাপার ছিল বলে ঐতিহাসিক হাসান নিযামী উল্লেখ করেছেন। কুতুবউদ্দিন আইবেক সামরিক শক্তিনির্ভর একটি শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। রাজস্ব ব্যবস্থায় আগের পদ্ধতি বহাল রাখা হয়। কেন্দ্র ও প্রাদেশিক প্রশাসনে মুসলিম সেনাধ্যক্ষ ও কর্মচারীদের দায়িত্ব দেওয়া হলেও স্থানীয় শাসনভার স্থানীয় কর্মচারীদের ওপরই ন্যস্ত ছিল।

---

[২] "Aibek was a powerful and capable ruler who always maintained high character." –Ishwari Prasad, *A Short History of Muslim Rule in India, p-64.*

[৩] "Aibek was the real founder of Turkish dominion in India and the first defacto sultan of the almost entire Hindustan." – *V.D. Mahajan, The Delhi Sultanate, p-90.*

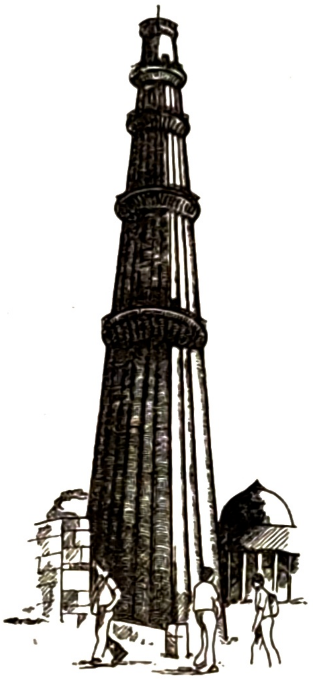
কুতুব মিনার

শিক্ষা ও শিল্প-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক: কুতুবউদ্দিন আইবেক ছিলেন শিক্ষা ও শিল্প-সংস্কৃতি অনুরাগী একজন শাসক। বিদ্বান ও উলামা সমাজ তার কাছ থেকে বিশেষ সমাদর লাভ করেছিলেন। তার কাছ থেকে বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্তদের মধ্যে 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী' গ্রন্থ প্রণেতা ইয়াহিয়া বিন আহমদ আস-সরহিন্দি এবং 'তাজুল মাসির' গ্রন্থ রচয়িতা ঐতিহাসিক হাসান নিযামীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নিযামী তার গ্রন্থটি সুলতানের নামেই উৎসর্গ করেছিলেন। স্থাপত্যশিল্পের প্রতিও সুলতানের বিশেষ অনুরাগ ছিল। দিল্লির 'কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদ' এবং আজমিরের 'আড়াই দিন কা-ঝোপড়া' মসজিদ তার স্থাপত্যপ্রীতির প্রকৃষ্ট নজির। ১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি রাজ্য বিজয়ের স্মারক ও ইসলামের বিজয়গাথা বিশ্বদরবারে উপস্থাপনের জন্য কুতুব মিনার নামে একটি বিজয় স্মৃতিস্তম্ভের নির্মাণ কাজ শুরু করেন। পরবর্তী সুলতান ইলতুৎমিশ এর নির্মাণ কাজ শেষ করেন। প্রখ্যাত সাধক কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকীর নামে এ মিনারটির নামকরণ করা হয়। এটি ছিল তৎকালীন বিশ্বের সর্বোচ্চ মিনার। এটি আজানের জন্য ব্যবহৃত হতো। মিনারটি সাতটি স্তরে বিভক্ত ছিল। উপরের দুটি স্তর ভেঙে গিয়েছে। অক্ষত অবস্থায় এর উচ্চতা ছিল ৩০০ ফুট, বর্তমানে ২৩৮ ফুট। এটি ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যশিল্পের একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি হিসেবে বিবেচিত।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, কুতুবউদ্দিন আইবেক ছিলেন একজন অসীম সাহসী ও সুযোগ্য সেনাপতি। তিনি ছিলেন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা, একটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং একজন প্রজারঞ্জক শাসক। তিনি ভারতে মুসলিম বিজেতাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। তিনি তার উত্তরসূরিদের জন্য ভারতে একটি বিশাল সাম্রাজ্য রেখে যান।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. 'লাখ বক্স' কোন সুলতানের উপাধি ছিল? *[সকল বোর্ড ২০১৬]*
২. স্বাধীন দিল্লি সালতানাতের প্রতিষ্ঠাকারী কে?
৩. কুতুব মিনারের নির্মাতা কে ছিলেন? *[জাবি ২০১৬-১৭]*
৪. কুতুব মিনার কোথায় অবস্থিত? *[সকল বোর্ড ২০১৫]*
৫. 'কুওয়াতুল ইসলাম', 'আড়াই দিন কা-ঝোপড়া' মসজিদ কার স্থাপত্যপ্রীতির উদাহরণ?
৬. কার নামে কুতুব মিনারের নামকরণ হয়? *[সকল বোর্ড ২০১৮]*

উত্তরের জন্য ১৩২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

কুতুবউদ্দিন আইবেকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে একটি চার্ট তৈরি করো।

গ. দলীয় কাজ

দুটি দলে ভাগ হয়ে একদল কুতুবউদ্দিন আইবেকের কৃতিত্ব এবং অন্য দল তার নির্মিত স্থাপত্যশিল্পের নাম ও অবস্থান ছক আকারে লেখো।

পাঠ ৪ ও ৫

সুলতান ইলতুৎমিশ: ক্ষমতায় আরোহণ ও প্রাথমিক সমস্যা এবং সমস্যা মোকাবিলা ও দিল্লি সালতানাত সুদৃঢ়ীকরণে সুলতান ইলতুৎমিশের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ (১২১১-১২৩৬ খি.) [Sultan Iltutmish: Ascending the Throne and Initial Problems and Faces the Problems and Steps taken by Sultan Iltutmish to Consolidate Delhi Sultanate (1211-1236 AD)]

প্রাথমিক জীবন: শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ তুর্কিস্তানের অভিজাত ইলবারি গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ইয়ালম খান। ভ্রাতৃবিরোধের শিকার হয়ে শৈশবেই তিনি জনৈক ব্যক্তির কাছে দাস হিসেবে বিক্রি হন। পরবর্তীকালে জামালউদ্দিন নামের একজন দাস ব্যবসায়ী তাকে দিল্লিতে কুতুবউদ্দিন আইবেকের কাছে বিক্রি করেন। ইলতুৎমিশ ছিলেন সুদর্শন এবং যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শীসহ বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তার প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা, কর্মদক্ষতা ও বিশ্বস্ততায় মুগ্ধ হয়ে আইবেক তার কন্যাকে ইলতুৎমিশের সাথে বিয়ে দেন। কর্মজীবনে তিনি 'আমির-ই-শিকার' বা গোয়ালিয়র দুর্গপ্রধান এবং বুলন্দ শহরের গভর্নর হিসেবে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। পাঞ্জাবের খোক্কার বিদ্রোহ দমনে মুহাম্মদ ঘুরিকে প্রভূত সহায়তার পুরস্কার হিসেবে সুলতানের নির্দেশে আইবেক তাকে দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্তি দেন এবং 'আমির উল উমরাহ' পদবি দান করেন। পরে তাকে বাদাউনের শাসনকর্তাও নিযুক্ত করা হয়।

সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ

সিংহাসনে আরোহণ: সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের আকস্মিক মৃত্যুর পর আরামশাহ (১২১০-১২১১ খ্রি.) সুলতান হিসেবে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। তবে আরামশাহ ছিলেন অযোগ্য ও অকর্মণ্য। অযোগ্যতার কারণে অল্পসময়ের মধ্যেই তিনি প্রজাসাধারণ ও অভিজাতদের বিরাগভাজন হন। অসন্তুষ্ট অভিজাতবর্গ তাকে ক্ষমতাচ্যুতির জন্য কুতুবউদ্দিন আইবেকের জামাতা ও বাদাউনের শাসনকর্তা শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশকে আমন্ত্রণ জানান। ইলতুৎমিশ এ আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে আরাম শাহের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন এবং তাকে পরাজিত করে ১২১১ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লি সালতানাতের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

ইলতুৎমিশের সময়ে সৃষ্ট নানাবিধ সংকট: দিল্লি সালতানাতের এক চরম সমস্যাসংকুল পরিস্থিতিতে ইলতুৎমিশ সুলতান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার সময়ের উল্লেখযোগ্য সমস্যাবলির মধ্যে ছিল–

ক. উচ ও মুলতানের শাসনকর্তা নাসিরউদ্দিন কুবাচার স্বাধীনতা ঘোষণা এবং ভাটিণ্ডা, কুহরাম, সারাসুতি ও লাহোর দখল করে তার পাঞ্জাবমুখি অগ্রাভিযান;

খ. গজনির তাজউদ্দিন ইয়ালদুজের ভারতীয় মুসলিম সাম্রাজ্যের ওপর সার্বভৌমত্বের দাবি উত্থাপন;

গ. দিল্লির অধীনতা অস্বীকার করে আলী মর্দান খলজির বাংলায় (লাখনৌতি) স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা;

ঘ. আজমির, রণথম্ভোর, গোয়ালিয়র প্রভৃতি হিন্দু রাজপুত রাজ্যের রাজন্যবর্গের দিল্লির কর্তৃত্ব প্রত্যাখ্যান এবং কর প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা;

ঙ. মুইজি ও কুতুবি নামের দিল্লির অভিজাতবর্গের বিরোধিতা এবং মোঙ্গল আক্রমণের আশঙ্কা।

সমস্যা মোকাবিলা ও দিল্লি সালতানাত সুদৃঢ়ীকরণে সুলতান ইলতুৎমিশের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ
Faces the Problems and Steps taken by Sultan Iltutmish to Consolidate Delhi Sultanate

সমস্যাসংকুল পরিস্থিতিতে বিচলিত না হয়ে একজন বাস্তববাদী হিসেবে ইলতুৎমিশ বিজ্ঞতার সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেন। তিনি সামরিক ও কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে কয়েক মাসের মধ্যে বিদ্রোহ দমন করে অযোধ্যা, বারানসি, বাদাউন, সিওয়ালিকসহ দিল্লি ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তার অবস্থান সুদৃঢ় করেন। লাহোরের তুর্কি বাহিনীও ইলতুৎমিশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে বাধ্য হয়। তিনি দক্ষতার সাথে বিদ্রোহীদের দমন করে দিল্লি সালতানাতের ভিত মজবুত করেন।

তাজউদ্দিন ইয়ালদুজের পতন: তাজউদ্দিন ইয়ালদুজ ছিলেন ভারতের মুসলিম সাম্রাজ্যের ওপর সার্বভৌমত্বের দাবিদার। ১২১৪ খ্রিষ্টাব্দে মধ্য এশিয়ার খাওয়ারিযম শাহ তাকে গজনি থেকে বিতাড়িত করলে তিনি কুবাচার কাছ থেকে পাঞ্জাব কেড়ে নেন এবং থানেশ্বর পর্যন্ত বিশাল অঞ্চলের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। সাম্রাজ্যের উত্তর সীমান্তে ইয়ালদুজের উপস্থিতিতে শঙ্কিত ইলতুৎমিশ ১২১৫ খ্রিষ্টাব্দে তরাইনের কাছাকাছি একটি যুদ্ধে ইয়ালদুজকে পরাজিত করেন। এ. বি. এম. হবিবুল্লাহর মতে, "এর ফলে দিল্লির স্বাধীনতা অর্জন ও মধ্য এশীয় ক্ষমতার রাজনীতির নাগপাশ ছিন্ন করার সর্বশেষ বাধা অপসারিত হলো এবং দিল্লি আইনগত দিক থেকে না হলেও কার্যত এখন একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হলো"।

লাহোর অধিকার: ইলতুৎমিশের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন নাসিরউদ্দিন কুবাচা। কুবাচা ইতোপূর্বে সম্পাদিত একটি চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করলে ইলতুৎমিশ ১২১৭ খ্রিষ্টাব্দে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। ভীত হয়ে কুবাচা পালিয়ে সিন্ধুর ভাক্কারে আশ্রয় নেন। ফলে লাহোর ইলতুৎমিশের অধিকারে আসে এবং সেখানে তিনি শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

মোঙ্গল আক্রমণের আশঙ্কা থেকে নিষ্কৃতি লাভ: দুর্ধর্ষ মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খান কর্তৃক পরাজিত ও বিতাড়িত হয়ে খাওয়ারিযম অধিপতি জালালউদ্দিন ১২২১ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের পাঞ্জাবে এসে দিল্লির দরবারে আশ্রয়ের জন্যে ইলতুৎমিশের কাছে আবেদন করেন। জালালউদ্দিনকে অনুসরণ করে মোঙ্গলরা ভারত সীমান্তে এসে উপনীত হলে ইলতুৎমিশ মোঙ্গল আক্রমণের আশঙ্কায় ভীত হয়ে পড়েন। এ অবস্থায় জালালউদ্দিনকে আশ্রয় দেওয়া একটি আত্মঘাতী পদক্ষেপ হবে বিবেচনা করে ইলতুৎমিশ বিনম্রভাবে জালালউদ্দিনকে আশ্রয়দানে অপারগতা প্রকাশ করেন। আশ্রয় না পেয়ে জালালউদ্দিন মুলতান ও পাঞ্জাব অঞ্চলে লুটতরাজ শেষে ১২২৪ খ্রিষ্টাব্দে পারস্যের উদ্দেশ্যে ভারত ত্যাগ করেন। মুখ্য শত্রুর ভারত ত্যাগের ফলে মোঙ্গলরা ভারত সীমান্তে সামান্য লুটতরাজ শেষে দেশে ফিরে যায়। জালালউদ্দিনকে আশ্রয় না দেওয়া কূটনৈতিক শিষ্টাচার পরিপন্থি হলেও ইলতুৎমিশের এ দূরদর্শী পদক্ষেপের ফলে সম্ভাব্য মোঙ্গল আক্রমণের বিভীষিকা থেকে দিল্লি সালতানাত রক্ষা পায়।

পশ্চিম ভারতে দিল্লির নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা: মোঙ্গল বিপদের আশঙ্কা দূর হওয়ার পর ইলতুৎমিশ পশ্চিম ভারতীয় অঞ্চলের প্রতি নজর দেন। ১২২৮ খ্রিষ্টাব্দে মুলতানের শাসনকর্তা নাসিরউদ্দিন কুবাচা ইলতুৎমিশের কাছে পরাজিত হন। পালানোর সময় সিন্ধুনদে ডুবে তার মৃত্যু হলে পশ্চিম ভারতীয় অঞ্চলে দিল্লির কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। মুলতান ও সিন্ধু অধিকৃত হয় এবং দেবলের সুমরা শাসক দিল্লির আনুগত্য স্বীকার করেন। উত্তর পাঞ্জাবের শিয়ালকোট এবং জানোর পর্যন্ত ইলতুৎমিশের ক্ষমতার বিস্তার ঘটে।

বাংলায় (লাখনৌতি) কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা: দিল্লির কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগে বঙ্গো আলী মর্দান খলজি স্বাধীনতা ঘোষণা করে দু'বছর স্বৈরশাসন পরিচালনা করেন। ১২১১ খ্রিষ্টাব্দে আলী মর্দান নিহত হলে হুসামউদ্দিন ইওয়াজ খলজি পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করে লাখনৌতির সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সুলতান গিয়াসউদ্দিন নামধারণ এবং নিজ নামে খুৎবা পাঠ ও মুদ্রাঙ্কন করেন। তিনি বিহারকে তার সাম্রাজ্যভুক্ত এবং উড়িষ্যা, ত্রিহুত ও কামরূপ থেকে কর আদায়ের প্রতিশ্রুতি লাভ করেন। ১২২৫ খ্রিষ্টাব্দে ইলতুৎমিশ বিদ্রোহী সুলতান গিয়াসউদ্দিনের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলে গিয়াসউদ্দিন দিল্লির কর্তৃত্ব মেনে নিয়ে একটি চুক্তি সম্পাদন করেন। চুক্তি মোতাবেক বিহারের ওপর থেকে দাবি প্রত্যাহার করলে ইলতুৎমিশ আলাউদ্দিন আলীকে

সেখানকার শাসনভার অর্পণ করেন। কিন্তু এর কিছু দিন পরই গিয়াসউদ্দিন পুনরায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বিহার থেকেও ইলতুৎমিশের প্রতিনিধিকে বিতাড়িত করা হয়। এ অবস্থায় ইলতুৎমিশের নির্দেশে তার পুত্র নাসিরউদ্দিন মাহমুদ ১২২৭ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গ আক্রমণ করেন। যুদ্ধে গিয়াসউদ্দিন পরাজিত ও নিহত হলে লাখনৌতি দিল্লির অধীনে আসে। নাসিরউদ্দিনকে সেখানকার গভর্নর নিয়োগ করা হয়। নাসিরউদ্দিনের আকস্মিক মৃত্যুতে বঙ্গে পুনরায় বিদ্রোহ দেখা দেয়। ইখতিয়ার উদ্দিন বলাকা এ বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন। এ অবস্থায় ১২৩০ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান ইলতুৎমিশ পুনরায় লাখনৌতি আক্রমণ করেন। বিদ্রোহী নেতা ইখতিয়ার উদ্দিন বলাকা পরাজিত ও নিহত হলে বাংলা (লাখনৌতি) চূড়ান্তভাবে দিল্লির অধীনে আসে।

দিল্লি সালতানাতের কর্তৃত্ব সম্প্রসারণ: বিদ্রোহ দমন ও হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করে সুলতান ইলতুৎমিশ দিল্লি সালতানাতের কর্তৃত্ব সম্প্রসারণে মনোযোগ দেন। তিনি ১২২৬ খ্রিষ্টাব্দে রণথম্ভোর এবং ১২২৭ খ্রিষ্টাব্দে মান্দাওয়ার অধিকার করেন। চৌহান রাজ্য, জালোরও বিজিত হওয়ার পর ১২৩২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি পুনরায় গোয়ালিয়র দখল করেন। এরপর ভিলসা এবং মালবের রাজধানী উজ্জয়িনীও ইলতুৎমিশের পদানত হয়। এরপর বাদাউন, বেনারস, কনৌজ, দোয়াব এবং অযোধ্যা পর্যন্ত দিল্লি সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত হয়।

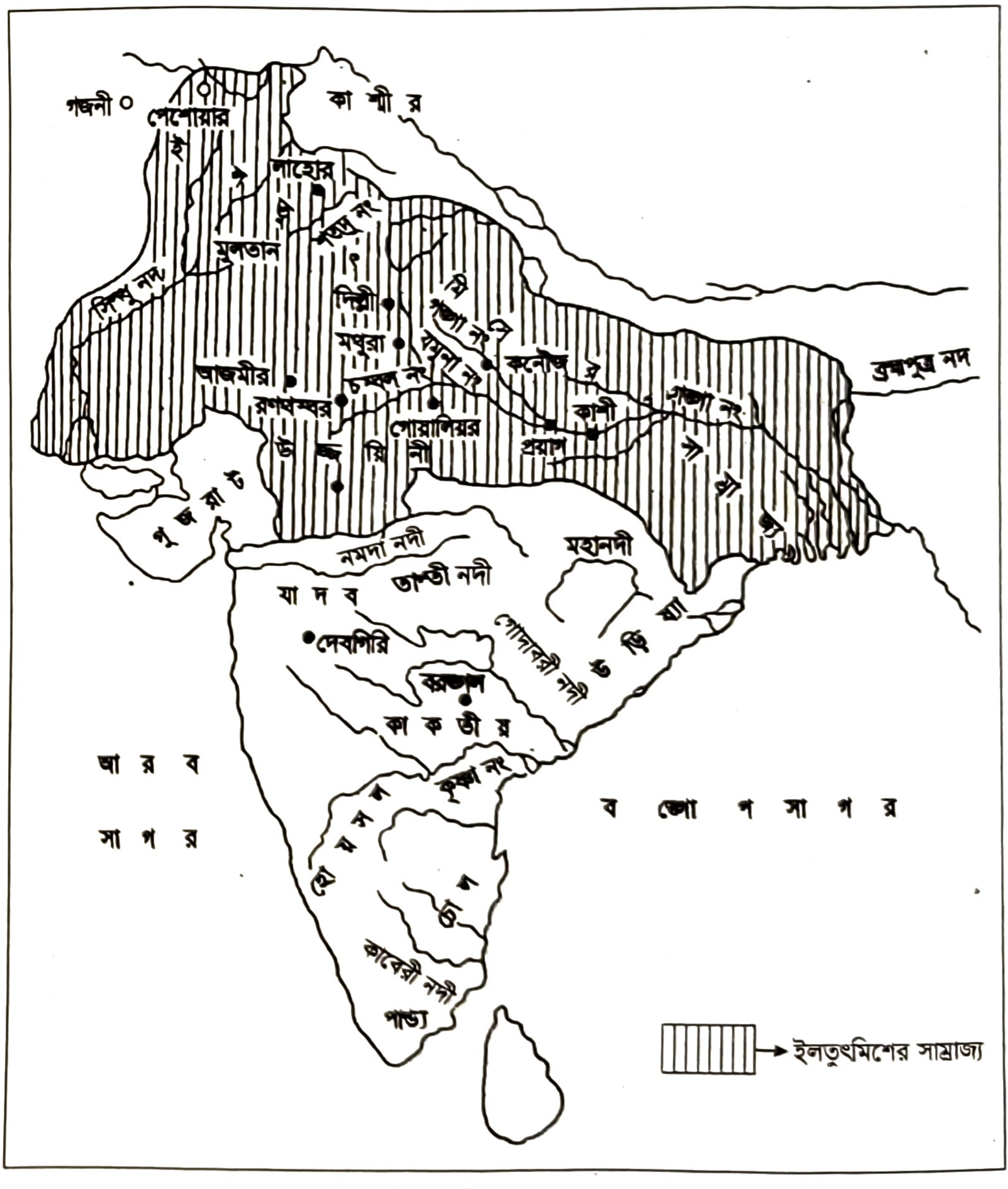
গজনী
পেশোয়ার
কাশ্মীর
লাহোর
মুলতান
সিন্ধু নদ
দিল্লী
গঙ্গা নদী
মথুরা
যমুনা নং
কনৌজ
আজমীর
চম্বল নং
রণথম্বর
গোয়ালিয়র
উজ্জয়িনী
প্রয়াগ
কাশী
গঙ্গা নং
ব্রহ্মপুত্র নদ
গুজরাট
নমদা নদী
মহানদী
তাপ্তী নদী
যাদব
দেবগিরি
গোদাবরী নদী
উড়িষ্যা
বরঙ্গল
কাকতীয়
কৃষ্ণা নং
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
কাবেরী নদী
পাণ্ড্য
ইলতুৎমিশের সাম্রাজ্য

ইলতুৎমিশের সাম্রাজ্য

আব্বাসি খলিফার স্বীকৃতি লাভ: ইলতুৎমিশ ১২২৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ ফেব্রুয়ারি বাগদাদের আব্বাসি খলিফা আল মুসতানসির বিল্লাহর কাছ থেকে স্বীকৃতি সনদ এবং 'সুলতান-ই-আজম' উপাধি গ্রহণ করেন। এ স্বীকৃতি প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছে এবং মুসলিম বিশ্বেও তার মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি করে। এ. বি. এম. হবিবুল্লাহ বলেন, "এই স্বীকৃতির মাধ্যমে তার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণতার গৌরব অর্জন করে এবং দিল্লি সাম্রাজ্য একটি পূর্ণ আইনসম্মত রূপ লাভ করে।"

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ কোন গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন?
২. ইলতুৎমিশকে দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্তি দেন কে?
৩. কত খ্রিষ্টাব্দে ইলতুৎমিশ দিল্লি সালতানাতের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন?
৪. ইলতুৎমিশের সময় উচ ও মুলতানে কে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন?
৫. ইলতুৎমিশের সময় বাংলায় স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালান কে?
৬. আব্বাসি খলিফা আল মুসতানসির বিল্লাহর কাছ থেকে ইলতুৎমিশ কী উপাধি গ্রহণ করেন? */সকল বোর্ড ২০১৭/*

উত্তরের জন্য ১৩২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. ক্ষমতায় আরোহণের পর সুলতান ইলতুৎমিশ যেসব সমস্যায় পড়েন সেগুলোর একটি তালিকা তৈরি করো।
২. সুলতান ইলতুৎমিশ সম্পর্কিত সঠিক তথ্যের আলোকে নিচের ছকটি পূরণ করো।

সুলতান ইলতুৎমিশ	সময় (খ্রি.)
১. ক্ষমতায় আরোহণ	
২. তাজউদ্দিন ইয়ালদুজের বিরুদ্ধে অভিযান	
৩. মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহতকরণ	
৪. পশ্চিম ভারতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা	
৫. বাংলায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা	
৬. আব্বাসি খলিফার স্বীকৃতি লাভ	

গ. বাড়ির কাজ

ইতালির রাজা গেলিবার প্রথম জীবনে একজন ক্রীতদাস ছিলেন। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দক্ষতাবলে সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি সাম্রাজ্যকে সকল শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করেন। তিনি প্রশাসনিক সংস্কার ও একটি বিশেষ সংঘ গঠনের মাধ্যমে সাম্রাজ্যকে মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করেন। তার এসব কৃতিত্বের জন্য তাকে উক্ত সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

১. উদ্দীপকে উল্লেখিত শাসকের সাথে ভারতে সুলতানি আমলের কোন শাসকের সাদৃশ্য আছে? ব্যাখ্যা করো।
২. প্রাথমিক সমস্যা মোকাবিলা করে উক্ত শাসক দিল্লি সালতানাতকে সুদৃঢ় ভিত্তি দিয়েছিলেন— বিশ্লেষণ করো।

পাঠ ৬

দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে সুলতান ইলতুৎমিশ
Sultan Iltutmish as the Real Founder of the Delhi Sultanate

দীর্ঘ ২৫ বছর গৌরবের সাথে রাজত্বের পর ১২৩৬ খ্রিষ্টাব্দে ইলতুৎমিশ মৃত্যুবরণ করেন। তিনি অনুপম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তেজস্বিতা এবং দুর্দমনীয় সাহসিকতা যেমন তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল, তেমনি তার মধ্যে উদারতা ও ন্যায়দর্শিতাও ছিল। তিনি ধর্মনিষ্ঠ হলেও পরধর্ম বিদ্বেষী ছিলেন না। সে যুগের শ্রেষ্ঠ দরবেশ শেখ জালালউদ্দিন তাব্রিজি, খাজা কুতুবউদ্দিন কাকী এবং বাহাউদ্দিন জাকারিয়ার সাথে তার নিবিড় সম্পর্ক ছিল। দানশীলতা ও বদান্যতায় তিনি কুতুবউদ্দিন আইবেককেও অতিক্রম করেছিলেন। প্রজারঞ্জক সুলতান ইলতুৎমিশ নিজেকে 'আল্লাহর বান্দাদের সাহায্যকারী' (The helper of the servants of God) বলে পরিচিত করেন। সমসাময়িক শিলালিপিতে তাকে 'আল্লাহর রাজ্যের রক্ষক' (The protector of the lands of God) হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

দিল্লি সালতানাত ও মামলুক (দাস) বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা: সুলতান শামসউদ্দিন ইলতুৎমিশ দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ঈশ্বরী প্রসাদ ইলতুৎমিশকে নিঃসন্দেহে মামলুক বংশের 'প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা' (The real founder) এবং স্ট্যানলি লেনপুল 'সত্যিকারের প্রতিষ্ঠাতা' (True founder) বলে অভিহিত করেছেন। কুতুবউদ্দিন আইবেকের মৃত্যুর পর সুলতান আরাম শাহের দুর্বল শাসনের সুযোগে ক্ষমতালোভী অভিজাতবর্গ, আমির-মালিক এবং প্রদেশ পালদের বিদ্রোহ এবং সিন্ধু, বাংলা (লাখনৌতি), রণথম্ভোর ও গোয়ালিয়র ইত্যাদির স্বাধীনতা ঘোষণার ফলে ভারতে তুর্কি আধিপত্য যখন বিপদাপন্ন, সেই সংকটময় মুহূর্তে ইলতুৎমিশ সুলতান হিসেবে দায়িত্ব নেন। তিনি সাহস, দৃঢ়তা, দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার সাথে বিদ্রোহ দমন ও প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাভূত করে শুধু দিল্লি সালতানাতের অস্তিত্ব রক্ষা করেননি বরং একে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিতও করেন। এক চরম দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে ইলতুৎমিশ আইবেকের অসমাপ্ত দায়িত্ব কাঁধে নেন এবং নানাবিধ বিপদের মধ্যেও একটি দুর্বল ভিতের ওপর একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। তার এ অসামান্য কীর্তি তাকে দিল্লি সালতানাতের প্রাথমিক যুগের শ্রেষ্ঠ সুলতান এবং প্রাথমিক তুর্কি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতার মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। আর. সি. মজুমদার ঠিকই বলেছেন, "ইলতুৎমিশকে যথার্থভাবেই ১২৯০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী প্রাথমিক যুগের দিল্লির তুর্কি সালতানাতের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক হিসেবে গণ্য করা যায়।"[৪]

উদ্যমী বিজেতা: প্রচণ্ড শারীরিক শক্তির অধিকারী, দুর্দমনীয়, সাহসী ও তেজস্বী, রণনিপুণ যোদ্ধা সুলতান ইলতুৎমিশ নবজাত তুর্কি সালতানাতের অভ্যন্তরীণ সংকট সমাধান ও সংহতি বিধানের পর নতুন অঞ্চল জয়ের মাধ্যমে সাম্রাজ্যের সীমা সম্প্রসারণ করেন। এ. বি. এম. হবিবুল্লাহ বলেন, "মুইজউদ্দিনের বিজিত অঞ্চল পুনরুদ্ধারের পরও তিনি রাজপুতনা ও গঙ্গা উপত্যকার অভ্যন্তরে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেন।" রণথম্ভোর, গোয়ালিয়র, উজ্জয়িনী, ভিলসা ও মান্দাওয়ার প্রভৃতি অঞ্চল জয় বিজেতা হিসেবে তার কৃতিত্বের উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

কূটনীতিবিদ: সুলতান ইলতুৎমিশ ছিলেন বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন ও প্রগাঢ় কূটনীতি জ্ঞানের অধিকারী। মোঙ্গল শক্তির যে পরাক্রম ও নৃশংসতা সমকালীন বিশ্বের অধিকতর পরাক্রমশালী ও প্রাচীন সাম্রাজ্যের (আব্বাসীয় ও খাওয়ারিযম রাজ্যসহ) ধ্বংস সাধন করেছিল, ইলতুৎমিশ তার কূটনৈতিক কৌশলের মাধ্যমে তা থেকে দিল্লি সালতানাতকে রক্ষা করেন।

খ্যাতিমান শাসক: ইলতুৎমিশকে ভারতবর্ষে তুর্কি শাসনব্যবস্থার প্রবর্তক বলা যায়। এ. বি. এম. হবিবুল্লাহ বলেন, "অত্যন্ত হিসেবি ও কুশলী সংগঠকরূপে তিনিই সালতানাতের শাসনব্যবস্থার কাঠামো প্রতিষ্ঠা করেন।" মুহাম্মদ জুনাইদি এবং ফখরুল মূলকের পরামর্শ ও সহযোগিতায় তিনি দিল্লিতে সামরিক ও বেসামরিক বিভিন্ন দপ্তর স্থাপন করেন। তিনি রাজস্বব্যবস্থা ও অর্থ পরিদপ্তর পুনর্গঠন করেন। সমগ্র সাম্রাজ্যকে কতকগুলো প্রদেশ বা 'ইকতায়' বিভক্ত করেন। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দিয়ে প্রতিটি ইকতায় 'ইকতাদার' নিয়োগ করা হয়। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় ইলতুৎমিশ খ্যাতি অর্জন করেন। সুলতান দরবারে একটি শিকল বাঁধা ঘণ্টা ঝুলিয়ে রাখতেন। ক্ষতিগ্রস্তরা ন্যায়বিচারের জন্য এটি বাজিয়ে সুলতানের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারতেন। উপমহাদেশের মুসলিম শাসকদের মধ্যে সুলতান ইলতুৎমিশই সর্বপ্রথম 'রূপাইয়া'

---

[৪] "Iltutmish may justly regarded as the greatest ruler of the early Turkish Sultanate of Delhi." – R C Majumder, *An Advanced History of India, p.-277*

নামে রৌপ্যমুদ্রা প্রবর্তন করেন। এ মুদ্রায় বাগদাদের আব্বাসি খলিফার নামের সাথে 'বিশ্বাসীদের নেতার সাহায্যকারী' হিসেবে ইলতুৎমিশের নাম উৎকীর্ণ করা হয়। একজন সদাশয় প্রজারঞ্জক শাসক হিসেবে ইলতুৎমিশ যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়নসহ নানাবিধ কল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বস্তুত বিচ্ছিন্ন এবং বিশৃঙ্খল সাম্রাজ্যে ইলতুৎমিশ সুষ্ঠু ও সদাশয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। তার প্রতিষ্ঠিত নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র খলজি সাম্রাজ্যবাদের হাতিয়ারে রূপান্তরিত হয়।

জেনে রাখো

ইকতা শব্দের অর্থ অংশ বা ভাগ। সুলতান ইলতুৎমিশ ভারতীয় সামন্ত প্রথা বিলোপের জন্য তার সমগ্র সাম্রাজ্যকে ছোট-বড় অনেকগুলো ইকতায় বিভক্ত করে যোগ্য তুর্কিদের ইকতাদার হিসেবে নিয়োগ দেন। ইকতাদাররা সরাসরি কেন্দ্রের কাছে জবাবদিহি করতেন। ফলে প্রশাসনিক কাজে ইকতা ব্যবস্থা খুবই ফলপ্রসূ হয়। এতে দূরবর্তী অঞ্চলের স্থানীয় সামন্তদের অরাজকতা থেকে সালতানাত সুরক্ষিত হয় এবং সুলতান ইলতুৎমিশ রাজস্ব আদায়, যোগাযোগ ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় কার্যকর ব্যবস্থা নিতে সক্ষম হন।

শিক্ষা ও শিল্প-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক: সুলতান ইলতুৎমিশ শিক্ষা ও শিল্প-সংস্কৃতির উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি দিল্লিকে কেবল তুর্কি সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কেন্দ্র নয়, বরং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রেও রূপান্তরিত করেন। ঐতিহাসিক মিনহাজ-উস-সিরাজ ও আওফি এবং কবি রুহানী ও মালিক তাজউদ্দিন প্রমুখ সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। তার পৃষ্ঠপোষকতায় ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্য ও শিল্পকলার বিকাশে নতুন যুগ সূচিত হয়। তিনি ভারতের প্রসিদ্ধ মুসলিম স্থাপত্য নিদর্শন কুতুব মিনারের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেন। কুওয়াতুল ইসলাম ও আড়াই-দিন-কা-ঝোপড়া মসজিদের সংস্কার ছাড়াও তিনি নতুন মসজিদ ও খানকা নির্মাণ করে তার স্থাপত্যকীর্তির প্রমাণ রাখেন।

প্রকৃতপক্ষে দিল্লি সালতানাতের এক চরম ক্রান্তিকালে দায়িত্ব গ্রহণ করে সুলতান ইলতুৎমিশ-এর সংহতি, স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা বিধান, রাজ্য বিস্তার ও সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করে ইতিহাসে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। ঐতিহাসিকেরা ন্যায়সংগতভাবেই তাকে দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেনে। কে. এ. নিযামী ইলতুৎমিশকে মধ্যযুগীয় ভারতের বিশিষ্ট নৃপতি (Most Outstanding) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তার রাজত্বকালকে 'সমৃদ্ধি ও গৌরবের যুগ' (Prosperous and Glorious Reign) বলা হয়। এ. বি. এম. হবিবুল্লাহ যথার্থই বলেছেন, "আইবেক ছিলেন স্বাধীন সার্বভৌম দিল্লি সালতানাতের স্বপ্নদ্রষ্টা আর ইলতুৎমিশ ছিলেন নিঃসন্দেহে এর প্রথম সুলতান।"[৫]

ডব্লিউ হেগ তাকে ন্যায়সংগতভাবেই দাস বংশের শাসকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক বলে অভিহিত করেছেন। আর ঈশ্বরী প্রসাদ ইলতুৎমিশকে নিঃসন্দেহে দাস বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলে আখ্যায়িত করেছেন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?
২. কে নিজেকে 'আল্লাহর বান্দাদের সাহায্যকারী' বলে পরিচিত করেন?
৩. সুলতান ইলতুৎমিশ সর্বপ্রথম কী নামে রৌপ্যমুদ্রা প্রবর্তন করেন?
৪. দাস বংশের শাসকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন কে?
৫. দিল্লির কুতুব মিনারের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেন কে?
৬. কার রাজত্বকালকে 'সমৃদ্ধি ও গৌরবের যুগ' বলে অভিহিত করা হয়?

উত্তরের জন্য ১৩২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে সুলতান ইলতুৎমিশের কৃতিত্ব চিহ্নিত করে একটি চার্ট তৈরি করো।

---

[৫] "Aibek outlined the Delhi Sultanate and its sovereign status; Iltutmish was unquestionably its first king." – A B M Habibullah, *The Foundation of Muslim Rule in India, P.105*

পাঠ ৭ ও ৮

সুলতান রাজিয়া: পরিচয় ও কৃতিত্ব (১২৩৬-১২৪০ খ্রি.) এবং রাজিয়া পরবর্তী সুলতান ইলতুৎমিশের অন্য উত্তরাধিকারী

Sultan Razia: Identity and Achievements (1236-1240 AD) and The Other Successors of Sultan Iltutmish after Razia

সিংহাসন লাভ: সুলতান ইলতুৎমিশ উপলব্ধি করেছিলেন যে, সুখসন্ধানী অযোগ্য পুত্রদের থেকে সুযোগ্য ও বুদ্ধিমতি কন্যা রাজিয়ার নেতৃত্বে দিল্লি সালতানাত অধিকতর নিরাপদ থাকবে এবং এর শাসনকাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হবে। তাই মৃত্যুর আগে তিনি কন্যা রাজিয়াকে তার উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। কিন্তু ইলতুৎমিশের মৃত্যুর পর রাজ্যের অভিজাতবর্গ ও আমির-উমরাহগণ রাজিয়ার আইনসংগত উত্তরাধিকারকে অস্বীকার করে ইলতুৎমিশের পুত্র রুকনউদ্দিন ফিরোজকে ১২৩৬ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। ফিরোজ ছিলেন অকর্মণ্য ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ। তার এবং রাজমাতা শাহ তুরকানের কুশাসনে অচিরেই রাজ্যের শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়ে এবং প্রবল গণঅসন্তোষ দেখা দেয়। রাজিয়া বিচক্ষণতার সাথে এ অসন্তোষকে স্বীয় স্বার্থে ব্যবহার করতে সক্ষম হন। তিনি ফিরোজ ও রাজমাতা শাহ তুরকানের কুশাসনের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করেন। দিল্লির সমরকর্তা ও অভিজাতরা তাকে সমর্থন দেন। সুলতান রুকনউদ্দিন ফিরোজ দিল্লির উপকণ্ঠে বিদ্রোহী প্রদেশপাল ও অভিজাতদের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে রাজধানীতে ফিরে যাওয়ার আগেই রাজিয়া সিংহাসনে বসেন (১২৩৬ খ্রি.)। এভাবে রাজিয়া ভারতের মুসলিম শাসনের ইতিহাসে প্রথম মহিলা সুলতান হিসেবে দিল্লি সালতানাতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

সুলতান রাজিয়া

সুলতান রাজিয়ার সময়কার প্রাথমিক সমস্যাবলি: সুলতান হিসেবে রাজিয়াকে নানা বাধা-বিপত্তি, ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হয়। রাজিয়ার সিংহাসনে আরোহণের ক্ষেত্রে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের মতামত উপেক্ষা করা হয়। একে তারা একটি অনিয়মজনিত বিষয় হিসেবে বিবেচনা করে এবং রাজিয়াকে উৎখাতের জন্য দিল্লি অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা অব্যাহত রাখে। এমনকি প্রধানমন্ত্রী জুনাইদিও রাজিয়ার ক্ষমতা গ্রহণকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। তিনিও বিদ্রোহীদের সাথে হাত মিলান। অভিজাতদের মধ্যে অনেকেই তার বিরোধিতা করেন। কারামতিয়া ও মূলাহিদ মুসলিম সম্প্রদায়ও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।

সমস্যা মোকাবিলায় সুলতান রাজিয়ার গৃহীত পদক্ষেপ: এ. বি. এম. হবিবুল্লাহ বলেন, “সামরিক শক্তির দিক থেকে রাজিয়া নিশ্চিতরূপে দুর্বল ছিলেন। কিন্তু তার ম্যাকিয়াভেলিয়ান কূটনীতি তাকে বিপদ থেকে মুক্ত হতে দারুণভাবে সহযোগিতা করে।” রাজিয়া কৌশলে বিদ্রোহী শাসনকর্তা ও অভিজাতদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে তাদের দুর্বল করে দিয়ে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। প্রধানমন্ত্রী জুনাইদিসহ বিদ্রোহীরা পরাস্ত হয়। নূরউদ্দিন নামে একজন তুর্কির নেতৃত্বে কারামতিয়া এবং মুলাহিদ সম্প্রদায়ের বিদ্রোহও কঠোরভাবে দমন করা হয়। নিজ ক্ষমতাকে শঙ্কামুক্ত ও স্থিতিশীল করে সুলতান রাজিয়া প্রশাসন পুনর্গঠনে মন দেন। খাজা মুহায্যাবুদ্দিনকে প্রধানমন্ত্রী এবং সাইফুদ্দিন আইবেককে সেনাপ্রধান নিয়োগ করা হয়। কবীর খান লাহোরের শাসনকর্তা পদে নিয়োগ লাভ করেন। লাখনৌতির শাসনকর্তা মালিক তুগ্রিল-ই-তুখান সুলতানের সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে রাজপ্রতিনিধির মর্যাদা লাভ করেন। হিন্দু খান উচের এবং মালিক আইতাগিন বাদাউনের শাসনকর্তার পদ লাভ করেন। এর ফলে লাখনৌতি থেকে দেবল এবং ডামরিলা পর্যন্ত সুলতান রাজিয়ার সার্বভৌম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

আলতুনিয়ার বিদ্রোহ ও রাজিয়ার ক্ষমতাচ্যুতি: সুলতান ইলতুৎমিশের অনুগ্রহ ও বিশেষ সান্নিধ্যে তুর্কি ক্রীতদাসদের একটি চক্র রাজনীতিতে অত্যন্ত প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল। ‘চল্লিশ চক্র’ নামে পরিচিত এ তুর্কি অভিজাত গ্রুপ ইলতুৎমিশের মৃত্যুর পর রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগে রাজ্যের সব ক্ষমতা কুক্ষিগত করে। এ চক্রটি সুলতান রাজিয়ার প্রতি সৎমনোভাবাপন্ন ছিল না। তাই তিনি এ তুর্কিগোষ্ঠীর ক্ষমতা খর্ব করার উদ্যোগ নেন। তুর্কিদের পরিবর্তে তাজিক অনুগত ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের উচ্চ রাজপদে নিয়োগ দেওয়া হয়। এতে তুর্কিরা ক্ষুব্ধ হয়। এ সময় সুলতান ব্যাপক ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধাযুক্ত আমির-ই-আখুর পদে জালালউদ্দিন ইয়াকুত নামক একজন হাবসিকে নিয়োগ দিলে তুর্কিদের অসন্তোষ চূড়ান্ত রূপ নেয়। এমতাবস্থায় রাজিয়ার শাসনের তৃতীয় বছরে এরা আমির-ই-হাযিব আইতাগিনের নেতৃত্বে রাজিয়ার বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র শুরু করে। ভাতিন্ডার

শাসনকর্তা মালিক আলতুনিয়া ছিলেন আইতাগিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আলতুনিয়া বিদ্রোহ করলে রাজিয়া তার কাছে পরাজিত হন। রাজিয়াকে বন্দি করে কারারুদ্ধ করা হয়। রাজিয়ার পরাজয়ের সংবাদ পেয়ে দিল্লিতে ষড়যন্ত্রকারীরা ইলতুৎমিশের তৃতীয় পুত্র বাহরামকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। কারারুদ্ধ রাজিয়া আলতুনিয়াকে বিয়ে করে কৌশলে মুক্তিলাভ করেন এবং উভয়ের সম্মিলিত চেষ্টায় সিংহাসন পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে দিল্লি অভিমুখে যাত্রা করেন। তবে বাহরামের সেনাবাহিনীর কাছে তারা পরাজিত হয়ে পলায়ন পথে আততায়ীর হাতে নিহত হন।

রাজিয়ার ব্যর্থতার কারণ: নানা গুণ ও যোগ্যতা সত্ত্বেও রাজিয়া ব্যর্থ হন। ঈশ্বরী প্রসাদ মন্তব্য করেন “নারী হওয়াই ছিল তার প্রধান অযোগ্যতা।” শক্তিশালী পুরুষ আমির-উমরাহগণ একজন নারী কর্তৃক শাসিত হতে অপমানবোধ করে তার উৎখাত সাধনে ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠেন। তাছাড়া রাজিয়ার পুরুষ বেশ পরিধান, পর্দা প্রথা অবজ্ঞা এবং প্রকাশ্যে অশ্বারোহণ ইত্যাদি রক্ষণশীল গোঁড়া মুসলমান অভিজাতরা সুনজরে দেখেনি। হাবসি জালালউদ্দিন ইয়াকুতের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহও তার পতনের কারণ বলে অনেকেই মনে করেন। এসব বক্তব্যের মধ্যে কিছু যুক্তি আছে সত্য কিন্তু এগুলোই তার ব্যর্থতা ও পতনের মূল কারণ নয়। বস্তুত রাজিয়ার ব্যর্থতা ও পতনের মূলে ছিল তুর্কি অভিজাতদের উচ্চাভিলাষ। রাজিয়ার অ-তুর্কি মুসলমানদের উচ্চ রাজপদে নিয়োগ এবং তাদের ওপর নির্ভরতা সুলতানি সাম্রাজ্যের ওপর তুর্কিদের অপ্রতিহত ক্ষমতা স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া রাজিয়ার দৃঢ় ব্যক্তিত্ব ও কঠিন হস্তে শাসন পরিচালনার প্রয়াসও তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। ফলে তুর্কি অভিজাতরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ষড়যন্ত্র শুরু করে এবং রাজিয়ার পতন ঘটায়।

সুলতান রাজিয়ার চরিত্র ও কৃতিত্ব (Character and Achievements of Sultan Razia)

ভারতের মুসলিম শাসনের ইতিহাসে সুলতান রাজিয়া ছিলেন দিল্লির সিংহাসনে আরোহণকারী প্রথম ও একমাত্র মহিলা। সালতানাতের এক সংকটকালে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। ঐতিহাসিক মিনহাজ উস সিরাজের হিসাব মতে, ৩ বছর ৬ মাস ৬ দিন তিনি রাজত্ব করেন। তিনি ছিলেন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং অসাধারণ প্রতিভাশালিনী একজন নারী। প্রচলিত মুদ্রায় তিনি নিজেকে উমদাদ-উল-নিসওয়ান (নারীদের মধ্যে বিশিষ্ট) বলে উল্লেখ করেন। মিনহাজ তাকে মহান নৃপতি, বিচক্ষণ ন্যায়পরায়ণ ও মহানুভব বলে বর্ণনা করেছেন। মিনহাজ-এর মতে, “তিনি একজন সার্বভৌম নৃপতির প্রয়োজনীয় সকল গুণাবলি ও যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন।”[৬] এ. বি. এম. হবিবুল্লাহর মতে, সাহসিকতা ও অদম্য দৃঢ়তাই (Courage and unflincing determination) ছিল রাজিয়ার আদর্শ। চারিত্রিক দৃঢ়তায় তিনি নিজেকে পুরুষ অপেক্ষা যোগ্যতর প্রমাণ করেন। ত্রয়োদশ শতকের ভারত শাসকের ব্যক্তিগত দৃঢ়তা ও যোগ্যতাই তার ক্ষমতা ও অস্তিত্বের চাবিকাঠি ছিল। সুলতান রাজিয়া তার প্রশাসনের দৃঢ়তা ও ব্যক্তিগত শক্তি-সামর্থ্য প্রমাণের লক্ষ্যেই মহিলা পোশাক পরিত্যাগ করেন। অশ্বারোহণে জনসম্মুক্ষে বের হন এবং প্রকাশ্যে দরবার পরিচালনা করেন। অধ্যাপক কে.এ. নিজামী যথার্থই বলেছেন, “অস্বীকার করার অবকাশ নেই যে, তিনি ছিলেন ইলতুৎমিশের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে যোগ্যতম।”[৭]

রাজিয়া পরবর্তী সুলতান ইলতুৎমিশের অন্য উত্তরাধিকারী (The Other Successors of Sultan Iltutmish after Razia)

সুলতান মুইজউদ্দিন বাহরাম শাহ (১২৪০-১২৪২ খ্রি.)

সুলতান রাজিয়ার পর সুলতান ইলতুৎমিশের তৃতীয় পুত্র ও রাজিয়ার ভাই মুইজউদ্দিন বাহরাম শাহ দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। বস্তুত তিনি ছিলেন একজন অযোগ্য ও অকর্মণ্য শাসক। তার শাসনামলে ‘বান্দেগানে চেহেলগান’ বা চল্লিশ জন অভিজাত চক্র দিল্লি সালতানাতের সব ক্ষমতা কুক্ষিগত করে। সুলতানকে উপেক্ষা এবং নিজেদের খেয়াল খুশিমতো শাসন কাজ পরিচালনার ঘটনায় সুলতান মুইজউদ্দিন বাহরাম শাহ ক্ষুব্ধ হন এবং এ চক্রের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা করেন। আইতাগিনকে হত্যা করা হয়। আইতাগিনের পর আমির হাজিব বদরুদ্দিন সঙ্কর অভিজাতদের মুখপাত্র হিসেবে রাজ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করলে সুলতান তাকেও হত্যা করেন। ১২৪১ খ্রিষ্টাব্দে মোঙ্গলরা লাহোর আক্রমণ করে। মোঙ্গলদের প্রতিরোধ করার জন্য সুলতান প্রধানমন্ত্রী মাহাজাবউদ্দিনকে নির্দেশ দিলেও তিনি তা প্রতিপালন করেননি। উল্টো তিনি অভিজাত চক্রের সমর্থনে সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। বিদ্রোহীরা সুলতানকে বন্দি করে এবং পরে ১২৪২ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

---

[৬] "She was endowed with all the admirable attributes and qualifications necessary for Kings." L. P. Sharma, *History of Medieval India, P-47*

[৭] "She was the ablest of the successors of Iltutmish can hardly be denied." L. P. Sharma, *History of Medieval India, P-48*

সুলতান আলাউদ্দিন মাসুদ শাহ (১২৪২-১২৪৬ খ্রি.)

সুলতান মুইজউদ্দিন বাহরাম শাহের হত্যাকাণ্ডের পর অভিজাতচক্র সুলতান ইলতুৎমিশের পৌত্র মাসুদকে 'আলাউদ্দিন মাসুদ শাহ' উপাধি দিয়ে দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে। তার শাসনামলেও চল্লিশচক্রের প্রভাব অব্যাহত থাকে। মাহাজাবউদ্দিন প্রধান উজির পদে বহাল থাকেন। অন্যদিকে চল্লিশ চক্রের কুতুবউদ্দিন হাসান নায়েব-ই-মামালাকাত পদ লাভ করেন। তবে এ সময় চল্লিশচক্রের নেতা আমির হাজিব গিয়াসউদ্দিন বলবন প্রভূত ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন এবং বলতে গেলে তিনিই সাম্রাজ্যের প্রকৃত শাসকে পরিণত হন। আলাউদ্দিন মাসুদ শাহ মোটেও যোগ্য শাসক ছিলেন না। তার সময়ে বিদ্রোহীদের হাতে দিল্লি সালতানাতের অনেক অংশই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বাংলার শাসনকর্তা তুগান খান বাংলা ছাড়াও বিহার এবং অযোধ্যা অধিকার করে নেন। মুলতান ও উচ দিল্লির হস্তচ্যুত হয়। সুলতান পাঞ্জাবের উত্তরাংশে মোঙ্গল হানা মোকাবিলা করতে সক্ষম হলেও তার সিংহাসন রক্ষা করতে পারেননি। অভিজাতদের ষড়যন্ত্রে ১২৪৬ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে সুলতান আলাউদ্দিন মাসুদ শাহ ক্ষমতাচ্যুত হন।

সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ (১২৪৬-১২৬৬ খ্রি.)

সুলতান আলাউদ্দিন মাসুদ শাহের ক্ষমতাচ্যুতির পর অভিজাতরা সুলতান ইলতুৎমিশের কনিষ্ঠ পুত্র নাসিরউদ্দিন মাহমুদকে দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। রাজ্যশাসন ব্যাপারে তিনি নায়েব-ই-মামালাকাত গিয়াসউদ্দিন বলবনের ওপর অধিকমাত্রায় নির্ভরশীল ছিলেন। আর এ সুযোগে বলবন নিজের ক্ষমতার পরিধি বৃদ্ধি করে নিজেকে এক রকমের ছায়া সুলতানে পরিণত করেন। বলবনের প্রচেষ্টায় নাসিরউদ্দিনের রাজত্বকালে একধরনের স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয়। বলবন তার দৃঢ়তা ও বিচক্ষণতা দিয়ে দিল্লি সালতানের অভ্যন্তরে অভিজাতদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে চলমান দ্বন্দ্ব -সংঘাতের অবসান ঘটান। আলাউদ্দিন মাসুদ শাহের সময় দিল্লি সালতানাতের অভ্যন্তরে যে সকল বিদ্রোহ দানা বেঁধেছিল বলবনের সহায়তায় নাসিরউদ্দিন তা দমন করেন। দোয়াব অঞ্চলে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়।

নাসির উদ্দিন মাহমুদ প্রায় বিশ বছর রাজত্ব করে ১২৬৬ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। যত দুর্বলতা ও অযোগ্যতাই থাকুক না কেন দিল্লি সালতানাতের ইতিহাসে তিনি এক আকর্ষণীয় চরিত্র হিসেবে পরিচিত। তবকাত-ই-নাসিরী গ্রন্থ প্রণেতা ঐতিহাসিক মিনহাজ-উস-সিরাজ ছিলেন তার দরবারের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। মিনহাজের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তিনি ছিলেন একজন আদর্শবাদী ও দয়ালু শাসক। সুলতান খুবই সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন। অবসরে কুরআন নকল এবং টুপি সেলাই করতেন। সুলতান একজন শিক্ষানুরাগী ছিলেন। ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, "সুলতান বিদ্বান ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন এবং গরিব-দুঃখীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন।"

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ভারতের মুসলিম শাসনের ইতিহাসে প্রথম নারী শাসক কে?
২. সুলতান রাজিয়ার পিতা কে ছিলেন?
৩. কত খ্রিষ্টাব্দে সুলতান রাজিয়া দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন?
৪. সুলতান রাজিয়া কাকে বিয়ে করেছিলেন?
৫. কার শাসনামলে 'বান্দেগানে চেহেলগান' বা চল্লিশ চক্র দিল্লি সালতানাতের সব ক্ষমতা কুক্ষিগত করে?
৬. সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ কত বছর দিল্লি শাসন করেন?

উত্তরের জন্য ১৩২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

সুলতান রাজিয়ার সিংহাসনে আরোহণের যৌক্তিক কারণ খুঁজে বের করো।

গ. দলীয় কাজ

নারী হওয়াই ছিল সুলতান রাজিয়ার পতনের মূল কারণ— দলে বিভক্ত হয়ে বিষয়টির পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি দাও।

পাঠ ৯

সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন: প্রাথমিক জীবন ও গৃহীত কার্যাবলি (১২৬৬-১২৮৭ খ্রি.) [Sultan Ghiyasuddin Balban: Early Life and Steps taken by Balban (1266-1287 AD)]

প্রাথমিক জীবন: গিয়াসউদ্দিন বলবনের প্রকৃত নাম বাহাউদ্দিন। উলুঘ খান এবং বলবন তার দুটি উপাধি। জন্মসূত্রে তিনি ছিলেন ইলবারি তুর্কি। সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও যৌবনেই তিনি ক্রীতদাসে পরিণত হন। মোঙ্গলরা তাকে বসরার দাস ব্যবসায়ী জামালউদ্দিনের কাছে বিক্রি করে। ১২৩২ খ্রিষ্টাব্দে উক্ত দাস ব্যবসায়ী বলবনকে দিল্লিতে নিয়ে এলে সুলতান ইলতুৎমিশ তাকে কিনে নেন । বলবন ছিলেন অসাধারণ মেধাবী ও যোগ্যতাসম্পন্ন। দক্ষতা এবং নানা গুণের বলে দিল্লিতে তার উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটতে থাকে এবং তিনি সুলতান ইলতুৎমিশের 'বন্দেগান-ই-চেহেলগান' বা চল্লিশ ক্রীতদাস চক্রের প্রভাবশালী অমাত্যে পরিণত হন। বলবন ইলতুৎমিশের 'খাসবরদার' (ব্যক্তিগত পরিচালক) হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। সুলতান রাজিয়ার সময় তিনি 'আমির-ই-শিকার' (দুর্গপ্রধান) এবং সুলতান বাহরাম শাহের (১২৪০-১২৪২ খ্রি.) সময় 'আমির-ই-আখুর' (রাজকীয় অশ্বশালার অধিপতি) পদে নিয়োগ লাভ করেন। তিনি রেওয়াবি ও হান্সির জায়গিরদার হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। সুলতান আলাউদ্দিন মাসুদ শাহের (১২৪২-১২৪৬ খ্রি.) সময় তিনি 'আমির-ই-হাযিব' (প্রধান সেনাপতি) পদাভিষিক্ত হন এবং মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে সাফল্যলাভ করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদের (১২৪৬-১২৬৬ খ্রি.) সময় বলবন সাম্রাজ্যের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তিতে পরিণত হন। সুলতান তাকে নায়েব্-মামালিক (সামরিক বাহিনীর প্রধান) পদে নিয়োগ করেন। রাজকাজে নাসিরউদ্দিনের অনীহার কারণে বলবনই মূলত দায়িত্ব পালন করেন এবং অনেকটা ছায়া সুলতান হিসেবে সালতানাতের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা ও বহিঃআক্রমণ প্রতিহত করে সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব বজায় রাখেন। বলবনের কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ তাই সুলতান নাসিরউদ্দিন তাকে 'উলুঘ খান' উপাধি দেন।

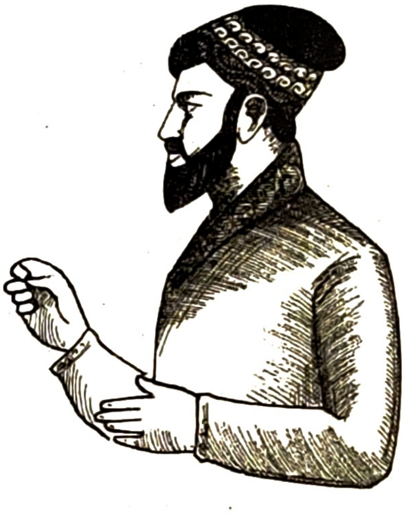
সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন

সিংহাসনে আরোহণ: সুলতান নাসিরউদ্দিন নিঃসন্তান ছিলেন। তাই মৃত্যুর আগে তিনি তার প্রিয়ভাজন বলবনকে সালতানাতের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। নাসিরউদ্দিনের মৃত্যুর পর বলবন ১২৬৬ খ্রিষ্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারি ৬০ বছর বয়সে 'গিয়াসউদ্দিন' উপাধি ধারণ করে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন।

সুলতান হিসেবে বলবনের কার্যাবলি (Activities of Balban as a Sultan)

দিল্লি সালতানাতের এক চরম সমস্যাসংকুল পরিস্থিতিতে বলবন সিংহাসনে আরোহণ করেন। এ সময় সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশের উত্তরাধিকারী সুলতানদের দুর্বলতার কারণে তুর্কি আমির- উমরাহ ও শামসি অভিজাতদের মধ্যে ক্ষমতা, দ্বন্দ্ব-কলহ ও ষড়যন্ত্রের ফলে দেশে এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। শুধু তাই নয় পূর্ববর্তী সুলতানদের অযোগ্যতার কারণে সুলতানের মর্যাদারও হানি ঘটে। কেন্দ্রীয় রাজশক্তির প্রতি অশ্রদ্ধার ফলে সর্বত্র বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। রাজকোষ অর্থশূন্য হয়ে পড়ে। তাছাড়া সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে বারবার মোঙ্গল আক্রমণ দিল্লি সালতানাতকে চরম সংকটাপন্ন করে তোলে। ভি. ডি. মহাজন মনে করেন, এরূপ গুরুতর পরিস্থিতি মোকাবিলায় বলবন ছিলেন যোগ্যতম ব্যক্তি।

সুলতান বলবনের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ (Steps taken by Sultan Balban)

অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও নৈরাজ্যের অবসান এবং বহিঃআক্রমণ প্রতিহত করে সাম্রাজ্যের সংহতি বিধান সুলতান হিসেবে বলবনের দায়িত্ব ছিল। আর তিনি সাফল্যের সাথে এ দায়িত্ব পালনে সক্ষম হন। ড. মজুমদার, রায় চৌধুরী ও দত্তের ভাষায়, "সুলতান হিসেবে বলবনের কার্যক্রম ছিল অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে একটি সংগ্রাম।"[৮]

---

[৮] "Balban's career as a sultan was one of the struggle against internal troubles and external danger." – *An Advanced History of India, P-288.*

রাজতন্ত্র ও সুলতানের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য গৃহীত পদক্ষেপ: সুলতান বলবন সুলতানের মর্যাদা পুনরুদ্ধার এবং রাজপদের পবিত্রতা ও শক্তি সম্পর্কে জনমনে সম্ভ্রম জাগানো তাৎক্ষণিক কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন। সুলতান উপলব্ধি করেন ঐক্যবদ্ধ, কেন্দ্রীভূত একটি শক্তিশালী ও নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই হিন্দু ও মোঙ্গল আগ্রাসন প্রতিহতকরণ ও সাম্রাজ্যের সংহতি বিধান সম্ভব। তাই তিনি সুলতানের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও রাজতন্ত্র শক্তিশালীকরণে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন। রাজতন্ত্র ও রাজক্ষমতা বিষয়ে তিনি বিশেষ ধারণা পোষণ করতেন। তার মতে, রাজতন্ত্র হচ্ছে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অপর নাম। এ. বি. এম. হবিবুল্লাহর মতে, বলবন ইংল্যান্ডের স্টুয়ার্ট রাজাদের মতো রাজার দৈবসত্তায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মনে করতেন, রাজার অন্তর আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহের আধার এবং এ বিবেচনায় মানবসমাজে তার সমকক্ষ কেউ নেই। বলবন মনে করতেন, সুলতান নিজে নিজের সম্মান রক্ষা না করলে শাসিতরা অবাধ্য হয়ে পড়বে এবং অরাজকতা ও নৈরাজ্য দেখা দিতে পারে। প্রজাদের আনুগত্য নিশ্চিত ও সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার জন্যই রাজার অতি মানবসুলভ ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা এবং স্বেচ্ছাচারী রাজক্ষমতা প্রয়োগ আবশ্যক। এরূপ ধারণার বশবর্তী হয়ে রাজতন্ত্রের মর্যাদা বৃদ্ধি ও সুলতানকে সবার কাছে শ্রদ্ধাশীল এবং সালতানাতের কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে তিনি কতগুলো ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। যেমন—

১. সিংহাসনে বলবনের বংশগত কোনো ভিত্তি ছিল না। তাই জনসম্মুখে আত্মসম্মান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি নিজেকে পৌরাণিক বীর 'আফরাসিয়াবের' বংশধর বলে দাবি করেন;

২. তিনি পৃথিবীতে নিজেকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে দাবি করেন;

৩. রাজতন্ত্রের মর্যাদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি ধর্ম রক্ষা ও শরিয়তের শাসন কায়েম, পাপাচার ও দুর্নীতি বিলোপ, ধার্মিক ও সদ্বংশীয় লোকদের রাজকাজে নিয়োগ এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন;

৪. জনমনে ভীতি ও শ্রদ্ধা জাগানোর জন্য বলবন সেলজুক ও খাওয়ারিযম রাজকীয় ঐতিহ্যের অনুকরণে জমকালো রাজদরবার প্রতিষ্ঠা এবং সুলতানের আভিজাত্য রক্ষা ও তার অবাধ ক্ষমতা প্রমাণের জন্য পারস্য রীতি অনুযায়ী রাজদরবারে সুলতানকে 'সিজদাহ' (আভূমি কুর্ণিশ) ও 'পায়বুস' (পদচুম্বন) করার রীতি প্রচলন করেন। তিনি রাজদরবারের মর্যাদা ও গাম্ভীর্য রক্ষায় রাজসভায় লঘু চপলতা, হাসিঠাট্টা বারণ এবং মদপান ও নৃত্য-গীত নিষিদ্ধ করেন।

৫. বলবন সুলতানের ব্যক্তিগত সমমর্যাদা, বাহ্যিক আড়ম্বর ও মর্যাদার ব্যাপারে বিশেষ সচেতন ছিলেন। তিনি সবসময় জনসাধারণের কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলতেন। সবসময় রাজকীয় পোশাকে সজ্জিত থাকতেন। নিচ বংশীয় লোকদের সাথে মেলামেশা বা কথাবার্তা বলা পছন্দ করতেন না।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. গিয়াসউদ্দিন বলবনের প্রকৃত নাম কী?
২. গিয়াসউদ্দিন বলবন কার সময়ে 'আমির-ই-শিকার' (দুর্গপ্রধান) পদে নিয়োগ পান?
৩. সুলতান নাসিরউদ্দিন বলবনকে কী উপাধি দেন?
৪. বলবন কত খ্রিষ্টাব্দে 'গিয়াসউদ্দিন' উপাধি ধারণ করে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন?
৫. রাজদরবারে সুলতানকে 'সিজদাহ' ও 'পায়বুস' করার রীতি প্রচলন করেন কে?
৬. বলবন নিজেকে কার বংশধর বলে দাবি করেন?

উত্তরের জন্য ১৩২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

রাজতন্ত্র ও সুলতানের মর্যাদা বৃদ্ধিতে সুলতান বলবনের গৃহীত পদক্ষেপগুলো ছক আকারে লেখো।

পাঠ ১০ ও ১১

দিল্লি সালতানাত সুদৃঢ়ীকরণে সুলতান বলবনের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ এবং তার মোঙ্গল নীতি (Steps taken by Sultan Balban to Consolidate Delhi Sultanate and His Policy towards the Mongol)

রাজতন্ত্র সুদৃঢ়ীকরণের মধ্য দিয়ে নিজেকে সুলতান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে বলবন সালতানাতের স্থায়িত্ব বিধানে মনোযোগী হন। এক্ষেত্রে তিনি যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তা হলো:

সামরিক বাহিনী পুনর্গঠন: মধ্যযুগীয় স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের প্রধান ভিত্তি হলো সামরিক বাহিনী। সুশৃঙ্খল সালতানাত প্রতিষ্ঠায় অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও বহিঃশক্তির আক্রমণ প্রতিহতকরণে সামরিক বাহিনীর গুরুত্ব উপলব্ধি করে বলবন এর পুনর্গঠনে পদক্ষেপ নেন। জায়গির প্রথা বিলুপ্ত করে সেনাবাহিনীকে নগদ অর্থে বেতন প্রদানের ব্যবস্থা করেন। সামরিক কর্তব্য পালনে সক্ষম ব্যক্তিদের নিয়োগ দিয়ে সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করেন। সুলতান বলবন তার সেনাবাহিনী পুনর্গঠনের দায়িত্ব তার আস্থাভাজন 'দিউয়ান-ই-আরয' (সমরমন্ত্রী) ইমাদ-উল-মূলকের ওপর ন্যস্ত করেন। এ. বি. এম. হবিবুল্লাহ বলেন, "তার (ইমাদ-উল-মূলক) সততা ও সৈনিক ভর্তির খুঁটিনাটি বিষয়ে সযত্ন দৃষ্টি এবং সৈনিকদের বেতন, যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহসহ সব বিষয়ে মনোযোগের ফলে সেনাবাহিনীর শক্তি ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।"

চল্লিশ চক্র দমন: সুলতান ইলতুৎমিশের রাজত্বকালেই তুর্কি অভিজাতরা প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হন। এ অভিজাতদের একটি চক্র 'বন্দেগান-ই- চেহেলগান' নামে পরিচিতি লাভ করে। ইলতুৎমিশের দুর্বল উত্তরাধিকারীদের যুগে রাজ্যপ্রশাসন, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে এরা সর্বেসর্বা হয়ে ওঠে। বলবন নিজেও এ চক্রের অন্যতম সদস্য ছিলেন। তাই তিনি এদের অশুভ প্রভাববলয় সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর সুলতান বলবন উপলব্ধি করেন যে, সালতানাতের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং নিজের ক্ষমতা ও নিরাপত্তা সুসংহত করার জন্য তুর্কি অভিজাত 'চল্লিশ চক্রের' ক্ষমতা নাশ করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে তিনি নিম্নপদস্থ তুর্কিদের উচ্চ পদে নিয়োগ করে অভিজাত চল্লিশ চক্রের সমপর্যায়ভুক্ত করেন। সামান্য অপরাধে তাদের কঠোর শাস্তি দিয়ে জনসম্মুখে হেয় করেন। তাছাড়া বিশেষ সুযোগ-সুবিধা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে জায়গির বাতিলের মাধ্যমে তাদের দুর্বল ও ক্ষমতাহীন করে সুলতানের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আনা হয়।

জেনে রাখো

সুলতান ইলতুৎমিশের সময় (১২১১-১২৩৬ খ্রি.) থেকেই তুর্কি আমির ও মালিকেরা শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। এদের মধ্যে চল্লিশজনকে নিয়ে একটি দল গঠিত হয়েছিল, যারা 'বন্দেগান-ই-চেহেলগান' বা চল্লিশ চক্র নামে পরিচিত। বস্তুত এরাই ছিল সালতানাতের সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তি। সুলতান নির্বাচন ও প্রশাসন পরিচালনায় এরাই মূল ভূমিকা পালন করত। এরা সুলতান রাজিয়াকে ক্ষমতা থেকে সরিয়েছিল। সুলতান বলবন নিজেও ছিলেন এ দলের একজন প্রভাবশালী সদস্য। তাই চল্লিশ চক্রের শক্তিমত্তা ও দুর্বলতা সম্পর্কে তার স্পষ্ট ধারণা ছিল। সিংহাসনে আরোহণের পর বলবন এদেরকে কঠোরভাবে দমন করেন।

মেওয়াটি দস্যুদের দমন: বলবনের রাজত্বকালে মেওয়াটি পার্বত্য অধিবাসী দস্যুদের চরম উৎপাত, লুটতরাজ ও নির্দয় হত্যাযজ্ঞে দিল্লি ও তার আশপাশের অঞ্চলগুলোতে জনজীবনে মারাত্মক বিপর্যয় নেমে আসে। ঈশ্বরী প্রসাদের বর্ণনা মতে, তাদের ঔদ্ধত্য এতখানি বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, আসর নামাজের পর রাজধানী দিল্লির পশ্চিম ফটক বন্ধ করে দিতে হতো। বলবন জনগণের জানমাল ও দিল্লির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য মেওয়াটি দস্যুদের কঠোর হস্তে দমন করেন। দস্যুদের অভয়ারণ্য দিল্লির আশপাশের বড় বড় জঙ্গলগুলো কেটে পরিষ্কার করা হয়। দিল্লির চতুর্পাশে সুরক্ষিত সামরিক পাহারার ব্যবস্থা করা হয়। ভবিষ্যতে তাদের আক্রমণ রোধের জন্য প্রয়োজনীয় স্থানে পুলিশ চৌকি স্থাপন করা হয়।

দোয়াবের বিদ্রোহ দমন: বলবনের সময় গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী দোয়াব অঞ্চলে দুর্ধর্ষ হিন্দুদের বেআইনি তৎপরতায় সাধারণ মানুষের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। এদের উৎপাতে পণ্য সম্ভার নিয়ে বণিক-ব্যবসায়ীদের চলাচল ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য বিঘ্নিত হয়। এ অবস্থায় সুলতান এসব অরাজকতা নির্মূলে উদ্যোগী হন। বিদ্রোহীদের প্রধান আস্তানা কাম্পিল, পাতিয়ালা এবং ভোজপুর করায়ত্ত করে লুটকারীদের নিশ্চিহ্ন করা হয়। ফলে দস্যুদের আস্তানা আফগান সৈনিক ও সেনানায়কদের আস্তানায় রূপান্তরিত করা হয়।

রোহিলাখণ্ডের বিদ্রোহ দমন: বলবন যখন দোয়াবের বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত তখন রোহিলাখণ্ডেও দাঙ্গা শুরু হয়। কাতেহার হিন্দুপ্রধানদের এ বিদ্রোহে সুলতান অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। সুলতান রাজকীয় বাহিনীকে বিদ্রোহীদের সমূলে নির্মূল করার জন্য আদেশ দিলে অত্যন্ত নির্মমভাবে তাদের দমন করা হয়। বিদ্রোহীরা গণহত্যার শিকার হয়। গোটা অঞ্চলকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে রাজকীয় বাহিনী বিপুল পরিমাণ সম্পদ হস্তগত করে।

জাঠ উপজাতিদের দমন: জাঠ পার্বত্য উপজাতি গোষ্ঠী বিদ্রোহী হলে সুলতান তাদেরও কঠোর হস্তে দমন করেন। তাদের দুর্গ আক্রমণ এবং গোটা অঞ্চল ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে অরাজকতার অবসান করা হয়।

গোয়েন্দা ব্যবস্থা প্রবর্তন: ঈশ্বরী প্রসাদের মতে, 'সুদক্ষ গোয়েন্দা ব্যবস্থা স্বৈরতন্ত্রের স্বাভাবিক এবং অনিবার্য সহযোগী।' এ সত্য উপলব্ধি করে বলবন একটি শক্তিশালী ও সুসংগঠিত গুপ্তচর বাহিনী গড়ে তোলেন। এ খাতে তিনি যথেষ্ট সময় ও প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও সেনাপতিদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত গোয়েন্দারা রাজধানীর পদস্থ আমাত্য ও অভিজাতবর্গ, প্রদেশপাল এবং উচ্চ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা এমনকি সুলতানের পুত্রদের দৈনন্দিন কার্যক্রম ও গতিবিধি সম্পর্কে সুলতানকে জানাতেন। সফল গোয়েন্দা তৎপরতার ফলে বিদ্রোহ ও অপরাধ তৎপরতার সংখ্যা ও মাত্রা হ্রাস পায়।

অভ্যন্তরীণ প্রশাসন পুনর্গঠন: শুধু সামরিক শক্তি দ্বারা একটি রাজ্য পরিচালনা সম্ভব নয়। এ কারণে বলবন তার অভ্যন্তরীণ প্রশাসন পুনর্গঠন করেন। ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, "এ প্রশাসনের ভিত্তি ছিল দক্ষতা এবং প্রকৃতি ছিল আধা বেসামরিক ও আধা সামরিক।" সুলতান স্বয়ং ছিলেন প্রশাসনের সকল কর্তৃত্বের উৎস। শাসনব্যবস্থার ব্যাপারে তিনিই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতেন এবং তা কার্যকর করা ছিল সবার জন্য বাধ্যতামূলক। তিনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশে তার পুত্রদের প্রদেশপাল নিয়োগ করেন। তবে তাদেরও কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হতো।

বিচার ব্যবস্থা: সুলতান গিয়াসউদ্দিন ন্যায়বিচারক ছিলেন। বিচার কাজে তিনি নিকটাত্মীয়দের কোনো পক্ষপাতিত্ব করতেন না। তিনি নিরপেক্ষভাবে বিবাদির ক্ষোভ প্রশমন করতেন। ন্যায়বিচারের ব্যাপারে সুলতানের কঠোরতার ফলে কেউ তার ভৃত্য বা ক্রীতদাসের প্রতিও অন্যায় করার সাহস করত না।

এসব পদক্ষেপ গ্রহণ করে সুলতান বলবন দিল্লি সালতানাতকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন।

সুলতান বলবনের মোঙ্গল নীতি (Policy of Sultan Balban towards the Mongol)

মোঙ্গল আক্রমণের হাত থেকে দিল্লি সালতানাতকে রক্ষা করা সুলতান বলবনের অন্যতম কৃতিত্ব। মোঙ্গলরা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পথে বারবার ভারত আক্রমণ করত। তারা লাহোর দখল করে নিয়েছিল। সিন্ধু ও মুলতান তাদের উপর্যুপরি আক্রমণের ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। এ অবস্থায় সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সুরক্ষা এবং মোঙ্গল আক্রমণ থেকে দিল্লি সালতানাতকে নিরাপদ রাখার লক্ষ্যে সুলতান কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ নীতি গ্রহণ করেন।

প্রথমত, সুলতান বলবন সেনাবাহিনী পুনর্গঠন ও শক্তিশালী করেন। সৈন্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও তাদের উত্তম অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জামাদি দ্বারা সজ্জিত করে সীমান্ত অঞ্চলে মোতায়েন করা হয়। সীমান্ত নিরাপত্তার গুরুত্ব বিবেচনা করে শেরখান ও শঙ্করের মতো সেনাপতিদের সীমান্ত অঞ্চলে নিয়োগ দেওয়া হয়;

দ্বিতীয়ত, গুরুত্বপূর্ণ সামরিক কেন্দ্রসমূহে নতুন দুর্গ নির্মাণ এবং পুরোনো দুর্গ সংস্কার করে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়;

তৃতীয়ত, মোঙ্গাল আক্রমণকারীদের গতিবিধি দেখার জন্য সীমান্ত অঞ্চলে গোয়েন্দা তৎপরতা বৃদ্ধি করা হয়;

চতুর্থত, মোঙ্গাল আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য রাজ্য বিস্তার নীতি বর্জন করা হয়। মোঙ্গাল আক্রমণের আশঙ্কায় সুলতান বলবন রাজধানী দিল্লি ছেড়ে অন্যত্র না গিয়ে যতদূর সম্ভব রাজধানীতে অবস্থান করেন। মোঙ্গাল আক্রমণ থেকে প্রজাদের রক্ষা করা প্রধান কর্তব্য বিবেচনা করে সুলতান রাজ্য বিস্তার নীতি পরিহার করেন।

পঞ্চমত, নিরাপত্তার জন্য সীমান্ত অঞ্চলে সামানা ও সুনাম নামে দুটি প্রদেশ গঠন করে সুলতানের কনিষ্ঠ পুত্র বুগরা খানের ওপর প্রদেশ দু'টির শাসনভার ন্যস্ত করা হয়। জ্যেষ্ঠপুত্র শাহজাদা মুহাম্মদকে সিন্ধু, মুলতান ও দিপালপুরের প্রদেশপাল নিয়োগ করা হয়;

ষষ্ঠত, ১২৭৯ খ্রিষ্টাব্দে মোঙ্গলরা পাঞ্জাব আক্রমণ করলে শাহজাদা মুহাম্মদ বুগরাখান ও দিল্লির মালিক মুবারকের সহায়তায় মোঙ্গল অগ্রাভিযান প্রতিহত করা হয়। ১২৮৬ খ্রিষ্টাব্দে মোঙ্গলরা পুনরায় পাঞ্জাব আক্রমণ করে। শাহজাদা মুহাম্মদ তাদের প্রতিরোধ করতে গিয়ে নিহত হন। বিক্ষুব্ধ বলবন নিজে সসৈন্যে অগ্রসর হয়ে মোঙ্গলদের বিতাড়িত করে লাহোর উদ্ধার করেন।

বাংলার বিদ্রোহ দমন: উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মোঙ্গল প্রতিরোধে সুলতান বলবনের ব্যস্ততার সুযোগে বাংলার শাসনকর্তা তুঘরিল খান দিল্লির কর্তৃত্ব অস্বীকার করে ১২৭৯ খ্রিষ্টাব্দে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি 'সুলতান মুগিস উদ্দিন' উপাধি ধারণ করে নিজ নামে খুতবা পাঠ ও মুদ্রা জারি করেন। সুলতান বলবন তুঘরিল খানের বিদ্রোহ দমন করার জন্য অযোধ্যার শাসনকর্তা মালিক আমিন খান, সেনানায়ক তিরমিতি এবং শাহাবউদ্দিনের নেতৃত্বে পর পর তিনটি অভিযান প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনটি অভিযানই ব্যর্থ হয়। উপর্যুপরি ব্যর্থতায় ক্ষুব্ধ হয়ে সুলতান বলবন স্বয়ং তুঘরিলের বিরুদ্ধে চতুর্থ অভিযানে নেতৃত্ব দেন। শাহজাদা বুগরা খান এ অভিযানে পিতার সঙ্গী হন। সুলতানের আগমনে ভীত হয়ে তুঘরিল খান রাজধানী ছেড়ে উড়িষ্যার অরণ্যে আশ্রয় নিয়েও শেষ রক্ষা করতে পারেননি। তিনি রাজকীয় বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন এবং তাকে হত্যা করা হয়। অতঃপর পুত্র বুগরা খানকে বাংলার শাসনকর্তা নিয়োগ করে বলবন বিজয়ীর বেশে রাজধানীতে ফিরে যান। ঐতিহাসিক বারানী মন্তব্য করেন যে, "তুঘরিলকে দমনের মধ্য দিয়ে জনমনে সুলতানের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সাম্রাজ্যের সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করে। এর মধ্য দিয়ে সুলতান বলবন তার শক্তি ও মর্যাদার শীর্ষে অধিষ্ঠিত হন।"

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. 'বন্দেগান-ই- চেহেলেগান' বা চল্লিশ চক্র দমন করেন কে?
২. পার্বত্য অঞ্চলের মেওয়াটি দস্যুদের কে দমন করেছিলেন?
৩. গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চল কী নামে পরিচিত?
৪. দিল্লি সালতানাতে গোয়েন্দা ব্যবস্থা প্রবর্তন কে?
৫. বলবন কাদের আক্রমণের হাত থেকে দিল্লি সালতানাতকে রক্ষা করেন?
৬. বলবনের সময় দিল্লির কর্তৃত্ব অস্বীকার করে বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন কে?

উত্তরের জন্য ১৩২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. দিল্লি সালতানাত সুদৃঢ়ীকরণে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তার একটি তালিকা তৈরি করো।
২. সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের মোঙ্গল নীতির পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ দিক চিহ্নিত করে চার্টে উপস্থাপন করো।

গ. দলীয় কাজ

দিল্লি সালতানাত সুদৃঢ়ীকরণে বলবনের গৃহীত পদক্ষেপগুলো কার্যকর ছিল কি না দুটি দলে বিভক্ত হয়ে এ বিষয়ের পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি দাও।

পাঠ ১২ ও ১৩

সুলতান বলবনের কৃতিত্ব ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং বলবনের শাসন নীতির সমালোচনা (Achievements and Characteristics of Sultan Balban and Criticism of Balban's Administrative Policy)

মোঙ্গল আক্রমণে জ্যেষ্ঠ পুত্র ও উত্তরাধিকারী শাহজাদা মুহাম্মদের মৃত্যুতে বৃদ্ধ সুলতান বলবন শোকে মূহ্যমান হয়ে পড়েন। সুলতান অচিরেই রোগাক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হন এবং ১২৮৭ খ্রিষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে মৃত্যুবরণ করেন।

চরিত্র (Character)

সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন একজন নিষ্ঠাবান সুন্নি মুসলমান ছিলেন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে ধর্মীয় অনুশাসন পালন করতেন। তিনি আলেমদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং তাদের সাথে ইসলামি আইন ও ধর্ম নিয়ে আলোচনা করতে পছন্দ করতেন। সুলতান নিজেকে আল্লাহর প্রতিনিধি মনে করতেন। তিনি ধর্মের রক্ষণাবেক্ষণ ও শরিয়তের নিয়মাবলি কার্যকর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তার সময়ে সাম্রাজ্যে সব ধরনের অনৈসলামিক ও অশালীন কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করা হয় এবং সুলতান নিজে মদপান ত্যাগ করেন।

বলবন কর্তব্যপরায়ণ ও ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন বদ্ধপরিকর। তিনি কঠোরভাবে বিদ্রোহী ও অপরাধীদের শাস্তি দিতেন। তবে ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন হৃদয়বান ও স্নেহপ্রবণ। অসহায় ও দুর্দশাগ্রস্তদের প্রতি সবসময় তার প্রবল মমত্ববোধ ছিল।

কৃতিত্ব (Achievements)

সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন এক কর্মবহুল বিচিত্র জীবনের অধিকারী ছিলেন। মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাসে বলবন ছিলেন তুলনাহীন (Unique in the annals of medieval India.) ব্যক্তিত্ব। এ. বি. এম. হবিবুল্লাহ তাকে দিল্লি সালতানাতের 'রূপকার' হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। হবিবুল্লাহ বলেন, "আইবেক ও ইলতুৎমিশের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে বলবন যে শক্তি ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন, সেজন্য তিনি শত্রুদের কাছ থেকেও প্রশংসা কুড়িয়েছেন।" লেনপুলের মতে, "বলবন দিল্লির সুলতানদের দীর্ঘ তালিকায় সবচেয়ে চমকপ্রদ ব্যক্তিত্ব ছিলেন।"

বলবন একজন সামান্য ক্রীতদাস হিসেবে জীবন শুরু করলেও নিজ প্রতিভা ও যোগ্যতাবলে তিনি ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করেন। ত্রয়োদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দিল্লি সালতানাতের ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ অবনতিশীল পরিস্থিতিতে ক্ষমতা গ্রহণ করে বলবন দক্ষতার সাথে পরিস্থিতি সামাল দেন। অভ্যন্তরীণ নৈরাজ্য, বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা দমন করে সুলতান বলবন শিশু তুর্কি সালতানাতের সংহতি বিধান ও একে নবজীবন দান করেন। নিজস্ব রাজতান্ত্রিক আদর্শ বাস্তবায়ন করে সালতানাতের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার ও সুলতানের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। তিনি পারস্যের রাজদরবারের রীতি ও ঐতিহ্য অনুসরণ করে দরবারের জৌলুস ও চাকচিক্য বৃদ্ধির মাধ্যমে এর প্রতি জনগণের ভয় মিশ্রিত আনুগত্য নিশ্চিত করেন। বিচ্ছিন্নতাবাদ নির্মূল ও শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুলতান অত্যন্ত কঠোর ও নির্দয় নীতি গ্রহণ করেন। তার এ নীতি 'রক্তপাত ও কঠোর নীতি' (Blood and Iron Policy) নামে খ্যাত। এ নীতি অনেক সময় বর্বরতার নামান্তর ছিল সন্দেহ নেই। তবে তখনকার দিল্লি সালতানাতে বিরাজমান বাস্তবতার নিরিখে তা ছিল অপরিহার্য।

বিজেতা হিসেবে বলবন সুনাম অর্জন করতে পারেননি। অবশ্য রাজ্য বিস্তারে তার কোনো আগ্রহও ছিল না। 'তোমার নিজের রাজ্য শক্তিশালী ও সুদৃঢ় করো'— প্রাচীন রাজন্যদের এ পরামর্শে বিশ্বাসী বলবন নতুন রাজ্যজয় অপেক্ষা নিজ রাজ্যের প্রতিরক্ষা ও সম্পদ সংরক্ষণে অধিকতর মনোযোগী ছিলেন। বলবন সামরিক সংগঠন ও বেসামরিক প্রশাসন পুনর্গঠনে কোনো মৌলিক সংস্কার করতে না পারলেও তিনি এর পুরোনো ধারায় গতি সঞ্চার করেছিলেন। বলবন জ্ঞানী-গুণী ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তার দরবারে মানবিক সংস্কৃতির চর্চা হতো। এ সময় দিল্লি মুসলিম কৃষ্টি ও শিক্ষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠে পরিণত হয়েছিল। মোঙ্গল আক্রমণে মধ্য এশিয়া থেকে বিতাড়িত বহু পণ্ডিত ও রাজ্যহারা রাজা তার দরবারে আশ্রয় লাভ করেন। বিখ্যাত কবি আমির খসরু ও আমির হাসান সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন।

বলবনের শাসন নীতির সমালোচনা (Criticism of Balban's Administrative Policy)

এ. বি. এম. হবিবুল্লাহ, কে. এ. নিজামী ও এ. এল. শ্রীবাস্তব প্রমুখ বলবনের শাসননীতির সমালোচনা করেছেন। হবিবুল্লাহর মতে, 'তার শাসন নীতিতে রাষ্ট্রনায়োকোচিত দূরদর্শিতার অভাব লক্ষ করা যায়।' তাছাড়া বলবন নিরঙ্কুশ স্বৈরতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। সাম্রাজ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি তুর্কি চল্লিশ চক্রের ক্ষমতা খর্ব করেন। বলবনের কঠোর শাসনে ক্ষমতাচ্যুত ব্যক্তিরা নিশ্চুপ থাকলেও দুর্বল উত্তরাধিকারীদের সময় তারা পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। বেসামরিক প্রশাসন ও রাজস্বব্যবস্থা পুনর্গঠনে কোনো মৌলিক রূপান্তর সাধন করতে না পারায় রাজ্যে প্রশাসনিক সংকট তৈরি হয়।

সামরিক বাহিনী সংগঠনে বলবনের দুর্বলতার কথা ঐতিহাসিক কে. এ. নিজামী উল্লেখ করেছেন। তার সেনাবাহিনী অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা করতে সক্ষম হলেও দক্ষ সেনানায়কের অভাবে রাজ্য বিস্তার বা রাজপুতদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেনি। বলবন উগ্র জাতীয় চেতনার কারণে সালতানাতকে সম্পূর্ণরূপে একটি তুর্কি প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। এজন্য তিনি ভারতীয় মুসলমানদের উপেক্ষা করেন। তিনি নিজেকে মুসলমানদের সুলতান অপেক্ষা তুর্কি সার্বভৌমত্বের অভিভাবকরূপেই গণ্য করতেন। তার ভারতীয়দের উপেক্ষাকরণ নীতি ভারতীয় মুসলমানদের মনে ক্ষোভের সঞ্চার করে। ফলে তাদের সাথে সুলতানের দূরত্ব বৃদ্ধি পায়। এ অসন্তোষ ও দূরত্বের প্রেক্ষাপটে ভারতীয় মুসলিম স্বার্থের প্রতিভূ হিসেবে খলজিদের রাজনৈতিক দৃশ্যপটে আগমন ঘটে এবং তথাকথিত তুর্কি দাস বংশের শাসনের অবসান হয়।

প্রকৃতপক্ষে, মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাসে বলবন ছিলেন একজন ক্ষণজন্মা শাসক। ঐতিহাসিক ঈশ্বরী প্রসাদের মতে, তিনি দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন, বিশৃঙ্খলা দূর এবং মোঙ্গলদের প্রলয়ঙ্করী আক্রমণ মোকাবিলা করে ভারতের শিশু মুসলিম রাষ্ট্রকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করেন। তিনি দিল্লি সালতানাতের মর্যাদা বৃদ্ধি এবং জনগণের শান্তি নিশ্চিত করেন। বলবন সমাজব্যবস্থার সুষম বিন্যাস দ্বারা আলাউদ্দিন খলজির সামরিক ও প্রশাসনিক সংস্কারের পথ সুগম করেন। এজন্য তাকে সুলতান আলাউদ্দিন খলজির অগ্রদূত (The precursor of Sultan Ala-uddin Khalji) বলা হয়।

কায়কোবাদ (১২৮৭-১২৮৯ খ্রি.): সুলতান বলবনের মৃত্যুর পর দরবারের অভিজাতরা বলবনের মনোনীত কায়খসরুকে সিংহাসনে না বসিয়ে তার পৌত্র ও বুঘরা খানের পুত্র কায়কোবাদকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। বরানির মতে, কায়কোবাদ 'মুইজ-উদ-দীন; উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে বসলেও শাসনকার্যে মনোনিবেশ না করে আরাম-আয়েশে নিমজ্জিত হন। এ সুযোগ প্রধানমন্ত্রী নিজাম উদ্দিন সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত করেন এবং ক্ষমতা দখলের জন্য ১২৮৯ খ্রিষ্টাব্দে কায়কোবাদকে হত্যা করেন। এরপর কায়কোবাদের শিশুপুত্র কায়মুর্সকে সিংহাসনে বসানো হয়। কিন্তু কিছুদিন পর তাকেও হত্যা করা হয়। এর ফলে সাম্রাজ্যে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলে সুযোগ বুঝে প্রভাবশালী আমির মালিক জালালউদ্দিন খলজি মালিকদের সহযোগিতায় দিল্লির সিংহাসন দখল করেন। ফলে দিল্লি সালতানাতে দাস বংশের শাসনের অবসান ঘটে এবং 'খলজি রাজবংশের' শাসন শুরু হয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. 'রক্তপাত ও কঠোর নীতি' কার শাসনের বৈশিষ্ট্য ছিল? *[রাবি ২০১০-১১]*
২. সুলতান বলবন নিজেকে কার প্রতিনিধি মনে করতেন?
৩. বিখ্যাত কবি আমির খসরু ও আমির হাসান কোন সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন?
৪. বলবন রাজদরবারে কোন দেশের রীতি ও ঐতিহ্য অনুসরণ করেন?
৫. বলবন কোন রাষ্ট্রীয় মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন?
৬. সুলতান বলবনের মৃত্যুর পর অভিজাতরা কাকে দিল্লির সিংহাসনে বসান?

উত্তরের জন্য ১৩২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের কৃতিত্বসমূহের উল্লেখযোগ্য পাঁচটি ছক আকারে লেখো।
২. ঐতিহাসিকদের মতামতের ভিত্তিতে বলবনের শাসননীতির সমালোচনার একটি ছক তৈরি করো।

পাঠ ১৪

সুলতান জালালউদ্দিন খলজি: খলজি বংশের প্রতিষ্ঠা (১২৯০-১২৯৬ খ্রি.)
Sultan Jalaluddin Khalji: Establishment of the Khalji Dynasty (1290-1296 AD)

মুহাম্মদ ঘুরি ভারতবর্ষে যে মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন করেছিলেন তথাকথিত মামলুক (দাস) তুর্কি রাজবংশের শাসনাধীনে তা স্থিতিশীল ও সুসংহত রূপলাভ করে। ১২৯০ খ্রিষ্টাব্দে তুর্কি মামলুক শাসনের অবসান ঘটে এবং ভারতের মুসলিম শাসনের ইতিহাসে খলজি যুগের সূচনা হয়। খলজি বংশের শাসনামলে (১২৯০-১৩২০ খ্রি.) ভারতের মুসলিম সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণসহ প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হয়।

খলজিদের পরিচয় (Introduction to Khalji)

খলজিদের বংশ পরিচয় সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য বিদ্যমান। ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানীর মতে, খলজিরা তুর্কিদের থেকে ভিন্ন এক জাতি। ভিনসেন্ট স্মিথের মতে, খলজিরা আফগান বংশোদ্ভূত। অন্যদিকে, ভূগোলবিদ ইবনে হাউকল, ইতিহাসবিদ ফখরুদ্দিন, মিনহাজ-উস-সিরাজ, নিজামউদ্দিন বখশী এবং ফিরিশতা প্রমুখ খলজিদের তুর্কি বংশোদ্ভূত বলে উল্লেখ করেছেন। র‍্যাবার্টি, লেনপুল, বারথোল্ড প্রমুখ আধুনিক ইতিহাসবিদরাও খলজিদের তুর্কি জাতিভুক্ত বলে মনে করেন। ওলাফ কোরাও খলজিদের মূল উৎস তুর্কি বলে বর্ণনা করেছেন। অধিকাংশ আধুনিক পণ্ডিত মনে করেন খলজিরা আফগান নয়, তুর্কি। তবে তারা আদি নিবাস তুর্কিস্তান ত্যাগ করে আফগানিস্তানের হেলমন্দ উপত্যকায় বসতি স্থাপন করেন। দীর্ঘদিন আফগানিস্তানে বসবাসের ফলে তাদের মধ্যে আফগান আচার-আচরণ ও রীতি-নীতির বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এজন্য অনেকে ভুলবশত তাদের আফগান বলে উল্লেখ করেন। বস্তুত খলজিরা জাতিতে তুর্কি এবং ইলবারি তুর্কিদের মতো তাদেরও আদি নিবাস তুর্কিস্তান। মিনহাজ-উস-সিরাজ খলজি বংশের প্রতিষ্ঠাতা জালালউদ্দিন খলজিকে চেঙ্গিস খানের জামাতা কালিজ খানের উত্তর পুরুষ বলে অভিহিত করেছেন। তার মতে, এ কালিজ থেকে খলজি নামের উৎপত্তি।

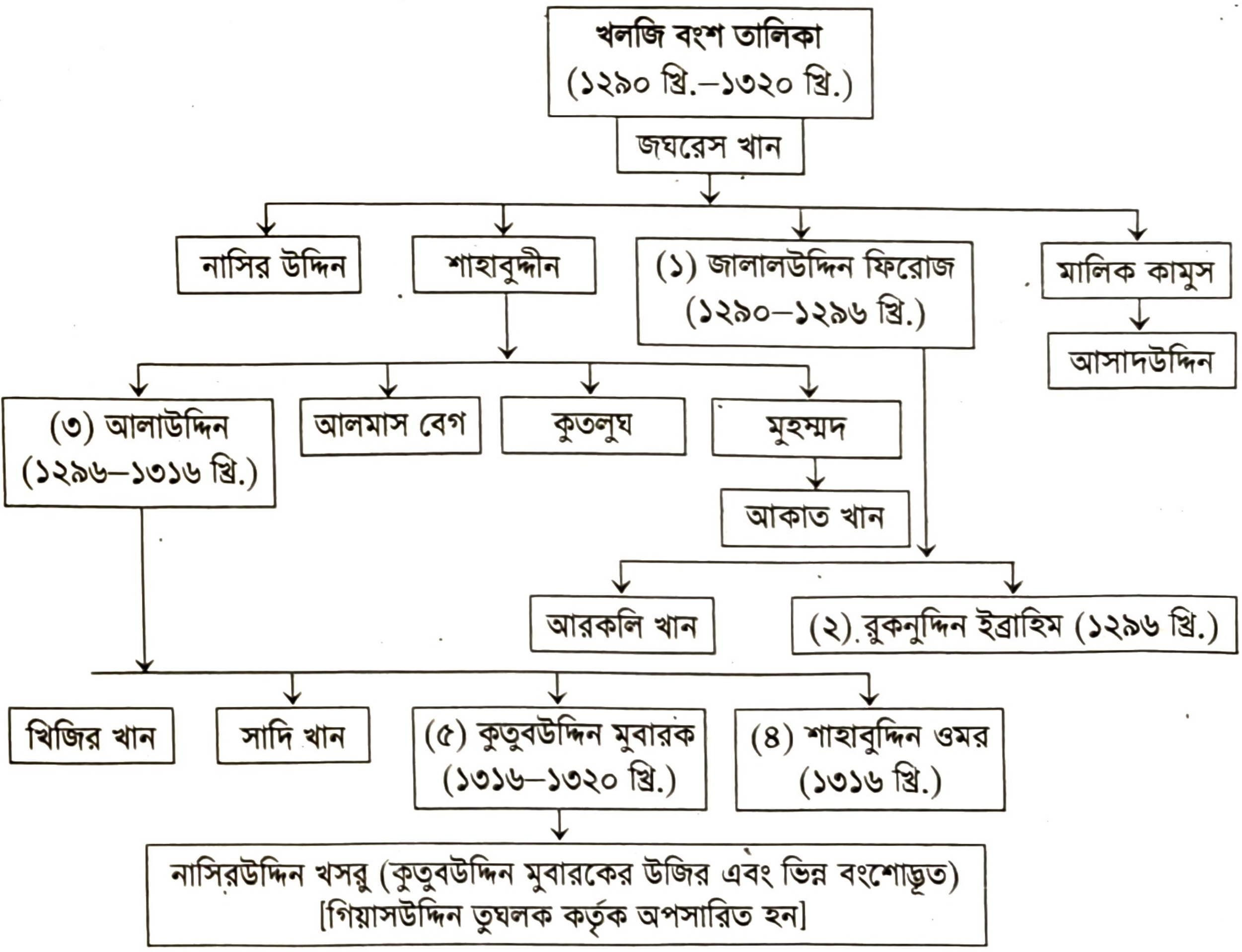
খলজি বংশ তালিকা
(১২৯০ খ্রি.–১৩২০ খ্রি.)
জঘরেস খান
নাসির উদ্দিন
শাহাবুদ্দীন
(১) জালালউদ্দিন ফিরোজ (১২৯০–১২৯৬ খ্রি.)
মালিক কামুস
আসাদউদ্দিন
(৩) আলাউদ্দিন (১২৯৬–১৩১৬ খ্রি.)
আলমাস বেগ
কুতলুঘ
মুহম্মদ
আকাত খান
আরকলি খান
(২) রুকনুদ্দিন ইব্রাহিম (১২৯৬ খ্রি.)
খিজির খান
সাদি খান
(৫) কুতুবউদ্দিন মুবারক (১৩১৬–১৩২০ খ্রি.)
(৪) শাহাবুদ্দিন ওমর (১৩১৬ খ্রি.)
নাসিরউদ্দিন খসরু (কুতুবউদ্দিন মুবারকের উজির এবং ভিন্ন বংশোদ্ভূত)
[গিয়াসউদ্দিন তুঘলক কর্তৃক অপসারিত হন]

জালালউদ্দিন খলজির প্রাথমিক জীবন: খলজি বংশের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান জালালউদ্দিন ফিরোজ খলজি। তার জন্ম সম্ভবত ১২২০ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি তুর্কি মামলুক সুলতানদের অধীনে কর্মজীবন শুরু করেন এবং নিজ যোগ্যতাবলে শার-ই জান্দার (দেহরক্ষী বাহিনী প্রধান) এবং সামানার শাসনকর্তার পদসহ বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে চাকরি করেন। সুলতান কায়কোবাদ তাকে আরিয-ই-মামালিক (সমরমন্ত্রী) পদে নিয়োগ এবং শায়েস্তা খান উপাধি দেন।

খলজি বিপ্লব ও সিংহাসনে আরোহণ: সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের মৃত্যুর পর তুর্কি প্রাধান্যে অসন্তুষ্ট অতুর্কি ও খলজি অভিজাতদের সংগঠিত করে জালালউদ্দিন ফিরোজ খলজি দিল্লির রাষ্ট্রযন্ত্রে অপ্রতিহত প্রভাব প্রতিষ্ঠা করেন। এতে অসন্তুষ্ট তুর্কি অভিজাতরা তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করলে জালালউদ্দিন অসুস্থ অকর্মণ্য সুলতান কায়কোবাদকে (১২৮৬-১২৮৯ খ্রি.) হত্যা এবং তার শিশুপুত্র সুলতান শামসুদ্দিন কায়মুর্সকে (১২৮৯-১২৯০ খ্রি.) কারারুদ্ধ করে নিজেকে সুলতান হিসেবে ঘোষণা করেন। ১২৯০ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ জুন যমুনা নদীর তীরবর্তী কায়কোবাদের কিলকরি প্রাসাদে জালালউদ্দিন ফিরোজ খলজির অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়। আর এ অভিষেক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিল্লি সালতানাতের তথাকথিত দাস বংশের শাসনের অবসান ঘটে এবং খলজি বংশের শাসন শুরু হয়।

প্রাথমিক বিপত্তি ও সুলতানের পদক্ষেপ: দুজন সুলতানের হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে জালালউদ্দিনের ক্ষমতা গ্রহণ দিল্লির সাধারণ নাগরিকরা ভালো চোখে দেখেনি। তুর্কি অভিজাতরা এ সুযোগের সদ্ব্যবহারের চেষ্টা করে। জালালউদ্দিনকে অতুর্কি হিসেবে আখ্যায়িত করে তার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা হয়। ফলে প্রথম দিকে জালালউদ্দিন খলজির পক্ষে দিল্লিতে প্রবেশ করা সম্ভব হয়নি। অবশ্য নিজ চারিত্রিক গুণাবলি ও যোগ্যতাবলে সুলতান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সহায়তায় দিল্লিতে প্রবেশ করতে সক্ষম হন। তিনি খলজি বিপ্লবে তার সহযোদ্ধা অভিজাত আমিরদের উচ্চ রাজপদ ও উপাধি দান করে সম্মানিত করেন।

বিদ্রোহ দমন: সুলতান জালালউদ্দিন খলজির দুর্বল ও উদার শাসনব্যবস্থার সুযোগে প্রথম বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উত্তোলন করেন কারা প্রদেশের শাসনকর্তা মালিক ছাচ্চু। কয়েকজন ইলবারি তুর্কি অভিজাত ও অযোধ্যার শাসনকর্তা আমির আলীর প্ররোচনায় তিনি বিদ্রোহ করে নিজ নামে মুদ্রা জারি ও খুৎবা পাঠের ব্যবস্থা করেন। সুলতান 'মুঘিসউদ্দিন' উপাধি ধারণ করে ছাচ্চু দিল্লি অভিমুখে অগ্রসর হলে সুলতানের পুত্র আরকাল খান এবং ভাইপো আলাউদ্দিন খলজি বাদাউনের কাছে এক যুদ্ধে তাকে পরাজিত করেন। সুলতান আলাউদ্দিন খলজিকে কারা প্রদেশের গভর্নর নিয়োগ করেন।

এ সময় ঠগী দস্যুদের তৎপরতায় দিল্লির জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। রাজকীয় বাহিনী একদল দস্যুকে গ্রেফতার করে দরবারে নিয়ে আসলে মহানুভব সুলতান তাদের শাস্তির পরিবর্তে হিতোপদেশ দিয়ে ছেড়ে দেন এবং বাংলায় বসবাসের নির্দেশ দেন। সুলতানের মহানুভবতা এবং বিদ্রোহী ও অপরাধীদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন খলজি আমির-উমরাহদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করে। সুলতানের দুর্বল শাসন নীতিতে ক্ষুব্ধ আমির-উমরাহগণ তাকে ক্ষমতাচ্যুত ও হত্যা করে আমির তাজউদ্দিন কুচি অথবা আহমদ চ্যাপকে সিংহাসনে বসানোর ষড়যন্ত্র শুরু করে। অবশ্য তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

শায়খ ফরিদউদ্দিন গঞ্জ বখশের শিষ্য পারস্য দেশীয় সিদি মাওলা দিল্লিতে একজন দরবেশ হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। সাধারণ মানুষ ও অভিজাতদের মধ্যে তার ব্যাপক জনপ্রিয়তা থাকায় তার মধ্যে রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ জন্মে। সিদি মাওলা বৃদ্ধ সুলতানকে ক্ষমতাচ্যুত করে নিজে ক্ষমতা দখলের জন্য খলজিবিরোধী তুর্কি অভিজাতদের সাথে গোপন ষড়যন্ত্র শুরু করেন। সিদি মাওলার এ ভূমিকায় সুলতান অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন এবং ষড়যন্ত্রের মূল হোতা সিদি মাওলাকে হাতির পায়ের নিচে পিষ্ট করে হত্যা করেন। সিদি মাওলার সহযোগী অভিজাতদেরকেও নানা রকম শাস্তি দেওয়া হয়।

সামরিক অভিযান: ঐতিহাসিক ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, "সুলতানের বৈদেশিক নীতি ছিল তার অভ্যন্তরীণ নীতির মতো দুর্বল ও ভীরু।"[১] ১২৯১ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে আরকলি খানের নেতৃত্বে খলজি বাহিনী চৌহান রাজপুতদের শক্ত ঘাঁটি রণথম্ভোর দুর্গ অভিযানে বের হয়। তবে তাদের এ অভিযান সফল হয়নি। অবশ্য খলজি বাহিনী পথিমধ্যে জঈন করতলগত করে। রণথম্ভোর জয় করতে না পারলেও সুলতানের জামাতা ও ভাইপো কারা ও অযোধ্যার শাসনকর্তা আলাউদ্দিন খলজির মালব ও দেবগিরি অভিযান সফল হয়। এ অভিযানে আলাউদ্দিন পরাজিত শক্তির কাছ থেকে প্রভূত ধনসম্পত্তি লাভ করেছিলেন।

---

[১] "The Sultan's foreign policy was a weak and timid as his domestic policy." – Ishwari Prasad, *A Short History of Muslim Rule in India, P-82*

মোঙ্গল অগ্রাভিযান প্রতিরোধ: বিখ্যাত মোঙ্গল নেতা হালাকু খানের পৌত্র আব্দুল্লাহ খানের নেতৃত্বে লক্ষাধিক সৈন্যের এক বিশাল মোঙ্গল বাহিনী সিন্ধু অতিক্রম করে সুনাম পর্যন্ত অগ্রসর হলে সুলতান ফিরোজ খলজি সাফল্যের সাথে তাদের প্রতিরোধ করেন। আব্দুল্লাহ খান জালালউদ্দিন খলজির সাথে সমঝোতা করে স্বদেশে ফিরে গেলে দিল্লি সালতানাত মোঙ্গল আক্রমণের বিভীষিকা থেকে রক্ষা পায়।

নওমুসলিমদের প্রতি সুলতানের নীতি: সমঝোতা চুক্তি অনুযায়ী আব্দুল্লাহ খান স্বদেশে ফিরে গেলেও মোঙ্গল নেতা উলুগ খান প্রায় চার হাজার অনুচরসহ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে দিল্লিতে থেকে যান। ইতিহাসে ধর্মান্তরিত এ মোঙ্গলরা 'নওমুসলিম' নামে পরিচিত। সুলতান উলুগ খানের সাথে তার এক কন্যার বিয়ে এবং অনুচরসহ তাকে দিল্লির উপকণ্ঠে বসবাসের অনুমতি দেন। তাদের অধ্যুষিত অঞ্চল পরে মোঙ্গলপুর নামে পরিচিতি লাভ করে।

জেনে রাখো

'মোঙ্গ' শব্দ থেকে মোঙ্গল শব্দের উদ্ভব হয়েছে। মহাবীর চেঙ্গিস খান (তেমুচিন) প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ ইতিহাসে 'মোঙ্গল' নামে পরিচিত। এরা মঙ্গোলিয়ার অধিবাসী। মোঙ্গলরা ছিল দুর্ধর্ষ ও নির্ভীক। চেঙ্গিস খান তাদের বিচ্ছিন্ন উপদলগুলো একত্র করে এশিয়ার একটি শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তিতে পরিণত করেন। তিনি উত্তরে সাইবেরিয়া থেকে দক্ষিণে জর্জিয়া এবং পূর্বে চীন থেকে পশ্চিমে রুশ দেশ পর্যন্ত বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। সুলতানি যুগ থেকেই এ মোঙ্গলরা ভারতে রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করতে থাকে এবং বিভিন্ন সময়ে ভারত আক্রমণ করে।

চরিত্র ও কৃতিত্ব (Character and Achievements)

মানুষ হিসেবে সুলতান জালালউদ্দিন ফিরোজ খলজি ছিলেন প্রকৃত অর্থেই ভদ্র ও বিনম্র। উদারতা, দয়াপ্রবণতা ও কোমলতা ছিল তার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তার ধর্মনিষ্ঠার বিষয়টিও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সুলতানের শাসন নৈপুণ্য ও সমরকুশলতার অভাব ছিল বলা যায় না। তবে শাসনকার্যে তার উদারতা প্রদর্শন রাজনৈতিক ভুল হিসেবে প্রমাণিত হয়। তার মধ্যে রাজোচিত মর্যাদাবোধ না থাকায় অভিজাতদের মধ্যে তার প্রতি সমীহর মনোভাব দেখা যায় না। ঐতিহাসিক ভি. ডি. মহাজন বলেন, "সুলতান হওয়ার আগে তিনি ছিলেন একজন সফল সেনাপতি। কিন্তু সুলতান হওয়ার পর তিনি আক্রমণাত্মক নীতি পরিহার করেন এবং সবার প্রতি শান্তিপূর্ণ ও সমঝোতামূলক নীতি গ্রহণ করেন, তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী।" রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অভাবে তিনি অনেক ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। অবশ্য এসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও একটি নতুন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে সুলতান জালালউদ্দিন ফিরোজ খলজি ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাকে প্রজাকল্যাণকামী উদার স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আদর্শ স্থাপনকারী সুলতান হিসেবে আখ্যায়িত করা অসঙ্গত হবে না। এ. বি. পান্ডে বলেন, "জালালউদ্দিন হচ্ছেন প্রথম সুলতান যিনি প্রজাকল্যাণভিত্তিক একটি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন।"

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কত খ্রিষ্টাব্দে তুর্কি মামলুক শাসনের অবসান ঘটে?
২. দিল্লি সালতানাতে খলজি বংশের সূচনা করেন কে? *[সকল বোর্ড ২০১৬]*
৩. দিল্লি সালতানাতে খলজিদের শাসনকাল কত ছিল?
৪. খলজিরা কাদের বংশোদ্ভূত?
৫. কোন শব্দ থেকে খলজি নামের উৎপত্তি হয়েছে?
৬. সিদি মাওলাকে হাতির পায়ের নিচে পিষ্ট করে হত্যা করেন কে?

উত্তরের জন্য ১৩২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

সুলতান জালালউদ্দিন ফিরোজ খলজি যে সব বিদ্রোহ দমন করেন তার একটি তালিকা প্রস্তুত করো।

পাঠ ১৫

আলাউদ্দিন খলজি: প্রাথমিক জীবন, সংকটসমূহ ও সংকট নিরসনে গৃহীত পদক্ষেপ (১২৯৬-১৩১৬ খ্রি.) [Alauddin Khalji: Early Life, Problems and Steps taken to face Problems (1296-1316)]

মধ্যযুগে ভারতের মুসলিম শাসনের ইতিহাসে আলাউদ্দিন খলজি অসামান্য প্রতিভাদীপ্ত একজন সফল সমরনায়ক ও শাসক। অসীম যোগ্যতাবলে তিনি শুধু নিজের উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করা নয়, বরং ভারতের মুসলিম শাসনকে একটি শক্তিশালী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। তিনি ১২৯৬-১৩১৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিস্তৃত এলাকা জুড়ে সাম্রাজ্য স্থাপনের পাশাপাশি শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সাধন করে তিনি নিজ কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তার দৃঢ়তায় মোঙ্গল আক্রমণ থেকে ভারতবর্ষ রেহাই পায়। এদিক বিচার করলে তাকে সুলতানি আমলের শ্রেষ্ঠ সুলতান বলা যেতে পারে।

সুলতান আলাউদ্দিন খলজি

প্রাথমিক জীবন: আলাউদ্দিন খলজি সম্ভবত ১২৬৬/১২৬৭ খ্রিষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতা সিহাবউদ্দিন মাসুদ খলজি ছিলেন সুলতান ফিরোজ খলজির ভাই। পিতার অকাল মৃত্যুর কারণে আলাউদ্দিন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভ করতে পারেননি। তবে চাচা জালালউদ্দিন ফিরোজের তত্ত্বাবধানে তিনি যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। জালালউদ্দিন তাকে অপার স্নেহে লালন-পালন করেন এবং নিজ কন্যার সাথে বিয়ে দেন। ১২৯০ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান জালালউদ্দিন খলজি আলাউদ্দিনকে 'আমির-ই-তুজুক' (রাজকীয় উৎসব অনুষ্ঠানাদি বিভাগের প্রধান) পদে নিয়োগ দেন। পরের বছর আলাউদ্দিন খলজি কারা প্রদেশের শাসনকর্তা পদে নিয়োগ লাভ করেন। আলাউদ্দিন খলজি ছিলেন অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী। বারানীর বর্ণনা মতে, কারা প্রদেশের শাসনকর্তা হওয়ার পরই আলাউদ্দিন খলজি দিল্লির সিংহাসন লাভের পরিকল্পনা করেন এবং বিভিন্ন অঞ্চলে অভিযান পরিচালনা করে অর্থ সংগ্রহ ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে থাকেন। ১২৯২ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান তাকে অযোধ্যার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। এ সময় ক্ষমতালিপ্সু অভিজাতরা আলাউদ্দিনকে সিংহাসন দখলের জন্য নানাভাবে প্ররোচনা দিতে থাকে। আলাউদ্দিন তাদের প্ররোচনায় প্রলুব্ধ হয়ে সুলতানের অজ্ঞাতে ১৮,০০০ অশ্বারোহী সৈন্যের এক বাহিনীসহ দাক্ষিণাত্যের সমৃদ্ধিশালী রাজ্য দেবগিরি আক্রমণ করেন। প্রথমে তিনি রাজা রামচন্দ্র দেব এবং তার পুত্র শঙ্কর দেবকে পরাজিত করে দেবগিরি থেকে প্রচুর ধনসম্পদ হস্তগত করেন। জানা যায়, দেবগিরি থেকে ৬০০ মণ সোনা, ১০০০ মন রূপা, ৭ মণ মুক্তা, ২ মণ মূল্যবান পাথর, ৪০টি হাতি, কয়েক হাজার ঘোড়া লুট করে দিল্লিতে ফিরে যান।

সিংহাসনে আরোহণ: আলাউদ্দিন খলজির নেতৃত্বে দেবগিরি বিজয়ের পর বৃদ্ধ সুলতান জালালউদ্দিন খলজি তার পরামর্শকদের নিষেধ উপেক্ষা করে ভ্রাতুষ্পুত্রকে অভিনন্দন জানানোর জন্য স্বয়ং কারায় উপস্থিত হন। আবেগতাড়িত সুলতান ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দিনকে আলিঙ্গন করতে অগ্রসর হলে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী মুহাম্মদ সেলিম এবং ইখতিয়ারউদ্দিন নামক দুই ঘাতক বৃদ্ধ সুলতানকে হত্যা করে। পিতৃব্য ও শ্বশুর সুলতান জালালউদ্দিন খলজি নিহত হওয়ার পর ১২৯৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ জুলাই আলাউদ্দিন খলজি নিজেকে দিল্লির সুলতান হিসেবে ঘোষণা করেন।

সুলতান আলাউদ্দিন খলজির প্রাথমিক সংকটসমূহ (Early Problems of Sultan Alauddin Khalji)

সিংহাসনে আরোহণ করে সুলতান আলাউদ্দিন খলজি অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ক্ষেত্রে চরম সংকট দেখতে পান। এসব সংকটের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল—

প্রথমত, পিতৃব্য সুলতান জালালউদ্দিন খলজিকে হত্যা করায় তার অনুসারী জালালি আমির ও জনসাধারণ আলাউদ্দিনকে বলপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী রূপে গণ্য করে তার বিরোধিতা শুরু করেন;

দ্বিতীয়ত, বিধবা রাজমাতা মালিকা জাহানের আলাউদ্দিনের ক্ষমতা দখলকে চ্যালেঞ্জ মনে করা এবং নিহত সুলতানের তৃতীয় পুত্র কদর খানকে রুকনুদ্দিন ইব্রাহিম উপাধি দিয়ে দিল্লির সুলতান হিসেবে ঘোষণা;

তৃতীয়ত, সিন্ধু ও মুলতানে নিহত সুলতানের দ্বিতীয় পুত্র আরকলি খানের প্রায় স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠা;
চতুর্থত, সুলতানের প্রতি গুজরাটের স্বাধীন রাজপুত রাজ্য এবং চিতোর ও রণথম্ভোর রাজাদের চ্যালেঞ্জ;
পঞ্চমত, বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার স্বাধীন রাজ্যসমূহের প্রতিপত্তি বজায় রাখা;
ষষ্ঠত, মধ্য ভারত, মালোয়া, উজ্জয়িনী ও বুন্দেলখণ্ড রাজ্যের দিল্লির নিয়ন্ত্রণমুক্ত অবস্থান। একই পরিস্থিতি ছিল অযোধ্যা, বারানসি ও গোরখপুরেও। আর বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণ অঞ্চল তখনও মুসলমানদের অধিকারে ছিল;
সপ্তমত, তদুপরি দিল্লি সালতানাতের সামনে ছিল বহিরাগত দুর্ধর্ষ মোঙ্গল আক্রমণের আশঙ্কা।

সংকট মোকাবিলায় সুলতানের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ (Steps taken by Sultan to face Problems)

সাম্রাজ্যের চরম সংকটে বিভ্রান্ত না হয়ে সুলতান আলাউদ্দিন খলজি বিচক্ষণতা, ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তার সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলায় নানামুখী পদক্ষেপের মাধ্যমে সালতানাত ও তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন।

অসন্তুষ্ট আমির ও জনতাকে সপক্ষে আনয়ন: সুলতান আলাউদ্দিন খলজি তার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন আমির-উমরাহদের উদার হাতে পুরস্কৃত করেন এবং উচ্চ রাজপদ দেওয়ার লোভ দেখিয়ে দলে টানেন। বিপুল অর্থ ও সোনা দিয়ে অসন্তুষ্ট জন সাধারণকে তুষ্ট করা হয়।

রাজধানীতে প্রবেশ ও উপাধি গ্রহণ: আলাউদ্দিন খলজি কর্মস্থল কারা থেকে রাজধানী দিল্লিতে প্রবেশ করতে চাইলে প্রতিদ্বন্দ্বী রুকনুদ্দিন ইব্রাহিম তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু তার বাহিনীর একটি বড় অংশ আলাউদ্দিনের পক্ষে যোগ দেওয়ায় তিনি পালিয়ে যান এবং রাজমাতাসহ ভাই আরকলি খানের কাছে আশ্রয় নেন। আলাউদ্দিন বিজয়ীর বেশে রাজধানীতে প্রবেশ করেন। দিল্লির আমির-উমরাহগণ সুলতানকে স্বাগত জানান। তিনি 'আবুল মুজাফ্‌ফর সুলতান আলা-উদ-দুনিয়া ওয়া-দ্বীন মুহাম্মদ শাহ খলজি' এ রাজকীয় উপাধি ধারণ করে মুদ্রা জারি ও খুৎবাপাঠের ব্যবস্থা করেন।

আরকলি খানকে দমন: সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আলাউদ্দিন খলজি তার বিশ্বস্ত সেনাপতি উলুগ খান ও জাফর খানের নেতৃত্বে মুলতানের বিদ্রোহী আরকলি খানের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। রাজকীয় বাহিনী মুলতান জয় করে আরকলি খান ও তার ভাই ইব্রাহিম খানকে বন্দি করে প্রথমে অন্ধ এবং পরে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

মোঙ্গল আক্রমণ মোকাবিলা: দুর্ধর্ষ মোঙ্গলরা বার বার পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে ভারত আক্রমণ করে আসছিল। আলাউদ্দিনের সময়ও তারা আক্রমণ অব্যাহত রাখে। দূরদর্শী সুলতান আলাউদ্দিন খলজি তার পূর্বসূরি সুলতান বলবনের মতো মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। মোঙ্গলদের আক্রমণ পথে স্থানে স্থানে দুর্গ নির্মাণ ও পুরোনো দুর্গ সংস্কার করে সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ১২৯৬ খ্রিষ্টাব্দে আমির দাউদের নেতৃত্বে মোঙ্গল বাহিনী ভারতের পাঞ্জাব, সিন্ধু ও মুলতান অধিকার করে। সুলতানের নির্দেশে সেনাপতি জাফর খান মোঙ্গলদের পরাজিত ও বিতাড়িত করেন। পরের বছর সালাদির নেতৃত্বে মোঙ্গলরা পুনরায় ভারত আক্রমণ করলে সেনাপতি জাফর খানের নেতৃত্বে তাদেরও পরাজিত করা হয়। পরপর দুটি অভিযানে ব্যর্থতার পর ১২৯৮-৯৯ খ্রিষ্টাব্দে কুতলুখ খানের নেতৃত্বে দু'লক্ষ সৈন্যের এক বিশাল মোঙ্গল বাহিনী পুনরায় ভারত আক্রমণ করে দিল্লি অভিমুখে অগ্রসর হয়। আলাউদ্দিনের রাজত্বকালে এটি ছিল সবচেয়ে বিপজ্জনক মোঙ্গল আক্রমণ। সুলতান আলাউদ্দিন খলজি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে সেনাপতি জাফর খান ও উলুগ খানের সহায়তায় মোঙ্গলদের মোকাবিলা করেন। প্রচণ্ড যুদ্ধে সে সময়ের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা সেনাপতি জাফর খান নিহত হলেও রাজকীয় বাহিনী মোঙ্গলদের পরাজিত করতে সক্ষম হয়।

১৩০৩ খ্রিষ্টাব্দে তারঘীর নেতৃত্বে এবং ১৩০৪ সালে আলী বেগ ও খাজা তাশের নেতৃত্বে মোঙ্গলরা পুনরায় ভারত আক্রমণ করে। অভিযানে সেনাপতি মালিক কাফুর এবং দিপালপুরের গভর্নর গাজি মালিক সাফল্যের সাথে মোঙ্গলদের মোকাবিলা করেন। ১৩০৬ খ্রিষ্টাব্দে মোঙ্গলরা পুনরায় ভারত আক্রমণ করে। কিন্তু আবারও তারা গাজি মালিকের নেতৃত্বাধীন সুলতানি বাহিনীর হাতে পরাজিত হয়। সুলতান আলাউদ্দিন খলজির সময় সর্বশেষ মোঙ্গল আক্রমণ পরিচালিত হয় ১৩০৭ খ্রিষ্টাব্দে। ইকবালমান্দ খানের নেতৃত্বে মোঙ্গল বাহিনী সিন্ধু আক্রমণ করলে সেনাপতি গাজি মালিক তাদের প্রতিহত করেন। যুদ্ধে মোঙ্গলদের প্রধান সেনাপতি ইকবালমান্দসহ অনেক সেনাপতি ও সৈন্য নিহত হয়। এভাবে বারবার পরাজয়ের ফলে মোঙ্গলরা আলাউদ্দিন খলজির রাজত্বকালে আর ভারত আক্রমণে সাহস করেনি।

মোঙ্গাল আক্রমণের ফলাফল: মোঙ্গাল আক্রমণ মোকাবিলায় সাফল্যের ফলে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। আলাউদ্দিন খলজির গৌরব, মর্যাদা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। জনগণ তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং তাদের মনে সুলতানের প্রতি সম্মানবোধ জেগে ওঠে। মোঙ্গাল আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য তিনি ৪,৭৫,০০০ সৈন্যের যে শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করেন পরবর্তীতে সে শক্তির ওপর ভিত্তি করেই তিনি বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন।

নওমুসলিমদের দমন: সুলতান জালালউদ্দিন খলজির মাধ্যমে পুনর্বাসিত নওমুসলিমরা আলাউদ্দিনের সময় দিল্লিতে নানা অনাচার শুরু করে। উচ্চ রাজপদে নিয়োগ বা বিশেষ কোনো রাজকীয় সুযোগ-সুবিধা না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ নওমুসলিমরা সুলতান আলাউদ্দিন খলজিকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে সুলতান ত্রিশ হাজার নওমুসলিমকে নির্দয়ভাবে হত্যা করেন বলে ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায়।

নতুন ধর্মমত প্রবর্তনের পরিকল্পনা: বিরুদ্ধবাদীদের দমন ও মোঙ্গাল আক্রমণ প্রতিহতকরণে আশাতীত সাফল্য সুলতান আলাউদ্দিন খলজিকে অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী করে তোলে। ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানীর মতে, তার সাফল্য ও উন্নতি তাকে উন্মাদগ্রস্ত করে তোলে। তিনি তার বিপুল ধনসম্পদ ও বিশাল সেনাবাহিনীর সাহায্যে আলেকজান্ডারের মতো দিগ্বিজয়ের পরিকল্পনা করেন। আলাউদ্দিনের খ্যাতি ও সাফল্যের পেছনে সেনাপতি জাফর খান, উলুগ খান, আলপ খান এবং নসরত খানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তাই সুলতান ভাবেন যে, মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ধর্মমত প্রচারে তার চারজন সহযোগীর বিশেষ অবদান ছিল। কাজেই তিনিও তার চারজন সহযোগীর সহায়তায় একটি নতুন ধর্মমত প্রচারের পরিকল্পনা করেন। সুলতান তার এ মহাপরিকল্পনা সম্পর্কে দিল্লির কতোয়াল ও তার বিশ্বস্ত অনুচর আলা উল মুলকের পরামর্শ জানতে চান। আলা উল মুলক সুলতানকে বলেন, ধর্ম আল্লাহ প্রদত্ত। প্রেরিত নবি ও ঐশী গ্রন্থ ছাড়া কোনো ব্যক্তির পরিকল্পিত ধর্ম মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। কাজেই এ বিষয়ে সুলতানের চিন্তা না করাই ভালো। আর দিগ্বিজয় সম্পর্কে এ বিচক্ষণ কতোয়াল আলা উল মুলক সুলতানকে বলেন, সম্পূর্ণ ভারতবর্ষের ওপরই যখন সুলতানের কর্তৃত্ব সুদৃঢ় হয়নি, আর এরিস্টটলের মতো যখন তার কোনো বিচক্ষণ মন্ত্রী নেই, কাজেই দিগ্বিজয়ের দুরাশাও সুলতানের ত্যাগ করা উচিত।

জেনে রাখো

গ্রিক দার্শনিক ও রাষ্ট্র চিন্তাবিদ এরিস্টটলকে দর্শন, প্রাণিবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক বলা হয়। তিনি তার বিখ্যাত গ্রন্থ The Politics-এ আদর্শ রাষ্ট্রের রূপরেখা প্রণয়ন এবং এ রাষ্ট্রের নাগরিকদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। তিনি সক্রেটিস ও প্লেটোর দর্শনশাস্ত্রের সাথে আগের সব দর্শনের সমন্বয় সাধন করে একে একটি পাশ্চাত্য ন্যায়শাস্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন।

আলা উল মুলকের এ বক্তব্য শুনে সুলতান নতুন ধর্মমত প্রবর্তন ও দিগ্বিজয়ের মহাপরিকল্পনা পরিত্যাগ করেন। তবে সাম্রাজ্যবাদী এ সুলতান তার মুদ্রায় 'সিকান্দর-ই-সানি' বা দ্বিতীয় আলেকজান্ডার পদবি নিয়ে তার উচ্চাভিলাষের বহিঃপ্রকাশ ঘটান।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আলাউদ্দিন খলজি কত খ্রিষ্টাব্দে নিজেকে দিল্লির সুলতান হিসেবে ঘোষণা করেন?
২. আলাউদ্দিন খলজি কত খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লি শাসন করেন?
৩. সুলতান জালালউদ্দিন খলজিকে হত্যার পরিকল্পনা করেন কে?
৪. কাদের নেতৃত্বে মুলতানের বিদ্রোহী আরকলি খানকে দমন করা হয়?
৫. সুলতান আলাউদ্দিন খলজির সময় সর্বশেষ কত খ্রিষ্টাব্দে মোঙ্গাল আক্রমণ পরিচালিত হয়?
৬. ত্রিশ হাজার নওমুসলিমকে নির্দয়ভাবে হত্যা করেন কে?

উত্তরের জন্য ১৩২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

মোঙ্গাল আক্রমণ মোকাবিলায় সুলতান আলাউদ্দিন খলজির সাফল্যের কারণগুলোর একটি তালিকা তৈরি করো।

পাঠ ১৬

সুলতান আলাউদ্দিন খলজির সাম্রাজ্য বিস্তার: উত্তর ভারত বিজয়
Expansion of the Empire by Sultan Alauddin Khalji: The Conquest of North India

আলেকজান্ডারের মতো দিগ্বিজয়ী বিজেতা না হতে পারলেও সুলতান আলাউদ্দিন খলজি সাম্রাজ্য বিস্তারে সফল হয়েছিলেন। মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ ও সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্য তিনি এক বিশাল ও দক্ষ সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন। প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করে সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমান্ত সুরক্ষার পর সুলতান সাম্রাজ্য বিস্তারে উদ্যোগী হন এবং সমগ্র উত্তর ভারত পদানত করে বিন্ধ্য পর্বত অতিক্রম করে দাক্ষিণাত্য জয়ের চেষ্টা করেন।

উত্তর ভারতের রাজপুত রাজ্য বিজয় (The Conquence of the North Indian Rajput States)

গুজরাট অভিযান: গুজরাট মধ্যযুগের ভারতের সবচেয়ে উর্বর ও সমৃদ্ধ অঞ্চল। এ ধন-ঐশ্বর্যে প্রলুব্ধ হয়ে আলাউদ্দিনের পূর্বসূরি অনেকেই গুজরাট আক্রমণ করেছিলেন। তিনিও একই কারণে গুজরাট আক্রমণ করেন। ১২৯৭ খ্রিষ্টাব্দে সেনাপতি উলুগ খান ও নসরত খানের নেতৃত্বে সুলতানি বাহিনী গুজরাট আক্রমণ ও জয় করে। রাজধানী আনহিলওয়ার খলজিদের পদানত হয়। রাজা দ্বিতীয় কর্ণদেব এবং কন্যা দেবলা দেবীসহ দেবগিরি পলায়ন করে। খলজি বাহিনী ক্যাম্বেসহ সমগ্র গুজরাট অধিকার করে। সুলতানের বাহিনীর কাছে বন্দি রানি কমলাদেবীকে সুলতান বিয়ে করেন। গুজরাটের খোজা সেনাপতি কাফুর পরবর্তীকালে আলাউদ্দিন খলজির প্রধান সেনাপতি ও অমাত্যে পরিণত হন এবং মালিক কাফুর নামে খ্যাতিলাভ করেন।

রণথম্ভোর বিজয়: দিল্লির সন্নিকটবর্তী রণথম্ভোরে দুর্ধর্ষ ও দুর্জেয় রাজপুত শক্তির উপস্থিতি দিল্লির নিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক ছিল। তাই সুলতান জালালউদ্দিন ফিরোজ খলজির পথ অনুসরণ করে সুলতান আলাউদ্দিন খলজিও রণথম্ভোর জয়ের উদ্যোগ নেন। এ সময় রাজা হামির দেব বিদ্রোহী মুহাম্মদ শাহ ও খেবরুসহ নওমুসলিমদের তার রাজ্যে আশ্রয় দিলে আলাউদ্দিন খলজির জন্য রণথম্ভোর বিজয়ের প্রত্যক্ষ অজুহাত সৃষ্টি হয়। ১২৯৯ খ্রিষ্টাব্দে সেনাপতি উলুগ খান ও নসরত খানের নেতৃত্বে হামির দেবের বিরুদ্ধে প্রেরিত অভিযান ব্যর্থ হলে সুলতান স্বয়ং রণথম্ভোরে উপস্থিত হন। এক বছর অবরুদ্ধ থাকার পর রাজা হামির দেব পরাজয় বরণ করেন। পরাজিত হামির দেবকে হত্যা করে ১৩০১ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান রণথম্ভোর অধিকার করেন এবং উলুগ খানের ওপর রণথম্ভোরের শাসনভার অর্পণ করে দিল্লিতে ফিরে আসেন।

চিতোর অভিযান: মেবার ছিল রাজপুতনার বিখ্যাত রাজ্য। সম্মান ও ঐশ্বর্যের দিক থেকে এ রাজ্যের দুর্ভেদ্য দুর্গ চিতোরের বিশেষ খ্যাতি ছিল। আলাউদ্দিন খলজি ১৩০৩ খ্রিষ্টাব্দে চিতোর আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। কারণ মেবারের রাজপুত শক্তি ছিল মুসলিমবিদ্বেষী। রানা রতন সিংহ আলাউদ্দিনের গুজরাট অভিযানের সময় তার রাজ্যের মধ্য দিয়ে সৈন্য ও রসদ পরিবহনে অনুমতি না দেওয়ায় সুলতান তার প্রতি রুষ্ট ছিলেন। তদুপরি এ আক্রমণের পেছনে একটি উপাখ্যান প্রচলিত আছে। উপাখ্যান মতে, রানা রতন সিংহের অনিন্দ্য সুন্দর স্ত্রী ছিলেন পদ্মিনী। রানি পদ্মিনীর রূপ ও গুণের কথা শুনে তাকে হাসিলের উদ্দেশ্যে আলাউদ্দিন খলজি চিতোর আক্রমণ করেন। আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে কে কে দত্ত, কে এস লাল, ডিএইচ. ওঝা প্রমুখ পদ্মিনী কাহিনীর ঐতিহাসিক সত্যতা নেই বলে উল্লেখ করেছেন। আধুনিক গবেষকদের মতে আলাউদ্দিনের চিতোর জয়ের পেছনে পদ্মিনীর কাহিনী নিছক উপাখ্যান। বস্তুত রাজনৈতিক কারণেই আলাউদ্দিন খলজি চিতোর অভিযান পরিচালনা করেন। এর সাথে পদ্মিনী কাহিনীকে যুক্ত করা অনৈতিহাসিক।

১৩০৩ খ্রিষ্টাব্দে আলাউদ্দিন খলজি চিতোর আক্রমণ করেন। রানা রতন সিংহ বীর বিক্রমে আক্রমণকারী বাহিনীকে বাধা দিলেও দীর্ঘ সাত মাস পর শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণে বাধ্য হন। রতন সিংহকে বন্দি করা হয়। সম্মান রক্ষার্থে রাজপুত নারীদের অনেকেই অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে আত্মবিসর্জন দেন। আলাউদ্দিন খলজি পুত্র খিজির খানকে চিতোরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন এবং তার নামানুসারে চিতোরের নামকরণ করা হয় খিজিরাবাদ। ১৩১১ খ্রিষ্টাব্দে রাজপুতদের ক্রমাগত আক্রমণের মুখে খিজির খান চিতোর ত্যাগে বাধ্য হলে সুলতান মালদেব নামক একজন রাজপুত সামন্তের হাতে চিতোরের শাসনভার অর্পণ করেন।

মালব অভিযান: সুলতান আলাউদ্দিন খলজি ১৩০৫ খ্রিষ্টাব্দে রাজপুত রাজ্য মালব আক্রমণ করেন। রাজা রায় মাহলাক দেব পরাজিত হলে মালব সুলতানের অধিকারে আসে। উজ্জয়িনী, চান্দেরি, মান্দু এবং ধর প্রভৃতি অঞ্চলেও সুলতানের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। সুলতান আলাউদ্দিন খলজি মালব বিজয়ী সেনাপতি আইনুল মুলককে সেখানকার গভর্নর নিযুক্ত করেন।

মারোয়ার অভিযান: রাজস্থানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য ছিল মারোয়ার। সুলতান আলাউদ্দিন খলজি ১৩০৮ খ্রিষ্টাব্দে স্বয়ং মারোয়ার আক্রমণ করেন। সুলতান রাজা সাতল দেবকে পরাজিত ও হত্যা করে মারোয়ার নিজ অধিকারে আনেন। সুলতান সেনাপতি কামালুদ্দিনের ওপর মালবের শাসনভার ন্যস্ত করে দিল্লিতে ফিরে যান।

জালোর জয়: জালোর ছিল মারোয়ারের প্রতিবেশী রাজ্য। ১৩১১ খ্রিষ্টাব্দে আলাউদ্দিন খলজি জালোরের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। দীর্ঘ যুদ্ধের পর রাজা কানহোর দেব পরাজিত হলে জালোর মুসলিম সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। জালোর জয়ের পর বুন্দি, মান্দোর ও টঙ্কসহ ছোটখাটো রাজপুত রাজ্য সুলতান আলাউদ্দিনের বশ্যতা স্বীকার করে। ফলে রাজপুতনাসহ সমগ্র উত্তর ভারত আলাউদ্দিনের অধিকারে আসে।

রাজপুতদের পরাজয়ের কারণ (The Causes of failure of Rajput)

সন্দেহ নেই রাজপুতরা ব্যক্তিগতভাবে দেশপ্রেমিক, নির্ভীক এবং রণপটু যোদ্ধা ছিল। তথাপি তারা সুলতান আলাউদ্দিন খলজির অভিযানের মুখে টিকে থাকতে পারেনি। ১৩১১ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে তাদের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া হয়। রাজপুতদের এ পরাজয়ের নানা কারণ ছিল। যথা—

প্রথমত, রাজপুতদের মধ্যে কোনো ঐক্য ও সংহতি ছিল না। ফলে তারা কোনো সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি।

দ্বিতীয়ত, রাজপুতদের দুর্গ নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা, যুদ্ধাস্ত্র ও রণকৌশল ছিল চিরাচরিত ও সেকেলে। তাই উন্নত যুদ্ধকৌশল ও যুদ্ধাস্ত্রের অধিকারী খলজিদের হাতে তাদের পরাজয় ছিল অবধারিত।

তৃতীয়ত, সামন্ততান্ত্রিক রাজপুত রাজারা সেনাবাহিনী ও রসদ সরবরাহে অধীন সামন্তদের মুখাপেক্ষী ছিলেন। ফলে অনেক সময় সংকটকালে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা না পাওয়ায় তাদের পরাজয়বরণ করতে হয়।

চতুর্থত, রাজপুতরা ছিল সীমিত ধনসম্পদের অধিকারী। কাজেই অগাধ ধনৈশ্বর্য ও বাহুবলের অধিকারী খলজিদের মোকাবিলায় তারা ব্যর্থ হয়।

বস্তুত বহুধাবিভক্ত, সেকেলে যুদ্ধকৌশল ও সীমিত সম্পদ ও যুদ্ধ উপকরণের অধিকারী রাজপুতদের শক্তিশালী খলজিদের বিরুদ্ধে পরাজয় ছিল স্বাভাবিক ও অনিবার্য। অবশ্য রাজপুতনায় সুলতানের বিজয় দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। রাজপুতদের ওপর কর্তৃত্ব দীর্ঘস্থায়ী করার ব্যাপারে সুলতান নিজেও খুব বেশি যত্নশীল ছিলেন বলে মনে হয় না। মূলত তিনি রাজপুতদের ব্যাপারে একটি মধ্যবর্তী ও সহনশীল নীতি গ্রহণ করেছিলেন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কোন সুলতান উত্তর ভারতের রাজপুতদের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছিলেন?
২. মধ্যযুগের ভারতের সবচেয়ে উর্বর ও সমৃদ্ধ অঞ্চল কোনটি?
৩. আলাউদ্দিন খলজি কাদের নেতৃত্বে গুজরাট জয় করেন?
৪. আলাউদ্দিন খলজি কার ওপর রণথম্ভোরের শাসনভার অর্পণ করেন?
৫. কত খ্রিষ্টাব্দে আলাউদ্দিন খলজি চিতোর আক্রমণ করেন?
৬. সুলতান আলাউদ্দিন খলজি ১৩০৮ খ্রিষ্টাব্দে কোন অঞ্চল আক্রমণ করেন?

উত্তরের জন্য ১৩২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

সুলতান আলাউদ্দিন খলজি উত্তর ভারতের যেসব রাজ্য জয় করেছিলেন অভিযানের সময়সহ তার একটি তালিকা তৈরি করো।

পাঠ ১৭

সুলতান আলাউদ্দিন খলজির দক্ষিণ ভারত অভিযান
South Indian Expeditions of Sultan Alauddin Khalji

উত্তর ভারত জয় করার পর সুলতান আলাউদ্দিন খলজি দক্ষিণ ভারত জয়ে মনোনিবেশ করেন। সুলতান আলাউদ্দিন খলজিই প্রথম মুসলিম যিনি দক্ষিণ ভারত জয়ের পরিকল্পনা করেন এবং মাদুরা পর্যন্ত বিজয়াভিযান প্রেরণে সক্ষম হন। নতুন অঞ্চল জয় করে নিজ সাম্রাজ্যের সীমা সম্প্রসারণের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে ছিল। তবে দাক্ষিণাত্যের প্রভূত সমৃদ্ধি ও ধনৈশ্বর্যও যে তাকে দাক্ষিণাত্য বিজয়ে প্রলুব্ধ করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। তাছাড়া দক্ষিণ ভারতের রাজনৈতিক অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে তিনি নিজের সাফল্যের উজ্জ্বল সম্ভাবনাও দেখতে পেয়েছিলেন। এ সময় দাক্ষিণাত্যের চারটি প্রধান রাজ্য ছিল— (১) দেবগিরির যাদবরাজ্য (২) তেলেঙ্গানার কাকতীয় রাজ্য (৩) হোয়াসল রাজ্য এবং (৪) সুদূর দক্ষিণের পাণ্ডরাজ্য। আলাউদ্দিন খলজি মালিক কাফুরকে দক্ষিণ ভারত অভিযানের প্রধান সমরনায়ক নিয়োগ করেন।

দেবগিরি অভিযান: দেবগিরির যাদব বংশীয় রাজা ছিলেন রামচন্দ্র দেব। তিনি সুলতানকে প্রতিশ্রুতি মোতাবেক ইলিচপুর প্রদেশের বার্ষিক কর প্রদান বন্ধ করে এবং গুজরাটের পরাজিত রাজা কর্ণদেবকে তার কন্যা দেবলা দেবীসহ আশ্রয় দিয়ে সুলতানের বিরাগভাজন হন। ১৩০৬ খ্রিষ্টাব্দে সুলতানের নির্দেশে মালিক কাফুরের নেতৃত্বে দেবগিরি আক্রমণ করা হয়। সহযোগী সেনাপতি খাজা হাজির সহায়তায় মালিক কাফুর প্রায় বিনা বাধায় দেবগিরি জয় করে প্রচুর ধনরত্ন হস্তগত করেন। রাজা রামচন্দ্র দেব সুলতানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ এবং ১ লাখ টাকার বিনিময়ে তার রাজ্য রক্ষা করেন। রামচন্দ্র দেবকে 'রায় রায়ান' (king of the kings) উপাধি প্রদান করা হয়। দেবগিরিতে আশ্রিত গুজরাটের রাজকুমারী কন্যা দেবলা দেবীকে দিল্লিতে এনে সুলতান পুত্র খিজির খানের সাথে তার বিয়ে দেন।

তেলেঙ্গানা রাজ্যের বশ্যতা স্বীকার: ১৩০৯ খ্রিষ্টাব্দে সেনাপতি মালিক কাফুর তেলেঙ্গানার কাকতীয় রাজা প্রতাপ রুদ্রের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে তেলেঙ্গানার রাজধানী বরঙ্গাল (অরঙ্গাল) অবরোধ করা হয়। দুর্ভেদ্য বরঙ্গাল দুর্গে দীর্ঘসময় অবরুদ্ধ থাকার পর রাজা দ্বিতীয় প্রতাপরুদ্র দেব আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। পরাজিত রাজা সুলতানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ এবং বার্ষিক কর প্রদানে সম্মতিসহ বিপুল পরিমাণ ধনরত্ন প্রদানের বিনিময়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে রাজ্য রক্ষা করেন। মালিক কাফুর প্রায় ১০০০ উটের এক বিশাল বহরে করে প্রাপ্ত মালামালসহ দিল্লি ফিরে যান।

দ্বারসমুদ্র বিজয়: দক্ষিণ ভারতের উত্তরোত্তর সাফল্য ও বিপুল ধনৈশ্বর্য লাভের ফলে উদ্দীপ্ত সুলতান আলাউদ্দিন খলজি সম্পূর্ণ দাক্ষিণাত্য জয়ে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। ১৩১০ খ্রিষ্টাব্দে সুলতানের নির্দেশে সেনাপতি মালিক কাফুর হোয়সল রাজ বীর বল্লালের রাজধানী দ্বারসমুদ্র আক্রমণ করেন। এ অভিযানে সুলতানের মিত্র দেবগিরির রাজা রামচন্দ্র এবং বরঙ্গালের রাজা দ্বিতীয় প্রতাপরুদ্র দেব কাফুরকে সহায়তা করেন। হোয়সল রাজা বীর বল্লাল সুযোগ্য ও জনপ্রিয় শাসক হলেও সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে জয়লাভের কোনো সম্ভাবনা না থাকায় আত্মসমর্পণ ও সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করেন। ফলে হোয়সল রাজ্য দিল্লি সালতানাতের করদ রাজ্যে পরিণত হয়।

পাণ্ডরাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান: সুলতান আলাউদ্দিন খলজির নির্দেশে ১৩১১ খ্রিষ্টাব্দে সেনাপতি কাফুর ভারতের সর্ব দক্ষিণের পাণ্ডরাজ্য আক্রমণ করেন। ভ্রাতৃবিরোধে ক্ষত-বিক্ষত পাণ্ডরাজ্যের রাজা বীর মালিক কাফুরকে প্রতিহত করতে ব্যর্থ হন। রাজা বীর রাজধানী মাদুরা ছেড়ে পালিয়ে গেলে মালিক কাফুর রাজধানী দখল করে প্রচুর ধনসম্পদ হস্তগত করেন। বিজয়ী সেনাপতি ১৩১১ খ্রিষ্টাব্দের শেষ দিকে দিল্লি ফিরে গেলে স্বয়ং সুলতান তাকে অভ্যর্থনা জানান।

রাজা শংকর দেবের বিরুদ্ধে অভিযান: সুলতানের অনুগত দেবগিরির রাজা রামচন্দ্র দেবের মৃত্যুর পর তার পুত্র শংকর দেব পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করেই সুলতানের প্রতি আনুগত্য প্রত্যাহার এবং দিল্লির সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে সুলতান ১৩১৩ খ্রিষ্টাব্দে মালিক কাফুরকে দেবগিরি আক্রমণের নির্দেশ দেন। সেনাপতি কাফুর দেবগিরি আক্রমণ করে শংকরদেবকে পরাজিত ও হত্যা করেন। ফলে দেবগিরি পুনরায় দিল্লির কর্তৃত্বে আসে।

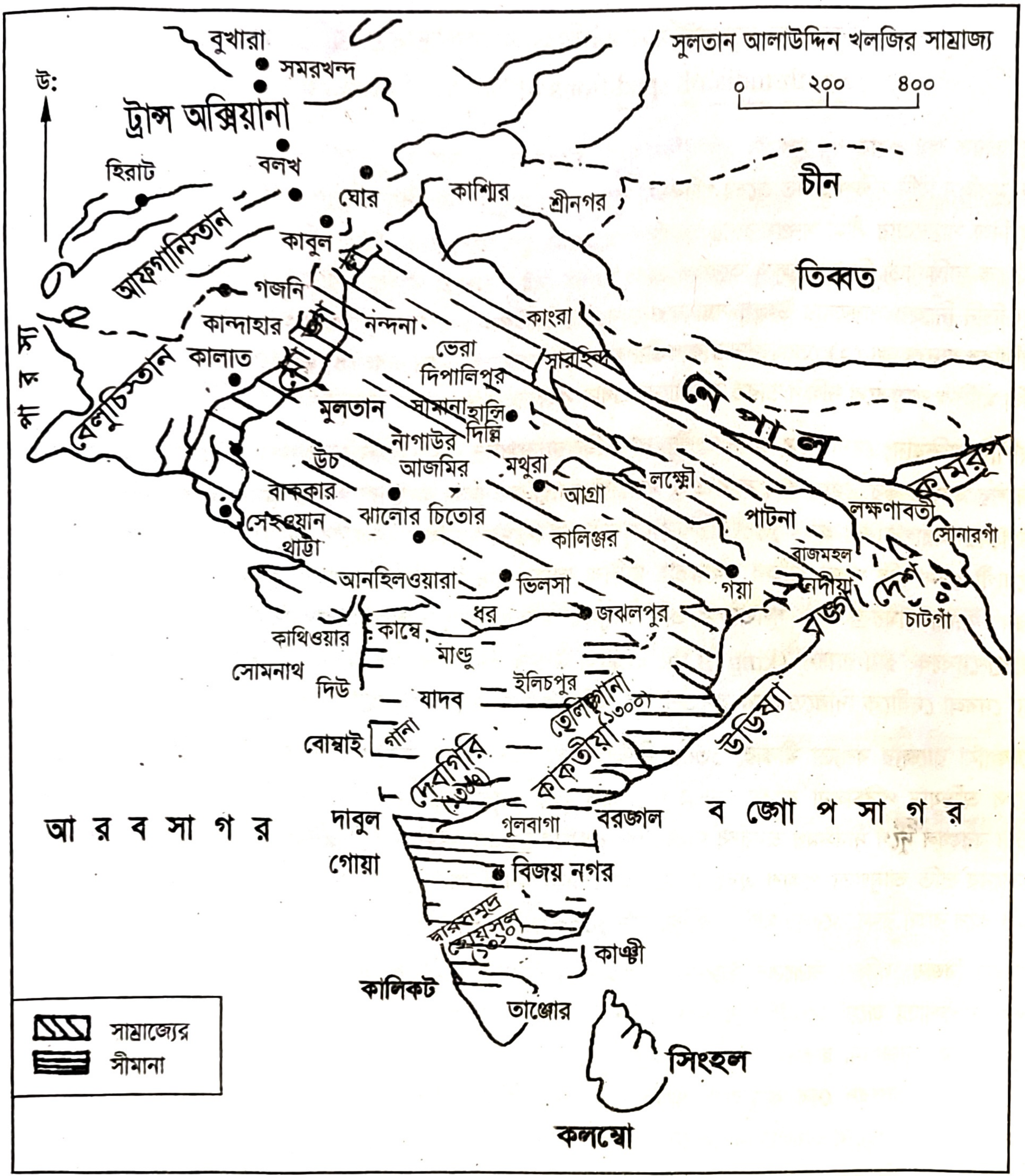
সুলতান আলাউদ্দিন খলজির সাম্রাজ্য
০ ২০০ ৪০০
উ:
বুখারা
সমরখন্দ
ট্রান্স অক্সিয়ানা
হিরাট
বলখ
ঘোর
কাশ্মির
শ্রীনগর
চীন
আফগানিস্তান
কাবুল
তিব্বত
গজনি
কান্দাহার
নন্দনা
কাংরা
বেলুচিস্তান
কালাত
ভেরা
দিপালিপুর
সারহিন্দ
নেপাল
মুলতান
সামানা
হান্সি
দিল্লি
নাগাউর
উচ
আজমির
মথুরা
আগ্রা
লক্ষ্ণৌ
কামরূপ
বাককার
সেহওয়ান
ঝালোর
চিতোর
কালিঞ্জর
পাটনা
লক্ষণাবতী
সোনারগাঁ
থাট্টা
রাজমহল
আনহিলওয়ারা
ভিলসা
গয়া
নদীয়া
বঙ্গদেশ
চাটগাঁ
কাথিওয়ার
কাম্বে
ধর
জব্বলপুর
মাণ্ডু
সোমনাথ
দিউ
যাদব
ইলিচপুর
তেলিঙ্গানা (১৩০৩)
উড়িষ্যা
বোম্বাই
থানা
দেবগিরি
কাকতীয়
আ র ব সা গ র
দাবুল
গুলবাগা
বরজাল
ব ঙ্গো প সা গ র
গোয়া
বিজয় নগর
দ্বারসমুদ্র
হোয়সল
কাঞ্চী
কালিকট
তাঞ্জোর
সিংহল
কলম্বো
▨ সাম্রাজ্যের
▤ সীমানা

সুলতান আলাউদ্দিন খলজির সাম্রাজ্য

ইতিহাসে মালিক কাফুরের অবস্থান (The Position of Malik Kafur in History)

১২৯৯ খ্রিষ্টাব্দে আলাউদ্দিনের বাহিনী যখন গুজরাট অভিযান করে, তখন সেনাপতি নুসরাত খান মালিক কাফুরকে বন্দি অবস্থায় দাস বাজার থেকে কিনে আনেন এবং সুলতানকে উপহার দেন। তার মূল্য ছিল এক হাজার দিনার। তাই তাকে 'হাজার দিনারি' বলা হয়। মালিক কাফুর ছিলেন খোজা। তাকে প্রথমে হারেমরক্ষী হিসেবে নিয়োগ করা হয় বলে জানা যায়। কিন্তু ভারতীয় ক্রীতদাস প্রথায় দাসরাও স্বীয় প্রতিভায় উঠে আসতে পারতেন ক্ষমতার শীর্ষে। সেই প্রতিভা মালিক কাফুরের ছিল। মোঙ্গল আক্রমণের সময় রণক্ষেত্রে তিনি অসামান্য বীরত্বের পরিচয় দেন। সুলতান আলাউদ্দিন খলজির দাক্ষিণাত্য বিজয়ের ডান হাত ছিলেন মালিক কাফুর। বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণে ইসলামের পতাকা তিনিই বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন বলে জানান ইতিহাসবিদরা। যাদব, কাকতীয়, হোয়সল, পাণ্ড্য বংশীয় রাজাদের তিনি দিল্লি সালতানাতের অধীনে আনেন। সেই সাথে নিজে অধিকার করেন বিপুল পরিমাণ ধনরত্ন।

আলাউদ্দিনের আস্থাভাজন হয়ে উঠতে দেরি হয়নি মালিক কাফুরের। ক্রমেই সুলতানির বিভিন্ন কাজে তিনি অপরিহার্য হয়ে উঠতে শুরু করেন। একসময়ে তিনিই হয়ে দাঁড়ান আলাউদ্দিনের প্রধান পরামর্শদাতা। ১৩১৩ থেকে ১৩১৫ খ্রি. পর্যন্ত তিনি দেবগিরির শাসনকর্তাও ছিলেন। আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পরে তিনি স্বয়ং মসনদ দখলের চেষ্টা করেন। আলাউদ্দিনের নাবালক পুত্র শিহাবউদ্দিন ওমরকে হাতের পুতুল বানিয়ে মাসখানেক শাসনও করেন দিল্লির দরবার। কিন্তু আলাউদ্দিনের ব্যক্তিগত রক্ষীরা তার এই উত্থানকে বিষনজরে দেখেছিলেন। তারা সুযোগ বুঝে মালিক কাফুরকে হত্যা করেন। ক্ষমতায় আসেন আলাউদ্দিনের জ্যেষ্ঠ পুত্র মুবারক শাহ।

সাহিত্যিক শরবিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তার 'শঙ্খ কঙ্কন' নামের ঐতিহাসিক আখ্যানে আলাউদ্দিনকে প্রায় নরপশু হিসেবে চিহ্নিত করেন। আর সেখানে মালিককে তিনি দেখান প্রভুর যাবতীয় কুকর্মের সহচর হিসেবে। কিন্তু ইতিহাসবিদদের অনেকেই স্বীকার করেছেন মালিক না থাকলে দাক্ষিণাত্য দিল্লির পতাকাতলে আসত না।

সুলতান আলাউদ্দিনের দাক্ষিণাত্য নীতির প্রকৃতি মূল্যায়ন

Evaluation of the Nature of Sultan Alauddin's Deccan Policy

সুলতান আলাউদ্দিন খলজি সমগ্র দাক্ষিণাত্য জয়ে সমর্থ হন। দক্ষিণ ভারতের ঐতিহ্যবাহী রাজবংশগুলো তার পদানত হয় এবং দিল্লির বশ্যতা স্বীকার করে। তবে লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, সুলতান আলাউদ্দিন খলজি উত্তর ভারতে বিজিত রাজ্যসমূহ দিল্লি সালতানাতের সরাসরি অন্তর্ভুক্ত করলেও দাক্ষিণাত্যে ভিন্ন নীতি গ্রহণ করেন। সমগ্র ভারতের অধীশ্বর হওয়ার বাসনা এবং বিপুল ধনরত্ন হস্তগত করার আকাঙ্ক্ষায় তিনি দাক্ষিণাত্য বিজয় করেন। তবে তিনি এ বাস্তবতা উপলব্ধি করেন যে, দাক্ষিণাত্যের দূর প্রদেশে দিল্লি হতে সক্রিয় শাসন পরিচালনা রীতিমতো দুরূহ ব্যাপার। তাই তিনি বিজিত রাজ্যসমূহকে করদ রাজ্যে পরিণত করে নিজের অন্তর্গত উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করেছিলেন। সে দিনের বাস্তবতায় এ নীতি আলাউদ্দিন খলজির রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার পরিচয় বহন করে।

দাক্ষিণাত্য বিজয়ের তাৎপর্য: আলাউদ্দিন খলজির দাক্ষিণাত্য বিজয়ের ফলে সুদূর দক্ষিণে মাদুরা পর্যন্ত দিল্লির নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রথম ভিত তৈরি হয়। এ বিজয় সুলতানের মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি করে। দিল্লি সালতানাতের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জিত হয়। সালতানাতের শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং দিল্লির জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। বিজয়ী সেনাপতি মালিক কাফুরের সম্মানও বৃদ্ধি পায়। সুলতান তাকে 'মালিক নায়েব' (সুলতানের একান্ত প্রতিনিধি) নিয়োগ করেন। অবশ্য এ বিজয়ের ফলে প্রাপ্ত বিপুল ধনসম্পদ সাম্রাজ্যে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করে। জনদুর্ভোগ লাঘবে সুলতান দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রণয়নে বাধ্য হন। তাছাড়া প্রভূত ঐশ্বর্যলাভ আমির-উমরাহদের অত্যন্ত বিলাসব্যসন প্রিয় করে তোলে যা কালক্রমে খলজিদের পতনের পথ উন্মুক্ত করে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. প্রথম মুসলিম হিসেবে কে দক্ষিণ ভারত জয়ের পরিকল্পনা করেন?
২. আলাউদ্দিন খলজির প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন? *[রাবি ২০১০-১১]*
৩. আলাউদ্দিন খলজির সময় দেবগিরির রাজা কে ছিলেন?
৪. কোন অঞ্চল জয় করে মালিক কাফুর প্রায় ১০০০ উটের এক বিশাল বহরে করে মালামালসহ দিল্লি ফিরে যান?
৫. 'হাজার দিনারি' বলা হয় কাকে?
৬. কোন বিজয়ের মাধ্যমে ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রথম ভিত তৈরি হয়?

উত্তরের জন্য ১৩২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

সুলতান আলাউদ্দিন খলজি দক্ষিণ ভারতের যেসব রাজ্য জয় করেছিলেন তা মানচিত্রের সাহায্যে দেখাও।

পাঠ ১৮

সুলতান আলাউদ্দিন খলজির শাসন ব্যবস্থা এবং সংস্কারসমূহ
Administrative System and Reforms of Sultan Alauddin Khalji

সুলতান আলাউদ্দিন খলজি শুধু বিখ্যাত যোদ্ধা ও বিজেতাই ছিলেন না, একজন সুদক্ষ প্রশাসক ও সংগঠকও ছিলেন। কে. এস. লাল বলেন, "অপর যেকোনো গুণ অপেক্ষা শাসক হিসেবে যোগ্যতাই আলাউদ্দিনকে তার পূর্বসূরি শাসকদের অপেক্ষা অধিকতর উচ্চতর মর্যাদা দান করেছিল।"[১০] শুধু সমগ্র ভারত বিজয়ই নয়, বিজিত রাজ্যে একটি সুষ্ঠু ও যুগোপযোগী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে তিনি ইতিহাসে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন।

রাজনৈতিক আদর্শ ও সার্বভৌমত্বের ধারণা: আলাউদ্দিন খলজির রাজনৈতিক আদর্শ অনেকাংশেই সুলতান বলবনের অনুরূপ ছিল। তিনি নিজেকে আল্লাহর প্রতিনিধি মনে করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন সুলতান বিশেষ উদ্দেশ্যে আল্লাহর প্রেরিত, তাই তিনি বিশেষ গুণাবলি ও ক্ষমতার অধিকারী। সুলতানের মর্যাদা সাধারণ মানুষের ঊর্ধ্বে। এককথায় আলাউদ্দিন খলজি একচ্ছত্র স্বৈরতন্ত্র ও সুলতানের নিরঙ্কুশ ক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিলেন।

রাষ্ট্র শাসনে আলেমদের ক্ষমতা খর্ব: ভারতের মুসলিম শাসকদের মধ্যে আলাউদ্দিন খলজিই প্রথম ধর্মকে রাজনীতি থেকে পৃথক রাখেন। তার আগের সুলতানরা শরিয়তের আইনের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী ছিলেন বিধায় রাজ্য শাসনে আলেমদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। আলাউদ্দিন খলজি মনে করতেন সুলতানের ক্ষমতা শরিয়তের আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। কাজেই রাষ্ট্র শাসনের ব্যাপারে উলামাদের পরামর্শ গ্রহণ জরুরি নয়। তিনি শাসনব্যবস্থার ব্যাপারে আলেমদের হস্তক্ষেপের অবসান ঘটান। তিনি নিজেকে রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার উৎসে পরিণত করেন।

বিদ্রোহের কারণ নির্ণয় ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা: সুলতান আলাউদ্দিন খলজির রাজত্বকালে বেশ কয়েকটি বিদ্রোহের ঘটনা ঘটেছিল। এসব বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে সুলতান উপলব্ধি করেন যে, রাষ্ট্র শাসনব্যবস্থার ত্রুটির কারণেই এসব বিদ্রোহ ঘটেছে। পরামর্শকদের সাথে আলোচনার পর সুলতান বিদ্রোহের চারটি বিশেষ কারণ চিহ্নিত করেন। যথা- ক. রাষ্ট্রীয় ব্যাপার ও শাসনকার্যে সুলতানের অমনোযোগ ও উদাসীনতা খ. অত্যধিক মদপান গ. অভিজাত আমির-উমরাহদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও অবাধ মেলামেশার সুযোগ এবং ঘ. আর্থিক প্রাচুর্য। এ অবস্থায় বিদ্রোহ দমন ও অভিজাতদের সংযত করার উদ্দেশ্যে সুলতান বেশ কিছু কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সম্পদশালী অভিজাত ও আমির-মালিকদের অতিরিক্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। রাজকর্মচারীদের জায়গির দান, সরকারি ভাতা বা অপর কোনো সরকারি সুযোগ-সুবিধা রহিত করা হয়। দিল্লি শহরে মদপান ও জুয়াখেলা নিষিদ্ধ করা হয়। অভিজাতবর্গ ও মালিক-আমিরদের পারস্পরিক মেলামেশা ও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়। অভিজাত ও সাধারণ জনগণের কর্মতৎপরতা ও গতিবিধি পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে গোয়েন্দা তৎপরতা বৃদ্ধি করা হয়।

আলাউদ্দিন খলজির হিন্দুনীতি: দিল্লি সালতানাতের অধিকাংশ ভূস্বামী ও রাজস্ব দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী ছিলেন হিন্দু। অবাধ বিত্তের অধিকারী এ হিন্দুরা সুযোগ পেলেই বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করত। আলাউদ্দিন খলজি এসব বিত্তশালী হিন্দুদের অবাধ্যতা দূর এবং তাদের আনুগত্য নিশ্চিত করার জন্য তাদের ওপর অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করেন। তাদের চক্রান্ত ও বিদ্রোহ রোধ করার জন্য সুলতান তাদের বিত্তহীন করতে চান বলে ঐতিহাসিক স্মিথ উল্লেখ করেছেন। তবে অনুগত ও আইনমান্যকারী হিন্দুদের তিনি হয়রানি করেননি বরং মুসলমানদের মতো সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিলেন বলে ঐতিহাসিক আগা মাহদী হোসেন উল্লেখ করেছেন।

সামরিক সংস্কার (Military Reforms)

সুলতান আলাউদ্দিন খলজি ছিলেন একজন বীরযোদ্ধা ও সুদক্ষ সেনাপতি। মোঙ্গল আক্রমণ মোকাবিলা, সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ, সালতানাতের নিরাপত্তা ও সংহতি বিধান এবং সর্বোপরি নিজের নিরঙ্কুশ সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য তিনি একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তাই সামরিক বাহিনীর সংস্কারের লক্ষ্যে তিনি বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

---

[১০] " It is an administrator than anything else that Alauddin stands head shoulder above his predecessors." –K. S Lal, *History of the Khaljis.*

প্রথমত, আলাউদ্দিন খলজি প্রথম একটি সুশিক্ষিত স্থায়ী সেনাবাহিনী গঠন করেন। সমরমন্ত্রী আরিজ-ই-মামালিকের তত্ত্বাবধানে সৈন্য নিয়োগসহ তার ওপর সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণের সার্বিক ভার অর্পণ করা হয়।

দ্বিতীয়ত, সুলতানের স্থায়ী বাহিনী জান্দার, দেহরক্ষী বাহিনী, অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীতে বিভক্ত ছিল। এর বাইরে সুলতান বিশেষ প্রয়োজনে অস্থায়ী স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীরও ব্যবস্থা করেন।

তৃতীয়ত, সুলতান জায়গিরের পরিবর্তে সৈন্যদের নগদ অর্থে বেতন প্রদানের রীতি প্রচলন করেন।

চতুর্থত, সামরিক বিভাগের দুর্নীতিরোধের উদ্দেশ্যে সুলতান 'দাগ' (অশ্বচিহ্নিতকরণ) এবং 'হুলিয়া' (তালিকা বইয়ে সৈন্যদের বিবরণ লিপিবদ্ধকরণ) প্রথা চালু করেন।

সুলতান আলাউদ্দিন খলজি এক বিশাল সেনাবাহিনীর অধিকারী হয়েছিলেন। ঐতিহাসিক আবুল কাসিম ফিরিশতার বিবরণ অনুযায়ী তার অশ্বারোহী বাহিনীর সংখ্যা ছিল ৪,৭৫,০০০। পদাতিক বাহিনীর সংখ্যা দ্বিগুণ ছিল বলে ধারণা করা হয়। তাছাড়া সুলতানের হস্তিবাহিনী ছিল। প্রতি ১ লক্ষ সৈন্যের সেনাপতিত্ব করতেন একজন 'খান' পদবির সেনা কর্মকর্তা।

অর্থনৈতিক সংস্কার (Economic Reforms)

একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শাসক হিসেবে সুলতান আলাউদ্দিন খলজি সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ, নিরাপত্তা ও সংহতি বিধানের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা প্রয়োজন বলে মনে করেছিলেন। কাজেই সাম্রাজ্যের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন ও প্রজাসাধারণের জীবনমান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে তিনি সংস্কারধর্মী কর্মসূচি গ্রহণ করেন।

রাজস্ব ব্যবস্থা: সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রে ভূমিকরই রাষ্ট্রের প্রধান আয়ের উৎস। তাই আলাউদ্দিন খলজি ভূমি রাজস্ব নীতির ক্ষেত্রে বেশকিছু ব্যবস্থা নেন। তিনি ভূমি ব্যবস্থাপনায় মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য নিয়ন্ত্রণ করেন। খোত, মোকাদ্দম ও চৌধুরী পদবিধারী ভূমি কর্মকর্তাদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা বাতিল করা হয়। কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি রাজস্ব আদায়ের জন্য 'আমিন' পদবির রাজস্ব কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। ইকতার রাজস্ব হিসাব তদারকির জন্যও কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। রাজকোষের ওপর বাড়তি চাপজনিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় কৃষকদের ওপর উৎপন্ন ফসলের অর্ধাংশ পর্যন্ত করারোপ করা হয়। গবাদি পশুর ওপর চারণ কর এবং কৃষকদের আবাসস্থলের ওপরও কর বসানো হয়। বিশেষ করে তিনি দোয়াব অঞ্চলের কৃষকদের ওপর উচ্চহারে কর বসান। দোয়াব অঞ্চল ছাড়া সর্বত্র নগদ অর্থে রাজস্ব পরিশোধ করতে হতো। উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণ এবং কর ধার্য করার সুবিধার্থে সুলতান আলাউদ্দিন খলজি ভূমি জরিপেরও ব্যবস্থা করেন। মুসলিম ভারতের ইতিহাসে ভূমি জরিপের প্রথম কৃতিত্ব তার।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ভারতের মুসলিম শাসকদের মধ্যে কে প্রথম ধর্মকে রাজনীতি থেকে পৃথক রাখেন?
২. ভারতে প্রথম একটি সুশিক্ষিত স্থায়ী সেনাবাহিনী গঠন করেন কে?
৩. সামরিক বিভাগে 'দাগ' এবং 'হুলিয়া' প্রথা চালু করেন কে?
৪. সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় আয়ের প্রধান উৎস কী?
৫. আলাউদ্দিন খলজি কোন অঞ্চলের কৃষকদের ওপর উচ্চহারে কর ধার্য করেন?
৬. মুসলিম ভারতের ইতিহাসে ভূমি জরিপের প্রথম কৃতিত্ব কার?

উত্তরের জন্য ১৩২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

সুলতান আলাউদ্দিন খলজির সংস্কারমূলক কাজগুলোর একটি তালিকা তৈরি করো।

গ. দলীয় কাজ

কয়েকজন শিক্ষার্থী মিলে সুলতান আলাউদ্দিন খলজির কৃতিত্বপূর্ণ দিকগুলো নিয়ে দুটি স্লাইড তৈরি করো।

পাঠ ১৯

সুলতান আলাউদ্দিন খলজির মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও এর ফলাফল
Price Control System of Sultan Alauddin Khalji and its Results

ব্রিটিশ ঐতিহাসিক স্ট্যানলি লেনপুলের মতে, আলাউদ্দিন খলজি ছিলেন একজন মহান রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ (A great political economist)। তার প্রবর্তিত অর্থনৈতিক সংস্কারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রবর্তন ছিল মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। আধুনিক ঐতিহাসিকগণেরা মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে সুলতানের শাসনব্যবস্থার দক্ষতার প্রতীক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ঐতিহাসিকদের অনেকেই মনে করেন যে, সাম্রাজ্য বিস্তার এবং বিশাল সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব বিধানের জন্য সুলতান এক বিশাল সেনাবাহিনী গঠন করেছিলেন। জিয়াউদ্দিন বারানীর মতে, অল্প বেতনে এ বিশাল সেনাবাহিনী পোষণের উদ্দেশ্যেই সুলতান মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। ঐতিহাসিক কে.এস. লাল এবং লেনপুলও এ মত সমর্থন করেন। তাদের মতে, সৈন্যরা যেন তাদের নির্ধারিত অল্প বেতনেই নিজ প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় এবং স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করতে পারে সে জন্য সুলতান দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করেন। অবশ্য এ ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মধ্যে ভিন্ন মতও রয়েছে। ঐতিহাসিকদের কেউ কেউ মনে করেন, সমকালের বিবেচনায় সেনাবাহিনীর বেতন একেবারে কম ছিল না। তাছাড়া সুলতান যেসব পণ্যের বাজার দর নির্ধারণ করেছিলেন এর সব কিছু সেনাবাহিনী ব্যবহার করত না। সুফি নাসিরউদ্দিন চিরাগের মতে, সুলতান আলাউদ্দিন খলজি প্রজাকল্যাণ সাধন রাজার কর্তব্য বলে মনে করতেন। আর এ কর্তব্যবোধের কারণেই তিনি মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মতো একটি উদ্ভাবনী ও কঠিন কাজে হাত দেন। আমির খসরুও এ মত সমর্থন করেন। ঐতিহাসিক বারানীর মতে, এ সময় অধিকাংশ ব্যবসায়ী ছিলেন হিন্দু। সুলতান এদের শায়েস্তা করার জন্য দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করেছেন। তবে এ মত গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রকৃতপক্ষে সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যেই আলাউদ্দিন খলজি মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। ভূস্বামীদের জমি বাজেয়াপ্ত এবং দক্ষিণ ভারত থেকে সংগৃহীত প্রচুর ধনরত্নের কারণে দিল্লিতে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। মুদ্রার মূল্যমান হ্রাস পাওয়ায় নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। ফলে এ অবস্থায় সামরিক-বেসামরিক নির্বিশেষে সব প্রজাসাধারণের দুর্ভোগ লাঘবের উদ্দেশ্যে সুলতান খাদ্যদ্রব্যসহ নিত্য ব্যবহার্য পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে দেন।

ক. খাদ্যশস্যের মূল্য তালিকা নির্ধারণ

পণ্য	পরিমাণ	মূল্য
ডাল	১ মণ	৫ জিতল
চিনি	১ সের	১.৫ জিতল
ঘি	২.৫ সের	১ জিতল
চাল	১ মণ	৫ জিতল
সরিষার তেল	৩ সের	১ জিতল
গম	১ মণ	৭.৫ জিতল
লবণ	২.৫ মণ	৫ জিতল
বার্লি	১ মণ	৪ জিতল
গুড়	১ সের	.৫ জিতল

১ জিতল = ০.৬ পয়সা

খ. বস্ত্রমূল্য নির্ধারণ

বস্ত্রের নাম	পরিমাণ	মূল্য
দিল্লি খাঁজ সিল্ক	১ খণ্ড	১৬ টাকা
কমলা রঙের নতুন সিল্ক	১ খণ্ড	৬ টাকা
পশম মিশ্রিত অর্ধ সিল্ক	১ খণ্ড	৩ টাকা

বস্ত্রের নাম	পরিমাণ	মূল্য
লংক্লথ/মসৃণ কার্পাস	২০ গজ	১ টাকা
মোটা কার্পাস	৪০ গজ	৬ জিতল
লাল ডোরাকাটা বস্ত্র	১টি	৬ জিতল
সাধারণ বস্ত্র	১টি	৩ জিতল
চাদর	১টি	১০ জিতল

গ. গৃহপালিত পশুর মূল্য তালিকা

পশুর নাম	পরিমাণ	মূল্য
প্রথম শ্রেণির ঘোড়া	১টি	১০০-১২০ টাকা
দ্বিতীয় শ্রেণির ঘোড়া	১টি	৮০-৯০ টাকা
তৃতীয় শ্রেণির ঘোড়া	১টি	৬৫-৭০ টাকা
টাট্টু ঘোড়া	১টি	১২-২০ টাকা
দুগ্ধবতী গাভী	১টি	৩-৪ টাকা
দুগ্ধবতী মহিষ	১টি	৫-৬ টাকা
ছাগল/বকরি	১টি	১৪-১৬ টাকা

সূত্র: মুহাম্মদ আবুল কাসিম ফিরিশতা, *তারিখ-ই-ফিরিশতা, অনুবাদ: ভারতের মুসলিম বিজয়ের ইতিহাস, পৃষ্ঠা-২৮১-২৮২*

অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ: উপরের পণ্য ছাড়াও সুলতান আলাউদ্দিন খলজি দাস-দাসী (কর্মক্ষম একজন মেয়ে ৫-১২ টাকা, সুন্দরী মেয়ে ২০-৪০ টাকা এবং ক্রীতদাস বালক ২০-৩০ টাকা) এবং শাকসবজি, ফল-মূল, টুপি, সুঁই, অস্ত্রশস্ত্র, মশলা, সুতা, মিষ্টি ও চিরুনিসহ প্রচলিত সকল পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে দেন।'

মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য গৃহীত বিধি-ব্যবস্থা: মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সফল ও কার্যকর করার জন্য সুলতান আলাউদ্দিন খলজি কতকগুলো বিধি-ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। যথা—

পণ্য বাজার স্থাপন: প্রথমত, 'মান্ডি' নামে দিল্লিতে প্রধান ও কেন্দ্রীয় শস্য বাজার বসানো হয়। দ্বিতীয়ত, ঔষধপত্র, কাপড়, শুকনো ফল, চিনি, মাখন এবং জ্বালানি তেলের বাজার বসানো হয় দিল্লির বাদায়ুন তোরণে 'সেহরা আদলে'। ঘোড়া, গবাদি পশু এবং ক্রীতদাসদের জন্য তৃতীয় একটি এবং এসব পণ্যের বাইরে সাধারণ জনগণের কেনাকাটার জন্য আরেকটি বাজার স্থাপন করা হয়।

বাজার পরিদর্শন ব্যবস্থা: পণ্য বাজার পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের জন্য 'শাহানা ই মান্ডি' এবং 'দিউয়ান ই রিয়াসাত' নামক দুই জন পদস্থ কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়। তাছাড়া পণ্যমূল্য ও ওজন পরিমাপ ও ব্যবসায়ীদের কর্মতৎপরতা তদারকির জন্য সুলতান গুপ্তচর নিয়োগ করেন। এসব ব্যবস্থার ফলে বাজার নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়।

নির্ধারিত মূল্যে পণ্য বিক্রি নিশ্চিত করা: ব্যবসায়ী ও দোকানদারদের সরকার নির্ধারিত মূল্যে খাদ্যশস্যসহ পণ্য আমদানি এবং নির্দিষ্ট মূল্যে তা বিক্রির বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য ব্যবসায়ীদের পণ্যমূল্য টানিয়ে রাখার নির্দেশ ছিল। নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত আদায় করা হলে ব্যবসায়ীদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হতো। ওজন পরিমাপে কারচুপির জন্যও কঠোর শাস্তির বিধান করা হয়েছিল।

সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ: প্রাকৃতিক কারণে যাতে খাদ্য ঘাটতি না পড়ে এবং চাহিদা অনুযায়ী খাদ্যশস্য সরবরাহ সুনিশ্চিত করা যায় সেজন্য দিল্লিতে কয়েকটি রাজকীয় শস্যাগার স্থাপন করা হয়েছিল। সংকটের সময় এখান থেকে শস্য সরবরাহ করা হতো।

পণ্য বরাদ্দ নির্ধারণ (রেশনিং) ব্যবস্থা: কে. এস. লাল শস্যের বরাদ্দ নির্ধারণ ব্যবস্থাকে আলাউদ্দিন খলজির মহান উদ্ভাবন বলে অভিহিত করেন। বস্তুত অনাবৃষ্টিসহ যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় সংকট মোকাবিলার উদ্দেশ্যে এ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এ ব্যবস্থায় সদস্য সংখ্যা অনুযায়ী একটি পরিবার সপ্তাহে নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য ক্রয় করতে পারত। এ ব্যবস্থার ফলে দিল্লির পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কখনও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়নি।

মজুদ নিরোধ ব্যবস্থা: অধিক মুনাফার লোভে কেউ যাতে পণ্যের মজুতদারি না করতে পারে সুলতান সে ব্যবস্থা করেন। মজুতদারি নিরোধে জরিমানা ও পণ্য বাজেয়াপ্ত করাসহ নানা রকমের শাস্তি দেওয়া হতো।

এসব ব্যবস্থা ছাড়াও সুলতান তার মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে হিন্দু-মুসলিম ব্যবসায়ীদের রাষ্ট্রীয় দপ্তরে নাম রেজিস্ট্রি করার নির্দেশ, সরকারি অনুমতিপত্র ছাড়া ব্যবসায়ীদের কৃষকদের কাছ থেকে শস্য ক্রয় নিষিদ্ধসহ কঠোর হস্তে চোরাকারবার দমনের ব্যবস্থা করেন।

মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ফলাফল (Results of Price Control System)

সুলতান আলাউদ্দিন খলজির মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার তাৎপর্য ও ফলাফল সম্পর্কে ঐতিহাসিকেরা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানী মূল্যনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির প্রশংসা করে 'বাজারে শস্যের অপরিবর্তিত মূল্যকে সে যুগের অন্যতম বিস্ময়' বলে উল্লেখ করেন। লেনপুল, ডব্লিউ হেইগ, ঈশ্বরী প্রসাদ এবং কে.কে. দত্ত প্রমুখ ঐতিহাসিকেরা মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে সফল ও কল্যাণকর বলে অভিহিত করেছেন। লেনপুলের মতে, এ ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে সফল হয়েছিল। তিনি আরও বলেন, সকল শ্রেণির জনগণ এ অভূতপূর্ব পদ্ধতির মাধ্যমে উপকৃত হয়েছিল। ঈশ্বরী প্রসাদের মতে, আলাউদ্দিন খলজির বাজার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি মধ্যযুগে রাষ্ট্রীয়নীতিতে অন্যতম বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল।

অবশ্য কোনো কোনো ঐতিহাসিক মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পর্কে উল্লিখিত মন্তব্যের বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেন। অধ্যাপক শ্রীরাম শর্মা এবং পি. সরন-এর মতে, মূল্যনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ছিল যুক্তিহীন ও জবরদস্তিমূলক ব্যবস্থা। কেননা সুলতান অর্থনৈতিক নীতি 'চাহিদা ও সরবরাহের' ওপর ভিত্তি করে এ ব্যবস্থা চালু করেননি। তাদের মতে, সুলতানের মৃত্যুর আগে এ ব্যবস্থার পতন ঘটে। তারা বলেন, সেনাবাহিনী ছাড়া এর দ্বারা জনগণের কোনো উপকার হয়নি। তাছাড়া সাম্রাজ্যের সকল অংশেও এটি কার্যকর করা হয়নি। কেবল দিল্লি ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এ নীতি সীমাবদ্ধ ছিল। কে.এস. লালের মতে, শস্য ও পণ্যমূল্য নির্ধারিত হওয়ায় সাধারণ নাগরিকের উপকার হয় বটে, তবে কৃষক এবং ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যেও মন্দা দেখা দেয়।

মূল্যনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের সমালোচনার কিছুটা সত্যতা আছে। তবে নিরপেক্ষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সুলতানের দৃঢ় সংকল্প, কঠোর নজরদারি, কর্মচারীদের কর্তব্যপরায়ণতা এবং সাধারণ মানুষের সহযোগিতায় এ পদ্ধতি সফল হয়। এর ফলে মুদ্রাস্ফীতি রোধ, খাদ্য সমস্যার সমাধান এবং মানুষের জীবনমানের উন্নতি হয়। সর্বোপরি সুলতানের পক্ষে অল্প বেতনে এক বিশাল বাহিনী প্রতিপালন করা সম্ভব হয়। ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, “সেনাবাহিনীর শক্তি ও দক্ষতা বৃদ্ধি মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধের নিশ্চয়তা বিধান করে এবং বিদ্রোহী মনোভাবাত্মক রাজা ও সামন্ত নেতৃবৃন্দকে নিয়ন্ত্রণে রাখে।”[১১]

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ভারতবর্ষে মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রবর্তক কে? *[রাবি ২০১১-১২]*
২. আলাউদ্দিন খলজি এক মণ চালের দাম কত নির্ধারণ করেছিলেন?
৩. আলাউদ্দিন খলজি কী নামে দিল্লিতে প্রধান ও কেন্দ্রীয় শস্য বাজার বসান?
৪. 'শাহানা ই মান্ডি' এবং 'দিউয়ান ই রিয়াসাত' কর্মকর্তাদের কাজ কী ছিল?
৫. পণ্য বরাদ্দ নির্ধারণ (রেশনিং) ব্যবস্থার উদ্ভাবক কে?
৬. আলাউদ্দিন খলজির শাসন ব্যবস্থার দক্ষতার প্রতীক বলা হয় কোনটিকে? *[সকল বোর্ড ২০১৭]*

উত্তরের জন্য ১৩২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

সুলতান আলাউদ্দিন খলজির নির্ধারিত খাদ্যশস্যের মূল্যের একটি তালিকা প্রস্তুত করো।

---

[১১] "The increased strength and efficiency of the army guaranteed security against Mongol invasions, and held in the check the refractory Rajas and chieftains." –Ishwari Prasad, *A Short History of Muslim Rule in India, p-130.*

পাঠ ২০

আলাউদ্দিন খলজির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্ব এবং খলজি বংশের পতন Characteristics and Achievements of Alauddin Khalji and Fall of the Khalji Dynasty

চরিত্র (Character)

সুলতান আলাউদ্দিন খলজি অসামান্য প্রতিভা ও নানাবিধ চারিত্রিক গুণের অধিকারী ছিলেন। অবশ্য ঐতিহাসিকগণেরা তার চারিত্রিক গুণাবলি মূল্যায়নে অভিন্ন মত পোষণ করেন না। এস.এ. রায় বলেন, "শাসক হিসেবে তিনি ছিলেন নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী এবং মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন বিশ্বাসঘাতক ও অকৃতজ্ঞ।"[১২] কোনো কোনো পণ্ডিত তাকে ক্রোধী, উদ্ধত, একগুঁয়ে, নির্মম, নিষ্ঠুর ও চক্রান্তকারী হিসেবে অভিহিত করেছেন। তবে তার চরিত্রে অনেক ইতিবাচক দিক ইতিহাসবিদদের দৃষ্টি এড়ায়নি। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, আলাউদ্দিন খলজি ছিলেন উচ্চাভিলাষী, নির্ভীক ও অধ্যবসায়ী। তার মধ্যে প্রখর অন্তর্দৃষ্টি ছিল। মানব চরিত্র বিশ্লেষণেও তিনি সক্ষম ছিলেন। অধীনদের নিরবচ্ছিন্ন আনুগত্য অর্জনের উপযোগী ক্ষমতা তার ছিল। প্রয়োজনে অন্যের পরামর্শ গ্রহণের মানসিক উদারতাও তার মধ্যে ছিল। তিনি ধর্মবিরোধী কোনো আলাপ-আলোচনা সহ্য করতেন না। ধর্মবেত্তা ও সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রতি তার প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবোধ ছিল।

সুলতান আলাউদ্দিন খলজির শেষ জীবন সুখকর ছিল না। বয়োবৃদ্ধি এবং অত্যধিক পরিশ্রমের কারণে তার স্বাস্থ্য ও মন দু'ই ভেঙে পড়ে। তদুপরি রাজ্যাভ্যন্তরে নানা গোলযোগ ও বিদ্রোহ বিশৃঙ্খলা দেখে সুলতান মানসিক হতাশার মধ্যে পড়েন। এরূপ দুরবস্থার মধ্যে সুলতান মারাত্মক উদরী রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৩১৬ খ্রিষ্টাব্দের ২ জানুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন। অনেকে মনে করেন, বিশ্বস্ত সেনাপতি মালিক কাফুরই সুলতানকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন।

কৃতিত্ব (Achievements)

প্রাক-মুঘল মুসলিম ভারতের ইতিহাসে আলাউদ্দিন খলজি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান। দিল্লি সালতানাতের নিরাপত্তা, সংহতি ও স্থায়িত্ব বিধান, সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ এবং বেসামরিক শাসন পুনর্গঠনে বিশেষ কৃতিত্বের জন্য তিনি ভারতীয় ইতিহাসে অক্ষয় স্থান অধিকার করে আছেন। পর্যটক ইবনে বতুতা তাকে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান বলে অভিহিত করেছেন। কৃতিত্ব ও খ্যাতির বিবেচনায় তিনি পূর্ববর্তী সুলতানদের অতিক্রম করেছিলেন।

দিগ্বিজয়ী বীর: সুলতান আলাউদ্দিন খলজি ছিলেন সহজাত সামরিক প্রতিভার অধিকারী। তার অধিনায়কত্বের দক্ষতাও ছিল সহজাত। ফলে অনেকগুলো দুঃসাহসিক বিজয় দ্বারা তিনি রাজত্বকালকে গৌরবময় করতে পেরেছেন। আলাউদ্দিন খলজি ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী। তিনি বিশ্ববিজয়ের স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং বিখ্যাত গ্রিক বীর আলেকজান্ডারের নীতি অনুসরণ করতেন। তিনি নিজেকে 'দ্বিতীয় আলেকজান্ডার' হিসেবে পরিচিত করে তোলেন। তার বিশ্বজয়ের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি, তবে তার সময় থেকে দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদী যুগের সূচনা হয়। মোঙ্গল আক্রমণ মোকাবিলায় ব্যাপৃত থেকেও তিনি বাহুবলে সমগ্র উত্তর ভারত জয় করেন। শুধু তাই নয়, মুসলিম শাসকদের মধ্যে তিনি প্রথম বিন্ধ্য পর্বত অতিক্রম করেন এবং করমণ্ডল উপকূল পর্যন্ত প্রায় সমগ্র

জেনে রাখো

আলেকজান্ডার দ্যা গ্রেট বা মহামতি আলেকজান্ডার ৩৫৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের দেশ মেসিডোনিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি দার্শনিক অ্যারিস্টটলের কাছে শিক্ষালাভ করেন। ৩৩৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে তার পিতা দ্বিতীয় ফিলিপকে হত্যা করা হলে আলেকজান্ডার মেসিডোনের সিংহাসনে বসেন। ক্ষমতায় আরোহণের পর তিনি বিশ্বজয়ে বের হন। তিনি পিতার স্বপ্নপূরণের উদ্দেশ্যে পারস্য অভিমুখে অভিযান চালান। ৩৩৯ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে তিনি পারস্য সাম্রাজ্য আক্রমণ করে তা দখল করেন। ৩২৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণ করে সিন্ধুর রাজাকে পরাজিত করেন। তিনি পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছানোর ইচ্ছাপোষণ করতেন। কিন্তু সেনাবাহিনীর দাবির কারণে তিনি ভারত থেকেই নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং পথে ৩২৩ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলন বা বর্তমান ইরাকে মৃত্যুবরণ করেন। এ অপরাজেয় বীর ইতিহাসের অন্যতম সফল সেনানায়ক হিসেবে পরিচিতি পান।

---

[১২] "As a king he was a ruthless and tyrant, and as a man, treacherous and ungrateful." – S A Roy, *The Delhi Sultanate, p-40.*

দক্ষিণ ভারতে মুসলিম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। বস্তুত, তার সাম্রাজ্যবাদী নীতি ক্ষুদ্র সুলতানি সাম্রাজ্যকে এক সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যে পরিণত করেছিল। অধ্যাপক এস. আর. শর্মা বলেন, “আলাউদ্দিন খলজি ছিলেন ভারতের প্রথম মুসলিম সম্রাট। তার রাজত্বকালেই সর্বপ্রথম অর্ধচন্দ্র খচিত পতাকা হিমালয় থেকে কুমারিকা অন্তরীপ এবং এক সমুদ্র থেকে অন্য সমুদ্র পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল।”[১৩]

দক্ষ শাসক: শাসক হিসেবেও আলাউদ্দিন খলজি ছিলেন সুদক্ষ ও খ্যাতিমান। ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, “বেসামরিক প্রশাসন পরিচালনায় তিনি মৌলিক প্রতিভা এবং প্রবল মানসিক শক্তির পরিচয় দেন।”[১৪] আলাউদ্দিন খলজি ছিলেন নিরঙ্কুশ স্বৈরতন্ত্রে বিশ্বাসী। সুলতানের ব্যক্তিগত মর্যাদা ও ঈশ্বর প্রদত্ত অবাধ ক্ষমতায় বিশ্বাসী হিসেবে তিনি রাষ্ট্রের সব ক্ষমতা নিজের হাতে গ্রহণ করেন। ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, “রাষ্ট্রনীতির ব্যাপারে তিনি ছিলেন ম্যাকিয়েভেলিপন্থি। কোনো প্রকার বিবেক বা ধর্মীয় নির্দেশ তার কাছে এতটুকু মূল্যবহন করেনি।” তিনি রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থার ব্যাপারে উলেমাদের হস্তক্ষেপ রোধ করেন। এমনকি নিজের কর্মপন্থা বিঘ্নিত হওয়ার মতো অবস্থা দেখা দিলে তিনি কুরআন-হাদিসের নির্দেশ অমান্য করতেও দ্বিধা করতেন না বলে ঈশ্বরী প্রসাদ উল্লেখ করেছেন। একজন সুদক্ষ শাসক হিসেবে তিনি সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ বিশৃঙ্খলা দমন করেন এবং সামরিক বাহিনী সংস্কার ও কেন্দ্রীয় শাসন শক্তিশালী করেন। রাজ্য ব্যবস্থার পুনর্গঠন করে রাজ্যের আর্থিক ভিত শক্তিশালী করা হয়। জনজীবনের দুর্ভোগ লাঘব ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করা হয় যা আজকের বাস্তবতায়ও অনেক দেশে চালু করা সম্ভব নয়। বস্তুত মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তাকে প্রজারঞ্জক শাসকের খ্যাতি দান করে। আলাউদ্দিন খলজির শাসনব্যবস্থা তার উত্তরসূরি মুসলিম শাসকদের জন্য ছিল অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। অধ্যাপক এস. আর. শর্মা যথার্থই বলেছেন “তার শাসন পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে মুসলিম শাসকেরা তাদের শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন।”

শিল্প ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক: আলাউদ্দিন খলজি নিজে নিরক্ষর ছিলেন। তবে তিনি শিল্প ও সংস্কৃতির বিকাশে উদার পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। ভারতের তোতাপাখি নামে খ্যাত কবি আমির খসরু, ভারতের শেখ সাদী, কবি হাসান দেহলভী, ঐতিহাসিক সালাম কোহী ও কবিরউদ্দিনসহ পঁয়তাল্লিশ জন কবি-সাহিত্যিক-পণ্ডিত তার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ ও দরবার অলঙ্কৃত করেছিলেন। শেখ নিজামউদ্দিন আউলিয়া, শেখ রুকনুদ্দিন এবং কাজি মুঘিসউদ্দিন প্রমুখ পুণ্যবানদের প্রতি সুলতান ছিলেন প্রগাঢ় শ্রদ্ধাশীল।

শিল্পকলার প্রতি আলাউদ্দিন খলজির বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি দিল্লিকে বহু জমকালো প্রাসাদ এবং হর্মরাজি দ্বারা সুসজ্জিত ও সুশোভিত করেন। আলাই দুর্গ (কোস-ই-সিরি), আলাই দরওয়াজা, সিরি শহর এবং হাজার সিতূন (হাজার স্তম্ভের রাজ প্রাসাদ) প্রভৃতি আলাউদ্দিন খলজির স্থাপত্য প্রীতির উজ্জ্বল নিদর্শন।

সমালোচনা: আলাউদ্দিন খলজির শাসনব্যবস্থা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল বটে, তবে এর মধ্যে কিছু দুর্বলতা এবং ত্রুটি-বিচ্যুতিও ছিল। তার সাম্রাজ্য ছিল সামরিক শক্তি নির্ভরশীল। অতিকেন্দ্রিকতা, কঠোর নিবর্তনমূলক শাস্তির ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি গোয়েন্দা বিভাগই ছিল সুলতানের শক্তির মূল উৎস। সমালোচকদের মতে, সুলতান আলাউদ্দিন খলজির সরকারের কোনো মজবুত ভিত্তি ছিল না। তিনি সাম্রাজ্যের কোনো স্থায়ী ভিত তৈরি করতে পারেননি। তার শাসনব্যবস্থার অন্তর্নিহিত দুর্বলতা খলজিদের পতনের পথ উন্মুক্ত করেছিল। আমির-উমরাহদের ওপর সুলতানের কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ, তার রাজস্বনীতি, বাজার মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় অনেকেই ক্ষুব্ধ ছিলেন। সুলতানের শেষ জীবনে তারা সে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। ফলে জীবদ্দশাতেই সুলতান তার সাম্রাজ্যের ধ্বংস অবলোকন করতে বাধ্য হন। সামরিক সংগঠক, বিজেতা, শাসক ও সংস্কারক হিসেবে তার কৃতিত্বের নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক বিচারে তাকে দিল্লির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান বলে অভিহিত করা অযৌক্তিক নয়। আলাউদ্দিন খলজির রাজত্বকালকে গৌরবোজ্জ্বল এবং সার্বিকভাবে তাকে একজন সফলকাম শাসক হিসেবে আখ্যাদান অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত। ঈশ্বরী প্রসাদের মতে, “মধ্যযুগীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে তার ন্যায় মহান শাসক ও সফলকাম

---

[১৩] "Ala-ud-din Khalji was the first Muslim Emperor of India. During the reign, for the first time the crescent domeneted over the whole country from the Himalayas to cape Comorin and from sea to sea." –S R Sharma, *The Crescent in India.*

[১৪] "In organising his civil administration, he displayed great originality and mental vigour." –Ishwari Prasad, *A Short History of Muslim Rule in India, P- 99*

সামরিক সংগঠকের দৃষ্টান্ত ছিল বিরল।" (He was endowed with the qualities of a great civil administrator and successful military organizer a rare combination in medieval statesmanship.) যদিও তার মধ্যে তুর্কি বর্বরতার ব্যাপারটা পুরোমাত্রায় ছিল, তবে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, তার আচরণের জন্য সাধারণ মুসলমানরা ভারতবর্ষকে স্বদেশ হিসেবে ভাবতে শুরু করে। ইসলাম ধর্মও ভারতে বিশ্বধর্ম হিসেবে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায়। এস এ রায় যথার্থই বলেছেন, "প্রকৃতপক্ষে ভারতে তার মাধ্যমে মুসলিম সাম্রাজ্য এবং মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়।" (The history of Muslim empire and Muslim administration in India really begins with him.) আলাউদ্দিন ছিলেন ভারতের প্রথম মুসলিম সাম্রাজ্যবাদী মহান প্রশাসক।

খলজি বংশের পতন (Fall of the Khalji Dynasty)

সুলতান আলাউদ্দিন খলজির মৃত্যুর পর তার মনোনীত উত্তরাধিকারী হিসেবে তার নাবালক পুত্র শিহাব উদ্দিন ওমর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার সময়ে মালিক কাফুর সাম্রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করেন। সুলতান আলাউদ্দিন খলজি তাকে তাজ-উল-মালিক কাফুরী উপাধি ও প্রধানমন্ত্রী পদে অভিষিক্ত করেন। কিন্তু তার স্বৈরশাসনে অতিষ্ঠ হয়ে অভিজাত শ্রেণি মাত্র ৩৬ দিন শাসনের পর তাকে হত্যা করেন। অভিজাতদের সহায়তায় শিহাব উদ্দিন ওমরকে ক্ষমতাচ্যুত করে তার ভাই কুতুবউদ্দিন মুবারক শাহ দিল্লির সিংহাসন দখল করেন। তিনি ১৩১৬-১৩২০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করেন। এ সময় সাম্রাজ্যে সর্বত্র বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এই পরিস্থিতির মধ্যেও মুবারক শাহ 'খলিফা' উপাধি ধারণ করে নিজের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষের পরিচয় দেন। অবশ্য এতে তার শেষ রক্ষা হয়নি। ১৩২০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি অনুচর খসরুর ষড়যন্ত্রে নিহত হন। বিশ্বাসঘাতক খসরু ১৩২০ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ এপ্রিল নাসির উদ্দিন খসরু উপাধি নিয়ে দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। সমসাময়িক মুসলিম ঐতিহাসিকগণ তার শাসনকালকে 'সন্ত্রাসের রাজত্ব' বলে অভিহিত করেছেন। তার কুশাসনে অতিষ্ঠ হয়ে অভিজাতগণ পাঞ্জাবের শাসক গাজি মালিককে দিল্লি আক্রমণের অনুরোধ করলে তিনি খসরুকে পরাজিত ও নিহত করেন। এরপর অভিজাতদের অনুরোধে গাজি মালিক 'গিয়াসউদ্দিন তুঘলক' উপাধি নিয়ে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করলে খলজি বংশের পতন ঘটে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আলাউদ্দিন খলজি কত খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন?
২. প্রাক-মুঘল মুসলিম ভারতের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন কে?
৩. কোন পর্যটক আলাউদ্দিন খলজিকে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান বলে অভিহিত করেছেন?
৪. 'দ্বিতীয় আলেকজান্ডার' উপাধি পেয়েছিলেন কে?
৫. ক্ষুদ্র সুলতানি সাম্রাজ্যকে এক সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যে পরিণত করেছিলেন কে?
৬. ভারতের 'তোতাপাখি' নামে খ্যাত কে? */সকল বোর্ড ২০১৬/*

উত্তরের জন্য ১৩২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

সুলতান আলাউদ্দিন খলজির কৃতিত্বপূর্ণ দিকগুলো নিয়ে একটি চার্ট তৈরি করো।

গ. বাড়ির কাজ

ফ্রান্সের বুরবোঁ রাজবংশের অন্যতম রাজা চতুর্দশ লুই বলেছিলেন, 'I am the State'। তিনি স্বৈরতন্ত্র ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি সাম্রাজ্যে অভিজাত ও পুরোহিত শ্রেণির জন্য বরাদ্দকৃত জায়গির প্রথা বিলোপ করেন এবং গোয়েন্দা তৎপরতা বৃদ্ধি করেন। সামরিক সংস্কার, অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও রাজ্যসীমা দানিয়ুব নদী পর্যন্ত বৃদ্ধি করে তিনি বুঁরবো রাজবংশের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

ক. উদ্দীপকে তোমার পঠিত দিল্লি সালতানাতের কোন শাসকের কর্মকাণ্ডের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো।
খ. উদ্দীপকে উল্লেখিত সামরিক সংস্কার, অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও রাজ্যসীমা বৃদ্ধির আলোকে উক্ত শাসকের অবদান মূল্যায়ন করো।

পাঠ ২১

সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক: তুঘলক বংশ প্রতিষ্ঠা (১৩২০-১৩২৫ খ্রি.)
Sultan Giyasuddin Tughlaq: Foundation of the Tughlaq Dynasty (1320-1325 AD)

তুঘলক বংশ (১৩২০-১৪১৩ খ্রি.)

দিল্লি সালতানাতে তুঘলক বংশের শাসনকাল একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা গাজি মালিক- যিনি সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক নামে ইতিহাসে সমধিক পরিচিত। কোনো পরিবার বা গোত্রের নামে নয় বরং এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা গিয়াসউদ্দিনের উপাধি বা ডাক নাম 'তুঘলক' থেকে তার প্রতিষ্ঠিত বংশের নাম 'তুঘলক বংশ' হয়েছে বলে অধিকাংশ ঐতিহাসিক মনে করেন। শেখ রুকনুদ্দিনের উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনে বতুতা বলেছেন, গিয়াসউদ্দিন তুঘলক ছিলেন 'কোরানা তুর্কি' বংশজাত। কোরানা তুর্কিদের আদি আবাস তুর্কিস্তান ও সিন্ধুর মধ্যবর্তী পার্বত্য অঞ্চলে। শামস সিরাজ আফিফও একই মত পোষণ করেন। ডব্লিউ হেইগ-এর মতে, 'অগলিক' শব্দ থেকে 'তুঘলক' শব্দের উৎপত্তি। আর বর্তমানে খোটান শহরের কাছাকাছি অঞ্চলে বসবাসরত তুর্কিরা এ অগলিক বংশজাত। যা হোক ভারতের সুলতানি শাসনের ইতিহাসে তুঘলক বংশের রাজত্বকাল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং এ বংশের ৯ জন শাসক নব্বই বছরেরও অধিক সময় শাসন কাজ পরিচালনা করেন।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের পরিচয় ও শাসনব্যবস্থা
(Imtroduction and the Administrative System of Sultan Giyasuddin Tughlaq)

প্রাথমিক জীবন: সুলতান গিয়াস উদ্দিন তুঘলকের বাল্যনাম ছিল গাজি তুঘলক। তার জন্ম নিতান্তই সাধারণ পরিবারে। পিতা ছিলেন সুলতান বলবনের একজন তুর্কি দাস এবং মাতা পাঞ্জাবের একজন জাঠ রানি। দারিদ্র্যের কারণে গাজি তুঘলক প্রথমে সিন্ধুর এক বণিকের অধীনে চাকরি নেন। পরবর্তীকালে তিনি সেনাবাহিনীতে যোগ দেন এবং নিজ প্রতিভা, সাহস ও যোগ্যতাবলে সুলতান আলাউদ্দিন খলজির সময় সুদক্ষ সমরনায়করূপে খ্যাতি অর্জন করেন। ১৩০৫ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান তাকে পাঞ্জাবের গভর্নর নিয়োগ করেন। দিপালপুর ছিল তার প্রধান কর্মদপ্তর। সুলতানের নির্দেশে গাজি তুঘলক উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মোঙ্গল আক্রমণ মোকাবিলা করেন। তিনি ২০টি অভিযানের প্রায় প্রত্যেকটিতে সাফল্য লাভ করায় তার সামরিক সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ সুলতান আলাউদ্দিন খলজি তাকে 'মালিক উল গাজি' বা গাজি মালিক উপাধি দেন। আলাউদ্দিন খলজির মৃত্যুর পরও পাঞ্জাবের শাসনকর্তা হিসেবে গাজি মালিক নিজের অবস্থান ও প্রতিপত্তি বজায় রাখতে সক্ষম হন।

সিংহাসনে আরোহণ ও তুঘলক বংশ প্রতিষ্ঠা: সুলতান আলাউদ্দিন খলজির মৃত্যুর পর তার উত্তরসূরি হিসেবে শিহাবউদ্দিন ওমর (১৩১৬ খ্রি.), কুতুবউদ্দিন মুবারক শাহ (১৩১৬-১৩২০ খ্রি.) এবং নাসিরউদ্দিন খসরু (১৩২০ খ্রি.) পর্যায়ক্রমে খলজি বংশের সুলতান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এদের মধ্যে শেষোক্ত সুলতান নাসিরউদ্দিন খসরু শাহের কুশাসন বিশেষ করে তার মুসলিমবিদ্বেষী তৎপরতার সুযোগে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা গাজি মালিক এবং তার পুত্র জুনা খান সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। তুর্কি অভিজাতসহ খসরু শাহের বিরোধী আমির ওমরাহগণ তাদের সাথে যোগ দেয়। বিদ্রোহী নেতা গাজি মালিকের নির্দেশে খসরু শাহকে বন্দি ও হত্যা করা হয়। এ সময় খলজি বংশের আইনসম্মত কোনো উত্তরাধিকারী না থাকায় অভিজাত ও আমির-ওমরাহদের অনুরোধে ১৩২০ খ্রিষ্টাব্দের ৮ সেপ্টেম্বর গাজি মালিক 'সুলতান গিয়াস উদ্দিন তুঘলক গাজি শাহ' উপাধি ধারণ করে দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। এর মধ্য দিয়েই ভারতের দিল্লি সালতানাতের ইতিহাসে তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠা হয়।

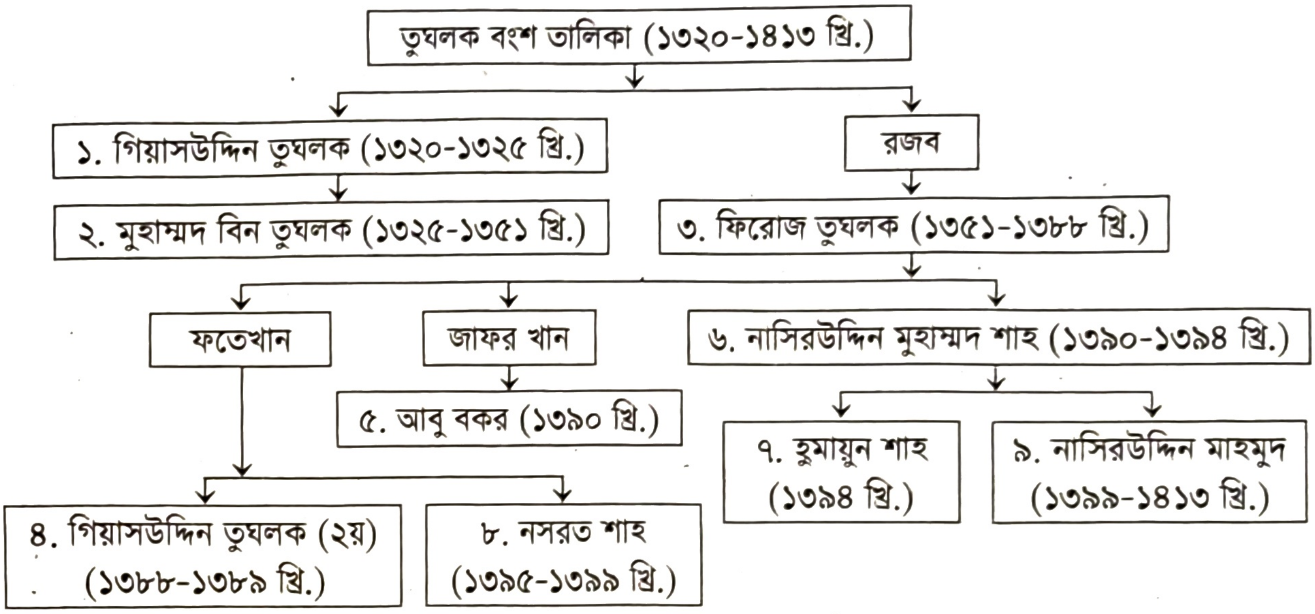
তুঘলক বংশ তালিকা (১৩২০-১৪১৩ খ্রি.)
১. গিয়াসউদ্দিন তুঘলক (১৩২০-১৩২৫ খ্রি.)
রজব
২. মুহাম্মদ বিন তুঘলক (১৩২৫-১৩৫১ খ্রি.)
৩. ফিরোজ তুঘলক (১৩৫১-১৩৮৮ খ্রি.)
ফতেখান
জাফর খান
৬. নাসিরউদ্দিন মুহাম্মদ শাহ (১৩৯০-১৩৯৪ খ্রি.)
৫. আবু বকর (১৩৯০ খ্রি.)
৭. হুমায়ুন শাহ (১৩৯৪ খ্রি.)
৯. নাসিরউদ্দিন মাহমুদ (১৩৯৯-১৪১৩ খ্রি.)
৪. গিয়াসউদ্দিন তুঘলক (২য়) (১৩৮৮-১৩৮৯ খ্রি.)
৮. নসরত শাহ (১৩৯৫-১৩৯৯ খ্রি.)

অভ্যন্তরীণ নীতি (Internal Policy)

অভিজাতদের সমর্থন আদায়: দিল্লি সালতানাতের এক সংকটময় পরিস্থিতিতে সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তবে তিনি কোনোরূপ বিচলিত না হয়ে অত্যন্ত কৌশল, বিজ্ঞতা ও দৃঢ়তার সাহায্যে রাজ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। তিনি দিল্লির গোলযোগ দমন করে অল্প সময়ের মধ্যেই সালতানাতের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। সুলতান আলাউদ্দিন খলজির আত্মীয়-পরিজন ও অনুগতদের যোগ্যতা অনুযায়ী উচ্চ রাজপদে নিয়োগ করা হয় এবং অনেকের জন্য প্রয়োজনীয় ভাতার ব্যবস্থা করা হয়। সুলতান খসরু শাহের রাজরোষে পড়ে চাকরিচ্যুতদেরও পুনর্বহাল করা হয়। পদমর্যাদাসম্পন্ন অভিজাতদের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়। সুলতানের নিজ আত্মীয়-পরিজনদেরও দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দানসহ নানা সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়। সুলতানের জ্যেষ্ঠপুত্র ফখরুদ্দিন জুনা খানকে 'উলুঘ খান' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করা হয়। এভাবে সুলতানের বিচক্ষণ ও উদারনীতির ফলে তুর্কি -অতুর্কি অভিজাতদের সমর্থন ও আনুকূল্য নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

প্রশাসনিক বিধি-ব্যবস্থা: সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক প্রশাসন ব্যবস্থারও পুনর্গঠন করেন। ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, “গিয়াসউদ্দিনের প্রশাসনের প্রধান নীতি ছিল ন্যায়পরায়ণতা ও নমনীয়তা।”[১৫] তিনি প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের সবার প্রতি সদাচরণ করার নির্দেশ দেন এবং কাজকর্মে অসাধুতা কঠোরভাবে বন্ধ করেন।

রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলার উদ্দেশ্যে সুলতান খসরু শাহের সময় তার অনুগ্রহভাজনদের অন্যায়ভাবে প্রদত্ত জায়গিরসমূহ বাতিল করে তা পুনরায় রাষ্ট্রীয় খাস ভূমিতে পরিণত করেন। তাছাড়া খসরু শাহ বিনা কারণে যাদেরকে রাষ্ট্রীয় অর্থ দিয়েছিলেন গিয়াসউদ্দিন তুঘলক তাদের অনেকের কাছ থেকে সে অর্থ ফিরিয়ে এনে রাজকোষে জমা করেন। তিনি রাজস্বব্যবস্থাও সংস্কার করেন। তিনি উৎপাদিত ফসলের দশভাগের এক ভাগ ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ করেন। রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে যথাসম্ভব উদার নীতি অবলম্বন করার জন্য রাজস্ব কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়। কৃষকদের কাছ থেকে গ্রাম প্রধানের অতিরিক্ত কর আদায় নিষিদ্ধ করা হয়। আদায়কৃত রাজস্ব যেন যথাযথভাবে রাজকোষে জমা হয় সুলতান তার ব্যবস্থা করেন। নিয়মিত হিসাব নিরীক্ষণেরও ব্যবস্থা করা হয়। রাষ্ট্রীয় খরচে খাল খনন ও পুনঃখননের মাধ্যমে সেচ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষক ও কৃষির উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হয়। পতিত জমি আবাদে কৃষকদের বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়। দুর্ভিক্ষের সময় করভার হ্রাস এবং কর প্রদানে অক্ষম কৃষকদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করা হয়। দস্যু-তস্করদের হাত থেকে কৃষক ও সাধারণ জনতাকে রক্ষার উদ্দেশ্যে দুর্গ নির্মাণ এবং পুলিশি ব্যবস্থা জোরদার করা হয়।

---

[১৫] "The administration of Ghiyas was based upon the principles of justice and moderation." -Ishwari Prasad, *A Short History of Muslim Rule in India, P-103*

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বাণিজ্য প্রসারের উদ্দেশ্যে সড়ক পথের উন্নতি বিধান করা হয়। তিনি ডাক ব্যবস্থা গতিশীল করেন। ডাক হরকরা বা ঘোড়ার মাধ্যমে ডাক পাঠানো হতো। তাছাড়া তিনি রাস্তায় দূরত্ব নির্দেশক স্মারক চিহ্ন স্থাপন করেন। সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক বিচার বিভাগেরও সংস্কার সাধন করেন। ঈশ্বরী প্রসাদ উল্লেখ করেছেন যে, "সুলতানের বিচার কার্য এতটা ভীতির সঞ্চার করে যে, সাম্রাজ্যের দূর-দূরাঞ্চলেও মানুষের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।" সুলতান গিয়াস উদ্দিন তুঘলক একজন সুদক্ষ সমরবিশারদ হিসেবে একটি সুশৃঙ্খল এবং সুদক্ষ সামরিক বাহিনী গঠন করেন। সৈনিকদের প্রতি সদয় আচরণ ও আকর্ষণীয় উচ্চ বেতন দিয়ে তাদের আনুগত্য বজায় রাখা হয়। তবে সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা রক্ষায় কঠোরতা প্রদর্শন করা হয়। উন্নত অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ ও সেনা শৃঙ্খলা রক্ষার মাধ্যমে সেনাবাহিনীর রণদক্ষতা নিশ্চিত করা হয়। সেনাবাহিনীর দুর্নীতিরোধে পরিদর্শক নিয়োগ, সৈন্যদের নিবন্ধন এবং অশ্ব চিহ্নিতকরণ 'দাগ' প্রথা বহাল রাখা হয়।

বৈদেশিক নীতি (Foreign Policy)

অভ্যন্তরীণ শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি গিয়াসউদ্দিন তুঘলক রাজ্য সম্প্রসারণেও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। নিচে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হলো:

বরঙ্গাল অভিযান: সুলতান আলাউদ্দিন খলজির সময় দাক্ষিণাত্যের কাকতীয় বংশের শাসনাধীন তেলিঙ্গানা রাজ্য দিল্লির অনুগত সামন্তরাজ্যে পরিণত হয়। কিন্তু তার মৃত্যুর পর দিল্লি সালতানাতের রাজনৈতিক দুর্বলতার সুযোগে তেলিঙ্গানার রাজা দ্বিতীয় প্রতাপরুদ্র দেব দিল্লির কর্তৃত্ব অস্বীকার করলে সুলতান গিয়াস উদ্দিন তুঘলক পুত্র জুনা খানকে তেলিঙ্গানার রাজধানী বরঙ্গাল অভিযানের নির্দেশ দেন। ১৩২১ খ্রিষ্টাব্দে জুনা খানের নেতৃত্বে প্রথম অভিযান ব্যর্থ হলেও পরের বছর তা সফল হয়। সুলতানি বাহিনীর তীব্র আক্রমণ প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়ে রাজা প্রতাপরুদ্র দেব শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণে বাধ্য হন। ফলে কাকতীয় বংশের প্রতিপত্তি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়। তেলিঙ্গানা রাজ্য সম্পূর্ণরূপে দিল্লির কর্তৃত্বাধীনে আসে। রাজধানী বরঙ্গালের নাম রাখা হয় সুলতানপুর।

মাদুরা ও উৎকল অভিযান: গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের সময় দিল্লি বাহিনী দাক্ষিণাত্যের মাদুরার পাণ্ডরাজ্য আক্রমণ করেছিল বলে জানা যায়। তাছাড়া তেলিঙ্গানা থেকে ফেরার পথে জুনা খান উড়িষ্যার উৎকল আক্রমণ করলে রাজা দ্বিতীয় ভানুদেব পরাজিত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করেন। পরাজিত রাজা ভানুদেব প্রভূত ধনরত্ন দিয়ে নিজেকে রক্ষা করেন। বিজয়ী উলুঘ খানকে দিল্লিতে সাদর অভ্যর্থনা এবং সাফল্যের জন্য পুরস্কৃত করা হয়।

মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহতকরণ: ১৩২৪ খ্রিষ্টাব্দে মোঙ্গলরা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে ভারত আক্রমণ করে। জুনা খানের নেতৃত্বে সুলতানি বাহিনী তাদের আক্রমণ প্রতিহত করে। মোঙ্গল বাহিনী পরাজিত হয় এবং গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের রাজত্বকালে মোঙ্গলরা আর ভারত আক্রমণ করেনি।

বাংলা অভিযান: সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবনের মৃত্যুর পর বাংলা দিল্লির অধীন থেকে মুক্ত হয়ে পড়ে। খলজি সুলতানরা বাংলায় অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিশেষ আগ্রহ দেখাননি। ১৩২২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করেন। তার মৃত্যুর পর সিংহাসনকে কেন্দ্র করে তার তিনপুত্র শিহাবউদ্দিন, গিয়াসউদ্দিন ও নাসিরউদ্দিনের মধ্যে বিরোধ বাঁধে। গিয়াসউদ্দিন তার ভাইদের পরাজিত করে সিংহাসন দখল করলে প্রতিদ্বন্দ্বী অপর ভাই নাসিরউদ্দিন তার বিরুদ্ধে দিল্লির সুলতানের সাহায্য কামনা করেন। এ অবস্থায় সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক নিজে বাংলা আক্রমণ করে বিদ্রোহী গিয়াসউদ্দিনকে পরাজিত করেন। ১৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে নাসিরউদ্দিনের ওপর বাংলার শাসনভার ন্যস্ত করে তিনি দিল্লি ফিরে যান। ফেরার পথে সুলতান ত্রিহুত আক্রমণ করেন। রাজা হরসিংহদেব পরাজিত হয়ে নেপালে পালিয়ে যান।

গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের মৃত্যু: বাংলা ও ত্রিহুত বিজয়ের পর সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের রাজধানী ফেরার উপলক্ষে পুত্র জুনা খান তার অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করেন। এ উপলক্ষে দিল্লির ৬ মাইল অদূরে আফগানপুরে একটি কাঠের তোরণ নির্মাণ করা হয়। হাতির পিঠে চড়ে সুলতান এ তোরণ অতিক্রমকালে এটি ধসে পড়ে এবং তার মৃত্যু হয় (১৩২৫ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে)। ইবনে বতুতা, নিজাম উদ্দিন, বাদাউনী, আবুল ফজল প্রমুখ তোরণ ধসের ঘটনার পেছনে সুলতানের পুত্র মুহাম্মদ জুনা খানের ষড়যন্ত্র ছিল বলে অভিযোগ করেন। ঐতিহাসিক ডব্লিউ হেইগ ও ঈশ্বরী প্রসাদ এ মত সমর্থন করেন। অন্যদিকে, জিয়াউদ্দিন বারানী, ইয়াহিয়া বিন আহমদ সরহিন্দ এর পেছনে জুনা খানের কোনো ভূমিকা ছিল না বলে মনে করেন। তাদের মতে, এটি নিছক একটি দুর্ঘটনা।

চরিত্র ও কৃতিত্ব মূল্যায়ন (Evaluation of Character and Achievements)

সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক ছিলেন উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী। ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন সরল প্রকৃতির ও আদর্শনিষ্ঠ। আড়ম্বরহীন ও উদার এ সুলতানকে পদমর্যাদার গৌরব ও অহংকার স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি ছিলেন শান্তিকামী ও নিষ্ঠাবান ধর্মানুরাগী। মুসলিম সমাজের উন্নতি বিধান তার জীবনব্রত হলেও তিনি পরধর্ম বিদ্বেষী ছিলেন না। ঈশ্বরী প্রসাদ যথার্থই বলেছেন, "যদি হিন্দুদের প্রতি কখনও দুর্ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তবে তার কারণ ছিল রাজনৈতিক, সংকীর্ণ গোঁড়ামি নয়।"

সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক ছিলেন একজন প্রবীণ সমরনায়ক। সিংহাসনে আরোহণের আগে ও পরে তিনি সমরনায়ক হিসেবে সমান পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছেন। তার তত্ত্বাবধানে দিল্লি বাহিনীর দক্ষতা ও শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং দাক্ষিণাত্য ও বাংলায় দিল্লির কর্তৃত্ব সম্প্রসারিত হয়।

একজন সফল শাসকের সবধরনের গুণাবলি সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের মধ্যে ছিল। রাজ্য শাসনের ব্যাপারে তিনি এমন একটি মধ্যমপন্থা অনুসরণ করেন, যা ছিল দৃঢ়তা ও সততার সুসমন্বয়। দিল্লি সালতানাতের সংকটজনক পরিস্থিতিতে তিনি এর শৃঙ্খলা ও সংহতি নিশ্চিত করেন। শাসনব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সংস্কার ও উন্নতি বিধান করে এতে নবজীবনের সঞ্চার করে সুলতানের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। গিয়াসউদ্দিন তুঘলক একজন প্রজাহিতৈষী সুলতান হিসেবে একটি বাস্তবসম্মত ও কৃষকবান্ধব ভূমিসংস্কার ও রাজস্বনীতি প্রণয়ন করেন। তার ভূমি ও রাজস্ব নীতি একদিকে ভূমিসংশ্লিষ্ট সবাইকে যেমন স্বাচ্ছন্দ্য দিতে সক্ষম হয়, তেমনি রাজকোষেরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটায়। বাণিজ্য প্রসার, যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি বিধান এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায়ও সুলতান সাফল্য লাভ করেছিলেন। সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি বিদ্বান ও জ্ঞানী-গুণীদের উদার পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। বিখ্যাত আমির খসরু তার সভাকবি ছিলেন। সুলতানের প্রশংসা করতে গিয়ে আমির খসরু বলেছেন, "বুদ্ধিদীপ্ত ও তথ্যপূর্ণ যুক্তি ছাড়া তিনি কখনও কিছু করেননি। তিনি তার মুকুটের নিচে হাজার পণ্ডিতের শিরোবস্ত্র ধারণ করতেন।" স্থাপত্যশিল্পের প্রতিও সুলতানের বিশেষ আগ্রহ ছিল। তুঘলকাবাদ দুর্গ ও শহর তার স্থাপত্য কীর্তির অনুপম নিদর্শন। তার সমাধিসৌধ মধ্যযুগের এক উৎকৃষ্ট শিল্পনিদর্শন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? *[সকল বোর্ড ২০১৭]*

২. দিল্লি সালতানাতে তুঘলক বংশের শাসনকাল কত ছিল?

৩. সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক ইতিহাসে কী নামে পরিচিত?

৪. সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের বাল্যনাম কী?

৫. 'উলুঘ খান' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করা হয় কাকে?

৬. কার নেতৃত্বে গিয়াসউদ্দিন তুঘলক মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করেন?

উত্তরের জন্য ১৩২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. তুঘলক বংশের শাসকদের নামের একটি তালিকা তৈরি করো।

২. সময় উল্লেখ করে সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের অভিযানগুলোর একটি ছক তৈরি করো।

পাঠ ২২

সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক: প্রাথমিক জীবন, সিংহাসনে আরোহণ এবং উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা প্রণয়ন (১৩২৫-১৩৫১ খ্রি.)

Sultan Muhammad Bin Tughlaq: Early Life, Ascend the Throne and Taking Ambitious Plans (1325-1351 AD)

প্রাথমিক জীবন ও সিংহাসনে আরোহণ (Early Life and Ascend the Throne)

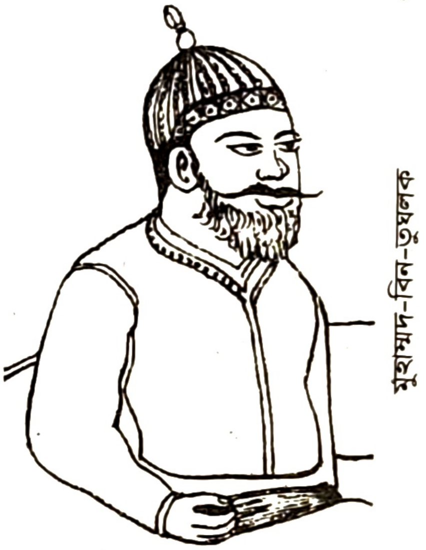

মুহাম্মদ বিন তুঘলকের প্রকৃত নাম ফখরুদ্দিন মুহাম্মদ জুনা খান। শৈশব থেকেই তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। তার পিতা সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক পুত্রের সাধারণ ও সামরিক শিক্ষার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করেন। পরিণত বয়সে তিনি একজন বহুমুখী প্রতিভাধর বিদ্বান ব্যক্তি হিসেবেও খ্যাতিলাভ করেন। সাহিত্য ছাড়াও তর্কশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, গণিত ও দর্শনশাস্ত্রে তিনি সমভাবে পারদর্শিতা অর্জন করেন। মুহাম্মদ জুনা খান কর্মজীবন শুরু করেন একজন সৈনিক হিসেবে। সুলতান নাসিরউদ্দিন খসরু শাহের সময় তিনি 'আমির-ই-আখুর' বা রাজকীয় অশ্বশালার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। খসরু শাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে তিনি তার পিতাকে সহায়তা করেন। পিতা সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের শাসনামলে তার প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। এ সময় তিনি দাক্ষিণাত্য অভিযানে নেতৃত্ব দেন। পুত্রের গুণে মুগ্ধ পিতা সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক তাকে উলুঘ খান উপাধিতে ভূষিত এবং সালতানাতের ভাবী উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন।

তোরণ দুর্ঘটনায় পিতা সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের মর্মান্তিক মৃত্যুর তিন দিন পর মুহাম্মদ জুনা খান 'সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক' নাম ধারণ করে তুঘলকাবাদে সিংহাসনে আরোহণ করেন। চল্লিশ দিন পর তুঘলকাবাদ থেকে রাজধানী দিল্লিতে ফিরে আসলে নগরবাসী তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। দিল্লির লাল প্রাসাদে জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে মুহাম্মদ বিন তুঘলকের অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়।

প্রাথমিক বিদ্রোহ ও সুলতানের পদক্ষেপ: মুহাম্মদ বিন তুঘলক দিল্লি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ায় কিছু আমির-ওমরাহ ও আত্মীয়-স্বজন সুলতানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহে লিপ্ত হয়। প্রথম বিদ্রোহটি করেন গুলবার্গের নিকটবর্তী সাগর অঞ্চলের গভর্নর ও সুলতানের চাচাতো ভাই বাহাউদ্দিন গুরসপ। ১৩২৭ খ্রিষ্টাব্দে তাকে পরাজিত করা হয় এবং তিনি পালিয়ে যান। কোনধানা (বর্তমান পুনার সিংঘর) অঞ্চলের হিন্দু সামন্ত প্রধান বিদ্রোহ করলে সুলতান তার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেন। বিদ্রোহী হিন্দু নেতা দিল্লির বশ্যতা স্বীকার করেন। মুলতান ও উচের গভর্নর বাহলুল কিসলু খান বিদ্রোহ ও স্বাধীনতা ঘোষণা করলে সুলতান তাকেও দমন করেন। সুলতানি বাহিনীর আক্রমণে বিদ্রোহী কিসলু খান নিহত হন।

মোঙ্গল আক্রমণ মোকাবিলা: ১৩২৮-১৩২৯ খ্রিষ্টাব্দে তারমাসিরিনের নেতৃত্বে মোঙ্গল বাহিনী উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আক্রমণ চালায় এবং মুলতান ও লাহোর অধিকার করে। তবে শেষ পর্যন্ত মুহাম্মদ বিন তুঘলক মোঙ্গলদের অগ্রযাত্রা মোকাবিলায় সফল হন। পরাজিত হয়ে মোঙ্গলরা ভারত ত্যাগে বাধ্য হয়।

সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনাসমূহ

Ambitious Plans of Sultan Muhammad Bin Tughlaq

সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাধর শাসক। স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের মতো তিনিও রাজত্বের শুরুতে রাজ্য শাসনে বিশেষ মনোনিবেশ করেন। তিনি রাজস্ব প্রশাসন উন্নয়নের জন্য নানাবিধ বিধিমালা জারি করেন। রাজস্বের সম্পূর্ণ তালিকা লিপিবদ্ধ এবং প্রদেশসমূহের ব্যয়ের হিসাব নথিভুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। পতিত ও অনাবাদি জমি চাষের আওতায় আনা এবং ভূমিহীনদের মধ্যে ভূমি বণ্টনের ব্যবস্থাপনা তত্ত্বাবধানের জন্য 'দিওয়ান-ই-কোহি' নামক কৃষি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ৬০ বর্গমাইল এলাকায় এক বিশাল রাষ্ট্রীয় কৃষি খামার তৈরি করা হয়।

মুহাম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী সুলতান। তিনি তার রাজত্বের প্রথম ভাগে পাঁচটি উচ্চাকাঙ্ক্ষামূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সুলতানের গৃহীত পরিকল্পনাগুলোর কারণ, যৌক্তিকতা, বাস্তবায়ন ও ব্যর্থতা পর্যালোচনা করে ঐতিহাসিকেরা মুহাম্মদ বিন তুঘলক সম্পর্কে পরস্পরবিরোধী মন্তব্যের মাধ্যমে তাকে ইতিহাসের এক চরম বিতর্কিত ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছেন। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন মুহাম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন কল্পনাবিলাসী, বাস্তবজ্ঞানহীন এক উন্মাদ শাসক। বারানীর মতে, সুলতান ছিলেন 'সৃষ্টির এক প্রকৃত বিস্ময়' (A varitable wonder of creation)। বাদাউনী তাকে 'বৈপরীত্যের সংমিশ্রণ' (A mixture of opposites) এবং লেনপুল, 'পরিকল্পনার ব্যক্তি' (Man of Ideas) বলে আখ্যা দিয়েছেন। মোরল্যান্ডের ভাষ্যমতে, সুলতান ছিলেন 'অসংগতির স্তূপ'। তবে মুহাম্মদ বিন তুঘলক সম্পর্কে এসব মূল্যায়ন ঐতিহাসিক বিবেচনাপ্রসূত এবং সুচিন্তিত নয় বলে আধুনিক গবেষকেরা মনে করেন। এরূপ বাস্তবতায় মুহাম্মদ বিন তুঘলককে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে হলে তার গৃহীত উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনাগুলো যথাযথরূপে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করতে হবে। বস্তুত সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের গৃহীত উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনার সংখ্যা ছিল পাঁচটি। প্রকৃতি (Nature) অনুযায়ী এ পাঁচটি পরিকল্পনাকে দু ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ক. শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা ও খ. রাজ্য বিস্তার পরিকল্পনা।

ক. **শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা:** মুহাম্মদ বিন তুঘলক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই নতুন কিছু শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। তিনি গতানুগতিক ধারায় শাসন পরিচালনায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তাই নতুন কিছু করে বিস্ময় সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। জনসাধারণের মধ্যে এ লক্ষ্যে তিনি তার প্রশাসনকে ঢেলে সাজান। তার শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে রাজধানী স্থানান্তর, প্রতীকী তাম্রমুদ্রার প্রচলন, দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধি।

খ. **রাজ্য বিস্তার পরিকল্পনা:** মুহাম্মদ বিন তুঘলক শুধু প্রশাসনিক বিস্ময় সৃষ্টি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন না। তিনি তার সাম্রাজ্যের সীমানাও বৃদ্ধি করতে চেয়েছিলেন। এ লক্ষ্যে তিনি খোরাসান এবং কারাচিল অভিযানের পরিকল্পনা করেন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের শাসনামলে দাক্ষিণাত্য অভিযানে নেতৃত্ব দেন কে?
২. কোথায় জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে মুহাম্মদ বিন তুঘলকের অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়?
৩. মুহাম্মদ বিন তুঘলক কী নামে কৃষি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন?
৪. মুহাম্মদ বিন তুঘলকের সময় কত বর্গমাইল এলাকায় রাষ্ট্রীয় কৃষি খামার তৈরি করা হয়?
৫. সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক কয়টি উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন?
৬. মুহম্মদ বিন তুঘলকের কারাচিল অভিযান কোন পরিকল্পনার অংশ ছিল? *[রাবি ২০১১-১২]*

উত্তরের জন্য ১৩২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের প্রাথমিক জীবন ও সমস্যা নিয়ে একটি তালিকা তৈরি করো।
২. সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা প্রণয়নের পাঁচটি কারণ লেখো।

পাঠ ২৩

সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা
Administrative Plan of Sultan Muhammad Bin Tughlaq

প্রশাসনব্যবস্থাকে নতুনভাবে সাজানোর জন্য সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক তিনটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। নিচে এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো—

১. রাজধানী স্থানান্তর (১৩২৬-১৩২৭ খ্রি.): মুহাম্মদ বিন তুঘলকের উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক পদক্ষেপ ছিল দিল্লি থেকে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর। সুলতান ১৩২৬-২৭ খ্রিষ্টাব্দে এ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

রাজধানী স্থানান্তরের উদ্দেশ্য: সুলতানের রাজধানী স্থানান্তরের পেছনে কতকগুলো যৌক্তিক উদ্দেশ্য ছিল। যথা - **প্রথমত,** বারানীর মতে, দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরের অন্যতম কারণ ছিল এর ভৌগোলিক অবস্থান ও গুরুত্ব। বস্তুত দেবগিরি বিশাল দিল্লি সালতানাতের কেন্দ্রভূমিতে অবস্থিত ছিল। তাই কৌশলগত সুবিধা ছাড়াও প্রশাসনিক সুবিধার্থে কেন্দ্রভূমিতে রাজধানী স্থাপন অধিক যৌক্তিক বলে সুলতান মনে করেছিলেন। তাছাড়া দাক্ষিণাত্যের ওপর নজরদারি বহাল রাখার জন্যও দেবগিরি ছিল দিল্লি অপেক্ষা উপযুক্ত স্থান।

দ্বিতীয়ত, মোঙ্গল আক্রমণের পটভূমিতে দিল্লি অপেক্ষা দেবগিরি ছিল অনেক বেশি নিরাপদ।

তৃতীয়ত, দাক্ষিণাত্যের ধনৈশ্বর্য নিয়ন্ত্রণ ও সদ্ব্যবহারের উদ্দেশ্যে দেবগিরিতে রাজধানী স্থাপন অধিক সমীচীন বলে সুলতান মনে করেছিলেন।

চতুর্থত, আগা মাহদী হোসাইনের মতে, সুলতান দেবগিরিকে ইসলামি কৃষ্টির প্রাণকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। এজন্য তিনি সেখানে রাজধানী স্থানান্তরের পরিকল্পনা নেন।

পঞ্চমত, সুলতানের কাজকর্মের সমালোচক ও অবাধ্য দিল্লিবাসী সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে সুলতান রাজধানী স্থানান্তরের পরিকল্পনা নেন বলে মরক্কোর পর্যটক ইবনে বতুতা মনে করেন।

দেবগিরিতে গমন: প্রথমত, দেবগিরিকে রাজধানী হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করার পর সুলতান তার পরিবার-পরিজন, আমির-ওমরাহ, অভিজাত ব্যক্তিবর্গ এবং দিল্লির জনগণসহ দেবগিরিতে গমন করেন। দেবগিরির নতুন নামকরণ হয় দৌলতাবাদ। ইবনে বতুতার বর্ণনা মতে, সুলতানের নির্দেশের ফলে দিল্লি মরুভূমিতে পরিণত হয়েছিল। বারানীর মতে, সুলতান দিল্লিকে ধ্বংস ও জনমানবশূন্য করে সবাই দেবগিরিতে নিয়ে যান। ইবনে বতুতা উল্লেখ করেন, সুলতানের আদেশ পালনে অন্ধ ও খোঁড়া ব্যক্তিকেও বাধ্য করা হয়েছিল। আধুনিক ঐতিহাসিকেরা ইবনে বতুতা ও বারানীর এসব মন্তব্যকে অতিরঞ্জিত ও অতিশয়োক্তি বলে মনে করেন। তাদের মতে, এসব মন্তব্যের কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। অনেকে মনে করেন সুলতানের সাথে ব্যক্তিগত বিরোধের কারণেই ইবনে বতুতা এরূপ ভিত্তিহীন মন্তব্য করেছেন। তাছাড়া তার বক্তব্য পরস্পরবিরোধী। ১৩৩৪ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লি ভ্রমণ করে তিনি একে ধনৈশ্বর্য ও লোকবসতিতে পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ নগরী রূপে অবহিত করেছেন। ১৩২৬-১৩২৭ খ্রিষ্টাব্দে রাজধানী স্থানান্তরের মাধ্যমে দিল্লিকে ধ্বংস ও জনমানবশূন্য করা হলে ১৩৩৪ খ্রিষ্টাব্দে ইবনে বতুতা দিল্লিকে একটি সমৃদ্ধ নগরী হিসেবে দেখতে পেতেন না। **দ্বিতীয়ত,** ১৩২৯ খ্রিষ্টাব্দে বাহরাম কিসলু খান বিদ্রোহ করলে সুলতান তাকে দমনের উদ্দেশ্যে দিল্লি থেকে একটি শক্তিশালী বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। দিল্লি জনমানবহীন হলে তা সম্ভব হতো না। তাছাড়া দিল্লি যে মরুভূমিতে পরিণত হয়নি, এমনকি রাজধানীর মর্যাদা হারায়নি ১৩২৭ ও ১৩২৮ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লিতে প্রাপ্ত দুটি সংস্কৃত শিলালিপি থেকেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

দিল্লি প্রত্যাবর্তন: মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজধানী স্থানান্তর পরিকল্পনাটি সফল হয়নি, কারণ দিল্লি থেকে দেবগিরির দূরত্ব ছিল ৭০০ মাইল। দীর্ঘ পথযাত্রা, পথশ্রান্ত ও মানসিক অবসাদের কারণে অভিযাত্রীদের অনেকেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। কেউ কেউ পথে এবং অনেকে দৌলতাবাদে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। যারা বেঁচে ছিলেন তারাও দৌলতাবাদের বিরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশে খাপ-খাওয়াতে না পেরে দিল্লিতে ফিরে আসতে অধৈর্য হয়ে ওঠেন। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অনেকেই দিল্লিতে ফিরে আসার জন্য সুলতানের ওপর চাপ সৃষ্টি করেন। এ সময় উত্তর ভারতেও বিদ্রোহ ও অরাজকতা বিস্তার লাভ করে। সর্বোপরি উত্তর-পশ্চিম দিক হতে মোঙ্গল আক্রমণ দিল্লি সালতানাতের নিরাপত্তাকে হুমকির সম্মুখীন করে তোলে। এ অবস্থায় ৮ বছর দৌলতাবাদ অবস্থানের পর সুলতান সবাইকে পুনরায় দিল্লি ফেরার নির্দেশ দেন।

পরিকল্পনার মূল্যায়ন: মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজধানী স্থানান্তর পরিকল্পনাকে অনেকে এক স্বৈরাচারী শাসকের নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত নিস্ফল কাজ, কেউ কেউ 'অসাবধানী পরিকল্পনা' (Careless project) বলে অভিহিত করেছেন। লেনপুলের মতে, "দৌলতাবাদ ছিল ভ্রান্তপথে পরিচালিত উদ্যমের কীর্তিস্তম্ভ" (Daulatabad was a management of misdirected energy)। নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে ঐতিহাসিকদের উপরের মন্তব্য যুক্তিসংগত বলে মনে হয় না। সুলতানের রাজধানী স্থানান্তরের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল মহৎ, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং সাম্রাজ্যের জন্য মঙ্গলজনক। তবে এ কথা সত্য যে, সুলতানের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পদ্ধতি ছিল ত্রুটিপূর্ণ। সুলতান যদি কেবল তার দরবার ও প্রশাসনিক দপ্তর স্থানান্তর করে ক্ষান্ত হতেন, তবে পরিকল্পনাটি সংগত ও বাস্তবে পরিণত হতো। কিন্তু তা না করায় মহৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হওয়া সত্ত্বেও পরিকল্পনাটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অবশ্য এ পরিকল্পনার কিছু পরোক্ষ ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব ইতিহাসে লক্ষ করা যায়। বস্তুত এর ফলে উত্তর ভারতের সাথে দাক্ষিণাত্যের সংযোগসূত্র জোরালো হয়। তাছাড়া দাক্ষিণাত্যে তুর্কি সংস্কৃতি, মুসলিম ধর্মীয় ও সামাজিক ভাবধারা বিস্তারলাভ করে।

২. প্রতীকী তাম্রমুদ্রা প্রবর্তন (১৩২৯-১৩৩০ খ্রি.): প্রতীকী তাম্রমুদ্রা প্রবর্তন 'মুদ্রা প্রবর্তকদের রাজা' (Prince of Moneyers) বলে খ্যাত সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালের উল্লেখযোগ্য ও অভিনব একটি পদক্ষেপ। ১৩২৯-১৩৩০ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান প্রচলিত সোনা ও রুপার মুদ্রার পরিবর্তে তামারমুদ্রা প্রবর্তন করেন।

তাম্রমুদ্রা প্রবর্তনের উদ্দেশ্য: তাম্রমুদ্রা চালু ছিল সুলতানের একটি পরীক্ষামূলক পদক্ষেপ। ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, "সুলতান ছিলেন প্রতিভাসম্পন্ন, তিনি সৃজনশীল ও পরীক্ষামূলক পরিকল্পনা গ্রহণে আনন্দ পেতেন।" অনেকে মনে করেন চীনের মোঙ্গল সম্রাট কুবলাই খান এবং পারস্যের গাইকাতু খানের প্রতীকী কাগজি মুদ্রার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সুলতান প্রতীকী তাম্রমুদ্রা প্রচলন করেছিলেন। তবে কেবল নতুনত্ব ও বৈচিত্র্যের আনন্দে সুলতান প্রতীকী তাম্রমুদ্রার প্রবর্তন করেন বলে মনে হয় না বরং এর পেছনে সুলতানের বেশকিছু সংকট মোকাবিলার উদ্দেশ্য ছিল। যথা—

প্রথমত, ঐতিহাসিক বাদাউনি, ইয়াহিয়া ও ফিরিশতা প্রমুখের মতে, সুলতানের বদান্যতা, রাজধানী স্থানান্তর পরিকল্পনার ব্যর্থতা, বিদ্রোহ দমন ও বিজয়াভিযান পরিচালনা, বিশাল সেনাবাহিনী গঠন ও পরিপোষণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্ভিক্ষ মোকাবিলা ইত্যাদি কারণে বিপুল অর্থ ব্যয়ের ফলে রাজকোষে অর্থঘাটতি দেখা দেয়। রাজকোষের অর্থাভাব দূর করার জন্য মুহাম্মদ বিন তুঘলক প্রতীকী তাম্রমুদ্রা প্রবর্তন করেন।

দ্বিতীয়ত, চতুর্দশ শতকে ভারতে রুপার অভাব ছিল এবং এ কারণে সুলতান প্রতীকী তাম্রমুদ্রার প্রচলন করেন বলে গার্ডনার ব্রাউন মনে করেন।

তৃতীয়ত, তদুপরি ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি এবং লেনদেন ও বিনিময় সহজলভ্য করার বিষয়টিও সুলতানের প্রতীকী তাম্রমুদ্রা প্রচলনের কারণ ছিল।

প্রতীকী তাম্রমুদ্রা প্রচলন ও প্রতিক্রিয়া: প্রতীকী তাম্রমুদ্রা প্রচলনের ক্ষেত্রে সুলতান বেশকিছু পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তবে এর প্রতি জনগণের আস্থা ছিল না বললেই চলে।

প্রথমত, সুলতান সোনা ও রুপার মুদ্রার মতো তামার মুদ্রাকেও বিনিয়োগ প্রতীকী মুদ্রা বলে ঘোষণা করেন। সন্দেহ নেই পরিকল্পনা হিসেবে সুলতানের এ পদক্ষেপ তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচায়ক। তবে তার মুদ্রানীতি কার্যকর করার বিষয়টি ছিল ত্রুটিযুক্ত। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, সুলতানের এ পরিকল্পনাটি যুগের অগ্রগামী ছিল এবং জনগণ এর প্রকৃত গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেনি। (It was in advance of the time and the people could not realise its real importance.) রক্ষণশীল জনগণ একে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি। কেননা বারানীর মতে, 'তখনকার লোকের কাছে' পিতল ছিল পিতল এবং তামা ছিল তামাই।' বিদেশি বণিকরাও সুলতানের প্রবর্তিত তাম্রমুদ্রা গ্রহণে অসম্মতি জানায়।

দ্বিতীয়ত, তাম্রমুদ্রা প্রচলনে প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় মুদ্রা ব্যাপকভাবে জাল হতে থাকে। বারানীর মতে, 'প্রত্যেক হিন্দুগৃহ জালমুদ্রা তৈরির কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়।' (The house of every Hindu became a mint.) মুদ্রার জাল নিরোধে সরকারি পদক্ষেপ না থাকায় অসাধু ব্যক্তিরা অসংখ্য জাল মুদ্রা তৈরি করে বাজারে ছাড়ে। ফলে সুলতানের তাম্রমুদ্রা প্রচলন পদক্ষেপ ব্যর্থ হয়ে পড়ে।

তৃতীয়ত, শাসনব্যবস্থার অস্থিতিশীলতা এবং জনগণের আস্থার অভাবও মুদ্রানীতি ব্যর্থতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

প্রতীকী তাম্রমুদ্রা প্রচলনের ফলাফল: প্রতীকী তাম্রমুদ্রা প্রবর্তনের ফলাফল ছিল মারাত্মক। এ ব্যবস্থায় মুদ্রার মান কমে যায় এবং মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। জনগণ জাল মুদ্রায় রাজস্ব পরিশোধ করায় রাষ্ট্র আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাহত হয়। সোনা ও রুপার অভাব দেখা দেয়। এসব কারণে দেশে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে মুহাম্মদ বিন তুঘলক প্রতীকী তাম্রমুদ্রা বাতিল করেন এবং বাজারের সব আসল ও নকল তাম্রমুদ্রার বিনিময়ে রাজকোষ থেকে রৌপ্যমুদ্রা প্রদানের ব্যবস্থা করেন। এর ফলেও রাষ্ট্রের প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হয়।

৩. দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধি: গঙ্গা ও যমুনা নদীর মধ্যবর্তী উর্বর অঞ্চল দোয়াব নামে পরিচিত। দিল্লি সালতানাতের 'শস্যভাণ্ডার' নামে খ্যাত এ দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধি ছিল মুহাম্মদ বিন তুঘলকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পরিকল্পনা। ১৩৩৪ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান কর বৃদ্ধির আদেশ জারি করেন।

কর বৃদ্ধির কারণ: বাদাউনীর মতে, দোয়াব অঞ্চলে বিত্তশালী কৃষকদের বিদ্রোহী মনোভাব দমন এবং তাদের ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে সুলতান দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধি করেন। আগা মাহদী হোসাইনসহ অনেক পণ্ডিত মনে করেন, সুলতানের প্রশাসনিক ও সামরিক উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনাসমূহের ব্যর্থতার ফলে সাম্রাজ্যের অর্থনীতিতে যে বিপর্যয় দেখা দেয় তা মোকাবিলার উদ্দেশ্যে দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধি করা হয়। উইলিয়াম হেগসহ আধুনিক ইতিহাসবিদদের কেউ কেউ মনে করেন, সামরিক শক্তি বৃদ্ধি এবং শাসনব্যবস্থাকে সুগঠিত ও কার্যক্ষম করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের উদ্দেশ্যে সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধি করেন।

কর বৃদ্ধির পরিমাণ: সমসাময়িক ও পরবর্তী ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য থাকায় দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধি সঠিক হারে নির্ধারণ কঠিন ব্যাপার। আধুনিক গবেষকদের মতে, দোয়াব অঞ্চলে ধার্যকৃত করের পরিমাণ ৫০%-এর বেশি ছিল না।

প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল: দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধির ফলে কৃষকদের দুর্দশা বৃদ্ধি পায়। বারানীর মতে, 'কৃষকদের মেরুদণ্ড ভেঙে যায়।' তিনি বলেন, সুলতানের উৎপীড়নে রায়তরা ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। সুলতান দোয়াবে বিভীষিকা ও ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেন। বারানীর মন্তব্যকে সঠিক বলে মনে হয় না। কারণ এ সময় দোয়াবে কৃষকদের যে দুরবস্থা হয়েছিল তা রাজস্ব বৃদ্ধিজনিত কারণে নয়। বস্তুত এ সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এতে জনদুর্ভোগ চরম আকার ধারণ করে। আর ঠিক এ সময়ই বর্ধিত হারে রাজস্ব আরোপের ফলে কৃষকেরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তারা বিদ্রোহ করে এবং অনেকে নিজ খামারের শস্য পুড়িয়ে ফেলে ও কৃষিকাজ ত্যাগ করে বনে-জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। জীবন ধারণের প্রয়োজনে অনেকে দস্যুতার পথ বেছে নেয়। সুলতানের কর বৃদ্ধির পরিকল্পনাটি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সংকট মোকাবিলায় মুহাম্মদ বিন তুঘলক মুক্ত হস্তে সাহায্য দিয়ে দোয়াবের কৃষকদের রক্ষার চেষ্টা করেন। তাঁদের বীজ, হালের জন্য বলদ এবং সেচের জন্য কূপ খনন করে দেওয়া হয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর করেন কে? *[রাবি ২০১০-১১]*
২. দিল্লি থেকে দেবগিরির দূরত্ব কত ছিল?
৩. সোনা ও রুপা মুদ্রার পরিবর্তে প্রতীকী তামার মুদ্রা প্রচলন করেন কে? *[রাবি ২০১৬-১৭]*
৪. গঙ্গা ও যমুনা নদীর মধ্যবর্তী উর্বর অঞ্চল কী নামে পরিচিত?
৫. কোন অঞ্চল দিল্লি সালতানাতের 'শস্যভাণ্ডার' নামে খ্যাত?
৬. দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধি করেন কে?

উত্তরের জন্য ১৩২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

সময় উল্লেখ করে সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনাগুলোর একটি তালিকা তৈরি করো।

পাঠ ২৪

সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজ্য বিস্তার পরিকল্পনা এবং পরিকল্পনা ব্যর্থতার কারণ ও এর প্রতিক্রিয়া (Plan of Expansion of the Empire of Sultan Muhammad Bin Tughlaq and Causes of Failure of Plans and Its Reactions)

রাজ্য বিস্তার পরিকল্পনা (Plan of Expansion of the Empire)

সুলতান আলাউদ্দিন খলজির মতো মুহাম্মদ বিন তুঘলকও বিশ্বজয়ের উচ্চাশা পোষণ করতেন। এ লক্ষ্যে তিনি রাজ্য বিস্তারের দুটি মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেন। যথা:

১. **খোরাসান অভিযান পরিকল্পনা (১৩২৭-১৩২৮ খ্রি.):** পারস্যের তৎকালীন ইলখানি শাসক আবু সাঈদের দুর্বল শাসনে সেখানে বিশৃঙ্খলা ও অরাজক পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল। এ অবস্থায় সুলতানের দরবারে আশ্রয়প্রাপ্ত কিছু খোরাসানি আমির সুলতানকে খোরাসান আক্রমণে উদ্বুদ্ধ করেন। মিসরের মামলুক সুলতান আল নাসির এবং ট্রান্সঅক্সিয়ানার মোঙ্গল শাসক তারমাশিরিন আবু সাঈদের বিরুদ্ধে অভিযানে সুলতানকে প্রয়োজনীয় সহায়তার আশ্বাস দেন। তাছাড়া খোরাসানের আর্থিক সমৃদ্ধি ও ধনৈশ্বর্য লাভের হাতছানি সুলতানকে এ অভিযান পরিকল্পনা গ্রহণে প্রলুব্ধ করেছিল বলে মনে হয়।

   খোরাসান অভিযান পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সুলতান ৩,৭০,০০০ সৈন্যের এক বিশাল সেনাবাহিনী গঠন করেন। পূর্ণ এক বছর ধরে সৈন্যদের বেতন-ভাতাদি দেওয়া হয়। তবে শেষ পর্যন্ত সুলতান অভিযান পরিকল্পনা বাতিল করেন। কেননা এ সময় মধ্য এশিয়ায় রাজনৈতিক পটপরিবর্তন, ট্রান্সঅক্সিয়ানার তারমাশিরিনের ক্ষমতাচ্যুতি এবং মিসরের সুলতান নাসির ও পারস্য সম্রাট সাঈদের মধ্যে মৈত্রী সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়ায় সুলতান তার অভিযানের সাফল্য সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়েছিলেন। তাছাড়া ভারত ও খোরাসানের মধ্যকার দীর্ঘ পথে প্রাকৃতিক বাধাও সুলতানকে অভিযান পরিচালনায় নিরুৎসাহিত করেছিল। তাই সুলতান অভিযান পরিকল্পনা বাতিল করেন। সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের খোরাসান বিজয় পরিকল্পনা বাতিল হওয়ায় সুলতানের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়; রাজ্যের অযথা অনেক অর্থ ব্যয় হয়। লোক কর্মহীন হয়ে পড়ে।

২. **কারাচিল অভিযান পরিকল্পনা (১৩৩২-১৩৩৩ খ্রি.):** সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের চতুর্থ উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা ছিল কারাচিল অভিযান (কারাজল বা কুর্মাচল নামেও পরিচিত)। অবশ্য ঐতিহাসিক ফিরিশতা সুলতান চীন বিজয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন। জিয়াউদ্দিন বারানী ও ইবনে বতুতার বর্ণনা মতে, চীনের বিরুদ্ধে নয় বরং চীন ও হিন্দুস্থানের মধ্যবর্তী হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত কারাচিলের হিন্দু রাজ্যের বিরুদ্ধে সুলতান অভিযান প্রেরণ করেছিলেন। আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে, সাম্রাজ্যের উত্তর সীমান্তের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে মুহাম্মদ বিন তুঘলক কারাচিল অভিযানের পরিকল্পনা করেছিলেন। কারাচিল ছিল একটি শক্তিশালী হিন্দু রাজ্য। দিল্লি সালতানাতের সীমান্ত অঞ্চলে এরূপ শক্তিশালী হিন্দু রাজ্যের উপস্থিতি সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য ছিল হুমকিস্বরূপ। এ হুমকি নিরসনে সুলতান ১৩৩২-১৩৩৩ খ্রিষ্টাব্দে তার ভাইপো খসরু মালিকের নেতৃত্বে কারাচিলে অভিযান প্রেরণ করেন। খসরু মালিকের নেতৃত্বাধীন সুলতানি বাহিনী শত্রুপক্ষের বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি দখল করতেও সক্ষম হন। তবে এরপর সেনাপতির হঠকারিতা, পার্বত্য অঞ্চলের প্রাকৃতিক বাধা এবং আকস্মিক প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে সুলতানের বাহিনী বিপর্যস্ত ও ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সুলতান পার্বত্য সর্দারদের আনুগত্য ও করদানের স্বীকৃতি আদায় করে অভিযানের সমাপ্তি টানেন। জিয়াউদ্দিন বারানী কারাচিল অভিযানকে সুলতানের অন্যতম অপকর্ম এবং ফিরিশতা এটিকে সুলতানের পাগলামি বলে অভিহিত করেছেন। তবে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে এসব বক্তব্য গ্রহণ করা যায় না। বস্তুত সাম্রাজ্যের উত্তর সীমান্ত সুরক্ষায় সুলতানের গৃহীত ব্যবস্থা তার প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টি প্রকাশ করে।

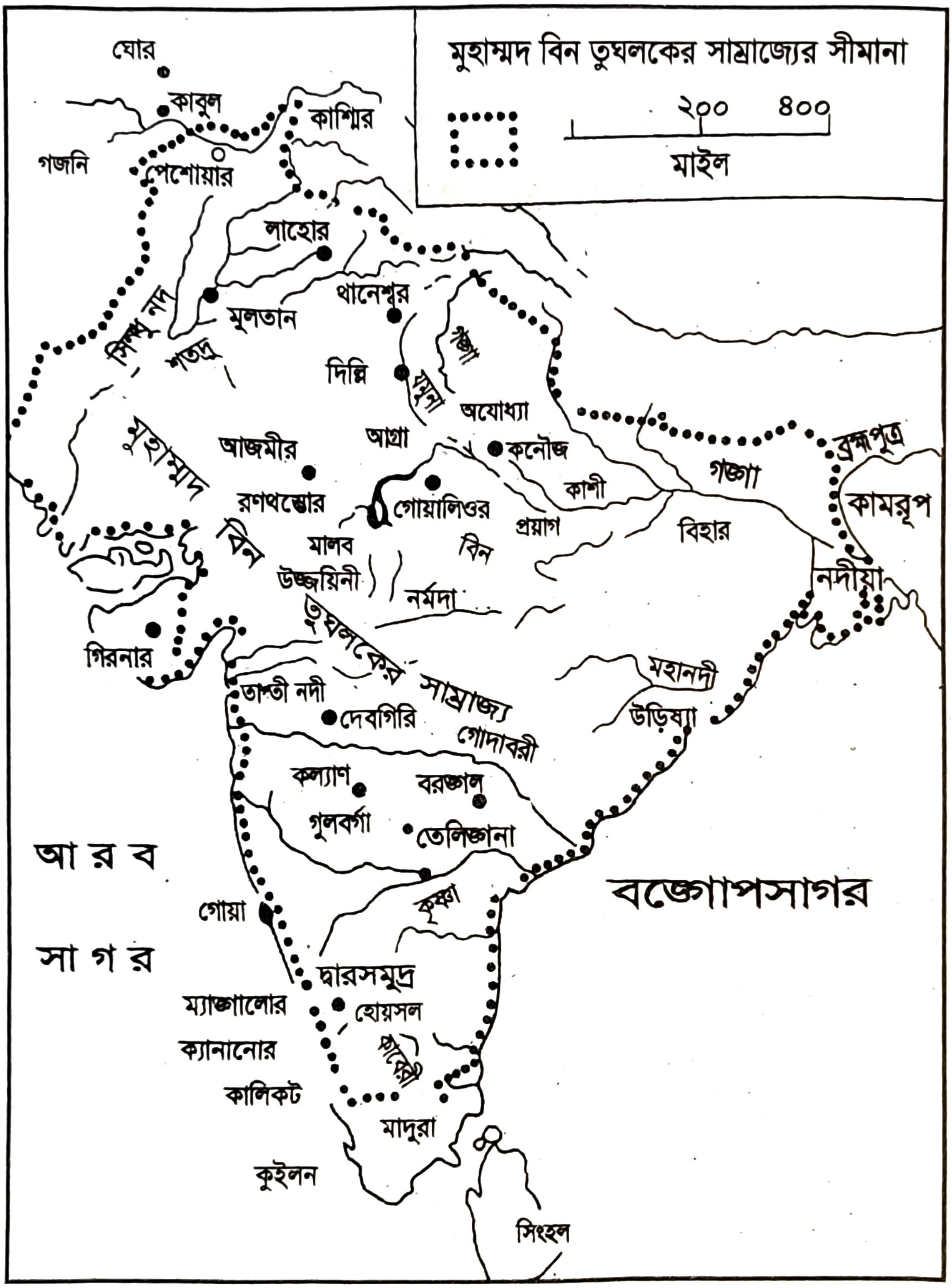
মুহাম্মদ বিন তুঘলকের সাম্রাজ্যের সীমানা
২০০ ৪০০
মাইল
ঘোর
কাবুল
কাশ্মির
গজনি
পেশোয়ার
লাহোর
মুলতান
সিন্ধু নদ
শতদ্রু
থানেশ্বর
দিল্লি
গঙ্গা
যমুনা
অযোধ্যা
আজমীর
আগ্রা
কনৌজ
কাশী
মুহাম্মদ বিন তুঘলকের সাম্রাজ্য
রণথম্ভোর
গোয়ালিওর
প্রয়াগ
বিহার
মালব
উজ্জয়িনী
নর্মদা
গঙ্গা
ব্রহ্মপুত্র
কামরূপ
নদীয়া
গিরনার
তাপ্তী নদী
দেবগিরি
গোদাবরী
মহানদী
উড়িষ্যা
কল্যাণ
বরঙ্গাল
গুলবর্গা
তেলিঙ্গানা
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
গোয়া
কৃষ্ণা
দ্বারসমুদ্র
ম্যাঙ্গালোর
হোয়সল
ক্যানানোর
কাবেরী
কালিকট
মাদুরা
কুইলন
সিংহল

মুহাম্মদ বিন তুঘলকের সাম্রাজ্য

মুহাম্মদ বিন তুঘলকের পরিকল্পনাসমূহের ব্যর্থতার কারণ

Causes of Failure of Muhammad Bin Tughlaq's Plans

মুহাম্মদ বিন তুঘলকের গৃহীত পরিকল্পনাসমূহের ব্যর্থতার কারণ ঐতিহাসিকেরা নানাভাবে মূল্যায়ন করেছেন। তাদের মতে, সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন একজন উন্মাদ এবং তার চরিত্রে ভারসাম্য ও মাত্রাজ্ঞানের অভাব ছিল। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নতুনত্বের আনন্দে তিনি নতুন নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তবে নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে এসব অভিযোগ সত্য বলে মনে হয় না। মুহাম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন যুগের বিস্ময়। তিনি অবাস্তব কল্পনাবিলাসী বা উন্মাদ ছিলেন না। তার

মধ্যে ভারসাম্য, ধৈর্য ও মাত্রা জ্ঞানেরও যে অভাব ছিল না একথা ব্রিটিশ ঐতিহাসিক গার্ডনার ব্রাউন স্পষ্ট করেই বলেছেন। ঐতিহাসিক লেনপুলের মতে, "বিশাল ভারতীয় সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থায় তিনি অনন্যসাধারণ ক্ষমতা ও ধীশক্তির পরিচয় দিলেও তার মহান পরিকল্পনাগুলো বিস্ময়করভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।" তিনি আরও বলেন, সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সামঞ্জস্যের অভাবে মুহাম্মদ বিন তুঘলক ব্যর্থ হন।"

উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনাসমূহের প্রতিক্রিয়ায় বিভিন্ন প্রদেশে বিদ্রোহ

The Revolts in Different Province as the Reactions of Ambitious Plans

সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনাসমূহের ব্যর্থতার প্রেক্ষাপটে সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক শক্তি বিনষ্ট হয়। সুলতান প্রজা সাধারণের কাছে অপ্রিয় হয়ে ওঠেন। এ সময় রক্ষণশীল মুসলিম নেতা ও উলেমারা সুলতানের বিরোধিতা করতে থাকে। উল্লেখ্য যে, মুহাম্মদ বিন তুঘলকের ব্যক্তিগত উদারতা ও ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা, শরিয়ত বা ধর্মীয় অনুশাসনের বদলে যুক্তি দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনার উদ্যোগ, রাষ্ট্রশাসন ব্যাপারে উলেমাদের অযাচিত হস্তক্ষেপ রোধ, নিজেকে আল্লাহর প্রতিনিধি (আল সুলতান জিল্লা আল্লাহ) বিবেচনা এবং খলিফার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন না করা ইত্যাদি কারণে উলেমা সম্প্রদায় তার প্রতি বিশেষ ক্ষুব্ধ ছিল। ১৩৩৫ সাল থেকে সুলতানের বিরুদ্ধে বেশ কিছু বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এর মধ্যে মেবারের বিদ্রোহ ছিল অন্যতম। ১৩৩৫ খ্রিষ্টাব্দে সৈয়দ জালাল উদ্দিন আহসান দক্ষিণ ভারতের উপকূলীয় রাজ্য মেবারে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। লাহোরের গভর্নর আমির খলজি এবং দৌলতাবাদের গভর্নরের পুত্র মালিক হুসামও বিদ্রোহ করেন। ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দে সোনারগাঁয়ের ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ফলে বাংলা দিল্লি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অযোধ্যা, কারা, বিদর, গুলবার্গ, মুলতান, সুনাম ও সামানা অঞ্চলেও সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়।

বিজয়নগর ও বাহমনি রাজ্যের অভ্যুদয়: এ সময় দক্ষিণ ভারতেও গোলযোগ দেখা দেয়। ১৩৩৬ খ্রিষ্টাব্দে হিন্দু নেতা হরিহর দাক্ষিণাত্যে বিজয় নগর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩৪৪ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে কৃষ্ণ নায়েকের নেতৃত্বে হিন্দু সামন্ত নরপতিদের প্রচেষ্টায় বরঙ্গাল, দ্বারসমুদ্র এবং হোয়াসল রাজ্যে মুসলিম আধিপত্য লোপ এবং হিন্দু প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। ১৩৪৭ খ্রিষ্টাব্দে দৌলতাবাদের অভিজাতরা আবু মোজাফফর আলাউদ্দিন বাহমান শাহের নেতৃত্বে স্বাধীন বাহমানি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. খোরাসান অভিযান পরিকল্পনায় মুহাম্মদ বিন তুঘলক কত জন সৈন্যের সেনাবাহিনী গঠন করেন?
২. সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের চতুর্থ উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা ছিল কোনটি?
৩. কারাচিল কোথায় অবস্থিত?
৪. সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক কত খ্রিষ্টাব্দে কারাচিলে অভিযান চালান?
৫. বাংলায় স্বাধীন সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠা করেন কে? */জবি ২০১১-১২/*
৬. কত খ্রিষ্টাব্দে ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন?

উত্তরের জন্য ১৩২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

ছক আকারে মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজ্য বিস্তার পরিকল্পনাগুলোর নাম লেখো এবং তার এসব পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করো।

পাঠ ২৫

মুহাম্মদ বিন তুঘলকের চরিত্র ও কৃতিত্ব
Character and Achievements of Muhammad Bin Tughlaq

মুহাম্মদ বিন তুঘলক ১৩৫১ খ্রিষ্টাব্দের ২০ মার্চ সিন্ধুতে মৃত্যুবরণ করেন। মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাসে তিনি ছিলেন একজন আকর্ষণীয় ও সবচেয়ে বিতর্কিত চরিত্রের সুলতান। ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানীর মতে, মুহাম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন প্রকৃতির এক অতি বিস্ময়কর সৃষ্টি। বাদাউনী তাঁকে 'বৈপরীত্যের সংমিশ্রণ' বলে অভিহিত করেছেন। তার মতে, মুহাম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন দয়ালু, বিনয়ী অত্যাচারী, উন্ধত, দানশীল ও অনুকম্পাশীল এবং অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও নির্মম। ইবনে বতুতার বর্ণনা মতে, সুলতান অত্যন্ত দয়ালু, বিনয়ী এবং তার চরিত্রের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গুণ ছিল বদান্যতা, নম্রতা ও সৌজন্যবোধ। আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে এলফিন স্টোন, হ্যাভেল, টমাস, স্মিথ প্রমুখ মুহাম্মদ বিন তুঘলককে উন্মত্ত ও বিকৃত মস্তিষ্কের অধিকারী বলে উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে গর্ডন ব্রাউন, ঈশ্বরী প্রসাদ, আগা মাহদী হোসাইন, কে এ নিজামী প্রমুখ মুহাম্মদ বিন তুঘলকের বিরুদ্ধে উন্মত্ততা, রক্ত লোলুপতা ও মস্তিষ্ক বিকৃতির অভিযোগ সঠিক নয় বলে মনে করেন। তাদের বক্তব্য মতে, সুলতান ছিলেন মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান। লেনপুলের ভাষায়, "মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাসে মুহাম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী।"[১৬]

নিরপেক্ষ বিচারে বলা যায় যে, দোষগুণের সমন্বয়েই মানবজীবন আবর্তিত হয়। এ চিরন্তন সত্য মুহাম্মদ বিন তুঘলকের চরিত্রেও লক্ষ করা যায়। তবে মার্জিত রুচিবোধ, মানসিক উৎকর্ষতা, তীক্ষ্ণ ধীশক্তি, প্রবল বিদ্যা অনুরাগ তাকে মধ্যযুগের এক আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছিল। ঈশ্বরী প্রসাদ মনে করেন, দিল্লির সিংহাসনে আরোহণকারী সুলতানদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বাধিক বিদ্বান ও গুণসম্পন্ন ব্যক্তি। তার বহুমুখী প্রতিভা সমসাময়িকদের বিস্ময়ের উদ্রেক করেছিল বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। ভি ডি মহাজন বলেন, "মুহাম্মদ বিন তুঘলক তার আমলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ও মার্জিত রুচির সুলতান ছিলেন।"[১৭] তার বিজ্ঞতা ও কর্মদক্ষতা এরিস্টটল ও আসফের মতো বিজ্ঞজনকেও বিস্ময়াভিভূত করতে পারত বলে বারানী উল্লেখ করেছেন। বস্তুত তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, তর্কশাস্ত্র, ভাষাবিজ্ঞান, ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে তার যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। কাব্য সাহিত্যেও তিনি বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। তিনি ছিলেন সুবক্তা এবং লিপিবিদ্যায় পারদর্শী একজন সুলেখক। কুরআন, হাদিস ও ফিকাহশাস্ত্রেও তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন।

মুহাম্মদ বিন তুঘলক ব্যক্তিগত জীবনে উচ্চমানের নীতিবোধের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ছিলেন। তিনি মধ্যযুগের রাজন্যদের মধ্যে প্রচলিত নৈতিক শিথিলতা ও পাপাচার থেকে মুক্ত ছিলেন। ইবনে বতুতার মতে, তিনি ছিলেন 'সত্য ও ন্যায়ের একনিষ্ঠ অনুসারী।' মুহাম্মদ বিন তুঘলক রাষ্ট্রশাসন পরিচালনায় ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ অনুশীলনে বিশ্বাসী ছিলেন। এ কারণে সমকালীন উলেমা সম্প্রদায় এমনকি বারানী পর্যন্ত তাকে ধর্মবিমুখ ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করছেন। কিন্তু নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় এরূপ অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায় না। ইবনে বতুতা, শিহাব উদ্দিন, ফিরিশতা প্রমুখ মুহাম্মদ বিন তুঘলককে প্রগাঢ় নিষ্ঠার সাথে ধর্মীয় নীতি অনুসরণকারী হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি পরধর্মের প্রতি বিরাগভাজন ছিলেন না এবং ধর্মীয় কারণে কারও বিরুদ্ধে তার নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কোনো প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

জেনে রাখো

রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে (৩৪৯-৩৩৬ খ্রি. পূ.) মেসিডোনের রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন মহামতি আলেকজান্ডারের বাবা। মেসিডোন সাম্রাজ্যের উত্থান, রাজ্যবিস্তার এবং রাজনৈতিক শক্তিমত্তা অর্জিত হয়েছিল সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপের সময়ই। গ্রিসের স্বর্ণযুগে তিনি গ্রিসের সব নগর রাষ্ট্র জয় করেন। তিনি গ্রিক মৈত্রী সংঘ, 'হেলেনিক লীগ' গঠন করে তার বিজিত রাষ্ট্রের সংহতি বিধান করেন।

---

[১৬] "Muhammad Tughlaq was the most striking figure in medieval India." – S Lane Poole, Medieval India

[১৭] "Muhammad Tughlaq was one of the most learned and accomplished scholars of his time."– V D Mahajan, *Muslim Rule in India, p-172*

মুহাম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন উৎসাহী সংস্কারক। উদ্ভাবন ও অভিনবত্ব ছিল তার প্রশাসনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। তিনি কেবল বিভিন্ন মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেননি, কেন্দ্রীয় শাসন সুদৃঢ়করণেও নানা পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপের মতো তিনি প্রশাসনের খুঁটিনাটি বিষয়ে তদারকি করতেন। তিনি সুষ্ঠুভাবে শাসন কাজ পরিচালনার জন্য তার সাম্রাজ্যকে ২৩টি প্রদেশে বিভক্ত করেছিলেন। শাসনব্যবস্থার সর্বনিম্ন প্রশাসনিক ইউনিট ছিল 'সাদী'। প্রশাসনিক প্রধান 'আমির-ই-সবদা' চৌধুরী মতাসারিক, পাটওয়ারি, সারহাং বালাহার, খুৎ, পেয়াদা প্রভৃতি অধীন কর্মচারীর সাহায্যে সাদী'র শাসন কাজ পরিচালনা করতেন। মুহাম্মদ বিন তুঘলক ডাকব্যবস্থারও উন্নতি বিধান করেন। তিনি ঘোড়ার ডাক ও ডাক হরকরা নামক দু প্রকারের ডাকব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। মুহাম্মদ বিন তুঘলক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। অপরাধীর শাস্তি বিধানে বংশ, কৌলীন্য বা পদমর্যাদাকে তিনি কখনও তোয়াক্কা করতেন না। একজন পরোপকারী উদার প্রজারঞ্জক শাসক হিসেবেও সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের ইতিহাসে সুখ্যাতি রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক বাস্তবজ্ঞানবর্জিত কল্পনাবিলাসী ছিলেন না। গর্ডন ব্রাউন বলেন, "তিনি যে কল্পনাবিলাসী ছিলেন তার বহুমুখী, বাস্তব ও উদ্যমশীল চরিত্র তাতে বিশ্বাস স্থাপন করতে আমাদের প্রলুব্ধ করে না।" তিনি যে পরিকল্পনাসমূহ গ্রহণ করেছিলেন তা দুঃসাহসিক ও বৈপ্লবিক ছিল বটে, তবে কোনোভাবেই বাস্তবতাবর্জিত খামখেয়ালিপনা ছিল না। এসব পরিকল্পনার মধ্যে সুলতানের আধুনিক ও গতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। তবে তার পরিকল্পনাগুলো সফল হয়নি। এ ব্যর্থতার পেছনে সুলতানের নিজস্ব দায় যেমন ছিল, তেমনি পারিপার্শ্বিক নানা কারণও ছিল। দীর্ঘস্থায়ী দুর্ভিক্ষ, আলেম-উলেমাসহ রক্ষণশীল জনগণের অনুদার ও বিরূপ মনোভাব এবং কর্মচারীদের অসহযোগিতা ইত্যাদি ছিল পারিপার্শ্বিক কারণসমূহের অন্যতম। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সুলতানের সদিচ্ছার অভাব ছিল না সত্য, তবে তার অনভিজ্ঞতা, সাংগঠনিক দুর্বলতা ও কার্যপদ্ধতির ত্রুটির কারণে তিনি সফল হতে পারেননি। সুলতানের ধৈর্যের অভাব, অন্যের পরামর্শ গ্রহণে অনীহা এবং একগুঁয়েমি তার ব্যর্থতার অন্যতম কারণ ছিল। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তাশক্তিতে সুলতান ছিলেন তার নিজ সময় ও সমাজ থেকে অনেক অগ্রসর। আগা মাহদী হোসাইনের ভাষায়, "সুলতান ছিলেন তার যুগের তুলনায় অধিক অগ্রসর।" (The Sultan was far in advance of his age) তার পরিকল্পনাসমূহ ছিল সমকালীন বাস্তবতা থেকে অনেকটা অগ্রগামী। দেশের সাধারণ মানুষ সুলতানের এ যুগধর্মের অগ্রবর্তী পরিকল্পনার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করতে পারেনি। ফলে অনেকেই এর বিরোধিতা করে, আর এ কথা সত্য যে, পরিকল্পনা যতই কল্যাণকামী ও যৌক্তিক হোক না কেন জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তা কার্যকর করা সম্ভব নয়। তবে তাই বলে তাকে খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। বস্তুত যুগের বিস্ময় সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক তার উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সফল না হলেও তার ব্যর্থতা তার প্রতিভাকে ম্লান করতে পারেনি।

দিল্লি সালতানাতের পতনে মুহাম্মদ বিন তুঘলকের দায়ভার: কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন, দিল্লি সালতানাতের পতনের জন্য মুহাম্মদ বিন তুঘলক সবচেয়ে বেশি দায়ী ছিলেন। তার অপরিকল্পিত উচ্চাভিলাষী পদক্ষেপ এবং সাম্রাজ্য শাসনে অক্ষমতা দিল্লি সালতানাতের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে। কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতা ও শিথিলতার সুযোগে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে অরাজকতা ও বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং সালতানাতের ঐক্যবিরোধী শক্তিগুলো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এ সময় ক্রমাগতভাবে সালতানাতের সীমানা সংকুচিত হয়ে পড়ে। চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সালতানাতের পতনোম্মুখতা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

নিরপেক্ষ বিচারে দিল্লি সালতানাতের পতনের জন্য মুহাম্মদ বিন তুঘলককে বিশেষভাবে দায়ী করা অনৈতিহাসিক প্রচেষ্টা বলে মনে হয়। তার রাজত্বকালে বিভিন্ন বিদ্রোহ সংঘটিত হয় সত্য, তবে প্রজাসাধারণ তার প্রতি পুরোপুরি বিরূপ ছিল এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাকে উৎখাতে কোনোরূপ ষড়যন্ত্র বা চেষ্টা হয়েছিল বলেও ইতিহাসে উল্লেখ নেই। তিনি ব্যর্থ হন সত্য, তবে এ ব্যর্থতার জন্য যেসব পরিস্থিতি দায়ী তার সবকিছু সুলতানের নিয়ন্ত্রণে ছিল না।

ইবনে বতুতা: মরক্কোর অধিবাসী বিখ্যাত মুসলিম পর্যটক ইবনে বতুতার প্রকৃত নাম আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে বতুতা। তিনি ১৩০৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ ফেব্রুয়ারি আফ্রিকার তাঞ্জিয়ারে জন্মগ্রহণ করেন। ২১ বৎসর বয়সে তিনি বিশ্বভ্রমণে বের হন এবং উত্তর আফ্রিকা, আরব, পারস্য, কনস্ট্যান্টিনোপল, ভারত, বাংলা, সিংহল, মালয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেন। ১৩৭৭/৭৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ৭৩ বৎসর বয়সে মারা যান। ইবনে বতুতা ১৩৩৩ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং দিল্লির সুলতান তাকে সাদরে গ্রহণ করেন। তার বুদ্ধিমত্তা ও গভীর জ্ঞানে আকৃষ্ট হয়ে সুলতান তাকে প্রধান কাজির পদ দান করেন। এ পদে দীর্ঘ আট বৎসর দায়িত্ব পালন করার পর অজ্ঞাত কারণে সুলতানের সাথে সম্পর্ক খারাপ হলে তিনি বন্দি হন এবং কিছুকাল পরে সুলতান তাকে মুক্ত করে ১৩৪১ খ্রিষ্টাব্দে রাষ্ট্রদূত হিসেবে চীনে প্রেরণ করেন। কিন্তু পথিমধ্যে দস্যু কর্তৃক সর্বস্ব লুণ্ঠিত হলে তিনি মালয় দ্বীপপুঞ্জে পৌছেন এবং সেখান থেকে দক্ষিণ ভারতের মাদুরা হয়ে চট্টগ্রামে আসেন। চট্টগ্রাম থেকে সোনারগাঁ হয়ে তিনি সিলেটে যান এবং বিখ্যাত সুফি সাধক হযরত শাহ জালালের (র) সাথে সাক্ষাৎ করেন। ইবনে বতুতার বিখ্যাত ভ্রমণকাহিনি *'রিহলা-ই-ইবনে বতুতা'* নামে পরিচিত। এ গ্রন্থে মুহাম্মদ বিন তুঘলকের পরিকল্পনাগুলোর বিশদ বিবরণ যেমন পাওয়া যায় তেমনি হযরত শাহ জালাল (র)-এর খানকাহ ও বাংলা সম্পর্কেও তিনি বহু মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করেছেন। ইবনে বতুতার মতে, তখন বাংলায় ৩ টাকায় একটি ভালো গরু এবং ১ টাকায় ৮ মণ চাল পাওয়া যেত। তবে সমৃদ্ধিশালী বাংলার ভৌগোলিক পরিবেশ, জলবায়ু, বন্যা, মশা-মাছি, কাদামাটি ও বিভিন্ন অনাচার দেখে তিনি একে 'দোজখ-ই-পুর নিয়ামত' বা প্রাচুর্যে পূর্ণ জাহান্নাম বলে অভিহিত করেন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ঐতিহাসিক বাদাউনী কাকে 'বৈপরীত্যের সংমিশ্রণ' বলে অভিহিত করেছেন?
২. মুদ্রা ব্যবস্থার প্রবর্তক বলা হয় কাকে?
৩. মুহাম্মদ বিন তুঘলকের শাসন ব্যবস্থার সর্বনিম্ন প্রশাসনিক ইউনিট কী ছিল?
৪. মরক্কোর পরিব্রাজক ইবনে বতুতা কখন ভারতবর্ষে আগমন করেন?
৫. ইবনে বতুতা কার সময়ে বাংলায় এসেছিলেন? *[বেরোবি ২০১১-১২]*
৬. বাংলাকে 'দোজখ-ই-পুর নিয়ামত' বা প্রাচুর্যে পূর্ণ জাহান্নাম বলে অভিহিত করেন কে?

উত্তরের জন্য ১৩২ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজধানী স্থানান্তরের কারণগুলো ছক আকারে লেখো।
২. নিচের ছকে খালিঘর পূরণ করো:

মুহাম্মদ বিন তুঘলকের উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনার নাম	সময় (খ্রি.)
রাজধানী স্থানান্তর	
প্রতীকী তাম্রমুদ্রা প্রবর্তন	
খোরাসান অভিযান	
কারাচিল অভিযান	
দোয়াব অঞ্চলের কর বৃদ্ধি	

পাঠ ২৬

সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক: প্রাথমিক জীবন এবং সমর অভিযান ও বিদ্রোহ দমন (১৩৫১-১৩৮৮ খ্রি.) [Sultan Firoz Shah Tughlaq: Early Life, Military expeditions and Suppression of the Revolts (1351-1388 AD)]

প্রাথমিক জীবন (Early Life)

তুঘলক বংশের অন্যতম খ্যাতিমান সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক ছিলেন সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের কনিষ্ঠ ভাই রজবের পুত্র। ১৩০৯ খ্রিষ্টাব্দে রজবের রাজপুত স্ত্রীর গর্ভে ফিরোজের জন্ম। মাত্র ৭ বছর বয়সে পিতৃ বিয়োগ ঘটলে ফিরোজ তার চাচা গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হন এবং ধর্মীয় ও অন্যান্য বিষয়ে সুশিক্ষা লাভ করেন।

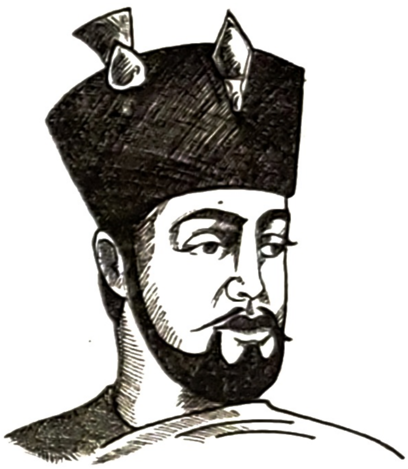
সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক

সিংহাসনে আরোহণ: সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক চাচাতো ভাই ফিরোজকে তার উত্তরাধিকারী মনোনয়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বলে ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানী ও শামস-ই-সিরাজের বর্ণনা থেকে জানা যায়। তবে অন্য সূত্র মতে, মুহাম্মদ বিন তুঘলক কোনো উত্তরাধিকারী মনোনয়ন দিয়ে যাননি। ফলে তার আকস্মিক মৃত্যুতে সেনাবাহিনী নেতৃত্বহীন হয়ে পড়ে এবং ভীষণ বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দেয়। সুলতানের উত্তরাধিকারী নির্বাচনে আমির ও অভিজাতদের মধ্যেও দ্বিধা-বিভক্তি দেখা দেয়। এ অবস্থায় থাট্টায় অবস্থিত আমির ও অভিজাতদের বার বার অনুরোধ এবং সাম্রাজ্যের বাস্তব সংকটজনক অবস্থা বিবেচনা করে সেখানে অবস্থানরত সুলতানের চাচাতো ভাই ফিরোজ ১৩৫১ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ মার্চ 'ফিরোজ শাহ তুঘলক' উপাধি নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এদিকে দিল্লিতে মন্ত্রী খাজা জাহান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের বোন খোদা বন্দজাদা বেগমের অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র দাওয়ার মালিককে প্রয়াত সুলতানের পুত্র বলে ঘোষণা এবং নিজ অভিভাবকত্বে দিল্লিতে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। তবে তিনি অভিজাতদের সমর্থন না পাওয়ায় শেষ পর্যন্ত ফিরোজ শাহ তুঘলকের কাছে আত্মসমর্পণ করে ক্ষমা চান। সুলতান তাকে ক্ষমা করে দেন এবং সামানার গভর্নর নিয়োগ করেন। পরে অবশ্য খাজা জাহান নিহত হন।

সমর অভিযান ও বিদ্রোহ দমন (Military Expeditions and Suppression of the Revolts)

মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালের শেষার্ধে কেন্দ্রীয় শাসনের শৈথিল্যের ফলে উদ্ভূত বিদ্রোহ ও অরাজক পরিস্থিতিতে সৃষ্ট এক সংকটময় পরিস্থিতিতে ফিরোজ শাহ তুঘলক দিল্লি সালতানাতের সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। এ অবস্থায় হৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধার ও বিদ্রোহ দমনে তাকে কিছু সামরিক অভিযান পরিচালনা করতে হয়।

বাংলা অভিযান: মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বের শেষদিকে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ গৌড় ও পূর্ববঙ্গে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে ১৩৫২ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে তিনি সমগ্র বাংলা জয় করে সেখানে একটি স্বাধীন সালতানাতের গোড়াপত্তন করেন। ইলিয়াস শাহ 'শাহী-ই-বাঙ্গালাহ' 'শাহী বাঙ্গালিয়ান' বা বাংলার সুলতান হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন। দিল্লি সালতানাতের দক্ষিণ-পূর্ব অংশ ত্রিহুত আক্রমণ করলে সুলতান ফিরোজ শাহ ১৩৫৩ খ্রিষ্টাব্দে তার বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হন। তবে ইলিয়াস শাহ সুরক্ষিত একডালা দুর্গে আশ্রয় নিলে ফিরোজ শাহের এ অভিযান ব্যর্থ হয়।

ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর তার পুত্র সিকান্দর শাহ বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার রাজত্বকালে সুলতান ফিরোজ শাহ ১৩৫৯-৬০ খ্রিষ্টাব্দে পুনরায় বাংলা আক্রমণ করেন। পথে তিনি জাফরাবাদে মুহাম্মদ বিন তুঘলকের বাল্য নাম অনুসারে জৈনপুর নামে একটি নগরীর গোড়াপত্তন করেন। অতঃপর ফিরোজ শাহের বাহিনী এবং সিকান্দর শাহের বাহিনীর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তবে দিল্লি বাহিনীর পক্ষে সিকান্দর শাহকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করা সম্ভব হয়নি। অবশেষে বর্ষা সমাগত হলে ফিরোজ শাহ তুঘলক ৪০টি হাতি এবং বিপুল ধনরত্নের বিনিময়ে একটি সন্ধি স্বাক্ষর করে বাংলায় সিকান্দর শাহের কর্তৃত্বের স্বীকৃতি দিয়ে দিল্লি ফিরে যান। এর ফলে পরবর্তী দুইশত বছর বাংলা দিল্লির অধীনতামুক্ত স্বাধীন দেশ হিসেবে শাসিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে।

উড়িষ্যা অভিযান: বাংলা থেকে ফেরার পথে ফিরোজ শাহ তুঘলক উড়িষ্যা (তদানীন্তন জাজনগর) আক্রমণ করেন। রাজা তৃতীয় ভানুদেব পালিয়ে তেলিঙ্গানায় আশ্রয় নিলে সুলতান পুরির বিখ্যাত জগন্নাথ মন্দির অধিকার করেন। পরে রাজা ভানুদেব বশ্যতা স্বীকার করে শান্তি চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে রাজ্য রক্ষা করেন।

নাগরকোট বিজয়: সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক ১৩৬১ খ্রিষ্টাব্দে পাঞ্জাবের কাংড়া উপত্যকায় নাগরকোট দুর্গ আক্রমণ করেন। নাগরকোট অধিপতি বিদ্রোহী রাজা রূপচাঁদ জাওয়ালামুখী দুর্গে আশ্রয় নেন। ছয় মাস অবরুদ্ধ রাখার পর বিপুল ধনরত্ন লাভের বিনিময়ে সুলতান রূপচাঁদের সাথে আপস মীমাংসায় আসেন এবং অবরোধ প্রত্যাহার করে দিল্লি ফিরে যান। সুলতান জাওয়ালামুখী দুর্গ থেকে বিপুল পরিমাণ সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন। সুলতানের নির্দেশে আজিজ উদ্দিন খালিদ ঘানি এর মধ্যে থেকে ৩০০ পুঁথি ফারসি ভাষায় অনুবাদ করেন। অনূদিত এ পুঁথি একত্রে 'দালায়িল-ই-ফিরোজ শাহী' নামে পরিচিত।

সিন্ধু অভিযান: ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, "থাট্টা অভিযান ফিরোজ শাহ তুঘলকের শাসনামলের একটি উল্লেখযোগ্য কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা।"[১৮] সিন্ধুর নেতৃবর্গের অবাধ্যতা দমন এবং সেখানে দিল্লির কর্তৃত্ব পুনঃস্থাপনের উদ্দেশ্যে সুলতান ১৩৬১-১৩৬২ খ্রিষ্টাব্দে এক বিশাল সেনাবহর নিয়ে সিন্ধুর রাজধানী থাট্টা আক্রমণ করেন। সিন্ধুরাজ জামবাভিনার প্রবল প্রতিরোধের ফলে সুলতানের প্রাথমিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তবে প্রধানমন্ত্রী খান-ই-জাহান মকবুল দিল্লি থেকে অতিরিক্ত সেনা সহায়তা প্রেরণ করলে সুলতান পুনরায় থাট্টা আক্রমণ করেন। রাজা জামবাভিনা পরাজিত ও আত্মসমর্পণে বাধ্য হন। বশ্যতা স্বীকার ও কর প্রদানের শর্তে জামবাভিনার ভাই তামচিরকে সিন্ধুতে শাসনকর্তা নিয়োগ দিয়ে সেখানে দিল্লির আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়।

বিদ্রোহ দমন: সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক তার রাজত্বের শেষদিকে গুজরাটের শাসনকর্তা দামাখানি বিদ্রোহ করেন। সুলতান সাফল্যের সাথে এ বিদ্রোহ দমন করেন। ১৩৭৭ খ্রিষ্টাব্দে ইতাওয়াতে সংঘটিত দ্বিতীয় এবং ১৩৮০ খ্রিষ্টাব্দে কাতেহারে সংঘটিত তৃতীয় বিদ্রোহও দমন করা হয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ফিরোজ শাহ তুঘলক কত খ্রিষ্টাব্দে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন?

২. কার সময়ে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ গৌড় ও পূর্ববঙ্গে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন?

৩. বাংলায় একটি স্বাধীন সালতানাতের গোড়াপত্তন করেন কে? *[রাবি ২০১১-১২]*

৪. 'শাহ-ই-বাঙ্গালাহ' অথবা 'শাহ-ই-বাঙ্গালিয়ান' বাংলার কোন মুসলিম সুলতানের উপাধি ছিল? *[জাবি ২০১৭-১৮; রাবি ২০১০-১১]*

৫. বাংলায় সিকান্দর শাহের কর্তৃত্বের স্বীকৃতি দেন কে?

৬. কত খ্রিষ্টাব্দে ফিরোজ শাহ তুঘলক সিন্ধুর রাজধানী থাট্টা আক্রমণ করেন?

উত্তরের জন্য ১৩৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের বাংলা অভিযান ব্যর্থ হওয়ার কারণগুলো ছক আকারে লেখো।

২. সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের সমর অভিযান ও বিদ্রোহ দমনের একটি তালিকা তৈরি করো।

---

[১৮] "The Thatta expedition is one of the most interesting episodes in the reign of Firuz Taughluq." –Ishwari Prasad, *A Short History of Muslim Rule in India, p.112*

পাঠ ২৭

ফিরোজ শাহ তুঘলকের শাসন ব্যবস্থা ও জনহিতকর কার্যাবলি

Administrative System and Benevolent Activities of Firoz Shah Tughlaq

ফিরোজ শাহ তুঘলক রণকুশলী সুদক্ষ সেনাপতি ছিলেন না। পূর্বসূরি সুলতান আলাউদ্দিন খলজি বা মুহাম্মদ বিন তুঘলকের মতো দেশ জয়ের মহাপরিকল্পনাও তার ছিল না। তবে শাসক ও সংস্কারক হিসেবে তিনি ছিলেন দিল্লির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান। তিনি উদারতা ও সহিষ্ণুতার ভিত্তিতে একটি শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। তার এ শাসন ব্যবস্থা ইসলামের আদর্শ ও নীতিমালা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিল। তবে এ শাসনব্যবস্থা অমুসলিমদের জন্য ক্ষতিকারক ছিল না । নিচে তার শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

শক্তিশালী প্রশাসনিক কাঠামো: দিল্লি সালতানাতের এক সংকটময় পরিস্থিতিতে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে ফিরোজ শাহ তুঘলক প্রথমেই প্রশাসনিক ভিত মজবুত করার চেষ্টা করেন। সুদক্ষ প্রশাসক মালিক-ই-মকবুলকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করে খান জাহান উপাধি দেওয়া হয়। অভিজাত ও উলেমাদের শুভেচ্ছা, সমর্থন ও সহযোগিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তাদের কিছু বৈষয়িক সুবিধা প্রদান এবং সাধারণ জনতার দুর্ভোগ লাঘবের চেষ্টা করা হয়। সরকারি ঋণ মওকুফ ও নিত্য ব্যবহার্য পণ্যমূল্য হ্রাস ও নিয়ন্ত্রণে বিশেষ নজর রাখা হয়। তিনি এর আগে বিলুপ্ত জায়গির প্রথা পুনঃপ্রবর্তন করে গোটা সাম্রাজ্যকে কতকগুলো জায়গিরে বিভক্ত করেন। দায়িত্বশীল আমির-ওমরাহদের মধ্যে এসব জায়গির বণ্টন করে দেওয়া হয়। ভূমি ছাড়াও সরকারি কর্মচারীদের নিয়মিত ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। সুলতানের এ পদক্ষেপের ফলে আমির-ওমরাহদের বৈষয়িক শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। তাদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। এর ফলে কেন্দ্রীয় শক্তির ক্ষমতার ভিত দুর্বল হয়ে পড়ে। এমনকি দিল্লি সালতানাতের সংহতি হুমকির মুখে পড়ে।

অর্থ ও রাজস্ব প্রশাসন: সালতানাতের আর্থিক অব্যবস্থাপনা রোধ এবং অর্থনৈতিক কাঠামো সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে ফিরোজ শাহ তুঘলক রাজস্ব প্রশাসনে নানা সংস্কার সাধন করেন। জনদুর্ভোগ লাঘব, রায়তদের অবস্থার উন্নতি এবং জনপ্রশাসনের প্রতি তাদের আস্থা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সুলতান কৃষকদের বকেয়া সরকারি ঋণ (তাকাভি) মওকুফ করে দেন। পূর্ববর্তী সময়ে কৃষকদের ওপর যে সকল অবৈধ ও নিপীড়নমূলক কর ধার্য করা হয়েছিল তা বাতিল করা হয়। 'ফুতুহাত-ই-ফিরোজশাহী' গ্রন্থের বিবরণ মতে, সুলতান ২৩ প্রকারের অবৈধ কর বিলোপ করেন। ফিরোজ শাহ ইসলামি আইন অনুযায়ী কুরআন নির্দেশিত খারাজ, জিজিয়া, খুম্‌স ও জাকাত নামে চারটি কর আদায়ের নির্দেশ দেন। সুলতানের এ পদক্ষেপের ফলে কৃষকেরা অন্যায় করের হাত থেকে রক্ষা পায়। রাজস্ব প্রশাসনের দুর্নীতি রোধে সুলতান রাজস্ব কর্মীদের হয়রানি বন্ধ এবং তাদের বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করেন। রাষ্ট্রের আয়-ব্যয়ের সম্ভাব্য হিসাবপত্র স্থির করারও তিনি ব্যবস্থা করেন। বস্তুত ফিরোজ শাহের নতুন কর ব্যবস্থা রায়তদের জন্য কল্যাণকর হয়েছিল। ঐতিহাসিক শামস-ই-সিরাজ আফিফ মনে করেন সুলতানের রাজস্বনীতি প্রবর্তনের ফলে রায়তেরা ধনী ও সন্তুষ্ট হয়।

সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক কৃষিপ্রধান ভারতে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচব্যবস্থার উন্নয়নে একটি মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ভারতের 'সেচব্যবস্থার জনক' নামে অভিহিত সুলতান শতদ্রু থেকে ঘাঘরা পর্যন্ত ৬ মাইল দীর্ঘ এবং যমুনা থেকে হিসার পর্যন্ত দেড়শ মাইল দীর্ঘ দুটি খাল খননের ব্যবস্থা করেন। তাছাড়া সেচ সুবিধার জন্য বহু কূপ খনন ও পানি সংরক্ষণ উপযোগী ৫০টির মতো বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছিল। ফলে অনেক পতিত জমি চাষের আওতায় আসে এবং ফসল উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পায়। অবশ্য সেচ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য খাল খনন ও অন্যান্য ব্যবস্থার ব্যয় নির্বাহ বাবদ সুলতান কৃষকদের কাছ থেকে সেচ সুবিধাপ্রাপ্ত ভূমিতে উৎপন্ন ফসলের এক-দশমাংশ 'সেচকর' নির্ধারণ করেছিলেন।

ফিরোজ শাহ তুঘলক ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে নানা ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে আন্তঃপ্রাদেশিক শুল্কসহ নানাপ্রকার প্রান্তিক কর বিলোপ করা হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয় ও বিনিময় ব্যবস্থাকে সহজতর করার জন্য সুলতান মুদ্রাব্যবস্থারও সংস্কার করেন। তিনি প্রচলিত মুদ্রা বহাল রেখে 'আধা' (অর্ধ জিতল) এবং বিক (জিতলের এক-চতুর্থাংশ) নামক ধাতু ও রুপার মিশ্রণে দু'প্রকার ক্ষুদ্র মানের মুদ্রা চালু করেন। এতে মুদ্রার অবাধ বিনিময় ও লেনদেন সহজ হয় এবং

ব্যবসা-বাণিজ্যের অবাধ বিস্তার ঘটে, নিত্য ব্যবহার্য পণ্যমূল্য হ্রাস এবং জনসচ্ছলতা বৃদ্ধি পায়। ঐতিহাসিক শামস-ই-সিরাজ আফিফ-এর মতে, "জনগণের গৃহ শস্য, সম্পদ, ঘোড়া এবং আসবাবপত্রে ভরে ওঠে। প্রত্যেকের কাছে প্রচুর সোনা ও রুপা ছিল।" তিনি আরও বলেন, "সম্পদের প্রাচুর্যের ফলে সবাই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে দিনযাপন করতেন। এ শাসনামলে রাষ্ট্র অর্থনৈতিক সংকটে পড়েনি।"(The state did not suffer from financial bankruptcy during this reign.)

বিচার প্রশাসন: ফিরোজ শাহ তুঘলক ইসলামি শরিয়া আইন অনুসারে বিচার প্রশাসন পরিচালনা করতেন। আইনের ব্যাখ্যায় মুফতি এবং আইন অনুযায়ী বিচার কাজ সম্পন্নে কাজিরা দায়িত্ব পালন করতেন। তবে সুলতান দণ্ডবিধির সংস্কার করেন এবং শারীরিক নিপীড়ন ও অঙ্গাচ্ছেদসহ অমানবিক শাস্তি রহিত করেন। কঠিন অপরাধ ছাড়া সুলতান মৃত্যুদণ্ডও রদ করেছিলেন।

দাস বিভাগ: ফিরোজ শাহ তুঘলকের সময় দাস প্রথার বিস্তার ঘটে। তার সময়ে সাম্রাজ্যে ১,৮০,০০০ জন দাস ছিল এবং এদের মধ্যে ৪০,০০০ জন রাজপ্রাসাদে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত ছিল। বিশাল এ দাস বাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণ এবং তাদের সুযোগ-সুবিধা তদারকির জন্য সুলতান 'দিওয়ানে বন্দেগান' নামে একটি পৃথক দপ্তর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিপুল রাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যয়ে তাদের উপযুক্ত শিক্ষা এবং চাকরির সুবন্দোবস্ত করা হয়েছিল। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সুলতানের এ পদক্ষেপটি মানবিক ছিল, তবে এতে অনেক ব্যয় বৃদ্ধির ফলে কোষাগারের ওপর অতিরিক্ত চাপ বাড়ে। সর্বোপরি এ দাসরা কালক্রমে প্রশাসনেও হস্তক্ষেপ করতে থাকে, যা সাম্রাজ্যের সংহতি বিনষ্ট করে।

সামরিক বিভাগ: সেনাবাহিনী সংগঠনে সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করেন। নিয়মিত সেনা সদস্যদের বেতন বাবদ জমি ও জায়গির এবং অনিয়মিতদের রাজকোষ থেকে নগদ অর্থে বেতন দেওয়া হতো। কোনো সৈন্য বৃদ্ধ বা অক্ষম হয়ে পড়লে অথবা মৃত্যুবরণ করলে তার পুত্রকে পিতার পদে নিয়োগ দেওয়া হতো। পুত্রের অবর্তমানে জামাতা এবং জামাতা না থাকলে ক্রীতদাসকে নিয়োগ দেওয়া হতো। সেনাবাহিনীতে এরূপ অদ্ভুত বংশানুক্রমিক অধিকার ও স্বার্থ স্বীকৃত হওয়ায় অযোগ্য ও অনভিজ্ঞরা সেনাবাহিনীতে নিয়োগ লাভ করে। এতে সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয় এবং তারা দুর্বল হয়ে পড়ে।

মানবকল্যাণমূলক কার্যাবলি: ফিরোজ শাহ তুঘলক একজন দয়ালু ও প্রজারঞ্জক সুলতান ছিলেন। মানবকল্যাণমূলক কার্যাবলির জন্য ইতিহাসে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। তার প্রজা হিতৈষণামূলক কয়েকটি পদক্ষেপ ইতিহাসে 'মাতামহীসুলভ ব্যবস্থা' (Grandmother Lagislation) নামে পরিচিত। এ ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য দিকের মধ্যে ছিল 'বিবাহ দপ্তর' (Marriage Bureau) এবং 'চাকরি দপ্তর' (Employment Bureau) প্রতিষ্ঠা। 'দিওয়ান-ই-খায়রাত'-এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বিবাহ দপ্তরের মাধ্যমে গরিব ও অনাথ মুসলিম মেয়েদের সরকারি খরচে বিয়ে এবং বেওয়ারিশ লাশের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্নের ব্যবস্থা করা হতো। 'দিওয়ান-ই-ইস্তহক' নামক দপ্তর থেকে দরিদ্র, অনাথ ও বিধবাদের আর্থিক সাহায্য দেওয়া হতো। চাকরি দপ্তরের কাজ ছিল যোগ্যতা অনুযায়ী বেকার যুবকদের চাকরির ব্যবস্থা করা। কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য সুলভ করার উদ্দেশ্যে সুলতান ৩৬টি ক্ষুদ্র শিল্পকারখানা গড়ে তুলেছিলেন। প্রজাসাধারণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুলতান 'দার-উস-শেফা', 'বিমারিস্তান, বা 'শিফাখানা' নামে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেছিলেন। এসব দাতব্য চিকিৎসালয়ে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা, এমনকি দরিদ্র ও অসহায় রোগীদের বিনামূল্যে ওষুধও সরবরাহ করা হতো।

ধর্মীয় নীতি: সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান হিসেবে শুধু ব্যক্তিজীবনে নয় রাষ্ট্রীয় শাসন পরিচালনায়ও শরিয়ত আইনের অনুসরণ করতেন। তার গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে শাসনব্যবস্থায় উলেমাদের প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। কোনো কোনো ঐতিহাসিক সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলককে ধর্মান্ধ বলে উল্লেখ করেছেন। হিন্দু এমনকি শিয়া মুসলমানদের প্রতিও তিনি সহমর্মী ছিলেন না বলে তাদের অভিযোগ। তবে এ অভিযোগ ঢালাওভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা তিনি হিন্দুদের ওপর জিজিয়া আরোপ করেছিলেন সত্য, তবে যাকাত প্রদানে মুসলমানদের শৈথিল্যও তিনি বরদাস্ত করেননি। সুলতান ফিরোজ শাহ মিসরের আব্বাসিয় খলিফার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে দুবার তার সনদ ও খিলাফত লাভ করেন। আনুগত্যের নিদর্শনস্বরূপ মুদ্রায় খলিফার নাম উৎকীর্ণ ও খুতবায় নাম পাঠের ব্যবস্থা করা হয়।

সুলতানের শেষ জীবন ও মৃত্যু: সিংহাসনের উত্তরাধিকারী জ্যেষ্ঠপুত্র ফতেহ খান ও দ্বিতীয় পুত্র জাফর খানের মৃত্যুতে বৃদ্ধ সুলতানের শরীর ও মন উভয়ই ভেঙে পড়ে। এ সুযোগে রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রধানমন্ত্রী খান ই জাহান (খান-ই-জাহান মকবুলের পুত্র) বিশেষ প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠলে সুলতান তার তৃতীয় পুত্র মুহাম্মদ খানকে উত্তরাধিকারী নিয়োগ এবং তার ওপর রাজ্য পরিচালনার ভার অর্পণ করেন। পিতার নির্দেশে মুহাম্মদ খান উচ্চাভিলাষী প্রধানমন্ত্রীকে দমন করেন বটে, তবে অচিরেই তার সাথে আমির-ওমরাহদের বিবাদ বাধে। সর্বত্র অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সুলতান ফিরোজ শাহ পুত্রকে ক্ষমতাচ্যুত করেন এবং পুনরায় নিজের হাতে ক্ষমতা তুলে নিয়ে পৌত্র (ফতেহ খানের পুত্র) দ্বিতীয় গিয়াসউদ্দিন তুঘলক শাহকে উত্তরাধিকারী নির্বাচন করেন। ১৩৮৮ খ্রিষ্টাব্দের ২০ সেপ্টেম্বর ফিরোজ শাহ তুঘলক ৮০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে দিল্লি সালতানাতের একটি যুগেরও সমাপ্তি ঘটে (The death of Firoz marked the end of an epoch) বলে ঐতিহাসিক মোরল্যান্ড উল্লেখ করেছেন।

ফিরোজ শাহ তুঘলকের চরিত্র ও কৃতিত্ব মূল্যায়ন

Assessment of Character and Achievements of Sultan Firoz Shah Tughlaq

সমসাময়িক ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানী এবং শামস-ই-সিরাজ আফিফ প্রমুখের মতে, সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক ন্যায়পরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ, দয়াশীল, জনকল্যাণকামী এবং ধর্মপরায়ণ প্রভৃতি মানবীয় সদগুণের অধিকারী ছিলেন। আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে হেনরি ইলিয়ট ও এলফিন স্টোন ফিরোজ শাহের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। তারা ফিরোজ শাহকে 'সুলতানি আমলের আকবর' (Akbar of the Sultanate Period) বলেছেন। স্যার ওলসলে হেইগের মন্তব্যেও সুলতান সম্পর্কে প্রশংসার বাণী উচ্চারিত হয়েছে। তবে সম্রাট আকবরের সাথে ফিরোজ শাহের তুলনা করাকে ঐতিহাসিক ভিন্টসেন্ট স্মিথ অবান্তর বলে মনে করেন। ঈশ্বরী প্রসাদ সুলতান ফিরোজ সম্পর্কে সপ্রশংস মন্তব্য করলেও আকবরের সাথে তার তুলনার বিষয়ে একমত হতে পারেননি।

সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক ছিলেন নানা মানবিক সদগুণের অধিকারী এবং কর্তব্যকর্মে সৎ। একজন খোদাভীরু ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান হিসেবে তিনি ব্যক্তিজীবনে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করতেন। মুসলমানদের নৈতিক মান উন্নয়ন তার অন্যতম লক্ষ্য ছিল। রাষ্ট্রশাসনে কুরআনের নীতি-নির্দেশনা তিনি অনুসরণ করতেন। ঐতিহাসিকদের মতে, সুন্নি মুসলিম সমাজের প্রতি তিনি বিশেষ অনুকম্পাশীল ছিলেন।

ফিরোজ শাহ তুঘলক নিজে পণ্ডিত ছিলেন এবং বিদ্বান ও পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছেন। তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী গ্রন্থ রচয়িতা জিয়াউদ্দিন বারানী, শামস-ই-সিরাজ আফিফ, তাজউদ্দিন খালিদ খানি প্রমুখ ঐতিহাসিক ধর্মজ্ঞানী পণ্ডিত সুলতানের উদার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। তিনি 'সীরাত-ই-ফিরোজ শাহী' এবং 'ফুতুহাত-ই-ফিরোজ শাহী' নামক আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন বলে ধারণা করা হয়। 'দালাইল-ই- ফিরোজ শাহী' নামক অনুবাদ গ্রন্থটি সুলতানের নির্দেশে খালিদ খানি রচনা করেছিলেন। সুলতান শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যের সর্বত্র বেশ কিছু মক্তব ও খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দিল্লির ফিরোজিয়া মাদ্রাসা এ সময় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল।

সমরকুশলতা ও সামরিক সংগঠনে ফিরোজ শাহ বিশেষ প্রতিভা ও দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেননি। দাক্ষিণাত্যের হৃতরাজ্যগুলো পুনরুদ্ধারে ব্যর্থতা এবং বাংলা ও সিন্ধু অভিযানে তার সামরিক অদক্ষতা, সেনাপতিসুলভ বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। সেনাবাহিনীতে জায়গির প্রথার পুনঃপ্রবর্তন ও বংশানুক্রমিক স্বার্থ সংরক্ষণমূলক নিয়োগ নীতি প্রবর্তন এবং ক্রীতদাস বাহিনী গঠন তার অদূরদর্শিতারই পরিচয় বহন করে। তবে শাসক হিসেবে ফিরোজ শাহ তুঘলকের কিছু ইতিবাচক সাফল্য ছিল। কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে সেচ পরিকল্পনা গ্রহণ, অনাবাদি ভূমি চাষের আওতায় নিয়ে আসা এবং শরিয়ত নির্ধারিত চারটি কর ছাড়া আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্য শুল্কসহ সকল প্রকার অবৈধ ও নিপীড়নমূলক কর বিলোপের ফলে কৃষি ও কৃষকদের প্রভূত উন্নয়ন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের বিকাশ ঘটেছিল।

ফিরোজ শাহ তুঘলক ছিলেন একজন উদার ও প্রজাহিতৈষী সুলতান। ঈশ্বরী প্রসাদের মতে, "প্রজাসাধারণের কল্যাণসাধন ছিল তার শাসনব্যবস্থার মূল লক্ষ্য।" তার মতো প্রজাহিতৈষী শাসকের সংখ্যা মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাসে প্রায় বিরল। 'দিউয়ান-ই-খায়রাত, বিবাহ ও চাকরি দপ্তর প্রতিষ্ঠা, দিউয়ান-ই-বন্দেগানের তত্ত্বাবধানে অসহায় দাসদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা এবং দার-উস-শেফায় অসহায় দরিদ্রদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সুবিধা প্রদান ফিরোজ শাহ তুঘলকের প্রজাহিতৈষী মনোভাবের সাক্ষ্য বহন করে।

নির্মাতা হিসেবেও ফিরোজ শাহ দিল্লির খ্যাতিমান সুলতানদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তার উদ্যোগ ও তত্ত্বাবধানে ফতেহাবাদ, জৈনপুর এবং ফিরোজাবাদসহ বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকটি শহর নির্মিত হয়েছিল। দিল্লির পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রায় ১৩০০টি বাগান তৈরি করে শোভাবর্ধন করা হয়। তিনি সম্রাট অশোকের স্তম্ভ এনেও দিল্লিতে প্রতিস্থাপন করেন।

সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের চিন্তা ও বুদ্ধি বিবেচনার প্রখরতা না থাকলেও তার মনের প্রসারতা ছিল। তার মধ্যে বেশকিছু অনুকরণীয় মানবিক গুণাবলি দেখা যায়। কর্তব্যকর্মে সৎ ও নিষ্ঠাবান সুলতান প্রজাকল্যাণ এবং প্রজাদের বৈষয়িক উন্নতির জন্য যে অবদান রাখেন, তা তাকে ইতিহাসে বিশেষ স্থানে উন্নীত করেছে। জনগণের বৈষয়িক উন্নতিতে সুলতানের ভূমিকা সমসাময়িক ও আধুনিক ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আর পি ত্রিপাঠী বলেন, "যে বাস্তব সমৃদ্ধি জনগণ অনুভব করে তার দ্বারাই তারা একজন শাসকের সাফল্য বিচার করে।" ভি ডি মহাজন বলেন, "সামরিক ক্ষেত্রে ব্যর্থতা সত্ত্বেও তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহুবিধ সংস্কার সাধন করে জনগণের আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন।"[১৯]

সুলতানের শাসননীতি ও সংস্কারের সমালোচনা এবং তুঘলক বংশের পতনে তার দায়িত্ব বিচার
Criticism of Sultan's Administrative Policies and Reforms and Assessment of his Role in the Downfall of the Tughlaq Dynasty

ফিরোজ শাহ তুঘলক বহুবিধ সংস্কার সাধনসহ জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করলেও তার কোনো কোনো নীতি ও কার্যাবলি শুধু তুঘলক বংশের নয়, দিল্লি সালতানাতের পতনের জন্যও দায়ী ছিল বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন। রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, পূর্ববর্তী শাসনকালের বিপরীতে ফিরোজের রাজত্বকালে কোমলতা ও বহু জনহিতকর কাজ পরিদৃষ্ট হলেও তার শাসনকাল অনেকাংশে দিল্লি সালতানাতের ভিত্তিকে দুর্বল করেছিল। নিচের আলোচনাতেও বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

প্রথমত, উদারচিত্ত ও দুর্বল ব্যক্তিত্বের অধিকারী সুলতান ফিরোজশাহ কঠোরতার পরিবর্তে কোমলতা ও দয়া- দাক্ষিণ্য দ্বারা প্রজাসাধারণের আনুগত্য নিশ্চিত করতে প্রয়াসী ছিলেন। আর এ জন্যই তিনি কঠোর হাতে বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলা দমন করতে ব্যর্থ হন। রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও অদূরদর্শিতার কারণে তিনি অপাত্রে দয়া বর্ষণ করে সাম্রাজ্যের ভিত্তি দুর্বল করে তোলেন।

দ্বিতীয়ত, জায়গির প্রথার পুনঃপ্রবর্তন সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের একটি বড় ভুল ছিল। কেননা এর ফলে জায়গির প্রাপ্ত অভিজাতরা নিজ নিজ এলাকায় প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন এবং তাদের ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে পড়ে যা তুঘলক বংশের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

তৃতীয়ত, সুলতানের সেনাবাহিনীতে বংশানুক্রমিক নিয়োগ রীতি প্রবর্তন মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশংসনীয় হলেও তা কোনোক্রমে রাষ্ট্রনায়কোচিত বিজ্ঞতার পরিচায়ক ছিল না। কেননা এর ফলে সেনাবাহিনীর কর্মদক্ষতা ও শক্তিসামর্থ্য মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। সুলতান বিপুল রাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যয়ে যে বিশাল ক্রীতদাস বাহিনী প্রতিপালন করেছিলেন রাষ্ট্রের জন্য তাদের ভূমিকাও ইতিবাচক ছিল না বরং এদের নানা অনাচার ও শাসনকাজে হস্তক্ষেপ তুঘলক বংশ পতনের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

---

[১৯] "He introduced a large number of reformes in various fields and there by won the goodwill of the people inspite of his incompetence in the military field." V D Mahajan, *Muslim Rule in India*, p-190

চতুর্থত, সুলতানের অনুসৃত ধর্মীয় নীতিও তুঘলক বংশের পতনে আংশিকভাবে দায়ী ছিল। শাসন কাজে সুন্নি উলেমাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা, অসুন্নি এবং হিন্দুদের মধ্যকার ক্ষোভ ও এ সম্পর্কিত বিরোধিতা তুঘলক বংশের পতনে ভূমিকা রাখে।

আমির তৈমুর লঙয়ের ভারতবর্ষ আক্রমণ: বিশ্বজয়ী বীর আমির তৈমুর লঙ মধ্য এশিয়ার সমরকন্দের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ১৩৩৬ খ্রিষ্টাব্দে মধ্য এশিয়ার সমরকন্দের কেশ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম আমির তুরঘাই এবং মাতা তাকিনাহ খাতুন। পিতার মৃত্যুর পর তৈমুর নিজ প্রচেষ্টায় মাত্র ২৩ বৎসর বয়সে চাগতাই তুর্কি উপজাতির দলপতি নির্বাচিত হন এবং ১৩৬৯ খ্রিষ্টাব্দে সমরকন্দে রাজধানী স্থাপন করে বিশ্বজয়ে বের হন এবং সমগ্র পারস্য, মিসর, অটোমান সাম্রাজ্য, রাশিয়ার সীমান্তবর্তী অঞ্চল জয় করেন। ঈশ্বরী প্রসাদের মতে, ভারতবর্ষ থেকে পৌত্তলিকতার বিনাশসাধন, ভারতবর্ষের শাসকবর্গের দুর্বলতা এবং সর্বোপরি ভারতের অঢেল ধনসম্পদ হস্তগত করার জন্য তিনি প্রথমে পৌত্র পীর মুহাম্মদকে ১৩৯৭ খ্রি. ভারত অভিযানে প্রেরণ করেন এবং ১৩৯৮ খ্রি. নিজে ভারতে এসে দিল্লির সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহকে পরাজিত করে দিল্লি অধিকার করেন। আশরাফউদ্দিন আহমদের (পৃ. ১১৬) মতে, “দিল্লিতে ২৫ দিন ধরে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে অধিকৃত অঞ্চলের দায়িত্ব তাকে সাহায্যকারী সৈয়দ বংশীয় খিজির খানের ওপর অর্পণ করে তিনি সমরকন্দে ফিরে যান।” তৈমুরের ভারত অভিযানের ফলে তুঘলক বংশের শাসনের অবসানের সাথে সমগ্র উত্তর ভারতে রাজনৈতিক অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং তার ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ ও ধ্বংসযজ্ঞের ফলে দিল্লি শ্মশানে পরিণত হয়। আর. সি. মজুমদারের (*An Advanced History of India*, p.336-37) মতে, ভারত যতবার বৈদেশিক শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে তৈমুরের আক্রমণই সর্বাপেক্ষা মর্মস্পর্শী ঘটনা। তৈমুরের ভারত অভিযানের ফলাফল সম্পর্কে ঈশ্বরী প্রসাদ যথার্থ বলেন, "Taimur invasion caused widespread anarchy in Hindustan". Ref: Ishwari Prasad, *A Short History of Muslim Rule in India*, Allahabad, 1996, p.117

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. দিল্লি সালতানাতে জায়গির প্রথা পুনঃপ্রবর্তন করেন কে?
২. সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক কত প্রকার অবৈধ কর বিলোপ করেন?
৩. ভারতে ‘সেচ ব্যবস্থার জনক’ কে?
৪. কাদের তদারকির জন্য ফিরোজ শাহ তুঘলক ‘দিওয়ানে বন্দেগান’ নামে একটি পৃথক দপ্তর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?
৫. মাতামহীসুলভ ব্যবস্থার প্রবর্তক কে? *[সকল বোর্ড ২০১৫]*
৬. দিল্লিতে ‘বিমারিস্তান’ বা শিফাখানা নামে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন কে? *[সকল বোর্ড ২০১৬]*

উত্তরের জন্য ১৩৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক যেসব সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন তার একটি তালিকা তৈরি করো।
২. সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলককে সুলতানি আমলের আকবর বলার কারণ ছক আকারে লেখো।

গ. দলীয় কাজ

‘দিল্লি সালতানাতের পতনের জন্য সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকই দায়ী’— এ সম্পর্কে বিতর্কের আয়োজন করো।

পাঠ ২৮

সৈয়দ বংশ: উত্থান ও পতন (১৪১৪—১৪৫১ খ্রি.)
Sayed Dynasty: Rise and Fall (1414-1451 AD)

সৈয়দ বংশ দিল্লি সালতানাতের চতুর্থ রাজবংশ। এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা খিজির খান। খিজির খানের দাবি মতে, তার পূর্বপুরুষেরা ছিলেন মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর বংশধর। তাই তার প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের নামকরণ করা হয় 'সৈয়দ বংশ'। তবে এ ব্যাপারে ভিন্ন মতও রয়েছে। ঐতিহাসিকদের কেউ কেউ মনে করেন খিজির খানের পূর্বপুরুষদের আদি নিবাস আরবে হলেও তিনি মহানবি (স)-এর বংশধর ছিলেন কি না এ বিষয়ে নিশ্চিত তথ্য-প্রমাণ নেই। তাদের মতে, নিজের মর্যাদা বৃদ্ধি এবং জনগণের আনুগত্য ও শ্রদ্ধা অর্জনের উদ্দেশ্যে খিজির খান নিজেকে মহানবি (স)-এর বংশধর বলে দাবি করেছিলেন। যা হোক এ রাজবংশটি প্রায় ৩৭ বছর ভারতবর্ষ শাসন করে। এ বংশের মোট শাসকের সংখ্যা ছিল ৪ জন।

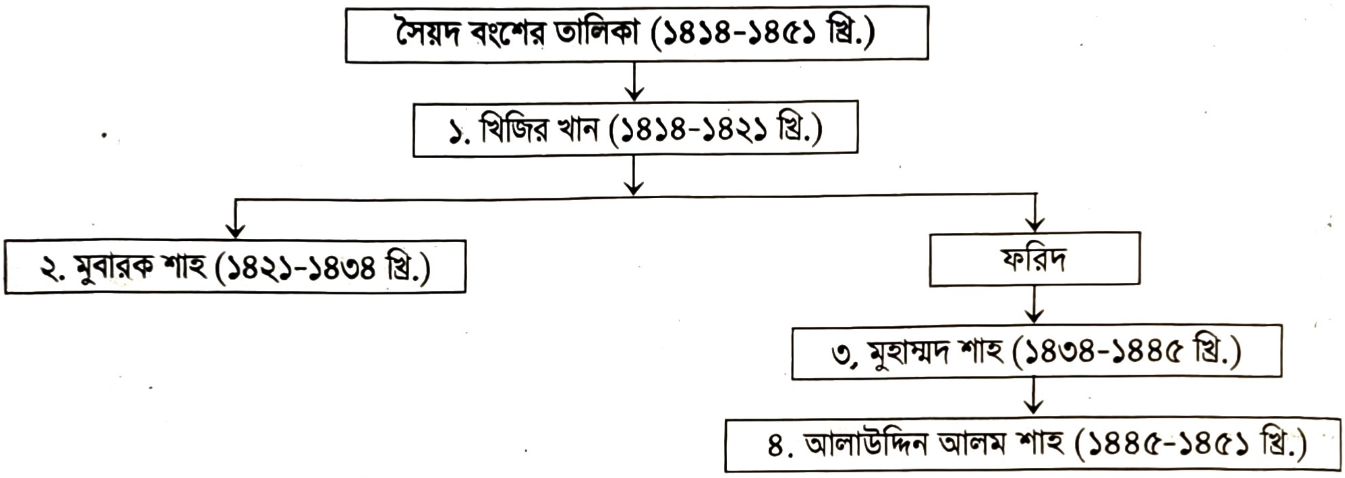
সৈয়দ বংশের তালিকা (১৪১৪-১৪৫১ খ্রি.)
১. খিজির খান (১৪১৪-১৪২১ খ্রি.)
২. মুবারক শাহ (১৪২১-১৪৩৪ খ্রি.)
ফরিদ
৩, মুহাম্মদ শাহ (১৪৩৪-১৪৪৫ খ্রি.)
৪. আলাউদ্দিন আলম শাহ (১৪৪৫-১৪৫১ খ্রি.)

খিজির খান (১৪১৪-১৪২১ খ্রি.) [Khijir Khan (1414–1421 AD)]

খিজির খান ছিলেন সৈয়দ বংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং সবচেয়ে সফল সুলতান। প্রাপ্ত তথ্য মতে, তিনি শৈশবে মুলতানের শাসনকর্তা মালিক নাসির-উল-মুলকের তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হন এবং তুঘলক শাসনামলে তিনি সেখানকার ইকতাদার (প্রদেশপাল) হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। তৈমুর লঙের ভারত অভিযানকালে তাকে সহায়তা করে খিজির খান তার অনুগ্রহ লাভ করেন। তাই স্বদেশে ফিরে যাওয়ার সময় তৈমুর লঙ খিজির খানকে মুলতান, দিল্লি ও দিপালপুরের শাসনভার অর্পণ করে যান।

খিজির খান ছিলেন উচ্চাভিলাষী। তিনি ক্রমে দিল্লির সিংহাসন প্রত্যাশী হয়ে ওঠেন। ১৪১৩ খ্রিষ্টাব্দে তুঘলক বংশের শেষ সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদের মৃত্যুর পর উদ্ভূত অরাজক পরিস্থিতিতে খিজির খান ১৪১৪ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লি অবরোধ করেন এবং সভাসদদের দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত দৌলত খানকে পরাজিত করে দিল্লি দখল করেন। এর মধ্য দিয়ে ভারতে তুঘলক শাসনের অবসান ঘটে এবং সৈয়দ বংশের গোড়াপত্তন হয়। খিজির খান সাত বছর দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ সময় তিনি স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করলেও নিজে সুলতান বা কোনো রাজকীয় উপাধি গ্রহণ করেননি। তবে তাকে 'রায়ত-ই-আলা' বা 'মসনদ-ই-আলা' নামে অভিহিত করা হতো। তিনি তৈমুর লঙ এবং তার উত্তরাধিকারী পুত্র শাহরুখের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং শাহরুখকে বার্ষিক করও পাঠাতেন।

খিজির খান যখন দিল্লির সালতানাত দখল করেন তখন তার অধিকার দিল্লি ও নিকটবর্তী কিছু অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এ অবস্থায় খিজির খান সালতানাতের ঐক্য ও মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন অঞ্চল পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চালান। সুযোগ্য প্রধানমন্ত্রী তাজ-উল-মুলকের সহায়তায় রাজপুত রাজ্য কাটেহার ও এটোয়াসহ খোর, কাশিল, পাতিয়ালা, জালেসার, গোয়ালিয়র এবং রায়নার বিরুদ্ধে বেশকিছু সফল অভিযান প্রেরণ করেন। অবশ্য এসব অভিযানের স্থায়ী ফলাফল অর্জিত না হওয়ায় তার আধিপত্য দিল্লি, দোয়াব ও পাঞ্জাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

১৪২১ খ্রিষ্টাব্দে খিজির খান মৃত্যুবরণ করেন। ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করেন যে, তিনি ছিলেন একজন প্রজাকল্যাণকামী ও ন্যায়পরায়ণ শাসক। ব্যক্তিজীবনে খিজির খান ছিলেন ধার্মিক, বিনয়ী এবং দয়ালু প্রকৃতির। ঐতিহাসিক ফিরিশতা খিজির খানকে একজন মহান, বিজ্ঞ, দয়ালু এবং প্রতিশ্রুতিরক্ষাকারী শাসক হিসেবে অভিহিত করেছেন।

মোবারক শাহ (১৪২১-১৪৩৪ খ্রি.) [Mubarak Shah (1421–1434 AD)]

খিজির খানের মৃত্যুর পর তার পুত্র মোবারক ১৪২১ খ্রিষ্টাব্দে মোবারক শাহ নামধারণ করে দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তার রাজত্বকালে চারদিকে বিদ্রোহ দানা বেঁধে ওঠে। উত্তর-পশ্চিমে জাসরাতের নেতৃত্বে পাঞ্জাবের খোক্কার উপজাতি এবং দক্ষিণ-পশ্চিম মালব ও জৈনপুরের রাজারা সৈয়দ বংশের জন্যে হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। তুর্ক বাচ্ছারা উপজাতি গোষ্ঠী নেতা পুলাদের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে এবং ১৪৩০ খ্রিষ্টাব্দে সরহিন্দ দখল করে নেয়। কাবুলের শাসক শেখ আলীও ভারত বিজয়ের স্বপ্ন দেখেন এবং ১৪৩১ খ্রিষ্টাব্দে পাঞ্জাব আক্রমণ করেন। দিল্লির নিকটবর্তী মেওয়াটিরাও সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। সুলতান মোবারক শাহকে তার রাজত্বের পুরো সময় ধরে এসব প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়েছে। এতে তার সাফল্যও উল্লেখ করার মতো। বস্তুত তিনি নতুন রাজ্য জয় করতে সমর্থ হননি বটে, তবে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সালতানাতের সীমা অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

মোবারক শাহ শুরু থেকেই সতর্কতার সাথে রাজ্য শাসন শুরু করেন। তিনি পিতার আমলের অমাত্যদের স্ব-স্ব পদে বহাল রাখেন। তবে পরবর্তীকালে শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজনেই তিনি কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার রদবদল করেন। এতে আমিরদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। কামাল-উল-মুলককে সহকারী-উজির পদে নিয়োগ দেওয়ায় প্রধানমন্ত্রী সারওয়ার-উল-মুলক ক্ষুব্ধ হন। তার নেতৃত্বে অসন্তুষ্ট আমির-ওমরাহদের ষড়যন্ত্রে মোবারক শাহ মোবারকবাদের একটি মসজিদে নামাজরত অবস্থায় ১৪৩৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ ফেব্রুয়ারি আততায়ীর হাতে নিহত হন।

মোবারক শাহ ছিলেন সৈয়দ বংশের সর্বাপেক্ষা যোগ্যতম শাসক। একজন পূর্ণাঙ্গ সার্বভৌম সুলতানের মর্যাদা নিয়ে তিনি সিংহাসনে বসেছিলেন। তিনি তৈমুরি শাসকদের প্রভুত্ব অস্বীকার করেন। 'মুইজউদ্দিন মোবারক শাহ' উপাধি ধারণ করে নিজ নামে মুদ্রা জারি এবং খুতবা পাঠের ব্যবস্থা করেন। মোবারক শাহ একজন মহানুভব ও প্রজারঞ্জক শাসক ছিলেন। তার পৃষ্ঠপোষকতায় ইয়াহিয়া বিন আহমদ সরহিন্দ 'তারিখ-ই-মুবারকশাহী' নামক বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থটি প্রণয়ন করেছিলেন। তিনি যমুনা নদীর তীরে মোবারকবাদ নামে একটি নতুন শহর নির্মাণ করেন। সমসাময়িক ঐতিহাসিক হামিদ উদ-দীন এর মতে মোবারক শাহ ছিলেন, "চমৎকার গুণাবলির অধিকারী একজন নম্র ও দয়ালু সুলতান।" তিনি মোবারক শাহকে "খিজির খানের বংশের সর্বাপেক্ষা যোগ্যতম শাসক" বলেও অভিহিত করেছেন।

মোহাম্মদ শাহ (১৪৩৪-১৪৪৫ খ্রি.) [Mohammad Shah (1434–1445 AD)]

অপুত্রক মোবারক শাহের মৃত্যুর পর দিল্লির অভিজাতরা তার ভ্রাতুষ্পুত্র মোহাম্মদ শাহকে সিংহাসনে বসান। তিনি ছিলেন অকর্মণ্য ও বিলাসী চরিত্রের অধিকারী। তিনি শাসন কাজে তেমন যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেননি। তার দুর্বলতার সুযোগে প্রধানমন্ত্রী সারওয়ার-উল-মুলক সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করেন। প্রধানমন্ত্রী 'খান-ই-জাহান' উপাধি নিয়ে দিল্লির সিংহাসন দখলের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলে সুলতান মোহাম্মদ শাহের সমর্থক অভিজাতরা সারওয়ার-উল-মুলককে হত্যা করেন এবং কামাল-উল-মুলককে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। এর ফলে দেশে যে রাজনৈতিক অনৈক্য ও কোন্দল দেখা দেয়। সে সুযোগে মালবের শাসনকর্তা মাহমুদ খলজি দিল্লি জয়ে অগ্রসর হন। সুলতান সরহিন্দের শাসনকর্তা বাহলুল লোদীর সহায়তায় মাহমুদ খলজির আক্রমণ প্রতিহত করেন এবং যুদ্ধে মাহমুদ খলজি নিহত হন। এ ঘটনায় দিল্লির দরবারে বাহলুল লোদীর প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। সুলতান মোহাম্মদ শাহ তাকে খান-ই-খানান উপাধি দেন। বাহলুল লোদি ছিলেন অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী। পাঞ্জাবের খোক্কার উপজাতির নেতা দশরথের প্ররোচনায় ১৪৪৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি দিল্লির সিংহাসন দখলের চেষ্টা করেন। তবে তার প্রয়াস ব্যর্থ হয়। ১৪৪৫ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান মোহাম্মদ শাহ মৃত্যুবরণ করেন।

আলাউদ্দিন আলম শাহ (১৪৪৫-১৪৫১ খ্রি.)

Alauddin Alam Shah (1445–1451 AD)

সুলতান মোহাম্মদ শাহের মৃত্যুর পর তার পুত্র আলাউদ্দিন দিল্লির অভিজাতদের সমর্থন নিয়ে 'আলাউদ্দিন আলম শাহ' উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ছিলেন সৈয়দ বংশের সবচেয়ে দুর্বল ও অযোগ্য শাসক। সুলতানের সাথে তার প্রধানমন্ত্রী হামিদ খানের দ্বন্দ্বের ফলে সৃষ্ট নাজুক পরিস্থিতিতে বাহলুল লোদি সুলতানের সহায়তায় প্রধানমন্ত্রী হামিদ খানকে হত্যা করেন। অতঃপর তিনি দিল্লি দখল করে নিলে সুলতান আলম শাহ স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে বাহলুল লোদীর হাতে ক্ষমতা তুলে দেন। ১৪৫১ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ এপ্রিল বাহলুল লোদি নিজেকে দিল্লির সুলতান হিসেবে ঘোষণা করেন। ফলে সৈয়দ বংশের শাসনের অবসান ঘটে এবং ভারতের ইতিহাসে লোদি বংশের শাসনের সূত্রপাত্র হয়।

সৈয়দ বংশের পতনের কারণ (Causes of the fall of Sayed dynasty)

খিজির খান কর্তৃক ১৪১৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত সৈয়দ বংশ প্রায় ১৪৫১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লির শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেছিল। বাহলুল লোদীর হাতে এ বংশের পতন ঘটে। এ বংশের পতনের নেপথ্যে কতকগুলো কারণ বিদ্যমান। প্রথমত, সুলতান খিজির খানের আমল থেকেই রাজ দরবারের ওপর আমির-উমরাহদের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারা সালতানাতের সর্বেসর্বা হয়ে ওঠে। উল্লেখ্য যে সুলতান মোবারক শাহকে উজির সারওয়াবুল মুলক হত্যা করেন। এভাবে আমির-উমরাহদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে কোনো সুলতানই উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। যার ফলে সালতানাতে নানা ধরনের বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং সৈয়দ বংশের পতন ঘটে। দ্বিতীয়ত, সুলতানদের অযোগ্যতা ও নির্বুদ্ধিতার কারণে দিল্লি সালতানাতের নানা স্থানে শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং সৈয়দ বংশের পতন ঘটে। তৃতীয়ত, উপযুক্ত সামরিক বাহিনীর অভাবে সৈয়দ বংশের সামরিক ভিত দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে সুলতানরা বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হন, যা এ বংশের পতনকে ত্বরান্বিত করে। চতুর্থত, এ বংশের শেষ শাসক আলম শাহ আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দেন। সালতানাত সম্পর্কে তিনি প্রায় উদাসীন ছিলেন। যার ফলশ্রুতিতে বাহলুল লোদি তার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে দিল্লি সালতানাতে সৈয়দ বংশের ধ্বংসলীলার ওপর লোদি বংশের গোড়াপত্তন করেন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. দিল্লি সালতানাতের চতুর্থ রাজবংশ কোনটি?
২. সৈয়দ বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? */সকল বোর্ড ২০১৭/*
৩. সৈয়দ বংশের সবচেয়ে সফল সুলতান কে?
৪. 'রায়ত-ই-আলা' বা 'মসনদ-ই-আলা' নামে অভিহিত করা হয় কাকে? */সকল বোর্ড ২০১৬/*
৫. সৈয়দ বংশের সর্বাপেক্ষা যোগ্যতম শাসক কে?
৬. কোন বংশের কাছে সৈয়দ বংশের পতন ঘটে?

উত্তরের জন্য ১৩৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. সৈয়দ বংশের শাসকদের শাসনকালসহ নামের একটি তালিকা তৈরি করো।
২. সৈয়দ বংশের পতনের কারণগুলো ছক আকারে লেখো।

পাঠ ২৯

লোদি বংশ: উত্থান ও পতন (১৪৫১-১৫২৬ খ্রি.)
Lodi Dynasty: Rise and Fall (1451-1526 AD)

লোদি বংশ ছিল দিল্লি সালতানাতের শেষ শাসক বংশ। এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান বাহলুল লোদি। জাতিগতভাবে তিনি ছিলেন আফগান লোদি উপদলের শাহু খেল (Shahu Khel) শাখার লোক। লোদি উপদলভুক্ত আফগান হওয়ায় বাহলুল প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ লোদি বংশ নামে পরিচিত। এ বংশের তিন জন সুলতান প্রায় ৭৫ বছর দিল্লির শাসনকাজ পরিচালনা করেন। স্থায়িত্বের দিক থেকে বিবেচনা করলে লোদি শাসন যেমন দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল তেমনি গুণ বিচারেও এ বংশের শাসন সৈয়দ বংশের তুলনায় অনেকটাই উজ্জ্বল ছিল।

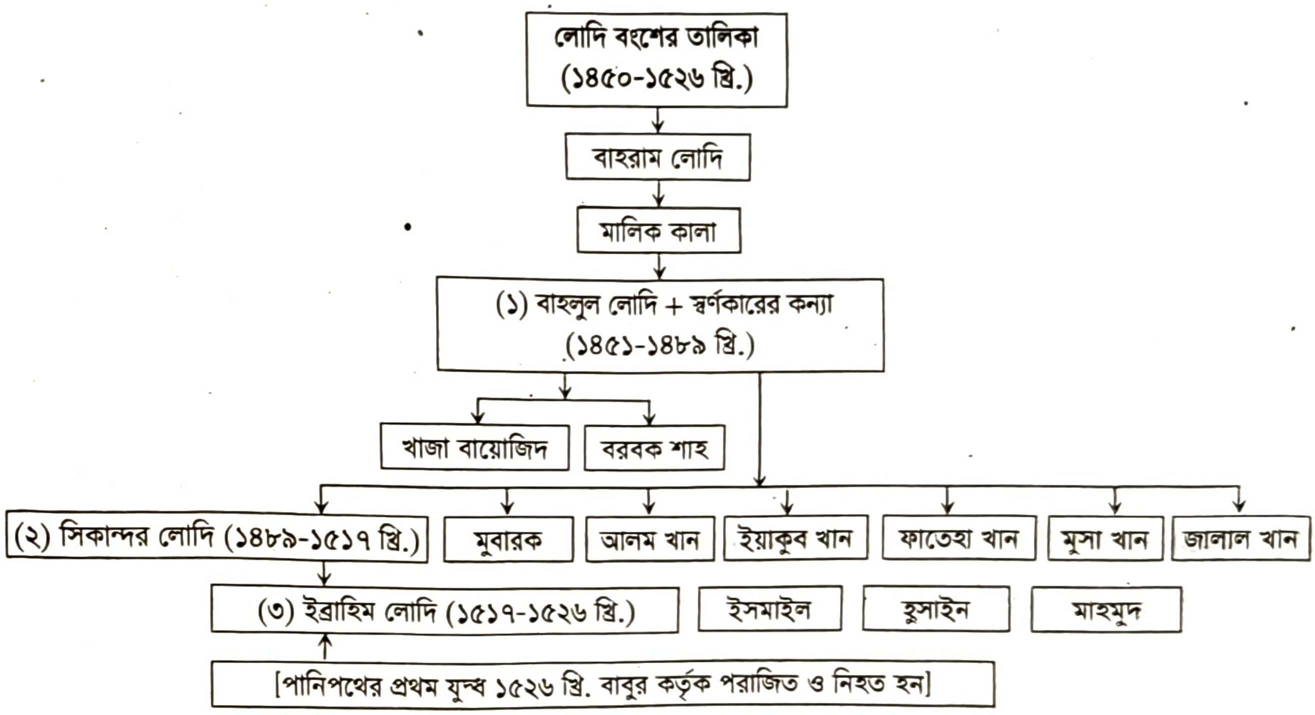
লোদি বংশের তালিকা
(১৪৫০-১৫২৬ খ্রি.)
বাহরাম লোদি
মালিক কালা
(১) বাহলুল লোদি + স্বর্ণকারের কন্যা
(১৪৫১-১৪৮৯ খ্রি.)
খাজা বায়েজিদ
বরবক শাহ
(২) সিকান্দর লোদি (১৪৮৯-১৫১৭ খ্রি.)
মুবারক
আলম খান
ইয়াকুব খান
ফাতেহ খান
মুসা খান
জালাল খান
(৩) ইব্রাহিম লোদি (১৫১৭-১৫২৬ খ্রি.)
ইসমাইল
হুসাইন
মাহমুদ
[পানিপথের প্রথম যুদ্ধ ১৫২৬ খ্রি. বাবুর কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন]

সূত্র: সতীশচন্দ্র- *History of Medieval India*, Page-244.

সুলতান বাহলুল লোদি (১৪৫১-১৪৮৯ খ্রি.) [Sultan Bahlul Lodi (1451–1489 AD)]

প্রাথমিক জীবন ও সিংহাসন লাভ: বাহলুল লোদির পিতার নাম মালিক কালা। বাহলুল লোদির চাচা সুলতান শাহ (ইসলাম খান) সৈয়দ বংশের প্রতিষ্ঠাতা খিজির খানের শাসনামলে সরহিন্দের গভর্নর ছিলেন। গুণমুগ্ধ চাচা ইসলাম খান তার কন্যাকে বাহলুল লোদীর সাথে বিয়ে দেন। ইসলাম খানের মৃত্যুর পর বাহলুল লোদি সরহিন্দের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। সৈয়দ বংশীয় সুলতান মোহাম্মদ শাহের সময় দিল্লির দরবারে তার প্রভাব বৃদ্ধি পায় এবং তার মধ্যে দিল্লির সুলতান হওয়ার উচ্চাভিলাষ জাগে। দুবার দিল্লি জয়ের ব্যর্থ চেষ্টার পর সুলতান আলাউদ্দিন আলম শাহের শাসনামলে দিল্লির দরবারে ক্ষমতা-দ্বন্দ্বের সুযোগে তিনি দিল্লির মসনদ অধিকারে সফল হন। পরিস্থিতির চাপে সুলতান আলম শাহ স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করলে ১৪৫১ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ এপ্রিল বাহলুল লোদি নিজেকে দিল্লির সুলতান হিসেবে ঘোষণা করেন।

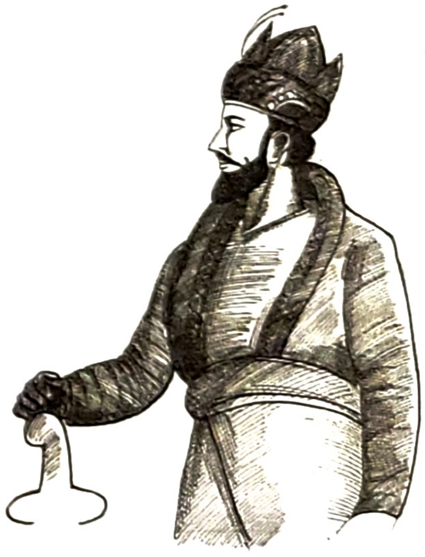

সুলতান বাহলুল লোদি

বিদ্রোহ দমন ও রাজ্যবিস্তার: সিংহাসনে আরোহণ করেই বাহলুল লোদি সালতানাতের গৌরব বৃদ্ধি ও মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংকল্প নেন। তার কর্তৃত্ব বিস্তারে সম্ভাব্য প্রতিবন্ধক প্রধানমন্ত্রী হামিদ খানকে ক্ষমতাচ্যুত, কারারুদ্ধ এবং হত্যা করা হয়। বাহলুল লোদি জৈনপুরের মাহমুদ শাহ শর্কির দিল্লি বিজয় পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেন। মেওয়াট, সম্বল, সকিত, কোল, রেওয়াবি, চান্দওয়ার এবং দোয়াব অঞ্চলের বিদ্রোহী শাসনকর্তা ও সামন্ত রাজারা বাহলুল লোদীর আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য হন। জৈনপুরের নতুন সুলতান হোসেন শাহ শর্কি দিল্লি অধিকারে তৎপর হয়ে উঠলে বাহলুল লোদি তাঁকে পরাস্ত করে জৈনপুর অধিকার করে পুত্র বরবক শাহকে জৈনপুরের গভর্নর নিয়োগ করেন। এ সময় পাঞ্জাব ও দিল্লি সালতানাতভুক্ত হয়। বাহলুল লোদির সর্বশেষ সামরিক অভিযান ছিল গোয়ালিয়রের রাজা মানসিংহের বিরুদ্ধে। যুদ্ধে রাজা পরাজিত হন। প্রচুর উপঢৌকন ও রাজার আনুগত্য নিশ্চিত করে দিল্লি ফেরার পথে বাহলুল লোদি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ১৪৮৯ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে জালালি নামক স্থানে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মূল্যায়ন: ব্যক্তিজীবনে বাহলুল লোদি ছিলেন সৎ, চরিত্রবান, সাহসী, অমায়িক, বিনয়ী, দয়ালু এবং শরিয়ত বিধানের অনুসারী নিষ্ঠাবান মুসলমান। তিনি ছিলেন ন্যায়বিচারক। তিনি আড়ম্বরহীন সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত এবং পরমতসহিষ্ণু ছিলেন। তিনি নিজে বিদ্বান ছিলেন না, তবে বিদ্বানদের সংসর্গ পছন্দ করতেন। শাসক হিসেবেও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের দাবিদার ছিলেন। দিল্লি সালতানাতের চরম দুর্দিনে তিনি ক্ষমতা গ্রহণ করে নিজের দক্ষতা, কর্মকুশলতা ও বীরত্বের সাহায্যে সালতানাতের সংহতি বিধান করেন এবং এর গৌরব ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। রমেশচন্দ্র মজুমদার যথার্থই বলেছেন, "শাসক হিসেবে বাহলুল লোদি ফিরোজ শাহ তুঘলকের সময় থেকে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণকারী তার পূর্বসূরি সুলতানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।"[২০] ভি. ডি. মহাজন বলেন, "বাহলুল লোদি বংশের শুধু প্রতিষ্ঠাতাই ছিলেন না, এর শক্তি ও গৌরবের মূলেও তার অবদান ছিল অপরিসীম। (Bahlul was not only the founder of the Lodi dynasty but was responsible for its strength and glory.)

সুলতান সিকান্দার লোদি (১৪৮৯-১৫১৭ খ্রি.) [Sultan Sikandar Lodi (1489–1517 AD)]

সিংহাসনে আরোহণ: সুলতান বাহলুল লোদির মৃত্যুর পর তার তৃতীয় পুত্র নিজাম খান ও অপর পুত্র বরবক শাহের উত্তরাধিকারকে কেন্দ্র করে আমির ও অভিজাত সম্প্রদায় দুটি প্রধান দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। এ দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত পাঠান অভিজাতদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন নিয়ে নিজাম খান ১৪৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ জুলাই 'সিকান্দার শাহ' উপাধি নিয়ে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন।

সুলতানের বিভিন্ন পদক্ষেপ: সিকান্দার শাহ একজন সুযোগ্য শাসক ছিলেন। তিনি তার বিদ্রোহী ভাই জৈনপুরের শাসনকর্তা বরবক শাহকে পদচ্যুত ও কারারুদ্ধ করে তার স্থলে নতুন গভর্নর নিয়োগ দেন। জৈনপুরের শাসনক্ষমতা পুনরুদ্ধারে হোসেন শর্কির প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেওয়া হয়। সুলতানের বিরুদ্ধে প্রভাবশালী আফগান সর্দারদের ষড়যন্ত্র নস্যাত করা হয়। সুলতান বায়ানা, কোয়েল, গোয়ালিয়র, নারোয়ার এবং ধোলপুরে তার কর্তৃত্ব সম্প্রসারণ করেন। চান্দেরিরাজ তার বশ্যতা স্বীকার করেন। সুলতান রণথম্ভোর জয়েও সফল হন। ১৫০৪ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান আগ্রা নগরীর গোড়াপত্তন করেন এবং দিল্লি থেকে সেখানে রাজধানী স্থানান্তর করেন। সুলতান সিকান্দার লোদি ১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দে আগ্রায় মৃত্যুবরণ করেন।

চরিত্র ও কৃতিত্ব বিচার: সিকান্দার লোদি ছিলেন লোদি বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান। দক্ষ রাজনীতিবিদ, সমরকুশলী এবং প্রজারঞ্জক সুলতান হিসেবে মধ্যযুগের ইতিহাসে তিনি বিশেষ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। উৎকৃষ্ট চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও মানবিক গুণাবলির জন্য সমসাময়িক ও পরবর্তী ঐতিহাসিকেরা সিকান্দার লোদির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি যথাযথভাবে ধর্মীয় অনুশাসন পালন করতেন। তবে অন্য ধর্মের প্রতি তিনি অনুদার ছিলেন বলে ঐতিহাসিকদের অভিযোগ। ন্যায়বিচার ও দানশীলতার জন্য সিকান্দার লোদির সুখ্যাতি ছিল।

---

[২০] "As a ruler Bahlul was incomparably superior to those who had preceded him on the throne of Delhi since the time of Firuz of the house of Tughlug." – *An Advanced History of India, P-332*

সিকান্দার লোদি রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপনে সফল হয়েছিলেন। শস্য কর ও অভ্যন্তরীণ শুল্ক বিলোপ করায় তার সময়ে সাম্রাজ্যে কৃষি ও শিল্প-বাণিজ্যের ব্যাপক উন্নতি ঘটে। সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতায় চারু ও কারুশিল্পের লক্ষণীয় প্রসার ঘটে। সুলতান স্বয়ং কবি ছিলেন এবং ফারসি ভাষায় কবিতা রচনা করতেন। তার পৃষ্ঠপোষকতায় মিএগ্রা ভূএগ্রা সংস্কৃত ভাষায় রচিত চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক একটি গ্রন্থ 'তিব্বী সিকান্দরী' নামে ফারসিতে অনুবাদ করেছিলেন।

সুলতান সিকান্দার লোদি ২৯ বছর গৌরব ও মর্যাদার সাথে দিল্লি শাসন করেছিলেন। ডব্লিউ হেগ বলেন, "লোদি বংশের তিন জন শাসকের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ।" (He was the greatest of the three kings of his house.) কে এস লাল বলেন, "লোদি বংশের তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ শাসক। তিনি কৃতিত্বের উজ্জ্বলতায় পিতা বাহলুল ও পুত্র ইব্রাহিম উভয়কে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন"। ড. পাণ্ডের মতে, সঠিক বিবেচনায় নিজ পিতা অথবা পুত্র অপেক্ষা তিনি ছিলেন উৎকৃষ্টতর ও শ্রেষ্ঠতর শাসক।" (He was the on the whole, a better and a greater administrator than either his father or his son.)

সুলতান ইব্রাহিম লোদি (১৫১৭-১৫২৬ খ্রি.) [Sultan Ibrahim Lodi (1517–1526 AD)]

সিংহাসনে আরোহণ: সিকান্দার লোদির মৃত্যুর পর তার জ্যেষ্ঠ পুত্র ইব্রাহিম দিল্লির অভিজাতদের নিরঙ্কুশ সমর্থন নিয়ে ১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দের ২১ নভেম্বর 'ইব্রাহিম শাহ' উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ছিলেন লোদি বংশের এবং দিল্লি সালতানাতের শেষ সুলতান।

নানা বিপত্তি ও সুলতানের গৃহীত ব্যবস্থা: সুলতান ইব্রাহিম লোদি পিতার মতো ন্যায়বান শাসক ছিলেন না। তার সামরিক দক্ষতা থাকলেও সুবুদ্ধি ও সংযমের অভাব ছিল। উগ্র স্বভাব ও অনুদার মনোভাবের ফলে অসন্তুষ্ট আফগান অভিজাতদের একদল সাম্রাজ্য বিভক্ত করে দ্বৈত শাসনব্যবস্থা (দুই জনের শাসন) প্রবর্তন করেন। ইব্রাহিম লোদির কনিষ্ঠ ভ্রাতা জালাল খান লোদিকে স্বাধীন সুলতান হিসেবে জৈনপুরের সিংহাসনে বসানো হয়। ইব্রাহিম লোদি প্রভাবশালী অভিজাত ফতেহ খান ও খান জাহানের সহায়তায় পরিস্থিতি মোকাবিলা করেন। ইব্রাহিম লোদির সেনাবাহিনীর হাতে পরাজিত হয়ে জালাল খান প্রথমে আগ্রা এবং পরে গোয়ালিয়র ও মালব হয়ে হানসিতে আশ্রয় নেন। ফলে দ্বৈত শাসনের অবসান ঘটে।

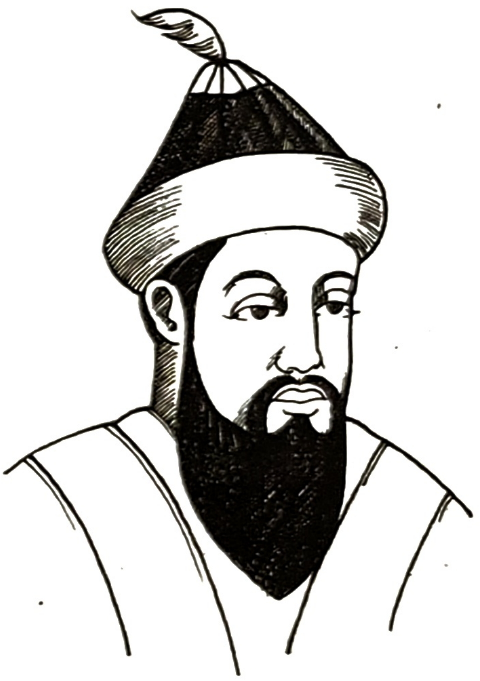
ইব্রাহিম লোদি

জালাল খানকে আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে ইব্রাহিম লোদি গোয়ালিয়র আক্রমণ ও দখল করেন। অবশ্য তার মেবার দখলের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ইব্রাহিম লোদি উদ্ধত আফগান অভিজাতদের দমন করেন। তবে অভিজাতদের প্রভাব হ্রাস ও ক্ষমতাহীন করায় সুলতানের এ নীতিই শেষ পর্যন্ত তার পতনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইব্রাহিম লোদির উদ্ধত ব্যবহার ও কঠোর নীতিতে বিরক্ত হয়ে আফগান অভিজাতরা সময়-সুযোগমতো বিদ্রোহ ও স্বাধীনতা ঘোষণা করতে থাকেন। বিহারের শাসনকর্তা দরিয়া খান লোহানি সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। দরিয়া খানের পুত্র বাহাদুর খান সুলতান মুহাম্মদ শাহ উপাধি ধারণ করেন। পাঞ্জাবের শাসনকর্তা ছিলেন দৌলত খান। তার পুত্র দিলওয়ার খান দিল্লিতে সুলতান ইব্রাহিম লোদির কাছে অপমানিত হলে দৌলত খান ক্ষুব্ধ হন এবং কাবুল অধিপতি বাবরকে দিল্লি আক্রমণের আমন্ত্রণ জানান। ইব্রাহিম লোদির চাচা আলম খান লোদি দিল্লি থেকে পালিয়ে কাবুলে যান এবং তিনিও বাবরকে দিল্লি আক্রমণের অনুরোধ জানান।

পানিপথের প্রথম যুদ্ধ ও লোদি বংশের পতন: কাবুলের অধিপতি ভাগ্যান্বেষী মুঘল নেতা বাবর আফগান অভিজাতদের এ আমন্ত্রণ সানন্দচিত্তে গ্রহণ করেন এবং ভারত আক্রমণ শুরু করেন। ১৫২৪ খ্রিষ্টাব্দে বাবর লাহোর ও পাঞ্জাব অধিকার করার পর সরাসরি ইব্রাহিম লোদির মুখোমুখি হন। ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দের ২০ এপ্রিল পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবরের নেতৃত্বাধীন মুঘল বাহিনীর কাছে ইব্রাহিম লোদি পরাজিত ও নিহত হন। এর ফলে ভারতবর্ষে শুধু লোদি শাসনের অবসান ঘটেনি, বরং দিল্লি সালতানাতেরও চূড়ান্ত পতন ঘটে এবং ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

মূল্যায়ন: ইব্রাহিম লোদি ছিলেন একজন পরিশ্রমী, নির্ভীক ও সাহসী যোদ্ধা। ধার্মিকতা ও বদান্যতার জন্য তিনি সুনাম অর্জন করলেও শাসক হিসেবে তার অনেক সীমাবদ্ধতা ছিল। তার মধ্যে সুবুদ্ধি ও সংযমের অভাব ছিল। আফগান অভিজাতদের দমন করার যে নীতি তিনি গ্রহণ করেছিলেন তা সঠিক ছিল। তবে আর. পি. ত্রিপাঠি মনে করেন "এ নীতি বাস্তবায়নে তিনি যে উপলক্ষ ও কার্যপদ্ধতি বেছে নিয়েছিলেন তা ছিল মারাত্মক ভুল"। নিজে আফগান হয়েও তিনি আফগান চরিত্র উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাই তার অনুসৃত রাজনৈতিক দর্শনে আফগান অভিজাতরা তার শত্রুতে পরিণত হয়। পরিণামে এটি তার পতনের অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

জেনে রাখো

পানিপথ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থান। এটি ভারতের হরিয়ানা রাজ্যের পানিপাত জেলার একটি শহর। এ শহরটি 'উইভিং সিটি অব ইন্ডিয়া' নামে পরিচিত। এ স্থানে তিনটি যুদ্ধ হয়েছিল। পানিপথের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দের ২১ এপ্রিল। এ যুদ্ধ হয়েছিল মুঘল সম্রাট বাবর ও দিল্লির শেষ সুলতান ইব্রাহিম লোদির মধ্যে। এ যুদ্ধে বাবর জয়লাভ করেছিলেন। পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে মুঘল সম্রাট আকবর ও আফগান সেনাপতি হিমুর (হেমচন্দ্র বিক্রমাধিত্য) মধ্যে। এ যুদ্ধে আকবর জয় লাভ করেন। ১৭৬১ খ্রিষ্টাব্দে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল আফগান নেতা আহমদ শাহ আবদালী (দুরানি সাম্রাজ্য ও আফগানিস্তানের জনক) ও মারাঠাদের মধ্যে। এ যুদ্ধে আহমদ শাহ আবদালী বিজয় লাভ করেন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. দিল্লি সালতানাতের শেষ শাসক বংশ কোনটি?
২. লোদি বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?
৩. লোদি বংশের শাসকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কে?
৪. দিল্লি সালতানাতের শেষ সুলতান কে? *[ঢা. বো., রা. বো., চ. বো. ২০১৭; সকল বোর্ড ২০১৫]*
৫. কোন যুদ্ধের মাধ্যমে দিল্লি সালতানাতের পতন ঘটে?
৬. পানিপথের প্রথম যুদ্ধ কাদের মধ্যে সংঘটিত হয়?

উত্তরের জন্য ১৩৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. লোদি বংশের শাসকদের শাসনকালসহ নামের একটি চার্ট তৈরি করো।
২. সুলতান বাহলুল লোদি যেসব রাজ্য জয় করেন তার একটি তালিকা তৈরি করো।

গ. দলীয় কাজ

লোদি বংশের পতনের কারণ নিয়ে একটি স্লাইড তৈরি করে শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিতে উপস্থাপন করো।

পাঠ ৩০

দিল্লি সালতানাতের ক্রমাবনতি ও পতন
Gradual Decline and Fall of the Delhi Sultanate

গজনির সাথে রাজনৈতিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে কুতুবউদ্দিন আইবেকের স্বাধীন ও সার্বভৌম শাসক হিসেবে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে সুলতানি শাসন শুরু হয়। তিনশ বছরেরও অধিক সময় রাজত্বের পর ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে সুলতান ইব্রাহিম লোদির পরাজয়ের মধ্য দিয়ে দিল্লি সালতানাতের পতন ঘটে। সালতানাত যুগে ৫টি রাজবংশ শাসন করে। সুলতানি আমলে ভারতে মুসলিম আধিপত্য বিস্তার লাভ করে এবং দাক্ষিণাত্যের দ্বারসমুদ্র পর্যন্ত মুসলিম বিজয় ও অধিকার প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রকৃতির বিধান অনুযায়ী উত্থানের পর পতন অনিবার্য। বস্তুত তুঘলক বংশের পতনের মধ্য দিয়ে দিল্লি সালতানাতের ক্রমাবনতি ও পতন প্রক্রিয়া শুরু হয়। সৈয়দ বংশের শাসনামলে পতন প্রক্রিয়া আরও ত্বরান্বিত হয় এবং লোদি বংশের শাসনের অবসানের মধ্য দিয়ে দিল্লি সালতানাতের চূড়ান্ত পতন ঘটে।

পতনের কারণ (Causes of the Downfall)

অভ্যন্তরীণ কারণ (Internal Causes)

ব্যক্তিনির্ভর একনায়কতন্ত্রের প্রতিক্রিয়া: দিল্লি সালতানাতের ভিত্তি ছিল ব্যক্তিনির্ভর একনায়কতান্ত্রিক স্বৈরশাসন। এতে সমগ্র ক্ষমতার উৎস ছিলেন স্বয়ং সুলতান। সুলতানের নিজস্ব ক্ষমতার ওপর সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও স্থিতিশীলতা নির্ভরশীল ছিল। সুলতান শক্তিমান ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হলে সাম্রাজ্যে সুশাসনসহ সর্বত্র নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় থাকত। অন্যদিকে, সুলতান অযোগ্য, ব্যক্তিত্বহীন ও দুর্বল হলে সাম্রাজ্যে অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠত। রূঢ় হলেও সত্য যে দিল্লি সালতানাতের তিনশ বছরের শাসনকালে সুলতান ইলতুৎমিশ, গিয়াসউদ্দিন বলবন, আলাউদ্দিন খলজি এবং মুহাম্মদ বিন তুঘলক ছাড়া প্রায় সব সুলতানই ছিলেন অকর্মণ্য, দুর্বল ও অযোগ্য। ব্যক্তিনির্ভর একনায়কতান্ত্রিক স্বৈরশাসন ব্যবস্থায় এসব দুর্বল সুলতানদের শাসনামলে সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিদ্রোহ, বিশৃঙ্খলা ও দুর্নীতি প্রকট আকার ধারণ করে। পরিণামে দিল্লি সালতানাতের পতন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়।

জেনে রাখো

একনায়কতন্ত্র সরকারের একটি প্রকারভেদ, যেখানে সবধরনের রাজনৈতিক, সামাজিক ক্ষমতা একজনের হাতে কুক্ষিগত থাকে। এ ব্যবস্থায় একটি মাত্র রাজনৈতিক দল থাকে এবং সব সিদ্ধান্ত সরকার একাই নিয়ে থাকে। এ ব্যবস্থায় সরকার যখন স্বেচ্ছাচারিতা প্রকাশ করে জনগণের সিদ্ধান্ত, সংবিধান, আইনের রীতিনীতির তোয়াক্কা না করে এককভাবে সিদ্ধান্ত নেয় তখন তা স্বৈরশাসন হিসেবে পরিগণিত হয়। জার্মানির এডলফ হিটলার, ইতালির বেনিতো মুসোলিনি ছিলেন একনায়কের উজ্জ্বল উদাহরণ।

কেন্দ্রীয় শাসনের শৈথিল্য: কেন্দ্রীয় শাসনের শৈথিল্য দিল্লি সালতানাতের পতনের অন্যতম কারণ ছিল। বিশাল দিল্লি সালতানাতে প্রদেশগুলোর ওপর কেন্দ্রীয় শাসনের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা জরুরি ছিল। কিন্তু দীর্ঘ সুলতানি শাসনের ইতিহাসে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন এবং আলাউদ্দিন খলজি প্রমুখ কয়েকজন ছাড়া আর কোনো সুলতান এ ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে পারেননি।

প্রাদেশিক শাসনের দুর্বলতা: প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ ছিলেন নিজ নিজ প্রদেশের সর্বময়কর্তা। প্রাদেশিক সেনাবাহিনী ও রাজস্বব্যবস্থা তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতা ও শিথিলতার সুযোগে প্রদেশপালরা প্রায়ই স্বাধীনতা ঘোষণা করতেন। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি প্রাদেশিক সরকারের আনুগত্যের অভাব এবং কেন্দ্রবিমুখী প্রবণতা দিল্লি সালতানাতের পতনের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সুষ্ঠু উত্তরাধিকারী নীতির অভাব: দিল্লি সালতানাতে উত্তরাধিকারের সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট ও সুপ্রতিষ্ঠিত কোনো নীতিমালা ছিল না। শুধু সুলতান নয়, অভিজাতগণও উত্তরাধিকার বা সুলতান মনোনয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখতেন। রাজতান্ত্রিক ঐতিহ্য অনুসারে জ্যেষ্ঠপুত্রের অধিকার সবসময় স্বীকৃতি পায়নি। ফলে সুলতানদের বৃদ্ধাবস্থায় বা মৃত্যুর পর একাধিক পুত্র বা নিকটাত্মীয়দের মধ্যে সিংহাসনের দাবি নিয়ে দ্বন্দ্ব, গৃহ-বিবাদ, অন্তর্কলহ, বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলা ও হত্যাকাণ্ড সুলতানি যুগের শেষদিকে মারাত্মক রূপ পরিগ্রহ করে, যা পরিণামে সুলতানি শাসনের ভিত্তিকে দুর্বল করে ফেলে।

সামরিক বাহিনীর দুর্বলতা: জনসমর্থন বা জনগণের স্বাভাবিক আনুগত্যের ওপর নয় সুলতানি শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল সামরিক শক্তির ওপর। সামরিক বাহিনীর কর্মক্ষমতা ও শক্তিমত্তার ওপর সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের বিষয়টি জড়িত ছিল। কিন্তু সুলতানি যুগে সব সময় সেনাবাহিনীর শক্তিমত্তাকে ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। সেনাবাহিনীর কর্মকুশলতা রক্ষা এবং তাদের দুর্নীতিমুক্ত রাখার লক্ষ্যে আলাউদ্দিন খলজি সেনাবাহিনী থেকে জায়গির প্রথার উচ্ছেদসহ নানা পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। কিন্তু ফিরোজ শাহ তুঘলকের সময় জায়গির প্রথা পুনঃপ্রবর্তনসহ সেনাবাহিনীতে বংশানুক্রমিক নিয়োগ-নীতি গ্রহণের ফলে সেনাবাহিনী দুর্বল ও দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এ দুর্বল সেনাবাহিনীর পক্ষে বিশাল সাম্রাজ্যের সংহতি রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

সালতানাতের বিশালতা: আকার আয়তনে দিল্লি সালতানাত ছিল বিশাল ও বিস্তৃত। এ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য প্রয়োজন ছিল প্রতিভাবান দক্ষ শাসকের যিনি কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপের মাধ্যমে সাম্রাজ্যের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে পারবেন। কিন্তু সুদীর্ঘ সুলতানি যুগ পর্বে যোগ্য ও দক্ষতাসম্পন্ন রাষ্ট্রনায়কের সংখ্যা ছিল খুবই অল্প। দুর্বল সুলতানদের অযোগ্যতার কারণে বিশাল সাম্রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত অনিবার্য পতনের দিকে ধাবিত হয়।

সামন্তপ্রথার কুফল: দিল্লি সালতানাতের ক্ষয়িষ্ণু সামন্তব্যবস্থা এর পতনের অন্যতম কারণ ছিল। সমগ্র সাম্রাজ্যকে ক্ষমতালিপ্সু শাসনকর্তাদের অধীনে অসংখ্য জায়গিরে বিভক্ত করার ফলে কেন্দ্রীয় শাসন দুর্বল হয়ে যায় এবং সালতানাতের সার্বভৌমত্ব সংকুচিত হয়ে পড়ে।

অভিজাতদের মধ্যে দ্বন্দ্ব: সুলতানি যুগে শাসকদের অভিজাতদের ওপর নির্ভরশীলতা ছিল। সুলতানগণ নিজ স্বার্থেই তুর্কি-অতুর্কি ও স্থানীয় অভিজাতদের দরবারে প্রতিষ্ঠা করতেন। সামরিক ও বেসামরিক উচ্চ পদে তাদের নিয়োগ দেওয়া হতো। এভাবে অভিজাততন্ত্র দিল্লি সালতানাতের সহায়ক শক্তিতে পরিণত হয়। সুলতানি যুগের শেষপর্বে ক্ষমতার প্রশ্নে অভিজাতশ্রেণির মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত সালতানাতকে অস্থিতিশীল করে তুলেছিল।

ক্রীতদাস প্রথার প্রতিক্রিয়া: রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সুলতানদের ক্রীতদাস প্রতিপালন এবং তাদের সামরিক ও বেসামরিক গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগে ক্রীতদাসদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। বিশাল ক্রীতদাস প্রতিপালনে রাষ্ট্রের বিপুল অর্থ ব্যয় এবং এদের ক্ষমতার দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ার ঘটনা দিল্লি সালতানাতের সংহতির ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

জেনে রাখো

সামন্ততন্ত্র বলতে মূলত এক প্রকার ভূমি ব্যবস্থাপনাকে বোঝায়। এর ইংরেজি Feudalism শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Feudal (সামন্ত) থেকে এসেছে। উৎপত্তিগতভাবে সামন্ততন্ত্র ল্যাটিন শব্দ Feudam থেকে এসেছে। Feudam অর্থ Fief বা ক্ষুদ্র জমি। সামন্ততন্ত্রের বিকাশের সময় সম্পদ ও ক্ষমতার উৎস ছিল একমাত্র জমি। তাই তখন জমির মালিকেরাই ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। সামন্ত প্রথায় উৎপাদন কাজে ভূমি মালিকদের কোনো ভূমিকা ছিল না। কৃষক ও ভূমিদাসরা উৎপাদন করত কিন্তু উৎপাদিত ফসলের অধিকাংশ পেত সামন্ত প্রভু তথা ভূমি মালিকেরা। এতে সমাজের শক্তিশালী মানুষেরা লাভবান, আর দুর্বল মানুষেরা বঞ্চিত হতো।

হিন্দু ও শিয়াদের বিরোধিতা: এ কথা সত্য যে, রাজনৈতিক কারণে কয়েকজন সুলতান ধর্মীয় সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতে পারেননি। অমুসলিম হিন্দু সম্প্রদায় এমনকি শিয়া মুসলিম সম্প্রদায়ও তাদের অবিচারের শিকার হয়েছিল। আবার পরমতসহিষ্ণুতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অনেক সুলতান হিন্দু সম্প্রদায়কে পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতাদানসহ উচ্চ রাজকাজে অংশগ্রহণেরও সুযোগ দিয়েছিলেন। তারপর সুলতানরা হিন্দুদের মন জয় এবং তাদের আস্থা অর্জন করতে পারেননি। উত্তর ভারতের রাজপুত ও দাক্ষিণাত্যের হিন্দুরা সুযোগ পেলেই স্বাধীনতা ঘোষণা করত। ভারতবর্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের বিরোধিতা ও অসহযোগিতা সালতানাতের সংহতিকে বিপন্ন করে তুলেছিল। সুন্নি শাসনে নিজেদের ন্যায্য অধিকার না পাওয়ার অভিযোগে ভারতের শিয়া মুসলমানরাও সুলতানি শাসনের বিরোধিতা করে।

নৈতিক অবক্ষয়: দিল্লি সালতানাতের শেষ পর্বের অধিকাংশ সুলতান এমনকি অভিজাতরাও রাজ্য শাসন অপেক্ষা বিলাস-ব্যসনে বেশি মত্ত থাকতেন। অতিরিক্ত মদপান, ব্যভিচার ও দুর্নীতি তাদের স্বাভাবিক কর্মক্ষমতাকে নষ্ট করে দিয়েছিল। ফলে তারা সাম্রাজ্যের সুশাসন, সংহতি ধরে রাখতে ব্যর্থ হন।

ত্রুটিপূর্ণ শাসননীতি: কোনো কোনো সুলতানের ত্রুটিপূর্ণ শাসননীতি দিল্লি সালতানাতের পতনের অন্যতম কারণ ছিল। যেমন— মুহাম্মদ বিন তুঘলকের অবাস্তব উচ্চাভিলাষী মহাপরিকল্পনা এবং সুলতান ফিরোজ শাহের উদার শাসননীতি ইত্যাদি।

বৈদেশিক কারণ (External Causes)

মোঙ্গল আক্রমণ: গোটা সুলতানি শাসনামলে সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে অসংখ্যবার মোঙ্গলরা ভারত আক্রমণ করেছে। তাদের আক্রমণে অনেক জনপদ ধ্বংস হয়েছে এবং লুণ্ঠনে অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছে। তাছাড়া মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করতে সুলতানদের ব্যতিব্যস্ত থাকার ফলে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও সাম্রাজ্য সুদৃঢ়ীকরণের কাজ ব্যাহত হয়েছে।

তৈমুর লঙের আক্রমণ: নানা কারণে দিল্লি সালতানাত যখন পতনোম্মুখ ঠিক সেই সময় মধ্য এশিয়ার দুর্ধর্ষ সমরনেতা আমির তৈমুর লঙ ভারত আক্রমণ করেন (১৩৯৮-৯৯ খ্রি.)। তার নৃশংস হত্যাযজ্ঞ ও লুণ্ঠন দিল্লি সালতানাতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়। এ সুযোগে সালতানাতের বিভিন্ন অঞ্চল কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। দিল্লি সালতানাতের পতনের বিষয়টি শুধু সময়ের ব্যাপারে পরিণত হয়।

বাবরের আক্রমণ ও সালতানাতের পতন: লোদি বংশের শেষ সুলতান ইব্রাহিম লোদির প্রশাসনিক দুর্বলতা, তার ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ ও আফগান আমিরদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি খর্ব করার প্রচেষ্টায় কায়েমী স্বার্থান্বেষী অভিজাতবর্গ সুলতানের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিল। এ অবস্থায় পাঞ্জাবের উচ্চাভিলাষী শাসনকর্তা দৌলত খান লোদি ও সিংহাসন প্রত্যাশী আলম খান লোদি কাবুল অধিপতি বাবরকে দিল্লি আক্রমণের আমন্ত্রণ জানান। গৃহদাহে জর্জরিত দিল্লি সালতানাতের তৎকালীন পরিস্থিতিতে ভাগ্যান্বেষী বাবর সাফল্যের নিশ্চিত সম্ভাবনা দেখতে পান। কাজেই অসন্তুষ্ট অভিজাতদের আমন্ত্রণ সানন্দে গ্রহণ করে তিনি ভারত আক্রমণ করেন। পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবর ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করেন। এর ফলে ভারতে লোদি তথা দিল্লি সালতানাতের চূড়ান্ত পতন ঘটে এবং মুঘল শাসনের ভিত রচিত হয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কত খ্রিষ্টাব্দে দিল্লি সালতানাতের পতন ঘটে?
২. সালতানাত যুগে কয়টি রাজবংশ দিল্লি শাসন করে?
৩. দিল্লি সালতানাতের ভিত্তি কী ছিল?
৪. মধ্য এশিয়ার দুর্ধর্ষ সমরনেতা তৈমুর লঙ কখন ভারত আক্রমণ করেন?
৫. পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খান লোদি এবং আলম খান লোদি কাকে দিল্লি আক্রমণের আমন্ত্রণ জানান?
৬. দিল্লি সালতানাতের পতনের পর কোন শাসনের ভিত রচিত হয়?

উত্তরের জন্য ১৩৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

দিল্লি সালতানাতের পতনের কারণসমূহ খুঁজে বের করে ছক আকারে লেখো।

গ. দলীয় কাজ

দিল্লি সালতানাতের বিভিন্ন শাসক সম্পর্কে উপস্থিত বক্তৃতার আয়োজন করো। (বক্তব্যের বিষয় লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত হবে।)

পাঠ মূল্যায়নের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর

পাঠ-১: ১. ভারতে; ২. মামলুক বা দাস বংশ; ৩. এগারো; ৪. ১২০৬; ৫. গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ; ৬. ৮৪।

পাঠ-২: ১. চন্দ্রদেবতা; ২. মুহাম্মদ ঘুরি; ৩. ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ জুন; ৪. জালালউদ্দিন শাহ; ৫. আলী মর্দান; ৬. ১২১০।

পাঠ-৩: ১. কুতুবউদ্দিন আইবেকের; ২. কুতুবউদ্দিন আইবেক; ৩. কুতুবউদ্দিন আইবেক; ৪. দিল্লিতে; ৫. কুতুবউদ্দিন আইবেকের; ৬. প্রখ্যাত সাধক কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকীর।

পাঠ-৪ ও ৫: ১. তুর্কিস্তানের ইলবারি গোত্রে; ২. কুতুবউদ্দিন আইবেক; ৩. ১২১১; ৪. নাসিরউদ্দিন কুবাচা; ৫. আলী মর্দান খলজি; ৬. সুলতান-ই-আজম।

পাঠ-৬: ১. সুলতান শামসউদ্দিন ইলতুৎমিশ; ২. সুলতান ইলতুৎমিশ; ৩. রূপাইয়া; ৪. সুলতান ইলতুৎমিশ; ৫. সুলতান ইলতুৎমিশ; ৬. সুলতান ইলতুৎমিশের।

পাঠ-৭ ও ৮: ১. সুলতান রাজিয়া; ২. সুলতান ইলতুৎমিশ; ৩. ১২৩৬; ৪. ভাতিন্ডার শাসনকর্তা মালিক আলতুনিয়াকে; ৫. মুইজউদ্দিন বাহরাম শাহের; ৬. বিশ বছর।

পাঠ-৯: ১. বাহাউদ্দিন; ২. সুলতান রাজিয়ার; ৩. উলুঘ খান; ৪. ১২৬৫ খ্রিষ্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারি; ৫. সুলতান বলবন; ৬. পৌরাণিক বীর আফরাসিয়াবের।

পাঠ-১০ ও ১১: ১. সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন; ২. সুলতান বলবন; ৩. দোয়াব; ৪. সুলতান বলবন; ৫. মোঙ্গলদের; ৬. তুঘরিল খান।

পাঠ-১২ ও ১৩: ১. গিয়াসউদ্দিন বলবনের; ২. আল্লাহর; ৩. গিয়াসউদ্দিন বলবনের; ৪. পারস্যের (ইরান); ৫. নিরঙ্কুশ স্বৈরতন্ত্র; ৬. বুঘরা খানের পুত্র কায়কোবাদকে।

পাঠ-১৪: ১. ১২৯০; ২. জালালউদ্দিন ফিরোজ খলজি; ৩. ১২৯০-১৩২০ খ্রি.; ৪. আফগানদের; ৫. কালিজ; ৬. জালালউদ্দিন ফিরোজ খলজি।

পাঠ-১৫: ১. ১২৯৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ জুলাই; ২. ১২৯৬-১৩১৬; ৩. সুলতান আলাউদ্দিন খলজি; ৪. সেনাপতি উলুগ খান ও জাফর খানের; ৫. ১৩০৭; ৬. সুলতান আলাউদ্দিন খলজি।

পাঠ-১৬: ১. আলাউদ্দিন খলজি; ২. গুজরাট; ৩. সেনাপতি উলুগ খান ও নসরত খানের; ৪. উলুগ খানের; ৫. ১৩০৩; ৬. মারোয়ার।

পাঠ-১৭: ১. সুলতান আলাউদ্দিন খলজি; ২. মালিক কাফুর; ৩. যাদব বংশীয় রামচন্দ্র দেব; ৪. তেলেঙ্গানার রাজধানী বরঙ্গল; ৫. মালিক কাফুরকে; ৬. সুলতান আলাউদ্দিন খলজির দাক্ষিণাত্য বিজয়।

পাঠ-১৮: ১. সুলতান আলাউদ্দিন খলজি; ২. আলাউদ্দিন খলজি; ৩. আলাউদ্দিন খলজি; ৪. ভূমিকর; ৫. দোয়াব অঞ্চল; ৬. সুলতান আলাউদ্দিন খলজির।

পাঠ-১৯: ১. সুলতান আলাউদ্দিন খলজি; ২. ৫ জিতল (এক জিতল= ০.৬ পয়সা); ৩. মান্ডি; ৪. পণ্য বাজার পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান; ৫. আলাউদ্দিন খলজি; ৬. মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে।

পাঠ-২০: ১. ১৩১৬ খ্রিষ্টাব্দের ২ জানুয়ারি; ২. আলাউদ্দিন খলজি; ৩. ইবনে বতুতা; ৪. আলাউদ্দিন খলজি; ৫. আলাউদ্দিন খলজি; ৬. কবি আমির খসরু।

পাঠ-২১: ১. সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক; ২. ১৩২০-১৪১৩; ৩. গাজি মালিক ৪. গাজি তুঘলক; ৫. গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের জ্যেষ্ঠপুত্র ফখরুদ্দিন জুনা খানকে; ৬. জুনা খানের।

পাঠ-২২: ১. মুহাম্মদ বিন তুঘলক (জুনা খান); ২. দিল্লির লাল প্রাসাদে; ৩. দিওয়ান-ই-কোহি; ৪. ৬০ বর্গমাইল; ৫. পাঁচটি ৬. রাজ্য বিস্তার পরিকল্পনা।

পাঠ-২৩: ১. সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক; ২. ৭০০ মাইল; ৩. মুহাম্মদ বিন তুঘলক; ৪. দোয়াব; ৫. দোয়াব; ৬. মুহাম্মদ বিন তুঘলক।

পাঠ-২৪: ১. ৩,৭০,০০০; ২. কারাচিল অভিযান (কারাজল বা কুর্মাচল নামেও পরিচিত); ৩. চীন ও হিন্দুস্থানের মধ্যবর্তী হিমালয়ের পাদদেশে; ৪. ১৩৩২-১৩৩৩ খ্রি. ; ৫. ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ; ৬. ১৩৩৮।

পাঠ-২৫: ১. মুহাম্মদ বিন তুঘলককে; ২. মুহাম্মদ বিন তুঘলককে; ৩. সাদী; ৪. মুহাম্মদ বিন তুঘলকের সময় (১৩৩৩ খ্রি.); ৫. ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ; ৬. ইবনে বতুতা ।

পাঠ-২৬: ১. ১৩৫১ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মার্চ; ২. মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বের শেষদিকে; ৩. শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ; ৪. শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের; ৫. ফিরোজ শাহ তুঘলক; ৬. ১৩৬১-১৩৬২।

পাঠ-২৭: ১. ফিরোজ শাহ তুঘলক; ২. ২৩ প্রকার; ৩. সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক; ৪. দাসদের; ৫. ফিরোজ শাহ তুঘলক; ৬. ফিরোজ শাহ তুঘলক।

পাঠ-২৮: ১. সৈয়দ বংশ; ২. খিজির খান; ৩. খিজির খান; ৪. খিজির খানকে; ৫. মোবারক শাহ; ৬. লোদি।

পাঠ-২৯: ১ লোদি বংশ; ২. সুলতান বাহলুল লোদি; ৩. সুলতান সিকান্দার লোদি ; ৪. ইব্রাহিম লোদি; ৫. পানিপথের প্রথম যুদ্ধ; ৬. ইব্রাহিম লোদি এবং মুঘল শাসক বাবর।

পাঠ-৩০: ১. ১৫২৬; ২. ৫টি; ৩. ব্যক্তিনির্ভর একনায়কতান্ত্রিক স্বৈরশাসন; ৪. ১৩৯৮-৯৯ খ্রি.; ৫. কাবুল অধিপতি বাবরকে; ৬. মুঘল।

এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

সালতানাত যুগ	সালতানাত যুগ বলতে ভারতীয় উপমহাদেশে ১২০৬-১৫২৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মুসলিম শাসনকালকে বোঝায়। এ সময় মোট পাঁচটি মুসলিম রাজবংশ ভারত শাসন করে। যথা– মামলুক বা দাস (১২০৬-১২৯০ খ্রি.), খলজি (১২৯০-১৩২০ খ্রি.), তুঘলক (১৩২০-১৪১৩ খ্রি.), সৈয়দ (১৪১৩-১৪৫১ খ্রি.) এবং লোদি বংশ (১৪৫১-১৫২৬ খ্রি.)। কুতুবউদ্দিন আইবেক এবং তার পরবর্তী ভারতীয় মুসলিম শাসকবৃন্দ 'সুলতান' উপাধি ধারণ করে রাজকার্য পরিচালনা করতেন। তাই ভারতের মুসলিম শাসনের এ কালপর্ব 'সালতানাত যুগ' নামে পরিচিত।
আইবেক	'আইবেক' শব্দের অর্থ 'চন্দ্র দেবতা'। ভারতে স্বাধীন দিল্লি সালতানাত প্রতিষ্ঠাকারী কুতুবউদ্দিন আইবেক চন্দ্রগ্রহণকালে জন্মগ্রহণ করেন বলে তাকে 'আইবেক' নামে অভিহিত করা হয় বলে ঐতিহাসিক ডব্লিউ হেগ মনে করেন। কিন্তু ঐতিহাসিক আবুল কাশিম ফিরিশতার মতে, কুতুবউদ্দিনের বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুলটি ভাঙা ছিল বলে তাকে আইবেক বলা হয়। আবার অনেকে মনে করেন, কুতুবউদ্দিনের নিজ বংশের নাম ছিল আইবেক। আর এ কারণেই তার নামের সাথে আইবেক যুক্ত করা হয়।
লাখ বক্স	সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেককে লাখ বক্স বলা হয়। তিনি প্রতিদিন লাখ লাখ টাকা মানুষকে দান করতেন বলে তাকে লাখ বক্স বা লাখ টাকা দানকারী উপাধি দেওয়া হয়। সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক ছিলেন একজন মহানুভব শাসক। তার বদান্যতা কিংবদন্তির পর্যায়ভুক্ত ছিল। আর দানশীলতায় তিনি ছিলেন ছিলেন দ্বিতীয় হাতেম।
কুতুব মিনার	দিল্লি সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা কুতুবউদ্দিন আইবেক ১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে রাজ্য বিজয়ের স্মারক ও ইসলামের বিজয়গাথা বিশ্বদরবারে উপস্থাপনের জন্য দিল্লিতে 'কুতুব মিনার' বিজয় স্মৃতিস্তম্ভের নির্মাণ কাজ শুরু করেন। পরবর্তী সুলতান ইলতুৎমিশ এর নির্মাণ কাজ শেষ করেন। প্রখ্যাত সাধক কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকীর নামে এ মিনারটির নামকরণ হয়। এটি ছিল তৎকালীন বিশ্বের সর্বোচ্চ মিনার। এটি আজানের জন্য ব্যবহৃত হতো। মিনারটি সাতটি স্তরে বিভক্ত ছিল। উপরের দুটি স্তর ভেঙে গিয়েছে। অক্ষত অবস্থায় এর উচ্চতা ছিল ৩০০ ফুট, বর্তমানে ২৩৮ ফুট। এটি ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যশিল্পের একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি হিসেবে বিবেচিত।
বন্দেগান-ই-চেহেলগান	'বন্দেগান-ই-চেহেলগান' অর্থ চল্লিশ দাস গোষ্ঠী। সুলতান ইলতুৎমিশের সময়ে (১২১১-১২৩৬ খ্রি.) চল্লিশজন বিশ্বস্ত ও সুযোগ্য ক্রীতদাস নিয়ে গঠিত সংগঠনকে 'বন্দেগান-ই-চেহেলগান' বলা হয়। ইলতুৎমিশের সময় গঠিত 'বন্দেগান-ই-চেহেলগান' নামে ক্রীতদাসদের এ সংগঠনটি শাসনকার্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ইলতুৎমিশ পরবর্তী দুর্বল সুলতানদের (রুকনউদ্দিন ফিরোজ শাহ, মুইজউদ্দিন বাহরাম শাহ প্রমুখ) শাসনামলে তারা সর্বেসর্বা হয়ে ওঠে এবং শাসনদণ্ড নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে। পরবর্তী সময়ে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন তাদেরকে কঠোরভাবে দমন করেন।
রক্তপাত ও কঠোর নীতি	অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন ও বহিঃশত্রুর কবল থেকে দিল্লি সালতানাতকে মুক্ত রাখার জন্য সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন রক্তপাত ও কঠোর নীতি (Blood and iron policy) গ্রহণ করেন। গিয়াসউদ্দিন বলবনের সময়ে তুর্কি অভিজাতদের ষড়যন্ত্র এবং বহিরাক্রমণ মারাত্মক রূপ ধারণ করে। সুলতান বলবন ষড়যন্ত্রপরায়ণ অভিজাতদের দমনের জন্য কঠোর শাসন নীতি গ্রহণ করেন। তাছাড়া মোঙ্গলদের আক্রমণ মোকাবিলা করার জন্যও তিনি কঠিন দৃঢ়তার পরিচয় দেন। মূলত অভ্যন্তরীণ কলহ ও বহিঃশত্রু দমনের জন্য গিয়াসউদ্দিন বলবন রক্তপাত ও কঠোর নীতি গ্রহণ করেন।

রাজতন্ত্র	ইংরেজি Monarchy শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ রাজতন্ত্র। রাজতন্ত্র বলতে নির্বাচন ছাড়া মনোনয়ন পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন করাকে বোঝায়। রাজতন্ত্রে রাষ্ট্রপ্রধানকে রাজা বলা হয়। রাজার মৃত্যুর পর তার বড় ছেলে বা ভাই রাজা হন। বর্তমান বিশ্বে দুই ধরনের রাজতন্ত্র চালু রয়েছে। যথা: ১. **নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র:** সৌদি আরবে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র চালু রয়েছে। ২. **সাংবিধানিক রাজতন্ত্র:** ইংল্যান্ড, থাইল্যান্ড, জাপান প্রভৃতি দেশে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র চালু আছে।
নওমুসলিম	জালালউদ্দিন খলজির সময় মোঙ্গল নেতা উলুগ খান প্রায় চার হাজার অনুচরসহ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে দিল্লিতে থেকে যান। ধর্মান্তরিত এ মোঙ্গলরা ইতিহাসে 'নওমুসলিম' নামে পরিচিত। সুলতান জালালউদ্দিন উলুগ খানের সাথে তার এক মেয়ের বিয়ে এবং অনুচরসহ তাকে দিল্লির উপকণ্ঠে বসবাসের অনুমতি দেন। তাদের অধ্যুষিত অঞ্চল পরে মোঙ্গলপুর নামে পরিচিতি লাভ করে। পরবর্তী সময়ে এসব নওমুসলিম দিল্লিতে নানা অনাচার শুরু করে। রাজকীয় সুযোগ-সুবিধা না পেয়ে তারা সুলতান আলাউদ্দিন খলজিকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে সুলতান আলাউদ্দিন ত্রিশ হাজার নওমুসলিমকে হত্যা করেন।
হাজার দিনারি	সুলতান আলাউদ্দিন খলজির সেনাপতি মালিক কাফুরকে হাজার দিনারি বলা হয়। ১২৯৯ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান আলাউদ্দিন খলজির বাহিনী যখন গুজরাট অভিযান করে, তখন সেনাপতি নুসরাত খান মালিক কাফুরকে বন্দি অবস্থায় দাস বাজার থেকে কিনে আনেন এবং সুলতানকে উপহার দেন। তার মূল্য ছিল এক হাজার দিনার। তাই তাকে 'হাজার দিনারি' বলা হয়। মোঙ্গল আক্রমণের সময় রণক্ষেত্রে তিনি অসামান্য বীরত্বের পরিচয় দেন। সুলতান আলাউদ্দিন খলজির দাক্ষিণাত্য বিজয়ের ডান হাত ছিলেন মালিক কাফুর। কিন্তু আলাউদ্দিনের ব্যক্তিগত রক্ষীরা তার এই উত্থানকে বিষনজরে দেখেছিলেন। তাই তারা সুযোগ বুঝে মালিক কাফুরকে হত্যা করেন।
মাতামহীসুলভ ব্যবস্থা	সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের গৃহীত কতগুলো মানবীয় সংস্কারমূলক কাজ ইতিহাসে মাতামহীসুলভ ব্যবস্থা (Grandmotherly Legislation) নামে পরিচিতি। ফিরোজ শাহ তুঘলক সিংহাসনে বসে দরিদ্র অসহায় মুসলমান মেয়েদের বিয়ের বন্দোবস্ত এবং অনাথ ও বিধবাদের ভরণপোষণের জন্য 'দিওয়ান-ই-খায়রাত' নামে আলাদা একটি বিভাগ গঠন করেন। বেকারদের চাকরি প্রদানের জন্য চাকরি দপ্তর প্রতিষ্ঠা করেন। অসুস্থ রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধপত্র প্রদানের জন্য দিল্লিতে 'বিমারিস্তান' বা দারুল শিফা নামে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। তার গৃহীত এ উদ্যোগগুলোকে মাতামহীসুলভ ব্যবস্থা বলা হয়।

▶ অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ সাল ও ঘটনা

সাল	ঘটনা
১২০৬	কুতুবউদ্দিন আইবেক দিল্লিতে স্বাধীন মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন করেন।
১২১১	লাহোরে চৌগান খেলার সময় কুতুবউদ্দিন আইবেক ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে মারাত্মক আহত হন এবং পরে তার মৃত্যু হয়।
১২১৩	দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা সুলতান ইলতুৎমিশ সিংহাসনে আরোহণ করেন।
১২৩৬	ইলতুৎমিশ মৃত্যুবরণ করেন।
১২৯০	তুর্কি মামলুক শাসনের অবসান ঘটে এবং ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাসে খলজি যুগের সূচনা হয়।
১২৯৬	সুলতান আলাউদ্দিন খলজি দিল্লির সিংহাসনে বসেন।
১৩০১	সুলতান আলাউদ্দিন খলজি রণথম্ভোর জয় করেন।
১৩০৩	সুলতান আলাউদ্দিন খলজি চিতোর জয় করেন এবং দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ আইন প্রবর্তন করেন।
১৩১৬	সুলতান আলাউদ্দিন খলজির শাসন শেষ হয়।
১৩২০	সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক "গাজী শাহ" উপাধি ধারণ করে দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং তুঘলক বংশ প্রতিষ্ঠা করেন।
১৩২৬-১৩২৭	মুহাম্মদ বিন তুঘলক রাজধানী দিল্লি থেকে দেবগিরিতে স্থানান্তর করেন।
১৩২৯-১৩৩০	মুহাম্মদ বিন তুঘলক প্রচলিত সোনা ও রুপার মুদ্রার পরিবর্তে তামার মুদ্রা প্রবর্তন করেন।
১৪১৪	তুঘলক শাসনের অবসান ঘটে এবং সৈয়দ বংশের গোড়াপত্তন হয়।
১৪৫১	সৈয়দ বংশের পতন হয় ও লোদি বংশের উত্থান ঘটে।
১৫২৬	পানিপথের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয় ও লোদি বংশের পতন ঘটে।

সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

ক. জ্ঞানমূলক

▩ কুতুবউদ্দিন আইবেক: দাস বংশ প্রতিষ্ঠা

প্রশ্ন-১. কত খ্রিষ্টাব্দে ভারতবর্ষে স্বাধীন দিল্লি সালতানাত যুগের সূচনা হয়?

উত্তর: ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে ভারতবর্ষে স্বাধীন দিল্লি সালতানাত যুগের সূচনা হয়।

প্রশ্ন-২. 'মামলুক' বা দাস বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?

উত্তর: 'মামলুক' বা দাস বংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন কুতুবউদ্দিন আইবেক।

প্রশ্ন-৩. দিল্লির প্রথম মুসলিম শাসক কে?

উত্তর: দিল্লির প্রথম মুসলিম শাসক কুতুবউদ্দিন আইবেক।

প্রশ্ন-৪. দাস বংশের কতজন শাসক ছিলেন?

উত্তর: দাস বংশের মোট ১১ জন শাসক ছিলেন।

প্রশ্ন-৫. ভারতে স্বাধীন মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন কে? */সকল বোর্ড ২০১৬, ২০১৫/*

উত্তর: ভারতে স্বাধীন মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন কুতুবউদ্দিন আইবেক।

প্রশ্ন-৬. 'আইবেক' শব্দের অর্থ কী? */সকল বোর্ড ২০১৯, ২০১৬/*

উত্তর: 'আইবেক' শব্দের অর্থ চন্দ্রদেবতা।

প্রশ্ন-৭.'লাখ বকস' কার উপাধি?

উত্তর: 'লাখ বকস' সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের উপাধি।

প্রশ্ন-৮. কুতুবউদ্দিনকে দাসত্ব মুক্তির সনদ প্রদান করেন কে?

উত্তর: মুহাম্মদ ঘুরি কুতুবউদ্দিনকে দাসত্ব মুক্তির সনদ প্রদান করেন।

প্রশ্ন-৯. কুতুবমিনারের নামকরণ কার নামানুসারে করা হয়? */সকল বোর্ড ২০১৮/*

উত্তর: কুতুবমিনারের নামকরণ হয় প্রখ্যাত সাধক কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকীর নামানুসারে।

প্রশ্ন-১০. 'আড়াই দিনকা ঝোপড়া' মসজিদ কে নির্মাণ করেন?

উত্তর: 'আড়াই দিনকা ঝোপড়া' মসজিদ কুতুবউদ্দিন আইবেক নির্মাণ করেন।

প্রশ্ন-১১. কুতুব মিনার কোথায় অবস্থিত?

উত্তর: কুতুব মিনার দিল্লিতে অবস্থিত।

প্রশ্ন-১২. কুতুব মিনারের নির্মাণ কাজ শুরু করেন কে?

উত্তর: কুতুবউদ্দিন আইবেক কুতুব মিনারের নির্মাণ কাজ শুরু করেন।

▩ ইলতুৎমিশ: দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা

প্রশ্ন-১৩. দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে?

উত্তর: দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা সুলতান ইলতুৎমিশ।

প্রশ্ন-১৪. ইলতুৎমিশ কত সালে সিংহাসনে বসেন?

উত্তর: ইলতুৎমিশ ১২১১ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন।

প্রশ্ন-১৫. 'সুলতান-ই-আযম' কোন সুলতানের উপাধি?

উত্তর: 'সুলতান-ই-আযম' সুলতান ইলতুৎমিশের উপাধি।

প্রশ্ন-১৬. বন্দেগান-ই-চেহ্‌লেগান কী?

উত্তর: বন্দেগান-ই-চেহ্‌লেগান হলো দিল্লির সুলতান ইলতুৎমিশের সময়ে চল্লিশজন তুর্কি অভিজাতদের সমন্বয়ে গঠিত একটি চক্র।

প্রশ্ন-১৭. বন্দেগান-ই- চেহ্‌লেগান (চল্লিশ চক্র) কে গঠন করেন? */সকল বোর্ড ২০১৯/*

উত্তর: বন্দেগান-ই-চেহ্‌লেগান (চল্লিশ চক্র) গঠন করেন সুলতান ইলতুৎমিশ।

প্রশ্ন-১৮. ইলতুৎমিশের সময়কালে লাহোরের শাসনকর্তা কে ছিলেন?

উত্তর: ইলতুৎমিশের সময়কালে লাহোরের শাসনকর্তা ছিলেন নাসিরউদ্দিন কুবাচা।

প্রশ্ন-১৯. কোন সুলতানকে 'আল্লাহর রাজ্যের রক্ষক' বলা হয়?

উত্তর: সুলতান ইলতুৎমিশকে 'আল্লাহর রাজ্যের রক্ষক' বলা হয়।

প্রশ্ন-২০. সুলতান ইলতুৎমিশ কত খ্রিষ্টাব্দে আব্বাসি খলিফার স্বীকৃতি লাভ করেন?

উত্তর: সুলতান ইলতুৎমিশ ১২২৯ খ্রিষ্টাব্দে আব্বাসি খলিফার স্বীকৃতি লাভ করেন।

প্রশ্ন-২১. উপমহাদেশে মুসলিম শাসকদের মধ্যে কে সর্বপ্রথম রৌপ্যমুদ্রার প্রবর্তন করেন?

উত্তর: সুলতান ইলতুৎমিশ উপমহাদেশে মুসলিম শাসকদের মধ্যে সর্বপ্রথম রৌপ্যমুদ্রার প্রবর্তন করেন।

▩ সুলতান রাজিয়া: কৃতিত্ব

প্রশ্ন-২২. ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাসে প্রথম মহিলা সুলতান কে?

উত্তর: ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাসে প্রথম মহিলা সুলতান হলেন রাজিয়া।

প্রশ্ন-২৩. সুলতান রাজিয়া কার কন্যা ছিলেন?

উত্তর: সুলতান রাজিয়া ইলতুৎমিশের কন্যা ছিলেন।

প্রশ্ন-২৪. সুলতান রাজিয়া কত খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন?

উত্তর: সুলতান রাজিয়া ১২৪০ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

প্রশ্ন-২৫. সুলতান রাজিয়া কাকে বিয়ে করেন?

উত্তর: সুলতান রাজিয়া ভাতিন্ডার শাসনকর্তা আলতুনিয়াকে বিবাহ করেন।

▩ গিয়াসউদ্দিন বলবন: সালতানাত সুদৃঢ়ীকরণ

প্রশ্ন-২৬. সুলতান নাসিরউদ্দিন বলবনকে কী উপাধি প্রদান করেন?

উত্তর: সুলতান নাসিরউদ্দিন বলবনকে 'উলুঘ খান' উপাধি প্রদান করেন।

প্রশ্ন-২৭. নাসিরউদ্দিনের মৃত্যুর পর কে দিল্লির সুলতান হন?

উত্তর: নাসিরউদ্দিনের মৃত্যুর পর গিয়াসউদ্দিন বলবন দিল্লির সুলতান হন।

প্রশ্ন-২৮. চল্লিশ চক্রের বিদ্রোহ দমন করেন কে?
উত্তর: গিয়াসউদ্দিন বলবন চল্লিশ চক্রের বিদ্রোহ দমন করেন।

প্রশ্ন-২৯. সাম্রাজ্য সুদৃঢ়ীকরণে সুলতান বলবনের গৃহীত নীতি কী নামে পারিচিত?
উত্তর: সাম্রাজ্য সুদৃঢ়ীকরণে সুলতান বলবনের গৃহীত নীতি 'Blood and Iron Policy' নামে পরিচিত।

প্রশ্ন-৩০. ভারতের তোতা পাখি বলা হয় কাকে? */সকল বোর্ড ২০১৮/*
উত্তর: আমির খসরুকে ভারতের তোতা পাখি বলা হয়।

প্রশ্ন-৩১. আমির খসরু কার সভাকবি ছিলেন?
উত্তর: আমির খসরু সুলতান বলবনের সভাকবি ছিলেন।

■ খলজি বংশ প্রতিষ্ঠা: জালালউদ্দিন খলজি

প্রশ্ন-৩২. খলজি বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?
উত্তর: খলজি বংশের প্রতিষ্ঠাতা জালালউদ্দিন খলজি।

প্রশ্ন-৩৩. ভিনসেন্ট স্মিথ খলজিদের কোন বংশোদ্ভূত বলে উল্লেখ করেছেন?
উত্তর: ভিনসেন্ট স্মিথ খলজিদের আফগান বংশোদ্ভূত বলে উল্লেখ করেছেন।

প্রশ্ন-৩৪. কাকে শায়েস্তা খান উপাধি দেওয়া হয়?
উত্তর: জালালউদ্দিন খলজিকে 'শায়েস্তা খান' উপাধি দেওয়া হয়।

প্রশ্ন-৩৫. ইতিহাসে নওমুসলিম নামে পরিচিত কারা?
উত্তর: ধর্মান্তরিত মোঙ্গলরা ইতিহাসে নওমুসলিম নামে খ্যাত।

■ আলাউদ্দিন খলজি: রাজ্য বিজয়, শাসনব্যবস্থা

প্রশ্ন-৩৬. আলাউদ্দিন খলজি কত খ্রিষ্টাব্দে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন?
উত্তর: আলাউদ্দিন খলজি ১২৯৬ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন।

প্রশ্ন-৩৭. সুলতানি আমলের আকবর বলা হয় কাকে?
উত্তর: সুলতানি আমলের আকবর বলা হয় সুলতান আলাউদ্দিন খলজিকে।

প্রশ্ন-৩৮. মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কে গ্রহণ করেন?
উত্তর: সুলতান আলাউদ্দিন খলজি মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন-৩৯. A Great Political Economist' বলা হয় কোন সুলতানকে?
উত্তর: সুলতান আলাউদ্দিন খলজিকে A Great Political Economist' বলা হয়।

প্রশ্ন-৪০. মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কী?
উত্তর: সুলতান আলাউদ্দিন খলজি বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য যে অর্থনৈতিক সংস্কারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তা-ই মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা হিসেবে পরিচিত।

প্রশ্ন-৪১. রাজস্ব কী?
উত্তর: রাষ্ট্রের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত ও জনকল্যাণের জন্য জনগণের দেওয়া নির্দিষ্ট পরিমাণ করকেই বলা হয় রাজস্ব।

প্রশ্ন-৪২. কোন সুলতান দ্বিতীয় আলেকজান্ডার উপাধি লাভ করেছিলেন?
উত্তর: সুলতান আলাউদ্দিন খলজি দ্বিতীয় আলেকজান্ডার উপাধি লাভ করেছিলেন।

প্রশ্ন-৪৩. মালিক কাফুর কে ছিলেন?
/দি. বো., কু. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০১৭/
উত্তর: মালিক কাফুর সুলতান আলাউদ্দিন খলজির প্রধান সেনাপতি ছিলেন।

প্রশ্ন-৪৪. সুলতান আলাউদ্দিন খলজি সামরিক বিভাগে দুর্নীতি রোধে কোন প্রথা চালু করেন?
উত্তর: সুলতান আলাউদ্দিন খলজি সামরিক বিভাগে দুর্নীতি রোধে 'দাগ' ও 'হুলিয়া' প্রথা চালু করেন।

প্রশ্ন-৪৫. আলাউদ্দিন খলজির বাজার পরিদর্শকের পদবি কী ছিল?
উত্তর: আলাউদ্দিন খলজির বাজার পরিদর্শকের পদবি ছিল শাহানা ই মান্ডি, এবং দিউয়ান-ই রিয়াসাত।

■ তুঘলক বংশ প্রতিষ্ঠা: গিয়াসউদ্দিন তুঘলক

প্রশ্ন-৪৬. তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? */সকল বোর্ড ২০১৭/*
উত্তর: তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন গিয়াসউদ্দিন তুঘলক।

প্রশ্ন-৪৭. আলাউদ্দিন খলজি গিয়াসউদ্দিনকে কী উপাধি দেন?
উত্তর: আলাউদ্দিন খলজি গিয়াসউদ্দিনকে 'মালিক-উল-গাজি' উপাধি দেন।

প্রশ্ন-৪৮. সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের বাল্যনাম কী ছিল?
উত্তর: সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের বাল্যনাম ছিল গাজি তুঘলক।

প্রশ্ন-৪৯. গিয়াসউদ্দিনের সময় মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করেন কে?
উত্তর: গিয়াসউদ্দিনের সময় মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করেন জুনা খান।

■ মুহাম্মদ বিন তুঘলক: মহাপরিকল্পনাসমূহ

প্রশ্ন-৫০. মুহাম্মদ বিন তুঘলকের প্রকৃত নাম কী ছিল?
উত্তর: মুহাম্মদ বিন তুঘলকের প্রকৃত নাম ছিল ফখরুদ্দিন মুহাম্মদ জুনা খান।

প্রশ্ন-৫১. কোন সুলতান উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা করেন?
উত্তর: সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা করেন।

প্রশ্ন-৫২. মুহাম্মদ বিন তুঘলক কয়টি মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেন?
উত্তর: মুহাম্মদ বিন তুঘলক ৫টি মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন-৫৩. মুহাম্মদ বিন তুঘলক দিল্লি থেকে রাজধানী কোথায় স্থানান্তর করেন?
উত্তর: মুহাম্মদ বিন তুঘলক দিল্লি থেকে রাজধানী দেবগিরিতে স্থানান্তর করেন।

প্রশ্ন-৫৪. কারাচিল কোথায় অবস্থিত? */সকল বোর্ড ২০১৫/*
উত্তর: হিন্দুস্থান ও চীনের মধ্যবর্তী স্থানে হিমালয়ের পাদদেশে কারাচিল অবস্থিত।

প্রশ্ন-৫৫. কোন অঞ্চলটি দিল্লি সালতানাতের 'শস্যভাণ্ডার' নামে খ্যাত?

উত্তর: দোয়াব অঞ্চলটি দিল্লি সালতানাতের শস্যভাণ্ডার নামে খ্যাত।

প্রশ্ন-৫৬. সফরনামা কী?

উত্তর: 'সফরনামা' বিখ্যাত পরিব্রাজক ইবনে বতুতার লিখিত একটি ভ্রমণ কাহিনি।

প্রশ্ন-৫৭. ইবনে বতুতা বাংলাকে কীসের সাথে তুলনা করেন?

উত্তর: ইবনে বতুতা বাংলাকে 'দোযখপুর নিয়ামত' বা প্রাচুর্যপূর্ণ জাহান্নামের সাথে তুলনা করেন।

ফিরোজ শাহ তুঘলক: সংস্কার ও জনহিতকর কার্যাবলি

প্রশ্ন-৫৮. ফিরোজ শাহ তুঘলক কত খ্রিষ্টাব্দে দিল্লি সালতানাতে অধিষ্ঠিত হন? *[সকল বোর্ড ২০১৫]*

উত্তর: ফিরোজ শাহ তুঘলক ১৩৫১ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লি সালতানাতে অধিষ্ঠিত হন।

প্রশ্ন-৫৯. মাতামহীসুলভ ব্যবস্থা কে গ্রহণ করেন?

উত্তর: মাতামহীসুলভ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন দিল্লির সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক।

প্রশ্ন-৬০. ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ কখন সোনারগাঁয়ের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন?

উত্তর: ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ ১৩৩৬ খ্রিষ্টাব্দে সোনারগাঁয়ের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

প্রশ্ন-৬১. 'শাহ-ই-বাঙ্গালাহ' বলা হয় কাকে?

উত্তর: শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহকে 'শাহ-ই-বাঙ্গালাহ' বলা হয়।

প্রশ্ন-৬২. তৈমুর লঙ কত খ্রিষ্টাব্দে ভারত আক্রমণ করেন?

উত্তর: তৈমুর লঙ ১৩৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ভারত আক্রমণ করেন।

প্রশ্ন-৬৩. তৈমুর লঙ কোন দেশের শাসক ছিলেন?

উত্তর: তৈমুর লঙ মধ্য এশিয়ার সমরখন্দের শাসক ছিলেন।

সৈয়দ ও লোদি বংশ: উত্থান ও পতন

প্রশ্ন-৬৪. সৈয়দ বংশের প্রথম শাসকের নাম কী?

উত্তর: সৈয়দ বংশের প্রথম শাসকের নাম খিজির খান।

প্রশ্ন-৬৫. সৈয়দ বংশ দিল্লি সালতানাতের কততম রাজবংশ?

উত্তর: সৈয়দ বংশ দিল্লি সালতানাতের চতুর্থ রাজবংশ।

প্রশ্ন-৬৬. সৈয়দ বংশের অবসানের পর কোন বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়?

উত্তর: সৈয়দ বংশের অবসানের পর লোদি বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন-৬৭. লোদি বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?

উত্তর: লোদি বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সুলতান বাহলুল লোদি।

প্রশ্ন-৬৮. লোদি বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান কে ছিলেন?

উত্তর: লোদি বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন সিকান্দার শাহ।

প্রশ্ন-৬৯. সালতানাতের শেষ সুলতান কে ছিলেন?
[ঢা. বো., রা. বো., চ. বো. ২০১৭; সকল বোর্ড ২০১৫]

উত্তর: সালতানাতের শেষ সুলতান ছিলেন ইব্রাহিম লোদি।

দিল্লি সালতানাতের ক্রমাবনতি ও পতন

প্রশ্ন-৭০. সুলতানি আমলে মোট কয়টি রাজবংশ দিল্লি শাসন করে?

উত্তর: সুলতানি আমলে মোট ৫টি রাজবংশ দিল্লি শাসন করে।

প্রশ্ন-৭১. কোন মোঙ্গল নেতার আক্রমণে দিল্লি সালতানাতের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে যায়?

উত্তর: মোঙ্গল নেতা তৈমুর লঙের আক্রমণে আক্রমণে দিল্লি সালতানাতের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে যায়।

প্রশ্ন-৭২. দিল্লি সালতানাতের পতন হয় কাদের হাতে?

উত্তর: মুঘলদের হাতে দিল্লি সালতানাতের পতন হয়।

প্রশ্ন-৭৩. পানিপথের প্রথম যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়?

উত্তর: পানিপথের প্রথম যুদ্ধ ১৫২৬ সালে সংঘটিত হয়।

প্রশ্ন-৭৪. কত সালে দিল্লি সালতানাতের পতন ঘটে?

উত্তর: ১৫২৬ সালে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে দিল্লি সালতানাতের পতন ঘটে।

খ. অনুধাবনমূলক

প্রশ্ন-১. কুতুবউদ্দিন আইবেক প্রতিষ্ঠিত বংশকে দাসবংশ বলা হয় কেন? *[সকল বোর্ড ২০১৫]*

উত্তর: কুতুবউদ্দিন আইবেক প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন বলে ঐতিহাসিক এবিএম হবিবুল্লাহ তার প্রতিষ্ঠিত রাজবংশকে 'মামলুক বংশ' বা 'দাসবংশ' নামে অভিহিত করেছেন।

১২০৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ জুন আইবেক সুলতান উপাধি গ্রহণ করে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার সিংহাসনে আরোহণের মধ্য দিয়ে ভারতে স্বাধীন মুসলিম শাসন ও একটি নতুন রাজবংশের সূচনা হয়। প্রাথমিক জীবনে তিনি ক্রীতদাস ছিলেন। তার পরবর্তী আরও কয়েকজন সুলতান দাস ছিল। তাই কুতুবউদ্দিনের প্রতিষ্ঠিত এ রাজবংশ ইতিহাসে 'দাসবংশ' নামে পরিচিত।

প্রশ্ন-২. কুতুবউদ্দিন আইবেককে 'লাখ বক্স' বলা হয় কেন?

উত্তর: সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক প্রতিদিন এক লাখ টাকা মানুষের মাঝে দান করতেন বলে তাকে 'লাখ বক্স' বা লক্ষ টাকা দানকারী বলা হয়।

সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক ছিলেন এক মহানুভব শাসক। তার বদান্যতা কিংবদন্তির পর্যায়ভুক্ত ছিল। আর দানশীলতায় তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ। বদান্যতায় তিনি ছিলেন দ্বিতীয় হাতেম। প্রতিদিন তিনি লাখ লাখ টাকা মানুষকে দান করতেন। এজন্য তাকে লাখ বক্স বলা হয়।

প্রশ্ন-৩. কুতুব মিনার নামকরণের কারণ ব্যাখ্যা করো।

[সকল বোর্ড ২০১৬]

উত্তর: মহান সাধক কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকীর নামানুসারে কুতুব মিনারের নামকরণ হয়।

দিল্লি সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা কুতুবউদ্দিন আইবেক ছিলেন শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি বেশ অনুরাগী। স্থাপত্য শিল্পের প্রতি তার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তাই তিনি দিল্লিতে একটি বিজয় স্তম্ভ নির্মাণের কাজ শুরু করেন। এ সময় কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকী নামে একজন মহান সাধক সুলতানের সংস্পর্শে আসেন। এ সাধককে সুলতান খুবই পছন্দ করতেন। তাই তার নামানুসারে এ বিজয় স্তম্ভের নামকরণ হয় কুতুব মিনার।

প্রশ্ন-৪. বলবনের "রক্তপাত ও কঠোর নীতি" ব্যাখ্যা করো।

[ঢা. বো., রা. বো., চ. বো. ২০১৭]

উত্তর: রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন এবং মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের গৃহীত নিষ্ঠুর ও কঠোর পদক্ষেপই 'রক্তপাত ও কঠোর নীতি' (Blood and Iron policy) নামে পরিচিত।

দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করে বলবন নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন। এর মধ্যে গুরুতর সমস্যাগুলো আমির-উমরাহ ও অভিজাত সম্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমান ঔদ্ধত্য, দ্বন্দ্ব-কলহ ও ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপ, দিল্লির পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মেওয়াটি দস্যুদের উপদ্রব, বারবার মোঙ্গল আক্রমণ প্রভৃতি। এসব সমস্যা সাম্রাজ্যের ভিতকে হুমকির সম্মুখীন করে তোলে। তাই নিজের ক্ষমতা সুসংহত করে সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি গুপ্তচর প্রথা চালু, বিচার ব্যবস্থার পুনর্গঠন, মোঙ্গল নীতি প্রভৃতি বিষয়ে কঠোর ও নিষ্ঠুর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এগুলোই বলবনের 'রক্তপাত ও কঠোর নীতি' হিসেবে স্বীকৃত।

প্রশ্ন-৫. ইলতুৎমিশ দাস রাজাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন — ব্যাখ্যা করো। *[সকল বোর্ড ২০১৯]*

উত্তর: ইলতুৎমিশ দাস রাজাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন কারণ তিনি সংকটময় মুহূর্তে সুলতান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে দিল্লি সালতানাতকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন।

দিল্লি সালতানাতের একটি উল্লেখযোগ্য সময় দাসরা শাসন করেন। এদের মধ্যে ইলতুৎমিশ ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের মৃত্যুর (১২১০ খ্রি.) পর দিল্লি সালতানাতের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে। কারণ তার পরবর্তী সুলতান আরাম শাহের অদক্ষতা, অযোগ্যতা ও অক্ষমতার কারণে দিল্লি সালতানাত গভীর সংকটের মুখে পড়ে। তার দুর্বল শাসনের সুযোগে বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ দানা বেঁধে ওঠে। এ সময় ক্ষমতা গ্রহণ করে (১২১১ খ্রি.) সুলতান ইলতুৎমিশ এসব বিদ্রোহ দমন করে দিল্লি সালতানাতের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছেন। এ কারণে তাকে দিল্লি সালতানাতের দাস রাজাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়।

প্রশ্ন-৬. 'চল্লিশ চক্র' বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: সুলতান ইলতুৎমিশের সময়কার (১২১১-১২৩৬ খ্রি.) চল্লিশজন প্রভাবশালী ও সুযোগ্য ক্রীতদাস নিয়ে গঠিত সংগঠনকে চল্লিশ চক্র বলা হয়।

সুলতান ইলতুৎমিশের সময় চল্লিশজন ক্রীতদাসকে নিয়ে 'বন্দেগান-ই-চেহেলগান' নামে একটি সংগঠন গড়ে ওঠে। এটি চল্লিশ চক্র নামে পরিচিত। ইলতুৎমিশের সময় তারা শাসনকার্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তার মৃত্যুর পর চল্লিশ চক্রের দৌরাত্ম্যের ফলে প্রশাসনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করেন।

প্রশ্ন-৭. ইকতা কী? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: সুলতান ইলতুৎমিশ ভারতীয় সামন্ত প্রথা বিলোপ সাধনের জন্য যে বিশেষ প্রথা চালু করেন তাই ইতিহাসে ইকতা নামে পরিচিত।

ইকতা শব্দের অর্থ অংশ বা ভাগ। ইলতুৎমিশ তার সমগ্র সাম্রাজ্যকে ছোট-বড় অনেকগুলো ইকতায় বিভক্ত করে যোগ্য তুর্কিদের ইকতাদার হিসেবে নিয়োগ দেন। ইকতাদারগণ সরাসরি কেন্দ্রের নিকট জবাবদিহি করতেন। ফলে প্রশাসনিক কাজে ইকতা ব্যবস্থা খুবই ফলপ্রসূ হয়। এতে দূরবর্তী অঞ্চলের স্থানীয় সামন্তদের অরাজকতা থেকে সালতানাত সুরক্ষিত হয় এবং সুলতান ইলতুৎমিশ রাজস্ব আদায়, যোগাযোগ ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় কার্যকর ব্যবস্থা নিতে সক্ষম হন।

প্রশ্ন-৮. ইলতুৎমিশের রাজত্বকালকে 'সমৃদ্ধি ও গৌরবের যুগ' বলা হয় কেন?

উত্তর: ইলতুৎমিশের রাজত্বকালে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছিল বলে তা 'সমৃদ্ধি ও গৌরবের যুগ' নামে পরিচিত।

দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ইলতুৎমিশ তার রাজ্যের উন্নয়নে নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। বিশেষ করে শিক্ষা ও শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশে তার ভূমিকা অসামান্য। আর শিক্ষা ও শিল্প-সংস্কৃতির উন্নয়ন ঘটলে সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত। ইলতুৎমিশ এক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রেখে গৌরবময় ও সমৃদ্ধিশালী রাজত্ব কায়েম করেছিলেন।

প্রশ্ন-৯. একজন আদর্শ শাসকের সকল গুণ থাকা সত্ত্বেও সুলতান রাজিয়া কেন ব্যর্থ হলেন?

উত্তর: একজন আদর্শ শাসকের সকল গুণ থাকা সত্ত্বেও তুর্কি অভিজাতদের উচ্চাভিলাষের কারণে সুলতান রাজিয়া ব্যর্থ হলেন।

রাজিয়া ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই অ-তুর্কি মুসলমানদের উচ্চ রাজপদে নিয়োগ এবং তাদের ওপর নির্ভরতা সুলতানি সাম্রাজ্যের ওপর তুর্কিদের অপ্রতিহত ক্ষমতা স্থাপনে আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। রাজিয়ার পুরুষ বেশ পরিধান, পর্দা প্রথা অবজ্ঞা এবং প্রকাশ্যে অশ্বারোহণ ইত্যাদি রক্ষণশীল গোঁড়া মুসলমান অভিজাতরা সুনজরে দেখেনি। তাছাড়া রাজিয়ার দৃঢ় ব্যক্তিত্ব ও কঠিন হস্তে শাসন পরিচালনার প্রয়াসও তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। ফলে তুর্কি অভিজাতরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ষড়যন্ত্র শুরু করে এবং রাজিয়ার পতন ঘটায়।

প্রশ্ন-১০. রক্তপাত ও কঠোর নীতি বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন এবং মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের গৃহীত নিষ্ঠুর ও কঠোর পদক্ষেপই 'রক্তপাত ও কঠোর নীতি' (Blood and Iron policy) নামে পরিচিত।

দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করে বলবন নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন। এর মধ্যে গুরুতর সমস্যাগুলো আমির-উমরাহ ও অভিজাত সম্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমান ঔদ্ধত্য, দ্বন্দ্ব-কলহ ও ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপ, দিল্লির পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মেওয়াটি দস্যুদের উপদ্রব, বারবার মোঙ্গল আক্রমণ প্রভৃতি। এসব সমস্যা সাম্রাজ্যের ভিতকে হুমকির সম্মুখীন করে তোলে। তাই নিজের ক্ষমতা সুসংহত করে সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি গুপ্তচর প্রথা চালু, বিচার ব্যবস্থার পুনর্গঠন, মোঙ্গল নীতি প্রভৃতি বিষয়ে কঠোর ও নিষ্ঠুর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এগুলোই বলবনের 'রক্তপাত ও কঠোর নীতি' হিসেবে স্বীকৃত।

প্রশ্ন-১১. চল্লিশ চক্র দমনে বলবনের গৃহীত পদক্ষেপ ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: বলবন অত্যন্ত দক্ষতা ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে চল্লিশ চক্রের বিদ্রোহ দমন করেন।

সুলতান ইলতুৎমিশের শাসনামলে চল্লিশ জন ক্রীতদাস নিয়ে গঠিত **'চল্লিশ চক্র'** তার দুর্বল উত্তরাধিকারীদের সময়কালে রাজ্যের মধ্যে সর্বেসর্বা হয়ে ওঠে। তারা সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনকে ক্ষমতা থেকে হঠাবার ষড়যন্ত্র করতে থাকে। ফলে বলবন তাদের বিশেষ সুবিধা বাতিল করেন। অবাধ মেলামেশা ও রাজদরবারে হাসি-ঠাট্টার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। এ ছাড়া জায়গিরদারি বাতিল এবং সামান্য অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে বলবন চল্লিশ চক্রের বিদ্রোহ দমন করেন।

প্রশ্ন-১২. মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়াসউদ্দিন বলবন কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন? *[সকল বোর্ড ২০১৯]*

উত্তর: সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের সময় মোঙ্গল আক্রমণ ছিল দিল্লি সালতানাতের অস্তিত্বের জন্য অত্যন্ত ভীতিকর। এজন্য তাদেরকে দমন করতে সুলতান বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এগুলো হলো—

প্রথমত, সুলতান বলবন সেনাবাহিনী পুনর্গঠন ও শক্তিশালী করেন। সৈন্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও তাদের উত্তম অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জামাদি দ্বারা সজ্জিত করে সীমান্ত অঞ্চলে মোতায়েন করা হয়। সীমান্ত নিরাপত্তার গুরুত্ব বিবেচনা করে শেরখান ও শঙ্করের মতো সেনাপতিদের সীমান্ত অঞ্চলে নিয়োগ দেওয়া হয়;

দ্বিতীয়ত, গুরুত্বপূর্ণ সামরিক কেন্দ্রসমূহে নতুন দুর্গ নির্মাণ এবং পুরোনো দুর্গ সংস্কার করে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়;

তৃতীয়ত, মোঙ্গল আক্রমণকারীদের গতিবিধি দেখার জন্য সীমান্ত অঞ্চলে গোয়েন্দা তৎপরতা বৃদ্ধি করা হয়;

চতুর্থত, মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য রাজ্য বিস্তার নীতি বর্জন করা হয়। মোঙ্গল আক্রমণের আশঙ্কায় সুলতান বলবন রাজধানী দিল্লি ছেড়ে অন্যত্র না গিয়ে যতদূর সম্ভব রাজধানীতে অবস্থান করেন। মোঙ্গল আক্রমণ থেকে প্রজাদের রক্ষা করা প্রধান কর্তব্য বিবেচনা করে সুলতান রাজ্য বিস্তার নীতি পরিহার করেন।

প্রশ্ন-১৩. গিয়াসউদ্দিন বলবন কর্তৃক রক্তপাত ও কঠোরনীতি কেন গ্রহণ করা হয়েছিল? *[ঢা. বো., রা. বো., চ. বো. ২০১৭]*

উত্তর: অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বহিরাক্রমণ থেকে সাম্রাজ্যকে রক্ষার জন্য গিয়াসউদ্দিন বলবন রক্তপাত ও কঠোর নীতি গ্রহণ করেন।

গিয়াসউদ্দিন বলবনের সময়ে তুর্কি অভিজাতদের ষড়যন্ত্র এবং বহিরাক্রমণ মারাত্মক রূপ ধারণ করে। সুলতান বলবন ষড়যন্ত্রপরায়ণ অভিজাতদের দমনের জন্য কঠোর শাসন নীতি গ্রহণ করেন। তাছাড়া মোঙ্গলদের আক্রমণ মোকাবিলা করার জন্যও তিনি কঠিন দৃঢ়তার পরিচয় দেন। সুতরাং অভ্যন্তরীণ কলহ ও বহিঃশত্রু দমনের জন্য গিয়াসউদ্দিন বলবন রক্তপাত ও কঠোর নীতি গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন-১৪. আলাউদ্দিন খলজি কীভাবে তার শাসন ক্ষমতা সুদৃঢ় করেছিলেন?

উত্তর: উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিস্তৃত এলাকাজুড়ে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সাধন করে আলাউদ্দিন খলজি তার শাসন ক্ষমতা সুদৃঢ় করেছিলেন।

আলাউদ্দিন খলজি শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনে মনোনিবেশ করেন। তিনি তার সময়ে মোঙ্গলদের আক্রমণ প্রতিহত করে নিজের গৌরব, মর্যাদা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন। বিশাল সেনাবাহিনীর ভরণ-পোষণের জন্য তিনি মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। সর্বোপরি, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিস্তৃত এলাকাব্যাপী সাম্রাজ্য বিস্তারের মাধ্যমে আলাউদ্দিন খলজি তার শাসন ক্ষমতা সুদৃঢ় করেন।

প্রশ্ন-১৫. আলাউদ্দিন খলজির দাক্ষিণাত্য অভিযানের উদ্দেশ্য কী ছিল?

উত্তর: আলাউদ্দিন খলজি বিপুল ধন-সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে দাক্ষিণাত্যে অভিযান করেন।

সুলতান আলাউদ্দিন খলজি ছিলেন একজন সাম্রাজ্যবাদী শাসক। ফলে তিনি তার রাজ্য সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে দাক্ষিণাত্যে অভিযান প্রেরণ করেন। এছাড়া অগণিত ধন-রত্নও সুলতানকে দাক্ষিণাত্য বিজয়ে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে। সর্বোপরি সুলতান আলাউদ্দিন খলজি তার উচ্চাভিলাষ পূরণ করার লক্ষ্যে দাক্ষিণাত্যে অভিযান প্রেরণ করেছিলেন।

প্রশ্ন-১৬. গিয়াসউদ্দিন বলবনের শাসননীতি সমালোচিত কেন?

উত্তর: গিয়াসউদ্দিন বলবনের শাসননীতিতে দূরদর্শিতার অভাব ছিল বলে তা সমালোচিত হয়েছে।

শাসক হিসেবে বলবন পরিপূর্ণ দক্ষতার স্বাক্ষর রাখতে পারেননি। স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তার পদক্ষেপসমূহ সমালোচিত হয়েছিল। কারণ তার এ পদক্ষেপ পরবর্তীতে খলজিদের রাজত্বের পথকে সুগম করে দিয়েছিল। তা ছাড়া তিনি রাজ্যবিস্তার বা রাজপুতদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাও নিতে পারেননি। তার সময়ে রাজ্যে প্রশাসনিক সংকটও সৃষ্টি হয়েছিল। এ সব কারণে তিনি সমালোচিত হন।

প্রশ্ন-১৭. দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধির প্রধান কারণ কী?

[দি. বো., কু. বো., সি. বো., য. ব. বো. ২০১৭]

উত্তর: দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধির প্রধান কারণ ছিল বিত্তশালী কৃষকদের প্রভাব খর্ব করা।

সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধির অন্যতম কারণ ছিল হিন্দু বিদ্রোহ দমন এবং জমিদারদের প্রভাব প্রতিহত করা। আবার অনেকেই মনে করেন রাজধানী স্থানান্তর, খোরাসান ও কারাচিল অভিযানের ব্যর্থতা এবং প্রতীকী মুদ্রার বিফলতার ফলে সৃষ্ট অর্থ সংকটের কারণেই সুলতান দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধি করেন। কর বৃদ্ধি সম্পর্কে ঐতিহাসিক বারানী বলেন যে, সুলতান দোয়াবে দশ হতে বিশগুণ কর বৃদ্ধি করেছিল।

প্রশ্ন-১৮. মুহাম্মদ তুঘলকের দৌলতাবাদে রাজধানী স্থানান্তরের প্রধান কারণটি ব্যাখ্যা করো। *[সকল বোর্ড ২০১৫]*

উত্তর: মুহাম্মদ বিন তুঘলকের দৌলতাবাদে রাজধানী স্থানান্তরের প্রধান কারণ ছিল এর ভৌগোলিক অবস্থান ও গুরুত্ব।

দাক্ষিণাত্যের হিন্দুদের বিদ্রোহী মনোভাব লক্ষ করে তাদের ওপর আধিপত্য ও কর্তৃত্ব বজায় রাখতে সুলতান দৌলতাবাদে রাজধানী স্থানান্তর করেন। তাছাড়া মোঙ্গল আক্রমণের আশঙ্কা থেকে রাজধানী নিরাপদ রাখার জন্য দৌলতাবাদই ছিল উপযুক্ত স্থান। দাক্ষিণাত্যের প্রাচুর্য ও সম্পদের অধিকতর সদ্ব্যবহারের জন্য দৌলতাবাদে রাজধানী স্থাপনকে সুলতান অধিক সমীচীন বলে মনে করেছিলেন। মূলত শাসনকার্যের সুবিধার জন্য তিনি দৌলতাবাদে রাজধানী স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন-১৯. আলাউদ্দিন খলজি নতুন ধর্মমত প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন কেন?

উত্তর: মহানবি (স)-এর চারজন সাহাবির মতো সুলতান আলাউদ্দিনও চারজন সেনাপতির সাহায্য লাভ করেছিলেন। এ মিলের কারণে তিনি নতুন ধর্মমত প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন।

আলাউদ্দিনের খ্যাতি ও সাফল্যের পেছনে সেনাপতি জাফর খান, উলুগ খান, আলপ খান এবং নসরত খানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এ সময় সুলতান ভাবেন যে, মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ধর্মমত প্রচারে তার চারজন সহযোগীর বিশেষ অবদান ছিল। তাই তিনিও তার চারজন সহযোগীর সহায়তায় একটি নতুন ধর্মমত প্রচারের পরিকল্পনা করেন। মূলত, বিরুদ্ধবাদীদের দমন এবং মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহতকরণে আশাতীত সাফল্য তাকে উচ্চাভিলাসী করে তোলে। তাই আলাউদ্দিন খলজি নতুন ধর্মমত প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন।

প্রশ্ন-২০. মাতামহীসুলভ ব্যবস্থা বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের গৃহীত কতগুলো মানবীয় সংস্কারমূলক কার্যক্রম ইতিহাসে মাতামহীসুলভ ব্যবস্থা (Grandmotherly Legislation) নামে পরিচিতি।

ফিরোজ শাহ তুঘলক সিংহাসনে বসে দরিদ্র অসহায় মুসলমান মেয়েদের বিয়ের বন্দোবস্ত করেন এবং অনাথ ও বিধবাদের ভরণপোষণের জন্য 'দিওয়ান-ই-খায়রাত' নামে আলাদা একটি বিভাগ সৃষ্টি করেন। বেকারদের চাকরি প্রদানের জন্য চাকরি দপ্তর প্রতিষ্ঠা করেন। অসুস্থ রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধপত্র প্রদানের জন্য দিল্লিতে 'বিমারিস্তান' বা দারুল শিফা নামে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। আর এ পদক্ষেপগুলোই মাতামহীসুলভ ব্যবস্থা নামে পরিচিত।

প্রশ্ন-২১. তৈমুর লঙের ভারত আক্রমণের ফলাফল ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: তৈমুর লঙের ভারত আক্রমণের ফলে দিল্লি সালতানাত পতনের দ্বার প্রান্তে পৌছে।

দিল্লি সালতানাতের দুর্বলতার সুযোগে মধ্য এশিয়ার দুর্ধর্ষ সমরনেতা আমির তৈমুর লঙ ভারত আক্রমণ করেন (১৩৯৮-৯৯ খ্রি.)। তার এ আক্রমণের ফলে দিল্লি সালতানাতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে যায়। এ সুযোগে সালতানাতের বিভিন্ন অঞ্চল কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং সালতানাতের পতনের বিষয়টি শুধু ব্যাপারে পরিণত হয়।

প্রশ্ন-২২. সৈয়দ বংশের পতনের কারণ ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: সৈয়দ বংশের পতনের উল্লেখযোগ্য কারণ হলো সুলতানদের অযোগ্যতা ও নির্বুদ্ধিতা।

সুলতান খিজির খানের আমল থেকেই রাজ দরবারের উপর আমীর-উমরাহদের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে সালতানাতে নানা ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। খিজির খান পরবর্তী সুলতানদের অযোগ্যতা ও নির্বুদ্ধিতার জন্য দিল্লি সালতানাতের নানা স্থানে বিদ্রোহ দেখা দেয়। এ বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে আনতে সুলতানগণ ব্যর্থ হন, যা এ বংশের পতনকে ত্বরান্বিত করে।

প্রশ্ন-২৩. সিকান্দর লোদিকে লোদি বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান বলা হয় কেন?

উত্তর: অনন্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, শাসক হিসেবে অসামান্য যোগ্যতা এবং অন্যান্য কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য সিকান্দার লোদিকে লোদি বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক বলা হয়।

একজন শাসক তখনই শ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠেন যখন তিনি তার দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করেন। সিকান্দার লোদি দক্ষ রাজনীতিবিদ, সমরকুশলী এবং প্রজারঞ্জক সুলতান হিসেবে তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায়ও তিনি সম্পূর্ণ সফল ছিলেন। ফলে একজন শ্রেষ্ঠ শাসক হিসেবেই তিনি ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. দিল্লি সালতানাত প্রতিষ্ঠা করেন কে?
ক. কুতুবউদ্দিন আইবেক খ. মুহাম্মদ ঘুরি
গ. মুহাম্মদ বিন কাসিম ঘ. সুলতান মাহমুদ

২. ভারতে কত খ্রিষ্টাব্দে স্বাধীন মুসলিম শাসন শুরু হয়?
ক. ১২০৩ খ্রি. খ. ১২০৪ খ্রি.
গ. ১২০৬ খ্রি. ঘ. ১২০৮ খ্রি.

৩. 'মামলুক' শব্দের অর্থ কী?
ক. মালিক খ. প্রভু
গ. দাস ঘ. কর্মী

৪. সুলতানি শাসনের স্থায়িত্বকাল কোনটি?
ক. ১২০২-১৫২৬ খ. ১২০৪-১৫২৬
গ. ১২০৬-১৫২৬ ঘ. ১২০৮-১৫২৬

৫. দিল্লি সালতানাত কত বছর স্থায়ী ছিল?
ক. ৩০০ বছর খ. ৩১০ বছর
গ. ৩২০ বছর ঘ. ৩৪০ বছর

৬. 'আইবেক' শব্দের অর্থ কী?
ক. সিংহ খ. সূর্যদেবতা
গ. চন্দ্রদেবতা ঘ. সৌভাগ্য

৭. কুতুবউদ্দিন আইবেককে 'লাখ বকস' উপাধি দেওয়া হয়েছিল কেন?
ক. দানশীলতার জন্য
খ. কবি-সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য
গ. স্থাপত্যশিল্পে অবদান রাখার জন্য
ঘ. ধর্মপরায়ণতার জন্য

৮. কুতুবমিনার কোথায় অবস্থিত?
ক. আগ্রায় খ. দিল্লিতে
গ. কলকাতায় ঘ. বারানসিতে

৯. 'চল্লিশ চক্র' গঠন করেন কে?
ক. কুতুবউদ্দিন আইবেক খ. ইলতুৎমিশ
গ. গিয়াসউদ্দিন বলবন ঘ. আলাউদ্দিন খলজি

১০. উপমহাদেশে মুসলিম শাসকদের মধ্যে কে সর্বপ্রথম রৌপ্যমুদ্রা প্রবর্তন করেন?
ক. সুলতান ইলতুৎমিশ খ. কুতুবউদ্দিন আইবেক
গ. গিয়াসউদ্দিন বলবন ঘ. আলাউদ্দিন খলজি

১১. কার রাজত্বকালকে 'গৌরব ও সমৃদ্ধিশালী' যুগ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়?
ক. কুতুবউদ্দিন আইবেকের খ. সুলতান মাহমুদের
গ. গিয়াসউদ্দিন বলবনের ঘ. সুলতান ইলতুৎমিশের

১২. 'রক্তপাত এবং কঠোরনীতি'র জন্য কে ইতিহাসে পরিচিতি লাভ করেছেন?
ক. মুহাম্মদ ঘুরি খ. গিয়াসউদ্দিন বলবন
গ. ইলতুৎমিশ ঘ. কুতুবউদ্দিন আইবেক

১৩. মালিক কাফুরকে হাজার দিনারি বলা হয় কেন?
ক. মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য
খ. তার কাছে হাজার দিনার ছিল বলে
গ. হাজার দিনার দান করত বলে
ঘ. তাকে হাজার দিনারে ক্রয় করা হয়েছিল বলে

১৪. আলাউদ্দিন খলজির দাক্ষিণাত্য বিজয়ের প্রধান কারণ ছিল?
ক. সামরিক খ. রাজনৈতিক
গ. ধর্মীয় ঘ. অর্থনৈতিক

১৫. মুহাম্মদ বিন তুঘলক কয়টি উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন?
ক. ৫টি খ. ৬টি
গ. ৮টি ঘ. ১০টি

১৬. পানিপথের প্রথম যুদ্ধ কত খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়?
ক. ১৫২৭ খ্রিষ্টাব্দে খ. ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে
গ. ১৫২৫ খ্রিষ্টাব্দে ঘ. ১৫২৪ খ্রিষ্টাব্দে

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন

১৭. কুতুবউদ্দিন আইবেক বিখ্যাত হয়ে আছেন—
i. সালতানাতের নিরাপত্তা ও সংহতি বিধান করে
ii. দিল্লি সালতানাত প্রতিষ্ঠা করে
iii. কুতুবমিনার নির্মাণ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৮. সুলতান ইলতুৎমিশকে দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলার কারণ—
i. সালতানাত প্রতিষ্ঠা
ii. দিল্লি সালতানাত সুদৃঢ়ীকরণ
iii. সালতানাতের সংকট সমাধান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৯ ও ২০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
ভাগ্যবিড়ম্বনার শিকার হয়ে ক্রীতদাসে পরিণত হলেও নিজ মেধা আর যোগ্যতা বলে বাংলায় মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন করেন ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি। বাংলার শেষ রাজা লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করে তিনি ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯. ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির সাথে নিচের কোন বীরের সাদৃশ্য রয়েছে?
ক. সুলতান মাহমুদের খ. কুতুবউদ্দিন আইবেকের
গ. সম্রাট জাহাঙ্গীরের ঘ. মুহাম্মদ ঘুরির

২০. উক্ত বীরদ্বয়ের মধ্যে সাদৃশ্য সৃষ্টি করেছে—
i. উভয়েই ক্রীতদাস ছিলেন
ii. উভয়েই মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন করেন
iii. উভয়েই বাংলার সফল শাসক ছিলেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২১ ও ২২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
রমজান মাসে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ন্যায্যমূল্যে কেনার জন্য 'ক' দেশের সরকার প্রতিটি বাজারে বিক্রেতাদের জন্য মূল্য তালিকা তৈরি করে দেয়। এতে ক্রেতারা স্বস্তিতে পণ্য কিনতে পারেন এবং মজুতদারি রোধ করাও সম্ভব হয়।

২১. উদ্দীপকের 'ক' দেশের সরকারের গৃহীত উদ্যোগের সাথে দিল্লির কোন সুলতানের গৃহীত উদ্যোগের মিল রয়েছে?
ক. আলাউদ্দিন খলজির খ. ইলতুৎমিশের
গ. বলবনের ঘ. নাসিরউদ্দিন মাহমুদের

২২. সুলতানের এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের পিছনে উদ্দেশ্য ছিল—
ii. সেনাবাহিনীকে সুবিধা প্রদান
ii. স্বল্পমূল্যে জনসাধারণকে পণ্য সরবরাহ
iii. আপতকালীন সময়ের জন্য সম্পদ মজুদ রাখা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

খ. বোর্ড পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৩. কুতুবউদ্দিনের প্রতিষ্ঠিত বংশকে দাস বংশ বলার কারণ কী? *[সকল বোর্ড ২০১৫]*
ক. তিনি দাসদের দ্বারা শাসন চালাতেন
খ. তার পূর্ব-পুরুষ দাস ছিল
গ. তিনি প্রথম জীবনে দাস ছিলেন
ঘ. অধিকাংশ শাসক দাস ছিলেন

২৪. 'লাখ বখস' কোন সুলতানের উপাধি ছিল? *[সকল বোর্ড ২০১৬]*
ক. কুতুবউদ্দিন আইবেক খ. ইলতুৎমিশ
গ. গিয়াসউদ্দিন বলবন ঘ. মুহাম্মদ বিন তুঘলক

২৫. কুতুব মিনার কোথায় অবস্থিত? *[সকল বোর্ড ২০১৫]*
ক. গৌড় খ. আজমির
গ. দিল্লি ঘ. গুজরাট

২৬. কুতুব মিনার কোন ধরনের স্থাপত্যকীর্তি? *[সকল বোর্ড ২০১৮]*
ক. মসজিদ খ. দরগাহ
গ. স্মৃতিস্তম্ভ ঘ. পর্যবেক্ষণ টাওয়ার

২৭. দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? *[সকল বোর্ড ২০১৬]*
ক. কুতুবউদ্দিন আইবেক খ. ইলতুৎমিশ
গ. গিয়াসউদ্দিন বলবন ঘ. নাসির উদ্দিন মাহমুদ

২৮. ইলতুৎমিশকে কেন দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়? *[সকল বোর্ড ২০১৫]*
ক. মোঙ্গলদের আক্রমণ প্রতিহত করেন
খ. বিভিন্ন বিদ্রোহ দমন করেন
গ. খলিফার কাছ থেকে খেতাব প্রাপ্ত হন
ঘ. দিল্লি সালতানাতকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করায়

২৯. কোন আব্বাসি খলিফা ইলতুৎমিশকে উপাধি প্রদান করেন? *[সকল বোর্ড ২০১৯]*
ক. মুসতানসির বিল্লাহ খ. মনসুর
গ. মামুন ঘ. হারুন অর রশিদ

৩০. ইলতুৎমিশ বাগদাদের খলিফার কাছ থেকে কোন উপাধি লাভ করেছিলেন? *[সকল বোর্ড ২০১৭]*
ক. সুলতান-ই-আজম খ. দিওয়ান-ই-ইনশা
গ. আমীর-উল-মুমেনীন ঘ. লাখ বখস

৩১. 'বন্দেগান-ই-চেহেলগান' হলো— *[সকল বোর্ড ২০১৭]*
ক. একটি সামরিক প্রতিষ্ঠান খ. একটি প্রশাসনিক পদ
গ. একটি সাহিত্য সমিতি ঘ. দাসদের একটি সংঘ

৩২. ভারতবর্ষে প্রথম কোন সুলতান খাঁটি আরবি মুদ্রার প্রচলন করেন? *[সকল বোর্ড ২০১৫]*
ক. কুতুবউদ্দিন আইবেক খ. সুলতান ইলতুৎমিশ
গ. সুলতান নাসিরউদ্দিন ঘ. সুলতান বলবন

৩৩. সুলতান রাজিয়ার পিতার নাম কী? *[সকল বোর্ড ২০১৭]*
ক. মুহাম্মদ ঘুরি খ. কুতুবউদ্দিন আইবেক
গ. ইলতুৎমিশ ঘ. বলবন

৩৪. 'ভারতের তোতাপাখি' খ্যাত ছিলেন কে? *[সকল বোর্ড ২০১৬]*
ক. আমির খসরু খ. জালাল খসরু
গ. রহিম খসরু ঘ. আমিন খসরু

৩৫. খলজি বংশ প্রতিষ্ঠা করেন কে? *[সকল বোর্ড ২০১৬]*
ক. জালালউদ্দিন খলজি খ. আলাউদ্দিন খলজি
গ. ফিরোজউদ্দিন খলজি ঘ. বখতিয়ার খলজি

৩৬. আলাউদ্দিন খলজির শাসনব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল— *[সকল বোর্ড-২০১৭]*
ক. সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণ খ. মুদ্রা সংস্কার
গ. মূল্য নিয়ন্ত্রণ ঘ. সম্পদের প্রাচুর্য

৩৭. মুহাম্মদ বিন তুঘলকের আসল নাম কী? *[সকল বোর্ড ২০১৬]*
ক. গাজী মালিক খ. জুনা খান
গ. গাজী ফিরোজ ঘ. গাজী ফারুক

৩৮. মুহাম্মদ বিন তুঘলক দেবগিরির নাম রাখেন— *[সকল বোর্ড ২০১৯, ২০১৮]*
ক. আহমেদাবাদ খ. দৌলতাবাদ
গ. ফিরোজাবাদ ঘ. তুঘলকাবাদ

৩৯. 'মাতামহীসুলভ' ব্যবস্থার প্রবর্তক ছিলেন— *[সকল বোর্ড ২০১৫]*
ক. সুলতান গিয়াসউদ্দিন খলজি
খ. সুলতান আলাউদ্দিন খলজি
গ. সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক
ঘ. সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক

৪০. দিল্লির কোন সুলতান 'বিমারিস্তান' নামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন? *[সকল বোর্ড ২০১৬]*
ক. আলাউদ্দিন খ. ফিরোজ শাহ তুঘলক
গ. মুহাম্মদ বিন তুঘলক ঘ. গিয়াসউদ্দিন তুঘলক

৪১. সৈয়দ বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? /সকল বোর্ড ২০১৭/
ক. মালিক সুলেমান খ. খিজির খান
গ. মুবারক শাহ ঘ. মুহম্মদ শাহ

৪২. 'মসনদ-ই-আলা' কোন সুলতানের উপাধি ছিল? /সকল বোর্ড ২০১৬/
ক. খিজির খান খ. মুবারক খান
গ. জালাল খান ঘ. তবারক খান

৪৩. লোদি বংশের সর্বশেষ শাসক কে ছিলেন? /সকল বোর্ড ২০১৫/
ক. সিকান্দার লোদি খ. বাহলুল লোদি
গ. ইব্রাহিম লোদি ঘ. বাহরাম লোদি

৪৪. কুতুবউদ্দিন আইবেক ছিলেন— /সকল বোর্ড ২০১৯/
i. রাজনীতিতে দূরদর্শী
ii. অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী
iii. ধর্মের ব্যাপারে উদাসীন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪৫. সুলতান রাজিয়া আলতুনিয়াকে বিবাহ করেছিলেন— /সকল বোর্ড ২০১৫/
i. নিজেকে রক্ষা করার জন্য
ii. ক্ষমতাকে সুসংহত করার জন্য
iii. সংসারী হওয়ার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪৬. সুলতান বলবন জমকালো রাজদরবার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন— /সকল বোর্ড ২০১৭/
i. জনমনে ভীতি সৃষ্টির জন্য
ii. জনগণের শ্রদ্ধা অর্জনের জন্য
iii. রাজ্যে প্রভাব বৃদ্ধির জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪৭. সুলতান আলাউদ্দিন খলজি মূল্যনিয়ন্ত্রণ নীতি প্রবর্তন করেন— /সকল বোর্ড ২০১৬/
i. সাম্রাজ্যের আর্থিক স্থিতিশীলতার জন্য
ii. জনগণের সুবিধার জন্য
iii. সাম্রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪৮. মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য আলাউদ্দিন খলজি কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ হলো— /সকল বোর্ড ২০১৮/
i. নতুন কেল্লা স্থাপন
ii. গাজি মালিককে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের শাসনকর্তা নিয়োগ
iii. ব্যাপক সমরাস্ত্র আমদানি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪৯. মুহম্মদ বিন তুঘলকের পরিকল্পনাগুলো ব্যর্থ হওয়ার কারণ— /সকল বোর্ড ২০১৫/
i. তিনি যুগের অগ্রবর্তী ছিলেন
ii. বাস্তবে কার্যকর করা অসম্ভব ছিল
iii. প্রজাসাধারণের অসহযোগিতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৫০ ও ৫১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

জয়নাল আবেদীন সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে এলাকার জনগণের উন্নয়নের প্রতি মনোযোগী হন। তিনি শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি রাস্তাঘাট, স্কুল কলেজ, মসজিদ, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আল নূর মসজিদের সুউচ্চ মিনার নির্মাণ করেন। /সকল বোর্ড ২০১৭/

৫০. উদ্দীপকের মসজিদের মিনারের সাথে দিল্লি সালতানাতের কোন স্থাপনার সাদৃশ্য রয়েছে?
ক. কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদের মিনার
খ. কুতুব মিনার
গ. আড়াই-দিনকা-ঝোপড়া মসজিদের মিনার
ঘ. দিল্লির মিনার

৫১. উক্ত স্থাপনার নির্মাতা ছিলেন—
i. দানশীল
ii. দাস বংশের প্রতিষ্ঠাতা
iii. তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে এবং ৫২ ও ৫৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

খিলাফত লাভ করে খলিফা আবদুল মালিক বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে পড়েন। এ সুযোগ বুঝে রোমানরাও মুসলিম সাম্রাজ্যে হানা দিতে শুরু করেন। /সকল বোর্ড ২০১৯/

৫২. খলিফা আবদুল মালিকের সাথে দিল্লির কোন সুলতানের তুলনা করা যায়?
ক. কুতুবউদ্দিন আইবেক খ. ইলতুৎমিশ
গ. ফিরোজ শাহ ঘ. বাহরাম শাহ

৫৩. উক্ত সুলতানের শাসনামলে কারা হানা দিয়েছিল?
ক. পারসিকরা খ. আফগানরা
গ. রোমানরা ঘ. মোঙ্গলরা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৫৪ ও ৫৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও সংহতি রক্ষার পাশাপাশি জনকল্যাণের কথা বিবেচনা করে রাজা এ্যাডাম বাজারে পণ্যমূল্য নির্দিষ্ট করে দেন। এ কারণে তিনি ইতিহাসে মেধাবী রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। /সকল বোর্ড ২০১৮/

৫৪. উদ্দীপকের শাসকের সাথে সুলতানি আমলের কোন শাসকের মিল রয়েছে?
ক. জালালউদ্দিন খলজি খ. আলাউদ্দিন খলজি
গ. রুকনুদ্দিন ইব্রাহিম ঘ. শাহাবুদ্দিন ওমর

৫৫. উক্ত সংস্কারের ফলে—
- i. চাষীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়
- ii. সেনাবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি পায়
- iii. ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ৫৬ ও ৫৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

সিংহাসনে আরোহণ করে সম্রাট 'D' তার রাজধানী স্থানান্তর করেন এবং পুরাতন রাজধানী শহরের লোকদের নতুন রাজধানী শহরে যেতে বাধ্য করেন। সম্রাট 'D'-এর কর্মকাণ্ডে বহু লোকের মৃত্যু হয়। *[সকল বোর্ড ২০১৬]*

৫৬. সম্রাট 'D' এর কর্মকাণ্ডের সাথে তোমার পঠিত দিল্লি সালতানাতের কোন শাসকের পরিকল্পনার মিল লক্ষ করা যায়?

ক. জালালউদ্দিন খলজি খ. আলাউদ্দিন খলজি
গ. ফিরোজ শাহ তুঘলক ঘ. মুহাম্মদ বিন তুঘলক

৫৭. উক্ত শাসকের কর্মকাণ্ডের ফলে জনজীবনে—
- i. দুর্ভোগ নেমে আসে
- ii. রাজকোষে ঘাটতি দেখা দেয়
- iii. জনমনে ভীতির সৃষ্টি হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উত্তরমালা

১	ক	২	গ	৩	গ	৪	গ	৫	গ	৬	গ	৭	ক	৮	খ	৯	খ	১০	ক	১১	ঘ	১২	খ
১৩	ঘ	১৪	ঘ	১৫	ক	১৬	খ	১৭	গ	১৮	গ	১৯	খ	২০	ক	২১	ক	২২	ক	২৩	গ	২৪	ক
২৫	গ	২৬	গ	২৭	খ	২৮	ঘ	২৯	ক	৩০	ক	৩১	ঘ	৩২	খ	৩৩	গ	৩৪	ক	৩৫	ক	৩৬	গ
৩৭	খ	৩৮	খ	৩৯	ঘ	৪০	খ	৪১	খ	৪২	ক	৪৩	গ	৪৪	ক	৪৫	ক	৪৬	ঘ	৪৭	ক	৪৮	ক
৪৯	ঘ	৫০	খ	৫১	ক	৫২	খ	৫৩	ঘ	৫৪	খ	৫৫	ক	৫৬	ঘ	৫৭	ঘ						

গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মামলুক বা দাস বংশের পরিচয় দাও।

২. শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশে কুতুবউদ্দিন আইবেকের অবদান ব্যাখ্যা করো।

৩. সুলতান ইলতুৎমিশ কীভাবে মোঙ্গল আক্রমণ থেকে দিল্লি সালতানাতকে রক্ষা করেন?

৪. সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহ একজন আদর্শবাদী ও দয়ালু শাসক ছিলেন— ব্যাখ্যা করো।

৫. খলজিদের পরিচয় দাও।

৬. সুলতান আলাউদ্দিন খলজির কাছে রাজপুতদের পরাজয়ের কারণ ব্যাখ্যা করো।

৭. তুঘলক বংশের পরিচয় দাও।

৮. সৈয়দ বংশের পতনের কারণ ব্যাখ্যা করো।

৯. লোদি বংশের পরিচয় দাও।

১০. পানিপথের প্রথম যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

ঘ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. আব্বাসি খলিফা আল মুতাসিমের দেহরক্ষী বাহিনীর সদস্য থেকেই সুলতান তুঘরিল বেগ ১০৩৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন সেলজুক বংশ। ক্রীতদাস থেকে যোগ্যতাবলে তিনি বাগদাদকেন্দ্রিক একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া বলখ, তাবারিস্তান, খাওয়ারিজম, হামাদান, আল রাই ও ইস্পাহান বিজয় করে তিনি আব্বাসি খলিফার কাছ থেকে দাস মুক্তির স্বীকৃতিস্বরূপ 'সুলতান আল মুয়াজ্জাম' উপাধিতে ভূষিত হন। প্রাথমিক সমস্যাবলি মোকাবিলার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসন সুদৃঢ়ীকরণ, শিক্ষা-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করে তিনি তার শাসকোচিত চরিত্রকে শানিত করেছেন।

ক. সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ কোন গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন?

খ. চল্লিশচক্র বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকে তোমার পঠিত দিল্লি সালতানাতের কোন শাসকের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. 'উদ্দীপকের শাসকের মতো কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসন সুদৃঢ়করণ, শিক্ষা-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা উক্ত শাসকের শাসকোচিত চরিত্রকে শানিত করেছে।'— মতামত দাও।

২. কাজী পরিবারের গৃহভৃত্য মারুফ অত্যন্ত মেধাবী ও সাহসী ছিলেন। কাজী সাহেবের মৃত্যুর পর তার সন্তানেরা মারুফকে জনৈক দাস ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করেন। পশ্চিমাঞ্চলের অধিপতি দাস ব্যবসায়ীর নিকট হতে মারুফকে ক্রয় করেন এবং তার মেধা ও সাহসিকতায় মুগ্ধ হয়ে তাকে সেনাপতি নিযুক্ত করেন। ইতোমধ্যে মারুফ পার্শ্ববর্তী পূর্বাঞ্চল রাজ্য জয় করেন। আকস্মিকভাবে পশ্চিমাঞ্চল অধিপতির মৃত্যু হলে পরবর্তী শাসক মারুফকে দাসমুক্ত করে এবং বিজিত পূর্বাঞ্চলের স্বাধীন শাসক হিসেবে স্বীকৃতি দেন। সামান্য অবস্থা থেকে নিজ দক্ষতা, মেধা ও বুদ্ধিমত্তায় গৃহভৃত্য মারুফ পূর্বাঞ্চলে স্বাধীন শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। *[সকল বোর্ড ২০১৯]*

ক. 'আইবেক' শব্দের অর্থ কী?

খ. তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের গুরুত্ব বর্ণনা করো।

গ. উদ্দীপকের মারুফের প্রাথমিক জীবন দিল্লীর কোন সুলতানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত সুলতানের কৃতিত্ব পর্যালোচনা করো।

৩. ১২৬০ খ্রিষ্টাব্দে ক্ষমতারোহণ করেই বাহরি মামলুক সুলতান রুকনউদ্দিন বাইবার্স নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হন। বাইবার্স প্রথম জীবনে ক্রীতদাস হিসেবে সুলতান আল সালিহের সেনা কমান্ডার আলাউদ্দিন আইতাকিন বান্দুকদারের কাছে বিক্রি হন। ক্রমে তিনি বাহরি মামলুক দলে অধিভুক্ত হন। শাসক হওয়ার সব গুণ তার মধ্যে ছিল। তাই ক্ষোভ ও পূর্ব বিরোধের জের ধরে সুলতান কুতুজকে হত্যা করে তিনি মিসরের সিংহাসনে বসেন। প্রাথমিক বিপত্তি দূর করে মামলুক সালতানাতকে দুর্ধর্ষ মোঙ্গল, বার্বার ক্রুসেডার এবং গুপ্ত ঘাতকদের হাত থেকে রক্ষা করতে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এছাড়া তিনি আর্মেনিয়া, এন্টিয়ক, নুবিয়া প্রভৃতি রাজ্য জয় করেন। সাম্রাজ্যের উন্নতিকল্পে তিনি মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ, শিক্ষা-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা, বিজয় মিনার নির্মাণ, স্বাধীন মুদ্রার প্রচলন, নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে বাহরি মামলুক বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে মর্যাদা লাভ করেন।

ক. কুতুবউদ্দিন আইবেক কত খ্রিষ্টাব্দে ক্ষমতারোহণ করেন?
খ. সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেককে লাখ বক্স বলা হয় কেন?
গ. উদ্দীপকের শাসকের সাথে দিল্লি সালতানাতের কোন শাসকের জীবন ও কাজের মিল বিদ্যমান? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকের শাসকের মতো উক্ত শাসককেও তার বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা যায় কি? মতামত দাও।

৪. প্রাচীন মিসরীয় রাজবংশের ইতিহাসে একমাত্র নারী শাসক ছিলেন রানি ক্লিওপেট্রা। নারী হয়েও নিজ যোগ্যতা ও কৃতিত্ব বলে মিসরীয় শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন। তবে শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে রানি রাজ্যের সভাসদদের ব্যাপক বিরোধিতার সম্মুখীন হন। সুকৌশলে সব বিরোধিতা ও বিদ্রোহের নিপাত ঘটালেও নিজ ভাগ্যের কাছে রানিকে হার মানতে হয়। তিনি বেশি দিন শাসনক্ষমতায় টিকে থাকতে পারেননি। কিন্তু প্রাচীন মিসরীয় রাজবংশের ইতিহাসের পাতায় নিজ ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভাবলে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

ক. গিয়াসউদ্দিন বলবনের প্রকৃত নাম কী?
খ. সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন কীভাবে অভিজাত তুর্কিদের নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন?
গ. উদ্দীপকে তোমার পঠিত কোন শাসকের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকের শাসকের মতো 'উক্ত শাসকও নিজ ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভাবলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ইতিহাসের পাতায়'— মতামত দাও।

৫. আধুনিক জার্মানির প্রতিষ্ঠাতা স্যার অটোভন বিসমার্ক লৌহ ও রক্তপাত নীতি প্রবর্তন করেছিলেন। মূলত জার্মানিকে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করা, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাত দূর করে শাসনব্যবস্থায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্যই তিনি এ নীতির প্রবর্তন করেছিলেন। এছাড়া সামরিক বাহিনী পুনর্গঠন, অভিজাতদের নিয়ন্ত্রণ, শাসকবিরোধী বিদ্রোহ দমন, বিচার ব্যবস্থার সংস্কার এবং বৈদেশিক আক্রমণ পরিহার প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিসমার্ক তার এ নীতি বাস্তবায়ন করেন। তবে বিসমার্কের এ নীতি আন্তর্জাতিক মহলে ব্যাপক সমালোচনার ঝড় তুলেছিল।

ক. দিল্লি সালতানাতের একমাত্র নারী শাসক কে ছিলেন?
খ. রক্তপাত ও কঠোর নীতি বলতে কী বোঝায়?
গ. উদ্দীপকে তোমার পঠিত কোন শাসকের কর্মকাণ্ডের চিত্র ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. তুমি কি মনে কর বিসমার্কের মতো উক্ত শাসকের নীতিও সমালোচিত হয়েছিল? যৌক্তিক মত দাও।

৬. অটোমান সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদের রাজত্বকালে 'জেনিসারি দল' ব্যাপক ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিল। এমনকি শাসকগণ এ দলের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছিল। ফলে সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ এ দলকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এ দলের কর্মীদের নানা সুবিধাদি বন্ধ করে দেওয়া হয়। এদের অনেককে চাকরিচ্যুত করা হয়। এমনকি বহুসংখ্যককে জনসম্মুখে হত্যা করা হয়। তাছাড়া এদের জন্য বরাদ্দকৃত জায়গির বাতিল করা হয়। এভাবে ১৮২৬ খ্রিষ্টাব্দের ২০ জুন সুলতান এ দলটির বিলোপসাধন করেন। তবে সুলতান এ সময়ে ইউরোপীয় অটোমান গ্রাস নীতি ও সার্বিয়ার বিদ্রোহ ঘোষণায় কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হয়েছিলেন।

ক. সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ কত খ্রিষ্টাব্দে ক্ষমতারোহণ করেন?
খ. সুলতান রাজিয়া ব্যর্থ হয়েছিলেন কেন?
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত শাসকের সাথে তোমার পঠিত কোন শাসকের কর্মকাণ্ডের মিল বিদ্যমান? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. তুমি কি মনে কর উদ্দীপকের শাসকের মতো উক্ত শাসকও একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন? যৌক্তিক মতামত দাও।

৭. আব্বাসি খলিফা আল মনসুর ছিলেন বাস্তবধর্মী রাজনীতিবিদ। তিনি বংশের স্বার্থ রক্ষার্থে যেকোনো নিষ্ঠুর কাজ করতে পারতেন। তার স্বরাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য ছিল সম্ভাব্য সকল প্রতিদ্বন্দ্বীদের নিশ্চিহ্ন করে সিংহাসনকে শঙ্কা মুক্ত রাখা। এ উদ্দেশ্যে তিনি তার চাচা আবদুল্লাহ বিন আলী ও সেনাপতি আবু মুসলিমকে হত্যা করেন। অথচ আব্বাসীয় বংশ প্রতিষ্ঠায় তাদের অবদান ছিল অপরিসীম। তাছাড়া সানবাদের বিদ্রোহ, রাওয়ান্দিয়া বিদ্রোহ, আলী বংশীয়দের ওপর অত্যাচারসহ অনেক বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করেন এবং রাজ্য বিস্তারে মনোযোগী হন। তিনি শিক্ষা, সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করেন। মনসুর তার নির্মম ও কঠোর নীতির মাধ্যমে রাজ্যকে সুদৃঢ় করেন।

ক. দিল্লির কোন সুলতান রক্তপাত ও কঠোর নীতি প্রয়োগ করেন?
খ. সালতানাত পতনে প্রাদেশিক শাসন কতটা দায়ী ছিল? ব্যাখ্যা করো।
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত কঠোর নীতির সাথে দিল্লি সালতানাতের কোন শাসকের কঠোর নীতির মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. তুমি কি মনে কর খলিফা আল মনসুরের মতো উক্ত শাসকও সাম্রাজ্যকে শত্রুমুক্ত রাখতে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন? যৌক্তিক মত দাও।

৮. পৃথিবীর সপ্তাশ্চার্যগুলোর মধ্যে চীনের প্রাচীর বিশেষ স্থান দখল করে আছে। প্রাচীনকালে মঙ্গোলিয়ার যাযাবর দস্যুরা চীনের বিভিন্ন অঞ্চলে আক্রমণ করত এবং লুটতরাজ চালাত। ফলে দস্যুদের হাত থেকে চীনকে রক্ষা করার জন্য সম্রাট কিং সি হুয়াং এ প্রাচীর নির্মাণ করেন। পাশাপাশি সীমান্তের দুর্গগুলো সংস্কার করে দক্ষ সামরিক নেতাদের সেখানে নিয়োগ করেন। এভাবে সম্রাট সীমান্তে নিরাপত্তা নিশ্চিত করে চীনকে বৈদেশিক শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করেন।

ক. কার নামে কুতুব মিনারের নামকরণ করা হয়?

খ. সুলতান ইলতুৎমিশকে দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় কেন?

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত সম্রাটের গৃহীত পদক্ষেপের সাথে তোমার পঠিত কোন শাসকের পদক্ষেপের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উক্ত শাসকের সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার নীতি উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

৯. মি. আলেক্স উত্তরাধিকারসূত্রে এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হন। ক্ষমতা গ্রহণের পর তিনি লক্ষ্য করলেন অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন। তিনি নিজেকে "ঈশ্বরের প্রতিনিধি" বলে ঘোষণা করেন, সেনাবাহিনী পুনর্গঠন করেন, রাজতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষার জন্য কঠোর নীতি অবলম্বন করেন। তার এ পদক্ষেপ সাম্রাজ্যের সংহতির জন্য সহায়ক হয়। তিনি দীর্ঘদিন দাপটের সাথে শাসনকার্য পরিচালনায় সক্ষম হন। *[সকল বোর্ড ২০১৮]*

ক. কার নামানুসারে কুতুব মিনার নামকরণ করা হয়?

খ. ক্ষমতা গ্রহণের পর ইলতুৎমিশের সমস্যা চিহ্নিত করো।

গ. উদ্দীপকের সাথে দাস বংশের কোন শাসকের কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উক্ত শাসকের পদক্ষেপ সালতানাতের ভিত্তি সুদৃঢ় করেছিল— মন্তব্য করো।

১০. স্বনামধন্য 'সেন্ট্রাল গার্মেন্টস' চেয়ারম্যানের আকস্মিক মৃত্যুর পর তার শ্বশুর মি. মাহিন চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। দায়িত্ব গ্রহণ করেই তিনি নানামুখী সমস্যার সম্মুখীন হন। সমস্যা মোকাবিলার জন্য তিনি 'কঠোরনীতি' গ্রহণ করেন। অবাধ্য ও দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তাদের তিনি বরখাস্ত করেন এবং চেয়ারম্যানের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য নিজ অফিস কক্ষটি জমকালোভাবে সজ্জিত করেন। প্রশাসনিক শক্তি সম্পর্কে কর্মচারীদের মনে ভীতি সঞ্চার করতে চেয়ারম্যানের কক্ষে প্রবেশে কড়াকড়ি আরোপ করেন। তিনি অফিসে সার্বক্ষণিক নজরদারিরও ব্যবস্থা করেন। ফলে সর্বক্ষেত্রে তার কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে 'সেন্ট্রাল গার্মেন্টস' পুনরায় লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। *[সকল বোর্ড ২০১৭]*

ক. কোন সুলতান মেওয়াটি দস্যুদের দমন করেন?

খ. মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়াসউদ্দিন বলবন কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন?

গ. উদ্দীপকের মি. মাহিনের 'কঠোর নীতি'র মতো দিল্লি সালতানাতের কোন সুলতানের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের মি. মাহিনের সাথে উক্ত সুলতানের রাজকীয় মর্যাদা ও ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার তুলনামূলক আলোচনা করো।

১১. অনলাইন শপিং এর জনপ্রিয়তা দিন দিন বেড়েই চলছে। মানুষের ব্যস্ততা ও কর্মপরিধি বাড়তে থাকায় তারা আজ বাজারে যাবার পর্যাপ্ত সময় পাচ্ছে না। তাছাড়া প্রতিটি পণ্যের দাম নির্ধারিত থাকায়, সঠিক ওজন ও পণ্যের গুণগত মানের নিশ্চয়তা বিধান করায় এ শপিং ব্যবস্থার উপর ক্রেতাদের আস্থা ও বিশ্বাস বৃদ্ধি পাচ্ছে। পণ্যের সরবরাহ নির্বিঘ্ন, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, দ্রব্য সামগ্রীর বিপুল সমাহার ও বৈচিত্র্য থাকায় অনলাইন শপিং মানুষের সময় ও অর্থ দুটোই সাশ্রয় করছে। *[দি. বো.; কু. বো.; সি. বো.; য. বো.; ব. বো. ১৭]*

ক. তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?

খ. তৈমুর লঙের ভারত আক্রমণের ফলাফল ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত অনলাইন শপিং ব্যবস্থাপনার সাথে সুলতান আলাউদ্দিন খলজির মূল্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মিল কোথায়? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. তুমি কি মনে কর, অনলাইন শপিং ফলপ্রসূ করার জন্য গৃহীত পদক্ষেপসমূহের মতো সুলতান আলাউদ্দিন খলজিও উক্ত ব্যবস্থা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য বহুবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন? তোমার উত্তরে পক্ষে যুক্তি দাও।

১২. গ্রিক সম্রাট আলেকজান্ডার দিগ্বিজয়ী বীর হিসেবে ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে তিনি সিংহাসনে বসেন। তার শাসনকালের (খ্রি. পূর্ব. ৩৩৬-৩২৩) অধিকাংশ সময় তিনি উত্তর-পূর্ব আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়া জুড়ে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। ত্রিশ বছর বয়সের মধ্যেই তিনি মিসর থেকে উত্তর-পশ্চিম ভারত পর্যন্ত প্রাচীন বিশ্বের বৃহত্তম সাম্রাজ্যগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ইতিহাসের অন্যতম সফল সেনানায়ক।

ক. ভারতের মুসলিম শাসনের ইতিহাসে প্রথম মহিলা সুলতান কে?

খ. সুলতান আলাউদ্দিন খলজির দাক্ষিণাত্য নীতি বলতে কী বোঝায়?

গ. সম্রাট আলেকজান্ডারের সাথে সুলতান আলাউদ্দিন খলজির সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো।

ঘ. সম্রাট আলেকজান্ডারের কৃতিত্ব বর্ণনায় সুলতান আলাউদ্দিন খলজির কৃতিত্বের পরিপূর্ণ রূপ ফুটে উঠেছে কি? পাঠ্যবইয়ের আলোকে মতামত দাও।

১৩. গেল বছর প্রজাতন্ত্রের কল্যাণে সরকার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন বাড়ানোর পদক্ষেপ নিলে ব্যবসায়ীরা দ্রব্যমূল্যের দাম বাড়াতে থাকে। সে জন্য সরকার দ্রব্যমূল্যের তালিকা তৈরি করে বিভিন্ন স্থানে প্রচারের ব্যবস্থা করেন। ফলে ব্যবসায়ীদের অসৎ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে প্রজারা স্বাচ্ছন্দ্যে দিনযাপন শুরু করে।

ক. দিল্লি সালতানাতের প্রথম সুলতান কে?
খ. মালিক কাফুরকে হাজার দিনারি বলা হয় কেন?
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যবস্থার সাথে কোন শাসকের গৃহীত ব্যবস্থার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকের বর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে প্রজাসাধারণের যে সুবিধা হয়েছিল তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে লেখো।

১৪. একটি পাঁচ টাকার কয়েন গলিয়ে ২টি চা-চামচ তৈরি করে তা দশ টাকায় বিক্রি করার ফলে হঠাৎ করে 'ক' দেশে ধাতব মুদ্রার অভাব দেখা দেয়। অভাব মোকাবিলায় সরকার উর্বর দক্ষিণ অঞ্চলের কর বৃদ্ধি করে। ওদিকে ব্যবসায়ীরা মুদ্রার অভাবে সিলযুক্ত কাগজের স্লিপ ব্যবহার করতে থাকে, কিন্তু অসাধু ব্যক্তিরা এসব স্লিপ জাল করে দেশের অর্থনীতিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। *[সকল বোর্ড ২০১৫]*

ক. কারাচিল কোথায় অবস্থিত?
খ. দৌলতাবাদে রাজধানী স্থানান্তরের প্রধান কারণটি ব্যাখ্যা করো।
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত উর্বর দক্ষিণাঞ্চলের সাথে ভারতের কোন অঞ্চলের তুলনা করা যায়? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত মুদ্রাব্যবস্থার মতোই মুহম্মদ বিন তুঘলকের 'প্রতীকী মুদ্রা' পরিকল্পনাটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়— উক্তিটি মূল্যায়ন করো।

১৫. ১৯৪৭ সালে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহ নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হয়। পাকিস্তান রাষ্ট্রটি দু'ভাগে বিভক্ত করে যথাক্রমে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান নামে সংবিধিবদ্ধ করা হয়। পাকিস্তানের নতুন রাজধানী স্থাপন করা হয় করাচিতে। তবে রাষ্ট্রের মধ্যস্থলে রাজধানী প্রতিষ্ঠা, প্রশাসনিক সুবিধা, আবহাওয়াগত সুবিধা ও জনগণের দাবির প্রেক্ষিতে করাচি থেকে ইসলামাবাদে রাজধানী স্থানান্তর করা হয়।

ক. দিল্লি সালতানাতে কয়টি রাজবংশ শাসন করেছিল?
খ. সুলতান বলবনের মোঙ্গলনীতি ব্যাখ্যা করো।
গ. করাচি থেকে ইসলামাবাদে রাজধানী স্থানান্তরের সাথে তোমার পঠিত ইতিহাসের কোন শাসকের কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ শাসকের প্রণীত পরিকল্পনাগুলোর ব্যর্থতার ফলাফল বিশ্লেষণ করো।

১৬. উমাইয়া খলিফা উমর বিন আব্দুল আজিজ ৭১৭ খ্রিষ্টাব্দে ক্ষমতারোহণ করেই দুর্নীতিমুক্ত ও দক্ষ প্রশাসন গড়ে তোলায় সচেষ্ট হন। তিনি ছিলেন যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রক্তপাত নীতির বিরোধী। ফলে তার রাজত্বকালে তেমন কোনো যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয়নি। তিনি প্রজাদের ওপর উৎপীড়নমূলক নানা প্রকার কর রহিত করেন। গরিব-দুঃখী ও ক্রীতদাসদের জন্য তিনি ভাতার ব্যবস্থা করেন। তিনি ইসলামি আইন অনুসরণ করতেন এবং সাদাসিধে জীবনযাপন করতেন। এতদসত্ত্বেও তার বংশের পতনে তার গৃহীত পদক্ষেপকে দায়ী করা হয়।

ক. সুলতান ইলতুৎমিশ বিচার প্রার্থীদের জন্য দরবারে কী ঝুলিয়ে রাখতেন?
খ. সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের প্রতীকী তাম্রমুদ্রার প্রচলনের পরিকল্পনাটি বুঝিয়ে লেখো।
গ. উদ্দীপকের শাসকের সাথে দিল্লি সালতানাতের কোন শাসকের মিল লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকের শাসকের মতো 'উক্ত শাসকের গৃহীত পদক্ষেপই তার বংশের পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল'— মতামত দাও।

১৭. অটোমান সুলতান বায়েজিদ অত্যন্ত জনপ্রিয় শাসক ছিলেন। তার সাম্রাজ্য ছিল সুখ ও সমৃদ্ধিতে ভরপুর, দয়া-দাক্ষিণ্যে তিনি ছিলেন মুক্তহস্ত। বিদ্বান ও পণ্ডিতদের তিনি নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করেন। তিনি শিক্ষার্থীদের বৃত্তি ও শিক্ষকদের বিশেষ ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করেন। তার আমলে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে দুস্থদের মধ্যে বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। শাসন ব্যবস্থার পুনর্গঠন, রাজস্ব সংস্কার, রাস্তাঘাট নির্মাণ প্রভৃতিতে তিনি দক্ষতার পরিচয় দেন।

ক. তৈমুর লং কত খ্রিষ্টাব্দে ভারত আক্রমণ করেন?
খ. পানিপথের প্রথম যুদ্ধ সম্পর্কে কী জানো?
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত শাসকের শাসনব্যবস্থার সাথে তোমার পঠিত ফিরোজ শাহ তুঘলকের শাসন ব্যবস্থার কীরূপ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ফিরোজ শাহ তুঘলকের শাসন ব্যবস্থা দিল্লির সালতানাতের পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো।

১৮. ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত আব্বাসি বংশ প্রায় ৫০০ বছর শাসন করার পর ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে এর পতন ঘটে। মূলত কেন্দ্রীয় শাসনের শৈথিল্য, প্রাদেশিক শাসনের দুর্বলতা, সুষ্ঠু উত্তরাধিকার নীতির অভাব, সামরিক বাহিনীর দুর্বলতা, জাতিগত বিরোধ, জায়গির প্রথার কুফল, ক্রীতদাস প্রথার প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি কারণেই এ বংশের পতন ঘটে। তাছাড়া ক্রুসেডের (ধর্মযুদ্ধ) প্রতিক্রিয়া এবং ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খানের পৌত্র হালাকু খান বাগদাদ আক্রমণ করলে প্রায় ৫০০ বছরের আব্বাসি শাসনের অবসান ঘটে।

ক. আলাউদ্দিন খলজির প্রধান সেনাপতির নাম কী ছিল?
খ. আলাউদ্দিন খলজির দাক্ষিণাত্যে কেন অভিযান পরিচালনা করেছিলেন?
গ. উদ্দীপকে তোমার পঠিত কোন রাজবংশের পতনের প্রতিচিত্র ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. 'উক্ত রাজবংশ বহিঃআক্রমণের কারণেই চূড়ান্ত পতনের দিকে ধাবিত হয়েছিল' — উদ্দীপকের আলোকে মতামত দাও।

ঙ. সমন্বিত অধ্যায়ের সৃজনশীল প্রশ্ন

১৯. অদম্য সাহসী মোহাম্মদ আলি পাশা কয়েকবার ব্যর্থতার পর তুর্কি বাহিনীর সামান্য সৈনিক পদে যোগদানের সুযোগ পান। তিনি মিসরের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে দায়িত্ব পালনকালে দেখতে পান যে, মিসরের সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চরম অরাজকতা চলছে। অভিজাত শ্রেণি সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে, আর নিম্নশ্রেণি সব ক্ষেত্রে বঞ্চিত হচ্ছে। তাছাড়া মিসর শাসনকারী ইংরেজ, ফরাসি, মামলুক ও তুর্কিদের মধ্যে বিদ্যমান দ্বন্দ্ব-সংঘাত সেখানকার রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করে তুলেছিল। এ সুযোগে মোহাম্মদ আলি পাশা তুর্কি বাহিনীর সেনাপতি হন এবং সুকৌশলে মিসর আক্রমণ করে নিজের দখলে নেন। ফলে বিবদমান ক্ষমতাসীন শাসকবর্গ মিসর ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। মোহাম্মদ আলি পাশা প্রথমে তুর্কি সুলতানের গভর্নর হিসেবে মিসরে নিয়োগ পেলেও পরবর্তী সময়ে তিনি স্বাধীনভাবে মিসর শাসন করেন। *◀ সমন্বিত অধ্যায় ১ ও ২*

ক. বাংলার শেষ রাজা কে ছিলেন?
খ. হিন্দুদের 'বর্ণভেদ প্রথা' বলতে কী বোঝায়?
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত মিসরের অরাজকতার সাথে প্রাক-মুসলিম ভারতবর্ষের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার মিল দেখাও।
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত মোহাম্মদ আলি পাশার কর্মকাণ্ডের আলোকে মুসলমানদের বঙ্গ বিজয়ের ঘটনা বিশ্লেষণ করো।

২০. 'হীরক রাজার দেশে' সত্যজিৎ রায়ের একটি বিখ্যাত চলচ্চিত্র। হীরক রাজ্যের অত্যাচারী রাজার কাহিনি নিয়ে চলচ্চিত্রটি নির্মিত হয়েছে। এখানে দেখা যায়, হীরক রাজা নিজের স্বার্থ হাসিলের জন্য প্রজাদের নানাভাবে অত্যাচার-নির্যাতন করেন। শ্রমিকদের অক্লান্ত পরিশ্রমে বাধ্য করেন। শিক্ষিত প্রজারা তার ক্ষমতার জন্য হুমকি হয়ে উঠতে পারে এ ভয়ে তিনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও বন্ধ করে দেন। অথচ হীরক রাজ্য ছিল ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ। হীরার খনি থাকায় রাজ্যটিতে অভাব ছিল না। অত্যাচারী রাজার স্বৈরশাসনে প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশা চরম আকার ধারণ করে। অবশেষে প্রজাদের হাতেই হীরক রাজার পতন ঘটে। *◀ সমন্বিত অধ্যায় ১ ও ২*

ক. 'কুতহুল বুলদান' গ্রন্থের রচয়িতা কে?
খ. সুলতান মাহমুদের যুগকে 'কবিতার যুগ' বলা হয় কেন?
গ. উদ্দীপকে আরব বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতবর্ষের কোন অবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. হীরক রাজার পতনের সাথে দিল্লি সালতানাতের পতনের কোনো সাদৃশ্য রয়েছে কি? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

২১. উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদ ৭০৫ খ্রিষ্টাব্দে তার চাচাতো ভাই ওমর বিন আবদুল আজিজকে হেজাজের শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেন। ওমর বিন আবদুল আজিজ হেজাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ইতোপূর্বে যুদ্ধের কারণে হেজাজের গুরুত্বপূর্ণ শহর মক্কা-মদিনার পবিত্র স্থানগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ওমর বিন আবদুল আজিজ সেগুলো পুনর্নির্মাণ করেন। ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে তাকে তার পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়। মক্কা-মদিনার লোকেরা তার সুশাসনে খুশি হয়েছিল এবং সেখান থেকে তার বিদায়ের সময় অশ্রু বিসর্জন দিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে ওমর বিন আবদুল আজিজ উমাইয়া খলিফা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে প্রজাদের কল্যাণে বিভিন্ন কর মওকুফ করেন। তিনি অযথা রক্তপাত পছন্দ করতেন না। রাজ্য বিজয় অপেক্ষা প্রজাকল্যাণ সাধনকেই তিনি অধিক গুরুত্ব দিতেন। *◀ সমন্বিত অধ্যায় ১ ও ২*

ক. মুসলমানদের সিন্ধু ও মুলতান বিজয় কত শতাব্দীর ঘটনা?
খ. সালতানাত যুগ বলতে কী বোঝায়?
গ. হেজাজের শাসনকর্তা হিসেবে ওমর বিন আবদুল আজিজের কর্মকাণ্ডের সাথে সিন্ধুর কোন মুসলিম শাসনকর্তার কাজের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. খলিফা হিসেবে ওমর বিন আবদুল আজিজের কার্যক্রমের আলোকে দিল্লির সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের কার্যক্রম মূল্যায়ন করো।

২২. সাম্মী সম্প্রতি 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' নামে একটি মুভি দেখেছে। মুভিটিতে শুন্ডী রাজ্যের রাজা অত্যন্ত প্রজারঞ্জক। প্রজাদের কল্যাণের জন্য তিনি সবসময় সচেষ্ট থাকেন। তার রাজ্যটি ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ। ফলে রাজ্যে অভাব নেই। কিন্তু এই ধন-সম্পদই শুন্ডী রাজ্যের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়। পার্শ্ববর্তী হুন্ডী রাজ্যের রাজা ধন-সম্পদের লোভে শুন্ডী রাজ্য আক্রমণের প্রস্তুতি নেয় এবং যুদ্ধ ঘোষণা করে শুন্ডী রাজার কাছে চিঠি পাঠায়। *◀ সমন্বিত অধ্যায় ১ ও ২*

ক. দিল্লি থেকে দেবগিরির দূরত্ব কত ছিল?
খ. আলাউদ্দিন খলজি রেশনিং ব্যবস্থা চালু করেছিলেন কেন?
গ. হুন্ডী রাজার যুদ্ধ ঘোষণা সুলতান মাহমুদের ভারত আক্রমণের কোন কারণটিকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. শুন্ডীর রাজাকে দিল্লি সালতানাতের সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের সার্থক প্রতিচ্ছবি বলা যায় কি? তোমার মতামত দাও।

২৩. গ্রিক বীর আলেকজান্ডার মাত্র বিশ বছর বয়সে তার পিতা মেসোডোনিয়ার রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের স্থলাভিষিক্ত হন। শাসনকালের অধিকাংশ সময় তিনি উত্তর-পূর্ব আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়ায় অভিযান পরিচালনা করেন। আলেকজান্ডার একের পর এক রাজ্য বিজয় করে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছার স্পৃহায় ৩২৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ভারত আক্রমণ করেন। তিনি মিসর থেকে ভারত পর্যন্ত প্রাচীন বিশ্বের একটি অন্যতম বৃহৎ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। *◀ সমন্বিত অধ্যায় ১ ও ২*

ক. কোন খলিফার সময়ে মুসলমানরা সিন্ধু বিজয় করে?
খ. আরবদের সিন্ধু অভিযানের প্রত্যক্ষ কারণটি ব্যাখ্যা করো।
গ. আলেকজান্ডার এবং সুলতান মাহমুদের ভারত আক্রমণের উদ্দেশ্য কোন দিক দিয়ে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. গ্রিক বীর আলেকজান্ডার এবং দিল্লির সুলতান আলাউদ্দিন খলজির বিজয়াভিযানের উদ্দেশ্য অভিন্ন— উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করো।

৩

ভারত উপমহাদেশে মুঘল শাসন

Mughal Rule in Indian Sub-Continent

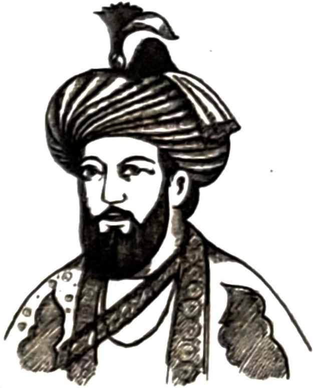

জহিরউদ্দিন মুহাম্মদ বাবর

প্রধান প্রধান শব্দ

- মোঙ্গল
- গোলন্দাজ বাহিনী
- সড়ক-ই-আযম
- নবরত্ন
- বাংলা নববর্ষ
- সুলহ-ই-কুল
- দ্বীন-ই-ইলাহি
- মনসব
- তাজমহল
- দস্তুরুল আমল
- বারো ভূঁইয়া
- মারাঠা সাম্রাজ্য
- জিন্দাপির

১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করে জহিরউদ্দিন মুহাম্মদ বাবর ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্য (১৫২৬-১৮৫৮ খ্রি.) প্রতিষ্ঠা করেন। ষোড়শ শতাব্দীর শুরুতে এ নতুন রাজবংশের গোড়াপত্তন ইসলামের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করে। ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত 'মুঘল রাজবংশ' ভারত শাসন করে। এ বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট জালালউদ্দিন মুহাম্মদ আকবর। তিনি মুঘল বংশকে একটি স্থায়ী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করে এ বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে মর্যাদা লাভ করেন। এ বংশের শেষ সম্রাট ছিলেন বাহাদুর শাহ জাফর। ১৮৫৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশে সংঘটিত সিপাহি বিদ্রোহের পটভূমিতে ব্রিটিশ সরকার ১৮৫৮ সালে বাহাদুর শাহকে ক্ষমতাচ্যুত করে বর্তমান মিয়ানমারে নির্বাসন দেয়। এর মধ্য দিয়ে প্রায় তিনশ বছর ভারত শাসনকারী মুঘল রাজবংশের অবসান ঘটে।

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখব

- ভারতে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠা: বাবর, চরিত্র ও কৃতিত্ব
- সম্রাট হুমায়ুন: মুঘল-আফগান দ্বন্দ্ব
- শের শাহ: শাসন ব্যবস্থা ও জনহিতকর কার্যাবলি
- সম্রাট আকবর: রাজ্য বিজয়, ধর্মীয় নীতি, রাজপুত নীতি ও শাসন পদ্ধতি
- সম্রাট জাহাঙ্গীর: নূরজাহানের প্রভাব, চরিত্র ও কৃতিত্ব
- সম্রাট শাহজাহান: স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ, পুত্রদের মধ্যকার উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব, চরিত্র ও কৃতিত্ব
- সম্রাট আওরঙ্গজেব: দাক্ষিণাত্য নীতি, চরিত্র ও কৃতিত্ব
- মুঘল সাম্রাজ্যের পতন: কারণ ও ফলাফল
- মুঘল আমলের শাসন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা

পাঠ পরিকল্পনা

পাঠ ১	মুঘলদের পরিচয় এবং সম্রাট বাবরের প্রাথমিক জীবন
পাঠ ২	সম্রাট বাবর: ভারতে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠা (১৫২৬-১৫৩০ খ্রি.)
পাঠ ৩	সম্রাট বাবর পরিচালিত অন্যান্য যুদ্ধ এবং তার চরিত্র ও কৃতিত্ব
পাঠ ৪	সম্রাট হুমায়ুন: প্রাথমিক জীবন ও সমস্যাবলি এবং মুঘল-আফগান দ্বন্দ্ব (১৫৩০-১৫৫৬ খ্রি.)
পাঠ ৫	মুঘল-আফগান সংঘর্ষে হুমায়ুনের পরাজয়ের কারণ, রাজ্য পুনরুদ্ধার এবং তার চরিত্র ও কৃতিত্ব
পাঠ ৬	শের শাহ: প্রাথমিক জীবন ও রাজ্য বিজয় (১৫৪০-১৫৪৫ খ্রি.)
পাঠ ৭ ও ৮	শের শাহের শাসন ব্যবস্থা ও জনহিতকর কার্যাবলি
পাঠ ৯	শের শাহের চরিত্র ও কৃতিত্ব
পাঠ ১০ ও ১১	সম্রাট আকবর: প্রাথমিক জীবন ও রাজ্য বিজয় (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রি.)
পাঠ ১২	সম্রাট আকবরের রাজপুত নীতি
পাঠ ১৩	সম্রাট আকবরের ধর্মীয় নীতি
পাঠ ১৪	সম্রাট আকবরের শাসন ব্যবস্থা এবং তার প্রবর্তিত মনসবদারি প্রথা
পাঠ ১৫	সম্রাট আকবরের চরিত্র ও কৃতিত্ব
পাঠ ১৬	সম্রাট জাহাঙ্গীর: প্রাথমিক জীবন ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি (১৬০৫-১৬২৭ খ্রি.)
পাঠ ১৭	সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজ্য বিস্তার
পাঠ ১৮ ও ১৯	সম্রাট জাহাঙ্গীরের ওপর নূরজাহানের প্রভাব এবং সম্রাট জাহাঙ্গীরের চরিত্র ও কৃতিত্ব
পাঠ ২০	সম্রাট শাহজাহান: প্রাথমিক জীবন ও বাধা-বিপত্তি (১৬২৭-১৬৫৮ খ্রি.)
পাঠ ২১	সম্রাট শাহজাহানের সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ নীতি
পাঠ ২২	সম্রাট শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যকার উত্তরাধিকার সংগ্রাম
পাঠ ২৩	স্থাপত্য ও চিত্রশিল্পের বিকাশে সম্রাট শাহজাহানের অবদান
পাঠ ২৪ ও ২৫	সম্রাট শাহজাহানের চরিত্র ও কৃতিত্ব এবং সম্রাজ্ঞী মমতাজমহল
পাঠ ২৬ ও ২৭	সম্রাট আওরঙ্গজেব: প্রাথমিক জীবন ও সাম্রাজ্য বিস্তার (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রি.)
পাঠ ২৮	সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজপুত নীতি
পাঠ ২৯	সম্রাট আওরঙ্গজেবের ধর্মীয় নীতি
পাঠ ৩০	সম্রাট আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি
পাঠ ৩১	সম্রাট আওরঙ্গজেবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্ব
পাঠ ৩২	সম্রাট আওরঙ্গজেব পরবর্তী মুঘল সম্রাটগণ
পাঠ ৩৩	মুঘল সাম্রাজ্যের পতন: কারণ ও ফলাফল
পাঠ ৩৪	মুঘল আমলের প্রশাসন
পাঠ ৩৫	মুঘল আমলে ভারতের আর্থ-সামাজিক অবস্থা

পাঠ ১

মুঘলদের পরিচয় এবং সম্রাট বাবরের প্রাথমিক জীবন
Introduction to Mughals and Early Life of Emperor Babur

মুঘলদের পরিচয় (Introduction to Mughals)

মোঙ্গল শব্দ থেকে 'মুঘল' (মোগল) কথাটির উদ্ভব হয়েছে। মহাবীর চেঙ্গিস খান প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ ইতিহাসে 'মোঙ্গল' নামে পরিচিত। এরা মঙ্গোলিয়ার অধিবাসী। মোঙ্গলরা ছিল দুর্ধর্ষ ও নির্ভীক। চেঙ্গিস খান (তেমুচিন) তাদের বিচ্ছিন্ন উপদলগুলো একত্র করে এশিয়ার একটি শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তিতে পরিণত করেন। তিনি উত্তরে সাইবেরিয়া থেকে দক্ষিণে জর্জিয়া এবং পূর্বে চীন থেকে পশ্চিমে রুশ দেশ পর্যন্ত বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। তার মৃত্যুর পর দ্বিতীয় পুত্র চাঘতাই খানের রাজ্য মধ্য এশিয়ায় তৈমুর লঙের আবির্ভাব ঘটে। তিনি ১৩৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ভারত আক্রমণ করেন। মূলত সুলতানি যুগ থেকেই মোঙ্গলরা ভারতে রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়। অবশেষে মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খান এবং চাঘতাই তুর্কি-তৈমুর লঙের বংশধর বাবর ভারতে একটি নতুন রাজবংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন, যা মুঘল নামে পরিচিতি লাভ করে। মুঘলদের ধর্ম ছিল ইসলাম। কিন্তু সভ্যতা ও কৃষ্টি ছিল ইরানি। ড. এম. এল. রায় চৌধুরী বলেন, 'মুঘলরা জন্মগতভাবে মধ্য এশিয়ার বাসিন্দা ছিল। তারা ধর্মে আরবীয়, কৃষ্টিতে ইরানি এবং স্থায়ীভাবে ভারতের বাসিন্দা। তাদের মধ্যে অনেকে ভারতে জন্মগ্রহণ করেন, ভারতের মাটিতে লালিত-পালিত হন এবং ভারতেই তাদেরকে সমাহিত করা হয়।' ভারতীয় সভ্যতার সাথে পারস্য (ইরান) সভ্যতার সংমিশ্রণকারী ও যোগসূত্র স্থাপনকারী মুঘলগণ বর্তমানকালের ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। এই উপমহাদেশের স্থাপত্য, শিল্পকলা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, নৃত্য, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি সবক্ষেত্রে মুঘলদের অবদান অনস্বীকার্য।

বাবরের প্রাথমিক জীবন ও সিংহাসনে আরোহণ: 'বাবর' তুর্কি শব্দ, যার অর্থ সিংহ। জহিরউদ্দিন মুহাম্মদ বাবর ১৪৮৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি মধ্য এশিয়ার তুর্কিস্তানের ফারগানায় জন্মগ্রহণ করেন। সিংহের মতো তেজ ও সাহসিকতা দ্বারা তিনি বাবর নামের সার্থকতা প্রমাণ করেন। তার পিতার নাম ওমর শেখ মির্জা এবং মা কুতলুঘ নিগার খানম। তিনি পিতার দিক থেকে চাঘতাই তুর্কি বীর তৈমুর লঙ এবং মাতার দিক থেকে মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খানের বংশধর ছিলেন। তবে তিনি তার আত্মজীবনী 'বাবরনামায়' নিজেকে 'চাকতাই বা চাঘতাই তুর্কি' বলে পরিচয় দিয়েছেন। বাবরের বাল্যজীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দু'জন মহান মানুষের সংস্পর্শে বাবরের চরিত্রে সাহসিকতা, তেজস্বিতা ও আত্মনির্ভরশীলতা ইত্যাদি মহৎ গুণের সমাবেশ ঘটেছিল। এদের একজন হলেন তার মাতামহী আয়সন দৌলত বেগম এবং অন্যজন তার গৃহশিক্ষক আবদুল মজিদ। গৃহশিক্ষক আবদুল মজিদের কাছে তিনি আরবি, ফারসি ও তুর্কি ভাষায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন । বাবরের পিতা ওমর শেখ মির্জা ছিলেন ফারগানা রাজ্যের আমির। বড় ভাই আহমদ মির্জা এবং শ্যালক মাহমুদ খানের সাথে ওমর মির্জার প্রবল শত্রুতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। ১৪৯৪ খ্রিষ্টাব্দে ওমর মির্জা তার এ দু'প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে বের হন। তবে এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হলে বাবর মাত্র ১১ বছর ৪ মাস বয়সে ফারগানার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

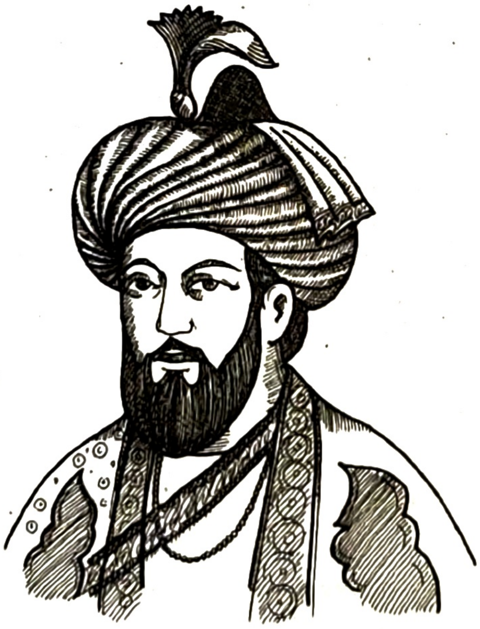

সম্রাট বাবর

সমরখন্দ অভিযান: সিংহাসনে আরোহণ করার পরপরই বাবর এর দুই পিতৃব্য ও আত্মীয়স্বজন এবং উজবেক নেতা সাইবানি খানের বিরোধিতার মুখে পড়েন। বাবর ১৪৯৭ খ্রিষ্টাব্দে মধ্য এশিয়ার অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিরোধের সুযোগে সমরখন্দ অধিকার করেন। কিন্তু ভাগ্য বিপর্যয়ে তিনি সমরখন্দ হারান। ১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ফারগানাও তার হস্তচ্যুত হয়। সমরখন্দ ও ফারগানা হারিয়ে দাবার ছকের রাজার মতো বাবর এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়াতে থাকেন। ঐতিহাসিক আবুল কাশিম ফিরিশতা বলেন, 'He was moving from square to square like a king on chess board.' কিন্তু তিনি দক্ষতাবলে ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দে ফারগানা পুনরুদ্ধার করেন। ১৫০২ খ্রিষ্টাব্দে সমরখন্দ অধিকার করেন। পরবর্তীকালে ১৫০৩ খ্রিষ্টাব্দে আরচিয়ানের যুদ্ধে সাইবানি খানের কাছে পরাজিত হয়ে ফারগানা ও সমরখন্দ থেকে বিতাড়িত হন। অসহায় ও আশ্রয়হীন বাবর বর্তমান উজবেকিস্তানের তাসখন্দে তার মামা সুলতান মাহমুদ খানের আশ্রয়লাভ করেন।

কাবুলে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা: স্বদেশে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আশা ত্যাগ করে বাবর অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক গোলযোগের সুযোগ নিয়ে ১৫০৪ খ্রিষ্টাব্দে রাজা আরঘুনকে পরাজিত করে কাবুল অধিকার করেন। অল্পদিনের মধ্যেই সমগ্র আফগানিস্তানে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে বাবর 'বাদশাহ' উপাধি গ্রহণ করেন। কাবুলে প্রতিষ্ঠা লাভের পর সাইবানি খানের মৃত্যুর সুযোগে চতুর বাবর পারস্য সম্রাট শাহ ইসমাইলের সাথে মৈত্রী স্থাপন করেন এবং তার সহায়তায় ১৫১১ খ্রিষ্টাব্দে সমরখন্দ অধিকার করেন। খোরাসানেও তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কান্দুজ, তাসখন্দ, হিসার এমনকি ফারগানাও তার অধিকারে চলে আসে। কিন্তু তার এ সাফল্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ১৫১২ খ্রিষ্টাব্দে সাইবানি খানের পুত্রের নেতৃত্বে উজবেকদের কাছে গাজদাওয়ানের যুদ্ধে বাবর পরাজিত হলে তিনি কাবুলে ফিরে যেতে বাধ্য হন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কোন শব্দ থেকে 'মুঘল'কথাটির উদ্ভব হয়েছে? *[রা. বো., কু. বো., য. বো. ২০২২]*
২. কার প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ 'মোঙ্গল' নামে পরিচিত?
৩. জন্মগতভাবে মুঘলরা কোন জায়গার অধিবাসী?
৪. 'বাবর' শব্দের অর্থ কী? *[ম. বো., দি. বো. ২০২৫; ঢা., য., দি., চ., সি., ব. বো. ২০২২; সকল বোর্ড ২০১৫]*
৫. বাবর কোন দিক থেকে মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খানের বংশধর?
৬. কত বছর বয়সে বাবর ফারগানার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন?

উত্তরের জন্য ২৪৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. মুঘলদের পরিচয় সম্পর্কিত একটি চার্ট তৈরি করো।
২. সম্রাট বাবরের প্রাথমিক জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলো নিয়ে একটি ছক তৈরি করো।

গ. দলীয় কাজ

'প্রাথমিক জীবনের সংকটই সম্রাট বাবরকে ভারতে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠায় প্রেরণা দিয়েছে'— দুটি দলে ভাগ হয়ে বিষয়টি আলোচনা করো।

পাঠ ২

সম্রাট বাবর: ভারতে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠা (১৫২৬-১৫৩০ খ্রি.)
Emperor Babur: Establishment of Mughal Empire in India (1526-1530 AD)

ভারতে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠা (Establishment of Mughal Empire in India)

১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধ জয়লাভ করে লোদি সালতানাতের ধ্বংসস্তূপের ওপর সম্রাট বাবর ভারতে মুঘল শাসনের গোড়াপত্তন করেন। মুঘল রাজবংশের ১৭ জন শাসক প্রায় তিনশ বছর (১৫২৬-১৮৫৮ খ্রি.) দিল্লি শাসন করে। মহামতি আকবরকে এ বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের পর মুঘল বংশের সর্বশেষ শাসক দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে ব্রিটিশ সরকার রেঙ্গুনে (মিয়ানমার) নির্বাসন দেয়। আর এরই মধ্য দিয়ে ভারতে মুঘল শাসনের অবসান ঘটে।

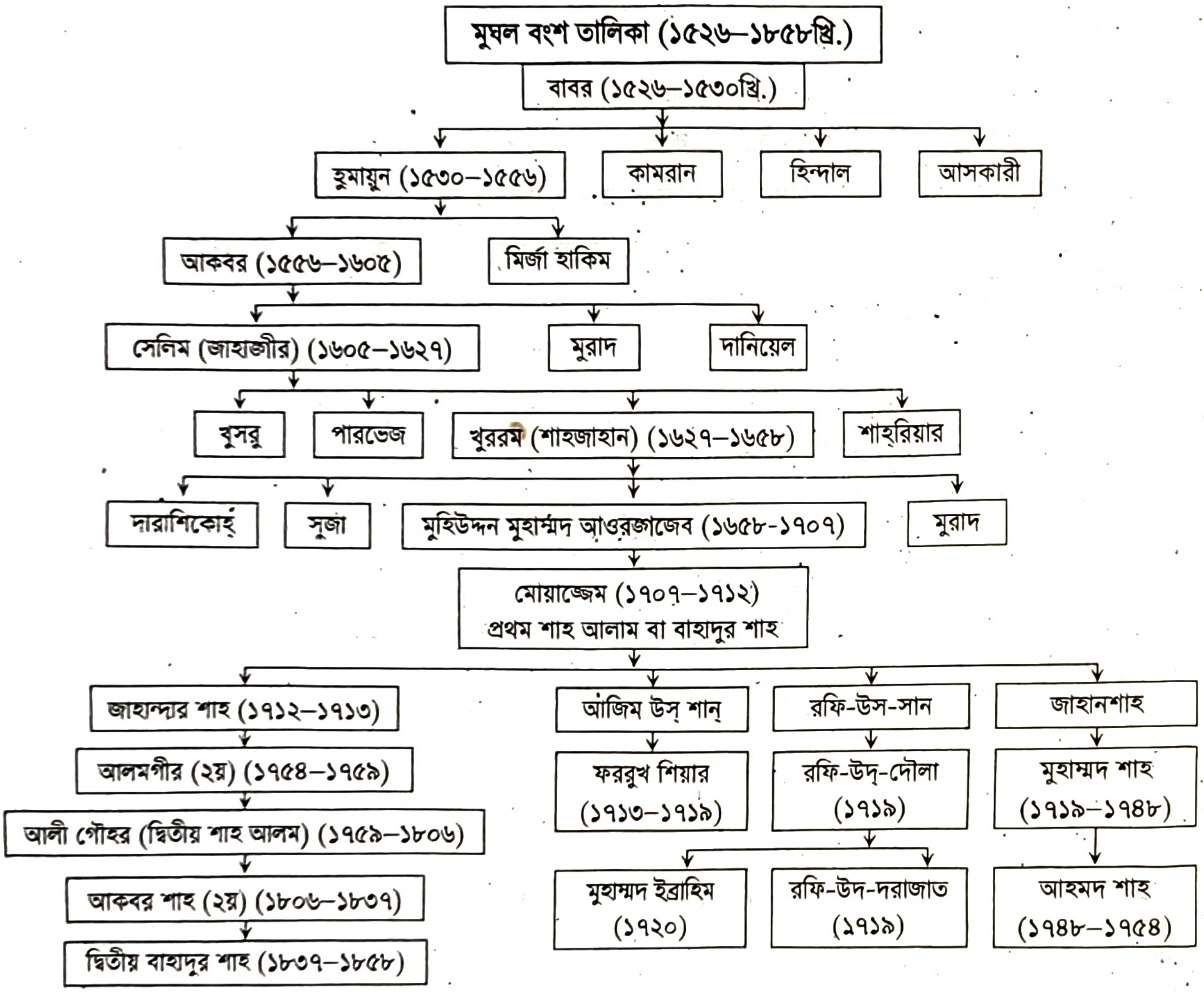
মুঘল বংশ তালিকা (১৫২৬–১৮৫৮খ্রি.)
বাবর (১৫২৬–১৫৩০খ্রি.)
হুমায়ুন (১৫৩০–১৫৫৬)
কামরান
হিন্দাল
আসকারী
আকবর (১৫৫৬–১৬০৫)
মির্জা হাকিম
সেলিম (জাহাঙ্গীর) (১৬০৫–১৬২৭)
মুরাদ
দানিয়েল
খুসরু
পারভেজ
খুররম (শাহজাহান) (১৬২৭–১৬৫৮)
শাহ্রিয়ার
দারাশিকোহ্
সুজা
মুহিউদ্দিন মুহাম্মদ আওরঙ্গজেব (১৬৫৮-১৭০৭)
মুরাদ
মোয়াজ্জেম (১৭০৭–১৭১২)
প্রথম শাহ আলাম বা বাহাদুর শাহ
জাহান্দার শাহ (১৭১২–১৭১৩)
আজিম উস্ শান্
রফি-উস-সান
জাহানশাহ
আলমগীর (২য়) (১৭৫৪–১৭৫৯)
ফররুখ শিয়ার (১৭১৩–১৭১৯)
রফি-উদ্-দৌলা (১৭১৯)
মুহাম্মদ শাহ (১৭১৯–১৭৪৮)
আলী গৌহর (দ্বিতীয় শাহ আলম) (১৭৫৯–১৮০৬)
মুহাম্মদ ইব্রাহিম (১৭২০)
রফি-উদ-দরাজাত (১৭১৯)
আহমদ শাহ (১৭৪৮–১৭৫৪)
আকবর শাহ (২য়) (১৮০৬–১৮৩৭)
দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ (১৮৩৭–১৮৫৮)

মুঘল অভিযানের আগে ভারত উপমহাদেশের সার্বিক অবস্থা (The Overall Condition of Indian Sub-Continent before the Expeditions of Mughal)

দীর্ঘদিনের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম সালতানাতের পতন ঘটিয়ে নতুন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা কোনো তাৎক্ষণিক ঘটনার ফল হতে পারে না। বস্তুত সমকালীন ভারতের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও সামরিক অবস্থার দুর্বলতাই ভারতে মুঘল সাফল্যকে সহজতর করেছিল। তাই বাবরের ভারত বিজয় সংক্রান্ত বিষয় আলোচনার ক্ষেত্রে সমকালীন ভারতের একটি বাস্তব চিত্র সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন।

রাজনৈতিক অবস্থা: বাবর যখন ভারত আক্রমণ করেন তখন দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন সুলতান ইব্রাহিম লোদি (১৫১৭-১৫২৫ খ্রি.)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তুঘলক বংশের শাসনের (১৩২০-১৪১৩ খ্রি.) শেষের দিকে দিল্লির কেন্দ্রীয় শক্তি অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এ সুযোগে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব ঘটে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে দক্ষিণ ভারতের বাহমনি ও বিজয়নগর, উত্তর ভারতে কাশ্মির ও জৈনপুর, পূর্ব ভারতে বাংলা, বিহার ও

উড়িষ্যা এবং পশ্চিম ভারতে পাঞ্জাব, মালব ও গুজরাট। এসব রাজ্যের স্বাধীনতাপ্রিয় রাজাদের সাথে সংঘাত থাকায় দিল্লির কেন্দ্রীয় শক্তি ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ে। ইব্রাহিম লোদি ছিলেন একজন অযোগ্য, দুর্বলচিত্ত এবং কূটনীতিজ্ঞানে অপরিপক্ক শাসক। তার পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বী উদীয়মান রাজশক্তিসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি। ফলে লোদিদের ক্ষমতার কেন্দ্র দিল্লি এবং আশপাশেই সীমিত হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া এ সময় লোদি অভিজাত শাসকচক্রের মধ্যে স্বার্থ-সংঘাত তীব্রতর হওয়ায় ভারতে বাবরের সাফল্যের পথ সুগম হয়। একটি নৈরাজ্যকর রাজনৈতিক অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে বাবর ভারত আক্রমণের জন্য অগ্রসর হন।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা: দিল্লি সালতানাতের প্রাথমিক পর্যায়ে তুর্কি ও আফগান সুলতানদের উদারতার কারণে ভারতে হিন্দু-মুসলিম সমাজ ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু তুঘলক বংশের শেষ দিকে এসে ভারতীয় সমাজের এ বন্ধনে কিছুটা ফাটল ধরে। এ সময় দিল্লির চেয়ে আঞ্চলিক রাজ্যগুলোতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে আন্তরিক সম্পর্ক ছিল বেশি। বাংলায়ও এ সময় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সুসম্পর্ক বিরাজ করছিল। ১৬ শতকের সূচনাকালে সুফি ও বৈষ্ণবদের মাধ্যমে ভক্তিবাদী আন্দোলন জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়। এ ধরনের হৃদ্যতাপূর্ণ সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি ভারতবর্ষের ঔজ্জ্বল্য বাড়িয়ে দিয়েছিল, যা বিদেশিদের চোখে ভারতকে আরও আকর্ষণীয় করেছিল।

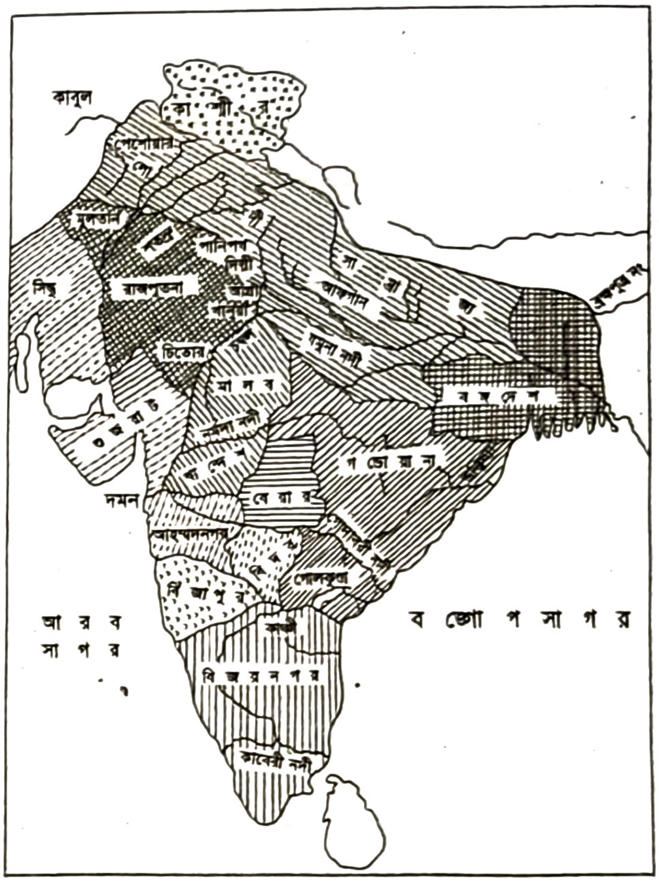

বাবরের আক্রমণকালে ভারতবর্ষ

অর্থনৈতিক অবস্থা: ভারত ছিল একটি সম্পদশালী দেশ। বাবর নিজে দিল্লি, আগ্রা ও গোয়ালিয়রকে অর্থসম্পদে পূর্ণ দেখেছেন বলে তার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'তুজুক-ই-বাবরি'তে উল্লেখ করেছেন। এ দেশের বিত্ত-বৈভবের মূল নিয়ামক ছিল কৃষি। মুঘল আক্রমণের প্রাক্কালে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ছাড়াও ভারতের পণ্যসামগ্রী মালয়, চীন এবং প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে রপ্তানি করা হতো। স্থলপথে বাণিজ্য প্রসারিত ছিল মধ্য এশিয়া, আফগানিস্তান, ইরান, তিব্বত, ভুটান প্রভৃতি দেশে। উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বস্ত্র, রেশম, সুতা, ধাতব দ্রব্য ও কাগজ তৈরির শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল।

সামরিক অবস্থা: অর্থ প্রাচুর্য থাকলেও উপমহাদেশের রাজ্যগুলোর মধ্যে সামরিক দুর্বলতা ছিল প্রকট। বিদেশি আক্রমণ প্রতিরোধের মতো ঐক্যবদ্ধ সামরিক শক্তি তখন ভারতে ছিল না। ভারতীয়দের সমরাস্ত্র ও যুদ্ধকৌশল ছিল তুলনামূলকভাবে সেকেলে ও সনাতন। অথচ এ সময় ইরানি, আফগান ও মধ্য এশীয়রা আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র ও রণকৌশল আয়ত্ত করে ফেলেছিল।

বাবরের ভারত অভিযানের কারণ (Causes of Indian Expedition of Babur)

পিতৃরাজ্য হাতছাড়া হওয়া এবং পূর্বপুরুষদের আবাসভূমি মধ্য এশিয়ায় সাম্রাজ্য স্থাপনের সম্ভাবনা অনিশ্চিত হয়ে পড়ায় বাবর ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ভাগ্য পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নেন। বাবরের ভারত আক্রমণের পেছনে বেশ কিছু কারণ ছিল বলে ঐতিহাসিকেরা মনে করেন। এসব কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল—

প্রথমত, এ বিষয়ে সব ঐতিহাসিকই একমত যে, বাবর ছিলেন মনে-প্রাণে উচ্চাভিলাষী ও সাম্রাজ্যবাদী। সাম্রাজ্য স্থাপনে তার প্রধান লক্ষ্যস্থল ছিল মধ্য এশিয়া। কিন্তু সেখানে সাম্রাজ্য স্থাপনের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হওয়ায় বাবর ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন। বাবরের পূর্বপুরুষেরা এর আগে ভারতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সফল হওয়ায় বাবর ভারতে নিজের সাফল্য সম্পর্কে আশাবাদী ছিলেন। এ বিষয়ে তিনি তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "যেহেতু হিন্দুস্থানের অনেকগুলো অঞ্চলই তুর্কিদের অধিকারে ছিল, সেহেতু আমি ভারত বিজয়ের স্বপ্ন দেখতাম। আমি একে নিজ রাজ্য বলে মনে করতাম এবং বলপ্রয়োগ বা শান্তিপূর্ণ উপায়ে দখল করতে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ ছিলাম।"

দ্বিতীয়ত, তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক অবস্থাও ছিল বাবরের আক্রমণের জন্য অনুকূলে। বাবরের অভিযানকালে ভারতের অবস্থা বিশেষ করে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল সংকটজনক। ভারতে বিরাজমান রাজনৈতিক অনৈক্য ও কোন্দল এবং তাদের সামরিক দুর্বলতা দেখে সাম্রাজ্যবাদী বাবর নিজের সাফল্যের সম্ভাবনায় উদ্দীপ্ত হন এবং ভারত আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন।

তৃতীয়ত, মধ্য এশিয়ায় বাবরের ব্যর্থতা, পিতৃরাজ্য হারানো এবং তার দেশান্তরী হওয়ার পেছনে মূল কারণ ছিল উজবেক শক্তির উত্থান। ফলে উজবেকদের ব্যাপারে বাবরের একরকমের ভীতি ছিল। কাবুলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পরও তাকে এ উজবেকভীতি তাড়া করে ফিরত। কাবুলের মতো ছোট একটি রাজ্য এবং কম সৈন্য নিয়ে ভবিষ্যতে উজবেক আগ্রাসন মোকাবিলা করা সম্ভব হবে না বলে তিনি মনে করতেন। তাই উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে বাবর তার দৃষ্টি সরিয়ে ভারতমুখী করেন।

চতুর্থত, কাবুল ও কান্দাহারে রাজত্বকালে বাবর তীব্র অর্থসংকটে ছিলেন। অনুর্বর ও পার্বত্য অঞ্চলের সংগৃহীত রাজস্ব দিয়ে প্রশাসনিক ও সামরিক ব্যয় নির্বাহ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছিল। ভারতবর্ষ বরাবরই ধনরত্নে পরিপূর্ণ একটি দেশ হিসেবে বহির্বিশ্বে পরিচিত ছিল। ভারতের এ প্রাচুর্যে প্রলুব্ধ হয়ে ইতিহাসের নানা কালপর্বে বহিরাগত শক্তি ভারত আক্রমণ করে। একই কারণে বাবরও ভারত আক্রমণ করেছিলেন বলে ঐতিহাসিকদের মত।

এ বাস্তবতায় দিল্লির সুলতান ইব্রাহিম লোদির ওপর অসন্তুষ্ট পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খান লোদি এবং সুলতানের চাচা আলম খান লোদিসহ সুলতানি উলেমা ও অভিজাতদের আমন্ত্রণ বাবরের ভারত অভিযানকে ত্বরান্বিত করেছিল।

ভারতের বিরুদ্ধে প্রাথমিক অভিযানসমূহ: ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার আগে বাবরকে ভারতের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি অভিযান পরিচালনা করতে হয়েছিল। ১৫১৯-২০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি তিনটি অভিযান পরিচালনা করেন এবং সিন্ধু নদ অতিক্রম করে বজৌর দুর্গ, ভেরা, কুশব ও চেনাব নদীর অববাহিকা অঞ্চল জয় করে কাবুলে ফিরে যান। ১৫২০ খ্রিষ্টাব্দে বাবর বাদাখশান এবং ১৫২২ খ্রিষ্টাব্দে কান্দাহার জয় করেন। এ সময় দিল্লির সুলতান ইব্রাহিম লোদির প্রতি অসন্তুষ্ট পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলতখান লোদি ও সুলতানের চাচা আলমখান লোদি বাবরকে ভারত আক্রমণের আমন্ত্রণ জানান। মেবারের রাজপুত রাজা রানা সংগ্রাম সিংহও বাবরকে ভারত আক্রমণে উৎসাহিত করেন। এ অবস্থায় বাবর সময় নষ্ট না করে ১৫২৪ খ্রিষ্টাব্দে পুনরায় ভারত আক্রমণ করেন এবং লাহোর, দিপালপুর এবং ১৫২৫ খ্রিষ্টাব্দে পাঞ্জাব আক্রমণ করে সহজে তা জয় করেন। এরপর তিনি দিল্লির দিকে দৃষ্টি দেন এবং ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে সুলতান ইব্রাহিম লোদির মুখোমুখি হন।

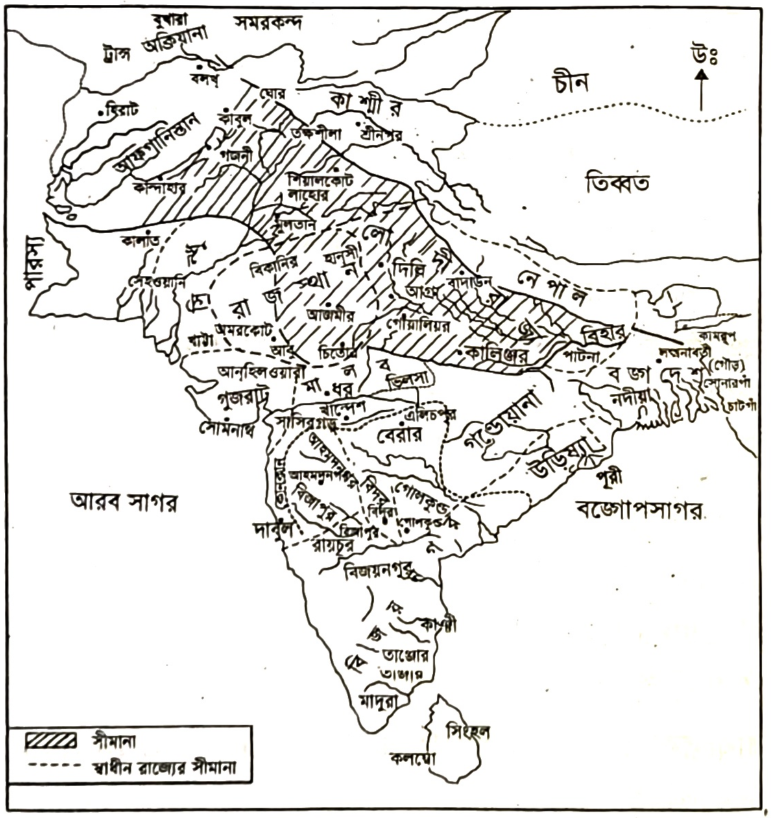
বুখারা
সমরকন্দ
ট্রান্স অক্সিয়ানা
বলখ
ঘোর
কাশ্মীর
চীন
উঃ
হিরাট
কাবুল
তক্ষশীলা
শ্রীনগর
আফগানিস্তান
গজনী
কান্দাহার
শিয়ালকোট
লাহোর
তিব্বত
মুলতান
কালাত
পারস্য
বিকানির
যমুনা
দিল্লি
সেহওয়ান
রাজস্থান
আগ্রা
বাদাউন
নেপাল
আজমীর
গোয়ালিয়র
অমরকোট
চিতোর
কালিঞ্জর
বিহার
পাটনা
কামরূপ
লক্ষনাবতী
(গৌড়)
সোনারগাঁ
আনহিলওয়ারা
মালব
ভিলসা
বঙ্গদেশ
নদীয়া
চাটগাঁ
গুজরাট
খান্দেশ
এলিচপুর
সোমনাথ
বেরার
গণ্ডোয়ানা
উড়িষ্যা
পুরী
আহমদনগর
বিদর
গোলকুণ্ড
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
বিজাপুর
দাবুল
রায়চুর
বিজয়নগর
কাঞ্চী
তাঞ্জোর
মাদুরা
সিংহল
কলম্বো
▨ সীমানা
----- স্বাধীন রাজ্যের সীমানা

বাবরের ভারতবর্ষ অভিযান ও মুঘল সাম্রাজ্য (১৫২৬ খ্রি.)

পানিপথের প্রথম যুদ্ধ (২১ এপ্রিল, ১৫২৬ খ্রি.) (The Battle of Panipat, 21 April, 1526 AD)

১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দের ২১ এপ্রিল বাবর ইব্রাহিম লোদির সাথে ঐতিহাসিক পানিপথ প্রান্তরে সরাসরি যুদ্ধে অংশ নেন। উল্লেখ্য যে, পানিপথ বর্তমান ভারতের রাজধানী দিল্লি থেকে ৮০ কি. মি. উত্তরে হরিয়ানা রাজ্যে অবস্থিত। এ প্রান্তরে বাবর ও ইব্রাহিম লোদির মধ্যে সংঘটিত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ইতিহাসে 'পানিপথের প্রথম যুদ্ধ' নামে পরিচিত। বাবর তার আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন যে, এ যুদ্ধে তার সাথে মাত্র বারো হাজার সৈন্য ছিল। অন্যদিকে, সুলতান ইব্রাহিম লোদির সৈন্যসংখ্যা ছিল ১ লাখ এবং তার সাথে একশ হাতির একটি বাহিনীও ছিল।

২১ এপ্রিল দু'পক্ষের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অভিজ্ঞ ও সুশৃঙ্খল মুঘল বাহিনীর কামান ও আগ্নেয়াস্ত্রের আঘাতে ইব্রাহিম লোদির বাহিনী বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বীরত্বের সাথে প্রাণপণ যুদ্ধ করেও ইব্রাহিম লোদি পরাজিত ও নিহত হন। যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদির প্রায় ৫০ হাজার আফগান সৈন্য আহত হয়েছিল।

বাবরের সাফল্যের কারণ (Causes of Success of Babur)

প্রথমত: ইব্রাহিম লোদির সৈন্যদের তুলনায় বাবরের সৈন্যরা ছিল অধিক দক্ষ, সুশিক্ষিত ও রণ-অভিজ্ঞ। মুঘল বাহিনীর ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্রও ছিল অপেক্ষাকৃত উন্নতমানের। এ যুদ্ধে তারা ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম কামান ও তুলঘুমা (পাথর নিক্ষেপকারী যন্ত্র) ব্যবহার করেছিল; **দ্বিতীয়ত,** বাবর নিজে ছিলেন একজন বিজ্ঞ ও সুনিপুণ সেনানায়ক। ইব্রাহিম লোদির তুলনায় যুদ্ধবিদ্যা ও সৈন্যপরিচালনার কৌশলে তিনি ছিলেন অনেক অভিজ্ঞ; **তৃতীয়ত,** ওস্তাদ আলী ও মোস্তফার নেতৃত্বে গোলন্দাজ বাহিনীর কর্তব্যনিষ্ঠা ও নিপুণতার সাথে দায়িত্ব পালন বাবরের সাফল্যের অন্যতম কারণ ছিল; **চতুর্থত,** বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে গঠিত হলেও মুঘল বাহিনী অধিক সুসংগঠিত ও সুশৃঙ্খল ছিল। অন্যদিকে, ইব্রাহিম লোদির সৈন্যদের মধ্যে একতা, সংহতি ও শৃঙ্খলার প্রচণ্ড অভাব ছিল; **পঞ্চমত,** আমির ও আত্মীয়-পরিজনের ষড়যন্ত্রে ইব্রাহিম লোদির পরাজয় ঘটেছিল এবং **ষষ্ঠত,** ভারতে বিরাজমান রাজনৈতিক অনৈক্য বাবরের সাফল্যের পেছনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল।

পানিপথের প্রথম যুদ্ধের ফলাফল: পানিপথের প্রথম যুদ্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ যুদ্ধে সুলতান ইব্রাহিম লোদির পরাজয়ের ফলে ভারতে তুর্কি-আফগান শাসনের অবসান ঘটে। এল. পি. শর্মা বলেন, "পানিপথের প্রথম যুদ্ধ ভারতে লোদি রাজবংশের ভাগ্য নির্ধারণ করে দিয়েছিল।" (The battle of Panipat sealed the fate of Lodi dynasty in India.) এ যুদ্ধের ফলে তিনশ বছরের অধিককাল স্থায়ী দিল্লি সালতানাতের ধ্বংসস্তূপের ওপর মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ড. ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, "পানিপথের যুদ্ধ দিল্লি সাম্রাজ্যকে বাবরের হাতে তুলে দেয়। লোদি বংশের ক্ষমতা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় এবং হিন্দুস্থানের সার্বভৌম ক্ষমতা চাঘতাই তুর্কিদের কাছে হস্তান্তরিত হয়।"[১] কে. কে. দত্ত (Kalikinkar Datta) বলেন, "পানিপথের যুদ্ধের নিজস্ব তাৎপর্য এই যে, এর মাধ্যমে ভারতবর্ষে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করে।"[২]

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে? *[ম. বো., দি. বো. ২০২৫; দি. বো., কু. বো., য. বো. ২০১৭; সকল বোর্ড ২০১৬]*
২. বাবরের ভারত আক্রমণের সময় দিল্লির সিংহাসনে কে অধিষ্ঠিত ছিলেন?
৩. কত খ্রিষ্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়? *[সকল বোর্ড ২০২৫]*
৪. পানিপথ স্থানটি কোথায় অবস্থিত?
৫. ভারতের ইতিহাসে প্রথম কামান ও তুলঘুমা ব্যবহার করেন কে? *[সকল বোর্ড ২০২২]*
৬. কোন যুদ্ধের মাধ্যমে ভারতবর্ষে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়?

উত্তরের জন্য ২৪৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. বাবরের ভারত অভিযানের পাঁচটি কারণ ছক আকারে লেখো।
২. পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবরের সাফল্যের কারণ এবং এর ফলাফল সম্পর্কিত একটি চার্ট তৈরি করো।

---

[১] "The Battle of Panipat placed the empire of Delhi in Babar's hands. The power of the Lodi dynasty was shattered to pieces, and sovereignty of Hindustan passed to the Chagtai Turkes." – Ref: Iswari Prasad. *A Short History of Muslim Rule in India, P. 205*

[২] Ref; K. K. Datta, *An Advance History of India.* p.427

পাঠ ৩

সম্রাট বাবর পরিচালিত অন্যান্য যুদ্ধ এবং তার চরিত্র ও কৃতিত্ব
The Other Battles under the Leadership of Emperor Babur and His Character and Achievements

মুঘল-রাজপুত সংঘর্ষ (Mughal-Rajput Conflict)

পানিপথের প্রথম যুদ্ধে আফগানরা পরাজিত হলেও সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত হয়নি। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক রাশব্রুক উইলিয়াম (Laurence Frederic Rusbrook Williams) বলেন, "পানিপথের জয় দ্বারা সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রথম পদক্ষেপ ঘটে; তবে তখনও আফগান উপজাতিসমূহের বিরোধিতা ছিল বাবরের প্রধান বাধা।" জৈনপুর, বাংলা, বিহার ও দোয়াব অঞ্চলের আফগান নেতারা সক্রিয় হয়ে ওঠেন এবং মুঘল অগ্রাভিযান প্রতিরোধে কৃতসংকল্প ঘোষণা করেন। মেবারের রানা সংগ্রাম সিংহের নেতৃত্বে রাজপুত শক্তিও মুঘলদের প্রবল প্রতিপক্ষ হিসেবে আবির্ভূত হয়। তিনি তুর্কি-আফগান শাসনের অবসান ঘটিয়ে ভারতে হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আশা পোষণ করতেন। এ জন্য পানিপথের যুদ্ধের পর বাবর যখন ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ নেন তখন রানা সংগ্রাম সিংহ তার লালিত স্বপ্ন ব্যর্থ হওয়ার আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে পড়েন। মুঘল অগ্রাভিযান রোধ করার জন্য তিনি সামরিক জোট গঠনের উদ্যোগ নেন। মেওয়াটের শাসনকর্তা হাসান খানসহ অনেক আফগান সর্দার রাজপুত শক্তিকে সমর্থন ও তাদের সাথে যোগ দিয়ে আক্রমণ পরিচালনা করে। ফলে মুঘল-রাজপুত সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

খানুয়ার যুদ্ধ (১৬ মার্চ, ১৫২৭ খ্রি.) (The Battle of Khanua, 16 March, 1527): রানা সংগ্রাম সিংহের নেতৃত্বে ধনুগড়ের উদয় সিংহ, মারওয়ারের ভীমসিংহ, চান্দেরীর মেদেনী রাও, মেওয়াটের হাসান খান ও অন্যান্য ভারতীয় রাজাদের সমন্বয়ে গঠিত সামরিক মৈত্রী জোট ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দের ১৬ মার্চ আগ্রার অদূরবর্তী খানুয়ার প্রান্তরে মুঘল বাহিনীর সাথে সরাসরি যুদ্ধে অংশ নেয়। যৌথ বাহিনীতে ১২০ জন সেনাপতি, ৮০ হাজার (মতান্তরে ১,২০,০০০) অশ্বারোহী সৈন্য এবং ৫শ হাতি বাহিনী (মতান্তরে ১,০০০) অংশগ্রহণ করেছিল। অন্যদিকে, অল্প সৈন্য নিয়ে বাবর স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বিশাল রাজপুত বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে মুঘল বাহিনী ইতস্তত করলে বাবর নেপোলিয়ন বোনাপার্টের মতো এক অনলবর্ষী ও তেজোদ্দীপ্ত ভাষণ দিয়ে তার ক্ষুদ্র সেনাবাহিনীকে যুদ্ধের অগ্নিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেন।

মুঘল গোলন্দাজ বাহিনীর ক্ষিপ্ত আক্রমণ ও কামানের গোলার আঘাতে শক্তিশালী রাজপুত বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। প্রায় ১০ ঘণ্টার যুদ্ধে অসাধারণ বিক্রম দেখালেও শেষ পর্যন্ত রাজপুত শক্তির পরাজয় ঘটে। হাসান খান ও রাজা উদয় সিংহসহ বহু রাজপুত দলপতি যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। গুরুতর আহত অবস্থায় রানা সংগ্রাম সিংহ পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন। অবশ্য কিছু দিনের মধ্যে তার মৃত্যু হয়।

খানুয়ার যুদ্ধের গুরুত্ব ও ফলাফল: পানিপথের প্রথম যুদ্ধ অপেক্ষা খানুয়ার যুদ্ধ ছিল নিঃসন্দেহে অধিক তাৎপর্যপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী। কেননা, পানিপথের প্রথম যুদ্ধে দিল্লির নামমাত্র সুলতান ইব্রাহিম লোদির পরাজয় ঘটেছিল। কিন্তু খানুয়ার যুদ্ধে ভারতের শক্তিশালী রাজপুত সংঘের পরাজয় ঘটে এবং ভারতে রাজপুতদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার আশা চিরতরে বিনষ্ট হয়। জি. এন. শর্মার (Jadu Nath Sharma) মতে, "সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তারকারী খানুয়ার যুদ্ধের ফলে ভারতের সার্বভৌম ক্ষমতা রাজপুতদের হাত থেকে মুঘলদের কাছে স্থানান্তরিত হয় এবং মুঘলরা তা দু'শ বছর অধিকারে রাখতে সমর্থ হয়।"[৩] কে. কে. দত্ত নিশ্চিতভাবেই তাই বলেন, "খানুয়ার যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকারী যুদ্ধ ছিল।"[৪] এ যুদ্ধে জয়লাভের পর বাবর 'গাজি' উপাধি ধারণ করেন এবং মুঘল সাম্রাজ্যের রাজধানী কাবুল থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত হয়।

জেনে রাখো

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট (Napoleon Bonaparte), (জন্ম: ১৫ আগস্ট, ১৭৬৯; মৃত্যু: ৫ মে, ১৮২১; সেন্ট হেলেনা) ছিলেন ফরাসি বিপ্লবের সময়কার একজন জেনারেল। তিনি ফরাসি প্রজাতন্ত্রের প্রথম কনসল (First Consul) ছিলেন। তার নেতৃত্বে ফরাসি সেনাবাহিনী এক দশকেরও বেশি সময় ধরে সব ইউরোপীয় শক্তির সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং তিনি ইউরোপের অধিকাংশ অঞ্চল তার আয়ত্তে নিয়ে আসেন। নেপোলিয়ন ১৮১৫ সালের ১৮ জুন ওয়াটার লু যুদ্ধে ব্রিটিশদের কাছে হেরে যান। নেপোলিয়ন তার জীবনের বাকি ছয় বছর ব্রিটিশদের তত্ত্বাবধানে আটলান্টিক মহাসাগরের দ্বীপ সেন্ট হেলেনাতে কাটান। তিনি সারা বিশ্বে সর্বকালের অন্যতম সেরা সেনাপতি হিসেবে সুপরিচিত। 'নেপোলিয়ন কোড' প্রতিষ্ঠা তার অন্যতম সেরা কীর্তি।

---

[৩] *Mawar and the Mughal Emperors*, p.45

[৪] "The battle of Khanua is certainly one of the decisive battles of Indian history."– Ref. K. K, Datta, *An Advance History of India*, *P.429*

চান্দেরি দুর্গ দখল (২০ জানুয়ারি, ১৫২৮ খ্রি.): খানুয়ার যুদ্ধে বিজয়ের পর বাবর মেওয়াটের রাজধানী আলওয়ার, চান্দয়ার, রাপ্রি ও ইটাওয়া পুনরাধিকার করে চান্দেরির রাজা মেদেনী রাওয়ের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং ১৫২৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ জানুয়ারি তাকে পরাজিত করে চান্দেরি দুর্গ দখল করেন।

মুঘল-আফগান সংঘাত ও গোগরার যুদ্ধ (৬ মে, ১৫২৯ খ্রি.)

Mughal-Afgan Conflict and Battle of Ghaghra (6th May, 1529 AD)

খানুয়ার যুদ্ধে রাজপুত শক্তির পতনের ফলে আফগানরাও শক্তিহীন হয়ে পড়েছিল, তবে তারা একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। এ সময় নিহত সুলতান ইব্রাহিম লোদির ভ্রাতা জৈনপুরের শাসনকর্তা মাহমুদ লোদি, বিহারের শের খান মুঘলবিরোধী একটি জোট গঠন করেন। মাহমুদ লোদি ও শের খান সম্মিলিতভাবে মুঘল অগ্রাভিযান মোকাবিলায় ব্যর্থ হন। এমতাবস্থায় হতাশ মাহমুদ লোদি বাংলার সুলতান নুসরত শাহের শরণাপন্ন হন। কিন্তু ১৫২৯ খ্রিষ্টাব্দের ৬ মে পাটনার কাছে গোগরা নদীর তীরে এক ভীষণ যুদ্ধে বাবর নুসরত শাহের সম্মিলিত বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করলে আফগানদের সে প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়।

গোগরার যুদ্ধের ফলাফল: ভারতবর্ষের ইতিহাসে গোগরার যুদ্ধের গুরুত্ব অপরিসীম। এ যুদ্ধ ছিল পানিপথের প্রথম যুদ্ধ ও খানুয়ার যুদ্ধের পরিপূরক। এ যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে ভারতবর্ষে লোদি-আফগানদের পুনরুত্থানের সম্ভাবনা সম্পূর্ণরূপে ধূলিস্যাৎ হয়। অন্যদিকে, সমগ্র উত্তরাঞ্চলের ওপর বাবর তথা মুঘলদের আধিপত্য নিশ্চিত হয়। বাবরের রাজ্যসীমা অক্ষু নদী থেকে গোগরা নদী এবং হিমালয় থেকে গোয়ালিয়র পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে।

সম্রাট বাবরের মৃত্যু (২৬ ডিসেম্বর ১৫৩০ খ্রি.): ঐতিহাসিক আবুল ফজলের মতে, গোগরার যুদ্ধের পর ১৫৩০ খ্রিষ্টাব্দে বাবরের জ্যেষ্ঠপুত্র হুমায়ুন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে সম্রাট বাবর তার নিজের জীবনের বিনিময়ে আল্লাহর কাছে ছেলের জীবন ও আরোগ্য কামনা করেন। এরপর হুমায়ুন ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করেন এবং বাবর ক্রমশ অসুস্থ হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত ১৫৩০ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ ডিসেম্বর বাবর মৃত্যুবরণ করেন। আধুনিক ঐতিহাসিকদের অনেকেই এ ঘটনাকে অনৈতিহাসিক ও নিছক কল্পকাহিনি বলে মনে করেন। শ্রীরাম শর্মার মতে, বাবর অসুস্থ হয়ে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন। তাকে আগ্রায় সমাহিত করা হয়। পরে তার অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী তার দেহাবশেষ কাবুলে স্থানান্তর ও সমাহিত করা হয়।

সম্রাট বাবরের চরিত্র ও কৃতিত্ব বিচার

Assessment of the Attributes and Achievements of Emperor Babur

চরিত্র: সমগ্র মধ্যযুগের ইতিহাসে জহির উদ্দিন মুহাম্মদ বাবর ছিলেন একজন আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। সমকালীন ও আধুনিক ঐতিহাসিকেরা একবাক্যে তার প্রশংসা করেছেন। ঐতিহাসিক স্ট্যানলি লেনপুল (Stanley Lanepoole) বাবরকে "প্রাচ্য ইতিহাসের অতি আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব" (The most facinating personality in the history of the East.) বলে আখ্যায়িত করেছেন। ড. ঈশ্বরী প্রসাদের মতে, "একজন যুবরাজ, যোদ্ধা ও বিদ্বান হিসেবে তিনি মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ শাসকদের সমমর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন।"[৫] কে. কে. দত্ত বলেন, "বাবর ছিলেন এশিয়ার ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা রোমাঞ্চকর ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী।"[৬] মির্জা হায়দারের (*তারিখ ই-রশিদী*) মতে, "বাবরের মধ্যে মানবতা ও দুর্জয় সাহসের এক অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছিল।" তিনি ছিলেন উদ্যমী, আত্মবিশ্বাসী ও দুর্দমনীয় ইচ্ছাশক্তির অধিকারী। ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন উন্নত চরিত্রের অধিকারী। তিনি ছিলেন খুবই ভদ্র, অকপট ও নিরহংকারী। পিতা হিসেবে তিনি ছিলেন স্নেহশীল। রাশব্রুক উইলিয়াম বাবরের চরিত্রে আটটি মৌলিক গুণাবলির সমাবেশ ঘটেছিল বলে উল্লেখ করেছেন। এ আটটি গুণ হলো— নিখুঁত বিচার-বুদ্ধি, মহৎ উচ্চাকাঙ্ক্ষা, যুদ্ধ জয়ের নিপুণ কৌশল, উন্নত প্রশাসনিক রীতি, প্রজাহিতৈষণা, উদারভাবে শাসন করার প্রতিভা, সেনাবাহিনীর হৃদয় জয়ের ক্ষমতা এবং ন্যায়বিচারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ। সম্রাট বাবর ছিলেন স্বধর্মানুরাগী একজন আচারনিষ্ঠ খাঁটি সুন্নি মুসলমান। তবে তিনি কোনোভাবেই পরধর্ম বিদ্বেষী ছিলেন না। ড. ঈশ্বরী প্রসাদের মতে, "তার শাসনামলে হিন্দুদের নীতিগত কারণে নির্যাতন ভোগ করতে হয়নি এবং তিনি কখনও কাউকে ধর্মীয় কারণে শাস্তি দেননি।"

---

[৫] As a prince, warrior and scholar he is fit to take the rank with the greatest rulers of mediaeval time. – Ref. Ishawari Prasad, *A Short History of Muslim Rule in India*, p.213

[৬] Most Romantic and interesting personalities. Ref. K K Datta, An Advance History of India, p.431

কৃতিত্ব

সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা: বাবর ছিলেন এক নতুন সাম্রাজ্যের স্থপতি ও নবযুগের স্রষ্টা। পিতৃরাজ্য ফারগানা ও বিজিত সমরখন্দ থেকে বিতাড়িত হয়ে আশ্রয় ও সহায়সম্বলহীন অবস্থায় পথে পথে ঘুরে বেড়ালেও তিনি কখনও হতাশ ও হতোদ্যম হননি। অজেয় মনোবল, দুর্দমনীয় ইচ্ছা ও নির্ভীক সাহসিকতার সাথে তিনি সকল প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে নিজ যোগ্যতাবলে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন। ঐতিহাসিক স্ট্যানলি লেনপুল বলেন, “ভারত বিজয় তাকে ইতিহাসে স্থায়ী আসনে অধিষ্ঠিত করেছে, যা একটি শাসকগোষ্ঠীর পথ উন্মুক্ত করেছিল।”[৭]

সুদক্ষ সেনানায়ক: বাবর সমসাময়িককালের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ও সেনানায়ক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। আর. পি. ত্রিপাঠির মতে, “বাবর ছিলেন একজন প্রতিভাবান সেনানায়ক, নিপুণ তরবারি চালক, দক্ষ তীরন্দাজ এবং চতুর ঘোড়সওয়ার।” তিনি ছিলেন তার পূর্বপুরুষ মোঙ্গল ও তুর্কিদের সামরিক মেধার যথার্থ উত্তরসূরি। পানিপথের প্রথম যুদ্ধসহ পরবর্তী যুদ্ধসমূহে সেনানায়ক হিসেবে তিনি তার কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

শাসক: বাবর পশ্চিমে কাবুল থেকে পূর্বে বিহার এবং উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে চান্দেরি পর্যন্ত বিস্তৃত এক সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। তবে সম্রাট হিসেবে তিনি মাত্র চার বছর রাজত্ব করেন। আর এ সংক্ষিপ্ত রাজত্বকালেও অধিকাংশ সময় কেটেছে যুদ্ধবিগ্রহে। কাজেই শাসক হিসেবে তিনি তেমন কোনো মৌলিক প্রতিভার পরিচয় বা শাসন কাঠামোর সংস্কার, উন্নয়ন ও পরিবর্তন সাধন করতে পারেননি। বাধ্য হয়ে তিনি তুর্কি-আফগান শাসন নীতির অনুসরণ করেছিলেন। তিনি মুসলমানদের প্রথাগত খিলাফতের প্রতি আনুগত্য ত্যাগ করে ভারতীয় রাজনীতির বাস্তবতার নিরিখে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার প্রতীক হিসেবে নিজেকে ‘পাদশাই’ বা ‘বাদশাহ’ বলে ঘোষণা করেন। অর্থনৈতিক ও সামরিক ব্যবস্থায় বাবর ভারতে প্রচলিত জায়গিরদারি ব্যবস্থা বহাল রাখেন এবং সামন্ত অধিপতিদের ওপর স্থানীয় প্রশাসন পরিচালনার ভার অর্পণ করেন। বাদশাহ ও সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক দপ্তরগুলোর সাথে সংযোগ রক্ষার জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দেন। প্রাদেশিক শাসনকাজ নির্বাহের জন্য তিনি প্রত্যেক প্রদেশে একজন করে ওয়ালী (প্রদেশপাল), দিওয়ান (রাজস্ব কর্মকর্তা), শিকদার (সমরকর্তা) এবং কোতোয়াল (নগরকর্তা) নিয়োগ করেন।

বিদ্যা ও সংস্কৃতি অনুরাগী: সমসাময়িক যুগের অন্যতম বিদ্যোৎসাহী ও সংস্কৃতিমান ব্যক্তিত্ব ছিলেন সম্রাট বাবর। ফারসি ও তুর্কি ভাষায় তার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি একজন সুসাহিত্যিক এবং উঁচুমানের কবি ছিলেন। বলা হয় যে, বাবর যদি সাম্রাজের প্রতিষ্ঠাতা নাও হতেন তবু তার কাব্য প্রতিভার গুণে তিনি ইতিহাসে অমর হয়ে থাকতেন। তুর্কি ভাষায় রচিত তার কাব্য সংকলনের নাম ‘দিউয়ান’। তিনি ‘নুবাইয়া’ নামে একটি পদ্যছন্দ ধারার স্রষ্টা। বাবর রচিত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ ‘তুজুক-ই-বাবরি’ বা ‘বাবরনামা’ সাহিত্য ও মুঘল ইতিহাসের এক অমূল্য সম্পদ। খাৎ-ই-বাবরি নামে লিপিশৈলীর স্রষ্টা ছিলেন তিনি । একজন সংগীতপ্রেমী হিসেবে তিনি ফারসি ও তুর্কি ভাষায় অনেক সংগীত রচনা করেন। যন্ত্রশিল্পেও তার দক্ষতা ছিল। বাঁশি বাজানো ছিল তার প্রিয় শখ।

ইতিহাসে বাবরের স্থান: আধুনিক ইতিহাসবিদরা বাবরকে মধ্যযুগের ইতিহাসের এক সুউচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথের মতে, “বাবর তার সমসাময়িক এশীয় যুবরাজদের মধ্যে খুবই উন্নত এবং ভারতের নৃপতিদের মধ্যে সুউচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হবার যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন।” ড. ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, “প্রকৃতপক্ষে প্রতিভা ও গুণাবলির দিক থেকে এশিয়ার ইতিহাসে খুব কম শাসকই বাবর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন।” ঐতিহাসিক লেনপুলের মতে, “ভারত শাসনের মাধ্যমে তিনি রাজকীয় শাসকগোষ্ঠীর জন্য যে পথ উন্মুক্ত করেছিলেন তা-ই ইতিহাসে তাকে স্থায়ী আসন দান করেছে।” লেনপুল আরও বলেন, “তিনি যে গৌরবময় সাম্রাজ্য সৌধের ভিত্তি স্থাপন করে যান তাকে তারই পৌত্র আকবর এক পরিপূর্ণ রূপদান করেন।” তাই আকবরকে তার শ্রেষ্ঠত্ব থেকে বঞ্চিত না করেও বলা যেতে পারে যে, তার স্বনামধন্য পিতামহই ভারতে তার সাফল্যের বীজ বপন করে যান এবং এখানেই তার শ্রেষ্ঠত্ব।

---

[৭] His permanent place in history rest upon his Indian conquests, which opened the way for an imperial line.– *Mediaeval India under Mohammedan Rule.* p.193-194.

'তুজুক-ই-বাবরি' বা 'বাবরনামা' (সম্রাট বাবরের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ)

সম্রাট বাবরের সাহিত্য প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'তুজুক-ই-বাবরি' তুর্কি ভাষায় রচিত একটি আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ। 'তুজুক-ই-বাবরি' মধ্যযুগের ইতিহাস অধ্যয়নে একটি আকরগ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। চমৎকার রচনাশৈলী, ভাষার মাধুর্য ও কারুকাজ, উন্নত বর্ণনা-রীতি এবং তথ্যের নির্ভরযোগ্যতার জন্য এ গ্রন্থটি পণ্ডিত সমাজে প্রশংসা অর্জন করেছে। স্যার ই.গেনস রস বাবরের আত্মজীবনীকে সর্বযুগের সাহিত্যের মনোমুগ্ধকর ও রোমাঞ্চকর সৃষ্টিগুলোর অন্যতম বলে মনে করেন। ঐতিহাসিক রাশব্রুক উইলিয়ামসও অসাধারণ আত্মচরিত গ্রন্থ রচনার জন্য বাবরের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ড. ঈশ্বরী প্রসাদের মতে, "পূর্বদেশীয় কোনো নৃপতিই বাবরের মতো এরূপ সুস্পষ্ট, মনোমুগ্ধকর এবং সত্যনিষ্ঠ আত্মজীবনী রচনা করেননি।" এ গ্রন্থে বাবর তার ব্যক্তিজীবনের নানাদিক, দোষ-গুণ, দক্ষতা-সীমাবদ্ধতা, সুখ-দুঃখ এবং সাফল্য-ব্যর্থতার কথা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। এ গ্রন্থটি মধ্য এশিয়া ও আফগানিস্তান বিশেষ করে সমকালীন ভারতের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার এক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যভাণ্ডার। বাবর তার বর্ণনায় ভারতের শহর ও গ্রামগুলোকে অপরিচ্ছন্ন ও অস্বাস্থ্যকর বলে উল্লেখ করেছেন। পাহাড়-পর্বত, জলপ্রপাত, ঝরনা ও ফুলের বাগান শোভিত বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক সম্পদে পূর্ণ কাবুলের তুলনায় তিনি উত্তর-ভারত ও মধ্য ভারতের সমভূমিকে বৈচিত্র্যহীন এবং একঘেঁয়ে বলে বর্ণনা করেছেন। অবশ্য ভারতের বর্ষাকালীন প্রকৃতি ও নদী বাবরকে আকৃষ্ট করেছে বলে তিনি এ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তবে ভারতের জনসাধারণের ব্যাপারে তিনি ইতিবাচক মনোভাব দেখাতে পারেননি। গ্রন্থটি ১৫৯০ খ্রিষ্টাব্দে আবদুর রহিম খান-ই-খানান 'বাবরনামা' নামে ফারসিতে এবং ১৮২৬ খ্রিষ্টাব্দে জন লেইডেন এবং উইলিয়াম আরসনিক এটি ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেন। এ গ্রন্থটি দুখণ্ডে বাংলায় অনুবাদ করেছেন প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ। বাংলা একাডেমি এ অনুবাদ প্রকাশ করেছে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কার নেতৃত্বে রাজপুত শক্তি মুঘলদের প্রবল প্রতিপক্ষ হিসেবে আবির্ভূত হয়?
২. খানুয়ার যুদ্ধ কত খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়?
৩. কোন যুদ্ধে ভারতের শক্তিশালী রাজপুত সংঘের পরাজয় ঘটে?
৪. মুঘল সাম্রাজ্যের রাজধানী কাবুল থেকে দিল্লিতে স্থানান্তর করেন কে?
৫. বাবর তার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ কোন ভাষায় লিখেছেন? *[সকল বোর্ড ২০২৫]*
৬. বাবর কত খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন?

উত্তরের জন্য ২৪৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. সম্রাট বাবরের পরিচালিত যুদ্ধসমূহে তার সাফল্যের কারণ অনুসন্ধান করো।
২. যুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট বিজয়ী শাসকের নাম লিখে খালি ঘর পূরণ করো:

পানিপথের প্রথম যুদ্ধ (১৫২৬) → ☐ → গোগরার যুদ্ধ (১৫২৯)

গ. দলীয় কাজ

দুটি দলে বিভক্ত হয়ে সম্রাট বাবরের কৃতিত্বপূর্ণ দিকগুলো চিহ্নিত করে দুটি স্লাইড তৈরি করো।

পাঠ ৪

সম্রাট হুমায়ুন: প্রাথমিক জীবন ও সমস্যাবলি এবং মুঘল-আফগান দ্বন্দ্ব (১৫৩০-১৫৫৬ খ্রি.) [Emperor Humayun: Early Life and Primary Problems & Mughal-Afghan Conflict (1530–1556 AD)]

প্রাথমিক জীবন ও সিংহাসনে আরোহণ (Early Life Ascend the Throne)

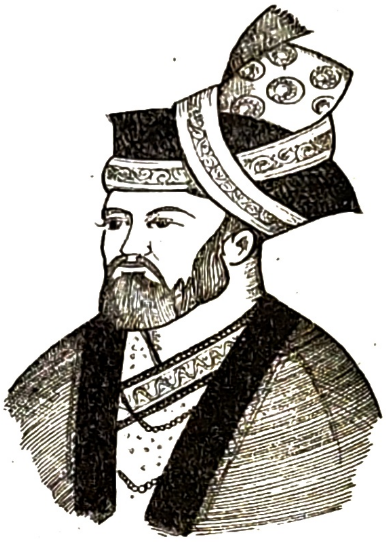

নাসিরউদ্দিন মুহাম্মদ হুমায়ুন

বাবরের চার পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র নাসিরউদ্দিন মুহাম্মদ হুমায়ুন ১৫০৮ খ্রিষ্টাব্দের ৬ মার্চ কাবুলে জন্মগ্রহণ করেন। 'হুমায়ুন' শব্দের অর্থ সৌভাগ্যবান (The Fortunate)। তার মায়ের নাম মহিমা বেগম। শৈশবেই তিনি তুর্কি, ফারসি ও আরবি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। বিদ্যোৎসাহী ও চিন্তাশীল হুমায়ুন গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রেও বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। ২০ বছর বয়সে তিনি বাদাখশানের শাসনকর্তার পদে নিয়োগ লাভ করেন। ভারত অভিযানসমূহে পিতার সহযোগী হিসেবে হুমায়ুন সেনাপতিরূপেও নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন। বাবর ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর পুত্র হুমায়ুনকে হিসার ফিরোজা ও সম্বলের জায়গিরদার নিয়োগ করেন। বাবরের মৃত্যুর চারদিন পর তার মনোনয়ন অনুযায়ী জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমায়ুন ১৫৩০ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ ডিসেম্বর ২৩ বছর বয়সে মুঘল সিংহাসনে আরোহণ করেন। ক্ষমতা গ্রহণ করেই হুমায়ুন পিতৃনির্দেশ অনুযায়ী ভ্রাতা কামরানকে কাবুল ও কান্দাহার, আসকারীকে সম্বল এবং হিন্দালকে মেওয়াটের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন।

প্রাথমিক সমস্যাবলি (Primary Problems)

ভাইদের বিরোধিতা: পিতার অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী হুমায়ুন তার ভাইদের সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ রাজপদ দান করেন। কিন্তু তারপরও তিনি তাদের মন জয় করতে পারেননি। মুসলিম আইনে জ্যেষ্ঠ পুত্রের উত্তরাধিকার আইন স্বীকৃত না থাকায় তার ভাইয়েরা সম্রাট হওয়ার আশা পোষণ করতে থাকেন এবং সিংহাসনের দাবি নিয়ে হুমায়ুনের সাথে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক ইরিসকিন বলেন, "তরবারিই ছিল অধিকার নির্ধারণের চরম নিষ্পত্তিকারক এবং সম্রাটের প্রত্যেক পুত্রই ভাইদের বিরুদ্ধে নিজেদের ভাগ্য পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত ছিল।"

আত্মীয়-পরিজনদের শত্রুতা: তিন ভাই ছাড়াও হুমায়ুনের অসংখ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। এদের মধ্যে ক্ষমতালোভী ও সুযোগ-সন্ধানী ভগ্নিপতি মুহাম্মদ জামান মির্জা এবং চাচা মির্জা মুহাম্মদ সুলতান ছিলেন অন্যতম। তারা উভয়েই ছিলেন উচ্চাভিলাষী এবং মুঘল সিংহাসন অধিকারের প্রত্যাশী। বাবরের শ্যালক মির্জা মাহদী খাজারও সিংহাসনের প্রতি বিশেষ দুর্বলতা ছিল। এসব নিকটাত্মীয়রা হুমায়ুনের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হন।

আফগান শক্তির বিরোধিতা: উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হুমায়ুনের বিশাল সাম্রাজ্যের ভিত্তি ছিল অত্যন্ত দুর্বল ও নড়বড়ে। ঐতিহাসিক রাশব্রুক উইলিয়ামসের মতে, "বাবর তার পুত্র হুমায়ুনের জন্য এমন একটি সাম্রাজ্য রেখে যান, যা কেবল যুদ্ধাবস্থার মাধ্যমেই অটুট রাখা সম্ভব, শান্তিকালীন এর অবস্থান ছিল দুর্বল কাঠামো ও মেরুদণ্ডবিহীন।"[৮] মুঘল সাম্রাজ্যের এ দুর্বলতার সুযোগে পূর্বপুরুষের হারানো রাজ্য পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে আফগানরা ইব্রাহিম লোদির ভাই মাহমুদ লোদির নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হয়।

গুজরাট ও বাংলায় মুঘলবিরোধী তৎপরতা: গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহ ভারতের অধিকর্তা হওয়ার আশা পোষণ করতেন। এ লক্ষ্যে তিনি রাজপুতনার মালব ও মেবার অধিকার করে দিল্লি ও আগ্রা জয়ের পরিকল্পনা করেন। মুঘলবিরোধী বিহারের আফগান শক্তিকেও তিনি নানাভাবে সহযোগিতা করেন। অন্যদিকে, বাংলার সুলতান নুসরত শাহ বাবরের সাথে সম্পাদিত মৈত্রী চুক্তি ভঙ্গ করেন এবং সরাসরি মুঘলদের প্রতিপক্ষ আফগানদের পক্ষে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেন।

---

[৮] Ref. Rusbrook Williams, *An Empire Builder of Sixteenth Century.*

সামরিক বাহিনীর অনৈক্য ও দুর্বলতা: মুঘল সেনাবাহিনী চাঘতাই তুর্কি, পারসিক, উজবেক, আফগান ও ভারতীয়দের সমন্বয়ে গঠিত ছিল। বিভিন্ন জাতির এ সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণের জন্য বাবরের মতো সাহসী, তেজস্বী ও দূরদর্শী সমরনায়কের প্রয়োজন ছিল। দুর্ভাগ্যবশত হুমায়ুনের মধ্যে এসব যোগ্যতার অভাব ছিল। ফলে মুঘল সেনাবাহিনীতে অনৈক্য ও দুর্বলতা দেখা দেয়।

হুমায়ুনের ব্যক্তিগত দুর্বলতা: অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন হুমায়ুনের অধিকাংশ সমস্যার মূলে ছিলেন তিনি নিজেই। বস্তুত সদ্য প্রতিষ্ঠিত মুঘল সাম্রাজ্যকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে রকম দৃঢ় মনোবল, সামরিক প্রজ্ঞা এবং রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক দূরদৃষ্টির প্রয়োজন হুমায়ুনের মধ্যে তা ছিল না। ফলে একটির পর একটি ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে হুমায়ুন নিজেই নিজের বিপদ ও সর্বনাশ ডেকে এনেছিলেন।

মুঘল-আফগান দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ (Mughal-Afgan Conflict and Wars)

মুঘল-আফগান সংঘাত-সংঘর্ষ সম্রাট হুমায়ুনের রাজত্বকালের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এ দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের নানাবিধ কারণ ছিল। প্রথমত, ভারতে মুঘল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আফগানদের উৎখাত করে। ফলে আফগানরা মুঘলদেরকে তাদের চরমশত্রু মনে করতেন। দ্বিতীয়ত, পানিপথের প্রথমযুদ্ধে পরাজিত হলেও আফগান শক্তি সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যায়নি। বাবরের মৃত্যুর পর হুমায়ুনের রাজত্বকালে তার ভাই ও আত্মীয়-পরিজনদের মধ্যকার বিরোধ ও ক্ষমতার দ্বন্দ্বের সুযোগে বিক্ষুব্ধ আফগানরা তাদের হারানো ক্ষমতা পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হয়।

জেনে রাখো

বর্তমান আফগানিস্তানে বসবাসরত সকল জাতি-গোষ্ঠীর লোকেরাই 'আফগান' নামে পরিচিত। এখানে বসবাসরত সবচেয়ে বড় জনগোষ্ঠী হলো পশতুন জাতি। এক সময় এরাই আফগান নামে পরিচিত হতো। তবে বর্তমানে আফগান বলতে এখানকার সকল নাগরিককেই বোঝায়। আফগানিস্তানের প্রধান ভাষা পশতু। ১৭৪৭ সালে আহমেদ শাহ আবদালি (১৭৪৭-১৭৭২ খ্রি.) আধুনিক আফগানিস্তান প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমান দেশটিতে তালেবান সরকার প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। আফগানিস্তান মধ্য এশিয়ার প্রাচীন 'সিল্ক রোডের' একটি কেন্দ্র। বর্তমানে দেশটিতে পশতুন, তাজিক, হাজার, উজবেক, তুর্কমেন, কিজিলবাস, আইমাক, পাশাই, বালুচ, পামিরিস, নুরিস্তানি প্রভৃতি বৈচিত্র্যময় মানুষ বসবাস করছে।

তৃতীয়ত, এ সময় ভারতীয় আফগান শক্তির মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা বৃদ্ধি পায়। মাহমুদ লোদি, শের শাহ্ প্রমুখ নেতাদের আবির্ভাব আফগানদের নতুন আশায় উদীপ্ত করে। ফলে তারা হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারে মুঘলদের সাথে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। আফগানদের বিরুদ্ধে সম্রাট হুমায়ুনের পরিচালিত অভিযানগুলো হলো—

কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধ: ১৫৩১ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে সম্রাট হুমায়ুন বুন্দেলখণ্ডের সুরক্ষিত কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধ করেন। সীমান্ত অঞ্চলের সুরক্ষা, গঙ্গা-যমুনা তীরবর্তী অঞ্চল ও মালব প্রদেশের মধ্যে যোগাযোগ সহজ করা এবং বুন্দেলখণ্ড রাজের আফগানদের প্রতি সমর্থন ও সহানুভূতির কারণে হুমায়ুন কালিঞ্জর অবরোধ করেন। অবরুদ্ধ রাজা কর প্রদানে সম্মত হলে হুমায়ুন অবরোধ প্রত্যাহার করেন। এটি রাজনৈতিকভাবে একটি ভুল সিদ্ধান্ত ছিল।

মাহমুদ লোদিকে দমন: কালিঞ্জর থেকে হুমায়ুন পূর্বদিকে অগ্রসর হন। কারণ, গোগরার যুদ্ধে বাবরের কাছে পরাজিত আফগান নেতা মাহমুদ লোদি আফগান শক্তিকে একত্রিত করার চেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন। তারা মুঘল শাসনকর্তা জুনায়িদ বারসালকে বিতাড়িত করে জৈনপুর অধিকার করলে ১৫৩২ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট হুমায়ুন লক্ষ্ণৌর কাছাকাছি দাদরা বা দৌরার যুদ্ধে মাহমুদ লোদিকে পরাজিত করেন। পরাজিত মাহমুদ লোদি জৈনপুর হয়ে পাটনা এবং আরও পরে বাংলায় আশ্রয় নিয়ে সেখানেই মারা যান। ফলে লোদি-আফগান বংশের পরিসমাপ্তি ঘটে।

চুনার দুর্গ অবরোধ: দৌরার যুদ্ধে ছত্রভঙ্গ আফগান বাহিনীর একটি অংশ বারানসীর দক্ষিণ-পশ্চিমে গঙ্গা নদীর তীরবর্তী চুনার দুর্গে আফগান নেতা শের খানের কাছে আশ্রয় নেয়। হুমায়ুন চুনার দুর্গ অবরোধ করেন। ১৫৩২ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত মুঘল সেনারা চুনার অবরোধ করে। অবরোধে চূড়ান্ত সাফল্য অর্জিত না হওয়ার আগেই সম্রাট সংবাদ পান যে গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহ রাজস্থান হয়ে আগ্রা অভিমুখে অভিযানে অগ্রসর হচ্ছেন। এতে বিচলিত হয়ে তিনি

শের খানের সাথে চুক্তি করে অবরোধ তুলে নেন এবং রাজধানীতে ফিরে যান। এটি ছিল হুমায়ুনের জীবনের এক চরম ভুল সিদ্ধান্ত। শের খানকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত না করে তিনি যে অদূরদর্শিতার পরিচয় দেন, তা শেষ পর্যন্ত কেবল তার নিজেরই নয়, বরং মুঘল সাম্রাজ্যের সর্বনাশের কারণ হয়েছিল।

হুমায়ুনের গুজরাট বিজয়: গুজরাট বিজয় হুমায়ুনের রাজত্বকালের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কাথিওয়াড়ের সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত গুজরাট সমকালীন ভারতের একটি অন্যতম সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ছিল। গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহ ছিলেন তখনকার ভারতীয় রাজন্যবর্গের অন্যতম প্রভাবশালী ও উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিত্ব। বাহাদুর শাহ সম্রাট হুমায়ুনের প্রতি প্রচণ্ড শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন। তাই হুমায়ুনের সাথে তার সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। এছাড়াও উভয়ের মধ্যকার সংঘাত-সংঘর্ষের মূলে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল।

প্রথমত, গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহ ছিলেন উচ্চাভিলাষী ও ক্ষমতালিপ্সু। তিনি তার রাজ্যসীমা বৃদ্ধি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে মালব, খান্দেশ, আহমদনগর ও বেরার অধিকার করেন। মেবার রাজ্য এমনকি পর্তুগিজরাও তার বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হয়। এরূপ সাফল্যে তার উচ্চাভিলাষ বৃদ্ধি পায়। এরপর তিনি মুঘল শাসনাধীন দিল্লি-আগ্রার দিকে নজর দেন। ফলে হুমায়ুনের সাথে সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয়ত, দাদরা বা দৌরার যুদ্ধে পরাজিত আফগান বিদ্রোহীদের আশ্রয়দান এবং মুঘল সিংহাসনের দাবিদার হুমায়ুনের ভগ্নিপতি জামান মির্জা ও মামা মেহেদী খাজাকে সমর্থন ও সহায়তা দিয়ে বাহাদুর শাহ হুমায়ুনের বিরাগভাজন হন।

তৃতীয়ত, বাহাদুর শাহ চিতোর অবরোধ করলে চিতোরের রাজমাতা রানি কর্ণবতী বাহাদুর শাহের আগ্রাসন মোকাবিলায় হুমায়ুনের কাছে সাহায্যের আবেদন জানালে তিনি এতে সাড়া দেন। এতে হুমায়ুন-বাহাদুর শাহ যুদ্ধ বাধে।

চুনার দুর্গ অবরোধ প্রত্যাহার করে আগ্রা ফিরেই হুমায়ুন গুজরাট অধিপতি বাহাদুর শাহের মুঘলবিরোধী কীর্তিকলাপ সম্পর্কে অবগত হন। তবে তিনি তাৎক্ষণিক তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে দিল্লিতে দনপানাহ নামে একটি নতুন নগরী নির্মাণ ও অন্যান্য আমোদ-প্রমোদে প্রচুর অর্থ এবং প্রায় দেড় বছর অযথা সময় নষ্ট করেন। তবে বাহাদুর শাহের চিতোর জয়ের পর তার টনক নড়ে। এবার তিনি উজ্জিয়িনীতে উপস্থিত হয়ে বাহাদুর শাহের মালবের রাজধানী মাণ্ডুতে ফেরার পথ বন্ধ করে দেন। ১৫৩৫ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে 'মান্দাসোর' নামে একটি কৃত্রিম হ্রদের পাশে হুমায়ুন ও বাহাদুর শাহের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বাহাদুর শাহ চম্পারন-আহমেদাবাদ হয়ে পর্তুগিজ অধিকৃত দিউদ্বীপে আশ্রয় নেন। ফলে মালব, চম্পারনসহ গুজরাট হুমায়ুনের অধিকারে আসে। বিজিত গুজরাটের শাসনভার ভ্রাতা মির্জা আসকারীর হাতে দিয়ে সম্রাট হুমায়ুন রাজধানীতে ফিরে যান।

বাহাদুর শাহের গুজরাট পুনরুদ্ধার: হুমায়ুনের গুজরাট অধিকার ছিল নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। গুজরাটের শাসনকর্তা আসকারী ছিলেন অকর্মণ্য। বিজিত প্রদেশের শাসন সংহত করার কোনো উদ্যোগ না নিয়ে তিনি আরাম-আয়েশে গা ভাসিয়ে দেন। ফলে এখানকার শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়ে এবং সমগ্র অঞ্চলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। মুঘল সেনানায়কদের সাথেও আসকারীর বিবাদ বাধে। এই সুযোগে বাহাদুর শাহের এক বিশ্বস্ত কর্মকর্তা ইমদাদুল মূলকের নেতৃত্বে গুজরাটে মুঘলবিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হয়। সুযোগ বুঝে বাহাদুর শাহ পর্তুগিজদের সহায়তায় গুজরাট পুনরাধিকার করেন। প্রতিদ্বন্দ্বী আফগান নেতা শের শাহের বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত থাকায় হুমায়ুন বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে আসকারীকে সাহায্য করতে পারেননি। ফলে মালব ও গুজরাটের মতো দুটি বড় প্রদেশ বিজয়ের এক বছরের মধ্যেই আবার হাত ছাড়া হয়ে যায়।

হুমায়ুন ও শের শাহের সংঘর্ষ (১৫৩৭-১৫৪০ খ্রি.): গুজরাট অধিকারে হুমায়ুনের ব্যস্ততার সুযোগে শের খান পূর্বাঞ্চলে তার শক্তি বৃদ্ধি করেন। ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দে শের খান বাংলা ও বিহারের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করে সমগ্র বিহারের মুকুটবিহীন সম্রাটে পরিণত হন। পূর্বাঞ্চলে শের খানের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে হুমায়ুন বাংলার সুলতানের সাহায্যের আবেদনে সাড়া দিয়ে শের খানকে দমনের উদ্দেশ্যে সসৈন্যে বাংলা অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু পথে তিনি শের খানের আস্তানা চুনার দুর্গ অবরোধ করে ছয় মাস অতিবাহিত করেন। কৌশলগত দিক থেকে এটি ছিল হুমায়ুনের সবচেয়ে বড় ভুল। এর ফলে শের খান নিজের

ক্ষমতা সুসংহত করার সুযোগ পান এবং সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহকে গৌড় থেকে বিতাড়িত করে বাংলা অধিকার করেন। এ অবস্থায় চুনার দুর্গ জয়ের পর হুমায়ুন ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে গৌড় অবরোধ করেন। কৌশলী শের খান মুঘল বাহিনীর সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ এড়িয়ে গৌড় ত্যাগ করেন। ফলে হুমায়ুন সহজে বাংলা অধিকারে সমর্থ হন। বিজিত গৌড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে হুমায়ুন এর নাম দেন 'জান্নাতাবাদ'। এখানে তিনি দীর্ঘ ছয় মাস আমোদ-প্রমোদে অলস সময় কাটান। এ সুযোগে শের খান চুনার দুর্গ পুনরুদ্ধারসহ বিহার, বারানসী, জৌনপুর ও কনৌজ পর্যন্ত দখল করে রাজস্ব আদায় শুরু করেন। এর ফলে হুমায়ুনের আগ্রা ফিরে যাওয়ার পথ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।

চৌসার যুদ্ধ (১৫৩৯ খ্রি.): অবশেষে হুমায়ুন তার ভুল বুঝতে পারেন। জাহাঙ্গীরকুলী বেগের ওপর বাংলার শাসনভার অর্পণ করে তিনি গঙ্গার বাম তীর ধরে আগ্রা অভিমুখে রওনা হন। কিন্তু শাহবাদ জেলার বক্সারের কাছাকাছি চৌসায় পৌঁছলে শের খান তার পথরোধ করেন। ১৫৩৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ জুন চৌসায় সংঘটিত যুদ্ধে শের খানের কাছে সম্রাট হুমায়ুন পরাজিত হন। পরাজিত মুঘল বাহিনী আফগানদের তাড়া খেয়ে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং এতে অনেকেই মারা যায়। সম্রাট হুমায়ুন নিজাম নামের এক মাঝির সাহায্যে গঙ্গা পার হয়ে জীবন বাঁচান। এ যুদ্ধে জয়লাভের ফলে শের খানের ক্ষমতা ও মর্যাদা বহু গুণে বৃদ্ধি পায়। শের খান 'শের শাহ' উপাধি গ্রহণ এবং রাজকীয় মর্যাদা ও সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতীক হিসেবে মুদ্রা অঙ্কন ও তার নামে খুৎবাপাঠের আদেশ দেন। অতঃপর শের শাহ বাংলা দখল করেন।

কনৌজ বা বিলগ্রামের যুদ্ধ (১৫৪০ খ্রি.): চৌসার যুদ্ধের পরাজয়ের গ্লানি দূর এবং হারানো গৌরব ফিরে পেতে হুমায়ুন ৪০ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে শের শাহের বিরুদ্ধে কনৌজ অভিমুখে অগ্রসর হন। ১৫৪০ খ্রিষ্টাব্দের ৭ মে শের শাহ ১৫ হাজার সৈন্য নিয়ে কনৌজের কাছে বিলগ্রামে মুঘল বাহিনীর সাথে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন। এ যুদ্ধেও হুমায়ুন পরাজিত হন। ভারতের ইতিহাসে কনৌজ বা বিলগ্রামের যুদ্ধকে অন্যতম মীমাংসাত্মক যুদ্ধ হিসেবে গণ্য করা হয়। বস্তুত ভারতবর্ষে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে বিগত কয়েক বছর ধরে মুঘল-আফগান যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল– এ যুদ্ধের মাধ্যমে তার নিষ্পত্তি হয়। ফলে ভারতে সাময়িকভাবে মুঘল সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে এবং পুনরায় আফগান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. 'হুমায়ুন' শব্দের অর্থ কী? *[ঢা. বো., রা. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫; ম. বো. ২০২৩; সকল বোর্ড ২০১৮]*
২. কীসের দাবি নিয়ে ভাইয়েরা হুমায়ুনের সাথে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন?
৩. সম্রাট হুমায়ুনের রাজত্বকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা কী?
৪. গৌড়ের নাম 'জান্নাতাবাদ' রাখেন কে? *[সকল বোর্ড ২০১৬]*
৫. চৌসার যুদ্ধ কত খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়?
৬. কোন যুদ্ধের ফলে ভারতে সাময়িকভাবে মুঘল সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে?

উত্তরের জন্য ২৪৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. সম্রাট হুমায়ুনের প্রাথমিক সমস্যাবলির একটি তালিকা তৈরি করো।

২. মুঘল-আফগান সংঘর্ষের কারণগুলো ছকে উপস্থাপন করো।

গ. দলীয় কাজ

কয়েকজন শিক্ষার্থী মিলে শের শাহ এবং সম্রাট হুমায়ুনের মধ্যকার সংঘর্ষের ঘটনাবলি নিয়ে একটি স্লাইড তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করো।

পাঠ ৫

মুঘল-আফগান সংঘর্ষে হুমায়ুনের পরাজয়ের কারণ, রাজ্য পুনরুদ্ধার এবং তার চরিত্র ও কৃতিত্ব (Causes of Humayun's Defeat in Mughal Afgan War, Recovery of State and His Character and Success)

হুমায়ুনের পরাজয়ের কারণ ও শের শাহের সাফল্য

Causes of Humayun's Failure and Sher Shah's Success

মুঘল-আফগান সংঘর্ষে সম্রাট হুমায়ুনের পরাজয় ও সিংহাসনচ্যুতি এবং শের শাহের সাফল্যের মূলে নানা কারণ ছিল বলে ঐতিহাসিকেরা মনে করেন। এসব কারণের মধ্যে যেসব গুলি উল্লেখযোগ্য ছিল তা নিচে বর্ণিত হলো:

প্রথমত, পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে হুমায়ুন যে সাম্রাজ্য লাভ করেছিলেন তা ছিল অত্যন্ত দুর্বল, কাঠামোহীন এবং ভঙ্গুর। এ সাম্রাজ্যকে রক্ষা ও সুসংহত করার জন্য প্রয়োজন ছিল উন্নত সমরকৌশল এবং রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক প্রজ্ঞাসম্পন্ন একজন শাসকের। দুর্ভাগ্যজনকভাবে সম্রাট হুমায়ুনের তা ছিল না।

দ্বিতীয়ত, সম্রাট হুমায়ুনের মধ্যে অনেক মানবিক গুণাবলির সমাবেশ দেখা যায়। তার পিতৃভক্তি ও ভ্রাতৃবাৎসল্য অনেক ঐতিহাসিকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহের কারণেই পিতার অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী ভাইয়ের মধ্যে সাম্রাজ্য ভাগ করে দিয়েছিলেন। ঐতিহাসিকেরা হুমায়ুনের এ সিদ্ধান্তকে একটি অপরিপক্ক রাজনৈতিক পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করেন। বস্তুত এ কাজটি দ্বারা তিনি তার নিজের অবস্থান দুর্বল করেছিলেন। বস্তুত সম্রাট হুমায়ুন তার ভাইয়ের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করলেও তারা কিন্তু সম্রাটের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন না। বরং তারা হুমায়ুনের প্রতি বিরূপ আচরণ ও অসহযোগিতার মাধ্যমে তার ভাগ্য বিপর্যয়কে ত্বরান্বিত করেন।

তৃতীয়ত, আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, হুমায়ুনের ব্যক্তি চরিত্রে নানা গুণের অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল। তবে তার মধ্যে প্রশাসনিক দূরদর্শিতা, সামরিক ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও কূটনৈতিক কলাকৌশলের অভাব ছিল। হুমায়ুনের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক অদূরদর্শিতা তার পরাজয় ও সিংহাসনচ্যুতিরও অন্যতম কারণ ছিল।

চতুর্থত, হুমায়ুন ছিলেন সরলমনা। তিনি মানুষের কথা ও মৌখিক প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস এবং মানুষকে অহেতুক ক্ষমা করতেন। আর এজন্য তাকে অনেক মূল্য দিতে হয়।

পঞ্চমত, হুমায়ুনের সেনাবাহিনী নানা জাতি-গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত ছিল। এ বাহিনীর সাংগঠনিক ভিত্তি দুর্বল ছিল। তদুপরি তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা, সংহতি ও নিয়মানুবর্তিতার অভাব ছিল। মুঘল সেনাবাহিনীর এ দুর্বলতা ছিল হুমায়ুনের পরাজয়ের অন্যতম কারণ।

ষষ্ঠত, শের শাহ ছিলেন হুমায়ুনের সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের মানুষ। তিনি ছিলেন সমকালের অন্যতম দূরদর্শী রাজনীতিবিদ। হুমায়ুন অপেক্ষা তিনি ছিলেন রণঅভিজ্ঞ একজন সেনাপতি। সামরিক কলা-কৌশল ও শক্তিমত্তায় তিনি হুমায়ুন অপেক্ষা অনেক উর্ধ্বে ছিলেন। সামরিক বাহিনী গঠন ও পরিচালনায় তার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। অন্যদিকে, হুমায়ুনের ব্যক্তিগত বীরত্বের দুএকটি উদাহরণ থাকলেও সামরিক বাহিনী গঠনে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ ব্যর্থ। হুমায়ুন এবং শের শাহের এ বিপরীত অবস্থান হুমায়ুনের পরাজয় এবং শের শাহের সাফল্যের মূলে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছিল বলে ঐতিহাসিকেরা মনে করেন।

সপ্তমত, বিশৃঙ্খল ও অনিয়ন্ত্রিত মুঘল সেনাবাহিনীর বিপরীতে শের শাহের আফগান বাহিনী ছিল সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসংবদ্ধ। সুদক্ষ সেনাপতি শের শাহ তাদের জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হন। ফলে তারা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অনড় থেকে সাফল্য ছিনিয়ে আনে।

অষ্টমত, হুমায়ুন তার বিপদে জ্ঞাতি ও আপনজনদের সহযোগিতা পাননি। কিন্তু শের শাহের প্রতি আফগানদের পূর্ণ সমর্থন ছিল। তাই শের শাহের পক্ষে হুমায়ুনের বিরুদ্ধে সাফল্য লাভ সম্ভব হয় এবং তিনি ভারতের ভাগ্যাকাশে ধূমকেতুর মতো আবির্ভূত হন।

হুমায়ুনের রাজ্য পুনরুদ্ধার (Humayun's Recovery of State)

শের শাহের কাছে কনৌজের যুদ্ধে মর্মান্তিক পরাজয়ের পর সিংহাসনচ্যুত হুমায়ুন ১৫৫৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত অসহায় পলাতকের মতো দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়ান। রাজ্যহারা হুমায়ুন প্রথমে পাঞ্জাবে তার ভাইদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। কিন্তু তা না পেয়ে তিনি সিন্ধুতে যান। শের শাহের বিরাগভাজন হওয়ার আশঙ্কায় সিন্ধুর সুলতান শাহ হোসেন আরগুণ হুমায়ুনকে আশ্রয় দিতে অস্বীকৃতি জানান। একই কারণে যোধপুরের রাজা মালবদেবও হুমায়ুনকে আশ্রয় দেননি। এ অবস্থায় তিনি অমরকোটের রানা প্রসাদের কাছে আশ্রয় নেন। এখানেই তার স্ত্রী হামিদা বানুর গর্ভে পুত্র আকবরের জন্ম হয়। রানা প্রসাদের সাথে মতবিরোধ ঘটলে হুমায়ুন অমরকোট ত্যাগে বাধ্য হন। এ পর্যায়ে তিনি কান্দাহারে ভাই কামরানের কাছে আশ্রয় চান। কিন্তু তা না পেয়ে পুত্র আকবরকে সেখানে রেখে সিংহাসনচ্যুত হুমায়ুন পারস্যের সাফাভি সম্রাট শাহ তাহমাসপের দরবারে আশ্রয় নেন। শিয়া মতবাদ গ্রহণ এবং ভারতে তা প্রচার ও কান্দাহার ফিরিয়ে দেওয়ার শর্তে শাহ তাহমাসপ হুমায়ুনকে তার ভারতীয় রাজ্য পুনরুদ্ধারে সহযোগিতা প্রদানে সম্মত হন। পারস্য সম্রাট শাহ তাহমাসপের সহযোগিতায় হুমায়ুন ১৫৪৫ খ্রিষ্টাব্দে কামরানকে পরাজিত করে কাবুল ও কান্দাহার অধিকার করেন। প্রতিদ্বন্দ্বী ভাই ও অন্যান্য জ্ঞাতিদের পরাজিত এবং আফগানিস্তানে নিজ কর্তৃত্ব সুনিশ্চিত করার পর তিনি ভারতের দিকে দৃষ্টি দেন। ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও তার অনুকূলে ছিল। বস্তুত শের শাহের মৃত্যুর পর অনৈক্য ও অন্তঃকলহের কারণে ভারতে আফগান শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। এ সুযোগে হুমায়ুন ভারতে প্রবেশ করেন এবং ১৫৫৫ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে লাহোর অধিকার করেন। সরহিন্দের যুদ্ধে সিকান্দার শুরকে পরাজিত করার পর ১৫৫৫ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে হুমায়ুন দিল্লি ও আগ্রা অধিকার করে পুনরায় সিংহাসনে আরোহণ করেন। এভাবে ভারতে মুঘল আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

হুমায়ুনের মৃত্যু: দীর্ঘ ১৫ বছরের সাধনা ও সংগ্রামের ফসল হুমায়ুন বেশি দিন ভোগ করতে পারেননি। সিংহাসন পুনরুদ্ধারের অল্প কিছুদিন পর দিনপানাহ্ শহরে তার নিজস্ব গ্রন্থাগারের সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে তিনি গুরুতর আহত হন এবং ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন। ঐতিহাসিক লেনপুল বলেন, "তিনি সারাজীবন আছাড় খেয়েছেন এবং আছাড়েই তার জীবনপ্রদীপ নিভে যায়।"[১]

চরিত্র ও কৃতিত্ব মূল্যায়ন (Evaluation of Character and Achievements)

সম্রাট হুমায়ুনের অতুলনীয় চরিত্রে নানা মানবীয় গুণের অপূর্ব সমাবেশ দেখা যায়।

উদারচিত্ত ও অদূরদর্শী শাসক: ঐতিহাসিকদের মতে, হুমায়ুন ছিলেন সরল, অনাড়ম্বর, দয়ালু, উদারচিত্ত ও হৃদয়বান। তিনি ছিলেন কর্তব্যপরায়ণ ও অনুগত, স্নেহশীল ভাই, বিশ্বস্ত ও উষ্ণ হৃদয়ের বন্ধু এবং প্রেমময় স্বামী। হুমায়ুন ভদ্রোচিত, শান্ত, দয়ালু ও বাৎসল্যপ্রবণ ছিলেন। পরম শত্রুকে ক্ষমা প্রদর্শন তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। বিরুদ্ধাচারী ভাই ও জ্ঞাতিদের প্রতি গভীর মমত্ববোধ তার উদারচিত্তের পরিচায়ক। ঐতিহাসিক স্মিথ-এর মতে, "হুমায়ুন শিক্ষিত, মার্জিত রুচি এবং শিষ্টাচারী ছিলেন এবং তার মধ্যে সমর দক্ষতারও অভাব ছিল না।" ঐতিহাসিক ফিরিশতার মতে, "চরিত্রের সদগুণাবলির বিচারে হুমায়ুন ছিলেন অতুলনীয়"। তবে তার কিছু চারিত্রিক ত্রুটি তার সমস্ত সদগুণাবলিকে ম্লান করে দিয়েছিল। হুমায়ুনের মধ্যে পিতা বাবরের মতো দৃঢ়চিত্ততা, তেজস্বিতা এবং রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ছিল না। তার চরিত্রের প্রধান ত্রুটি ছিল বিচক্ষণতা, অধ্যবসায় ও সংকল্পের অভাব। তিনি কর্তব্য-কর্মে উদাসীন ও আফিমসেবী ছিলেন।

সুশিক্ষিত ও সংস্কৃতিমান: হুমায়ুন ছিলেন কবিতাপ্রেমী এবং কবি হিসেবেও তার সুখ্যাতি ছিল। 'দিউয়ান-ই-হুমায়ুন' তার একটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। জ্যোতির্বিদ্যা, ধর্মতত্ত্ব, দর্শন এবং গণিতশাস্ত্রের প্রতি তার গভীর অনুরাগ ছিল। ঐতিহাসিক আবুল ফজলের মতে, হুমায়ুন এরিস্টটলের মতো জ্ঞানী ছিলেন। বহু জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তি তার রাজসভা অলঙ্কৃত করেছিলেন। এদের মধ্যে খুদ্দামীর, সাহাবউদ্দিন কাকী ও জওহর আফতাব প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ছিলেন। তার আমলে মুঘল চিত্রশিল্পের শুভ সূচনা হয়। এ সময়ে পারস্য থেকে আসা মীর সৈয়দ আলী এবং খাজা আবদুস সামাদ মুঘল চিত্রশিল্পের সূচনা করেন। তার উৎসাহে মুঘল স্থাপত্যেরও বিকাশ ঘটেছিল। তিনি দিল্লিতে 'দিনপানাহ' বা 'বিশ্বাসীদের আশ্রম' নামে একটি নগরী নির্মাণ করেন। একটি সুসজ্জিত গ্রন্থাগার ছিল এ নগরীর অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। হুমায়ুন আশ্রমে একটি চমৎকার মসজিদ নির্মাণ করেন। তার পত্নী হামিদা বানুর উদ্যোগে নির্মিত হুমায়ুনের সমাধিসৌধ মুঘল স্থাপতের একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নিদর্শন। ব্যক্তিজীবনে সম্রাট হুমায়ুন একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। তবে তিনি ধর্মান্ধ বা অন্য ধর্মবিরোধী ছিলেন না।

---

[১] He tumbled through life and he tumbled out of it.– Ref. S. Lane Poole, *Mediaeval India Under Mohammedan Rule*

ব্যর্থ শাসক: হুমায়ুনের মধ্যে মানবিক গুণাবলির পূর্ণতা থাকলেও রাজকীয় গুণের যথেষ্ট অভাব ছিল। শাসক হিসেবে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেননি। ইতিহাসে স্থায়ী আসন লাভের মতো কোনো আইন বা শাসনবিধি তিনি প্রণয়ন করতে পারেননি। প্রজাসাধারণের জীবনমান উন্নয়ন সাধনে কোনো হিতৈষণামূলক কাজও তার দ্বারা সম্পাদিত হয়নি। তাই ঐতিহাসিকেরা একজন শাসক হিসেবে তাকে ব্যর্থ বলেই রায় দিয়েছেন। লেনপুলের মতে, "তার (হুমায়ুনের) চরিত্র আকর্ষণ করে, কিন্তু প্রভাবিত করে না।"[১০] তিনি আরো বলেন, "তিনি ছিলেন খ্রিষ্টানোচিত গুণাবলির অধিকারী এবং তার সারাজীবনই ভদ্রলোকসুলভ ব্যবহারে পূর্ণ।" মানুষ হিসেবে যেমনই হোক না কেন সম্রাট হিসেবে হুমায়ুন ছিলেন ব্যর্থ। লেনপুলের ভাষায়– "কিন্তু রাজা হিসেবে তিনি ছিলেন ব্যর্থ। তার নামের অর্থ সৌভাগ্যবান কিন্তু কোনো হতভাগ্য সম্রাটই কখনো এত ভুল নামে অভিহিত হননি।" (But as a king he was a failure. His name means 'fortune', and never was unlucky sovereign more miscalled.) নানা ব্যর্থতা ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এ স্বীকার করতেই হবে যে, সম্রাট হুমায়ুন ভারতবর্ষে লুপ্ত মুঘল সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। আর এর ওপর দাঁড়িয়েই সম্রাট আকবর ভারতে বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। কাজেই এ জন্য হুমায়ুনকে ভারতের ইতিহাস মনে রাখবে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সম্রাট হুমায়ুনের সেনাবাহিনী কাদের সমন্বয়ে গঠিত ছিল?
২. কোন যুদ্ধের পর হুমায়ুন অসহায় হয়ে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়ান?
৩. সম্রাট হুমায়ুন কার দরবারে আশ্রয় নেন?
৪. সম্রাট হুমায়ুন কাকে পরাজিত করে কাবুল ও কান্দাহার অধিকার করেন?
৫. কত খ্রিষ্টাব্দে হুমায়ুন ভারতে মুঘল আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন?
৬. গ্রন্থাগারের সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে কোন মুঘল সম্রাট মৃত্যুবরণ করেন?

উত্তরের জন্য ২৪৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

নিচের যুদ্ধগুলো সংঘটিত হওয়ার সাল এবং যাদের মধ্যে সংঘটিত হয় তাদের নাম লিখে ছকটি পূরণ করো।

যুদ্ধ	সাল	যাদের মধ্যে সংঘটিত হয়
কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধ		
চৌসার যুদ্ধ		
বিলগ্রামের যুদ্ধ		

গ. বাড়ির কাজ

ইরাকের পার্শ্ববর্তী ছোট একটি দেশ কুয়েত। ইরাকের সাবেক প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের ছিল বিশাল সমরাস্ত্র বাহিনী। ফলে মাত্র এক দিনের যুদ্ধেই তারা কুয়েত দখল করে এবং কুয়েতকে ইরাকের একটি প্রদেশ ঘোষণা করেন। কুয়েত শাসনের জন্য সাদ্দাম হোসেন তার মন্ত্রিসভার একজন সদস্যকে প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে পাশ্চাত্য শক্তি ও অন্যান্য আরব দেশের বিরোধিতার মুখে সাদ্দাম হোসেন কুয়েত দখল করে বেশিদিন রাখতে পারেননি। মার্কিন নেতৃত্বাধীন ন্যাটো জোটের হামলার মুখে সাদ্দামের বাহিনী কুয়েত ছাড়তে বাধ্য হয়।

১. উদ্দীপকে সম্রাট হুমায়ুনের কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
২. উদ্দীপকের সাদ্দাম হোসেনের বিজয় ও সম্রাট হুমায়ুনের গুজরাট বিজয় ক্ষণস্থায়ী হওয়ার কারণ ও প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন– বিশ্লেষণ করো।

---

[১০] His character attarcts, but never dominates. – Ref. S. Lane Poole, *Mediaeval India Under Mohammedan Rule*

পাঠ ৬

শের শাহ: প্রাথমিক জীবন ও রাজ্য বিজয় (১৫৪০-১৫৪৫ খ্রি.)
Sher Shah: Early life and Conquests (1540–1545 AD)

প্রাথমিক জীবন: মুঘল শাসনের ধারাবাহিকতায় একটি ছেদ টেনে শের শাহ ভারতে শুর আফগান বংশের (১৫৪০-১৫৫৫ খ্রি.) শাসনের সূত্রপাত করেন। শের শাহের বাল্যনাম ফরিদ। তার পিতা হাসান খান শুর বিহারের অন্তর্গত সাসারামের জায়গিরদার ছিলেন। শের শাহের পূর্বপুরুষদের আদিনিবাস আফগানিস্তানের অন্তর্গত তখত-ই-সুলায়মান পার্বত্যাঞ্চলের 'শুর গরগাই' স্থানে। এ কারণে শের শাহ প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ 'শুর বংশ' নামে পরিচিত।

শুরি শাসকদের বংশ তালিকা

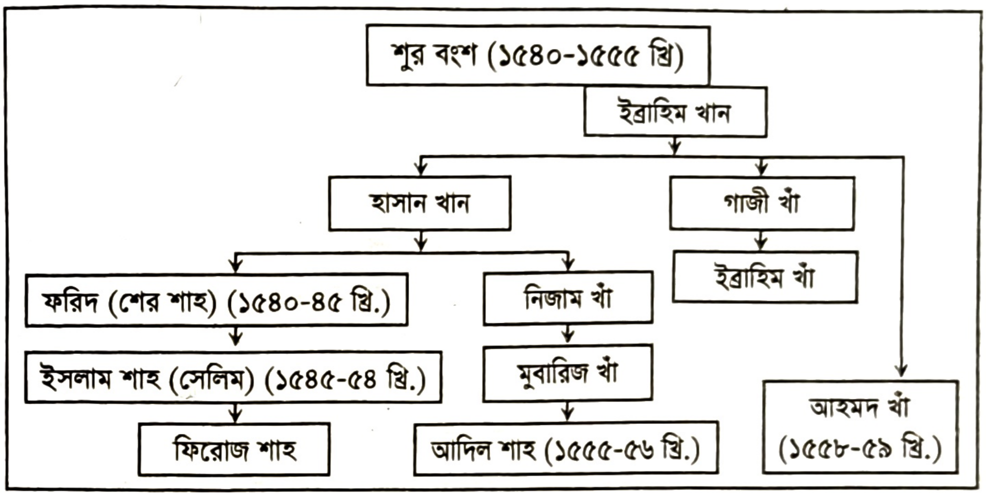

শের শাহ

অধিকাংশ ঐতিহাসিক মনে করেন শের শাহ ১৪৭২ খ্রিষ্টাব্দে পাঞ্জাবে জন্মগ্রহণ করেন। তবে পিতার কর্মস্থল সাসারামেই তার বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়।

শের শাহ ছিলেন হাসান শুরের প্রথম স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান। উল্লেখ্য যে, হাসান শুরের চার স্ত্রী ও আট পুত্র ছিল। যা হোক বিমাতার বিদ্বেষ ও দুর্ব্যবহার এবং পিতার অবহেলায় অতিষ্ঠ হয়ে ১৪৯৪ খ্রিষ্টাব্দে ফরিদ গৃহত্যাগ করেন। অসাধারণ মেধাবী ফরিদ তৎকালীন শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল জৌনপুরে এসে আরবি, ফারসি ভাষা ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। যুবক ফরিদের নানামুখী গুণ এবং বুদ্ধিমত্তায় মুগ্ধ হয়ে পদস্থ কর্মকর্তা ও হাসান শুরের পৃষ্ঠপোষক জামাল খান ফরিদের পিতাকে পুত্রের প্রতি যত্নবান হওয়ার উপদেশ দেন। ফলে হাসান শুর পুত্র ফরিদকে সাসারামে ফিরিয়ে নেন এবং তার ওপর সাসারাম ও খাওয়াসপুর পরগনার দায়িত্ব দেন। এখানে তিনি প্রশাসক হিসেবে দক্ষতার পরিচয় দেন। তিনি জমিদারদের অন্যায় জুলুম থেকে কৃষকদের রক্ষার ব্যবস্থা করেন এবং জমিদারদের কাছ থেকে খাজনা আদায় নিশ্চিত করেন। ফরিদের এ কৃতিত্ব তার বিমাতাকে পুনরায় ঈর্ষাকাতর করে তোলে। ফলে তার চক্রান্তে ফরিদ ১৫১৮ খ্রিষ্টাব্দে পুনরায় সাসারাম ত্যাগে বাধ্য হন।

'শের খান' উপাধি লাভ: ১৫২০ খ্রিষ্টাব্দে হাসান শুরের মৃত্যুর পর সুলতান ইব্রাহিম লোদির ফরমান বলে ফরিদ সাসারাম ও খাওয়াসপুরের জায়গির লাভ করেন। তবে বৈমাত্রেয় ভাই সুলায়মান শুরের চক্রান্তে তিনি আবারও সাসারাম ত্যাগ করতে বাধ্য হন। ১৫২২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বিহারের বাহার খান লোদির অধীনে চাকরিতে যোগ দেন এবং ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সেখানে কর্মরত ছিলেন। কথিত আছে যে, এ সময় ফরিদ বাহার খানের সাথে শিকারে গিয়ে খালি হাতে একটি বাঘ হত্যা করেন। এ বীরত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ বাহার খান ফরিদকে 'শের খান' উপাধি দেন। এভাবে ফরিদ 'শের খান' নামে পরিচিতি লাভ করেন। শের খানের ভাগ্যোন্নতি ও সাফল্যে আফগান অভিজাতদের অনেকেই ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠেন এবং তাদের ষড়যন্ত্রে তিনি চাকরি হারান ও বিহার থেকে বিতাড়িত হন। ১৫২৭ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে শের খান ভাগ্যান্বেষণে আগ্রায় যান এবং মুঘল সম্রাট বাবরের অধীনে চাকরি নেন। পূর্বাঞ্চল অভিযানে বাবরকে সহায়তা করে তিনি মুঘল সম্রাটের বিশেষ প্রীতিভাজনে পরিণত হন। ফলে ১৫২৮ খ্রিষ্টাব্দে মুঘল সম্রাট তাকে বৈমাত্রেয় ভাইয়ের কাছ থেকে পিতার জায়গির পুনরুদ্ধারে সহায়তা করেন। এদিকে বাহার খানের মৃত্যুর পর তার অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র জামাল খান বিহারের শাসনক্ষমতা গ্রহণ করেন। শের খান তখন জামাল খানের অভিভাবক নিযুক্ত হন।

শের খানের শক্তি বৃদ্ধি: শের খান মুঘলদের ঘৃণা করতেন এবং ভারতবর্ষ থেকে তাদের বিতাড়িত করা তার অন্যতম লক্ষ্য ছিল। জামাল খানের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করে তিনি তার লক্ষ্য অর্জনের পথে অগ্রসর হন। তিনি মুঘলদের প্রতিদ্বন্দ্বী স্বগোত্রীয় আফগানদের সংঘবদ্ধ করা ছাড়াও নিজ শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করেন। ১৫৩০ খ্রিষ্টাব্দে চুনার দুর্গের অধিপতি তাজ খানের বিধবা স্ত্রী লাদ মালিকাকে বিয়ে করে তিনি চুনার দুর্গের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৫৩১ খ্রিষ্টাব্দে মুঘল সম্রাট হুমায়ুন চুনার দুর্গ অবরোধ করলে শের খান তার প্রতি আনুগত্যের ভান করে দুর্গের অধিকার বজায় রাখেন। ইতোমধ্যে জামাল খান শের খানের বিরুদ্ধে বাংলার সুলতান মাহমুদ শাহের সাথে মৈত্রীবন্ধ হন। ১৫৩৪ খ্রিষ্টাব্দে কিউল নদীর তীরে সুরুজগড়ের যুদ্ধে শের খান সম্মিলিত বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। সুরুজগড়ের যুদ্ধে অভাবনীয় বিজয় ও সাফল্য শের খানের জীবনে এক সন্ধিক্ষণ। ড. কানুনগোর মতে, "এ যুদ্ধের ফলে সাসারামের অখ্যাত জায়গিরদারের অবহেলিত পুত্র দিল্লির মসনদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হন।"

সম্রাট হুমায়ুনের সাথে সংঘর্ষ ও শের খানের সিংহাসন লাভ: সুরুজগড়ের যুদ্ধে বিজয় শের খানের রাজনৈতিক উচ্চাশা বৃদ্ধি করে। তিনি ১৫৩৫ ও ১৫৩৭ খ্রিষ্টাব্দে যথাক্রমে দু'বার বাংলা আক্রমণ করেন। বাংলার সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ প্রথমবার বেশ কিছু নগদ অর্থ এবং কিছু এলাকা শের খানের হাতে ছেড়ে দিয়ে সিংহাসন রক্ষা করেন। কিন্তু ১৫৩৭ খ্রিষ্টাব্দে শের খান বাংলার রাজধানী গৌড় দখল করে নেন। মুঘল সম্রাট হুমায়ুন তখন গুজরাটে বাহাদুর শাহের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত ছিলেন। তবে শের খানের গৌড় অধিকার সংবাদে তিনি উৎকণ্ঠা বোধ করেন। এ সময় বাংলার সুলতান মাহমুদ শাহ সাহায্যের আবেদন জানালে হুমায়ুন শের শাহকে দমনের উদ্দেশ্যে বাংলার দিকে রওনা হন। তবে তিনি সরাসরি বাংলা আক্রমণ না করে চুনার দুর্গ অবরোধ ও সেখানে ছয় মাস অবস্থান করেন। ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে শের খান গৌড় আক্রমণ করেন। বিচক্ষণ শের খান মুঘলদের সাথে প্রত্যক্ষ সংঘাত এড়িয়ে বিহার চলে গেলে হুমায়ুন বিনা বাধায় গৌড় অধিকার করেন। তিনি বাংলার নতুন নামকরণ করেন 'জান্নাতাবাদ'। এখানে তিনি দীর্ঘ ছয় মাস আলস্য ও আমোদে কাটান। এ সুযোগে শের খান চুনার দুর্গ পুনরুদ্ধারসহ বিহার, বারানসী, জৈনপুর ও কনৌজ পর্যন্ত দখল করে রাজস্ব আদায় শুরু করেন। এর ফলে হুমায়ুনের আগ্রা প্রত্যাবর্তনের পথ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।

চৌসার যুদ্ধ: দিল্লির সাথে বাংলার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিলে হুমায়ুনের টনক নড়ে। আতঙ্কিত হুমায়ুন দ্রুত আগ্রার পথে রওনা হলে সমরকুশলী শের খান গঙ্গা তীরবর্তী স্থান চৌসায় তার গতিরোধ করেন। ১৫৩৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ জুন চৌসায় অনুষ্ঠিত যুদ্ধে হুমায়ুন পরাজিত হন এবং একাকী প্রাণে বেঁচে আগ্রায় পৌছান। চৌসার যুদ্ধে জয়লাভ শের খানের রাজনৈতিক জীবনে বিরাট পরিবর্তন এনে দেয়। তিনি 'শের শাহ' উপাধি ধারণ করে রাজকীয় মর্যাদায় নিজেকে ভূষিত করেন। তার নিজ নামে খুৎবাপাঠ ও মুদ্রাঙ্কনের নির্দেশ জারি করা হয়। ড. কানুনগো বলেন, "১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দে শের খান একজন মুঘল সামন্ত হিসেবেই সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু চৌসার যুদ্ধে বিজয় তার আকাঙ্ক্ষাকে সুদূর প্রসারিত করে।"

কনৌজের যুদ্ধ: চৌসার যুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানি ও ব্যর্থতা সহ্য করতে না পেরে হুমায়ুন পুনরায় শের শাহের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। ১৫৪০ খ্রিষ্টাব্দের ৭ মে কনৌজের অদূরে বিলগ্রামে উভয়ের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে হুমায়ুনের ভাগ্য ফেরাবার শেষ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তিনি শোচনীয় ও চূড়ান্তভাবে পরাজিত হন। শের শাহ কনৌজ, দিল্লি ও আগ্রা অধিকার করে দিল্লির সিংহাসনে বসেন। এভাবে ভারতে বাবরের কৃতিত্বের সমাপ্তি ঘটে এবং ভারতবর্ষের সার্বভৌমত্ব আবারও আফগানদের হাতে চলে যায়।

শের শাহের রাজ্যজয় (Conquests of Sher Shah)

শের শাহ ছিলেন সমকালের শ্রেষ্ঠ সমরনায়ক। দিল্লির সিংহাসনে আরোহণের পর তিনি রাজ্য বিস্তারে মন দেন। পরাজিত হুমায়ুনের পশ্চাদ্ধাবন করে তিনি পাঞ্জাবে এসে পৌছান। পাঞ্জাব তখন হুমায়ুনের ভাই কামরানের দখলে। শের শাহের চাপ সহ্য করতে না পেরে কামরান শের শাহের কাছে পাঞ্জাব হস্তান্তর করে কাবুলে চলে যান। শের শাহ এবার সিন্ধু ও ঝিলাম নদীর অববাহিকায় বসবাসরত খোক্কার উপজাতিদের দমনে আত্মনিয়োগ করেন। তবে এরই মধ্যে তিনি সংবাদ পান যে, বাংলার শাসনকর্তা খিজির খান বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। এ অবস্থায় তিনি রোটাস দুর্গ নির্মাণ করে খোক্কারদের দমনের ভার পঞ্চাশ হাজার সৈন্যসহ তার বিশ্বস্ত ও সুযোগ্য সেনাপতিদের ওপর ন্যস্ত করে নিজে দ্রুত বাংলা অভিমুখে যাত্রা করেন। ১৫৪১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বিদ্রোহী খিজির খানকে দমন করে তাকে বরখাস্ত করেন।

১৫৪২ খ্রিষ্টাব্দে শের শাহ মালব আক্রমণ করেন। সেখানকার শাসক মল্লাখান (কাদির শাহ) পরাজিত হলে মালবের অধিকাংশ শের শাহের অধিকারে আসে। মালব থেকে ফিরতি পথে তিনি রণথম্ভোর অধিকার করেন। এবার তিনি রাইসিনের দিকে দৃষ্টি দেন। আধুনিক ভুপাল শহরের ২৭ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত সুরক্ষিত রাইসিন দুর্গের অধিপতি ছিলেন রাজপুত রাজা পুরনমল। ছয় মাস অবরুদ্ধ থাকার পর পুরনমল আত্মসমর্পণে বাধ্য হন। ইতোমধ্যে মুলতান শের শাহের অধিকারে আসে। ১৫৪৩ খ্রিষ্টাব্দে শের শাহ সিন্ধুর ভাক্কার ও সেওয়ান দুর্গও দখল করেন। এছাড়া গোয়ালিয়র ও চান্দেরি দুর্গও শের শাহ করায়ত্ত করে নেন।

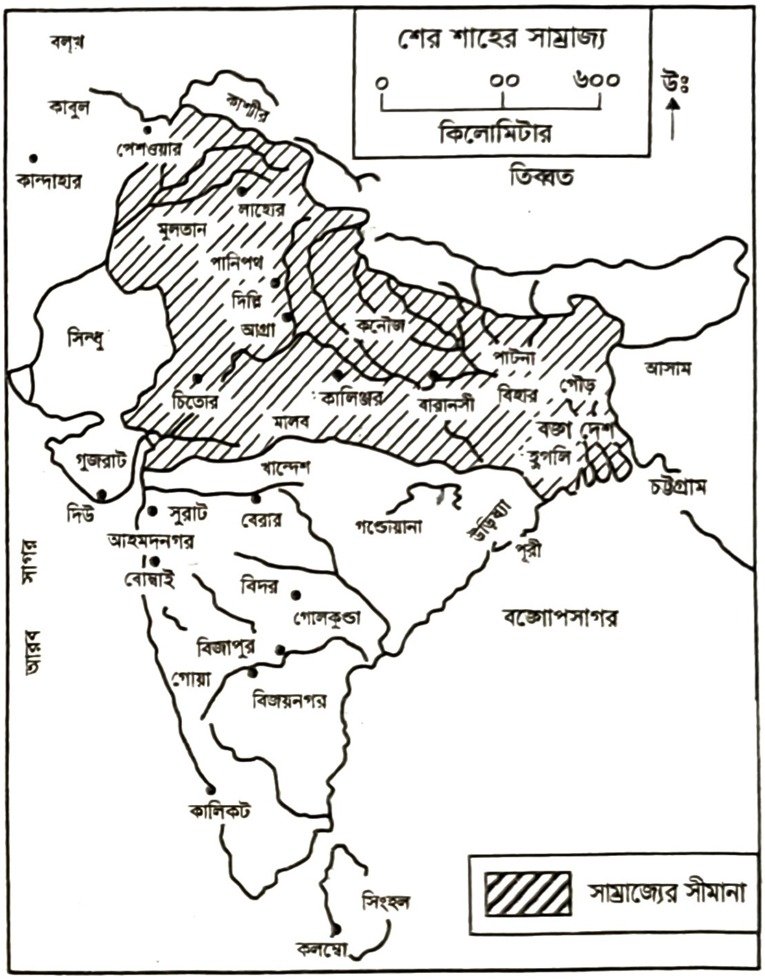
শের শাহের সাম্রাজ্য
0
০০
৬০০
কিলোমিটার
উঃ
বলখ
কাবুল
কাশ্মীর
পেশওয়ার
কান্দাহার
তিব্বত
লাহোর
মুলতান
পানিপথ
দিল্লি
আগ্রা
কনৌজ
সিন্ধু
পাটনা
আসাম
চিতোর
কালিঞ্জর
বারানসী
বিহার
গৌড়
মালব
বঙ্গ দেশ
গুজরাট
হুগলি
খান্দেশ
চট্টগ্রাম
দিউ
সুরাট
বেরার
গন্ডোয়ানা
উড়িষ্যা
পুরী
আহমদনগর
বোম্বাই
বিদর
গোলকুণ্ডা
বঙ্গোপসাগর
আরব সাগর
বিজাপুর
গোয়া
বিজয়নগর
কালিকট
সিংহল
কলম্বো
সাম্রাজ্যের সীমানা

শের শাহের রাজত্বে ভারতবর্ষ (১৫৪৫ খ্রি.)

শের শাহের একজন প্রবল শক্তিধর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন মেবারের রানা মালদেব। ১৫৪৪ খ্রিষ্টাব্দে শের শাহ মালদেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। দুর্ধর্ষ ও রণনিপুণ রাজপুত বাহিনী শের শাহের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে। কুশলী শের শাহ কয়েকটি জাল চিঠির মাধ্যমে রাজপুত সেনাপতিদের সম্পর্কে রাজা মালদেবের মনে সন্দেহ ও সংশয় তৈরি করেন এবং শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে শের শাহের জয় হয়। ফলে আজমির, যোধপুর ও আবুশৃঙ্গো শের শাহের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। চিতোরও শের শাহের বশ্যতা স্বীকার করে।

শের শাহের মৃত্যু: শের শাহের শেষ সামরিক অভিযান ছিল বুন্দেলখণ্ডের কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধ। ১৫৪৪ খ্রিষ্টাব্দে কালিঞ্জর অবরোধ করা হয়। প্রায় এক বছর অবরুদ্ধ থাকার পর দুর্গটি শের শাহের অধিকারে আসে। তবে এ অবরোধকালে বারুদের গোলার বিস্ফোরণে শের শাহ মারাত্মকভাবে দগ্ধ হন এবং ১৫৪৫ খ্রিষ্টাব্দের ২২ মে মৃত্যুবরণ করেন। সাসারামে নিজের তৈরি সমাধিক্ষেত্রে তাকে সমাহিত করা হয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ভারতে শুর আফগান বংশের শাসনের সূত্রপাত করেন কে?
২. শের শাহের শাসনকাল কত ছিল?
৩. শের শাহের বাল্যনাম কী? */সকল বোর্ড ২০১৮/*
৪. খালি হাতে বাঘ হত্যা করে শের শাহ কী উপাধি পান?
৫. কোন যুদ্ধের পর শের খান 'শের শাহ' উপাধি ধারণ করেন?
৬. কনৌজের যুদ্ধ কত খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়?

উত্তরের জন্য ২৪৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

আফগান শাসক শের শাহের জীবনের উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ এবং বিজিত রাজ্যসমূহের একটি তালিকা তৈরি করো।

পাঠ ৭ ও ৮

শের শাহের শাসন ব্যবস্থা ও জনহিতকর কার্যাবলি
Administration and Benevolent Activities of Sher Shah

শের শাহের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা
Central and Provincial Administrative System of Sher Shah

ভারতে মুঘল রাজত্বের অন্তর্বতীকালীন শুর আফগান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা শের শাহ একজন সাহসী বীর, সমরকুশলী সেনানায়ক ও বিজয়ী সমরনেতার পাশাপাশি একজন সুদক্ষ শাসকও ছিলেন। মাত্র পাঁচ বছরের রাজত্বকালে তিনি সাংগঠনিক ক্ষমতা, রাজোচিত অন্তর্দৃষ্টি এবং শাসনক্ষেত্রে যে কৃতিত্বের পরিচয় দেন তা তাকে ইতিহাসে অমরত্ব দান করেছে। শাসনকাজ পরিচালনায় তিনি ছিলেন সম্রাট আকবরের অগ্রদূত। আগের শাসন ব্যবস্থাকে যুগোপযোগীকরণ ছিল শের শাহের নিজস্ব উদ্ভাবন। শাসন ব্যবস্থার প্রতিটি ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন নিঃসন্দেহে শের শাহের অসাধারণ প্রতিভার পরিচায়ক। শাসন ব্যবস্থায় তার কৃতিত্ব ঐতিহাসিকদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ইংরেজ দার্শনিক কীনির মতে, "কোনো শাসকই এমনকি ব্রিটিশ সরকারও শাসনকাজে এই পাঠানের (শের শাহ) মতো পারদর্শিতা প্রদর্শন করেননি।"[১১] শের শাহ ছিলেন প্রজারঞ্জক ও জনহিতৈষী শাসকদের অন্যতম। প্রজাপীড়ন নয় বরং তাদের সুখ-শান্তি নিশ্চিত করাই ছিল তার শাসন ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। তিনি এমন একটি শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন যার মূলনীতি ছিল হিন্দু-মুসলিম প্রজাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। বস্তুত শের শাহ ছিলেন প্রথম শাসক যিনি উদার নীতির ভিত্তিতে মানুষের সদিচ্ছার ওপর একটি ভারতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। শের শাহের আমলে দুই ধরনের শাসন ব্যবস্থা ছিল। যথা: ১. কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা এবং ২. প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক শাসন ব্যবস্থা।

১. কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা: সমসাময়িক বিশ্বের সর্বত্রই রাজার ক্ষমতা ছিল অবাধ। শের শাহ নিজেও এই অবাধ ক্ষমতা ও সর্বাত্মক সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। পূর্বসূরি আলাউদ্দিন খলজি ও গিয়াসউদ্দিন বলবনের মতো শের শাহও ছিলেন একজন স্বৈরতান্ত্রিক শাসক। তবে এ কথাও সত্য যে, তিনি নিষ্ঠুর স্বৈরাচারী ছিলেন না। তার শাসন ব্যবস্থা স্বৈরতান্ত্রিক হলেও স্বেচ্ছাতান্ত্রিক ছিল না। ঈশ্বরী প্রসাদের মতে, "শের শাহের সরকার স্বৈরতান্ত্রিক হলেও সুদক্ষ ও আলোকদীপ্ত ছিল।"[১২] শের শাহ ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনক্ষমতার সর্বোচ্চ কেন্দ্রবিন্দু। রাষ্ট্রের সব ক্ষমতা তার হাতে কেন্দ্রীভূত ছিল। তিনি ছিলেন সাম্রাজ্যের প্রধান শাসক, প্রধান বিচারপতি এবং প্রধান সেনাপতি। তবে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হলেও তিনি প্রজাপীড়ক ছিলেন না। তিনি একটি প্রজাহিতৈষী কল্যাণকামী সরকার প্রতিষ্ঠা করেন।

শের শাহ সুষ্ঠুভাবে প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরিচালনার স্বার্থে শের শাহ কেন্দ্রীয় সরকারে চারটি প্রধান বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। বিভাগগুলো হলো— ক. দিউয়ান-ই-ওজারাত, খ. দিউয়ান-ই-আরজ গ. দিউয়ান-ই-রিসালত এবং ঘ. দিউয়ান-ই-ইনশা। প্রতিটি বিভাগ পরিচালনার জন্য একজন করে প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন। ওয়াজির ছিলেন দিউয়ান-ই-ওজারাতের প্রধান। সাম্রাজ্যের আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ এ বিভাগের প্রধান কাজ হলেও প্রশাসনের অন্যান্য বিভাগের তত্ত্বাবধানও এর কর্মপরিধির মধ্যে ছিল। দিউয়ান-ই-আরজ বিভাগের প্রধান আরজ-ই-মামালিক। সেনাবাহিনী সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রশিক্ষণ এবং তাদের বেতন-ভাতাদি পরিশোধের দায়িত্ব ছিল আরজ-ই-মামালিকের ওপর। দিউয়ান-ই-রিসালত পররাষ্ট্রবিষয়ক দপ্তর। বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে কূটনৈতিক ও অন্যান্য যোগাযোগ রক্ষা এবং রাজকীয় দান-খয়রাত তত্ত্বাবধান ছিল এ বিভাগের প্রধান কর্মকর্তার দায়িত্ব। দিউয়ান-ই-ইনশার প্রধান কর্মকর্তার দায়িত্ব ছিল রাজকীয় ফরমান রচনা ও সময়মতো তা ঘোষণার ব্যবস্থা করা। প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্বও তার ওপর ন্যস্ত ছিল। এছাড়াও সাম্রাজ্যের বিচারব্যবস্থা পরিচালনার ভার ছিল দিউয়ান-ই-কাজার ওপর। কাজী-উল-কুজ্জাত ছিলেন এ বিভাগের প্রধান কর্তা। ডাক পরিচালনা ও গোয়েন্দা কাজের দায়িত্ব ছিল দিউয়ান-উল-বারিদের ওপর। এ বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন সাহিব-ই-বারিদ।

---

[১১] No government - not even the *British*, has shown so much wisdom as did this Pathan.

[১২] The Government of Shershah, though autocratic, was vigorous and enlightened.

২. প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক শাসন ব্যবস্থা: শাসনকাজের সুবিধার জন্য শের শাহ প্রশাসনে বিকেন্দ্রীকরণ নীতি গ্রহণ করেন। সুলতানি যুগের প্রাদেশিক ও স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সংস্কার করে শের শাহ তার প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। তার শাসন ব্যবস্থার ভাগগুলো হলো—

সরকার: শের শাহ তার বিশাল সাম্রাজ্যকে 'সরকার' নামক ৪৭টি প্রশাসনিক ইউনিটে ভাগ করেন। সরকারের প্রধান দুজন কর্মকর্তা ছিলেন 'শিকদার-ই-শিকদারান' এবং 'মুনসিফ-ই-মুনসিফান'। সরকারের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়ভার ছিল মুনসিফ-ই-মুনসিফানদের ওপর। তাছাড়া এ দুজন কর্মকর্তা সার্বিকভাবে তাদের অধীন পরগনাগুলোর শাসনকাজ তদারকি করতেন।

পরগনা: সরকারের পরবর্তী প্রশাসনিক ইউনিট ছিল 'পরগনা'। আব্বাস শেরওয়ানির মতে, শের শাহের সময় পরগনার সংখ্যা ছিল ১,১৩,০০০। ঈশ্বরী প্রসাদসহ আধুনিক ঐতিহাসিকদের অনেকেই মনে করেন, পরগনার সংখ্যা কোনো ক্রমেই এত অধিক ছিল না। সম্ভবত গ্রাম ও পরগনা মিলিয়ে এ সংখ্যা ছিল। যা হোক শিকদার ছিলেন পরগনার প্রধান সামরিক অধিকর্তা। পরগনার সর্বোচ্চ বেসামরিক কর্তা ছিলেন আমীন। পরগনার রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়ের দায়িত্ব ছিল তার ওপর। এছাড়াও মুনসিফ, খাজাঞ্চি এবং দু'জন কারকুন (করণিক, একজন হিন্দি ভাষার এবং একজন ফারসি ভাষার) ছিলেন পরগনার অন্যান্য কর্মচারীর অন্যতম।

গ্রাম: আঞ্চলিক শাসন ব্যবস্থার সর্বনিম্ন ইউনিট ছিল গ্রাম। এটি ছিল শাসন ব্যবস্থার মৌলিক একক। গ্রাম প্রশাসনের দায়িত্ব ছিল পঞ্চায়েতের ওপর। মুখিয়া বা মুকাদ্দম ছিলেন গ্রামপ্রধান। তাছাড়া পাটোয়ারী নামক একজন কর্মকর্তা ও বাকায়েত ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ কর্তা ছিলেন। তবে এরা কেউই সরকারি কর্মচারী ছিলেন না। স্থানীয় বিবাদ মীমাংসা, প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সেচব্যবস্থার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব ছিল স্বয়ংশাসিত পঞ্চায়েতের ওপর। রাজকর্মচারীদের দুর্নীতি এবং তাদের মধ্যে স্থানীয় প্রভাব-প্রতিপত্তির বিস্তার রোধের উদ্দেশ্যে শের শাহ সরকারি কর্মচারীদের বদলি নীতি গ্রহণ করেন। দুই বা তিন বছর অন্তর তাদের একস্থান থেকে অন্যস্থানে বদলি করা হতো।

অর্থ ও রাজস্বব্যবস্থা: অর্থ ও রাজস্ব সংস্কার শের শাহের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এ ব্যাপারে তিনি বিশেষ মৌলিক প্রতিভা ও দক্ষতার পরিচয় দেন। ঐতিহাসিকদের মতে, শের শাহের রাজস্বব্যবস্থা যুক্তিসংগত, বিজ্ঞানভিত্তিক ও উদার নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

রাজস্ব আয়ের উৎস: শের শাহের রাজকোষ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক এ দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। ভূমি রাজস্ব, খুমস (গনিমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদের পাঁচ ভাগের এক ভাগ), জিজিয়া (অমুসলিম নাগরিকদের দেওয়া নিরাপত্তা কর), বাণিজ্য শুল্ক, প্রান্তীয় শুল্ক, লবণ কর, টাকশাল থেকে আয়, উত্তরাধিকারবিহীন সম্পত্তি এবং উপহার ও উপঢৌকন ইত্যাদি ছিল কেন্দ্রীয় রাজকোষের প্রধান আয়ের উৎস। অন্যদিকে, প্রাদেশিক আয়ের উৎস ছিল পথ কর, জল কর, যানবাহন ও বাস্তুভিটার ওপর ধার্য কর এবং গৃহপালিত পশুর ওপর করসহ নানা স্থানীয় শুল্ক ও কর।

ভূমি রাজস্ব: সামন্ততান্ত্রিক ভারতে ভূমি রাজস্ব ছিল রাষ্ট্রীয় আয়ের প্রধান উৎস। তাই শের শাহ ভূমি রাজস্ব সংস্কারে বিশেষ মনোযোগ দেন। সাসারামের জায়গিরদার থাকাকালীন তার অর্জিত অভিজ্ঞতাকে তিনি এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কাজে লাগান এবং কৃষি ও কৃষকের কল্যাণমুখী একটি ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাকে ন্যায়ানুগ করার উদ্দেশ্যে শের শাহ সযত্নে জমি জরিপের ব্যবস্থা করেন। তার আগে এ রীতি প্রচলিত না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে রায়ত অবিচারের সম্মুখীন হতেন। কাজেই শের শাহ ভূমি রাজস্ব নির্ধারণের পূর্বশর্ত হিসেবে প্রথমে সাম্রাজ্যের চাষ উপযোগী সমস্ত ভূমি পরিমাপের ব্যবস্থা করেন। ফসল বপনের সময় ভূমি জরিপ করা হতো এবং ফসল কাটার সময় শস্যের পরিমাপ করে উৎপাদিত শস্যের গড়পড়তা তিন ভাগের এক ভাগ রাজস্ব ধার্য করা হতো। অবশ্য মুলতানসহ আরও দু'একটি অঞ্চলে নির্ধারিত রাজস্বের পরিমাণ ছিল উৎপন্ন ফসলের চার ভাগের এক ভাগ। রাজস্ব নগদ অর্থ ও শস্যের মাধ্যমে পরিশোধ করা যেত।

কবুলিয়ত ও পাট্টা: শের শাহ প্রজাদের সাথে সরকারের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জমিদারি প্রথা লোপ এবং রায়তওয়ারি প্রথা প্রবর্তন করেন। ভূমি ব্যবস্থাপনায় 'কবুলিয়ত' ও 'পাট্টা' প্রথা প্রচলন তার অনবদ্য উদ্ভাবন। পাট্টা ছিল জমির স্বত্ব দলিল। জমির ওপর কৃষকের অধিকার ও স্বত্ব স্বীকার করে সরকারের পক্ষ হতে পাট্টা দেওয়া হতো। অন্যদিকে, প্রদেয় করসহ ভূমিতে কৃষকের দায় ও কর্তব্য বর্ণনা করে তারা রাষ্ট্রকে কবুলিয়ত নামে দলিল সম্পাদন করে দিতেন।

রাজস্ব আদায়: রাজস্ব নির্ধারণে শের শাহ যথাসম্ভব উদারতা দেখালেও নির্ধারিত রাজস্ব আদায়ে তিনি কঠোর মনোভাব প্রদর্শন করেন। অবশ্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা যুদ্ধের কারণে ফসল উৎপাদন ব্যাহত বা শস্যহানি হলে কৃষকদের রাজস্ব মওকুফ এমনকি রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে কৃষকদের ঋণদানেরও ব্যবস্থা ছিল। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের আপদকালীন সহযোগিতাদানের জন্য তিনি 'বীমা তহবিল' গঠন করেছিলেন। প্রত্যেক রায়তকে বিঘাপ্রতি আড়াই সের করে শস্য এ তহবিলে জমা দিতে হতো।

শুল্ক ও মুদ্রা সংস্কার: সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য শের শাহ জনমঙ্গলকর শুল্ক ও মুদ্রা নীতি প্রবর্তন করেন। শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য তিনি আন্তঃপ্রাদেশিক শুল্কসহ সকল প্রকার বেআইনি ও অবাঞ্ছিত কর রহিত করেন। কেবল সীমান্ত এবং বিক্রয় কেন্দ্রে কর ধার্যের ব্যবস্থা করা হয়। শুল্ক ব্যবস্থার পুনর্গঠনের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের সমৃদ্ধি ঘটে। ভারতীয় মুদ্রা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বিকাশে শের শাহের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। এ সময় শের শাহের সাম্রাজ্যে বিভিন্ন সুলতানের আমলে নির্মিত মুদ্রা প্রচলিত ছিল। এসব মুদ্রার মূল্যমান নির্ধারিত না থাকায় বিনিময় ব্যবস্থা ও ব্যবসা-বাণিজ্যে নানা অসুবিধা হচ্ছিল। এ অবস্থায় শের শাহ সমস্ত পুরোনো ও মিশ্রধাতু নির্মিত মুদ্রাগুলো বাতিল ঘোষণা করেন। শের শাহ 'আশরাফি' নামক স্বর্ণমুদ্রা, 'তঙ্কা' বা 'রূপাইয়া' নামক রৌপ্যমুদ্রা এবং 'দাম' নামক তাম্রমুদ্রার প্রচলন করেন। শুধু তাই নয় তিনি আধুলি, সিকি, দু' আনি ও এক আনি প্রভৃতি খুচরা মুদ্রারও প্রবর্তন করেন। এসব মুদ্রায় আরবি ভাষায় সুলতানের নাম ও উপাধি এবং টাকশালের এমনকি অনেক ক্ষেত্রে খলিফার নামও অঙ্কিত হতো।

যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা: ব্যবসা-বাণিজ্যের গতিশীলতা বৃদ্ধি, সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ সুবিধা বৃদ্ধি, সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য সেনাবাহিনীর চলাচল এবং ডাকব্যবস্থার সুবিধার জন্য শের শাহ বহু সুন্দর ও প্রশস্ত রাস্তা নির্মাণ করেছিলেন। তার নির্মিত রাস্তাসমূহের মধ্যে প্রধান ছিল 'সড়ক-ই-আযম' বা গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড'। প্রায় ১৫০০ মাইল দীর্ঘ এ রাস্তাটি পূর্ববঙ্গের সোনারগাঁ থেকে সিন্ধু নদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এছাড়াও আগ্রা থেকে বোরহানপুর, আগ্রা থেকে যোধপুর ও চিতোর এবং লাহোর থেকে মুলতান পর্যন্ত বিস্তৃত রাস্তাগুলো ছিল উল্লেখযোগ্য। সাধারণ পথিককে সূর্যের উত্তাপ থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে রাস্তার দু'ধারে ছায়াপ্রদ ও ফলদ গাছ লাগানো হয়। পথিক ও সরকারি বার্তাবাহকদের বিশ্রামের সুবিধার্থে শের শাহ দু'ক্রোশ অন্তর মুসাফিরখানা ও ধর্মশালা নির্মাণ করেন। শের শাহ প্রায় ১৭০০ মুসাফিরখানা নির্মাণ করেছিলেন বলে জানা যায়। এসব মুসাফিরখানায় হিন্দু-মুসলিম পথিকদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা ছিল।

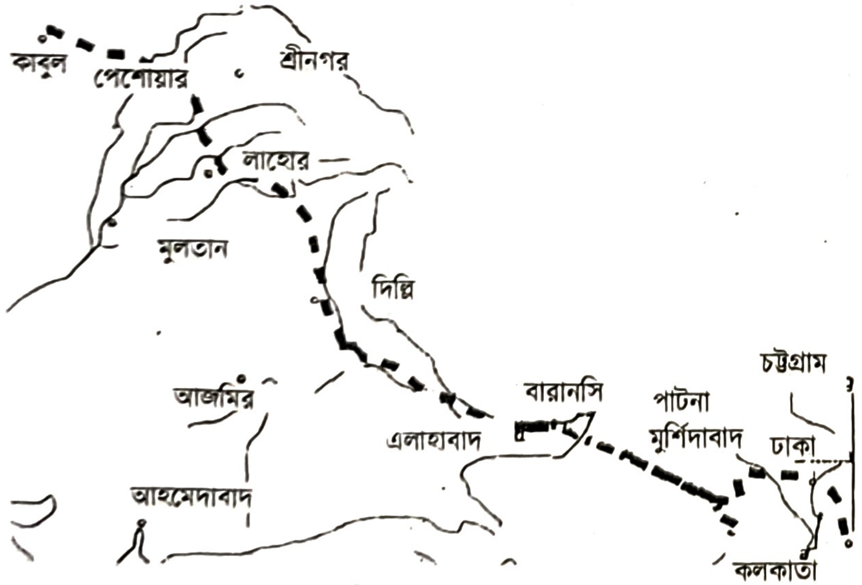

চিত্র: গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড

ডাক বিভাগ: শের শাহ ডাক ব্যবস্থারও সংস্কার করেছিলেন। রাস্তার পাশে নির্মিত মুসাফিরখানাগুলো ডাক-চৌকি বা ডাকঘর হিসেবে ব্যবহৃত হতো। দারোগা-ই-ডাকচৌকি ছিলেন ডাকচৌকির প্রধান কর্তা। দ্রুত সংবাদ সরবরাহের উদ্দেশ্যে শের শাহ ঘোড়ার ডাকের প্রচলন করেন। শের শাহ গৃহীত এসব পদক্ষেপের ফলে কেবল মানুষের যাতায়াত সুবিধাই বৃদ্ধি পায়নি সাম্রাজ্যের ব্যবসা-বাণিজ্যেও প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছিল।

সামরিক ব্যবস্থা: অস্ত্রবলে রাজবংশ প্রতিষ্ঠা এবং রাজ্যজয় করেছিলেন বলে স্বভাবতই সামরিক সংগঠনের ব্যাপারে শের শাহের বিশেষ আগ্রহ ছিল। তবে এক্ষেত্রে তিনি কোনো নতুন বা অভিনব পদ্ধতি প্রবর্তন করেননি। বরং পূর্বসূরি সুলতান আলাউদ্দিন খলজির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তার সামরিক বাহিনীকে ঢেলে সাজান। যেমন—

১. পূর্বে সামন্ত ব্যবস্থায় স্থানীয় জমিদার ও শাসকেরা প্রয়োজনের সময় সম্রাটকে সৈন্য সরবরাহ করতেন। শের শাহ এ পদ্ধতির ত্রুটি ও দুর্বলতা লক্ষ করেন এবং সেনাবাহিনীতে সামন্তপ্রথার উচ্ছেদ করে তার নিজের তত্ত্বাবধানে স্থায়ী সেনাবাহিনী গঠন করেন। দেড় লক্ষ অশ্বারোহী, পঁচিশ হাজার পদাতিক, তিনশ মতান্তরে পাঁচশ হাতি এবং গোলন্দাজ সৈন্য নিয়ে এ বাহিনী গঠিত হয়েছিল। সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সেনানিবাস স্থাপন করে এগুলোতে সৈন্য মোতায়েন করা হয়। সেনানিবাসে মোতায়েনকৃত সৈন্যদের 'ফৌজ' এবং তাদের অধিনায়ককে 'ফৌজদার' বলা হতো। সৈন্যদের জায়গিরের পরিবর্তে প্রধানত নগদে বেতন পরিশোধ করা হতো। সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ এবং শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে তার বিশেষ কড়া নজর ছিল।

২. সেনাদের দুর্নীতিরোধের উদ্দেশ্যে শের শাহ 'দাগ' বা অশ্বচিহ্নিত কর (Branding of horse) এবং 'চেরা' বা সৈন্যদের বিস্তারিত বিবরণমূলক তালিকা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন।

৩. তাছাড়া প্রতি দু'বছর অন্তর সামরিক কর্তাদের বদলির নীতি প্রবর্তন করা হয়। শের শাহের সেনাবাহিনীতে আফগান প্রাধান্য সুস্পষ্ট হলেও অন্যান্য জাতির সৈন্য ছিল। এমনকি হিন্দুদের উচ্চপদে নিয়োগের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

৪. শের শাহ নিজে একজন সুদক্ষ ও কুশলী সমরনেতা ছিলেন। সুষ্ঠুভাবে সেনা প্রশাসন পরিচালনার উদ্দেশ্যে তিনি 'দিউয়ান-ই-আরজ' নামে একটি কেন্দ্রীয় দপ্তর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

বিচার ব্যবস্থা: একজন ন্যায়বিচারক হিসেবে শের শাহ ইতিহাসে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বিচারের ব্যাপারে জাতি-ধর্ম ও ধনী-দরিদ্রের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ ছিল না। আইনের চোখে সব নাগরিকই সমান ছিল। হিন্দুদের ধর্মীয় ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত মামলাসহ গ্রামীণ দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার বিচারভার ছিল গ্রাম পঞ্চায়েতের ওপর। পরগনাতে আমীন এবং সরকারে মুনসিফ-ই-মুনসিফান দেওয়ানি মামলা এবং কাজী ও মীর-ই-আদিল ফৌজদারি মামলার বিচার করতেন। রাজধানীতে কাজী-উল-কুজ্জাত বা প্রধান কাজী ছিলেন ফৌজদারি বিচারের ভারপ্রাপ্ত। বিচার প্রশাসনের শীর্ষে ছিলেন স্বয়ং শের শাহ নিজেই। তিনি ছিলেন সব ক্ষমতার উৎস এবং সবশেষ আপিল নিষ্পত্তিকারক। শের শাহ অত্যন্ত কঠোর দণ্ডবিধি প্রবর্তন করেন। তিনি অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করে অপরাধপ্রবণতা হ্রাসের চেষ্টা করেন।

পুলিশ ও গোয়েন্দা ব্যবস্থা: আইনের শাসন বলবৎ রাখা, জননিরাপত্তা বিধান এবং আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে শের শাহ পুলিশ ও গোয়েন্দা ব্যবস্থা জোরদার করেন। তার সময়ে স্বতন্ত্র কোনো পুলিশ বিভাগ ছিল না। ঈশ্বরী প্রসাদের মতে, "শের শাহের পুলিশি ব্যবস্থা সনাতনি হলেও ছিল শক্তিশালী ও উন্নত ধরনের।" সরকারে শিকদার-ই-শিকদারান এবং পরগনায় শিকদার আইনশৃঙ্খলার রক্ষা ও জননিরাপত্তা সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করতেন। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রশ্নে শের শাহ স্থানীয় জনসাধারণকেও দায়িত্বশীল করে তোলেন। তিনি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে স্থানীয় অপরাধসমূহ নিরোধের ব্যবস্থা করেন। গ্রামপ্রধানেরা স্থানীয় অপরাধীদের খুঁজে বের করে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করতেন। এক্ষেত্রে ব্যর্থ হলে দায়িত্বশীলদেরও শাস্তির মুখোমুখি হতে হতো। শের শাহের এ নীতির সুষ্ঠু প্রয়োগের ফলে অপরাধপ্রবণতা হ্রাস পায়, শান্তি-শৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়। শের শাহ উন্নয়নের লক্ষ্যে নিয়মিত পুলিশি ব্যবস্থার বাইরে 'মুহতাসিব' নামক এক শ্রেণির কর্মকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। অসামাজিক এবং ধর্ম ও নৈতিকতাবিরোধী কার্যকলাপ রোধে মুহতাসিব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতেন।

সরকারি কর্মচারীদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ এবং সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে অবগতির উদ্দেশ্যে শের শাহ একটি শক্তিশালী গোয়েন্দা বাহিনী গড়ে তোলেন। এ বিভাগে কর্মরত বার্তালেখক ও বার্তা বাহকসহ কর্মচারীদের মাধ্যমে শের শাহ সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ ও গোপন তৎপরতা সম্পর্কে অবহিত হতেন। ফলে সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়ানো সম্ভব হতো।

শের শাহ গৃহীত এসব পদক্ষেপের ফলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির এত উন্নতি সাধিত হয়েছিল যে রাতের অন্ধকারে সোনার মোহরভরা থলি নিয়ে পথচারীরা নির্বিঘ্নে রাস্তাঘাটে যাতায়াত করতে পারত।

শিক্ষা ব্যবস্থা: শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে শের শাহ নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল মসজিদ ও মক্তবভিত্তিক। এখানে ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়াও আরবি ও ফারসি ভাষা শেখার ব্যবস্থা ছিল। উচ্চ শিক্ষার জন্য সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে মাদ্রাসা স্থাপন করা হয়। এসব প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ব্যয় নির্বাহের জন্য ওয়াকফ সম্পত্তি বরাদ্দ দেওয়া হয়। হিন্দুদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা হয় এবং এর ব্যয় নির্বাহের জন্য লাখেরাজ সম্পত্তি প্রদান করা হয়।

শিল্প ও স্থাপত্য: ভারতের মুসলিম স্থাপত্যকলার বিকাশেও শের শাহের বিশেষ অবদান রয়েছে। শের শাহের আমলের স্থাপত্য নিদর্শনসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় হচ্ছে বিহারের সাসারামে নির্মিত তার সমাধিসৌধ। ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ ভিনসেন্ট স্মিথ ও হ্যাভেল এবং স্থাপত্য বিশেষজ্ঞ ফারগুসান (James Fergusson) ও ভারতীয় স্থাপত্যিক পার্সি ব্রাউন (Percy Brown) সমাধিসৌধটির নির্মাণশৈলী ও ছন্দোময় কারুকার্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ফারগুসান একে ভারতবর্ষের চমৎকার ও সুপরিকল্পিত ইমারতগুলোর অন্যতম বলে আখ্যায়িত করেছেন। শুরি স্থাপত্যে ঐতিহ্য বহনকারী নিদর্শনগুলোর মধ্যে আরও আছে রাজধানীর পুরান কিল্লা এবং এখানে নির্মিত কি লা-ই-কুহনা মসজিদ, রোটাস দুর্গ ইত্যাদি।

ধর্মীয় ব্যবস্থা: অধ্যাপক রাম শর্মা শের শাহকে তার আগের তুর্কি-আফগানদের মতো গোঁড়া ধর্ম অনুসারী বলে আখ্যায়িত করেছেন। তবে ড. কানুনগো, আর পি. ত্রিপাঠি, কে. এ. নিজামী, ঈশ্বরী প্রসাদ প্রমুখ শের শাহকে উদার ও ধর্মসহিষ্ণু হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। শের শাহ একজন নিষ্ঠাবান সুন্নি মুসলমান ছিলেন। তবে তার মধ্যে ধর্মীয় সংকীর্ণতা ছিল না। যুদ্ধের সময় বা বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া তার হিন্দু মূর্তি বা মন্দির ধ্বংসের কোনো প্রমাণ নেই। বরং তার কাজে হিন্দুদের প্রতি উদারতার প্রমাণ মেলে। তিনি সেনাপতি ব্রহ্মজিত গৌড় ও রামসিংহকে উচ্চ রাজপদে নিয়োগ দেন, যা হিন্দুসমাজের প্রতি তার উদার মনোভাবেরই পরিচায়ক। সর্বোপরি শের শাহ ধর্মকে রাজনীতি থেকে পৃথক করেন। ধর্মনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা অর্জন করেন।

জনকল্যাণমূলক কাজ: শের শাহ একজন জনহিতৈষী ও প্রজারঞ্জক শাসক ছিলেন। তিনি দুস্থ ও অসহায়দের মুক্ত হস্তে দান করতেন। তিনি সাধু-সন্ন্যাসীদের নিয়মিত ভাতা ও লাখেরাজ ভূমি মঞ্জুরির মাধ্যমে তাদের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করেছিলেন। দুস্থদের জন্য সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অনেক লঙ্গারখানা স্থাপন করা হয়েছিল। পথিকদের সুবিধার্থে তিনি রাস্তার পাশে বহু সরাইখানা নির্মাণ করেছিলেন। ড. কানুনগো বলেন, "সরাইখানাগুলো সাম্রাজ্যের নিষ্ক্রিয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রাণ সঞ্চারকারীর শিরার মতো কাজ করে।"

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. শাসনকাজ পরিচালনায় শের শাহ কার অগ্রদূত ছিলেন?
২. শের শাহ তার সাম্রাজ্যকে কয়টি প্রশাসনিক ইউনিটে ভাগ করেন?
৩. শের শাহের আঞ্চলিক শাসন ব্যবস্থার সর্বনিম্ন ইউনিট কী ছিল?
৪. কোন বিষয়ে শের শাহ মৌলিক প্রতিভা ও দক্ষতার পরিচয় দেন? *[সকল বোর্ড ২০১৭]*
৫. ভূমি ব্যবস্থাপনায় 'কবুলিয়ত' ও 'পাট্টা' প্রথা উদ্ভাবন করেন কে?
৬. 'সড়ক-ই-আযম' বা 'গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড' নির্মাণ করেন কে?

উত্তরের জন্য ২৪৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. শের শাহের কেন্দ্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থায় যেসব দপ্তর ছিল তার একটি চার্ট তৈরি করো।
২. শের শাহের প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার ভাগগুলোর একটি তালিকা তৈরি করো।

গ. দলীয় কাজ

শের শাহ একজন জনকল্যাণধর্মী শাসক— কয়েকজন শিক্ষার্থী মিলে বিষয়টি যৌক্তিকভাবে প্রমাণ করো।

পাঠ ৯

শের শাহের চরিত্র ও কৃতিত্ব
Character and Achievements of Sher Shah

শের শাহ মধ্য যুগে ভারতের শ্রেষ্ঠ শাসকদের অন্যতম ছিলেন। তার মতো বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এবং অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শাসক মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাসে বিরল। শের শাহ নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নিজ প্রতিভা, অধ্যবসায় ও পরিশ্রম দ্বারা সামান্য অবস্থা থেকে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং শুরি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ইতিহাসে অমর স্থান লাভ করেন।

অসাধারণ ব্যক্তিত্ব: মানুষ হিসেবে শের শাহ ছিলেন অসাধারণ। তার চরিত্রে বহু আকর্ষণীয় গুণের অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল। শৈশবে অনাদর-অবহেলায় বেড়ে ওঠা শের শাহ ছিলেন অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী। তার তীক্ষ্ণ মেধা, অপরিমিত সাহস, আত্মবিশ্বাস, বিচক্ষণতা ও মহানুভবতা ইতিহাসে তাকে উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করেছে। শের শাহ উচ্চাভিলাষী ছিলেন। লক্ষ্য অর্জনে তার দৃঢ়চিত্ততা সামান্য জায়গিরদার থেকে তাকে দিল্লির অধিপতিতে পরিণত করেছিল। ব্যক্তিজীবনে শের শাহ একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। তিনি মদপান, ব্যভিচারসহ ও নৈতিকতাবিরোধী কাজকে ঘৃণা করতেন। তিনি নামাজ-রোজাসহ শরিয়ত অনুসরণ করতেন। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ধার্মিকদের প্রতিও তার বিশেষ সহানুভূতি ছিল। শের শাহ ইসলাম ধর্মের অনুসারী হলেও পরধর্ম বিদ্বেষী ছিলেন না। তিনি অন্যধর্মের প্রতি উদার ও সহিষ্ণু ছিলেন।

সমরনায়ক: সমরনায়ক হিসেবে শের শাহ প্রশংসনীয় কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন। সামরিক দক্ষতায় তিনি নিঃসন্দেহে আফগানদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় প্রতিভাবান ছিলেন। একজন সৈনিক ও যোদ্ধা হিসেবে তিনি বিভিন্ন যুদ্ধ-বিগ্রহে অসাধারণ বীরত্ব ও সমরনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। মুঘলদের বিরুদ্ধে চৌসা ও বিলগ্রামের যুদ্ধে সফলতা তার সামরিক কৃতিত্বের যথার্থ প্রমাণ। তাছাড়া বাংলা, মালব, বুন্দেলখণ্ড ও রাজপুতনায় অভিযান তার সমরপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। নেতৃত্বে সম্মোহনী শক্তি বলে তিনি অধীন সৈন্যদের ওপর প্রভাব বিস্তারে সক্ষম ছিলেন। যুদ্ধ ব্যবস্থাপনা ও সৈন্য পরিচালনায় তিনি মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দেন। একজন সফল সামরিক নেতা হিসেবে রণচাতুর্য, যুদ্ধক্ষেত্রে বুহ্য নির্মাণ কৌশল এবং সমর-কূটকৌশল প্রয়োগের জন্য তিনি ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন।

শাসক ও রাজনীতিবিদ: একজন শাসক ও রাজনীতিবিদ হিসেবেও শের শাহ অনন্য কৃতিত্বের অধিকারী। শের শাহ সামান্য অবস্থা থেকে শুধু একটি রাজবংশই প্রতিষ্ঠা করেননি, মাত্র পাঁচ বছরের শাসনকালে নিজ যোগ্যতা বলে তিনি এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হতে সক্ষম হয়েছিলেন। একজন দূরদর্শী রাজনীতিবিদ হিসেবে শের শাহ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে জনগণের সদিচ্ছা ও সহযোগিতার ওপর ভিত্তি করে একটি শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। শের শাহ ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় শাসনপ্রণালির শ্রেষ্ঠ নীতিগুলো গ্রহণ করে একটি যুগোপযোগী ও যুক্তিসংগত শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলেন। এক্ষেত্রে তিনি যে প্রতিভা ও দক্ষতার পরিচয় দেন তা নিঃসন্দেহে উচ্চ প্রশংসার দাবিদার। শের শাহের প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য স্বৈরতান্ত্রিক হলেও তা স্বেচ্ছাচারী ছিল না। তিনি একটি প্রজাকল্যাণকামী শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলেন। সাম্রাজ্যের সংহতি বিধানের উদ্দেশ্যে শের শাহ একটি সুনিয়ন্ত্রিত ও শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন নিশ্চিত করেন। সুষ্ঠুভাবে রাজকার্য পরিচালনার জন্য তিনি প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে প্রাদেশিক ও স্থানীয় শাসনব্যবস্থা বিন্যস্ত করেন। অর্থ ও রাজস্ব প্রশাসন পুনর্গঠনে শের শাহ যথেষ্ট মৌলিকত্বের পরিচয় দেন। তার ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা ছিল বিজ্ঞানসম্মত ও জনকল্যাণকামী। পরবর্তীকালে মুঘল সম্রাট আকবর তার ভূমি রাজস্ব নীতি অনুসরণ করেন। প্রজাসাধারণের অর্থনৈতিক জীবনমানের উন্নয়নের লক্ষ্যে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিকাশ শুল্ক ও মুদ্রাব্যবস্থার সংস্কার, জননিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থার উন্নয়ন, বিচার ব্যবস্থার সংস্কার, যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, অসহায় দুস্থদের সাহায্যদান ও লঙ্গরখানা স্থাপন, ধর্মবেত্তা ও সাধু-সন্ন্যাসীদের ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা ইত্যাদি শের শাহের শাসন দক্ষতার পরিচয় বহন করে। ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মানুরাগী হলেও প্রশাসনিক নীতি ব্যবস্থাপনায় শের শাহ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমদর্শী ছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, সকল শ্রেণির জনসাধারণের সদিচ্ছা ও সমর্থনের ওপরই তার সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। তাই হিন্দু-মুসলিম সব সম্প্রদায়কে তিনি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন।

ইতিহাসে শের শাহের স্থান: ঈশ্বরী প্রসাদের মতে, "শের শাহ ইতিহাসে উচ্চাসন লাভের দাবিদার।"[১৩] ড. কানুনগোও এরূপ মত পোষণ করেন। তার ভাষায়, "শের শাহ বিশ্ব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ পুরুষদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।" বস্তুত প্রশাসনিক ও সামরিক দক্ষতা এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে শের শাহ মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের ইতিহাসে অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব

---

[১৩] Shershah deserves a high place in history. Ref. Ishwari Prasad, *A Short History of Muslim Rule in India*.

হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, "প্রকৃতপক্ষে শের শাহের কীর্তিসমূহ তাকে মধ্যযুগের ইতিহাসে সম্মুখভাগে আসন দান করেছে।"[১৪] শের শাহ ভারতে একটি জাতীয় রাষ্ট্রগঠনের প্রয়োজনীয় সব গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি বিভিন্ন উপায়ে সম্রাট আকবরের গৌরবময় রাজত্বের ভিত্তি স্থাপন করে গিয়েছেন। যে সমস্ত পরিকল্পনার ওপর আকবরের মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় তার অধিকাংশেরই উদ্ভাবক শের শাহ। তিনি ছিলেন আকবরের পথপ্রদর্শক। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, শাসন দক্ষতা ও নানামুখী চারিত্রিক গুণাবলি ইতিহাসে শের শাহকে স্বর্ণ সিংহাসনে আসীন করেছে। ভি এ স্মিথের মতে, "শের শাহ যদি আরও কিছুকাল বেঁচে থাকতেন, তাহলে তিনি তার বংশকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতেন এবং ইতিহাসের পাতায় হয়তো মহান মুঘল সম্রাটদের আর আবির্ভাব ঘটত না।"[১৫]

শের শাহের উত্তরসূরি শুর শাসকবৃন্দ ও মুঘলদের পুনরুত্থান: শের শাহের মৃত্যুর পর তার দ্বিতীয় পুত্র জালাল খান 'ইসলাম শাহ' উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি 'সলিম শাহ' নামেও পরিচিত ছিলেন। তার শাসনকাল ছিল ১৫৪৫–১৫৫৩ খ্রি. পর্যন্ত। ইসলাম শাহ ছিলেন একজন বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও দৃঢ়চিত্তের অধিকারী শাসক। তিনি খোক্কার উপজাতিদের বিদ্রোহ দমন করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। অবশ্য আফগান অভিজাতদের প্রতি তার উদ্ধত আচরণ, স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাব, তাদের মর্যাদাহানি এবং তাদেরকে আজ্ঞাবহ কর্মচারীতে রূপান্তরের প্রচেষ্টা ইত্যাদি নীতির কারণে সাম্রাজ্যে রাজদ্রোহ ও বিপ্লবের পরিস্থিতি তৈরি হয়। আর পরবর্তীকালে তা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে শুর রাজবংশের ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয়।

ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর তার অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র ফিরোজকে শুর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা হয়। কিন্তু মাত্র তিন দিন পরেই ফিরোজ শের শাহের ভ্রাতুষ্পুত্র মুবারিজ খান কর্তৃক নিহত হন। এরপর মুবারিজ খান 'মুহাম্মদ আদিল শাহ' নাম নিয়ে শুর সিংহাসনে আরোহণ করেন। আদিল শাহ একজন অকর্মণ্য ও দুর্বল শাসক ছিলেন। তার সাথে সাম্রাজ্যের অভিজাতদের দূরত্ব আরও বৃদ্ধি পায় এবং বিহার ও জৈনপুরে মহাম্মদ শাহ আদালি, দোয়াব অঞ্চলে ইব্রাহিম শুর, পাঞ্জাবে আহমদ শুর, বাংলায় মহাম্মদ খান এবং মালবের দৌলত খান প্রমুখ স্বাধিকার প্রশ্নে আদিল শাহের সাথে সংঘাতে জড়িয়ে পড়েন। এদের মধ্যে ইব্রাহিম শুর 'সিকান্দার শাহ' নাম ধারণ করে দিল্লি ও আগ্রা জয় করেন। এ অবস্থায় আদিল শাহ চুনারে পালিয়ে যান।

আফগান অভিজাতদের মধ্যকার উল্লিখিত দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পটভূমিতে রাজ্যহারা মুঘল সম্রাট হুমায়ুন পুনরায় ভারত আক্রমণ করেন। ১৫৫৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ ফেব্রুয়ারি হুমায়ুন লাহোর অধিকার করেন। একই বছর মাচিওয়ার ও সরহিন্দের যুদ্ধে আফগানদের পরাজিত করে তিনি দিল্লির সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ভারতে শের শাহের প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ কী নামে পরিচিত?
২. আফগানদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় প্রতিভাবান ছিলেন কে?
৩. শের শাহ কোন যুগের শাসনপ্রণালির শ্রেষ্ঠ নীতিগুলো গ্রহণ করেন?
৪. মুঘল সম্রাট আকবর কার ভূমি রাজস্বনীতি অনুসরণ করেন?
৫. শের শাহের মৃত্যুর পর কে সিংহাসনে আরোহণ করেন?
৬. হুমায়ুন কোন যুদ্ধে আফগানদের পরাজিত করে দিল্লির সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেন?

উত্তরের জন্য ২৪৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. শের শাহের চরিত্রের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো চিহ্নিত করে একটি চার্ট তৈরি করো।
২. শের শাহের প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো ছক আকারে লেখো।

---

[১৪] Indeed Shershah's achievements place him in the forefront of mediaeval history.– Ref. Ishwari Prasad

[১৫] If Shershah has been spared he would have established his dynasty and the great Mughals would not have appeared on the stage of history.– Ref. V. A Smith, *Oxford History of India.*

পাঠ ১০ ও ১১

সম্রাট আকবর: প্রাথমিক জীবন ও রাজ্য বিজয় (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রি.)
Emperor Akbar: Early Life and Conquests (1556–1605 AD)

প্রাথমিক জীবন (Early Life)

'মহামতি' (The Great) সম্রাট আকবর ভারতের মুঘল সম্রাটদের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি সম্রাট হুমায়ুন ও হামিদা বানু দম্পতির সন্তান। আকবর ১৫৪২ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ নভেম্বর সিন্ধুর অমরকোটে জন্মগ্রহণ করেন। আকবরের জন্মের এক বছর পরেই হুমায়ুনকে স্ত্রী হামিদা বানুসহ আশ্রয়ের সন্ধানে পারস্যে পালিয়ে যেতে হয়। আর তখন তাদের শিশুপুত্র আকবর কান্দাহারে চাচা কামরানের জিম্মায় জওহর, শামসুদ্দিন খান, বিবি আনগা ও মাহম আনগার তত্ত্বাবধানে পিতা-মাতার স্নেহবঞ্চিত অবস্থায় লালিত-পালিত হতে থাকেন। অবশ্য তিন বছর পর কামরানকে পরাজিত করে হুমায়ুন কান্দাহার দখল করে নিলে শিশু আকবর পিতা-মাতার স্নেহছায়া লাভ করেন। বিদ্যানুরাগী হুমায়ুন পুত্র আকবরের পড়াশুনার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করেন। তবে প্রথাগত বিদ্যার্জনের প্রতি আকবরের কোনো আগ্রহ ছিল না। শৈশবে পড়াশুনার বদলে অতি অল্প সময়ে তিনি মল্লযুদ্ধ, অশ্ব ও অস্ত্র চালনায় বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। শিকার ও খেলাধুলার প্রতিও তার বিশেষ ঝোঁক ছিল। ১৫৫১ খ্রিষ্টাব্দে নয় বছর বয়সে আকবরের সাথে চাচা হিন্দালের মেয়ের বিয়ে দেওয়া হয়। হুমায়ুন যখন তার সিংহাসন পুনরুদ্ধারে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত তখন বালক আকবর তার সাথে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশ নিয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দেন। দিল্লির সিংহাসন পুনরুদ্ধারের পর পরই সম্রাট হুমায়ুন ১৫৫৫ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তবে মৃত্যুর আগেই তিনি পুত্র আকবরকে তার উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন এবং বিশ্বস্ত অনুচর বৈরাম খানের তত্ত্বাবধানে আকবরকে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

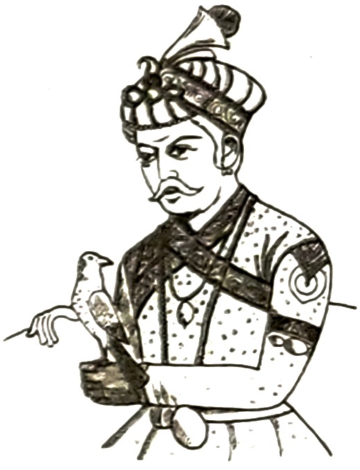
জালালউদ্দিন মুহাম্মদ আকবর

সিংহাসনে আরোহণ: পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার কালানৌরে সিকান্দার শুরের সাথে যুদ্ধরত অবস্থায় আকবর তার পিতা সম্রাট হুমায়ুনের মৃত্যু সংবাদ জানতে পারেন। মুঘল সিংহাসনের শূন্যতা পূরণের উদ্দেশ্যে বৈরাম খান তখনই কালানৌরের উদ্যানে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে আকবরকে দিল্লির মুঘল সম্রাট হিসেবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন। ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি আকবর 'জালালউদ্দিন মুহাম্মদ আকবর' উপাধি নিয়ে মুঘল সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। তার বয়স তখন মাত্র ১৩ বছর। সমস্যাসংকুল মুঘল সাম্রাজ্য পরিচালনা অপ্রাপ্ত বয়স্ক আকবরের পক্ষে দুরূহ হবে বলে অভিজ্ঞ তুর্কি যোদ্ধা বৈরাম খানকে তার অভিভাবক নিয়োগ করা হয়। ১৫৬০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত আকবর বৈরাম খানের অভিভাবকত্বে রাজ্য শাসন করেন।

আকবরের সিংহাসনে আরোহণের সময় ভারতের সার্বিক অবস্থা
The Overall Conditions of India During the Ascend Throne of Akbar

আকবরের সিংহাসনে আরোহণের সময় ভারতে এক জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। এ সময় পাঞ্জাবে সিকান্দার শুর, সাম্রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে আদিল শাহ শুর শক্তি সঞ্চয় করে ভারত থেকে পুনরায় মুঘল কর্তৃত্ব ধ্বংস করতে তৎপর ছিলেন। এর বাইরে আকবরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কাবুলের শাসনকর্তা মির্জা হাকিমও ভারতে মুঘল সিংহাসন অধিকারের স্বপ্নে বিভোর ছিলেন। মেবার, বুন্দি, যোধপুর, সিন্ধু, মুলতান, গুজরাট এবং মালব ইত্যাদি রাজ্যগুলো ছিল দিল্লির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ মুক্ত। দাক্ষিণাত্যে আহমদনগর, বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, বিদর, বেরার এবং বিজয় নগর ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র। কোচিন, গোয়া ও দিউ ছিল পর্তুগিজদের নিয়ন্ত্রণে। মুঘল কর্তৃত্ব কেবল দিল্লি ও আগ্রার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থাও ছিল শোচনীয়। এ সময় দুর্ভিক্ষ ও প্লেগ রোগ ছড়িয়ে পড়ায় উত্তর ভারতে এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে অভিজাতবর্গ আকবরকে ভারত ত্যাগ করে কাবুলে চলে যাওয়ার পরামর্শ দেন। একমাত্র বৈরাম খানই তাকে সাহসের সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে অনুরোধ করেন। আকবর তার অভিভাবক বৈরাম খানের পরামর্শ গ্রহণ করে তার সহায়তায় পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

সম্রাট আকবরের রাজ্য বিজয় (Conquests of Emperor Akbar)

মধ্যযুগের ভারতীয় শাসকদের মধ্যে সাম্রাজ্য সংগঠক ও বিজেতা হিসেবে সম্রাট আকবর অনন্য স্থান দখল করে আছেন। ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, "সহজাতভাবে আকবর একজন শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন এবং নিজেকে ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার ইচ্ছা পোষণ করতেন।"[১৬] তার সিংহাসনে আরোহণের সময় মুঘল সাম্রাজ্যের সীমা পাঞ্জাব, দিল্লি ও আগ্রার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বৈরাম খানের মাধ্যমে গোয়ালিয়র, আজমির ও জৈনপুরে মুঘল কর্তৃত্ব সম্প্রসারিত হয় এবং মালবেও কিছুটা সাফল্য আসে এবং এভাবে তিনি ১৫৬১-১৬০১ খ্রি. পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৪০ বছরে হিমালয় থেকে কৃষ্ণা নদী এবং হিন্দুকুশ থেকে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ (১৫৫৬ খ্রি.) [The Second Battle of Panipat (1556 AD)]

মুঘল-আফগান দ্বন্দ্বের প্রেক্ষাপটে ভারতে নিজের অবস্থানকে সুসংহত করার জন্য আকবর দিল্লি-আগ্রা জয় করতে অগ্রসর হন। এ সময় তিনি শক্তিশালী আফগান শত্রু হিমুর মুখোমুখি হন। হিমু ছিলেন শুর সুলতান আদিল শাহ শুরের প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপতি। ঈশ্বরী প্রসাদ মনে করেন, "সমগ্র হিন্দুস্তানে আকবরের প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে শৌর্য, উদ্যম ও সাহসিকতায় হিমুর সমকক্ষ আর কেউ ছিলেন না।" হুমায়ুনের মৃত্যুকালে হিমু চুনার দুর্গে ছিলেন। হুমায়ুনের মৃত্যুর পর উত্তর ভারতে হিন্দু আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দিল্লি ও আগ্রার মুঘল শাসনকর্তা তরজী বেগের বিরুদ্ধে অভিযান চালান। তরজী বেগ পরাজিত হন এবং হিমু দিল্লি-আগ্রা জয় করেন। 'বিক্রমজিৎ' বা 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি নিয়ে হিমু নিজেকে স্বাধীন রাজ হিসেবে ঘোষণা করেন। হিমুর সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে লক্ষাধিক তুর্কি-আফগান ও রাজপুত সৈন্য হিমুর পতাকাতলে সমবেত হয়। এতে উৎসাহিত হয়ে হিমু মুঘল বাহিনীকে পরাস্ত করার উদ্দেশ্যে পূর্ণোদ্যমে অগ্রসর হন। অন্যদিকে, আকবরও দিল্লি পুনরাধিকারে দৃঢ়সংকল্প হন। সুতরাং উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। বৈরাম খান মুঘল বাহিনীর অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন। তিনি মুঘল সৈন্যদের একত্রিত করে ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ৫ নভেম্বর পানিপথের বিখ্যাত রণক্ষেত্রে হিমুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন। বৈরাম খান ও আকবরের নেতৃত্বাধীন ২০,০০০ সৈন্যের মুঘল বাহিনী হিমুর লক্ষাধিক সৈন্যের বিশাল বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। যুদ্ধরত হিমুর চোখে একটি তীর বিদ্ধ হওয়ায় তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন এবং অচেতন অবস্থায় তাকে বন্দি ও পরে হত্যা করা হয়। পানিপথে এ ভাগ্য নির্ধারণকারী দ্বিতীয় যুদ্ধটি অনুষ্ঠিত হওয়ায় এ যুদ্ধটি 'পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ' নামে খ্যাত।

পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধের গুরুত্ব ও তাৎপর্য: ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। মুঘলদের জন্য এ যুদ্ধ ছিল একটি মীমাংসাত্মক যুদ্ধ। ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে ভারতে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় মুঘল-আফগান দ্বন্দ্বের যে সূচনা হয়েছিল ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দের পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধের মাধ্যমে তার পরিসমাপ্তি ঘটে। এ যুদ্ধে জয়লাভের ফলে মুঘলরা পুনরায় ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে ফিরে আসে।

মুঘল-আফগান দ্বন্দ্বের অবসান: পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধের পর আকবর পাঞ্জাবে গোলযোগকারী সিকান্দার শুরের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। মানকোট দুর্গে আট মাস অবরুদ্ধ থাকার পর সিকান্দার শুর মুঘল বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেন। আকবরের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী শুর সুলতান আদিল শাহ শুর ১৫৫৭ খ্রিষ্টাব্দে মুঙ্গেরে বাংলার শাসনকর্তা কর্তৃক নিহত হন। অপর প্রতিদ্বন্দ্বী ইব্রাহিম শুর বিরোধিতা ত্যাগ করে উড়িষ্যায় আশ্রয় নেন এবং বছর দশেক পরে তিনি নিহত হলে শের শাহ প্রতিষ্ঠিত শুর বংশের পতন ঘটে এবং মুঘল-আফগান দ্বন্দ্বের অবসান হয়।

মালব ও গণ্ডোয়ানা অধিকার: সম্রাট আকবর আদম খানের নেতৃত্বে ১৫৬১ খ্রিষ্টাব্দে মালব অধিকার করেন। পরবর্তী সময়ে রাজা রাজবাহাদুর আকবরের বশ্যতা স্বীকার করলে সম্রাট তাকে মনসবদার নিয়োগ দেন। এরই ধারাবাহিকতায় সম্রাট ১৫৬৪ খ্রিষ্টাব্দে আসফ খানের মাধ্যমে মধ্য ভারতের গণ্ডোয়ানা আক্রমণ করে গণ্ডোয়ানার চান্দেলা বংশীয় রাজা বীর নারায়ণের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন। রাজমাতা দুর্গাবতী বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেও মুঘল আক্রমণ প্রতিরোধে ব্যর্থ হন এবং রাজা বীর নারায়ণ যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। ফলে গণ্ডোয়ানা মুঘল রাজ্যভুক্ত হয়।

---

[১৬] Akbar was a man of strong imperial instincts and wished to make himself the supreme ruler of Hindustan. -*A Short History of Muslim Rule in India. P.232*

রাজপুতনা অভিযান: ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তারের পথে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল রাজপুত শক্তি। একজন বিচক্ষণ ও দূরদর্শী রাজনীতিবিদ হিসেবে আকবর রাজপুতদের নিয়ন্ত্রণে তাদের প্রতি সৌহার্দ্যপূর্ণ মিত্রতার নীতি গ্রহণ করেন। তার মৈত্রী নীতিতে আকৃষ্ট হয়ে অম্বরের (জয়পুর) রাজা বিহারীমল ১৫৬২ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট আকবরের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ ও বশ্যতা স্বীকার করেন এবং কন্যা যোধবাঈকে সম্রাটের সাথে বিয়ে দেন। বিহারীমল, তার পুত্র ভগবান দাস এবং পৌত্র মানসিংহ মুঘল সেনাবাহিনীতে উচ্চপদ ও মনসব লাভ করেন। এরপর সম্রাট আকবর তার আপসমূলক মৈত্রীনীতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে যে সব রাজপুত রাজা তার বশ্যতা স্বীকার করেননি তাদের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

চিতোর অভিযান: রাজপুতনার সবচেয়ে শক্তিশালী রাজ্য ছিল মেবার। এ রাজ্যের রাজা উদয় সিংহ সম্রাট আকবরের বশ্যতা স্বীকারে অস্বীকৃতি জানিয়ে মালবের পলাতক রাজা রাজবাহাদুরকে আশ্রয়দান এবং আকবরের প্রতিদ্বন্দ্বী ও বৈমাত্রেয় ভাই মির্জা হাকিমকে সাহায্য প্রদান করেন। ঐতিহাসিক আবুল ফজলের মতে, উদয় সিংহ ছিলেন উদ্ধত স্বভাবের। তার ঔদ্ধত্য ও শৌর্যবীর্যের গরিমা ধ্বংসের জন্য আকবর ১৫৬৮ খ্রিষ্টাব্দে মেবারের রাজধানী চিতোর আক্রমণ করলে রানা উদয় সিংহ পালিয়ে গিয়ে পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নেয়। তার দুই বীর সেনাপতি জয়মল ও পাট্টা প্রায় চার মাস ধরে মুঘল বাহিনীকে প্রতিহত করে রেখেছিল। অবশেষে তারা পরাজিত হন, বহু রাজপুত সৈন্য নিহত হয় এবং বহু রাজপুত নারী জওহর ব্রত পালন করে। চিতোর বিজয় অনেক রাজপুত রাজার মনে ভীতির সঞ্চার করে। ফলে বিকানীর রাজা কল্যাণমল ও তার পুত্র রাই সিংহ এবং রাজা রাওয়াল হর রায়সহ মাতোয়ার, বুন্দি, সিরোহী প্রভৃতি রাজপুত রাজ্যের রাজারা স্বেচ্ছায় সম্রাট আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন।

রণথম্ভোর বিজয়: রাজপুতনার অন্যতম দুর্ভেদ্য রাজ্য রণথম্ভোরের রাজা ছিলেন চৌহান বংশীয় সুরজন হর। সম্রাট আকবর নিজে ১৫৬৮ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে রণথম্ভোর আক্রমণ করেন। রাজা সুরজন হর মুঘল আক্রমণ প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়ে ১৫৬৯ খ্রিষ্টাব্দে একটি সন্ধি চুক্তির মাধ্যমে আত্মসমর্পণ করলে সম্রাট তাকে ক্ষমা করে দিয়ে বারানসী ও চুনারের শাসনকর্তা নিয়োগ দিয়ে দু'হাজার মনসব দান করেন।

কালিঞ্জর অধিকার: কালিঞ্জর ছিল বুন্দেলখণ্ডের একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ। এ দুর্গের অধিপতি ছিলেন রাজা রামচন্দ্র। সম্রাটের নির্দেশে সেনাপতি মজনু খান কালিঞ্জর অবরোধ করলে রাজা রামচন্দ্র ১৫৬৯ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে আত্মসমর্পণ করেন।

রানা প্রতাপ সিংহের বিরুদ্ধে অভিযান: মেবারের রানা উদয় সিংহের মৃত্যুর পর তার পুত্র প্রতাপ সিংহ রাজ সিংহাসন লাভ করেন। রানা প্রতাপ সিংহ অসম সাহসের সাথে মুঘল রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ঘোষণা দেন। মানসিংহ ও আসফ খানের নেতৃত্বে মুঘল বাহিনী প্রতাপ সিংহের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়। ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে গোলকুণ্ডার কাছে হলদিঘাটের প্রান্তরে উভয়পক্ষ শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। যুদ্ধে রাজপুত বাহিনী পরাজিত হলে রানা প্রতাপ সিংহ পালিয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নেন। তবে পরবর্তী সময়ে সম্রাট আকবরের ব্যস্ততার সুযোগে তিনি বেশকিছু অঞ্চল পুনরুদ্ধার করলেও ১৫৯৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রতাপ সিংহের মৃত্যু হলে সে ধারা ব্যাহত হয়।

গুজরাট বিজয়: বন্দরসমৃদ্ধ গুজরাট ছিল তৎকালীন ভারতের একটি সম্পদশালী রাজ্য। কে. কে. দত্ত বলেন, "উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী বন্দর থাকায় গুজরাটের একটি আকর্ষণীয় বাণিজ্যিক অবস্থান ও বিশেষ অর্থনৈতিক গুরুত্ব ছিল।"[১৭] গুজরাটের আর্থিক সমৃদ্ধি এবং এর গোলযোগপূর্ণ অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্রাট আকবরকে গুজরাট বিজয়ে বিশেষভাবে উৎসাহিত করে। গুজরাটের সুলতান তৃতীয় মুজাফফর শাহের দুর্বলতার সুযোগে তার মন্ত্রী ইতিমাদ খান সম্রাট আকবরকে গুজরাট আক্রমণের আমন্ত্রণ জানান। এমতাবস্থায় মালব ও রাজপুতনা অধিকারের পর সম্রাট আকবর ১৫৭২ খ্রিষ্টাব্দে গুজরাট অভিযানে অগ্রসর হন। সুলতান মুজাফফর শাহ আকবরের বশ্যতা স্বীকার করলে রাজধানী আহমদাবাদ মুঘলদের অধিকারে আসে। সম্রাট তার প্রতিদ্বন্দ্বী বিদ্রোহী মির্জাদের পরাজিত করে ১৫৭৩ খ্রিষ্টাব্দে সুরাট দখল করেন। অতঃপর খান-ই-আজম আজিজ কোকাকে আহমেদাবাদের শাসনকর্তা নিয়োগ করে সম্রাট রাজধানী ফতেহপুর সিক্রিতে ফিরে যান। আকবরের রাজধানীতে ফেরার পর গুজরাটের বিদ্রোহী ও পলাতক আমিররা সুরাট, ব্রোচ, ক্যাম্বে ও আহমেদাবাদ পুনর্দখল করে। এ সংবাদ শুনে সম্রাট আকবর পুনরায় গুজরাট আসেন এবং বিদ্রোহীদের পরাজিত করে রাজা টোডরমলকে সুবেদার নিয়োগ করেন।

---

[১৭] Ref. *An Advanced History of India, p.444*

গুজরাট বিজয়ের গুরুত্ব: গুজরাট বিজয়ের ফলে সমুদ্র এবং পশ্চিম উপকূলের সমৃদ্ধিশালী বন্দরগুলোর ওপর মুঘলদের অবাধ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। মুঘলরা ইউরোপীয় পর্তুগিজ শক্তির সংস্পর্শে আসে। সমুদ্র উপকূল অধিকৃত হওয়ায় মুঘলরা নৌবাহিনী গঠনের সুযোগ লাভ করে। গুজরাট বিজয়ের ফলে মুঘলদের সামনে দাক্ষিণাত্যের দ্বার উন্মুক্ত হয়। সর্বোপরি গুজরাট ছিল মুসলমানদের মক্কায় তীর্থযাত্রার পথ। গুজরাট বিজয়ের ফলে নিরাপদে মক্কায় হজব্রত পালনের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

জেনে রাখো

ইউরোপীয় দেশ পর্তুগালের অধিবাসীরা পর্তুগিজ নামে পরিচিত। ১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামার ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কারের কয়েক দশক পর ১৫১৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম ইউরোপীয় বণিক গোষ্ঠী হিসেবে তারা ভারতে আসে। পর্তুগিজরা এদেশে বহু অবদান রেখেছে। চীনের রেশমি কাপড়, মালাক্কার মসলা, সিংহলের চীনাবাদাম ইত্যাদি তারাই এ দেশে প্রথম আমদানি করে আনে। উত্তর আমেরিকা থেকে গোল আলু ও তামাক, ব্রাজিল থেকে বাদাম, ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে পেঁপে, আনারস, কামরাঙা ও পেয়ারা, ইউরোপ থেকে জলপাই-এগুলো সবই পর্তুগিজরা এ দেশে প্রথম উৎপাদন শুরু করে। বাংলা গদ্যের প্রথম বই লেখে পর্তুগিজরা। বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ ও অভিধান তারাই রচনা করে। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আলমারি, বালতি, চাবি, সাবান, আলকাতরা, বোতাম, আলপিন প্রভৃতি শব্দ পর্তুগিজরাই চালু করে।

বাংলা বিজয় (১৫৭৪-১৫৭৬ খ্রি.): গুজরাট বিজয়ের পর সম্রাট আকবর বাংলা বিজয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এ সময় বাংলা কররানি বংশের শাসনাধীনে ছিল। কররানি বংশের প্রতিষ্ঠাতা সুলায়মান কররানি সম্রাট আকবরের শক্তিসামর্থ্য উপলব্ধি করে তার আনুগত্য প্রকাশ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখেন। তবে তার উত্তরসূরি দাউদ খান কররানি দুর্বল, অকর্মণ্য ও অপরিণামদর্শী সুলতান ছিলেন। নিজের শক্তি সম্পর্কে অসচেতন দাউদ কররানি তার পিতার দূরদর্শী নীতি পরিত্যাগ করেন এবং নিজ নামে খুৎবাপাঠ ও মুদ্রা জারি করে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেন। শুধু তাই নয়, আকবরের সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমান্তবর্তী জানানিয়া দুর্গ জয় করে তিনি সম্রাটের রোষ দৃষ্টিতে পড়েন। এমতাবস্থায় সম্রাট আকবর দাউদ খানকে দমনের জন্য জৌনপুরের শাসনকর্তা মুনিম খানকে বাংলা আক্রমণের নির্দেশ দেন। দাউদ খানের উজির লোদি খানের মধ্যস্থতায় দাউদ খান ও মুনিম খানের মধ্যে এক সমঝোতা চুক্তি সম্পাদিত হয়। বিষয়টি মনঃপূত না হওয়ায় সম্রাট আকবর নিজে সসৈন্যে বিহার আক্রমণ করেন এবং দাউদ খানকে বিতাড়িত করে ১৫৭৪ খ্রিষ্টাব্দে হাজিপুর ও পাটনা অধিকার করেন। মুনিম খানকে বাংলার সুবেদার নিযুক্ত করে এবং রাজা টোডরমলের ওপর বাংলা জয়ের দায়িত্ব দিয়ে সম্রাট আকবর রাজধানীতে ফিরে যান। মুঘল বাহিনী একে একে মুঙ্গের, ভাগলপুর, কোলগাঁও এবং তেলিয়াগর্হি গিরিপথ অধিকার করে। মুনিম খান গৌড়ের রাজধানী তাণ্ডা হয়ে সপ্তগ্রাম অধিকার করলে সুলতান দাউদ খান উড়িষ্যায় পালিয়ে যান। মুঘল বাহিনী উড়িষ্যার পথে দাউদ খানের দিকে অগ্রসর হলে ১৫৭৫ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে তুকোরাই স্থানে উভয় বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে দাউদ খান পরাজিত হয়ে মুঘলদের সাথে 'কটকের সন্ধি' স্বাক্ষর করেন।

রাজমহলের যুদ্ধ (১৫৭৬ খ্রি.): মুঘলদের কাছে নতিস্বীকার করে দাউদ খান কটক সন্ধি স্বাক্ষর করলেও অনেক আফগান নেতা এ চুক্তি মেনে নেননি। তারা বিক্ষিপ্তভাবে মুঘলদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। এ সময় মুনিম খান প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করলে সুযোগ বুঝে দাউদ খান কটকের সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ করে বিদ্রোহ করেন এবং সমগ্র বাংলা পুনর্দখল করেন। দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে সম্রাট আকবর খান-ই-জাহান হোসেন কুলি খানকে সুবেদার এবং রাজা টোডরমলকে তার সহকারী নিয়োগ দিয়ে বাংলায় পাঠান। রাজা টোডরমল বিচক্ষণতার সাথে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। মুঘল বাহিনী তেলিয়াগর্হি পুনরুদ্ধার করলে দাউদ খান রাজমহলে পিছু হটেন। ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ১০ জুলাই রাজমহলে মুঘল বাহিনী ও দাউদ খানের মধ্যে যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে দাউদ খান পরাজিত হন। সন্ধিভঙ্গের অপরাধে দাউদকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। দাউদের পতনের মধ্য দিয়ে বাংলার স্বাধীন সুলতানি যুগের অবসান ঘটে এবং বাংলা মুঘল সুবা বা প্রদেশে পরিণত হয়।

বারো ভূঁইয়াদের প্রতিরোধ: দাউদ খানের পতন হলেও আকবরের শাসনামলে বাংলায় সম্পূর্ণভাবে মুঘল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি। 'বারো ভূঁইয়া' নামধারী বাংলার কয়েকজন স্বাধীন ও আধা স্বাধীন জমিদার আকবরের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ভাটি অঞ্চলের জমিদার ঈসা খান মসনদ-ই-আলা ও তার পুত্র মুসা খানের নেতৃত্বে যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য, বুকাইনগরের ওসমান খান লোহানী, সরাইলের সোনা গাজী, নাটোরের কংস নারায়ণ, বিক্রমপুরের চাঁদ রায় ও কেদার রায়, ভুলুয়ার রাজা অনন্ত মাণিক্য প্রমুখ জমিদারগণ মুঘল কর্তৃত্ব অস্বীকার করে বিদ্রোহ ও প্রতিরোধ যুদ্ধ চালাতে থাকেন। আকবরের পক্ষে এ ভূঁইয়াদের দমন করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তী সময়ে সম্রাট জাহাঙ্গীর তাদের মুঘল কর্তৃত্ব স্বীকারে বাধ্য করেন।

কাবুল, কান্দাহার, বলখ ও বাদাখশান বিজয়: সম্রাট আকবরের বৈমাত্রেয় ভাই মির্জা হাকিম কাবুলের শাসনকর্তা ছিলেন। দিল্লির সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে তিনি প্রায় স্বাধীনভাবেই কাবুল শাসন করতেন। দিল্লির সিংহাসনের প্রতিও তার লোলুপ দৃষ্টি ছিল। নিজের সীমাবদ্ধতার কথা চিন্তা না করেই উচ্চাভিলাষী মির্জা হাকিম মানসিকভাবে আকবরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিলেন। সম্রাট আকবরের ধর্মনীতিতে অসন্তুষ্ট হয়ে বাংলা ও বিহারের গোঁড়া আফগান মুসলমানরা যখন আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে মির্জা তার গোপন অভিলাষ চরিতার্থ করার জন্য তখন তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেন। বিদ্রোহীরা ইসলামবিরোধী আকবরের পরিবর্তে গোঁড়া সুন্নি মতাবলম্বী হাকিমকে সিংহাসনে বসানোর পরিকল্পনা করে। এতে উৎসাহিত হয়ে মির্জা হাকিম ১৫৮০-৮১ খ্রিষ্টাব্দে তিন বার পাঞ্জাব আক্রমণ করেন। অবশ্য সেনাপতি মান সিংহের দৃঢ়তায় তিনি তিন বারই পাঞ্জাব অধিকারে ব্যর্থ হন। এ পরিস্থিতিতে সম্রাট আকবর স্বয়ং ১৫৮১ খ্রিষ্টাব্দে মির্জা হাকিমের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়ে তাকে পরাজিত করেন। পরে তিনি সম্রাটের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করলে আকবর তাকে ক্ষমা করে দিয়ে পুনরায় কাবুলের শাসনভার তার হাতে অর্পণ করেন। ঐতিহাসিক স্মিথের মতে, "কাবুল বিজয় আকবরের পরবর্তী রাজনৈতিক জীবনকে নিষ্কণ্টক করে এবং একে তার জীবনের শীর্ষ উন্নতি (Climax of his career) বলা যেতে পারে।" এ বিজয়ের ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সুরক্ষা নিশ্চিত হয়।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা: মুঘল ভারতের নিরাপত্তা ও বংশীয় শাসনের স্থায়িত্বের জন্য কান্দাহার, বলখ ও বাদাখশান বিজয়সহ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ মুঘলদের জন্য জরুরি ছিল। কাবুল দখলের পর সম্রাট আকবর এই সত্য আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বেলুচিস্তান থেকে কাশ্মির পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে দুর্ধর্ষ উজবেক, ইউসুফ জাই ও রোশনিয়া উপজাতিদের বাস ছিল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সুরক্ষার স্বার্থে সম্রাট আকবর উপজাতিদের দমনের সিদ্ধান্ত নেন। রাজা টোডরমল ও শাহজাদা মুরাদের নেতৃত্বে মুঘল বাহিনী উপজাতিদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালায়। মুঘল আক্রমণে ইউসুফ জাই ও রোশনিয়া উপজাতি পরাস্ত হয়। সোয়াত, বাজাউর ও কুমার অঞ্চলে মুঘল অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। উজবেক নেতা আবদুল্লাহ খান পরাজিত হলে উজবেকের আনুগত্য নিশ্চিত হয়।

কাশ্মির, সিন্ধু ও অন্যান্য অঞ্চল অধিকার: কাশ্মির ভারতের ভূস্বর্গ নামে পরিচিত। এ রাজ্যের শাসক ছিলেন সুলতান ইউসুফ শাহ। ১৫৮৬ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাটের নির্দেশে রাজা ভগবান দাস ও কাশিম খানের নেতৃত্বে মুঘল বাহিনী কাশ্মির আক্রমণ করে। ইউসুফ শাহ ও তার পুত্র ইয়াকুব খান পরাজিত হলে কাশ্মির মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। মুলতানের শাসনকর্তা আবদুর রহিম খান-ই-খানান ১৫৯১ খ্রিষ্টাব্দে মির্জা জানি বেগকে পরাজিত করে সিন্ধু জয় করেন। ১৫৯৫ খ্রিষ্টাব্দে বেলুচিস্তানও মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। এভাবে উত্তর ভারতে আকবরের রাজ্যসীমা উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে নর্মদা নদী এবং পশ্চিমে হিন্দুকুশ থেকে পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

দাক্ষিণাত্য অভিযান (১৫৯৫-১৬০১ খ্রি.) [Expedition to Deccan (1595-1601 AD)]

সম্রাট আকবর ছিলেন মনেপ্রাণে একজন সাম্রাজ্যবাদী শাসক। উত্তর ভারতে নিরঙ্কুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় ব্যাপক সাফল্যে তার সাম্রাজ্যবাদী অভিলাষ আরও প্রবল হয়ে ওঠে। মালব, গুজরাট, উড়িষ্যা প্রভৃতি রাজ্যের সীমান্ত দাক্ষিণাত্যের সীমান্তের সাথে সংযুক্ত হওয়ায় সম্রাট আকবর গুজরাট ও মালব অধিকারের পরপরই দাক্ষিণাত্যের ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। এ লক্ষ্যে সম্রাট আকবর ১৫৯১ খ্রিষ্টাব্দে খান্দেশ, আহমদনগর, গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর রাজ্যের আনুগত্য চেয়ে চারটি পৃথক রাজনৈতিক মিশন পাঠান। তবে খান্দেশের সুলতান রাজা আলী খান ছাড়া আর কেউ এতে সাড়া দেননি। সম্রাটের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করায় আকবর দাক্ষিণাত্যের আহমদনগরের বিরুদ্ধে শাহজাদা মুরাদ এবং আবদুর রহিম খান-ই-খানানের নেতৃত্বে অভিযান প্রেরণ করেন। আহমদনগরের সুলতান বাহাদুর নিযাম অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ায় তার অভিভাবক বীরাঙ্গনা চাঁদ সুলতানা মুঘলদের বিরুদ্ধে অমিতবিক্রমে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত টিকতে না পেরে ১৫৯৬ খ্রিষ্টাব্দে মুঘলদের সাথে সন্ধি স্বাক্ষর করেন। দরবারের ষড়যন্ত্র ও বিরোধে চাঁদ সুলতানা নিহত হলে ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দে আহমদনগর মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। এরপর খান্দেশের রাজা আলী খানের উত্তরসূরি সুলতান মিরন বাহাদুর শাহ আকবরের আনুগত্য অস্বীকার করলে সম্রাট বিদ্রোহী মিরনের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। খান্দেশের রাজধানী বুরহানপুর মুঘলদের দ্বারা বিজিত হলে সুলতান মিরন বাহাদুর শাহ আসিরগড় দুর্গে আশ্রয় নেন। এ আসিরগড় ছিল তদানীন্তন ভারতের অন্যতম সুরক্ষিত দুর্গ। অনেক প্রচেষ্টার পর ১৬০১ খ্রিষ্টাব্দে আসিরগড় দুর্গের পতন ঘটে। দাক্ষিণাত্যে সম্রাট আকবরের ব্যস্ততার সুযোগে শাহজাদা সেলিম বিদ্রোহ করেন এবং রাজকীয় উপাধি গ্রহণ করে এলাহাবাদে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এমতাবস্থায় সম্রাট আকবর তার অধিকৃত অঞ্চলকে আহমদনগর, বেরার ও খান্দেশ এ তিনটি সুবায় বিভক্ত করেন। শাহজাদা দানিয়েলের ওপর প্রদেশসমূহের শাসনভার ন্যস্ত করা হয়।

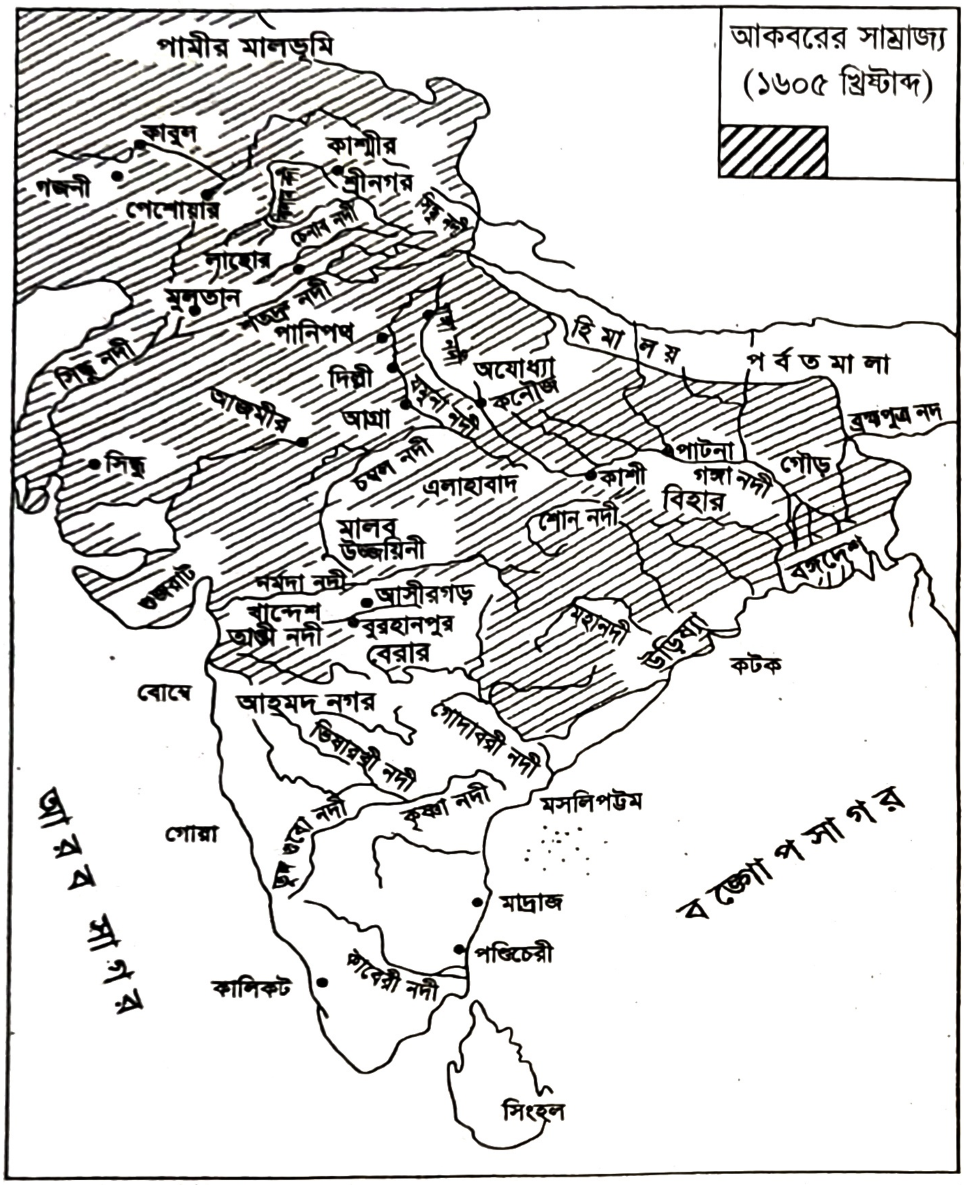
আকবরের সাম্রাজ্য (১৬০৫ খ্রিষ্টাব্দ)
▨
পামীর মালভূমি
কাবুল
গজনী
পেশোয়ার
কাশ্মীর
শ্রীনগর
লাহোর
চেনাব নদী
সিন্ধু নদী
মুলতান
শতদ্রু নদী
পানিপথ
দিল্লী
গঙ্গা
অযোধ্যা
কনৌজ
যমুনা নদী
আজমীর
আগ্রা
সিন্ধু
চম্বল নদী
এলাহাবাদ
হিমালয় পর্বতমালা
ব্রহ্মপুত্র নদ
পাটনা
কাশী
গঙ্গা নদী
গৌড়
বিহার
শোন নদী
মালব
উজ্জয়িনী
গুজরাট
নর্মদা নদী
আসীরগড়
খান্দেশ
তাপ্তী নদী
বুরহানপুর
বেরার
বঙ্গদেশ
মহানদী
উড়িষ্যা
কটক
বোম্বে
আহমদ নগর
ভিমারথী নদী
গোদাবরী নদী
তুঙ্গভদ্রা নদী
কৃষ্ণা নদী
মসলিপট্টম
গোয়া
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
মাদ্রাজ
পন্ডিচেরী
কালিকট
কাবেরী নদী
সিংহল

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. জালালউদ্দিন মুহাম্মদ আকবর মুঘল সাম্রাজ্যের কততম সম্রাট ছিলেন? *[চবি ২০১৬-১৭]*

২. জালালউদ্দিন মুহাম্মদ আকবর কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

৩. কে সম্রাট আকবরের অভিভাবক নিযুক্ত হয়েছিলেন? *[সকল বোর্ড ২০২৫]*

৪. পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ কত খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়? *[ঢা. বো., ম. বো., দি. বো., চ. বো., সি. বো., ব. বো. ২০২২]*

৫. মুঘল-আফগান দ্বন্দ্বের সমাপ্তি ঘটে কোন যুদ্ধের মাধ্যমে?

৬. কোন মুঘল সম্রাটের সময় বাংলা বিজিত হয়? *[চবি ২০১৫-১৬]*

উত্তরের জন্য ২৪৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

সম্রাট আকবরের বিজিত রাজ্যসমূহের তালিকা তৈরি করে মানচিত্রের সাহায্যে দেখাও।

পাঠ ১২

সম্রাট আকবরের রাজপুত নীতি
Rajput Policy of Emperor Akbar

অর্ধশতাব্দী রাজত্বকালে সম্রাট আকবরের গৃহীত উল্লেখযোগ্য নীতিগুলোর মধ্যে রাজপুত নীতি একটি। প্রকৃতপক্ষে হিন্দুধর্মাবলম্বী রাজপুতরা ছিল বীর ও স্বজাত্যবোধে সচেতন যোদ্ধা জাতি। দূরদর্শী আকবর রণদক্ষ ও নির্ভীক রাজপুত জাতির সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় এক সুচিন্তিত ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত নীতি গ্রহণ করেন। এর ফলে রাজপুতদের শুধু নিয়ন্ত্রণ নয়, বরং মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তার ও স্থায়িত্বে তাদের সহায়তা লাভ সম্ভব হয়। কে. কে. দত্ত বলেন, "প্রকৃতপক্ষে আকবরের সাম্রাজ্য মুঘল শৌর্যবীর্য ও কূটনীতি এবং রাজপুতদের সাহস ও সেবার ওপর গড়ে উঠেছিল।"[১৮]

রাজপুত নীতি গ্রহণের কারণ (Causes of Acceptance of Rajput Policy)

প্রথমত, সম্রাট আকবরের লক্ষ্য ছিল একটি সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা। তিনি উপলব্ধি করেন যে, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেণির প্রজাসাধারণের সমর্থন, শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা ছাড়া তার লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়। তাই তিনি ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে রাজপুত নীতি গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয়ত, সম্রাট আকবর ছিলেন উদারপন্থি ও অসাম্প্রদায়িক। তিনি তার দূরদৃষ্টি, রাজনৈতিক জ্ঞান ও বাস্তব বুদ্ধি দ্বারা বুঝেছিলেন যে, ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী, স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধিশালী করতে হলে রাজপুতদের সমর্থন ও সহযোগিতা প্রয়োজন হবে। কাজেই আকবর নিজ বংশের স্থায়িত্বের স্বার্থে হিন্দু জাগরণে নেতৃত্বদানকারী রাজপুতদের মন জয়ে সচেষ্ট হন এবং তাদের ব্যাপারে বিশেষ নীতি গ্রহণ করেন।

জেনে রাখো

সাধারণত উত্তর ভারতের অধিবাসীরা রাজপুত নামে পরিচিত। তারা প্রাচীন সনাতনী মতবাদে বিশ্বাসী। রাজপুতরা উত্তর ভারতের রণথম্ভোর, চিতোর, বারানসি, চুনার, কালিঞ্জর, যোধপুর, বিকানির, জয়সলমির, গুজরাট প্রভৃতি রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। মুঘল সম্রাট আকবর রাজপুত শক্তিকে ব্যবহার করে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক টড-এর মতানুসারে গুপ্তপূর্বে ও গুপ্তোত্তর যুগে শক, হুন, কুষাণ, গুর্জর প্রভৃতি যেসব জাতি ভারতে এসেছিল রাজপুতরা তাদের বংশধর। কালক্রমে তারা ভারতীয়দের সাথে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন এবং ভারতীয় রীতিনীতি, আচারবিধি ও জাতিভেদ প্রথা গ্রহণ করে রাজপুত নামে পরিচিত হয়েছে।

তৃতীয়ত, সম্রাট আকবর ক্ষমতালাভের পর থেকেই আত্মীয়-পরিজনসহ নানা জাতি-গোষ্ঠীর বিদ্রোহে অতিষ্ঠ ছিলেন। বিচক্ষণ সম্রাট রাজপুত জাতির প্রভুভক্ত বিশ্বাসী চরিত্র সম্পর্কে অবগত হন এবং এ যোদ্ধা জাতিকে নিজের বিরুদ্ধবাদী বিভিন্ন শক্তি বিশেষ করে উজবেক, পারসিক এবং আফগান বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কাজে লাগানোর ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

রাজপুত নীতির বাস্তবায়ন (Implement of Rajput Policy)

সম্রাট আকবর রাজপুত নীতি বাস্তবায়নে দুটি কর্মপন্থা অবলম্বন করেন। যথা—ক. মিলনাত্মক নীতি খ. কঠোর নীতি।

মিলনাত্মক নীতি: রাজপুতদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে সম্রাট আকবর ভারতে তার সাম্রাজ্য দীর্ঘস্থায়ী করতে চেয়েছিলেন। এজন্য তিনি তাদের প্রতি নমনীয় ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন।

প্রথমত, সম্রাট আকবর রাজপুতদের সাথে আপসমূলক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী ছিলেন। এ লক্ষ্যে তিনি ১৫৬২ খ্রিষ্টাব্দে সর্বপ্রথম অম্বরের রাজা বিহারীমলের কন্যা যোধবাঈকে বিয়ে করেন। একই লক্ষ্যে আকবর ১৫৭০ সালে বিকানীর রাজপুত রাজকন্যাকেও বিয়ে করেন। যুবরাজ সেলিমের সাথে ভগবান দাসের কন্যার বিয়ে দেওয়া হয়। এ সব বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে সম্রাট ভারতের সর্বাপেক্ষা সাহসী রাজপুত জাতিকে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করেন।

দ্বিতীয়ত, সম্রাটের মিলনাত্মক নীতির অন্যতম অংশ ছিল সামরিক ও বেসামরিক উচ্চ রাজপদে রাজপুতদের নিয়োগ দান। আইন-ই-আকবরীর তথ্যমতে, সম্রাট আকবরের ২১ জন সভাসদের মধ্যে ৯ জন ছিলেন হিন্দু। এদের মধ্যে রাজা মানসিংহ, ভগবান দাস, রাজা বিহারীমল, রাজা টোডরমল, বীরবল প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

---

[১৮] Ref. *An Advanced History of India, p.442*

তৃতীয়ত, সম্রাট হিন্দু ও রাজপুতদের আনুগত্য ও সমর্থনলাভের উদ্দেশ্যে তাদের জিজিয়া ও তীর্থকর দেওয়া থেকে অব্যাহতি দেন। তাছাড়া তাদের স্বাধীনভাবে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের অধিকার দেওয়া হয়। হিন্দু ও রাজপুতদের অনুভূতিতে আঘাত না দেওয়ার উদ্দেশ্যে সম্রাট সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে পশু জবাই নিষিদ্ধ করেন এবং গোহত্যা বন্ধের ব্যবস্থা নেন। হিন্দুশিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ সাধনে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া হয়। সম্রাটের নির্দেশে সংস্কৃত ভাষায় রচিত বহু পুস্তক ফারসি ভাষায় অনুবাদ করা হয়।

চতুর্থত, রাজপুতদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে সম্রাট তাদের সাথে খোলাখুলি মেলামেশা শুরু করেন। তাদের বহু প্রথা ও আচার-অনুষ্ঠান পালন করেন। তিনি হিন্দু মন্দির ও মেলা পরিদর্শন করতেন। হিন্দু সম্রাজ্ঞীদের জন্য রাজপ্রাসাদে মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। তিনি হিন্দুসমাজে প্রচলিত বাল্যবিবাহ রোধ এবং বিধবাবিবাহ প্রচলন করেন। তাছাড়া সম্রাট সহমরণ ও সতীদাহ প্রথা বিলুপ্তেরও উদ্যোগ নেন।

কঠোর নীতি: রাজপুতদের প্রতি আপসমূলক মিলনাত্মক নীতি গ্রহণ করলেও তাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও ঔদ্ধত্যকে তিনি সহ্য করেননি। আনুগত্য স্বীকারে অস্বীকৃতিজ্ঞাপনকারী রাজপুতদের বিরুদ্ধে কঠোর সামরিক নীতি গ্রহণ করে প্রয়োজনে তিনি তাদের রাজ্য ছিনিয়ে নিতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। মেবার, মালব, রণথম্ভোর ও কালিঞ্জরের বিরুদ্ধে তিনি সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাদের আনুগত্য আদায় করেন। তবে এক্ষেত্রেও সম্রাট মহানুভবতার পরিচয় দেন। পরাজিত রাজপুতদের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ না হয়ে তিনি তাদের প্রতি অনুকম্পা ও উদারতা প্রদর্শন করেন।

রাজপুত নীতির ফলাফল (Results of Rajput policy)

আকবরের রাজপুত নীতি ভারতের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এ নীতির ফলে ভারতে হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির সম্পর্ক তৈরি হয়। আকবরের উদার নীতির কারণে রাজপুতরা মুঘলদের প্রতি বিরোধিতার নীতি ত্যাগ করে। ঐতিহাসিক মোরল্যান্ড বলেন, "এই নীতির ফলে রাজপুতদের অধিকাংশ সুনির্দিষ্টভাবে সম্রাটের অনুগত হয়ে পড়েন। যার ফলে তিনি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ৫০,০০০ অশ্বারোহী বাহিনীর সেবা লাভের অধিকারী হয়েছিলেন।"[১৯] ভি. এ. স্মিথ বলেন, "আকবরের বিভিন্ন পদক্ষেপ রাজপুতদের সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হয় এবং তারা বাবরের কাছে পরাজয়ের আঘাত সহজেই ভুলে যায়। বিদেশি নয় বরং আকবরকে 'জাতীয় নরপতি' হিসেবে মেনে নিয়ে রাজপুতরা মুঘল সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব বিধানে সহযোগিতা করে।"[২০]

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সম্রাট আকবরের লক্ষ্য কী ছিল?
২. উত্তর ভারতের অধিবাসীরা কী নামে পরিচিত?
৩. আকবরের মুঘল সাম্রাজ্য কাদের সাহস ও সেবার ওপর গড়ে উঠেছিল?
৪. অম্বরের রাজা বিহারীমলের কন্যা যোধবাঈকে বিয়ে করেন কে?
৫. সম্রাট আকবরের ২১ জন সভাসদের মধ্যে কত জন হিন্দু ছিলেন?
৬. কোন মুঘল সম্রাট সহমরণ ও সতীদাহ প্রথা বিলুপ্তির উদ্যোগ নেন?

উত্তরের জন্য ২৪৪ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

সম্রাট আকবরের রাজপুত নীতি গ্রহণের কারণ এবং ফলাফল খুঁজে বের করে ছকে উপস্থাপন করো।

---

[১৯] Ref. W. H. Moreland, *India at the Death of Akabar, London,* 1920

[২০] Ref. V. A Smith, *Oxford History of India.*I

পাঠ ১৩

সম্রাট আকবরের ধর্মীয় নীতি
Religious Policy of Emperor Akbar

মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাসে অন্যতম উল্লেখযোগ্য আলোচিত ও সমালোচিত বিষয় হলো সম্রাট আকবরের ধর্মীয় নীতি। তার এ নীতি সম্পর্কে ইতিহাসের গবেষক ও পাঠকদের মধ্যে নানামুখী বিতর্ক ও ভিন্ন মূল্যায়ন রয়েছে এবং নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তার ধর্মীয় দর্শন উদার ও পরমতসহিষ্ণু ছিল। আকবরের ধর্মচিন্তার চূড়ান্ত পরিণতি হলো 'দ্বীন-ই-ইলাহি' ধর্মমতের প্রবর্তন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রথম জীবনে সম্রাট আকবর ছিলেন একজন আচারনিষ্ঠ সুন্নি মুসলমান। পির-ফকির ও ধার্মিকদের প্রতি তার অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। সেলিম চিশতি এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কিন্তু ধর্মকে কেন্দ্র করে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, উলামাদের গোঁড়ামি এবং সুন্নি-শিয়া-মাহদী ও সুফিদের মধ্যে বিরোধ তার মধ্যে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি করে। ১৫৭৮ খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে তার ধর্মীয় চিন্তায় পরিবর্তন দেখা দেয় এবং তিনি ক্রমশ উদার ধর্মীয় নীতির দিকে ঝুঁকে পড়েন।

উদার ধর্মীয় নীতি প্রবর্তনের কারণ (Causes of the Introduction of the Liberal Religious Policy)

পারিবারিক প্রভাব: আকবরের পারিবারিক পরিবেশ ছিল ধর্মীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে। পিতা-মাতার উদারতা ও পরমতসহিষ্ণুতার গুণাবলি আকবরের মধ্যে পুরো মাত্রায় সঞ্চারিত হয়েছিল।

শিক্ষক ও সহচরদের প্রভাব: আকবরের গৃহশিক্ষক শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত আবদুল লতিফের কাছ থেকে তিনি মরমীবাদ ও সুলহ-ই-কুল বা সকল ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতার আদর্শ শিক্ষালাভ করেন। তাছাড়া তার অভিভাবক বৈরাম খান এবং মানবতাবাদী পণ্ডিত শেখ মুবারক ও তার দুই সুযোগ্য পুত্র শেখ ফৈজী ও আবুল ফজলের সান্নিধ্য আকবরকে ধর্মীয় উদারতা ও সহিষ্ণুতা শিক্ষা দেয়।

সুফিবাদের প্রভাব: সুফি ও মরমীবাদের প্রতি সম্রাট আকবরের বিশেষ অনুরাগ ছিল। আজমিরসহ বিভিন্ন পির দরবেশের মাজারে তার যাতায়াত বিশেষ করে সাধক সেলিম চিশতির প্রতি তার অনুরাগ মরমীবাদের প্রতি আকবরের বিশেষ দুর্বলতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

রাজ অন্তঃপুরের প্রভাব: আগে বলা হয়েছে, সম্রাট আকবর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে রাজপুত হিন্দু নারীদের বিয়ে করেছিলেন। আকবরের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে প্রভাব বিস্তারকারী রাজপুত হিন্দু সম্রাজ্ঞীদের ধর্মচিন্তা ধর্মীয় ব্যাপারে উদার নীতি অবলম্বনে উৎসাহিত করেছিল।

যুগধর্মের প্রভাব ও আকবরের অনুসন্ধিৎসা: ষোড়শ শতাব্দী ছিল বিশ্বব্যাপী অনুসন্ধিৎসা ও সংশয়ের যুগ (Age of enquiry and doubt) এবং ঈশ্বরী প্রসাদের মতে, "আকবর ছিলেন এর পূর্ণাঙ্গ প্রতিনিধি।" বস্তুত এই শতাব্দীতেই ধর্মীয় কারণে ইংল্যান্ড এবং স্পেনের মধ্যে আর্মাডার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। জার্মানিতে মার্টিন লুথার কিং-এর নেতৃত্বে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। ভারতের জৈনপুরে সৈয়দ মুহাম্মদ মাহদী আন্দোলন শুরু করেন। আফগানিস্তানেও অনুরূপ 'রাসনী' আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। সর্বোপরি এ সময় ভারতে কবি নানক, শ্রী চৈতন্য, রামানন্দ প্রমুখ মনীষী ভক্তি আন্দোলন নামে যেসব আন্দোলন শুরু করেছিলেন তা অনুসন্ধিৎসু ও বিচক্ষণ আকবরকে প্রভাবিত করেছিল।

রাজনৈতিক ইচ্ছা: অধিকাংশ পণ্ডিতই মনে করেন যে, আকবরের ধর্মচিন্তার পেছনে কিছুটা হলেও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কাজ করেছিল। আর. সি. মজুমদারের মতে, "আকবরের সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য তার ধর্মচিন্তাকে প্রভাবিত করেছিল।"[২১] ঈশ্বরী প্রসাদের মতে, আকবরের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল তার সাম্রাজ্যের সবাইকে একটি কাঠামোর মধ্যে ঐক্যবন্ধ করা।

---

[২১] Akbar's political aim to establishing an all Indian Mughal Empire had some influence of his religious policy.– Ref. R.C. Majumdar. *An Advanced History of India.* P. 458.

ইবাদতখানা নির্মাণ ও ডিক্রি জারি: ধর্মীয় বিষয়ে গবেষণার জন্য আকবর ১৫৭৫ খ্রিষ্টাব্দে ফতেহপুর সিক্রিতে একটি ইবাদতখানা নির্মাণ করেন। এটি ধর্মসভা নামে পরিচিত ছিল। এখানে সম্রাট ধর্মীয় ও দার্শনিক নানা বিষয়ে আলোচনার জন্য সব ধর্মের ধর্মবেত্তা ও পণ্ডিতদের সমাবেশের ব্যবস্থা করেন। শুরুতে সম্রাট সুন্নি আলেম শেখ মখদুম-উল-মুলক ও শেখ আবদুন্নাবীকে ইসলাম ধর্মের মূলনীতিগুলো ব্যাখ্যা করার জন্য বলেন। কিন্তু তাদের মধ্যকার গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতা এবং পারস্পরিক বিদ্বেষ সম্রাটকে হতাশ করে। এ অবস্থায় সম্রাট অন্যত্র সত্যানুসন্ধান শুরু করেন। ফতেহপুর সিক্রিতে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ধর্মগুরুদের আহ্বান জানানো হয়। সম্রাটের আহ্বানে জেসুইট ধর্মযাজক রিডেলফো আকুয়াভিভ ও ফাদার মনসারেট, পার্সি অগ্নি উপাসক দস্তুর মেহেরজী রানা, হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দেবী ও পুরুষোত্তম, জৈন তির্থংকর হীরা ভিজয় সুরী, বিজয় সেন প্রমুখ ইবাদতখানায় ধর্মালোচনায় অংশ নেন। এসব আলোচনায় ধর্মে ধর্মে পারস্পরিক বিদ্বেষ, হানাহানি এবং বিপরীত চিন্তা আকবরকে ব্যথিত করে তোলে। তিনি এ থেকে উত্তরণের জন্য সব ধর্মকে একসূত্রে গাঁথার উপায় খুঁজতে থাকেন। এ লক্ষ্যে ধর্মক্ষেত্রে উলেমাদের একাধিপত্য খর্ব করার জন্য সম্রাট ১৫৭৯ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে একটি ডিক্রি জারি করেন। ভিনসেন্ট স্মিথ সম্রাটের এ ডিক্রিকে 'অভ্রান্ত অনুশাসন' (Infallibility decree) বলে অভিহিত করেছেন। এই ঘোষণা দ্বারা সম্রাট আকবর রাষ্ট্র পরিচালনার পাশাপাশি ইসলাম ধর্ম সম্পর্কেও যেকোনো সমস্যার চরম সমাধানের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নিজ হাতে গ্রহণ করে 'ইমাম-ই-আদিল' খেতাব গ্রহণ করেন এবং নিজ নামে খুৎবা পাঠ শুরু করেন।

দ্বীন-ই-ইলাহি (The Din-I-Ilahi)

সম্রাট আকবর ১৫৮২ খ্রিষ্টাব্দে 'দ্বীন-ই-ইলাহি' নামে একটি নতুন ধর্মমত প্রবর্তন করেন। এটি ছিল একটি একেশ্বরবাদী ধর্ম। ঐতিহাসিক মোল্লা আবদুল কাদের বাদাউনী একে 'তৌহিদ-ই-ইলাহি' বা ঐশী একেশ্বরবাদ বলে আখ্যায়িত করেছেন। জেসুইট লেখক বারটুলির মতে, সব ধর্মের সার নিয়ে দ্বীন-ই-ইলাহী ধর্মমত গঠিত হয়েছিল। ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, "দ্বীন-ই-ইলাহি একটি উদার সর্বেশ্বরবাদী ধর্ম, সকল ধর্মের ভালো ও উৎকৃষ্ট নীতিগুলো এতে সমন্বিত ছিল।"[২২] আকবরের প্রবর্তিত দ্বীন-ই-ইলাহি ধর্মমতে কোনো নবি বা দেব-দেবীর অস্তিত্ব ছিল না। প্রতি রোববার সম্রাট নির্দিষ্ট আসনে বসে আগ্রহীদের দীক্ষা দিতেন। এ সময় দীক্ষা গ্রহণকারীকে সম্রাটের নামে ৪টি স্তরে ব্যক্তির জীবন, ধর্ম, সম্মান ও সম্পত্তি উৎসর্গ করতে হতো। যারা সম্রাটের জন্য শুধু তাদের সম্পত্তি উৎসর্গ করতো তারা প্রথম স্তরের; যারা সম্পদ ও জীবন উৎসর্গ করতো তারা দ্বিতীয় স্তরের; যারা সম্পদ, জীবন ও সম্মান উৎসর্গ করত তারা তৃতীয় স্তরের এবং যাদের সম্পত্তি, জীবন, সম্মান ও ধর্ম উৎসর্গ করা হতো তারা চতুর্থ বা সর্বোচ্চ স্তরের সদস্য বলে বিবেচিত হতো।

দ্বীন-ই-ইলাহির মূলনীতি: দীন-ই-ইলাহির কিছু মূলনীতি ছিল। যথা: ১. দ্বীন-ই-ইলাহির কালেমা ছিল 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ ওয়া আকবারু খালিফাতুল্লাহ।' অনুসারীদেরকে এ কালেমা পাঠ করতে হতো; ২. দ্বীন-ই-ইলাহির অনুসারীদেরকে পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাতে একজনকে 'আল্লাহু আকবর' বলে সম্ভাষণ করতে হতো এবং অন্যজনকে 'জাল্লাজালালাখ' বলে উত্তর দিতে হতো; ৩. আগুনকে পবিত্র বলে সম্মান করা হতো; ৪. এর অনুসারীদের অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে হতো; ৫. মাংস খাওয়াসহ যথাসম্ভব আমিষ গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হতো; ৬. জন্মদিন বা জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করতে হতো এবং ঐ দিন দানখয়রাত্‌সহ স্বধর্মীদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতে হতো; ৭. পারলৌকিক কল্যাণের জন্য মৃত্যুর আগেই ভোজ অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হতো; ৮. ভিক্ষা দেওয়া গেলেও কোনো অবস্থাতেই ভিক্ষা গ্রহণ করা যেত না এবং ৯. এ ধর্মের অনুসারীদের কসাই, ধীবর, ব্যাধ প্রভৃতি নিচু শ্রেণির লোকদের সাথে মেলামেশা বর্জন করতে হতো।

দ্বীন-ই-ইলাহির প্রচার: সম্রাট আকবর ছিলেন উদার প্রকৃতির এবং চিন্তার স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। এ কারণে তিনি দ্বীন-ই-ইলাহির প্রসারে কোনো জবরদস্তিমূলক নীতি গ্রহণ করেননি। এ ধর্মের কোনো স্বতন্ত্র ধর্মগ্রন্থ ছিল না। দ্বীন-ই-ইলাহি প্রচারের জন্য সম্রাট কোনো মসজিদ, মিশন নির্মাণ করেননি বা ব্যক্তিবিশেষকে দায়িত্বও দেননি। ফলে দ্বীন-ই-ইলাহির ব্যাপক প্রসার ঘটেনি। ঐতিহাসিক আবুল ফজলের মতে, এর অনুসারী সংখ্যা ছিল মাত্র আঠারো জন। এদের মধ্যে শেখ মোবারক, আবুল ফজল, ফৈজী, মির্জা জানী এবং আজিজ কোকা ছিলেন উল্লেখযোগ্য। হিন্দুদের মধ্যে একমাত্র রাজা বীরবল দ্বীন-ই-ইলাহি ধর্মমতে দীক্ষা নিয়েছিলেন। তাই সম্রাটের মৃত্যুর সাথে সাথে দ্বীন-ই-ইলাহিরও অবসান ঘটে।

---

[২২] It was an Eclectic Pantheism containing the good points of all religions.– Ref. Ishawari Prasad, *A Short History of Muslim Rule in India.*

অভিযোগ ও সমালোচনা: বাদাউনী আকবরের দ্বীন-ই-ইলাহি প্রবর্তনের কঠোর সমালোচনা করেন। তার মতে, দ্বীন-ই-ইলাহি প্রবর্তনের পর সম্রাট আকবর ইসলামবিরোধী হয়ে ওঠেন। তিনি মন্তব্য করেন যে, আকবর দ্বীন-ই-ইলাহি প্রণয়ন করে মসজিদে নামাজ পড়া ও আজান নিষিদ্ধ, দাঁড়ি ও রোজা রাখা এবং হজ পালনে বিধিনিষেধ আরোপ, কুরআন শিক্ষা নিরুৎসাহিত ও আরবি ভাষা শিক্ষা নিষিদ্ধ করা, মুহাম্মদ, আহম্মদ ও মোস্তফা ইত্যাদি ইসলামি নামকরণে নিরুৎসাহিত করা, পুরুষদের সিল্ক ও স্বর্ণালংকার পরিধানে উৎসাহিত করা এবং প্রাসাদে কুকুর ও শূকর পালন উৎসাহিত করা ইত্যাদি নানা ইসলামবিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ভিনসেন্ট স্মিথ, ডব্লিউ হেইগ, ব্লকম্যান, এডওয়ার্ডস, গ্যারেটও এ মত মেনে নিয়েছেন। তবে অধিকাংশ ভারতীয় ঐতিহাসিক আকবরের ধর্মমত সম্পর্কে বাদাউনীর সমালোচনা ও অভিযোগের বিষয়ে একমত নন। তাঁদের মতে, বাদাউনী গোঁড়া, রক্ষণশীল মুসলমান ও হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন। এছাড়া বাদাউনীর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন আবুল ফজল। তিনি আবুল ফজলের সাফল্যে দরবারে আশানুরূপ সাফল্য লাভে ব্যর্থ হয়ে সম্রাটের বিরুদ্ধে নানা মিথ্যাচার করেছেন। নিরপেক্ষ বিশ্লেষণে দেখা যায়, আকবরের ইসলামবিরোধী আইন সম্পর্কে বাদাউনীর অনেক তথ্যই ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন। তিনি নামাজ, রোজা, হজ পালন নিষিদ্ধের যে অভিযোগ করেছিলেন তা সঠিক নয়। কারণ এ সময় ভারতীয় মুসলমানদের হজ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় যাওয়ার ঐতিহাসিক তথ্য এবং সম্রাটের হজযাত্রীদের জন্য নানা সুবিধাদি প্রদানের প্রমাণ পাওয়া যায়। সম্রাট কুরআন শরিফকে অশ্রদ্ধা করেছেন বা আরবি শিক্ষা নিষিদ্ধ করেছেন তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

আকবরের ধর্মীয় চিন্তার মূল্যায়ন (Assessment of the Religious Thought of Akbar)

আকবরের ধর্মীয় চিন্তা ও দ্বীন-ই-ইলাহি প্রবর্তন সম্পর্কে পণ্ডিত মহলে নানারকম বিতর্ক রয়েছে। ভিনসেন্ট স্মিথ আকবরের ধর্মমতকে "তার প্রজ্ঞার নয় বরং নির্বুদ্ধিতার স্মৃতিচিহ্ন বলে আখ্যায়িত করেছেন"। তার মতে, "সমস্ত পরিকল্পনাটি ছিল হাস্যকর অহংকারের স্বাভাবিক ফল এবং অসংযত স্বৈরাচারের বীভৎস প্রকাশ।"[২৩] তার ধর্মীয় নীতি ভারতের রক্ষণশীল ও নিষ্ঠাবান মুসলমানদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল। তাই তারা আকবরের এ ধর্মনীতি ও দ্বীন-ই-ইলাহীর বিরুদ্ধে তৎকালীন বিখ্যাত ধর্মবেত্তা খাজা শেখ আহমদ সরহিন্দ বা মুজাদ্দেদ-ই-আলফেসানির নেতৃত্বে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। বস্তুত সম্রাট আকবরের দ্বীন-ই-ইলাহি প্রবর্তনের উদ্দেশ্য ছিল প্রধানত রাজনৈতিক, ধর্মীয় নয়। ভারতে মুঘল শক্তির স্থায়িত্ব বিধানের স্বার্থে হিন্দু-মুসলিম নাগরিকদের মধ্যে একটি ঐক্য ও প্রীতির বন্ধন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যেই সম্রাট ধর্মীয় ক্ষেত্রে উদার নীতি ও দ্বীন-ই-ইলাহি প্রবর্তন করেছিলেন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. 'দ্বীন-ই-ইলাহি' ধর্মমত প্রবর্তন করেন কে? */সকল বোর্ড ২০২১; ২০১৬/*
২. ধর্মীয় বিষয়ে গবেষণার জন্য সম্রাট আকবর কোথায় ইবাদতখানা নির্মাণ করেন?
৩. সম্রাট আকবর কত খ্রিষ্টাব্দে 'দ্বীন-ই-ইলাহি' ধর্মমত প্রবর্তন করেন?
৪. 'দ্বীন-ই-ইলাহি' প্রতিষ্ঠার কারণ কী ছিল? */সকল বোর্ড ২০২৫/*
৫. 'দ্বীন-ই-ইলাহি' ধর্মমতের অনুসারী সংখ্যা ছিল কত জন?
৬. হিন্দুদের মধ্যে একমাত্র কে 'দ্বীন-ই-ইলাহি' ধর্মমতে দীক্ষা নিয়েছিলেন?

উত্তরের জন্য ২৪৪ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

সম্রাট আকবরের উদার ধর্মীয় নীতি প্রবর্তনের কারণ চিহ্নিত করে ছক আকারে লেখো।

গ. দলীয় কাজ

ইসলাম ধর্মের সাথে দীন-ই-ইলাহির সাংঘর্ষিক দিকসমূহ নিয়ে একটি বিতর্কের আয়োজন করো।

---

[২৩] The whole scheme was the outcome of ridiculous vanity, a mantrous growth of unstained autocracy.

পাঠ ১৪

সম্রাট আকবরের শাসন ব্যবস্থা এবং তার প্রবর্তিত মনসবদারি প্রথা
Administrative System and the Mansabdari System of Emperor Akbar

শাসন ব্যবস্থার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য: প্রকৃতপক্ষে সম্রাট আকবর ছিলেন মুঘল শাসন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাতা। ক্ষমতায় বসে তিনি সর্বপ্রথম শাসন ব্যবস্থা সুসংহত ও সুশৃঙ্খল করার প্রতি বিশেষভাবে জোর দেন এবং তার অর্ধশতাব্দীর রাজত্বকালে এ শাসন ব্যবস্থাকে পরিপূর্ণ রূপ দেন। তার পরবর্তী মুঘল সম্রাটেরা আকবর প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থা চালু রাখেন। তবে অনেকেই মনে করেন, সম্রাট আকবর মুঘল শাসনব্যবস্থার মূল উদ্ভাবক ছিলেন না। এ. এ. রিজভীর মতে, আকবরের শাসনব্যবস্থা ছিল পারসিক ঐতিহ্য এবং প্রাচীন ভারতীয় ও সুলতানি শাসনব্যবস্থার নানা মৌলিক উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। এতে শের শাহের শাসন ব্যবস্থার কিছু বিশেষ দিকও পরিলক্ষিত হয়।

কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা: মুঘল সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও সংহতি বিধানের প্রয়োজনেই সম্রাট আকবর কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা সুসংহত করার পদক্ষেপ নেন। মুঘল কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার শীর্ষে ছিলেন সম্রাট। সম্রাট ছিলেন সামরিক ও বেসামরিক বিষয়ে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। সম্রাট একাধারে সাম্রাজ্যের প্রধান সেনাপতি, প্রধান বিচারপতি এবং ধর্ম বিষয়ে চূড়ান্ত মীমাংসাকারী ছিলেন। সম্রাটের ইচ্ছা ও নির্দেশানুসারেই শাসনকাজ পরিচালিত হতো। এককথায় সম্রাট ছিলেন অবাধ ও অসীম ক্ষমতার অধিকারী। তবে নিরঙ্কুশ ক্ষমতাধর হলেও সম্রাট আকবর দায়িত্বহীন স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না।সম্রাটের পরেই ছিলেন ভকিল (Wakil) বা প্রধান উজির। তিনি ছিলেন সাম্রাজ্যের প্রধান বিধায়ক-সম্রাট ও শাসন ব্যবস্থার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনকারী। সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ পদ ছিল দিউয়ান। সাম্রাজ্যের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব তত্ত্বাবধান, রাজকোষ সংরক্ষণ ও পরিদর্শন এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করা ছিল দিউয়ানের কর্তব্য। কেন্দ্রীয় সামরিক বিভাগের প্রধানকর্তা ছিলেন মীর বকশী। সেনাবাহিনীর নিয়োগ, শৃঙ্খলা বিধান, প্রয়োজনে অভিযান পরিচালনা, সেনাবাহিনীর রসদ সরবরাহ, বেতন বন্টন ও হিসাব সংরক্ষণ ছিল মীর বকশীর কর্তব্য। রাজকীয় গৃহস্থালি সংগঠন তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তার পদবি ছিল মীর সামান। কেন্দ্রে কাজী-উল-কুজ্জাত ছিলেন প্রধান বিচারপতি। সদর-উস-সুদূর পদবিধারী কর্মকর্তা কেন্দ্রে দাতব্য বিভাগ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতেন। জনসাধারণের নৈতিক চরিত্র পর্যবেক্ষণ করতেন মুহতাসিব। আইনশৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব ছিল কোতোয়ালের ওপর। তাছাড়া মীর আতিশ, গোলন্দাজ বিভাগ, দারোগা-ই-ডাক, চৌকি গোয়েন্দা ও ডাক বিভাগ এবং দারোগা নামক কর্মকর্তা টাকশাল পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করতেন।

প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা: বিশাল সাম্রাজ্য সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য সম্রাট আকবর ১৬০২ খ্রিষ্টাব্দে তার সাম্রাজ্যকে মোট পনেরোটি সুবা বা প্রদেশে বিভক্ত করেন। সুবাগুলো হলো: ১. দিল্লি, ২. আগ্রা, ৩. আজমির, ৪. বাংলা, ৫. বিহার, ৬. এলাহাবাদ, ৭. অযোধ্যা, ৮. মুলতান, ৯. লাহোর, ১০. কাবুল, ১১, গুজরাট, ১২. মালব, ১৩. খান্দেশ, ১৪. বেরার ও ১৫. আহমদনগর।

প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা ছিল কেন্দ্রীয় সরকারেরই একটি অবিকল ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি (exact miniature of the central government)। সুবার সামরিক ও বেসামরিক শাসন বিষয়ে সর্বোচ্চ কর্তা ছিলেন সুবাদার। তার অধীনে প্রাদেশিক বকশি ছাড়াও প্রদেশে কর্মরত উল্লেখযোগ্য কর্মচারীর মধ্যে ছিল আমিল, ফৌজদার, কোতোয়াল, কাজি, বিতিকচি, পোদ্দার ও ওয়াকেনবীশ। পদমর্যাদায় সুবায় সুবাদারের পর গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারী ছিলেন দিউয়ান। তিনি ছিলেন প্রদেশের রাজস্ব বিভাগের প্রধান। সম্রাট সরাসরি দিউয়ানকে নিযুক্ত করতেন এবং তার কাজের জন্য কেন্দ্রীয় দিউয়ানের কাছে জবাবদিহি করতেন।

জেনে রাখো

জারিব নামে লোহার বলয় দ্বারা বেষ্টিত শক্ত দণ্ডের সাহায্যে নিখুঁতভাবে ভূমি জরিপ শেষে উর্বরতার ওপর ভিত্তি করে সমগ্র আবাদি ভূমি বিভক্ত করার পদ্ধতিকে যাবতি প্রথা বলে। এ ব্যবস্থায় জমির ৪টি শ্রেণি হলো—

১. পোলাজ (যেসব জমি সারা বছর চাষোপযোগী),
২. পারাউতি (যেসব ভূমির উৎকর্ষ বাড়াবার জন্য নির্দিষ্ট সময় পতিত রাখতে হতো),
৩. চাচার (যেসব ভূমি ৩ বছরের জন্য পতিত রাখা হতো) এবং
৪. বানজার (যেসব ভূমি ৫ বছরের অধিক সময়ের জন্য পতিত রাখা হতো)।

রাজস্ব ব্যবস্থা: একটি সফল, সুচারু অর্থ ও রাজস্ব প্রশাসন গড়ে তোলার লক্ষ্যে সম্রাট আকবর শের শাহকে অনুসরণ করে রাজস্ব প্রশাসনের উন্নয়নে নজর দেন। মোজাফফর খান তুরবতী ও রাজা টোডরমল এ ব্যবস্থার উন্নয়নে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেন। এ সময় সমগ্র সাম্রাজ্যকে ১৮২টি এককে বিভক্ত করা হয়। প্রতিটি এককের রাজস্ব ছিল এক কোটি দাম (এক দাম = এক রৌপ্য মুদ্রার $\frac{১}{৪০}$ অংশ)। কিন্তু রাজস্ব আদায়কারীদের দুর্নীতি ও অসততার কারণে এ প্রথা পরিত্যক্ত হয়। ১৫৮২ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট আকবর রাজা টোডরমলকে দিউয়ান-ই-আশরাফ পদে নিয়োগ

দিয়ে ভূমি রাজস্ব সংস্কারের দায়িত্ব দেওয়া হয়। টোডরমল রাজস্ব নির্ধারণের লক্ষ্যে 'ইলাহীগজ্ঞ' নামে বাঁশের চেইন ব্যবহার করে দেশের আবাদযোগ্য জমির একটি নির্ভুল জরিপ সম্পন্ন করেন। এরপর জমির উর্বরতা ও উৎপাদন এবং চাষের সময় হিসেব করে জরিপকৃত জমিকে পোলাজ, পারাউতি, চাচার ও বান্জার— এ চার শ্রেণিতে ভাগ করেন। প্রথম দুই শ্রেণির জমিকে আবার উত্তম, মধ্যম ও নিম্ন— এই তিন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। এ তিন প্রকার জমির বিঘা প্রতি গড় উৎপাদনের হার নির্ণয় করে উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব নির্ধারণ করা হয়। কৃষক নগদ অর্থে অথবা উৎপন্ন ফসলে রাজস্ব পরিশোধ করতে পারত। মুঘলদের এই রাজস্ব নীতি রায়তোয়ারি ব্যবস্থা নামে পরিচিত। একে টোডরমলের 'যাবতি নীতি'ও বলা হয়। যাবতি পদ্ধতি ছাড়াও সমসাময়িক বিরবণীতে 'নাসখ' এবং 'গাল্লাবখশ' রাজস্বনীতির উল্লেখ পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে ভূমি রাজস্ব ছিল সাম্রাজ্যের আয়ের প্রধানতম উৎস। আকারের সময় রাজস্ব আয়ের আরও কতগুলো উৎস ছিল। এগুলো হলো— ১. বাণিজ্য শুল্ক ২. টাকশাল ৩. উত্তরাধিকার স্বত্ব ৪. উপঢৌকন ৫. লুণ্ঠিত দ্রব্য এবং ৬. ক্ষতিপূরণের অর্থ।

বিচার ব্যবস্থা: সম্রাট আকবর ন্যায়বিচারক ছিলেন। বিচার প্রশাসনে সম্রাট নিজে ছিলেন সর্বোচ্চ বিচারক। তিনি মামলার আপিল শুনানি ও নিষ্পত্তি করতেন। সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিনে সম্রাট বিচারপ্রার্থীদের অভিযোগ শুনতেন এবং অভিযোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা করতেন। বিচারব্যবস্থায় সম্রাটের পরই ছিল কাজি-উল-কুজ্জাত বা প্রধান কাজির অবস্থান। তিনি ফৌজদারি মামলার বিচার এবং অধীনস্থ কাজিদের নিয়োগ করতেন। ধর্ম সংক্রান্ত এবং দিউয়ানি বিচারের প্রধান ছিলেন সদর-উস-সুদূর। বিচার বিভাগে অন্যান্য কর্মকর্তার মধ্যে ছিলেন কাজি, মুফতি এবং মীর আদল। কোনো লিখিত ও বিধিবদ্ধ আইন সংহিতা না থাকায় কাজিরা শরিয়তের অনুশাসন, পূর্ববর্তী বিশিষ্ট আলেমদের রায় বা ফতোয়া এবং সাধারণ নীতিবোধের ওপর ভিত্তি করে বিচার কাজ পরিচালনা করতেন। ফৌজদারি বিচারক্ষেত্রে হিন্দুদের জন্য স্বতন্ত্র কোনো বিধি অনুসরণ না করা হলেও ধর্মীয় ও উত্তরাধিকার মামলায় হিন্দুধর্মীয় আইন ও ঐতিহ্য অনুসরণ করা হতো। লঘু অপরাধের জন্য বেত্রাঘাত, অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ড বা হত্যাকাণ্ড এবং রাজদ্রোহিতার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের বিধান ছিল। মুঘল বিচারব্যবস্থার অন্যতম একটি ভালো দিক ছিল দ্রুত বিচার সম্পন্ন করা। পি. শরণ বলেন, "মুঘল বিচার ব্যবস্থার আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল সহজলভ্যতা, ক্ষিপ্রতা ও নিরপেক্ষতা।"

সামরিক ব্যবস্থা: সম্রাট আকবরের আগে সাম্রাজ্যের স্থায়ী কোনো সেনাবাহিনী ছিল না। জায়গিরদাররা প্রয়োজনের সময় সৈন্য সরবরাহ করতেন। এতে অনেক সময় নানা অসুবিধা হতো। সম্রাট আকবর ক্ষমতা গ্রহণ করে সেনাবাহিনী পুনর্গঠনে মনোযোগ দেন। তার সেনাবাহিনী পদাতিক, অশ্বারোহী, গোলন্দাজ ও নৌবাহিনী— চার ভাগে বিভক্ত ছিল। গোলন্দাজ বাহিনী প্রধানের পদবি ছিল মীর-ই আতিশ এবং নৌবাহিনীর প্রধান আমির-ই-বহর। সম্রাট স্বয়ং ছিলেন সাম্রাজ্যের প্রধান সেনাপতি। তার অধীনে সিপাহশালার নামধারী সেনানায়কেরা সেনাবাহিনী পরিচালনায় দায়িত্বশীল ছিলেন। কেন্দ্রে মীর বকশি এবং প্রদেশে বকশির তত্ত্বাবধানে সমর প্রশাসন পরিচালিত হতো।

মনসবদারি প্রথা (The Mansabdari System)

সম্রাট আকবরের সামরিক সংস্কারের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল 'মনসবদারি প্রথা'। সেনাবাহিনীতে নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের অব্যবস্থা দূর করার লক্ষ্যে সম্রাট ১৫৭১ খ্রিষ্টাব্দে শাহবাজ খানকে মীর বকশি নিয়োগ করে স্বয়ং একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সম্রাটের এ পরিকল্পনাই ইতিহাসে 'মনসবদারি প্রথা' নামে পরিচিত। 'মনসব' শব্দের অর্থ পদ বা পদমর্যাদা। এ পদের অধিকারীকে 'মনসবদার' এবং সমগ্র ব্যবস্থাটিকে 'মনসবদারি প্রথা' বলা হয়। ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, "আকবরের সমগ্র সামরিক সংগঠনই মনসবদারি ব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।" (The entire military organization was based upon the Mansabdari System.) সম্রাট আকবর ১৫৭৭ খ্রিষ্টাব্দে মনসবদারি প্রথা চালু করেন। আবুল ফজলের (আইন-ই-আকবরী বা আকবরনামা) মতে, সাম্রাজ্যে সর্বমোট ৩৩ প্রকারের, আরভিনের মতে, ২৭ এবং কোনো কোনো তথ্য মতে, ৬৬টি প্রকারের মনসব ছিল। সর্বোচ্চ পর্যায়ের মনসবদার মোট দশ হাজার এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ে ১০ জন সৈন্য সংরক্ষণের নিয়ম ছিল। সাত হাজার থেকে তদূর্ধ্ব মনসব সাধারণত রাজ পরিবারের সদস্যদের জন্য নির্ধারিত ছিল। তবে ব্যতিক্রম হিসেবে রাজা মানসিংহ, টোডরমল ও কুলিচ খানকে সাত হাজারের বেশি মনসব দ্বারা সম্মানিত করা হয়েছিল।

মনসবদার নিয়োগ: মনসবদার নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদচ্যুতি সম্পূর্ণভাবে সম্রাটের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল ছিল। একজন ব্যক্তির সামরিক যোগ্যতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে সম্রাট তাকে মনসবদার হিসেবে নিয়োগ দিতেন। মনসবদারদের 'জাত' ও 'সওয়ার' নামে দুটি মর্যাদা ছিল। আইন-ই-আকবরী, পাদশাহনামা ও দস্তুরুল আমল থেকে প্রাপ্ত তথ্য মতে, মনসবদাররা উচ্চ হারে বেতন পেতেন। আবুল ফজলের তথ্যমতে, একজন পাঁচ হাজারি মনসবদারের বেতন ছিল মাসিক ৩২০০ টাকা, প্রথম শ্রেণির একজন পাঁচশতী মনসবদারের বেতন ছিল মাসিক ২৫০০ টাকা এবং ১০ জন সৈন্যের মনসবদারের মাসিক বেতন ছিল ১০০ টাকা অর্থ বা বেতনের সমপরিমাণ জায়গির দেওয়া হতো।

মনসবদারি ব্যবস্থার সুফল ও কুফল (Merits and Demerits of Mansabdari System)

প্রতিটি নীতি ও ব্যবস্থাপনারই কিছু ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক থাকে। মনসবদারি ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। এ ব্যবস্থারও কিছু সুফল ও কুফল লক্ষণীয়। যেমন—

প্রথমত, এ ব্যবস্থায় কোনো কেন্দ্রীয় সংগঠন ছাড়াই কেন্দ্রীয় সরকার একটি বিশাল সেনাদলের অধিকারী হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রের সাহায্য ছাড়াই প্রাদেশিক সরকার সংশ্লিষ্ট এলাকার মনসবদারদের সাহায্যে বিদ্রোহ দমন ও অন্যান্য সংকট মোকাবিলা করতে পারত।

তৃতীয়ত, এ ব্যবস্থায় গুণ ও দক্ষতার ভিত্তিতে পদোন্নতি হতো বলে মনসবদারদের মধ্যে দক্ষতা প্রমাণের ইচ্ছা থাকত। আর রাষ্ট্র এর সুফল পেত।

চতুর্থত, এ প্রথা একটি সুসংগঠিত ব্যবস্থা হওয়ায় মুঘল সাম্রাজ্যের সামরিক দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

তবে এর কতগুলো কুফলও পরিদৃষ্ট হয়। যেমন—

প্রথমত, বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর সমন্বয়ে সেনাবাহিনী গঠিত হওয়ায় এতে ঐক্য ও সংহতির অভাব পরিলক্ষিত হয়।

দ্বিতীয়ত, সেনাবাহিনী মনসবদারদের অধীনে প্রতিপালিত হওয়ায় তাদের আনুগত্য মনসবদারদের প্রতি ছিল। সম্রাটের প্রতি নয়।

তৃতীয়ত, কেন্দ্র থেকে দূরবর্তী স্থানে মনসবদারদের অবস্থান থাকায় তাদের ওপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ছিল শিথিল।

চতুর্থত, মনসবদাররা প্রায়ই প্রতারণা করত। তাদের যে সংখ্যক সৈন্য প্রতিপালনের কথা থাকত তারা তা করত না।

তবে এসব সীমাবদ্ধতা থাকলেও আকবরের মনসবদারি ব্যবস্থা ভারতের সামরিক ইতিহাসে একটি অভিনব সংযোজন ছিল। ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ বলেন, "এ ব্যবস্থাটি ছিল প্রশংসনীয়। এর নীতিমালা নিখুঁত ছিল এবং কার্যক্রমটি সাফল্যমণ্ডিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্মচারিবৃন্দকে যে বাস্তব নির্দেশনা প্রদান করা হতো তাতেও কোনো অস্বাভাবিকতা ছিল না।"

দাখিলি ও আহদি সৈন্য: মনসবদারি ব্যবস্থার বাইরে সম্রাটের দাখিলি ও আহদি নামে আরও দু'প্রকার সৈন্য ছিল। দাখিলি সৈন্যরা মনসবদারদের অধীনেই থাকতেন। তবে তাদের নিয়োগ এবং বেতন কেন্দ্রীয় সরকার থেকে দেওয়া হতো। আহদি ছিল অপেশাদার। তাদের কোনো মনসব ছিল না। সম্রাট তাদের নিয়োগ দিয়ে সাধারণত দেহরক্ষী হিসেবে দায়িত্ব দিতেন। তাদের তত্ত্বাবধানের জন্য পৃথক দিউয়ান ও বকশি ছিল।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মুঘল শাসন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাতা কে?
২. সম্রাট আকবর তার সাম্রাজ্যকে কয়টি সুবা বা প্রদেশে বিভক্ত করেন?
৩. সম্রাট আকবরের অর্থমন্ত্রী কে ছিলেন?
৪. 'আইন-ই-আকবরী' বা 'আকবরনামা' গ্রন্থের রচয়িতা কে? */সকল বোর্ড ২০২৫/*
৫. 'মনসবদারি প্রথা' প্রবর্তন করেন কে? */সকল বোর্ড ২০১৭; ২০১৫/*
৬. 'মনসব' শব্দের অর্থ কী? */সকল বোর্ড ২০২৫; ২০১৭/*

উত্তরের জন্য ২৪৪ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. সম্রাট আকবরের প্রবর্তিত মনসবদারি ব্যবস্থার ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলো চিহ্নিত করে ছক আকারে লেখো।
২. সম্রাট আকবর তার সাম্রাজ্যকে যেসব সুবায় ভাগ করেছিলেন তার নাম লেখো।

পাঠ ১৫

সম্রাট আকবরের চরিত্র ও কৃতিত্ব
Character and Achievements of Emperor Akbar

চরিত্র বিশ্লেষণ: ১৬০৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ অক্টোবর মহান সম্রাট আকবর মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছিলেন আকর্ষণীয় ও অনুপম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তার চরিত্রে বহুমুখী প্রতিভার অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল। আবুল ফজল ও বাদাউনীর বিবরণ মতে, সম্রাট আকবর আকর্ষণীয় ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন এবং রাজকীয় সব গুণই তার চরিত্রে বিদ্যমান ছিল। ফাদার মনসারেট বলেন, "চেহারা এবং আকৃতিতে তিনি ছিলেন রাজকীয় মর্যাদাসম্পন্ন।" (He was in face and stature fit for the dignity of a king.) শারীরিক গঠন, চাল-চলন ও কথাবার্তায় তিনি ছিলেন রাজোচিত। চাল-চলনে রাজোচিত হলেও সম্রাট আকবর ব্যক্তিমানুষ হিসেবে ছিলেন সরল, সহজ, ভদ্র ও অমায়িক। পরিবারবর্গের প্রতি তিনি ছিলেন বাৎসল্য ও স্নেহশীল। বৈমাত্রেয় ভাই মির্জা হাকিম ও পুত্র যুবরাজ সেলিমের প্রতি তার আচরণে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। সম্রাট ঔদ্ধত্য, দাম্ভিকতা ও অহংকার পছন্দ করতেন না। অবাধ্য ও উদ্ধতদের ব্যাপারে তিনি ছিলেন নির্মম ও কঠোর। তবে অনুগত বিনয়ী ও আস্থাভাজনদের প্রতি ছিলেন অতীব দয়ালু ও ক্ষমাশীল। বাল্যকাল থেকেই সম্রাট নির্ভীকচিত্ত ও তেজস্বী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। কর্তব্যকর্মে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সৎ। তার মধ্যে প্রচণ্ড উচ্চাভিলাষ ছিল। সময়ানুবর্তিতা সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তিনি আয়েশ অপছন্দ করতেন কিন্তু তার মধ্যে অলসতা বলতে কিছু ছিল না।

কৃতিত্ব বিচার: ঐতিহাসিক ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, "আকবর শুধু ভারতবর্ষের ইতিহাসে নয় সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা।"[২৪] ব্রিটিশ ঐতিহাসিক এডওয়ার্ডস ও গ্যারেটের মতে, "তিনি ছিলেন একাধারে একজন দুর্দমনীয় সৈনিক, শ্রেষ্ঠ সেনাপতি, বিচক্ষণ প্রশাসক, জনহিতৈষী শাসক এবং মানব চরিত্রের প্রকৃত বিচারক।"

দিগ্বিজয়ী বিজেতা: সম্রাট আকবর অসাধারণ সামরিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। উচ্চাভিলাষী ও সাম্রাজ্যবাদী আকবর তার অসাধারণ সামরিক নৈপুণ্য ও দূরদর্শী কূটনৈতিক কলাকৌশল দ্বারা এ সাম্রাজ্যকে পুনরুজ্জীবিত করেন এবং পশ্চিমে কাবুল থেকে পূর্বে বঙ্গোপসাগর এবং উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে নর্মদা পর্যন্ত এক বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিপতি হন।

রাজনীতিবিদ ও সংগঠক: সম্রাট আকবর একজন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ ও সফল সংগঠক ছিলেন। স্ট্যানলি লেনপুলের (Stanley Lanepoole) মতে, "ভারতবর্ষের শাসকদের মধ্যে আকবর ছিলেন সর্বাপেক্ষা মহান। তিনি ছিলেন মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ও সংগঠক।" ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথের মতে, "আকবরের সংগঠন প্রতিভা প্রাচ্যের শাসকদের মধ্যে অত্যন্ত বিরল এবং বিশ্বের অন্য কোনো দেশেও সহজপ্রাপ্য নয়।" ড. কানুনগো মনে করেন, জাতীয় একতা বিধানের মহান ধারণার জন্য আকবর ভারতীয় শাসকদের মধ্যে শীর্ষস্থান দখল করে আছেন। বস্তুত জাতি, ধর্ম, বর্ণ, মতবাদ নির্বিশেষে প্রজাসাধারণকে একটি রাজনৈতিক সংগঠনের আওতাভুক্ত করে ভারতীয় ঐক্য স্থাপন ছিল তার প্রধান লক্ষ্য। তিনি বিবদমান বিভিন্ন রাজ্য, জাতি ও ধর্মকে ঐক্যবদ্ধ করে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পিতায় পরিণত হন। জওহরলাল নেহেরু আকবরকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জনক (Father of Indian nationalism) বলে আখ্যায়িত করেছেন।

শ্রেষ্ঠ শাসক ও সংস্কারক: একজন মহান ও সফল শাসকের প্রয়োজনীয় সব গুণ সম্রাট আকবরের মধ্যে ছিল। কে. টি. শাহের মতে, "আকবর ছিলেন শ্রেষ্ঠ মুঘল সম্রাট। তিনি সম্ভবত প্রায় এক হাজার বছরের ভারতীয় শাসকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন।" তিনি তার সাম্রাজ্যে একটি কল্যাণকর ও বাস্তবধর্মী প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলেন। তার শাসনব্যবস্থা ছিল ব্যক্তি ও ধর্মনিরপেক্ষ ভারতীয় ও পারসিক আরবীয় শাসননীতির এক অপূর্ব সংমিশ্রণ। শুধু পরবর্তী মুঘল সম্রাটেরাই নয়, আধুনিক ভারতবর্ষও তার শাসন প্রতিভার কাছে বিশেষভাবে ঋণী। সম্রাট আকবর একজন কৃতী সংস্কারকও ছিলেন। ধর্ম ও বিবেকের স্বাধীনতাদান, জিজিয়া ও তীর্থ করসহ বৈষম্যমূলক নানা কর বিলোপ, সতীদাহ ও কন্যা শিশু হত্যা নিষিদ্ধ, বিধবা বিবাহে উৎসাহদান, যুদ্ধ বন্দিদের দাস করার প্রথা বিলোপ এবং বাল্যবিবাহ দূর করা ইত্যাদি তার ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংস্কারমূলক পদক্ষেপ ছিল। তাছাড়াও তার শাসনতান্ত্রিক ও সামরিক সংস্কারের মধ্যে ভূমিরাজস্ব নীতির ব্যাপক পরিবর্তন, জায়গির প্রথা নিয়ন্ত্রণ, মনসবদারি প্রথা প্রবর্তন, বাংলা সনের প্রবর্তন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সম্রাট আকবরের সময় থেকেই বাংলা সনের প্রথম দিন তথা পহেলা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ হিসেবে উদযাপিত হয়ে আসছে।

---

[২৪] "Akbar is one of the most remarkable king not only in the history of India but of the whole world." -*A Short History of Muslim Rule in India.*

শিক্ষা ও সংস্কৃতি অনুরাগী: সম্রাট আকবরের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না। তবে তিনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের মুখে আলোচনা শুনে শুনে তিনি ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, ইতিহাস ও রাষ্ট্রনীতি বিজ্ঞানে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জনে সমর্থ হন এবং এসব বিষয়ে বিভিন্ন জটিল প্রশ্নের মতামত এবং মীমাংসা দিতে পারতেন। সম্রাট আকবরের পৃষ্ঠপোষকতায় মুঘল রাজদরবার বিদ্যা ও সাহিত্যচর্চার তীর্থকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। সম্রাট আকবরের রাজদরবার ছিল সমকালীন জ্ঞানী-গুণী ও বিদ্বান ব্যক্তিদের তীর্থস্থান। এ সময় ১. মির্জা আবদুর রহিম ২. মির্জা আবদুল আজিজ কোকলতাস ৩. আবুল ফজল ৪. কবি ফৈজী ৫. হোসায়ন খান ৬. বাক্যবাগীশ আবুল ফাতাহ গিলানী ৭. রাজা টোডরমল ৮. রসিক প্রবর রাজা বীরবল এবং ৯. সংগীতজ্ঞ মিয়া তানসেন প্রমুখ নয় জন বিদ্বান ও গুণী ব্যক্তি আকবরের রাজসভাকে অলংকৃত করেছিলেন। এরা একত্রে দরবারের নওরতনে আকবর বা আকবরের দরবারের নবরত্ন নামে পরিচিত ছিলেন। এছাড়াও ঐতিহাসিক নিজামুদ্দিন বখশী, আবদুল কাদের বাদাউনী, কবি তুলসী দাস, সুরদাস, নরহরি, সংগীতবিদ বজবাহাদুর, বাবা রামদাস ও বৈজুবাওয়া, চিত্রশিল্পী খাজা আবদুস সামাদ, মীর সৈয়দ আলী, মুকুন্দ দাস, জমসেদ ফারুক বেগ, কিষাণ দাস প্রমুখ আকবরের রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন। ফতেহপুর সিক্রি নগরীর পত্তন এবং সেখানে বহু স্থাপত্য ইমারত নির্মাণ সম্রাট আকবরের স্থাপত্য প্রীতির উজ্জ্বল নিদর্শন। ভিনসেন্ট স্মিথ ফতেহপুর সিক্রিকে 'A Romance for Stone' বলে অভিহিত করেছেন।

ইতিহাসে সম্রাট আকবরের স্থান: সম্রাট আকবর ভারতে মুঘল শাসনের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক টডের (Tod) ভাষায়- "আকবর ছিলেন মুঘলদের প্রকৃত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা।" (Akbar was the real founder of the empire of the Mughals.) এডওয়ার্ডস ও গ্যারেট বলেন, "তার শাসনামলেই মুঘলরা একটি আক্রমণকারী সামরিক শক্তি থেকে স্থায়ী ভারতীয় রাজবংশে পরিণত হয়।" সমরনৈপুণ্য, সাংগঠনিক প্রতিভা, প্রখর রাজনীতি জ্ঞান, চিত্তাকর্ষক ও হৃদয়গ্রাহী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং প্রশাসনিক যোগ্যতা ইত্যাদির আলোকে বিচার করলে সম্রাট আকবর ভারতের ইতিহাসে এক অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছেন। ড. ত্রিপাঠী বলেন, "ঐতিহাসিক ভারতবর্ষে তিনি ছিলেন অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি।" স্ট্যানলি লেনপুলের ভাষায়, "আকবর ছিলেন এ যাবত ভারত-শাসনকারী রাজন্যবর্গের মধ্যে মহত্তম। তিনি ছিলেন সত্যিকার অর্থেই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ও সংগঠক।" ষোড়শ শতাব্দীতে তার সমসাময়িক শাসক ফ্রান্সের রাজা চতুর্থ হেনরি (১৫৯৪-১৬১০ খ্রি.), পারস্যের শাহ আব্বাস (১৫৮৭-১৩২৯ খ্রি.) এবং ইংল্যান্ডের রানি এলিজাবেথ (১৫৯৮-১৬০৩ খ্রি.) অপেক্ষা তিনি ছিলেন কীর্তিমান। এ জন্যই ঈশ্বরী প্রসাদ আকবরকে শুধু ভারতবর্ষের ইতিহাসে নয় সমগ্র বিশ্ব ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক বলে অভিহিত করেছেন। ভি.এ. স্মিথ বলেন, "আকবর ছিলেন জন্মগতভাবে মানুষের রাজা এবং ন্যায়সংগতভাবে ইতিহাসখ্যাত শ্রেষ্ঠ সার্বভৌম সম্রাটদের অন্যতম হওয়ার দাবিদার।"[২৫] প্রকৃতপক্ষেই 'মহামতি' বা 'The Great' উপাধি তার প্রাপ্য ছিল।

মুঘল রাজনীতিতে বৈরাম খানের উত্থান ও পতন: মুঘল রাজনীতিতে বৈরাম খানের উত্থান ও পতন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তুর্কি বংশোদ্ভূত ও শিয়া ধর্মাবলম্বী বৈরাম খানের জন্ম বাদাখশানে। গজনির গভর্নর সায়েফ আলী বেগের পুত্র বৈরাম খান কর্মজীবন শুরু করেন বাবরের সেনাবাহিনীর একজন সৈনিক হিসেবে। তবে নিজ যোগ্যতাবলে অচিরেই তিনি মুঘল পরিবারের ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। হুমায়ুনের সৎ বোন সলিমা বেগমের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক সূত্রে তিনি রাজপরিবারের আত্মীয়ও ছিলেন। রাজ্যহারা সম্রাট হুমায়ুনের দুর্দিনে তিনি তার পাশে থাকেন এবং তাকে দিল্লি পুনরাধিকারে সহায়তা করেন। সরহিন্দের যুদ্ধে বৈরাম খান মুঘল বাহিনীর প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন। কান্দাহার জয়ের পর সম্রাট হুমায়ুন বৈরাম খানকে সেখানকার গভর্নর নিযুক্ত করেন ও 'খান ই-খানান' উপাধি দেন। বৈরাম খান সম্রাট হুমায়ুনের পুত্র আকবরকে পাঞ্জাবের গভর্নর নিয়োগ করেন। আকবর অপরিণত বয়স্ক হওয়ায় বৈরাম খানকে তার 'আতালিক' বা অভিভাবক নিয়োগ করা হয়। আকবর শ্রদ্ধাভরে তাকে 'খান বাবা' বলে ডাকতেন।

হুমায়ুনের মৃত্যুর পর সংকটময় রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তিনি মুঘল সাম্রাজ্যকে রক্ষা করেন এবং বুদ্ধিমত্তা, তেজস্বিতা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টা দ্বারা পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে হিমুকে পরাজিত করে মুঘল রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথ সুগম করেন। বৈরাম খানের সুযোগ্য নেতৃত্বে গোয়ালিয়র, জৌনপুর ও আজমির অধিকৃত হয়। বৈরাম খান তার সর্বশক্তি দিয়ে বিপদাপন্ন মুঘল

---

[২৫] He (Akbar) was a born king of men with a rightful claim to rank as one of the greatest sovereigns known to history, *A Short History of Muslim Rule in India*, Ishwari Prasad.

সাম্রাজ্যকে রক্ষা করেন। কিন্তু আকবর সবকিছু জানা সত্ত্বেও তার খান বাবা বৈরাম খানকে পদচ্যুত করেন। ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, "বৈরাম খানের পতন আকবরের রাজত্বের প্রথমার্ধের একটি অন্যতম আর্কষণীয় ঘটনা।" ১৫৬০ খ্রিষ্টাব্দে মুঘল রাজনীতিতে তার পতন ঘটে। তার এ পতনের পেছনে নানাবিধ কারণ ছিল বলে ঐতিহাসিকেরা মনে করেন। যেমন—

প্রথমত, বৈরাম খান ছিলেন শিয়া। শিয়াদের প্রতি তার পক্ষপাতিত্ব ও সহানুভূতি দরবারের সুন্নি অভিজাত অমাত্যদের মর্মপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং তারা বৈরাম খানের পতন ঘটানোর ব্যাপারে তৎপর হয়ে ওঠেন।

দ্বিতীয়ত, মুঘল অভিজাততন্ত্র পারসিক ও তুরানি এ দু'গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। বৈরাম খান ছিলেন পারসিক। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, তিনি তার আত্মীয়-পরিজনসহ সগোত্রীয়দের উচ্চ রাজপদ, মনসব ও জায়গিরসহ নানা সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন। এতে প্রতিপক্ষ তুরানি ওমরাহগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন এবং তাকে অপসারণ করার ষড়যন্ত্র শুরু করেন।

তৃতীয়ত, মুঘল সাম্রাজ্যের স্বার্থের প্রতি একান্ত অনুগত ও সতর্ক দৃষ্টিসম্পন্ন হলেও স্বভাবে বৈরাম খান ছিলেন উদ্ধত, স্বেচ্ছাচারী ও ঈর্ষাপরায়ণ। আর এ কারণে তিনি ক্রমশ সবারই কাছে অপ্রিয় হয়ে ওঠেন এবং শেষপর্যন্ত ক্ষমতাচ্যুত হন।

চতুর্থত, সম্রাট আকবর প্রাপ্ত বয়স্ক হলে পূর্ণ রাজক্ষমতা লাভের জন্য তিনি উদগ্রীব হয়ে ওঠেন। তাই বৈরাম খানের অভিভাবকত্ব ও সর্বময় কর্তৃত্বের নাগপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে তিনি তাকে ক্ষমতাচ্যুত করেন।

পঞ্চমত, সম্রাটের ধাত্রীমাতা মাহম আনগা, তার পুত্র আদম খান এবং দিল্লির শাসনকর্তা শিহাবউদ্দিনসহ সম্রাটের আত্মীয়-পরিজনদের অনেকেই আকবরকে বৈরামের অভিভাবকত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়ার পরামর্শ দেন। তারা রাজমাতা হামিদা বানুকেও তাদের দলভুক্ত করে নেন। তারা আকবরের মনে সন্দেহ তৈরি করেন যে, বৈরাম খান তাকে পদচ্যুত করে তার চাচা কামরানের পুত্র আবুল কাসেমকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার ষড়যন্ত্র করছেন।

বৈরাম খানের মৃত্যু: উপরে বর্ণিত পরিস্থিতিতে শিক্ষক, অভিভাবক ও সাম্রাজ্যরক্ষক বৈরাম খানের প্রতি আকবরের বিতৃষ্ণা দিন দিন বাড়তে থাকে এবং শেষপর্যন্ত তিনি তাকে পদচ্যুত করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন। আকবর বৈরাম খানকে রাজকার্য থেকে অবসর গ্রহণ করে মক্কায় গিয়ে হজ পালনের পরামর্শ দিলে তিনি তাতে সম্মত হন। তবে তার মক্কা যাওয়ার বাসনা পূর্ণ হয়নি। পথে গুজরাটের পাটনায় মুবারক খান নামে এক লোহানি আফগান আততায়ীর হাতে ১৫৬১ খ্রিষ্টাব্দের ৩১ জানুয়ারি বৈরাম খান নিহত হন। এভাবে বৈরাম খান বিরোধী চক্রের জয় হয়। মুঘল সাম্রাজ্যের অকৃত্রিম বন্ধু সম্রাট হুমায়ুন যাকে মুঘল পরিবারের 'অনির্বাণ প্রদীপ' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন সেই বৈরাম খানের জীবনের দুঃখজনক পরিসমাপ্তি ঘটে। এদিকে বৈরাম খানের নিহত হওয়ার সংবাদে আকবর অনুতপ্ত হন। এ অবস্থায় নিহত বৈরাম খানের পরিবারকে তিনি সসম্মানে তার প্রসাদে নিয়ে আসেন। বৈরাম খানের বিধবা স্ত্রী সলিমা বেগমকে সম্রাট বিয়ে করেন এবং তার শিশুপুত্র আবদুর রহিমের লালন-পালনের দায়িত্ব নেন। এই আবদুর রহিম পরবর্তীকালে মুঘল অভিজাতবর্গের অন্তর্ভুক্ত হন। ১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দে আকবর তাকে 'খান-ই-খানান' উপাধি দেন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মুঘল বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় কাকে? *[সকল বোর্ড ২০২১; ২০১৬]*
২. মুঘল বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক কে?
৩. কোন মুঘল শাসক 'মহামতি' উপাধি ধারণ করেছিলেন?
৪ পহেলা বৈশাখকে বাংলা নববর্ষ হিসেবে উদযাপনের রীতি চালু করেন কে?
৫. আকবরের দরবারের নবরত্ন ছিলেন কয় জন?
৬. তানসেন কোন মুঘল সম্রাটের সভা-গায়ক ছিলেন? *[জাবি ২০১৭-১৮]*

উত্তরের জন্য ২৪৪ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে যে সব বিদ্বান ব্যক্তি সমাদৃত হয়েছিলেন তাদের নামের একটি চার্ট তৈরি করো।
২. বৈরাম খানের পতনের কারণগুলো ছক আকারে লেখো।

পাঠ ১৬

সম্রাট জাহাঙ্গীর: প্রাথমিক জীবন ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি (১৬০৫-১৬২৭ খ্রি.)
Emperor Jahangir: Early Life and Important Events (1605-1627 AD)

প্রাথমিক জীবন: নূরউদ্দিন মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর ছিলেন সম্রাট আকবরের পুত্র এবং মুঘল সাম্রাজ্যের চতুর্থ সম্রাট। বলা হয়ে থাকে যে, একাধিক শিশু সন্তানের মৃত্যু হওয়ায় উত্তরাধিকার হিসেবে পুত্র সন্তান লাভের আশায় সম্রাট আকবর প্রতি বছর আজমিরে হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতির দরগাহ জিয়ারত করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতেন। একই উদ্দেশ্যে সম্রাট প্রতি সপ্তাহে ফতেহপুর সিক্রির বিখ্যাত সাধক শেখ সেলিম চিশতির খানকাহ্‌তে যেতেন। ধারণা করা হয়, সেলিম চিশতির দোয়ার ফলে সম্রাট আকবরের রাজপুত স্ত্রী রানী যোধবাঈর গর্ভে ১৫৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ আগস্ট এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। বহু সাধনার ফলে এ পুত্রের জন্ম হওয়ায় তাকে "A Child of Many Prayers" বলা হয়। সেলিম চিশতির নামানুসারে সম্রাট তার নবজাতক পুত্র সন্তানের নাম রাখেন সেলিম। তবে স্নেহভরে সম্রাট তাকে 'শেখু বাবা' বলে ডাকতেন।

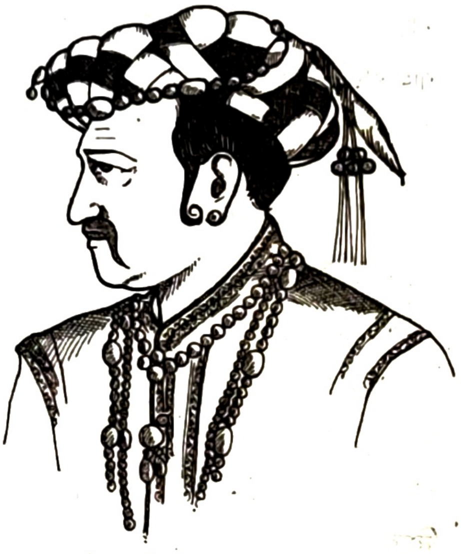
সম্রাট নূরউদ্দিন মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর

সম্রাট আকবরের নিজের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলেও তিনি তার শিশুপুত্র সেলিমকে সাম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী হিসেবে উপযুক্তভাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। আর এজন্য সম্রাট আকবর সে সময়কার বিখ্যাত পণ্ডিত আবদুর রহিম খান-ই-খানানসহ বেশ কয়েকজন মনীষীর ওপর শাহজাদার শিক্ষার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এদের তত্ত্বাবধানে শাহজাদা একাধারে ফারসি, তুর্কি ও হিন্দি ভাষা এবং গণিত, ইতিহাস ও ভূগোলসহ নানা বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করেন। যুদ্ধবিদ্যায়ও শাহজাদা বিশেষ জ্ঞান লাভ করেছিলেন। ১৫৮৫ খ্রিষ্টাব্দে অম্বরের রাজা ভগবান দাসের কন্যা মানবাঈয়ের সাথে সেলিমের বিয়ে দেওয়া হয়।

সিংহাসনারোহণ: শাহজাদা সেলিম উচ্চাভিলাষী ছিলেন। শাহজাদা দানিয়েলের প্রতি পিতা আকবরের সদয় দৃষ্টি ভবিষ্যতে সিংহাসন লাভের ব্যাপারে সেলিমকে সন্দিহান করে তোলায় তিনি ১৬০১ খ্রিষ্টাব্দে এলাহাবাদে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। এতে সম্রাট আকবর শাহজাদা সেলিমের প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট হন। অবশ্য রাজমাতার মধ্যস্থতায় সেলিম আগ্রায় গিয়ে সম্রাটের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে আকবর তাকে ক্ষমা করেন। শাহজাদা দানিয়েলের মৃত্যুর পর সম্রাট আকবর তার অন্তিম সময়ে শাহজাদা সেলিমকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে নিজের রাজকীয় পোশাক এবং তরবারি দান করে যান। ১৬০৫ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট আকবরের মৃত্যুর এক সপ্তাহ পর ২৪ অক্টোবর যুবরাজ সেলিম মুঘল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হিসেবে 'নূরউদ্দিন মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাদশাহ গাজী' উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। অবশ্য ইতিহাসে তিনি 'জাহাঙ্গীর' (ভুবন বিজয়ী, পৃথিবীর অধিকারী) নামেই সমধিক পরিচিত।

সম্রাটের প্রাথমিক কার্যাবলি: সম্রাট আকবরের মতো কিংবদন্তিতুল্য মেধা ও প্রতিভার অধিকারী না হলেও সম্রাট জাহাঙ্গীর একজন দক্ষ শাসক ছিলেন। ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, "তার উদার শিক্ষা, প্রকৃতি প্রদত্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং দৃঢ় উপস্থিত জ্ঞান তাকে পিতার রাজনীতিসুলভ রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিকে অব্যাহত রাখার জন্য যথেষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন করে তুলেছিল।"[২৬] নির্বিঘ্নে রাজ্য শাসনের উদ্দেশ্যে সম্রাট জাহাঙ্গীর কতকগুলো প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি বহু বন্দিকে মুক্তি দেন। নিজ নামে মুদ্রা চালু করেন এবং উলেমা ও রক্ষণশীল মুসলমানদের সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে ধর্মরক্ষার প্রতিশ্রুতি দেন। তার সিংহাসন লাভের বিরোধিতাকারী অভিজাতদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করেন। আবুল ফজলের হত্যাকারী বীরসিংহ বুন্দেলাকে

---

[২৬] His liberal education, his natural shrewdness and his strong commonsense well qualified him to carry on the statesman like policy of his father.-Ref. Ishawari Prasad, *A Short History of Muslim Rule in India.*

তিন হাজারি মনসব দান করা হয়। আবুল ফজলের পুত্র আবদুর রহমানকে উচ্চ পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। মির্জা গিয়াস বেগকে যুগ্ম দিউয়ান পদে নিয়োগ এবং 'ইতিমাত-উদ-দৌলা' উপাধি দেওয়া হয়। গিয়াস বেগের পুত্র জানানা বেগ **'মহব্বত খাঁ'** উপাধি লাভ করেন।

প্রজাদের সার্বিক মঙ্গলের কথা চিন্তা করে সম্রাট কতকগুলো কল্যাণকর নীতি গ্রহণ করেন। নিরীহ মজলুম প্রজাদের অভিযোগ শুনে এর প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যে সম্রাট আগ্রা দুর্গের শাহ বুরিজি থেকে যমুনা নদীর তীরবর্তী একটি প্রস্তর স্তম্ভ পর্যন্ত ৩০ গজ লম্বা একটি ঘণ্টাযুক্ত 'ন্যায়শৃঙ্খল' টানিয়ে দেন। সম্রাটের এই ঘণ্টা 'Bell of justice' এবং শিকলঘণ্টা বা 'Chain of justice' নামে পরিচিত। যেকোনো ব্যক্তি এই শিকল টেনে অভিযোগ বিষয়ে সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে সম্রাট তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করতেন। শাসনব্যবস্থায় অনাচার রোধ এবং জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সম্রাট 'দস্তুরুল আমল' নামে ১২টি বিধি জারি করেন। এগুলো হলো: ১. বিভিন্ন ধরনের অতিরিক্ত ও অন্যায্য শুল্ক রহিত করা; ২. রাহাজানি এবং চুরি নিয়ন্ত্রণে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ; ৩. অপরাধের শাস্তি হিসেবে অঙ্গচ্ছেদ প্রথা বন্ধ এবং বলপূর্বক ঘরবাড়ি দখল নিষিদ্ধ; ৪. মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্ণয়; ৫. বলপূর্বক অন্যের সম্পদ হরণ নিষিদ্ধ; ৬. মাদক ও অন্যান্য উত্তেজক পানীয় সেবন ও বিক্রয় নিষিদ্ধ; ৭. রবিবারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন; ৮. নির্দিষ্ট দিনে পশুহত্যা নিষিদ্ধ; ৯. আর্তপীড়িতের সেবার জন্য হাসপাতাল নির্মাণ ও চিকিৎসক নিয়োগ; ১০. ওয়াকফ্ (আইমা) জমি নির্দিষ্ট করা; ১১. মনসব ও জায়গির প্রথার স্থিতিশীলতা বিধান এবং ১২. বন্দিদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন।

জেনে রাখো

'নওরোজ' হলো নতুন বছরের প্রথম দিন। দিনটি শিয়ারা উদযাপন করে। ২১ মার্চ পালিত হয় এ বিশেষ নববর্ষ উৎসব। এর মধ্য দিয়ে বসন্তকাল এবং নতুন বছর শুরু হয়। খ্রিষ্টপূর্ব ৮০০ সালে নওরোজের প্রবর্তন করেছিলেন প্রাচীন পারস্যের প্রভাবশালী সম্রাট জামশিদ। এটি ইরানের ঐতিহ্যবাহী জাতীয় উৎসব। ইরান থেকে এ উৎসব মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন মুসলিম দেশ এবং ভারত উপমহাদেশে প্রচলিত হয়। তবে নওরোজ উদযাপনের প্রচলন প্রাক- মুঘল যুগে ছিল না। মুঘল সম্রাট হুমায়ুন পারস্যের সহায়তায় ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে হারানো সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করার পর থেকে উপমহাদেশে ইরানি শিয়াদের ব্যাপক আগমন ঘটে। ফলে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে ইরানি সংস্কৃতির প্রভাব বৃদ্ধি পায়। ওই সময় থেকে ভারতে অন্যতম প্রধান রাষ্ট্রীয় উৎসব হিসেবে নওরোজ উদযাপন হতে থাকে। অবশ্য সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় (১৬৫৬-১৭০৭) এ উৎসব উদযাপন নিষিদ্ধ করা হয়।

এসব বিধি-বিধান সম্রাটের মানবিকতা, ন্যায়বিচার এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞার এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত। ঐতিহাসিক এস. কে রায়ের মতে, "The regulations are remarkable for the humanity, justice and political sagacity." বস্তুত এসব বিধিবিধানের মাধ্যমে সম্রাট হিন্দু-মুসলিম সবার সন্তুষ্টি অর্জন করেন। তার প্রবর্তিত দস্তুরুল আমল মেনে চলার জন্য তিনি সাম্রাজ্যের সব প্রজাকে নির্দেশ দেন। নিজের অবস্থা সুসংহত করতে তিনি আকবরের আমলের সব রাজকর্মচারী এমনকি তার সিংহাসনে আরোহণের বিরোধীদেরও ক্ষমা করে তাদের প্রতি বিশেষ সম্মান দেখান। নিজের অবস্থান দৃঢ় করে তিনি ১৬০৬ খ্রিষ্টাব্দে জমকালো আয়োজনে সাম্রাজ্যের প্রথম 'নওরোজ' উৎসব পালন করেন।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি
(Other Important Events of Jahangir's Reign)

সিংহাসনে আরোহণের পর সম্রাট জাহাঙ্গীর বেশ কিছু প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। তিনি এসব পরিস্থিতি মোকাবিলায় সক্ষম হলেও তার গৃহীত কিছু পদক্ষেপের কারণে তিনি পরে সমালোচিত হন। এসব ঘটনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল—

শাহজাদা খসরুর বিদ্রোহ: সম্রাটের বিরুদ্ধে জ্যেষ্ঠ সন্তান যুবরাজ খসরুর বিদ্রোহ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। রানি মানবাঈয়ের গর্ভজাত খসরু যোগ্যতা ও চারিত্রিক মাধুর্যের কারণে সাম্রাজ্যে খুবই জনপ্রিয় ও আকর্ষণীয় ব্যক্তি ছিলেন। খসরুর মামা রাজা মানসিংহ এবং শ্বশুর খান-ই-আজম আজিজ কোকা আকবরের জীবদ্দশাতেই খসরুকে সিংহাসনে বসানোর চেষ্টা করেন। অবশ্য রাজমাতার হস্তক্ষেপে তখন তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। সম্রাট আকবর জাহাঙ্গীরকেই তার উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন।

সিংহাসনে আরোহণের পর সম্রাট জাহাঙ্গীর খসরুর ওপর বিশেষ নজর রাখেন। তাকে রাজদরবারে সম্মানজনক পদ দেওয়া হলেও আগ্রার দুর্গে প্রায় নিঃসঙ্গ ও নজরবন্দি করে রাখা হয়। ১৬০৬ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সম্রাট যুবরাজ খসরুকে সেকান্দ্রায় আকবরের সমাধি দর্শনের অনুমতি দেন। আগ্রার দুর্গ থেকে বের হয়ে শাহজাদা খসরু পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। বিদ্রোহী খসরু লাহোর দুর্গ দখলের চেষ্টা করেন। তবে জাহাঙ্গীরের বিশ্বস্ত ও অনুগত সেনাপতি দিলওয়ার খান ও সৈয়দ খানের প্রতিরোধে খসরুর লাহোর জয়ের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

খসরুর বিদ্রোহে সম্রাট জাহাঙ্গীর আতঙ্কিত ও অস্থির বোধ করেন। সম্রাট দ্রুত পাঞ্জাবের দিকে অগ্রসর হন। জলন্ধরের কাছে যুদ্ধে পিতা জাহাঙ্গীরের কাছে বিদ্রোহী শাহজাদা খসরু বন্দি হন। বন্দি শাহজাদা ও তার অনুগামীদের রাজ দরবারে হাজির করা হলে সম্রাট বিদ্রোহী পুত্রকে তার কৃতকর্মের জন্য কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেন এবং তাকে বন্দিশালায় পাঠিয়ে দেন। দশ বছরের কারা জীবনে অনেক কষ্ট-ক্লেশ ভোগ করার পর ১৬২২ খ্রিষ্টাব্দে শাহজাদা খুররমের নির্দেশে বাহাদুর নামে একজন আততায়ী শাহজাদা খসরুকে হত্যা করে।

জেনে রাখো

শিখধর্ম একটি সর্বেশ্বরবাদী ভারতীয় ধর্ম। সংস্কৃত শিষ্য বা শিক্ষা শব্দ থেকে শিখ শব্দটি এসেছে। শিখ ধর্মের অনুসারীদের 'শিখ' বলা হয়। শিষ্য শব্দের অর্থ শিক্ষার্থী। খ্রিষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীতে ভারতীয় উপমহাদেশের পাঞ্জাব অঞ্চলে গুরু নানক এ ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী সময়ে শিখ গুরুরা এ ধর্মের প্রসার ঘটান। শিখদের দশ জন মানব গুরু ছিলেন। এদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ গুরু গ্রন্থ সাহিব, যা প্রথম পাঁচজন শিখগুরু সংকলন করেন। শিখরা বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম ধর্মীয় গোষ্ঠী। এ ধর্মের অনুসারীর সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি। এ ধর্মের কেন্দ্রীয় শিক্ষা ঈশ্বরের একত্ববাদে বিশ্বাস।

গুরু অর্জুনের প্রাণদণ্ড ও প্রতিক্রিয়া: শিখ সম্প্রদায়ের পঞ্চম গুরু অর্জুন সিং বিদ্রোহী খসরুকে সমর্থন দিয়ে সহযোগিতা করেছিলেন। এ অপরাধে সম্রাট জাহাঙ্গীর শাস্তি হিসেবে তাকে অর্থ জরিমানা করেন। গুরু অর্জুন জরিমানা প্রদানে অস্বীকার করায় সম্রাট তাকে প্রাণদণ্ড দেন। যদিও সম্রাটের এ সিদ্ধান্তের পেছনে কোনো ধর্মীয় প্রণোদনা ছিল না, তথাপি এর পরিণাম হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। ক্রোধান্ধ সম্রাট জাহাঙ্গীর এ শিখ ধর্ম গুরুকে হত্যা করে শিখ-মুঘল দ্বন্দ্বের বীজ বপন করেন। তার এ অদূরদর্শিতার কারণে শিখরা মুসলমানদের জাতশত্রুতে পরিণত হয়। হিরেন্দ্রনাথ মুখোপ্যাধ্যায় বলেন, "এই অপ্রত্যাশিত আঘাতে শিখ আত্মঅভিমান বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল এবং ক্রমশ শিখ সম্প্রদায় সাম্রাজ্যের বিপক্ষে এক প্রতিকূল শক্তিতে পরিণত হলো।"[২৭]

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মুঘল সাম্রাজ্যের চতুর্থ সম্রাট কে?
২. 'A Child of Many Prayers' বলা হয় কাকে?
৩. 'জাহাঙ্গীর' শব্দের অর্থ কী?
৪. 'দস্তুরুল আমল' নামে ১২টি বিধি জারি করেন কে?
৫. মুঘল সাম্রাজ্যে প্রথম জমকালো 'নওরোজ' উৎসব পালন করেন কে?
৬. শিখ সম্প্রদায়ের পঞ্চম গুরু অর্জুন সিংকে প্রাণদণ্ড দেন কে?

উত্তরের জন্য ২৪৪ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রবর্তিত দস্তুরুল আমলের বিধিগুলোর একটি তালিকা তৈরি করো।
২. সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলির আলোকে একটি চার্ট তৈরি করো।

---

[২৭] *ভারতের ইতিহাস*, পৃ. ৭৪

পাঠ ১৭

সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজ্য বিস্তার
Expansions of Kingdom of Emperor Jahangir

বাংলা বিজয়: সম্রাট আকবর ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে রাজমহলের যুদ্ধে দাউদ খান কররানিকে পরাজিত করে বাংলা জয় করেন। তবে 'বারো ভূঁইয়া' নামে খ্যাত ভূস্বামীদের প্রতিরোধের কারণে আকবরের রাজত্বের শেষ সময় পর্যন্ত সম্পূর্ণ বাংলা অধিকার ও সেখানে কর্তৃত্ব বিস্তার সম্ভব হয়নি। জাহাঙ্গীরের শাসনামলে ভাটির জমিদার ঈসা খানের পুত্র মুসা খান এবং বুকাইনগরের জমিদার লোহানি আফগান উসমান খানের নেতৃত্বে বাংলার জমিদাররা মুঘল শক্তির বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধ অব্যাহত রাখেন। এ অবস্থায় সম্রাট জাহাঙ্গীর সম্পূর্ণ বাংলা জয় এবং তার শাসন কর্তৃত্ব স্থাপনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করেন। ১৬০৮ খ্রিষ্টাব্দে জাহাঙ্গীর ইসলাম খান চিশতিকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন এবং তাকে সম্পূর্ণ বাংলা দখল করার নির্দেশ দেন। ইসলাম খান প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ হিসেবে নৌবাহিনী শক্তিশালী করেন এবং ১৬১০ খ্রিষ্টাব্দে রাজমহল থেকে ঢাকায় বাংলার রাজধানী স্থানান্তর করেন। সম্রাটের নামানুসারে ঢাকার নাম রাখা হয় 'জাহাঙ্গীরনগর'। সুবাদার ইসলাম খান বিদ্রোহী ভূঁইয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করে যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য, ভাটির (সোনারগাঁওয়ের) মুসা খান, মজলিশ কুতুব খান এবং বাকলার রামচন্দ্র প্রমুখ জমিদারদের পরাজিত ও বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। ১৬১২ খ্রিষ্টাব্দে বিদ্রোহী উসমান খান পরাজিত ও নিহত হলে বাংলায় আফগান শক্তি সম্পূর্ণ নির্মূল হয় এবং বাংলায় মুঘলবিরোধী প্রতিরোধের অবসান ঘটে।

মেবার বিজয়: মেবার বিজয় সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের একটি বিশেষ ঘটনা। মেবারের রানা অমর সিংহ তার পিতা বীর কেশরী রানা প্রতাপ সিংহের মতোই স্বাধীনচেতা ছিলেন। তার স্বাধীনতা বজায় রাখার চেষ্টার কারণে তিনি সম্রাট জাহাঙ্গীরের চক্ষুশূলে পরিণত হন। সম্রাট জাহাঙ্গীর প্রথমে যুবরাজ পারভেজ এবং পরে সেনাপতি মহব্বত খান ও আবদুল্লাহ খানের নেতৃত্বে মেবারের বিরুদ্ধে পরপর কয়েকটি অভিযান প্রেরণ করেন। কিন্তু মুঘল বাহিনী মেবারের বিরুদ্ধে বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। এমতাবস্থায় সম্রাট ১৬১৩ খ্রিষ্টাব্দে তার তৃতীয় পুত্র শাহজাদা খুররমের নেতৃত্বে একটি অভিযান প্রেরণ করেন। মুঘল বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণ এবং মাসের পর মাস অবরুদ্ধ থাকার পর রানা অমর সিংহ পরাজয়বরণ এবং মুঘল আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য হন। ১৬১৫ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীর ও রানা অমর সিংহের মধ্যে একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। আর. পি. ত্রিপাঠির মতে, এ চুক্তি সম্পাদনের ফলে দুটি রাজশক্তির মধ্যে প্রায় শতাব্দীকাল ধরে চলমান বিরোধের অবসান ঘটে।

কাংড়া ও কিস্তাওয়ার বিজয়: কাংড়া ছিল উত্তর পাঞ্জাবের শতদ্রু ও রাভী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ। ১৬১০ খ্রিষ্টাব্দে সেনাপতি মুর্তজা খান এ দুর্গটি দখলে ব্যর্থ হলে সম্রাট শাহজাদা খুররমের ওপর দুর্গ দখলের দায়িত্ব দেন। প্রায় চৌদ্দ মাস অবরোধ করে রাখার পর মুঘল বাহিনী কাংড়া দুর্গ দখলে সক্ষম হয়। ১৬২০ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাটের নির্দেশে কাশ্মিরের শাসনকর্তা দিলওয়ার খান কিস্তাওয়ারের রাজাকে মুঘল আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করেন।

দাক্ষিণাত্য অভিযান: দাক্ষিণাত্যে মুঘল সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ সম্রাট আকবরের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। সিংহাসনে আরোহণ করে সম্রাট জাহাঙ্গীর দাক্ষিণাত্য অভিযানের সিদ্ধান্ত নেন। প্রথমেই তিনি আহমদনগর রাজ্যের দিকে দৃষ্টি দেন। নিজামশাহী সুলতানদের শাসনাধীন আহমদনগর রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মালিক অম্বর নামক একজন হাবসি ক্রীতদাস। মালিক অম্বরের প্রচেষ্টায় আকবর কর্তৃক বিজিত আহমদনগরের নিজামশাহী শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সম্রাট জাহাঙ্গীর দাক্ষিণাত্য জয়ের চেষ্টা করলে মালিক অম্বর তাকে বাধা দেন। যুবরাজ পারভেজ, আবদুর রহিম খান-ই-খানান এবং খান-ই-জাহান লোদির অভিযান ব্যর্থ হলে সম্রাট ১৬১০ খ্রিষ্টাব্দে শাহজাদা খুররমকে দাক্ষিণাত্য অভিযানে প্রেরণ করেন। খুররম বিচক্ষণ ও সাহসী মুঘল সেনানায়কদের সহায়তায় আহমদনগর পুনরাধিকার করেন। শাহজাদা খুররমের সাফল্যে সম্রাট খুব খুশি হন এবং তাকে 'শাহজাহান' (পৃথিবীর রাজা) উপাধি দেন এবং তার মনসব বৃদ্ধি করেন। অবশ্য দাক্ষিণাত্যে মুঘলদের এ বিজয়ও স্থায়ী হয়নি। মুঘলদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-বিবাদের সুযোগে মালিক অম্বর মুঘল অধিকৃত অঞ্চলসমূহ পুনরাধিকার করেন এবং ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে অম্বরের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি মুঘলদের অগ্রগতি প্রতিরোধ করেন।

কান্দাহার হস্তচ্যুত: কান্দাহার মুঘল সাম্রাজ্যের উত্তর দিকের বহিঃসীমান্তে অবস্থিত । পারস্য রাজ মহামতি শাহ আব্বাস যুবরাজ খসরুর বিদ্রোহের সুযোগে কান্দাহার জয়ের চেষ্টা করেন। তার প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে তিনি সম্রাট জাহাঙ্গীরের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেন। শাহ আব্বাসের বন্ধুত্বে বিশ্বাস স্থাপন করে সম্রাট জাহাঙ্গীর কান্দাহারের সুরক্ষার

ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করেন। এই সুযোগে ১৬২২ খ্রিষ্টাব্দে শাহ আব্বাস কান্দাহার জয় করে নেন। জাহাঙ্গীর স্বীয় পুত্র খুররমকে (শাহজাহান) কান্দাহার পুনরুদ্ধারের নির্দেশ দেন। কিন্তু সিংহাসনের উত্তরাধিকার বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কায় শাহজাহান কান্দাহার অভিযানে অস্বীকৃতি জানান। সম্রাট জাহাঙ্গীর এতে মর্মাহত হন। কান্দাহার পুনরুদ্ধারে শাহরিয়ারের নেতৃত্বে অভিযান প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিলেও শাহজাহানের বিদ্রোহ এবং দাক্ষিণাত্যে মালিক অম্বরের তৎপরতা ইত্যাদি কারণে সম্রাটের পক্ষে কান্দাহার পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

মুঘল সাম্রাজ্যে বিদ্রোহ (Revolt in Mughal Empire)

শাহজাদা খুররমের (শাহজাহান) বিদ্রোহ: সম্রাট জাহাঙ্গীরের শেষ দিনগুলো বিদ্রোহ-বিপ্লবের কারণে নিরানন্দ হয়ে উঠেছিল। এ সময় সিংহাসন দখল করার জন্য তার পুত্ররা ক্ষিপ্র হয়ে পড়েন এবং পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের চার পুত্র ছিলেন। এদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র খসরু ইতোপূর্বে মৃত্যুবরণ করেন। জীবিতদের মধ্যে পারভেজ ও শাহরিয়ার অপেক্ষা খুররম ছিলেন নিঃসন্দেহে যোগ্য ও প্রতিশ্রুতিবান। কিন্তু বিমাতা নূরজাহানের মাত্রাতিরিক্ত ক্ষমতালিপ্সা এবং নানামুখী ষড়যন্ত্রে খুররম উত্তরাধিকার বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা করেন। সম্রাজ্ঞী নূরজাহান খুররমের পরিবর্তে শাহজাদা শাহরিয়ারকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করার ব্যাপারে তৎপর হয়ে ওঠেন। শাহরিয়ারের সাথে তার প্রথম পক্ষের কন্যাকে বিয়ে দিয়ে নূরজাহান তাকে জামাতা বানান। এমতাবস্থায় ১৬২২ খ্রিষ্টাব্দে পারস্য সম্রাট কান্দাহার দখল করলে সম্রাট জাহাঙ্গীর শাহজাদা খুররমকে কান্দাহার পুনরুদ্ধারের নির্দেশ দেন। শাহজাদা খুররম একে তার বিরুদ্ধে বিমাতা নূরজাহানের ষড়যন্ত্র বলে মনে করলেন। তিনি ভাবলেন দিল্লি থেকে দূরবর্তী স্থানে পাঠিয়ে নূরজাহান তার পিতাকে দিয়ে শাহরিয়ারের উত্তরাধিকার নিশ্চিত করে নেবেন। কাজেই খুররম পিতার আদেশ অমান্য করেন এবং বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। শাহজাদা খুররমের বিদ্রোহে সম্রাট মর্মাহত হন। নূরজাহানের পরামর্শে সম্রাট শাহজাদা পারভেজ ও সেনাপতি মহব্বত খানকে খুররমের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। ১৬২৩ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লির দক্ষিণে বালোচপুরের যুদ্ধে রাজকীয় বাহিনীর নিকট পরাজিত হয়ে খুররম প্রথমে মান্ডু ও পরে দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করেন। দাক্ষিণাত্যে বিশেষ সুবিধা করতে না পেরে তিনি বাংলায় চলে যান। তবে সেখান থেকেও বিফল হয়ে খুররম পুনরায় দাক্ষিণাত্যে মালিক অম্বরের কাছে আশ্রয় নেন। মালিক অম্বরের সহায়তায় বোরহানপুর জয়ের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর হতাশ খুররম পিতার কাছে আত্মসমর্পণ করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। উদার হৃদয় সম্রাট জাহাঙ্গীর পুত্র খুররমের অপরাধ ক্ষমা করে দিলেন। এভাবেই খুররমের বিদ্রোহের অবসান ঘটে। তবে শাহজাদা খুররমের বিদ্রোহ মুঘল সাম্রাজ্যের সংহতি নষ্ট করেছিল। এ বিদ্রোহের ফলে কান্দাহার মুঘলদের হাতছাড়া হয়ে যায়। দাক্ষিণাত্যের মুঘল অধিকৃত অনেক অঞ্চলও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

মহব্বত খানের বিদ্রোহ: শাহজাদা খুররমের বিরুদ্ধে মহব্বত খানের সামরিক সাফল্য এবং শাহজাদা পারভেজের সাথে তার সৌহার্দ্য ও সখ্য নূরজাহানের মনে ঈর্ষা ও ক্ষোভের উদ্রেক করে। নূরজাহান তার জামাতা শাহরিয়ারের উত্তরাধিকারের ব্যাপারেও উদ্বিগ্ন বোধ করেন। এমতাবস্থায় সম্রাজ্ঞী নূরজাহান মহব্বত খানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করেন। শাহজাদা পারভেজের অমত সত্ত্বেও মহব্বত খানকে রাজকীয় বাহিনীর সেনাপতির পদ থেকে অপসারণ করে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করা হয়। মহব্বত খান এ সিদ্ধান্ত সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি। অবশ্য প্রথমে আপত্তি করলেও শেষ পর্যন্ত সরকারি নিয়োগ আদেশ মেনে নেন। কিন্তু এবার মহব্বত খানের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাৎ ও দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয়। মহব্বত খানের কাছে খুররমের বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রাপ্ত অর্থের হিসাব চাওয়া হয়। বাংলা থেকে পাওয়া হাতি ও ধনসম্পদ সম্রাটের কাছে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, সম্রাটের বিনা অনুমতিতে মহব্বত খান কেন নিজের কন্যার বিয়ে ঠিক করেছেন তার জন্যও কৈফিয়ত চাওয়া হয়। ভাবী জামাতাকে রাজ দরবারে ডেকে এনে অপমান ও নির্যাতন করা হয়। দৃঢ়চেতা ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহব্বত খানের পক্ষে এসব অপমান নীরবে সহ্য করা সম্ভব ছিল না। তিনি অনন্যোপায় হয়ে ১৬২৬ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। বিদ্রোহী মহব্বত খান সম্রাট জাহাঙ্গীরকে বন্দির উদ্দেশ্যে বেশকিছু সংখ্যক রাজপুত সৈন্যসহ তার সমর্থকদের নিয়ে কাবুলের উদ্দেশ্যে রওনা হন। কারণ সম্রাট জাহাঙ্গীর তখন সসৈন্যে কাবুল অভিযানে বেরিয়েছিলেন। কাবুল যাওয়ার পথে ঝিলাম নদীর তীরে মহব্বত খানের সাথে রাজকীয় বাহিনী মুখোমুখি হয়। মহব্বত খান সম্রাটের শিবির অবরোধ করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর বন্দি হন। সামরিক শক্তি প্রয়োগে ব্যর্থ হয়ে কুশলী নূরজাহান স্বেচ্ছায় বন্দিত্ব বরণ করেন। এরপর বুদ্ধি ও কৌশল দ্বারা মহব্বত খানকে বিভ্রান্ত করে তিনি স্বামী সম্রাট জাহাঙ্গীরকে মুক্ত করে নিয়ে যান। মুক্ত হয়ে সম্রাট মহব্বত খানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রোটাসে সৈন্য সমাবেশ করেন। পরিস্থিতি প্রতিকূল দেখে মহব্বত খান দাক্ষিণাত্যে পালিয়ে যান এবং শাহজাদা খুররমের সাথে মিলিত হন।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের সাথে ইউরোপীয়দের সম্পর্ক
Relationship between Emperor Jahangir and Europeans

পর্তুগিজরা ভারতে আসা ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রথম। প্রথম দিকে তাদের প্রতি সম্রাটের সহানুভূতি থাকলেও পর্তুগিজরা মুঘলদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়। পর্তুগিজরা সুরাট বন্দরে চারটি মুঘল জাহাজ আটক এবং বিদ্রোহীদের সমর্থন ও সহযোগিতা করলে সম্রাট তাদের প্রতি ক্ষুব্ধ হন। ১৬১৩ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট পর্তুগিজ ঘাঁটি আক্রমণ করে তাদের পরাস্ত করেন। ভারতে তাদের প্রদত্ত সব সুযোগ-সুবিধা প্রত্যাহার করা হয়। আগ্রা ও লাহোরের পর্তুগিজ গির্জাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। পর্তুগিজদের প্রতি সম্রাটের বিরূপ মনোভাব পরিবর্তনের মধ্যস্থতা করতে এগিয়ে আসেন জেসুইট মিশনারিরা। ফাদার জেভিয়ার, পিনহেইরো, জোসেফ ডি ক্যাস্ট্রো সংস্টপ প্রমুখ জেসুইট পাদ্রীদের সাথে জাহাঙ্গীরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। জেসুইট মিশনারিদের মধ্যস্থতায় সম্রাটের সাথে পর্তুগিজদের সম্পর্কের কিছুটা উন্নতি ঘটে।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ইংরেজরাও মুঘলদের অনুগ্রহ লাভে বিশেষভাবে সচেষ্ট ছিল। ১৬০৮ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমস ইংরেজ বণিকদের কিছু সুযোগ-সুবিধা প্রদানের অনুরোধ জানিয়ে উইলিয়াম হকিন্স নামক একজন দূতকে সম্রাটের দরবারে পাঠিয়েছিলেন। তবে পর্তুগিজ ও জেসুইট মিশনারিদের বিরোধিতায় এ যাত্রায় ইংরেজরা বিশেষ সুবিধা আদায় করতে পারেননি। এ অবস্থায় ১৬১৫ খ্রিষ্টাব্দে রাজা প্রথম জেমস টমাস রোকে পুনরায় জাহাঙ্গীরের দরবারে দূত হিসেবে পাঠান। সুদক্ষ কূটনৈতিক টমাস রো সম্রাটের আনুকূল্য অর্জনের উদ্দেশ্যে দরবারের প্রভাবশালী সম্রাজ্ঞী নূরজাহান, আসফ খান ও শাহজাদা খুররমের সাথে সখ্য গড়ে তোলেন। তাদের মাধ্যমে তিনি সম্রাটের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হন। শেষ পর্যন্ত সম্রাট ইংরেজদের কিছু বাণিজ্যিক সুবিধা প্রদান করেন। সম্রাটের পক্ষ থেকে ইংরেজদের পক্ষে একটি ফরমান জারি করা হয়। এ সময় হকিন্স ও টমাস রো ছাড়াও উইলিয়াম কিন্স (১৬০৮-১৬১১ খ্রি.), নিকলাস উইলিংটন (১৬১২-১৬১৬ খ্রি.), টমাস কোরাট (১৬১২-১৬১৭) এবং এডওয়ার্ড টেরি প্রমুখ ইংরেজ দূত ও পর্যটক ভারতবর্ষে এসেছিলেন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ১৬০৮ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীর কাকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন?
২. ঢাকার নামকরণ জাহাঙ্গীরনগর করা হয় কত খ্রিষ্টাব্দে? *[ঢাবি ২০১৬-১৭; জবি ২০১৬-১৭]*
৩. সর্বপ্রথম বাংলার রাজধানী ঢাকায় স্থাপন করেন কে? *[জবি ২০১৬-১৭]*
৪. ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রথম ভারতে আসে কারা?
৫. ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমস কার দরবারে দূত পাঠান?
৬. কোন মুঘল সম্রাট ইংরেজদের বাণিজ্যিক সুবিধা দিয়ে ফরমান জারি করেন?

উত্তরের জন্য ২৪৪ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় সাম্রাজ্যে যেসব বিদ্রোহ দেখা দেয় সেগুলোর একটি তালিকা তৈরি করো।

গ. দলীয় কাজ

'সিংহাসন নিয়ে নূরজাহানের ষড়যন্ত্রই শাহজাহানের বিদ্রোহের মূল কারণ'— দুটি দলে বিভক্ত হয়ে পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি দাও।

পাঠ ১৮ ও ১৯

সম্রাট জাহাঙ্গীরের ওপর নূরজাহানের প্রভাব এবং সম্রাট জাহাঙ্গীরের চরিত্র ও কৃতিত্ব (Influence of Nurjahan on Emperor Jahangir and Character and Achievements of Emperor Jahangir)

সম্রাট জাহাঙ্গীরের ওপর নূরজাহানের প্রভাব (Influence of Nurjahan on Emperor Jahangir)

ঐতিহাসিক ভি. ডি. মহাজন বলেছেন, "নূরজাহানের গল্প সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে।" নূরজাহান শুধু তার স্বামীকে প্রভাবান্বিতই করেননি বরং কয়েক বছর রাষ্ট্রীয় কাজেও অনন্য প্রতিভার পরিচয় দেন।

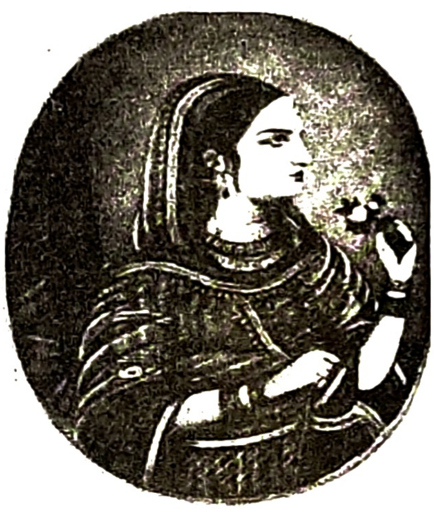

নূরজাহান

নূরজাহানের প্রকৃত নাম ছিল মেহের-উন-নিসা। তিনি ছিলেন মুঘল অমাত্য মির্জা গিয়াস বেগের কন্যা। মেহের-উন-নিসার প্রথম বিয়ে হয়েছিল বাংলার বর্ধমানের জায়গিরদার আলী কুলি ইস্তাজুলের (শের আফগান নামেও পরিচিত) সাথে। ১৬০৭ খ্রিষ্টাব্দে মুঘলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আলী কুলি নিহত হলে তার বিধবা স্ত্রী মেহর-উন-নিসা তার শিশুকন্যা লাডলী বেগমসহ মুঘল দরবারে আশ্রয় পান। ১৬১১ সালে মুঘল রাজমহলে অনুষ্ঠিত এক মিনা বাজারে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সাথে মেহের-উন-নিসার প্রথম দেখা হয়। মেহের-উন-নিসার রূপ লাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে সম্রাট জাহাঙ্গীর তাকে বিবাহ করেন। মেহের-উন-নিসাকে সম্রাট তার প্রধান মহীসীর স্ত্রী মর্যাদা দিয়ে প্রথমে 'নূর মহল' (প্রাসাদের আলো) এবং পরে নূরজাহান (পৃথিবীর আলো) উপাধি দেন। তখন থেকেই মেহের-উন-নিসা 'নূরজাহান' নামেই পরিচিতি লাভ করেন। ১৬১১ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সাথে নূরজাহানের বিবাহের পর থেকে প্রায় ১৫ বছর সাম্রাজ্যে প্রবল প্রতিপত্তি ও প্রভাব বিস্তার করেছিলেন অসামান্য রূপ ও অসাধারণ গুণের অধিকারী এ নারী। নূরজাহানের ছিল তীক্ষ্ণবুদ্ধি, প্রগাঢ় সাধারণ জ্ঞান এবং শিল্প সাহিত্যের প্রতি প্রবল অনুরাগ। তার এসব গুণ মুঘল দরবারকে গৌরবান্বিত করে। জাহাঙ্গীরের ওপর তার প্রভাব ছিল অসামান্য এবং তার নির্দেশ মন্ত্রী ও সভাসদরা অমান্য করতে পারত না। নূরজাহানের প্রতিকৃতি মুদ্রায় জাহাঙ্গীরের সঙ্গে মুদ্রিত হয়। রাজদণ্ড নিজের হাতে ধারণ না করলেও তিনি দরবারে সর্বেসর্বা ছিলেন এবং সম্রাট তার হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হয়ে পড়েন। ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ নূরজাহানকে সিংহাসনের পশ্চাতের শক্তি (Power behind the throne) বলে অভিহিত করেছেন। তিনি মৃগয়ায় স্বামীর সাথে ব্যাঘ বধ করতেন। নূরজাহান তার প্রভাবে পিতা ইতিমাদ্দৌলা এবং ভ্রাতা আসফ খানকে দরবারের দায়িত্বশীল সভাসদে পরিণত করেন। অধিকন্তু শের আফগানের ঔরসজাত কন্যা লাডলী বেগমের সাথে জাহাঙ্গীরের কনিষ্ঠ পুত্র শাহরিয়ারের বিবাহ দিয়ে নূরজাহান নিজ ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন। তবে নূরজাহানের এ প্রভাব সাম্রাজ্যে অনেকাংশে নানা ধরনের বিদ্রোহের বীজ বপন করেছিল। মহব্বত খান এবং সম্রাটপুত্র খুররম সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিল, যা সাম্রাজ্যের শান্তি চরমভাবে বিঘ্নিত করেছিল। ১৬২৭ খ্রিষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর নূরজাহান রাজনীতি থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হন। এরপর তিনি মেয়ে লাডলী বেগমকে নিয়ে লাহোরে সাধারণ জীবনযাপন করেন। ১৬৪৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Emperor Jahangir)

সম্রাট জাহাঙ্গীরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি বিশ্লেষণে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভিন্নতা দেখা যায়। ঈশ্বরী প্রসাদ, ড. বেনি প্রসাদ, ফ্রান্সিস গ্লাডউইন প্রমুখ ঐতিহাসিক জাহাঙ্গীরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, "জাহাঙ্গীর ছিলেন মুঘল ইতিহাসে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী।"[২৮] ড. বেনি প্রসাদের মতে, "তিনি সুবিবেচক ও দয়ালু। পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি অনুরাগপ্রবণ, মহানুভব ছিলেন।" প্রজাকে প্রতি সম্রাটের মনোভাব সদয় এবং সহানুভূতিশীল ছিল বলে গ্লাডউইন উল্লেখ করেছেন।

---

[২৮] Jahangir is one of the most interesting figures in Mughal history. Ref. Ishwari Prasad, *A Short History of Muslim Rule in India. P. 372*

অন্যদিকে, ইউরোপীয় ঐতিহাসিক বিশেষ করে ভিনসেন্ট স্মিথ, আলেকজান্ডার টড, টেরি এবং বেভারিজ প্রমুখ জাহাঙ্গীরের চারিত্রিক দুর্বলতার কঠোর সমালোচনা করেন। অনেকেই মনে করেন জাহাঙ্গীর ছিলেন মদ্যপায়ী, আফিমসেবী, ব্যভিচারী, আরামপ্রিয় ও অত্যাচারী শাসক। পর্যটক এডওয়ার্ড টেরির বর্ণনা মতে, জাহাঙ্গীরের চরিত্র ছিল পরস্পরবিরোধী গুণাবলির সমষ্টি। টেরি বলেন, "কখনও কখনও তাকে নিষ্ঠুর আবার কখনও মনে হতো তিনি ছিলেন অতিমাত্রায় নম্র ও ভদ্র।"[২৯] ভিনসেন্ট স্মিথের মতে, "জাহাঙ্গীরের চরিত্র ছিল দয়া, নম্রতা, ন্যায়ানুগতা, খামখেয়ালিপনা, মার্জিত রুচিবোধ, পাষণ্ডতা, সুজ্ঞান, শিশুসুলভতার বিস্ময়কর সংমিশ্রণ।"[৩০] বেভারিজের বর্ণনাতেও জাহাঙ্গীরের চরিত্রে পরস্পরবিরোধী দোষ-গুণের অদ্ভুত সংমিশ্রণের কথা বলা হয়েছে।

জাহাঙ্গীরের চরিত্রে পরস্পরবিরোধী বৈশিষ্ট্যও ছিল চোখে পড়ার মতো। তার মধ্যে তীব্র মমত্ববোধ ছিল। তবে ক্রোধের বশবর্তী হয়ে চরম নৃশংসতা প্রদর্শন করতেও তিনি দ্বিধা করতেন না। আবার অপরাধীদের প্রতি ক্ষমাশীলতারও অসংখ্য নজির দেখা যায়। তিনি চপলমতিও ছিলেন। তার মধ্যে অনেক অনুকরণীয় গুণাবলিই ছিল। তিনি রুচিশীল শিল্পবোধের অধিকারী ছিলেন।

জাহাঙ্গীরের ধর্ম বিশ্বাস ও ধর্মনীতি সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কারও কারও মতে, তিনি ছিলেন নাস্তিক। কেউ কেউ মনে করেন সম্রাট বাইরে মুসলমান হলেও ভিতরে ছিলেন খ্রিষ্টান। তারা সম্রাটের শোয়ার ঘরে মাতা মেরি এবং যিশুর মূর্তি থাকার কথা উল্লেখ করেছেন। তবে অধিকাংশ পণ্ডিত মনে করেন সম্রাট জাহাঙ্গীর আল্লাহর প্রতি যেমন অবিশ্বাসী ছিলেন না, তেমনি খুব বেশি ধর্মনিষ্ঠও ছিলেন না। হিরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, "তিনি ধর্মের ব্যাপারে দীন-ই-ইলাহী বাদে প্রায় সর্বক্ষেত্রে পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন।"[৩১] ড. বেনী প্রসাদের মতে, "তিনি আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন। সব ধর্মের প্রতি তার সহিষ্ণুতাবোধ ছিল এবং তিনি 'সুলহ-ই-কুল' নীতি অনুসরণ করতেন।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের কৃতিত্ব (Achievements of Emperor Jahangir)

সফল শাসক: পিতা আকবরের মতো বিচক্ষণ না হলেও শাসক হিসেবে জাহাঙ্গীর মোটামুটি সফল ছিলেন। ঈশ্বরী প্রসাদের মতে, জাহাঙ্গীর একজন বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ কূটনীতিবিদ ছিলেন এবং অতি সহজেই তিনি সাম্রাজ্যের সমস্যাসমূহ উপলব্ধি করতে পারতেন। তার কোনো উপদেষ্টা বা মন্ত্রিসভা না থাকায় সম্রাট নিজেই রাজনৈতিক সমস্যাসমূহ মীমাংসা করতেন। শাসনসংস্কারে তিনি কোনো উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেননি, তবে তিনি তার পিতার শাসনব্যবস্থা অব্যাহত রাখার চেষ্টা করেন। ফলে খুররম ও মহব্বত খানের বিদ্রোহ বাদ দিলে তার সময়ে বড় রকমের কোনো অঘটন দেখা যায় না।

বিজেতা: সম্রাট জাহাঙ্গীর একজন সাহসী এবং নিপুণ সমরনায়ক ছিলেন। তিনি নিজে যুদ্ধের পরিকল্পনা করতেন এবং যুদ্ধ বিষয়ে সেনাপতিদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিতেন। তবে লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, তিনি বিজেতা হিসেবে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেননি। তার সময়ে কাংড়া ও মেবার মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করা ছাড়া মুঘল সেনাবাহিনী আর কোনো বড় বিজয় অর্জন করতে পারেনি।

শিল্প ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক: সম্রাট জাহাঙ্গীর ফারসি ভাষা ও সাহিত্যে এবং তুর্কি বিশেষভাবে দক্ষ ছিলেন। তিনি হিন্দি কবিতা পছন্দ করতেন এবং নিজে ফারসি ভাষায় কবিতা রচনা করতেন। ইতিহাস, ভূগোল ও জীবনচরিত বিষয়ে তার বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি *তুযুক-ই-জাহাঙ্গীরী'* নামে একটি আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ রচনা করেন। এটি মধ্যযুগের ভারতীয় ইতিহাসের একটি অমূল্য ঐতিহাসিক উপাদান

জেনে রাখো

রোমের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক অগাস্টাস সিজারের মূল নাম সিজার জুলিয়াস গাইয়াম অক্টাভিয়াস। রানি ক্লিওপেট্রা ও মার্ক এন্থোনির পরাজয়ের পর ৩১ খ্রিষ্টপূর্বে শুরু হয় তার রাজত্ব। তার শাসনামল রোমের স্বর্ণযুগ হিসেবে পরিচিত। তিনি রোমে সিনেট প্রতিষ্ঠা করে প্রজাতন্ত্র ফিরিয়ে আনেন। তার শাসনামল থেকে রোমে শুরু হয় যুদ্ধবিহীন শান্তিনীতি। যাকে ইতিহাসবিদরা 'প্যাক্স রোমানা' আখ্যা দিয়েছিলেন। তিনি রোমকে শিল্প সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক উচ্চ শিখরে পৌঁছে দিয়েছিলেন। তার সম্মানে বছরের অষ্টম মাসের নাম রাখা হয় আগস্ট। আর তাই কোনো শাসক বা তার শাসনামল বিশেষ সমৃদ্ধি অর্জন করলে এ অগাস্টাস সিজারের শাসনামলের সাথেই তুলনা করা হয়।

---

[২৯] For sometimes he was cruel and at other times he would seems to be exceedinglly fair and gentle. Ishwari Prasad.

[৩০] A strange compound of tenderness and cruelty, justice and caprice, refinement and bratality, good sense and childish. Ishwari Prasad.

[৩১] *ভারতবর্ষের ইতিহাস*, পৃ.৮৪

হিসেবে বিবেচিত হয়। ঐতিহাসিকেরা সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালকে ভারতীয় সাহিত্যের 'অগাস্টাস যুগ' বলে অভিহিত করেন। তার সময়ে তুলসী দাস রামায়ণের অনুবাদ করেন। নিয়ামতুল্লাহ, নাজির খান, আবদুল হক দেহলভী প্রমুখ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতেরা সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় চিত্রশিল্পের ব্যাপক উন্নতি ঘটে। পার্সি ব্রাউন জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালকে চিত্রশিল্পের 'চরম উৎকর্ষের যুগ' বলে অভিহিত করেছেন। সম্রাট নিজে একজন কৃতী চিত্রশিল্পী ছিলেন। চিত্রবিদ্যায় তার অনুরাগের জন্য তাকে 'শিল্পীদের রাজা' বলা হয়। জাহাঙ্গীর চিত্রশিল্পীদের বিশেষ সমাদর করতেন। শিল্পীদের উৎসাহিত করার জন্য তিনি উচ্চ মূল্যে ছবি কিনতেন। তার সময়ে আবুল হাসান, ফারুক বেগ, আবদুস সামাদ, মোহাম্মদ নাদির, মুহাম্মদ মুরাদ, ওস্তাদ মনসুর, বিষ্ণু দাস, মনোহর, গোবর্ধন, আগা রেজা প্রমুখ ছিলেন বিখ্যাত চিত্রশিল্পীদের অন্যতম।

স্থাপত্য শিল্প বিষয়ে সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিশেষ উৎসাহ ছিল না। তবে সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের অনুপ্রেরণায় এ সময় ইতিমাদ-উদ-দৌলার সমাধি, লাহোর প্রাসাদ, শালিমার বাগ এবং জাহাঙ্গীরের সমাধি সৌধসহ বেশকিছু স্থাপত্য নির্মিত হয়েছিল। সম্রাজ্ঞী নূরজাহান ছিলেন ললিতকলা বিশেষজ্ঞ। তিনি নানা ধরনের শিল্পে নিপুণা ছিলেন। তিনি বিভিন্ন পোশাক, অলংকার, প্রসাধন সামগ্রীর উদ্ভাবক। তিনি মুঘল রাজপরিবারে ওড়না ও কাঁচুলির প্রর্বতন করেন। সংগীতের প্রতিও সম্রাটের এবং সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের অনুরাগ ছিল বলে জানা যায়।

খ্যাতিমান ন্যায়বিচারক: ন্যায়বিচারক হিসেবে সম্রাট জাহাঙ্গীর বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। মজলুম বিচারপ্রার্থী যাতে সম্রাটের কাছে সরাসরি তার অভিযোগ পেশ করতে পারে, সেজন্য তিনি বিচার ঘণ্টা স্থাপন করেন। জাতি-ধর্ম, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সব বিচারপ্রার্থীই ঘণ্টার সাথে যুক্ত শিকল টেনে সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারতেন। তিনি অপরাধীদের শাস্তির ব্যাপারে কঠোর ছিলেন। তিনি দস্তুরুল আমল নামক ১২টি আইন বিধিও প্রবর্তন করেছিলেন।

সম্রাট জাহাঙ্গীর পিতা সম্রাট আকবরের মতো অধিক যোগ্যতর না হলেও এবং তার চরিত্রে অনেক সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও তাকে একজন সফল শাসক বলা যায়। কেননা এ সময় সাম্রাজ্যে মোটামুটি শান্তি- শৃঙ্খলা বজায় ছিল। অর্থনৈতিক অবস্থার ব্যাপক উন্নতি না ঘটলেও দেশে অভাব ছিল না। ঐতিহাসিক হকিন্সের মতে, সম্রাটের বার্ষিক আয় ছিল পঞ্চাশ কোটি টাকা। ইউরোপীয় পর্যটকদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, এ সময় দ্রব্যসামগ্রী সস্তা এবং জনসাধারণের নাগালের মধ্যে ছিল। এ সময় ললিতকলারও বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। এসব দিক বিবেচনায় সম্রাট জাহাঙ্গীরকে ভারতীয় ইতিহাসে যোগ্য নরপতিদের কাতারভুক্ত করা যায়। এল. পি. শর্মা যর্থাথই বলেছেন, "জাহাঙ্গীর অবশ্য মহান মুঘল সম্রাটদের অন্যতম হিসেবে বিবেচিত হতে পারেন।"[৩২] ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, "তার চরিত্রে অনেক কিছু ঘৃণার দিক থাকলেও এমন অনেক গুণও রয়েছে যার ফলে তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাসে আকর্ষণীয় নরপতির কাতারে বসবার যোগ্য বটে।"

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. নূরজাহানের বাল্যনাম কী? *[সকল বোর্ড ২০১৬]*
২. নূরজাহান শব্দের অর্থ কী?
৩. দস্তুরুল আমলে কয়টি বিধি সন্নিবেশিত ছিল? *[সকল বোর্ড ২০২২; ২০১৮]*
৪. মুঘল দরবারে 'Bell of justice' এবং শিকলঘণ্টা চালু করেন কে?
৫. 'তুযুক-ই-জাহাঙ্গীরী' কার রচিত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ?
৬. কোন মুঘল সম্রাটকে 'শিল্পীদের রাজা' বলা হয়?

উত্তরের জন্য ২৪৪ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. নূরজাহানের চরিত্রের পাঁচটি ইতিবাচক ও পাঁচটি নেতিবাচক দিক চিহ্নিত করে ছক আকারে লেখো।
২. সম্রাট জাহাঙ্গীরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্বের আলোকে একটি চার্ট তৈরি করো।

---

[৩২] Jahangir, certainly can be regarded as one among the great Mughal emperors. – Ref. L. P. Sharma, *History of Mediaeval India* ,p- 337

পাঠ ২০

সম্রাট শাহজাহান: প্রাথমিক জীবন ও বাধা-বিপত্তি (১৬২৭-১৬৫৮ খ্রি.)
Emperor Shahjahan: Early Life and Problems (1627–1658 AD)

প্রাথমিক জীবন (Early Life)

সম্রাট শাহজাহান ১৫৯২ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজপুত স্ত্রী জগৎ গোসাইয়ের (মারওয়ারের রানা উদয় সিংহের কন্যা) গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তার প্রকৃত নাম খুররম (সদাপ্রসন্ন)। সম্রাট জাহাঙ্গীরের চার পুত্রের মধ্যে তিনি তৃতীয় ছিলেন। তিনি পিতামহ আকবর ও পিতা জাহাঙ্গীরের খুব প্রিয় ছিলেন। শাহজাদা খুররম বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতার জন্য পিতা সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিশেষ প্রিয় ও আস্থাবান ছিলেন। তাকে দায়িত্বপূর্ণ রাজকীয় পদ ও উচ্চ মনসব দান করা হয়েছিল। দক্ষ যোদ্ধা ছিলেন বলেই পিতা জাহাঙ্গীর তাকে মেবার ও দাক্ষিণাত্যের আহমদনগর রাজ্যের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে প্রেরণ করেছিলেন। আহমদনগরের প্রধানমন্ত্রী মালিক অম্বরকে পরাজিত করায় উল্লসিত সম্রাট জাহাঙ্গীর পুত্র খুররমকে 'শাহজাহান' (জগতের অধিশ্বর) উপাধি দেন। কৃতিত্বের পুরস্কারস্বরূপ শাহজাহান গুজরাটের শাসনকর্তার পদও লাভ করেন। ১৬১২ খ্রিষ্টাব্দে শাহজাদা খুররমের সাথে সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের ভাই আসফ খানের কন্যা আরজুমান্দ বানু বেগমের বিয়ে হয়। খুররম ১৬২২ খ্রিষ্টাব্দে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেও ১৬২৫ খ্রিষ্টাব্দে পিতা ও পুত্রের মধ্যে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। মৃত্যুর আগে পিতা জাহাঙ্গীর তাকে মুঘল সাম্রাজ্যের পরবর্তী উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান।

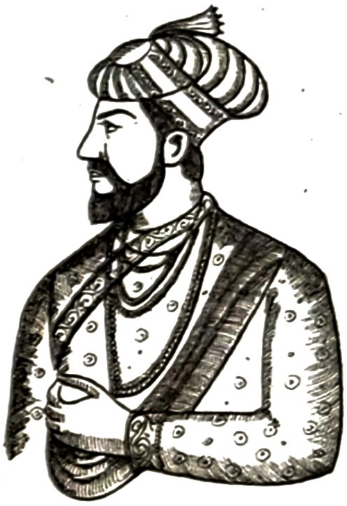
শিহাবউদ্দিন মুহাম্মদ শাহজাহান

সিংহাসনে আরোহণ: ১৬২৭ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর সাথে সাথে সিংহাসনকে কেন্দ্র করে উত্তরাধিকার সংগ্রাম শুরু হয়ে যায়। জাহাঙ্গীরের চার পুত্রের মধ্যে খসরু ও পারভেজ পিতার জীবদ্দশাতেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র শাহরিয়ার ছিলেন রাজধানীতে। আর শাহজাদা খুররম দাক্ষিণাত্যে। সম্রাটের মৃত্যুর পরপরই সম্রাজ্ঞী নূরজাহান তার জামাতা শাহরিয়ারকে রাজধানীতে সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করেন। রাজকোষ দখল এবং শাহজাদা খুররমের আগমন প্রতিহত করার জন্য প্রয়োজনীয় সামরিক প্রস্তুতি রাখা হয়। তবে রাজধানীতে অবস্থানরত প্রভাবশালী অমাত্য আসফ খান শাহরিয়ারের ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করেন। শাহজাদা খুররম রাজধানীতে ফিরে আসা পর্যন্ত তিনি সাময়িক সময়ের জন্য খসরুর পুত্র দাওয়ার বক্সকে সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করেন। এদিকে সংবাদ পেয়ে শাহজাদা খুররম দ্রুত রাজধানীর দিকে অগ্রসর হন এবং লাহোরের কাছে এক প্রতিরোধ যুদ্ধে শাহরিয়ারকে পরাজিত করে অন্ধ করে দেন। পথে সম্ভ্রান্ত স্থানীয় শাসকদের সমর্থন লাভ করে শাহজাদা খুররম বিজয়ী বেশে রাজধানীতে প্রবেশ করে আবুল মুজাফফর শিহাব উদ্দিন মুহাম্মদ সাহিব-ই-কিরান সানী শাহজাহান পাদশাহ 'গাজী' উপাধি নিয়ে মুঘল সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৬২৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি রাজসিক আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে সম্রাট হিসেবে শাহজাহানের অভিষেক সম্পন্ন হয়। সম্রাটের নামে খুতবা পাঠের ব্যবস্থা করা হয়। সম্রাজ্ঞী নূরজাহান রাজনীতি থেকে অবসর নিয়ে লাহোরে চলে যান। সম্রাট তার শ্বশুর আসফ খানকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ দেন।

প্রাথমিক বিপত্তি এবং উত্তরণের জন্য শাহজাহানের গৃহীত পদক্ষেপ
Initial Problems and Steps Taken by Shahjahan to recover it

জুঝুর সিংহের বিদ্রোহ: জুঝুর সিংহ ছিলেন বুন্দেলখণ্ডের রাজপুত সর্দার সিংহদেব বুন্দেলার পুত্র। শাহজাহানের রাজত্বের প্রথম বছরেই জুঝুর সিংহ বিদ্রোহ করেন। শাহজাহানের সেনাপতি মহব্বত খান সহজেই এ বিদ্রোহ দমন করেন। জুঝুর সিংহ সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেন। অবশ্য ১৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি পুনরায় বিদ্রোহ করেন। এবার সম্রাটের পুত্র শাহজাদা আওরঙ্গজেবের নেতৃত্বে মুঘল বাহিনী তাকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত ও দেশ থেকে বিতাড়িত করে। পলায়ন পথে পুত্র বিক্রমজিৎ সিংহসহ জুঝুর সিংহ গুণ্ডাদের হাতে নিহত হলে বুন্দেলখণ্ডে শাহজাহানের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

খানজাহান লোদির বিদ্রোহ: সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বের দ্বিতীয় বছরে আফগান সর্দার এবং দাক্ষিণাত্যের সাবেক সুবাদার খানজাহান লোদি বিদ্রোহ করেন। বুন্দেলখণ্ডে জুঝুর সিংহের বিদ্রোহ অপেক্ষা খানজাহানের বিদ্রোহ ভয়ংকর ছিল। কেননা আহমদনগরের শেষ নিজাম শাহী সুলতান নিজামুল মুলক খানজাহান লোদিকে সম্রাট শাহজাহানের বিরুদ্ধে সমর্থন দেন। খানজাহান কিছু মারাঠা ও রাজপুতদের কাছ থেকেও সমর্থন-সহযোগিতা পেয়েছিলেন বলে জানা যায়। সম্রাট শাহজাহান সেনাপতি আবদুল্লাহ ও মোজাফফরকে সুদক্ষ ও সাহসী সেনাবাহিনীসহ এ বিদ্রোহ দমনে প্রেরণ করেন।

পর্তুগিজদের বিরুদ্ধে অভিযান: ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইউরোপীয় পর্তুগিজ বণিকেরা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বাংলায় আসে এবং মুঘল প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে প্রথমে সাতগাঁও ও পরে হুগলিতে বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করে। কালক্রমে পতুর্গিজরা দুর্বৃত্তপনা শুরু করে। জলদস্যুতা ও দাস করে দ্বারা তারা জনজীবনকে অতিষ্ঠ করে তোলে। তাছাড়া পর্তুগিজ বণিকদের সাথে আগত খ্রিষ্টান পাদ্রীরা ইসলামবিরোধী তৎপরতা এবং কৌশল ও বলপ্রয়োগে এদেশের নিরীহ দরিদ্র লোকদের খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরিতকরণের চেষ্টা করে। বাংলার সুবাদার কাসিম খান পর্তুগিজদের এসব অসৎ আচরণ সম্পর্কে সম্রাট শাহজাহানকে অবহিত করেন।

এ পরিস্থিতিতে সম্রাট শাহজাহান পর্তুগিজদের সমুচিত শাস্তি দিতে কৃতসংকল্প হন। সম্রাটের নির্দেশে ১৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে কাসিম খান পুত্র এনায়েতুল্লাহর নেতৃত্বে হুগলি আক্রমণের জন্য একটি মুঘল বাহিনী প্রেরণ করেন। জল ও স্থল পথে তিন মাস অবরোধ করে রাখার পর পর্তুগিজরা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়।

দুর্ভিক্ষ ও মহামারি: সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বের চতুর্থ ও পঞ্চম বছরে (১৬৩০-৩২ খ্রি.) গুজরাট, খান্দেশ এবং দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য এলাকায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও মহামারি দেখা দেয়। প্রত্যক্ষদর্শী মির্জা আমিন কাজভিনী, ইংরেজ পর্যটক পিটার মান্ডি ও চার্লস টেম্পল মুঘল দরবারী ঐতিহাসিক আবদুল হামিদ লাহোরী প্রমুখের বিবরণীতেও দুর্ভিক্ষের আনুমানিক বর্ণনা পাওয়া যায়। বর্ণিত সূত্র মতে, এ সময় গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যে প্রচণ্ড খাদ্যাভাব দেখা দেয়। মানুষের দুঃখ-কষ্ট বর্ণনাতীত পর্যায়ে পৌছে। ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবৃত করার জন্য মানুষ মৃত মানুষের মাংস খেতে শুরু করে। বাজারের দোকানিরা ময়দার সাথে হাড়ের গুঁড়া মিশিয়ে বিক্রি করতে শুরু করে। এমনকি কুকুরের মাংসও বিক্রি করা আরম্ভ করে। এ দুর্ভিক্ষের সাথে মহামারি যোগ হওয়ায় বহু মানুষ মৃত্যুবরণ করে। আবদুল হামিদ লাহোরির *'পাদশাহনামা'* গ্রন্থের তথ্য অনুযায়ী জনতার এ দুর্দিনে সম্রাট নির্বিকার ছিলেন না। তিনি আক্রান্ত এলাকায় লঙ্গারখানা স্থাপনের নির্দেশ দেন। দুর্গতদের মধ্যে বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ করা হয়। উপদ্রুত এলাকায় এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব মাফ করে দেওয়া হয়।

কয়েকটি ছোট অভিযান: ১৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে শিখ সম্প্রদায়ের ষষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দের বিরুদ্ধে মুঘল বাহিনী অভিযান চালায়। অবশ্য শেষ পর্যন্ত দু'পক্ষের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে বিরোধের নিষ্পত্তি করা হয়। ১৬৩৭-৩৮ খ্রিষ্টাব্দে তিব্বতের আবদাল মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করে এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে সম্রাটকে দশ লাখ টাকা দিতে বাধ্য হয়। ১৬৩৯ খ্রিষ্টাব্দে অহমরাজের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি মোতাবেক আসামের সাথে মুঘল সাম্রাজ্যের সীমান্ত স্থির করা হয়। এসব অভিযান মুঘল সাম্রাজ্যের সংহতি বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছিল।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সম্রাট শাহজাহানের প্রকৃত নাম কী?
২. শাহজাদা খুররমকে 'শাহজাহান' (জগতের অধিশ্বর) উপাধি দেন কে? *[সকল বোর্ড ২০১৫]*
৩. শাহজাদা খুররমের সাথে কার বিয়ে হয়?
৪. সম্রাট শাহজাহান কত খ্রিষ্টাব্দে মুঘল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন?
৫. ভারত থেকে পর্তুগিজদের বিদায় করেন কে?
৬. কোন মুঘল সম্রাটের সময় দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন এলাকায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও মহামারি দেখা দেয়?

উত্তরের জন্য ২৪৪ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. প্রাথমিক বিপত্তি মোকাবিলায় সম্রাট শাহজাহানের গৃহীত পদক্ষেপগুলো ছক আকারে লেখো।

পাঠ ২১

সম্রাট শাহজাহানের সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ নীতি
Policy to Expansion of the Empire of Emperor Shahjahan

প্রাথমিক বাধা-বিপত্তি মোকাবিলা করে সাম্রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার পর সম্রাট শাহজাহান সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোযোগী হন। এক্ষেত্রে তিনি ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি গ্রহণ করেন। তার রাজ্যবিস্তার নীতি ও গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য জয়গুলো নিম্নরূপ:

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি: ভারতের মুসলিম শাসনের শুরু থেকেই শাসকগোষ্ঠীর কাছে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের নিরাপত্তার প্রশ্নটি বেশ গুরুত্ব লাভ করেছিল। এর কারণ এ সীমান্ত পথেই বার বার ভারত বিদেশি শক্তি দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। সম্রাট আকবর এ সত্য উপলব্ধি করেন এবং স্বয়ং কান্দাহার জয় করে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। এ লক্ষ্যে সম্রাট আকবর কান্দাহার নিয়ন্ত্রণে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষ পর্যায়ে পারস্য রাজ শাহ আব্বাস কান্দাহার অধিকার করে নেন। সম্রাট শাহজাহান ক্ষমতা লাভের পর কান্দাহার পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হন। তার নির্দেশে কাবুলের মুঘল সুবাদার কান্দাহারের পারসিক শাসনকর্তা আলি মর্দানকে অর্থ ও সম্মানের প্রলোভন দেখিয়ে ১৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে কান্দাহার মুঘলদের হাতে আনেন। ১৬৪৮ সালে পারস্য সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আব্বাস কান্দাহার আক্রমণ করেন। প্রচণ্ড শীতে তুষারপাতের কারণে প্রয়োজনীয় সামরিক সহায়তা না পাওয়ায় মুঘল শাসনকর্তা দৌলত খান ১৬৪৯ খ্রিষ্টাব্দে কান্দাহার পারস্যের হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। দৌলতখানের আত্মসমর্পণের সংবাদে সম্রাট শাহজাহান ভীষণ ক্ষুব্ধ হন। সম্রাটের নির্দেশে ১৬৪৯ খ্রিষ্টাব্দে শাহজাদা আওরঙ্গজেব ও প্রধানমন্ত্রী সাদ উল্লা খানের নেতৃত্বে মুঘল বাহিনী কান্দাহার অবরোধ করে। তবে পারসিকদের উন্নত যুদ্ধ কৌশল ও গোলন্দাজ বাহিনীর বিপুল বিক্রমের কাছে মুঘল শক্তি নতিস্বীকারে বাধ্য হয়। পরবর্তী সময়ে ১৬৫২ খ্রিষ্টাব্দে শাহজাদা আওরঙ্গজেবের নেতৃত্বে পুনরায় কান্দাহারে অভিযান প্রেরিত হলেও কোনো কার্যকর ফল আসেনি।

বারবার ব্যর্থতা সত্ত্বেও সম্রাট শাহজাহান কান্দাহার পুনরুদ্ধারে নিরুৎসাহিত হননি। সম্রাট ১৬৫৩ খ্রিষ্টাব্দে জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাশিকোকে কান্দাহার অভিযানে প্রেরণ করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে মুঘল বাহিনী কিছুটা সাফল্য পেলেও প্রচণ্ড শীত এবং তুষারপাতের কারণে মুঘল বাহিনীর বিপর্যয় ঘটে। শেষ পর্যন্ত এ অভিযানও প্রত্যাহার করতে হয়।

মধ্য-এশিয়া নীতি: ভারতবর্ষের মাটির সাথে গভীর সংযোগ সত্ত্বেও মহাবীর তৈমুরের উত্তরসূরি হিসেবে মুঘলরা তাদের পিতৃভূমি মধ্য এশিয়ায় আধিপত্য স্থাপনের স্বপ্ন মন থেকে মুছতে পারেনি। এ স্বপ্ন পূরণের জন্য বুখারার রাজা ইমাম কুলী ও তার পুত্র আব্দুল আজিজের মধ্যকার গৃহবিবাদের সুযোগে সম্রাট শাহজাহান ১৬৪৬ খ্রিষ্টাব্দে পুত্র মুরাদ ও আলি মর্দানের নেতৃত্বে অভিযান প্রেরণ করেন। মুঘল বাহিনী বলখ ও বাদাখশান জয় করেন। অবশ্য পর্বতসংকুল এ অঞ্চলে মুঘলদের শাসনকর্তৃত্ব সংহত করা সম্ভব হয়নি। তদুপরি উজবেকদের প্রতি আক্রমণে মুঘলদের অবস্থা নাজুক হয়ে পড়ে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শাহজাদা মুরাদ আগ্রায় ফিরে গেলে সম্রাট অধিকৃত অঞ্চলে মুঘল কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য প্রধানমন্ত্রী সাদুল্লাহ খানকে বলখে পাঠান। ১৬৪৭ সালে শাহজাদা আওরঙ্গজেব ও সুজার নেতৃত্বে মধ্য এশিয়ায় অভিযান পাঠানো হয়। ঐ অঞ্চলে মুঘল অধিকার বজায় রাখার জন্য আওরঙ্গজেবের একাগ্র প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। ১৬৪৭ খ্রিষ্টাব্দে মুঘল বাহিনী কাবুলে ফিরে গেলে সম্রাট শাহজাহানের পিতৃভূমি মধ্য এশিয়া বিজয়ের স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়।

সম্রাট শাহজাহানের মধ্য এশিয়া নীতি চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। এ ব্যর্থতায় মুঘলদের সম্মানহানি ও প্রভূত অর্থ ব্যয় হয়। অধ্যাপক যদুনাথ সরকার মনে করেন, সম্রাট শাহজাহানের অপরিণামদর্শিতার কারণেই তার মধ্য এশিয়ার নীতি ব্যর্থ হয়েছিল। এ অভিযানে মুঘল রাজকোষের চার কোটি টাকা ব্যয় এবং পাঁচ হাজার সৈন্যের জীবনহানি ঘটে।

দাক্ষিণাত্য নীতি: সম্রাট আকবর দাক্ষিণাত্যে সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ শুরু করে মাত্র খান্দেশ ও বেরারের কিছু অংশ দখল করতে সমর্থ হয়েছিলেন। আহমদনগর বিজিত হলেও আহমদনগরের প্রধানমন্ত্রী মালিক অম্বরের প্রতিরোধ ও বিরোধিতার কারণে সেখানে সম্রাট জাহাঙ্গীরের আন্তরিক প্রচেষ্টা সফল হয়নি। উপরন্তু এ সময় বিজাপুর ও গোলকুন্ডা মুঘল সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করে। আহমদনগরের বিশৃঙ্খল অবস্থার সুযোগে বিজাপুর ও গোলকুন্ডা আহমদনগরের দিকে সাম্রাজ্য সীমা বর্ধিত করে। এ অবস্থায় সম্রাট শাহজাহান মুঘল সিংহাসনে আরোহণ করেন। ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, "শাহজাহানের

সিংহাসনে আরোহণের সাথে সাথেই দাক্ষিণাত্য নীতিতে একটি নবযুগের সূচনা হয়।"[৩৩] সম্রাট শাহজাহান তার পিতামহ ও পিতার নীতি অনুসরণ করে দাক্ষিণাত্যে মুঘল সাম্রাজ্য সম্প্রসারণে কৃতসংকল্প হন। এমতাবস্থায় মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তার ও সংহতি রক্ষার উদ্দেশ্যে সম্রাট দাক্ষিণাত্য নীতি গ্রহণ করেন। তার দাক্ষিণাত্য নীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল দাক্ষিণাত্যের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য আহমদনগর, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা অধিকার। দাক্ষিণাত্যে সাম্রাজ্য বিস্তারের সাথে সাথে শিয়া সম্প্রদায়ের ধ্বংস সাধনও তার উদ্দেশ্য ছিল।

আহমদনগর অধিকার: আগেই বলা হয়েছে যে, প্রধানমন্ত্রী মালিক অম্বরের প্রতিরোধের কারণে সম্রাট জাহাঙ্গীর আহমদনগর অধিকারে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এবার আহমদনগর অধিকারের ভার পড়ল সম্রাট শাহজাহানের ওপর। আর তিনি সুযোগও পেয়ে গেলেন। মালিক অম্বরের মৃত্যুর পর তার পুত্র ফতেহ খান পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। অযোগ্য ও অকর্মণ্য ফতেহ খানের দায়িত্বলাভের মধ্য দিয়ে আহমদনগরের ভাগ্য বিপর্যয় শুরু হয়। কুচক্রী ফতেহ খান আহমদনগরের সুলতান মুর্তজা নিজামকে হত্যা করে তার নাবালক পুত্র হোসেনকে ক্ষমতায় বসান এবং নিজে তার অভিভাবক হিসেবে সব ক্ষমতা কুক্ষিগত করেন। তিনি মুঘলদের সাথেও হাত মেলান। ১০ লাখ টাকা উৎকোচের বিনিময়ে ফতেহ খান মুঘলদের হাতে দৌলতাবাদের দুর্গ তুলে দেন। ফতেহ খানের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে আহমদনগর মুঘলদের অধীনে আসে। নাবালক সুলতান হোসেন শাহকে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দি করে রাখা হয়। এর ফলে ১৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দে আহমদনগর মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয় এবং নিজামশাহী বংশের চূড়ান্ত পতন ঘটে।

বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা অধিকার: বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা ছিল দাক্ষিণাত্যের দুটি ঐশ্বর্যশালী স্বাধীন শিয়া রাষ্ট্র। আহমদনগর বিজিত হওয়ার পর সম্রাট শাহজাহান এ রাজ্য দুটির প্রতি দৃষ্টি দেন। ১৬২৯ খ্রিষ্টাব্দে উড়িষ্যার মুঘল সুবাদার বাকির খান গোলকুণ্ডার মনসুরগড় দুর্গ দখল করেন। ১৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে তেলেঙ্গানার এক-তৃতীয়াংশ মুঘল অধিকারে আসলে গোলকুণ্ডার সুলতান আবদুল্লাহ কুতুবশাহ মুঘল সম্রাটের সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে চুক্তিবদ্ধ হন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিনি চুক্তি খেলাপ করে সম্রাট শাহজাহানের বিরাগভাজন হন। ১৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট শাহজাহান বিশাল মুঘল বাহিনী নিয়ে গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করেন। মুঘলদের সাথে যুদ্ধে সাফল্য অর্জন সম্ভব নয় ভেবে গোলকুণ্ডা সুলতান কুতুবশাহ মুঘল সম্রাটকে নিয়মিত বার্ষিক কর প্রদান, সম্রাটের নামে খুৎবা পাঠ এবং মুদ্রাঙ্কনে সম্মত হয়ে চুক্তি করেন। গোলকুণ্ডা সহজেই মুঘল আধিপত্য মেনে নিলেও বিজাপুরের সুলতান আদিল শাহ মুঘল অধীনতা মেনে নিতে অস্বীকার করেন। ফলে মুঘলদের সাথে তার যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে। মুঘল বাহিনী তিন দিক থেকে বিজাপুর আক্রমণ করে। ত্রিমুখী আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে সুলতান আদিল শাহ শেষ পর্যন্ত সম্রাট শাহজাহানের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হয়। ১৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে মুঘলদের সাথে তার চুক্তি হয়। চুক্তি অনুযায়ী সুলতান আদিল শাহ মুঘল সম্রাটকে নিয়মিত বার্ষিক কর প্রদান, মারাঠা নেতা শাহজীর সাথে সম্পর্কোচ্ছেদ এবং প্রয়োজনে মুঘলদের হয়ে যুদ্ধ করতে সম্মত হন।

দাক্ষিণাত্যের সুবাদার হিসেবে আওরঙ্গজেব: দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর সম্রাট শাহজাহান তার আঠারো বছর বয়স্ক তৃতীয় পুত্র শাহজাদা আওরঙ্গজেবকে সেখানকার সুবাদার নিযুক্ত করেন। তিনি দাক্ষিণাত্যের চারটি প্রদেশ যথা— খান্দেশ, বেরার, তেলিঙ্গানা ও দৌলতাবাদের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তরুণ আওরঙ্গজেবের সুবাদার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর সেখানে মুঘল শক্তি সুদৃঢ় করার চেষ্টা করেন। তার প্রচেষ্টায় বাগলান অঞ্চল (সুরাট ও খান্দেশের অন্তর্বর্তী অঞ্চলে অবস্থিত) মুঘল অধিকারে আসে। মারাঠা নেতা শাহজী ভোসলে পরাজিত হয়ে মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের সুবাদার হিসেবে আওরঙ্গজেব

জেনে রাখো

মারাঠা একটি ভারতীয় জাতিগোষ্ঠী, যারা ভারতের উত্তর প্রদেশ তথা মহারাষ্ট্রের অধিবাসী (এদের ধর্ম হিন্দু)। মারাঠা শব্দটি দুটি বিষয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। প্রথমত, এরা একটি প্রভাবশালী বর্ণগোষ্ঠী যারা মারাঠি ভাষাভাষী। দ্বিতীয়ত, ঐতিহাসিকভাবে সপ্তম শতাব্দীতে এ শব্দটি দিয়ে ছত্রপতি শিবাজি প্রতিষ্ঠিত এবং তার উত্তরাধিকারীদের পরিচালিত সাম্রাজ্যকে বোঝায়। প্রাথমিকভাবে এরা মহারাষ্ট্র, মধ্য প্রদেশ, গুজরাট, কর্নাটক ও গোয়া অঞ্চলে বসবাস গড়ে তোলে।

---

[৩৩] With Shahjahan's accession to the throne commenced a new era of Decan Policy. Ref. Ishwari Prasad, *A Short History of Muslim Rule in India.*

কৃতিত্বের পরিচয় দিলেও তিনি নিজের অবস্থান ধরে রাখতে পারেননি। তিনি দাক্ষিণাত্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করে ভাই দারার রোষানলে পড়েন। যদুনাথ সরকার ও ঈশ্বরী প্রসাদের মতে, বড় ভাই দারাশিকোর ঈর্ষা ও বৈরিতা এবং বড় ছেলের প্রতি সম্রাটের পক্ষপাতিত্বের কারণেই আওরঙ্গজেব পদচ্যুত হন। দাক্ষিণাত্যের সুবাদার পদ থেকে পদত্যাগের পর বোন জাহানারার প্রচেষ্টায় আওরঙ্গজেব ১৬৪৫ খ্রিষ্টাব্দে গুজরাটের সুবাদার পদ লাভ করেন। ১৬৪৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বলখ ও বাদাখশান অভিযানে নেতৃত্ব দিয়ে ব্যর্থ হয়ে রাজধানীতে ফিরে যান। ইতোমধ্যে দাক্ষিণাত্যের মুঘল শাসনব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে ১৬৫৩ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট শাহজাহান আওরঙ্গজেবকে পুনরায় দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিয়োগ করেন।

দ্বিতীয় পর্বে সুবাদার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে আওরঙ্গজেব ১৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দে গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর দখল করেন। পরবর্তীসময়ে সময়ে গোলকুণ্ডার সুলতান আবদুল্লাহ কুতুবশাহ সম্রাটকে কর দেওয়া বন্ধ করলে তিনি কুতুবশাহের প্রধানমন্ত্রী মীর জুমলার সাথে হাত মেলান। পরবর্তীকালে কালে এখানে কয়েকটি অভিযান পরিচালিত হলে ১৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দে পুনরায় গোলকুণ্ডার সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং চুক্তির শর্তানুযায়ী গোলকুণ্ডা মুঘল করদ রাজ্যে পরিণত হয়। এরপর তিনি বিজাপুরের দিকে দৃষ্টি দেন। মুঘল মিত্র সুলতান আদিল শাহের মৃত্যুর পর তার নাবালক পুত্র দ্বিতীয় আদিল শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। এ সময় বিজাপুরের রাজনৈতিক অরাজকতার সুযোগে আওরঙ্গজেব মীর জুমলার সহযোগিতায় ১৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দে বিজাপুর আক্রমণ করেন। দীর্ঘ আট মাস মুঘল অভিযানে বিদর ও কল্যাণী মুঘলদের অধিকারে আসে। কিন্তু বিজাপুরনগর দখল করে চূড়ান্ত বিজয় সম্পন্ন করার আগে সম্রাটের নির্দেশে আওরঙ্গজেব যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য হন। সুলতান দ্বিতীয় আদিল শাহের সাথে মুঘলদের নতুন করে সন্ধি হয়। সন্ধি অনুযায়ী বিজাপুর সুলতান যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ ৫০ লাখ টাকাসহ বিদর, কল্যাণী, পীরন্দা প্রভৃতি স্থান মুঘলদের হাতে ছেড়ে দেন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সম্রাট শাহজাহানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি ব্যর্থ হওয়ার কারণ কী? *[সকল বোর্ড ২০২১; ২০১৬]*
২. সম্রাট শাহজাহানের মধ্য এশিয়া নীতি ব্যর্থ হওয়ার কারণ কী?
৩. মধ্য এশিয়া অভিযানে মুঘল রাজকোষের কত কোটি টাকা ব্যয় হয়?
৪. সম্রাট শাহজাহানের মধ্য এশিয়া অভিযানে কত হাজার সৈন্য মারা যায়?
৫. সম্রাট শাহজাহানের দাক্ষিণাত্য নীতির প্রধান লক্ষ্য কী ছিল?
৬. সম্রাট শাহজাহান কাকে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিযুক্ত করেন?

উত্তরের জন্য ২৪৪ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

সম্রাট শাহজাহানের দাক্ষিণাত্য নীতির মূল উদ্দেশ্য ছকে উপস্থাপন করো।

গ. দলীয় কাজ

দুটি দলে বিভক্ত হয়ে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার হিসেবে আওরঙ্গজেবের সাফল্য-ব্যর্থতা সম্পর্কিত দুটি ছক তৈরি করো।

পাঠ ২২

সম্রাট শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যকার উত্তরাধিকার সংগ্রাম
War of Succession among the Sons of Emperor Shahjahan

১৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট শাহজাহান গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ অবস্থায় তার মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা না করে সিংহাসন অধিকার প্রশ্নে তার চার পুত্র অধীর হয়ে ওঠে এবং তাদের মধ্যে উত্তরাধিকার সংগ্রাম শুরু হয়ে যায়। এ উত্তরাধিকার সংগ্রাম মুঘল ইতিহাসের এক মর্মান্তিক ও কলঙ্কময় ঘটনা।

পুত্রদের পরিচয়, যোগ্যতা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য: সম্রাট শাহজাহানের চার পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ দারাশিকো, শাহ সুজা দ্বিতীয়, আওরঙ্গজেব তৃতীয় এবং মুরাদ বখশ চতুর্থ ছিলেন। চার ভাইয়ের মধ্যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও সামর্থ্যের পার্থক্য ছিল। কন্যাদের মধ্যে জাহানারা ছিলেন বড় আর রওশন আরা ছোট। ছয় ভাই-বোনের সবাই উত্তরাধিকার সংগ্রামে কোনো না কোনোভাবে যুক্ত ছিলেন।

দারাশিকো: সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাশিকো ছিলেন পাঞ্জাব ও দিল্লির শাসনকর্তা। তিনি পণ্ডিত, বিদ্বান ও মার্জিত রুচিজ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন। ধর্মবিশ্বাসে তিনি ছিলেন প্রপিতামহ আকবরের মতো উদার এবং সর্বধর্ম সারগ্রাহী। তবে ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন দাম্ভিক, স্পষ্টভাষী, দুর্বিনীত ও উদ্ধত প্রকৃতির। স্ট্যানলি লেনপুলের মতে, দারার মধ্যে একজন সুকবি বা উন্নত চিন্তার দার্শনিকের গুণাবলি থাকলেও ভারতবর্ষের শাসক হওয়ার গুণাবলি তার ছিল না।[৩৪]

শাহ সুজা: শাহ সুজা ছিলেন বাংলার সুবাদার। তিনি ছিলেন সাহসী, সূক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন, কূটকৌশলী, সুনিপুণ যোদ্ধা। তার প্রখর রাজনীতি জ্ঞান ও প্রশাসনিক যোগ্যতাও ছিল। ব্যক্তিজীবনে তিনি অমায়িক ও সদালাপী ছিলেন। তবে তিনি ছিলেন ইন্দ্রিয়বিলাসী, আয়েশী। আর ধর্মবিশ্বাসে তিনি ছিলেন শিয়া মতাবলম্বী।

আওরঙ্গজেব: সম্রাট শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেব ছিলেন সবচেয়ে যোগ্য। যুদ্ধবিদ্যা ও প্রশাসন পরিচালনায় তিনি সমান দক্ষ ছিলেন। তিনি প্রখর কূটনৈতিক জ্ঞানেরও অধিকারী ছিলেন। তিনি নির্মল ও নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। মুঘল পরিবারের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ হেরেম জীবনের অন্তরালে আওরঙ্গজেব একটি সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী চরিত্রের অধিকারী ছিলেন বলে ব্রিটিশ ঐতিহাসিক উইলিয়াম হান্টার উল্লেখ করেছেন। ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার ক্ষেত্রে তিনি খুবই নিষ্ঠাবান ছিলেন। দাক্ষিণাত্য ছাড়াও তিনি গুজরাটের সুবাদারের দায়িত্ব পালন করেন।

মুরাদ: সম্রাট শাহজাহানের কনিষ্ঠ পুত্র মুরাদ ছিলেন গুজরাটের সুবাদার। তিনি সাহসী ও রণকুশলী যোদ্ধা ছিলেন। তবে প্রবল ইন্দ্রিয় আসক্তির কারণে রাজনীতি ও প্রশাসন পরিচালনায় তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি।

উত্তরাধিকার সংগ্রামের কারণ (Causes of the War of Succession)

শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকারকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট সংগ্রামের পেছনে নানা কারণ ছিল বলে ঐতিহাসিকেরা মনে করেন। এসব কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল—

সুষ্ঠু উত্তরাধিকার নীতির অভাব: সিংহাসন লাভ বিষয়ে মুঘলদের কোনো সুনির্দিষ্ট নীতি ছিল না। ফলে সিংহাসন নিয়ে পূর্ববর্তী সম্রাটদের আমলেও বিরোধ ও ভ্রাতৃসংঘাত ছিল। সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল।

শাহজাহানের পুত্রদের চারিত্রিক বৈপরীত্য: উপরের আলোচনায় দেখা যায়, সম্রাট শাহজাহানের চার পুত্রের মধ্যে ব্যক্তিগত চরিত্র ও গুণাবলির যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। চরিত্রবল, গুণ-গরিমা ও অভিজ্ঞতায় আওরঙ্গজেবের তুলনায় উদারমতি, কিন্তু রাজনৈতিক দক্ষতা ও সমরকৌশলে অনভিজ্ঞ দারার প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোনো সামর্থ্যই ছিল না। সুজা ও মুরাদও আওরঙ্গজেবের যোগ্যতার কাছে একেবারেই নিষ্প্রভ ছিল। শাহজাদাদের চারিত্রিক গুণাবলির এ বৈপরীত্য উত্তরাধিকার সংঘাতকে ত্বরান্বিত করেছিল বলে ঐতিহাসিকেরা মনে করেন।

---

[৩৪] Ref. Lane Poole, *Mediaeval India Under Mohammedan Rule*

পুত্রদের প্রতি সম্রাট শাহজাহানের বৈষম্যপূর্ণ আচরণ: পুত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকার সংগ্রামের জন্য সম্রাট শাহজাহান নিজেই অনেকাংশে দায়ী ছিলেন বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন। পুত্রদের প্রতি তিনি সমআচরণ করেননি। তার চার পুত্রের মধ্যে আওরঙ্গজেব সবচেয়ে সুযোগ্য হওয়ার পরও দারাশিকোর প্রতি অন্ধ স্নেহের কারণে তিনি আওরঙ্গজেবের প্রতি সুবিচার করতে পারেননি। দারার প্ররোচনায় সম্রাট আওরঙ্গজেবকে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার পদ থেকে পদত্যাগে বাধ্য করাসহ তিনি তাকে নানাভাবে হেয় করেন। দারার কুমন্ত্রণায়ই সম্রাট তার অন্য পুত্রদের প্রতি আপত্তিকর ভাষায় পত্র লিখে পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছিলেন।

দারাশিকোর ক্ষমতা কুক্ষিগত করার অপপ্রয়াস: সম্রাট শাহজাহানের গুরুতর অসুস্থতার সময় একমাত্র দারাই আগ্রায় ছিলেন এবং তিনিই সম্রাটের পক্ষে রাজকাজ পরিচালনা করছিলেন। অসুস্থ সম্রাট নিজে তখন জীবনের আশা ত্যাগ করেছিলেন এবং এ কারণে তিনি তার স্নেহের জ্যেষ্ঠপুত্র দারার ওপর শাসনভার অর্পণ করেন। দারা এ সুযোগ কাজে লাগানোর চেষ্টা করেন। তিনি সম্রাটের অসুস্থতার খবর গোপন রাখেন। রাজদরবার তথা সম্রাট সম্পর্কে সকল তথ্য গোপন রাখার জন্য দারা তার ভাইদের কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত ভকিলদের কঠোর নির্দেশ দেন। রাজধানীর সাথে সংযোগরক্ষাকারী বাংলা, গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যের পথগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। কেন্দ্রে ভাইদের জায়গির ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য দারার এরূপ অশুভ আচরণ আওরঙ্গজেবসহ তার ভাইদের ক্ষুব্ধ এবং উত্তরাধিকার সংগ্রামকে অনিবার্য করে তোলে।

উত্তরাধিকার সংগ্রামের গতি-প্রকৃতি: উত্তরাধিকার সংগ্রামে ভাইদের মধ্যে প্রথম প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন বাংলার সুবাদার শাহ সুজা ও গুজরাটের মুরাদ। শাহ সুজা বাংলায় এবং মুরাদ আহমদাবাদে নিজেদের সম্রাট হিসেবে ঘোষণা দিয়ে রাজকীয় উপাধি গ্রহণ করেন। তারা নিজ নিজ নামে খুৎবা পাঠ ও মুদ্রা অঙ্কন করেন। ধীর স্বভাবের এবং গভীর কূটনীতিজ্ঞানের অধিকারী আওরঙ্গজেব রাজধানীতে অবস্থানরত বোন শাহজাদী রওশন আরার মাধ্যমে পিতার সঠিক অবস্থা অবহিত হয়ে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, শাহজাহানের দু'কন্যার মধ্যে বড় কন্যা জাহানারা ছিলেন পিতা ও বড় ভাইয়ের সমর্থক এবং রওশন আরা আওরঙ্গজেবের সমর্থক। আওরঙ্গজেব শাহ সুজার সাথে দারাশিকোর ব্যাপারে আগেই চুক্তিবদ্ধ ছিলেন। এবার তিনি দারাকে ধ্বংস করার জন্য মুরাদের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করে নিজের পক্ষে আনেন। অতঃপর আওরঙ্গজেব-মুরাদের যৌথ বাহিনী দিল্লি অভিমুখে অগ্রসর হয়।

বাহাদুরগড়ের যুদ্ধ: আগেই বলা হয়েছে, শাহজাদা শাহ সুজা নিজেকে সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করে রাজমহলে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি এক বিশাল বাহিনীসহ দিল্লি অভিমুখে যাত্রা করেন। সম্রাট শাহজাহান শাহ সুজাকে প্রতিহত করার জন্য দারাশিকোর পুত্র সুলায়মান শিকোকে প্রেরণ করেন। সুলায়মান শিকো অম্বরের রাজা জয়সিংহের সহযোগিতায় ১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ জানুয়ারি বারানসীর কাছে বাহাদুরগড়ের যুদ্ধে শাহ সুজাকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করলে শাহ সুজা বাংলায় পালিয়ে যান।

ধর্মাটের যুদ্ধ: আওরঙ্গজেব-মুরাদের যৌথ বাহিনী দিল্লির পথে অগ্রসর হয়ে উজ্জয়িনীর কাছাকাছি ধর্মাটে শিবির স্থাপন করে। সম্রাট শাহজাহান আওরঙ্গজেব-মুরাদের যৌথ বাহিনীকে মোকাবিলার জন্য যোধপুরের অধিপতি মহারাজা যশোবন্ত সিংহকে নির্দেশ দেন। যশোবন্ত সিংহকে সহযোগিতার জন্য কাশিম খানের নেতৃত্বে একটি রাজকীয় বাহিনী প্রেরণ করা হয়। ১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ এপ্রিল ধর্মাটে উভয় বাহিনীর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে সম্রাটের রাজকীয় বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় ঘটে। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে শত্রু সৈন্যদের পরিত্যক্ত বিপুল রণসামগ্রী করায়ত্ত করে আওরঙ্গজেব তার শক্তি বৃদ্ধি করেন।

সামুগড়ের যুদ্ধ: ধর্মাটের যুদ্ধে রাজকীয় বাহিনীর শোচনীয় পরাজয়ে যুবরাজ দারাশিকো হতাশ ও ক্ষুব্ধ হন। পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলার জন্য তিনি নিজে ১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রায় পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনীসহ আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। ধর্মাটের যুদ্ধে বিজয়ের ফলে উজ্জীবিত আওরঙ্গজেব একটি শক্তিশালী বাহিনীসহ আগ্রার পথে গোয়ালিয়র হয়ে সামুগড়ে এসে পৌছান। ২৯ মে দারা ও আওরঙ্গজেবের বাহিনী সামুগড়ে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মুখোমুখি হয়। এ যুদ্ধে দারার পক্ষে তার কনিষ্ঠ পুত্র সিফহির শিকো, মুঘল সেনাপতি খলিল উল্লাহ খান এবং রাম সিংহসহ বহু রাজপুত অংশ নেয়। কিন্তু দারার ভুল রণকৌশল, সৈন্য সংগঠনে গলদ এবং সেনানায়কদের বিচক্ষণতার অভাব প্রভৃতি কারণে যুদ্ধে দারা পরাজিত হন। যুদ্ধরত অবস্থায় দারাকে বহনকারী হাতি তীরবিদ্ধ হলে সেনাপতি খলিল উল্লাহর পরামর্শে দারা যুদ্ধ করার জন্য

অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করেন। কিন্তু দারার বাহিনী দারাকে বহনকারী হাতির হাওদা শূন্য দেখে ভাবে যে তাদের নেতা হয় পরাজিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করেছেন অথবা যুদ্ধে নিহত হয়েছেন। তাই সৈন্যবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। আওরঙ্গজেব ও মুরাদের নেতৃত্বে তাদের যৌথ বাহিনী প্রবল বিক্রমে দারার বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাদের পর্যুদস্ত করে। ফলে পরাজয়ের গ্লানি মাথায় নিয়ে দারাশিকো আগ্রায় পালিয়ে যান। শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকার সংগ্রামে সামুগড় যুদ্ধ ছিল চূড়ান্ত মীমাংসাত্মক ঘটনা। এ যুদ্ধে জয়লাভের ফলে আওরঙ্গজেবের মুঘল সিংহাসন লাভ নিশ্চিত হয়।

আওরঙ্গজেবের ক্ষমতা গ্রহণ ও শাহজাহান কারারুদ্ধ: সামুগড়ের যুদ্ধের পর ১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে আওরঙ্গজেব জয়গর্বে আগ্রায় উপনীত হন। আওরঙ্গজেব আগ্রা দুর্গ দখল করে পিতা সম্রাট শাহজাহানকে আগ্রা দুর্গে বন্দি করেন। পিতার সাথে বোন জাহানারাকেও কারারুদ্ধ করা হয়। এখানে নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনে তাদের বাধ্য করা হয়। অতঃপর আওরঙ্গজেব সিংহাসন দখল করেন। এবার আওরঙ্গজেব আগ্রা থেকে দিল্লিতে রওনা হন। ১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দের ২১ জুলাই দিল্লিতে পৌঁছে আওরঙ্গজেব নিজেকে সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করেন এবং 'আলমগীর' উপাধি ধারণ করে রাজমুকুট গ্রহণ করেন।

মুরাদের বন্দিত্ব ও মৃত্যুদণ্ড: আওরঙ্গজেবের এসব পদক্ষেপে শাহজাদা মুরাদ ক্ষুব্ধ হন। মুরাদ আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে সৈন্য সংগঠিত করার চেষ্টা করলে কুশলী আওরঙ্গজেব মথুরার কাছে তার শিবিরে মুরাদকে নৈশভোজে আমন্ত্রণ করেন। নৈশভোজে যোগদান করতে এলে তাকে বন্দি এবং পরবর্তী সময়ে গুজরাটের দিউয়াল আলী নকীকে হত্যার অভিযোগে বিচারের নামে প্রহসন করে ১৬৬১ খ্রিষ্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর মুরাদকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

শাহ সুজার প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান: আওরঙ্গজেবের আধিপত্য স্বীকার না করে সামুগড়ের যুদ্ধের পর শাহসুজা সিংহাসন লাভের জন্য সচেষ্ট হন। আওরঙ্গজেব মীর জুমলার নেতৃত্বে তার বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। ১৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দের ৫ জানুয়ারি এলাহাবাদের কাছে খাজওয়ার যুদ্ধে শাহ সুজা পরাজিত হয়ে পালিয়ে বাংলায় আসেন। মীর জুমলা তার পশ্চাদ্ধাবন করলে শাহ সুজা সপরিবারে চট্টগ্রাম হয়ে আরাকানে পালিয়ে যান। ধারণা করা হয়, তিনি সম্ভবত আরাকানি মগদের হাতে সপরিবারে নিহত হয়েছিলেন।

দারার চূড়ান্ত পরাজয়: আওরঙ্গজেব আগ্রা থেকে দিল্লিতে এসে নিজেকে সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করায় দারাশিকো দিল্লি ত্যাগ করে লাহোর গিয়ে শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করেন। কিন্তু আওরঙ্গজেবের তাড়া খেয়ে তিনি প্রথমে মুলতান এবং পরে সেখান থেকে গুজরাটে আশ্রয় নেন। গুজরাটের শাসনকর্তা নওয়াজ শাহের সহযোগিতায় দারা একটি সেনাবাহিনী সংগঠিত করেন। গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের শিয়া শাসকেরা দারার প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়ায়। মহারাজা যশোবন্ত সিংহের কাছ থেকে সহযোগিতার আশ্বাসে দারা আজমিরে যান। তবে শেষ পর্যন্ত তিনি তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেননি। বরং তিনি আওরঙ্গজেবের সাথে হাত মেলান। ১৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দের ১২ এপ্রিল আজমিরের কাছে দেওরায়ের যুদ্ধে আওরঙ্গজেবের বাহিনীর হাতে দারাশিকো চূড়ান্তভাবে পরাজিত হন। ভাগ্য বিড়ম্বিত দারা আফগান দলপতি জিওয়ান খানের আশ্রয় নেন। তবে আশ্রয়দাতা জিওয়ান খান তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে সপরিবারে মুঘল বাহিনীর হাতে তুলে দেন। মুঘল সেনাপতি বাহাদুর খান বন্দি দারাকে তার পুত্র সিফহির শিকো ও দু'কন্যাসহ দিল্লিতে নিয়ে আসেন। আওরঙ্গজেব তার বড় ভাই দারাকে চরমভাবে লাঞ্ছিত করেন। তাকে জীর্ণ কাপড় পরিয়ে গাধার পিঠে উল্টোমুখো বসিয়ে দিল্লির রৌদ্রদগ্ধ রাজপথে ঘুরানো হয়। অবশেষে তার বিরুদ্ধে ইসলামদ্রোহিতার অভিযোগ এনে ১৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ আগস্ট প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়।

এভাবে নানারকম কূটচাল, প্রতারণা ও রক্তক্ষরণের মধ্য দিয়ে সম্রাট শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকার যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং আওরঙ্গজেব মুঘল সিংহাসনে আরোহণ করেন।

আওরঙ্গজেবের সাফল্যের কারণ (Cause of the Success of Aurangzeb)

সম্রাট শাহজাহানের দুর্বলতা ও ভ্রান্তনীতি: সম্রাট শাহজাহানের দুর্বলতা ও ভ্রান্তনীতি উত্তরাধিকার সংগ্রামে আওরঙ্গজেবের সফলতার অন্যতম কারণ। সম্রাট শাহজাহান নিঃসন্দেহে একজন যোগ্য ও জনপ্রিয় সম্রাট ছিলেন। কিন্তু সময়োচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থতা তার শেষ জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। পীড়িত সম্রাট শাহজাহান যদি আরোগ্যলাভের পর শাসনদণ্ড নিজ হাতে গ্রহণ করতেন এবং তার মৃত্যু সংক্রান্ত গুজব বন্ধ করে অন্যান্য শাহজাদাদের দরবারের প্রকৃত অবস্থা অবহিত করার ব্যবস্থা নিতেন তবে হয়তো পরিস্থিতি অন্যরকম হতো।

আওরঙ্গজেবের যোগ্যতা ও দক্ষতা: আওরঙ্গজেবের সাফল্যের পেছনে তার ব্যক্তিগত প্রতিভার ভূমিকা ছিল অনেকখানি। বেনী প্রসাদের মতে, "উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বে আওরঙ্গজেবের সফলতা তার ব্যক্তিগত গুণাবলির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।" ড. ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, "প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে কূটনীতিতে, রাষ্ট্র পরিচালনায় এবং সেনাপতিত্বে কেউই আওরঙ্গজেবের সমকক্ষ ছিল না।"[৩৫] শাহজাহানের বড় পুত্র দারা ছিলেন অস্থির, অসংযমী ও আবেগপ্রবণ। সুজা সাহসী, কুশলী ও কূটনীতিজ্ঞ হলেও ইন্দ্রিয়াসক্তির কারণে তিনি তার স্বাভাবিক সামর্থ্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। এক্ষেত্রে আওরঙ্গজেব ছিলেন ধীরস্থির ও কূটনীতিজ্ঞানের অধিকারী, দাক্ষিণাত্য ও মধ্য এশিয়ার বিপদসংকুল অঞ্চলে যুদ্ধের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। তাই তার অনুপযুক্ত ভাইদের বিরুদ্ধে তার সাফল্য ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার।

আওরঙ্গজেবের সামরিক বাহিনীর শ্রেষ্ঠত্ব: আওরঙ্গজেবের সাফল্যের মূলে তার সামরিক বাহিনীর ভূমিকাও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত দারার সেনাবাহিনীর তুলনায় আওরঙ্গজেবের বাহিনী ছিল অনেক বেশি সুশৃঙ্খল ও রণপটু। অন্যদিকে, দারার অধীন মুঘল ও রাজপুত বাহিনীর মধ্যে ঐক্য, শৃঙ্খলা ও সংহতির অভাব ছিল। দারার গোলন্দাজ বাহিনী ছিল দুর্বল। এমতাবস্থায় আওরঙ্গজেবের দক্ষ নেতৃত্বে তার সুসংগঠিত বাহিনী সহজেই প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জয়লাভে সক্ষম হয়।

আওরঙ্গজেবের ধর্মনিষ্ঠা: আওরঙ্গজেব ইসলামি অনুশাসন প্রতিপালনে একনিষ্ঠ ছিলেন। সমকালীন মুসলিম ঐতিহাসিকেরা আওরঙ্গজেবের ধর্মপ্রবণতাকে তার সাফল্যের অন্যতম কারণ বলে মনে করেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, দারা উদার ও ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তার অধিকারী ছিলেন। দারার এ ধর্মীয় মনোভাব গোঁড়া সুন্নি মুসলমান ও উলেমারা সুনজরে দেখেননি। তারা দারাকে নাস্তিক বিবেচনা করেন। ইসলামের হারানো গৌরব ও মর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্য তারা ধর্মের প্রতি নিষ্ঠাবান আওরঙ্গজেবের প্রতি তাদের অকুণ্ঠ সমর্থনদান ও তার পতাকাতলে সমবেত হন। ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান ও উলেমাদের সমর্থন দারাসহ প্রতিদ্বন্দ্বী ভাইদের বিরুদ্ধে আওরঙ্গজেবের বিজয়কে ত্বরান্বিত করেছিল।

সম্রাট শাহজাহানের অন্তিম জীবন ও মৃত্যু (The Ultimate Life and Death of Emperor Shahjahan)

সম্রাট শাহজাহানের শেষ জীবন মোটেই সুখকর ছিল না। ঈশ্বরী প্রসাদের মতে, "শাহজাহানের জীবন-নাট্য অপূর্ব জাঁকজমক ও প্রাণপ্রাচুর্যের মধ্য দিয়ে শুরু হয়ে তা অন্যতম গ্রিক বিয়োগান্ত নাটকের (The Greek tragedies) বেদনা-বিধুর পরিস্থিতির মধ্যে পরিসমাপ্তি ঘটে।" তিনি কন্যা জাহানারাসহ শেষ জীবনে আট বছর আগ্রা দুর্গে নিয়ন্ত্রিত বন্দি জীবন কাটান। তবে বৃদ্ধ বয়সে প্রিয়তমা পত্নী মমতাজ মহলের মৃত্যু এবং জীবদ্দশাতেই তিন পুত্রের হত্যাকাণ্ড শাহজাহানকে চরম ভারাক্রান্ত ও অসুস্থ করে তুলেছিল। অবশেষে ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দের ২২ জানুয়ারি ৭৪ বছর বয়সে শাহজাহান মৃত্যুবরণ করেন। তাজমহলে প্রিয়তমা পত্নী মমতাজ মহলের পাশে তাকে সমাহিত করা হয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সম্রাট শাহজাহান কত খ্রিষ্টাব্দে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন?
২. সম্রাট শাহজাহানের চার পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন কে?
৩. দারাশিকো কোন অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন?
৪. সম্রাট শাহজাহানের সময় বাংলার সুবাদার ছিলেন কে?
৫. সম্রাট শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে সবচেয়ে যোগ্য ছিলেন কে?
৬. আওরঙ্গজেব নিজেকে মুঘল সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করেন কত খ্রিষ্টাব্দে?

উত্তরের জন্য ২৪৪ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

সম্রাট শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে সংঘটিত উত্তরাধিকার যুদ্ধের কারণ এবং আওরঙ্গজেবের বিজয়ী হওয়ার কারণগুলো ছক আকারে লেখো।

---

[৩৫] Among his rivals there was name who could equal arranged in diplomacy, statecraft and generalship. 'Ibid'

পাঠ ২৩

স্থাপত্য ও চিত্রশিল্পের বিকাশে সম্রাট শাহজাহানের অবদান
Contributions of Shahjahan in the Development of Art and Architecture

সম্রাট শাহজাহান ছিলেন সৌন্দর্যপিপাসু এবং শিল্পীমনের মানুষ। ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, "প্রকৃতিগতভাবে তিনি ছিলেন শিল্পকলা, সৌন্দর্য ও সম্পদের পূজারী।"[৩৬] ভারতবর্ষের ইতিহাসে শাহজাহান একজন শ্রেষ্ঠ নির্মাতা ছিলেন। ঐতিহাসিকেরা তাকে 'স্থাপত্যের রাজপুত্র'[৩৭] বলে অভিহিত করেছেন। তিনি স্থাপত্যশিল্পের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেন। তার আমলে নির্মিত সৌধরাজির অনবদ্য রূপশ্রীকে ব্রিটিশ ঐতিহাসিক ফারগুসান "স্থাপত্য শিল্পে রূপায়িত মানিক্যাধার" (Jewel Caskets magnified into architecture.) বলে অভিহিত করেছেন। শাহজাহান তার আগের মুঘল সম্রাটদের আমলে স্থাপত্যের নির্মাণ উপকরণ লাল পাথরের স্থলে বহু মূল্যবান শ্বেত মর্মর পাথর ব্যবহার করেন। তার স্থাপত্যে রং আর আড়ম্বরের প্রাচুর্য বিশেষভাবে দেখা যায়।

তাজমহল

সম্রাট শাহজাহানের সময় দিল্লি, আগ্রা ও লাহোরে অনেক উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য নির্মিত হয়েছিল। কাবুল, কাশ্মির, কান্দাহার ও আজমিরেও কিছু প্রাসাদ, উদ্যান ও মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। রাজধানী আগ্রায় সম্রাট শাহজাহান দিউয়ান-ই-আম, দিউয়ান-ই-খাস, মোতি মসজিদ, মুসাম্মাম বুরুজ এবং শীষ মহল ইত্যাদি স্থাপত্য নির্মাণ করেছিলেন। এসব স্থাপত্যকর্মের মধ্যে আগ্রার প্রাসাদ দুর্গের অভ্যন্তরে শ্বেত পাথরের তৈরি মোতি মসজিদ ছিল নিঃসন্দেহে এক অনন্য কীর্তিময় স্থাপত্য নিদর্শন। সাদুল্লা খানের তত্ত্বাবধানে ৩০ লাখ মুদ্রা ব্যয়ে নির্মিত এ মোতি মসজিদ পৃথিবীর অনিন্দ্য সুন্দর মসজিদ স্থাপত্যের অন্যতম।

সম্রাট শাহজাহান ১৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে আগ্রা থেকে দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তর করেন। তিনি দিল্লির অদূরে একটি নতুন নগরীর গোড়াপত্তন করে এর নাম দেন শাহজাহানাবাদ। এখানে তিনি লালকেল্লা দুর্গ নির্মাণ করেন। এ দুর্গের অভ্যন্তরে দিউয়ান-ই-আম, দিউয়ান-ই-খাস ও মমতাজ মহল প্রাসাদ নির্মাণ করেন। তবে এসব ইমারতের মধ্যে দিউয়ান-ই-খাস ছিল সবচেয়ে বেশি সৌন্দর্যমণ্ডিত বহু মূল্যবান পাথর খচিত মার্বেলের তৈরি। এ ইমারতটিকে সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বের ঐশ্বর্য ও খ্যাতির মূর্ত প্রতীক হিসেবে গণ্য করা যায়। সম্রাট একে ভূস্বর্গ মনে করতেন। প্রাসাদ ফটকে লিখিত নিম্নোক্ত ফারসি শ্লোকটি এর প্রমাণ।

"আগর বর রূ-এ জমিন ফেরদৌস আস্ত,
হামিন আস্ত, হামিন আস্ত, হামিন আস্ত।"
(স্বর্গ যদি ধরা মাঝে থাকে কোনোখানে, এখানে তা, এখানে তা, এখানে তা।)

সম্রাট শাহজাহানের শাসনামলে বহুসংখ্যক মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। তবে এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল দিল্লির জামে মসজিদ। এটি ভারতের বৃহত্তম মসজিদগুলোর অন্যতম। বহু মূল্যবান পাথর দ্বারা নির্মিত এ মসজিদ তার স্থাপত্য অনুরাগের একটি বিশেষ নিদর্শন। পৃথিবী বিখ্যাত ময়ূর সিংহাসন সম্রাট শাহজাহানের নির্মিত অনুপম শিল্পকীর্তির অন্যতম। শিল্পী বেবাদল খানের তত্ত্বাবধানে প্রায় ৮ কোটি টাকা ব্যয়ে সাত বছরে (১৬২৮-১৬৩৫ খ্রি.) এ সিংহাসনটি নির্মিত হয়েছিল। সিংহাসনের স্বর্ণনির্মিত চারটি স্তম্ভের ওপর একটি কারুকার্যমণ্ডিত চন্দ্রাতপ ছিল। প্রতিটি স্তম্ভের শীর্ষে মুখোমুখি বসানো একজোড়া ময়ূর স্থাপন করা হয়েছিল। এদের মাঝখানে ছিল বহু মূল্যবান মণিমুক্তা খচিত ফলবান বৃক্ষ। সিংহাসনে ওঠার জন্য মণিমুক্তা খচিত তিনধাপ বিশিষ্ট একটি সিঁড়ি ছিল। এটি দৈর্ঘ্যে সাড়ে তিন গজ, প্রস্থে আড়াই গজ এবং উচ্চতায় ছিল পাঁচ গজ। অনিন্দ্যসুন্দর ও মূল্যবান এ ময়ূর সিংহাসনটি সম্রাট শাহজাহানের সৌন্দর্য জ্ঞান ও ঐশ্বর্যের উজ্জ্বলতম নিদর্শন। ১৭৩৯ খ্রিষ্টাব্দে পারস্যের নাদির শাহ ভারত আক্রমণকালে ময়ূর সিংহাসনটি নিয়ে যান। ময়ূর সিংহাসনটি পারস্য থেকে ব্রিটিশরা জাহাজযোগে দক্ষিণ আফ্রিকা নিয়ে যাওয়ার পথে জাহাজডুবিতে এটি হারিয়ে যায়।

---

[৩৬] He was by nature a lover of art, beauty and wealth. 'Ibid'

[৩৭] The prince of builders or Engineer king. 'Ibid'

তাজমহল: সম্রাট শাহজাহানের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকীর্তি 'তাজমহল'। সম্রাট তার প্রিয়তমা স্ত্রী মমতাজ মহলের সমাধির ওপর এ জগদ্বিখ্যাত ইমারতটি নির্মাণ করেন। ১৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে এর নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং শেষ হয় ১৬৫৩ খ্রিষ্টাব্দে। যমুনা নদীর তীরে আগ্রায় নির্মিত তাজমহল শুধু মুঘল স্থাপত্য নিদর্শন নয়, বরং স্ত্রী প্রেমের একটি উজ্জ্বল প্রতীকরূপেও স্বীকৃত। বিশ হাজার দক্ষ শিল্পী ও কারিগরের বাইশ বছরের পরিশ্রমের ফসল তাজমহলের স্বপ্নদ্রষ্টা সম্রাট নিজেই। মূল পরিকল্পনাবিদ ছিলেন শিল্পী ইসফানদিয়ার রুমী। প্রধান স্থপতি ইরানের ওস্তাদ ঈসা সিরাজী। বাঙালি শিল্পী বলদেও দাসও ছিলেন তাজমহলের অন্যতম স্থপতি। মর্মর পাথরের নির্মিত তাজমহলকে ইতিহাসবিদ হ্যাভেল ভারতের 'ভেনাস দ্যা মিলো' বলে অভিহিত করেছেন। ইন্দো-পারসিক রীতির সংমিশ্রণে তৈরি তাজমহল মধ্যযুগীয় পৃথিবীর অন্যতম সপ্তাশ্চর্য হিসেবে সমাদৃত। এ অনন্যসাধারণ সৌন্দর্যের স্থাপত্য ইমারতের প্রশংসা করে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

"হীরা মুক্তা-মাণিক্যের ঘটা
যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা
যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক।
শুধু থাক,
একবিন্দু নয়নের জল
কালের কপোল তলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল।"

১৬৬৩ খ্রিষ্টাব্দে আগ্রা ভ্রমণ করে ফরাসি পর্যটক ফ্রান্সিস বেরানিয়ার (Francis Bernier) বলেছিলেন, 'দুটো বিস্ময়কর সমাধির বিবরণ দিয়ে আমি চিঠিটি শেষ করব যেগুলো আগ্রাকে দিল্লি থেকে শ্রেষ্ঠ করেছে। একটি নির্মাণ করেছেন সম্রাট জাহাঙ্গীর তার পিতা আকবরের সম্মানে, অন্যটি সম্রাট শাহজাহান তার স্ত্রীর স্মরণে তৈরি করেছেন 'তাজমহল', যা অসাধারণ সৌন্দর্যের অধিকারী।' এ স্থাপত্যকর্ম ছাড়াও শাহজাহানের সময় নির্মিত ইমারতগুলো মধ্যে লাহোরে নির্মিত 'হীরা মহল', 'মতি মহল', 'রঙ্গমহল', 'শীষ মহল' ও নিজামউদ্দিন আউলিয়ার সমাধিসৌধ ছিল উল্লেখযোগ্য।

চিত্রকলা: স্থাপত্যশিল্পের প্রতি বিশেষ দুর্বলতা থাকলেও সম্রাট শাহজাহানের পৃষ্ঠপোষকতায় মুঘল চিত্রশিল্পের যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। সম্রাট ছাড়াও অভিজাত আসফ খান ও শাহজাদা দারাশিকো ছিলেন চিত্রশিল্পের উদার পৃষ্ঠপোষক। দারাশিকোর এলবাম এ সময় মুঘল চিত্রকলার অনবদ্য সৃষ্টি হিসেবে বিবেচিত হয়। শাহজাহানের চিত্রশালার পরিচালক ছিলেন শিল্পী ফকিরুল্লাহ মীর হাসান, অনুচ্ছ। চতর এবং চিত্রমনি শাহজাহানের আমলের বিখ্যাত চিত্রকর ছিলেন। সম্রাট হস্তলিপি বিদ্যারও সমঝদার ছিলেন। তার সময়ে এ বিদ্যার প্রভূত চর্চা হয়। হস্তলিপিবিদদের চিত্রশিল্পীর সম্মান দেওয়া হতো।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. 'স্থাপত্যের রাজপুত্র' বলে অভিহিত করা হয়েছে কাকে?
২. পৃথিবী বিখ্যাত ময়ূর সিংহাসন কার সময়ে নির্মিত হয়?
৩. সম্রাট শাহজাহানের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকীর্তি কী? *[ঢা. বো., রা. বো., য. বো. ২০১৭]*
৪. তাজমহল কোথায় নির্মিত হয়?
৫. তাজমহলের প্রধান স্থপতি কে?
৬. 'হীরা মহল', 'মতি মহল', 'রঙ্গমহল', 'শীষ মহল' ও নিজামউদ্দিন আউলিয়ার সমাধিসৌধ কার স্থাপত্যিক নিদর্শন?

উত্তরের জন্য ২৪৪ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

সম্রাট শাহজাহানের নির্মিত আগ্রার তাজমহল পরিদর্শন করে এসে তোমার অভিজ্ঞতা উপস্থাপন করো।

পাঠ ২৪ ও ২৫

সম্রাট শাহজাহানের চরিত্র ও কৃতিত্ব এবং সম্রাজ্ঞী মমতাজমহল
Character and Achievements of Emperor Shahjahan and Empress Mumtazmahal

চরিত্র (Character)

সম্রাট শাহজাহানের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভিন্নতা দেখা যায়। বার্নিয়ার, মানুচি ও ভিনসেন্ট স্মিথসহ অনেক ইউরোপীয় ঐতিহাসিক শাহজাহানের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের কঠোর সমালোচনা করে তাকে নীতিজ্ঞানহীন, নিষ্ঠুর, বিশ্বাসঘাতক, ইন্দ্রিয়াসক্ত হিসেবে চিহ্নিত করেন। তবে এসব বক্তব্য ঐতিহাসিক তথ্যভিত্তিক নয়। ভারতীয় ঐতিহাসিকেরা সম্রাট শাহজাহানকে আদর্শ মুসলিম শাসক ও ইসলামি শরিয়তের রক্ষক বলে অভিহিত করেছেন। সম্রাট শাহজাহান দীর্ঘাঙ্গী, ফর্সা ও সুদর্শন দেহ সৌষ্ঠবের অধিকারী ছিলেন। তিনি শিক্ষিত ও মার্জিত রুচি জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন। ঐশ্বর্য ও জাঁকজমকের প্রতি তার প্রবল অনুরাগ ছিল। তিনি রাজকীয় খেলাধুলা, শিকার করা, তরবারি চালনা, ঘোড়দৌড় ও সংগীতের বিশেষ সমঝদার ছিলেন।

ব্যক্তি হিসেবে সম্রাট শাহজাহান ছিলেন দয়ালু। রাজনৈতিক কারণে ভ্রাতৃহত্যার মতো নিষ্ঠুর আচরণ করলেও অন্যের দুঃখ-দুর্দশা মোচনের চেষ্টা করতেন। সন্তানবাৎসল্য ও গভীর স্ত্রীপ্রেম তার উদারচিত্ততা ও অন্তরের কোমলতারই পরিচায়ক। ধর্ম বিষয়ে সম্রাট শাহজাহান নিষ্ঠাবান সুন্নি মুসলমান ছিলেন। তিনি নিয়মিত নামাজ আদায় করতেন এবং রমজানে রোজা রাখতেন। ঐতিহাসিক হেগের মতে, 'যদিও তার রক্তের সম্পর্কের দিক থেকে অর্ধেকেরও বেশি হিন্দু ছিলেন তবুও তিনি পিতা অথবা পিতামহ অপেক্ষা অধিক খাঁটি মুসলমান ছিলেন।' সম্রাট শাহজাহান তার পূর্বপুরুষদের সময় প্রচলিত অনৈসলামিক রীতিনীতিগুলো বাতিল করেন। তিনি আকবরের প্রবর্তিত ইলাহি বর্ষ গণনা বাতিল করে হিজরি সন প্রবর্তন করেন। তিনি জিজিয়া ও তীর্থ কর পুনঃপ্রবর্তন করেননি। হিন্দুরা তার সময় রাজানুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়নি।

সম্রাট শাহজাহানের কৃতিত্ব (Achievements)

যোগ্য বিজেতা: সম্রাট হিসেবে শাহজাহানের সামরিক সাফল্যের তালিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। তিনি সেনাবাহিনীকে নতুনভাবে সংগঠিত করলেও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এবং মধ্য এশিয়ায় তার সামরিক ব্যর্থতা নজরে পড়ার মতো। অবশ্য এর মধ্যেও সম্রাট শাহজাহানের সময় হুগলি ও দাক্ষিণাত্যের আহমদনগর মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার ওপর মুঘল নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। তার সময়ে অহোমিদের পরাজিত করে মুঘল বাহিনী কামরূপ অধিকারে সক্ষম হয়। ফলে শাহজাহানের সময় মুঘল সাম্রাজ্যের সীমা বাংলার সিলেট থেকে সিন্ধু এবং আফগানিস্তানের বিস্তৃত দুর্গ থেকে দাক্ষিণাত্যের আউসা অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তার ঘটেছিল। এজন্যই সম্ভবত ভি. এ. স্মিথ বলেন, "শাহজাহানের রাজত্বকালে মুঘল বংশ ও সাম্রাজ্য গৌরবের চরম শিখরে আরোহণ করে।" (Shahjahan's reign marks the climax of Mughal dynasty and empire.)

প্রতিভাধর শাসক: সম্রাট শাহজাহান ছিলেন একজন প্রতিভাধর রাষ্ট্রনীতিবিদ। সমসাময়িক ঐতিহাসিক কাফিখান, ইতালীয় পর্যটক মানুচি এবং ঐতিহাসিক এলিফেনস্টোন প্রমুখ শাহজাহানের শাসনব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। পি বি. সাকসেনা বলেন, "সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে মুঘল সাম্রাজ্য শান্তি, সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যের উচ্চপর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল।" সম্রাট শাহজাহান তার রাজত্বের ৩০ বছরে সাম্রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পুনর্গঠনে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সম্রাট আকবরের শাসনব্যবস্থাই গ্রহণ করেছিলেন। তবে ক্ষেত্রবিশেষে তিনি প্রয়োজনীয় সংস্কার দ্বারা আকবরের ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করেন। আকবরের মনসবদারি ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হয়। সম্রাট রাজস্বের হার পুনঃনির্ধারণ করেন। নতুন নিয়মানুযায়ী $\frac{১}{৩}$ পরিবর্তে $\frac{১}{২}$ অংশ রাজস্ব ধার্য করা হয়। মধ্য এশিয়া ও ইউরোপের সাথে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নয়ন ঘটিয়ে শাহজাহান সাম্রাজ্যের আর্থিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করেন।

সম্রাট শাহজাহানকে স্মিথ এশিয়ার নিষ্ঠুর বর্বর স্বৈরাচারী শাসক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তবে ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণ মতে, তিনি একজন প্রজাহিতৈষী শাসক ছিলেন। টেভার্নিয়ারের মতে, "শাহজাহান প্রজাদেরকে রাজার মতো শাসন করতেন না বরং পিতার মতোই প্রতিপালন করতেন।" ঐতিহাসিক স্ট্যানলি লেনপুলও প্রায় অনুরূপ মত প্রকাশ করেন। তার ভাষায়, "Shahjahan was renowned for his kindness and benevolence which endeared him to the people." প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবে তার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায়ও তিনি ছিলেন বিশেষভাবে আগ্রহী। ধনী-গরিব নির্বিশেষে সবার প্রতি তিনি ন্যায়বিচার করতেন।

শিক্ষা ও সংস্কৃতিপ্রেমী: সম্রাট শাহজাহান নিজে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি আরবি, ফার্সি ও হিন্দি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তির অধিকারী ছিলেন। তার সময় খ্যাতিমান ঐতিহাসিক ও পণ্ডিতদের মধ্যে আবদুল হামিদ লাহোরি, আমির কামওইনি, ইনায়েত খান, সালিহ, আবুল কাসিম ইরানি, মির্জা জিয়াউদ্দিন, আবদুল হাকিম শিয়ালকোটী, মুহিব আলী সৈয়দী, বিহারি লাল ও তুলসী দাস ছিলেন উল্লেখযোগ্য। শিক্ষার প্রসারকল্পে সম্রাট বিখ্যাত দার-উল-বাকা মাদ্রাসা এবং দিল্লির রাজ কলেজসহ সাম্রাজ্যের সর্বত্র বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেন। সংগীতপ্রেমী শাহজাহানের পৃষ্ঠপোষকতায় সংগীত বিদ্যারও উৎকর্ষ সাধিত হয়। কবীন্দ্র, চিত্র খান, লাল খান, গুণসমুদ্র জগন্নাথ প্রমুখ সংগীত সাধক শাহজাহানের দরবার অলংকৃত করেছিলেন।

সম্রাট শাহজাহানের শিল্পানুরাগ সম্পর্কে সব ঐতিহাসিকই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। তার মননশীল শিল্প সৌন্দর্যবোধের চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে স্থাপত্য ও চিত্রকলায়। নন্দন তত্ত্ব ও শিল্পকলার এ দুটো বিষয়ে তার কীর্তি সম্পর্কে পূর্ববর্তী পাঠে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

ইতিহাসে সম্রাট শাহজাহানের স্থান তার রাজত্বকালের গুরুত্ব: সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালকে আধুনিক গবেষকরা সমৃদ্ধি ও অবক্ষয়ের সন্ধিক্ষণ বলে অভিহিত করেন। ড. ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, "গৌরবের উচ্চ শিখর থেকে হঠাৎ করে তিনি একজন দুর্দশাগ্রস্ত বন্দির অবস্থায় উপনীত হন।"[৩৮] অবশ্য এ সত্য মেনে নিয়েও বলতে হয় দোষগুণে শাহজাহান উচ্চ মর্যাদারই অধিকারী এবং বহু গ্লানি থাকা সত্ত্বেও তার রাজত্বকাল মুঘল ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয়। অনেক ঐতিহাসিক তার রাজত্বকালকে মুঘল ইতিহাসের স্বর্ণযুগ (the golden age of the Mughals) বলে অভিহিত করেন। ভ্রাতৃঘাতী উত্তরাধিকারী সংগ্রাম মুঘল সাম্রাজ্যের সংহতিকে কিছুটা ব্যাহত করলেও গৌরবময় বিজয়, সুদক্ষ শাসনব্যবস্থা, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং স্থাপত্য ও শিল্পকলার যে চরম বিকাশ এ সময় মুঘল সাম্রাজ্যে ঘটেছিল তার ভিত্তিতে শাহজাহানের রাজত্বকালকে ন্যায়সংগতভাবেই মুঘল ইতিহাসের স্বর্ণযুগ বলা যায়।

সম্রাজ্ঞী মমতাজমহল (Empress Mumtazmahal)

মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাসের অন্যতম উজ্জ্বল তারকা সম্রাজ্ঞী মমতাজমহল। তার প্রকৃত নাম আরজুমান্দ বানু বেগম। তবে তিনি ইতিহাসে 'মমতাজমহল' (প্রাসাদের অলংকার) নামেই সমধিক পরিচিত। তিনি ভারতের আগ্রায় ১৫৯৩ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের ২৭ তারিখ জন্মগ্রহণ করেন। মমতাজ মহলের পিতা আসফ খান সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের ভাই এবং মুঘল রাজ দরবারের একজন প্রভাবশালী অমাত্য ছিলেন। মমতাজ তার ফুফু নূরজাহানের মতোই অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী ছিলেন। বুদ্ধিমতী মমতাজ একজন প্রতিভাবান নারীরূপেও পরিচিতি লাভ করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর আসফ খানের কন্যার সৌন্দর্য ও প্রতিভার কথা অবগত হয়ে প্রিয় পুত্র খুররমের (শাহজাহানের) সাথে বিয়ে দেন। ১৬১২ খ্রিষ্টাব্দে মহা ধুমধামে

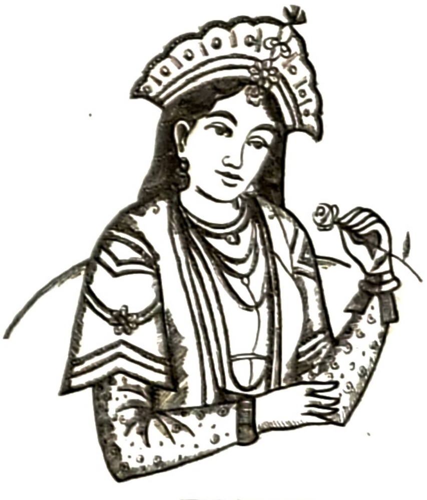
মমতাজমহল

---

[৩৮] From the meridian of splendour, he had, all of sudden, sunk to the position of miserable captive.– 'Ibid'

দু'জনের বিয়ে সম্পন্ন হয়। দাম্পত্য জীবনে সম্রাট শাহজাহান ও মমতাজমহল অত্যন্ত সুখী ছিলেন। ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন, "বহুবিবাহ প্রথা অধ্যুষিত রাজপরিবারে শাহজাহান ও আরজুমান্দ বানুর বিবাহের মতো অপর কোনো বিবাহ এরূপ আনন্দদায়ক হয়নি।" বস্তুত ফুফু নূরজাহানের মতো তিনিও তার আকর্ষণীয় সৌন্দর্য ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে স্বামী শাহজাহানের অন্তর জয় করেছিলেন। (Like her aunt, she captivated her husbands heart by her charms.)

শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মমতাজমহল ছিলেন একজন প্রতিভাবান উজ্জ্বল নারী। তিনি আরবি ও ফারসি ভাষায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। তার চরিত্রে নম্রতা ও বিনয়ের অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছিল। তিনি ছোট বয়সেই অনেক মহৎ ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

সৌন্দর্য, বুদ্ধিমত্তা ও প্রেম-ভালোবাসায় মমতাজমহল স্বামী শাহজাহানের হৃদয়ের রানিতে পরিণত হয়েছিলেন। সম্রাট শাহজাহানের আরও স্ত্রী থাকলেও তিনি মমতাজমহলকেই তার প্রধান মহীসীর (স্ত্রী) আসন দান করেন। সম্রাট রাজপরিবারের সব নারীর ওপর তাকে প্রাধান্য এবং তাকে 'মালিকা-ই-জাহান' (বিশ্বের রানি) এবং 'মালিকা-উজ-জামান' (যুগের রানি) উপাধি দেন। ব্যক্তিজীবনে মমতাজমহল ছিলেন ধর্মনিষ্ঠ ও উদারমনা। ফুফু নূরজাহানের মতো তিনিও তার স্বামীর অন্তর জয় করতে পেরেছিলেন। এজন্যই সম্রাট শাহজাহান রাজ্যপরিচালনার অনেক ব্যাপারেই তার পরামর্শ গ্রহণ করতেন।

১৬৩১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ জুন চতুর্দশ সন্তান প্রসবকালে মহীয়সী মমতাজমহল বুরহানপুরে ইন্তেকাল করেন। তখন তার বয়স ছিল ৩৯ বছর। প্রিয়তমা স্ত্রীর অকাল ও আকস্মিক মৃত্যুতে সম্রাট শাহজাহান বেদনাকাতর হয়ে পড়েন। শোকাতুর সম্রাট এতটাই মুষড়ে পড়েছিলেন যে, তিনি সাত দিন ঝরোকায় দর্শন দেননি এমনকি রাজকাজেও অংশ নেননি। তিনি প্রায়ই বলতেন, রাজ্যে আর কোনো মাধুর্য নেই, আমার জীবনে আর কোনো মোহও নেই। সম্রাট তার প্রিয়তমা স্ত্রীর প্রতি গভীর ভালোবাসা ও অনুরাগের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে মমতাজের সমাধির ওপর তাজমহল নির্মাণ করেন, যা বিশ্বের সপ্তাশ্চর্যের একটি। এটি স্ত্রীপ্রেমেরও এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কার রাজত্বকালকে মুঘল ইতিহাসের স্বর্ণযুগ বলা হয়?
২. মমতাজমহল কে ছিলেন?
৩. কত খ্রিষ্টাব্দে খুররমের (শাহজাহানের) সাথে মমতাজমহলের বিয়ে হয়?
৪. মমতাজমহলকে 'মালিকা-ই-জাহান' এবং 'মালিকা-উজ-জামান' উপাধি দেন কে?
৫. কত খ্রিষ্টাব্দে মমতাজমহল ইন্তেকাল করেন?
৬. কার সমাধির ওপর তাজমহল নির্মিত হয়?

উত্তরের জন্য ২৪৪ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. সম্রাট শাহজাহানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো ছক আকারে লেখো।
২. সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালকে মুঘল ইতিহাসের স্বর্ণযুগ বলার পাঁচটি কারণ ছকে উপস্থাপন করো।
৩. সম্রাজ্ঞী মমতাজমহলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো চিহ্নিত করে একটি চার্ট তৈরি করো।

পাঠ ২৬ ও ২৭

সম্রাট আওরঙ্গজেব: প্রাথমিক জীবন ও সাম্রাজ্য বিস্তার (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রি.) [Emperor Aurangzeb: Early Life and Expansion of the Empire (1658–1707 AD)]

প্রাথমিক জীবন (Early Life)

ভারতে মুঘল রাজবংশের শেষ খ্যাতিমান ও সফল সম্রাট ছিলেন মুহিউদ্দিন মুহাম্মদ আলমগীর। তার অর্ধশতাব্দীর রাজত্বকাল মুঘল ইতিহাসে দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ ও ঘটনাবহুল। যদুনাথ সরকার বলেন, "আওরঙ্গজেবের ইতিহাস বস্তুত ভারতবর্ষের ষাট বছরের ইতিহাস। তার রাজত্বকাল (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রি.) সতেরো শতকের শেষভাগ জুড়ে আছে এবং এটি আমাদের দেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।" সম্রাট আওরঙ্গজেব ছিলেন ক্ষয়িষ্ণু মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তিমকালে শেষ সফল ও প্রদীপ্ত সূর্য।

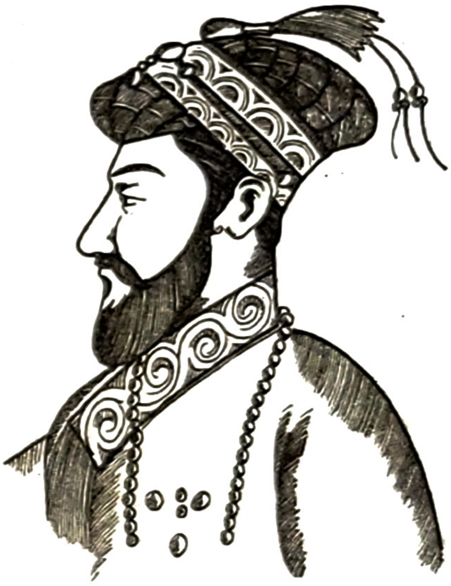

সম্রাট মুহিউদ্দিন মুহাম্মদ আওরঙ্গজেব

সম্রাট আওরঙ্গজেব সম্রাট শাহজাহান ও মমতাজমহলের তৃতীয় পুত্র। শাহজাহান দাক্ষিণাত্যের সুবাদার থাকাকালে আহমদাবাদ ও মালব সীমান্তের ধুদে নামক স্থানে ১৬১৮ খ্রিষ্টাব্দে আওরঙ্গজেবের জন্ম। আওরঙ্গজেব প্রখর মেধাবী ছিলেন। অতি অল্প সময়েই তিনি কুরআন ও হাদিসে বিশেষ ব্যুৎপত্তি এবং আরবি, ফারসি, তুর্কি ও হিন্দি ভাষায় পারদর্শিতা অর্জন করেন। ইসলামি ধর্মতত্ত্বেও তার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। সমরবিদ্যায়ও তিনি বিশেষ শিক্ষা পেয়েছিলেন। মাত্র ১৭ বছর বয়সেই বুন্দেলার জুঝর সিংহের বিরুদ্ধে তিনি তার সমর প্রতিভা ও কূটনীতি জ্ঞানের প্রমাণ দেন। ১৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দে ১৮ বছর বয়সে আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের সুবাদার হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। আট বছর সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালন করে বড়ভাই দারাশিকোর ঈর্ষার কারণে আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের সুবাদার পদ থেকে ইস্তফা দিতে বাধ্য হন। ১৬৪৫ খ্রিষ্টাব্দে তাকে গুজরাটের সুবাদার নিযুক্ত করা হয়। ১৬৪৭ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাটের নির্দেশে আওরঙ্গজেব বলখ ও বাদাখশানের অভিযানে নেতৃত্ব দেন। ১৬৪৮ থেকে ১৬৫২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মুলতান ও সিন্ধুতে শাসনকর্তার দায়িত্ব পালন করেন। ১৬৫২ খ্রিষ্টাব্দে আওরঙ্গজেব পুনরায় দাক্ষিণাত্যের সুবাদার পদ লাভ করেন এবং ১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এ পদে বহাল ছিলেন।

সিংহাসনে আরোহণ ও রাজ্যাভিষেক: রক্তক্ষয়ী উত্তরাধিকার সংগ্রামে নিজ কৃতিত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ দিয়ে আওরঙ্গজেব প্রতিদ্বন্দ্বী ভাইদের পরাজিত ও পিতা সম্রাট শাহজাহানকে আগ্রার দুর্গে বন্দি করে ১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দের ২১ জুলাই মুঘল সিংহাসনে আরোহণ করেন। এখানে তার প্রথম অনাড়ম্বর অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তী সময়ে খাজওয়ার যুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাই শাহ সুজাকে এবং দেওরাইয়ের যুদ্ধে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বড় ভাই দারাশিকোকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে আওরঙ্গজেব দিল্লি অধিকার করেন। দিল্লি জয়ের পর ১৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দের ৫ জুন মহাসমারোহে তার দ্বিতীয় অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়। আওরঙ্গজেব 'আবুল মুজাফফর মুহিউদ্দিন মুহাম্মদ আওরঙ্গজেব 'আলমগীর বাদশাহ গাজী' উপাধি ধারণ করে ৬ষ্ঠ মুঘল সম্রাট হিসেবে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। দু'মাস ধরে চলা অভিষেক অনুষ্ঠানে সাম্রাজ্যের সব শ্রেণির মানুষ অংশগ্রহণ করে।

প্রাথমিক কার্যাবলি: সিংহাসনে আরোহণ করেই সম্রাট আওরঙ্গজেব কতকগুলো প্রজাকল্যাণকামী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি জনদুর্ভোগ লাঘব ও প্রজাসাধারণের জীবনমান সহজ ও সুখকর করার জন্য শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, দ্রব্যমূল্য হ্রাস এবং অতিরিক্ত ও কষ্টকর কর বাতিল করেন। সমসাময়িক ঐতিহাসিক কাফি খানের বর্ণনা মতে, সম্রাট প্রায় আশি প্রকার আইনি ও বেআইনি কর মওকুফ করেছিলেন। মওকুফকৃত করের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল হিন্দুদের দেওয়া তীর্থকর, বাণিজ্য পণ্যের ওপর ধার্যকৃত রাহাদারি, বানদারী কর এবং শস্য কর ইত্যাদি।

সম্রাট আওরঙ্গজেব নিজে একজন নিষ্ঠাবান সুন্নি মুসলমান ছিলেন। তাই সুন্নি মুসলমানদের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তিনি কতকগুলো পদক্ষেপ নেন। যেমন— মাদকের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। সম্রাটের ঝরোকা দর্শন প্রথা রহিত করা হয়। সতীদাহ প্রথা বেআইনি করা হয়। রাজদরবার থেকে সভাকবিসহ সম্রাটের স্তুতি-স্তাবকদের বিতাড়িত করা হয়। নওরোজ উৎসব উদযাপন, জুয়াখেলা, রাজদরবারে সংগীত বাদ্য এবং সম্রাটের কপালে চন্দনের রাজটিকা প্রদান নিষিদ্ধ করা হয়। সম্রাট কালেমার পবিত্রতা রক্ষার জন্য মুদ্রায় কালেমা অঙ্কনের রীতি বাতিল করেন। সৌর পঞ্জিকার পরিবর্তে চন্দ্রমাসের গণনায় বর্ষপঞ্জি চালু করা হয়। দীন-ই ইলাহি ধর্মমতের অবসান ঘটানো হয়। মহররমের অনুষ্ঠান উদযাপন সীমিত এবং তাজিয়া নিষিদ্ধ করা হয়। জরাজীর্ণ মসজিদ ও খানকাহসমূহ সংস্কার এবং রাজভাণ্ডার থেকে ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের বেতন-ভাতা দানের ব্যবস্থা করা হয়। দুর্নীতিরোধ ও জনসাধারণের নৈতিক জীবনমান রক্ষার উদ্দেশ্যে মুহতাসিব কর্মকর্তাদের তৎপরতা জোরদার করা হয়। প্রজাসাধারণের সুবিধার জন্য পরিকল্পিতভাবে রাস্তাঘাট ও সেতু নির্মাণ ও সংস্কার করা হয়। শিক্ষাবিকাশের জন্য অসংখ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণসহ বিপুল অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়। দুর্ভিক্ষ মোকাবিলার জন্য প্রতিটি জেলায় সরকারি শস্য সংরক্ষণাগারসহ প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের বিজয়াভিযান ও সাম্রাজ্যবিস্তার

Conquests and the Expansion of the Empire by Aurangzeb

ঐতিহাসিকেরা সম্রাট আওরঙ্গজেবের সুদীর্ঘ রাজত্বকালকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। ক. প্রথম ভাগ: ১৬৬৮-১৬৮১ খ্রি. এবং খ. দ্বিতীয় ভাগ: ১৬৮২-১৭০৭ খ্রি.। রাজত্বের প্রথম ভাগে আওরঙ্গজেব উত্তর-পূর্ব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এবং রাজপুতনার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। রাজত্বের দ্বিতীয় ভাগে তার কার্যক্রম দাক্ষিণাত্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

আওরঙ্গজেবের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অভিযান: উত্তর-পূর্ব সীমান্তে আসাম অভিযান সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সাম্রাজ্যের সীমা অক্ষুণ্ন রাখা এবং নতুন অঞ্চল জয় করে সাম্রাজ্যসীমা সম্প্রসারণ সম্রাটের অন্যতম কর্তব্য ছিল। সম্রাট আওরঙ্গজেব এ কাজ সম্পাদনে বদ্ধপরিকর ছিলেন। তাই নিজের অবস্থান সুনিশ্চিত করার পর তিনি উত্তর-পূর্ব সীমান্তে আসামের দিকে দৃষ্টি দেন। অহোমী হিন্দু অধ্যুষিত আসাম রাজ্য উত্তর-পশ্চিমে বারানসী ও পশ্চিমে কালাং নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উত্তরাধিকার সংগ্রামের সময় কামরূপ থেকে কুচবিহার ও আসাম বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সুযোগ বুঝে ১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দে আসাম সম্রাট শাহজাহানের সাথে সম্পাদিত সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করে এবং কামরূপের রাজধানী গোহাটি অধিকার করে নেয়।

মীর জুমলার আসাম অভিযান: সম্রাট আওরঙ্গজেব বিখ্যাত সেনাপতি মীর জুমলাকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করে তার উপর কুচবিহার ও আসাম অধিকারের দায়িত্ব দেন। ১৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে মীর জুমলা ঢাকা থেকে সুসজ্জিত বাহিনী নিয়ে আসাম অভিমুখে রওনা দেন। তিনি পথে কুচবিহার অধিকার করে ১৬৬২ খ্রিষ্টাব্দে ১৩ মার্চ এক নৌযুদ্ধে আসাম রাজাকে পরাজিত করে রাজধানী গড়গাঁও অধিকার করেন। অবশ্য বৈরী প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে মুঘলরা সুবিধা করতে পারেননি। সুযোগ বুঝে অহোমীরা খণ্ডযুদ্ধের মাধ্যমে মুঘল বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। তবে মুঘলদের বিরুদ্ধে তারা চূড়ান্ত বিজয় অর্জনে ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত ১৬৬৩ খ্রিষ্টাব্দে চুক্তি সম্পাদনে বাধ্য হয়। চুক্তির শর্তানুসারে ক. আসামরাজ জয়ধ্বজ মুঘল সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করে বার্ষিক করদানে সম্মত হন। খ. মুঘল দরবারের প্রতিভূ হিসেবে নিজ কন্যাকে রাখতে সম্মত হন। গ. যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ, রৌপ্য ও হাতিসহ নগদ অর্থ মুঘল সম্রাটকে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন এবং সর্বোপরি অহমরাজ তার রাজ্যের দারং প্রদেশের অর্ধেক মুঘলদের হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। মীর জুমলা আসামে তার কষ্টলব্ধ সাফল্যের ফল ভোগ করতে পারেননি। আসাম থেকে ঢাকায় ফেরার পথে ১৬৬৩ খ্রিষ্টাব্দের ৩১ মার্চ তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

জেনে রাখো

মীর জুমলার প্রকৃত নাম মীর মুহাম্মদ। তিনি ইস্পাহানের অধিবাসী। ভাগ্যান্বেষণে তিনি ভারতে আসেন এবং নিজ যোগ্যতাবলে গোলকুণ্ডার সেনাবাহিনীতে চাকরি পান। পরে মুঘল সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে তিনি সিপাহসালার উপাধিতে ভূষিত হন এবং ৭ হাজার সৈন্যের মনসবদার এবং বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। তিনি রাজমহল থেকে বাংলার রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তর করেন।

শায়েস্তা খানকে সুবাদার নিয়োগ ও তার পদক্ষেপ: মীর জুমলার মৃত্যুর পর আওরঙ্গজেব তার মাতুল আসফ খানের পুত্র শায়েস্তা খানকে বাংলার সুবাদার নিয়োগ করেন। তিনি ত্রিশ বছর বাংলার সুবাদার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এদিকে জয়ধ্বজের মৃত্যুর পর চক্রধ্বজ ক্ষমতায় এসে আসাম ও কামরূপ পুনঃদখল করেন। মুঘল বাহিনী তাদের অধিকৃত অঞ্চল পুনর্দখলে ব্যর্থ হলেও শায়েস্তা খান ঐ অঞ্চলে শক্তি বৃদ্ধিতে সক্ষম হন। কুচবিহারের রাজা মুঘল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হয়। এ সময় আরাকানের মগ ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের মিলিত তৎপরতায় বাংলার দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল। সুবাদার শায়েস্তা খান নৌশক্তি বৃদ্ধি করে পর্তুগিজ ও মগ জলদস্যুদের তাণ্ডব রোধ করেন। জলদস্যুদের প্রধান কর্মকেন্দ্র বঙ্গোপসাগরের সন্দীপ দ্বীপ দখল করে নেওয়া হয়। ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে সুবাদার শায়েস্তা খান পুত্র বুজুর্গ উমেদ খানের সহায়তায় আরাকান রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ থেকে চট্টগ্রামকে রক্ষা করেন। সম্রাটের অনুমতিক্রমে বিজিত চট্টগ্রামের নামকরণ হয় ইসলামাবাদ।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি: ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত বরাবরই মুসলমান সুলতান ও সম্রাটদের জন্য মাথাব্যথার কারণ ছিল। কারণ এ সীমান্ত সুরক্ষার ওপর ভারতের নিরাপত্তা অনেকাংশ নির্ভরশীল ছিল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্তী পার্বত্যাঞ্চলে ছিল আফগান উপজাতিদের বসতি। এ আফগানরা ছিল দুর্ধর্ষ ও যুদ্ধপ্রিয়। কৃষিকাজের অনুপযোগী অঞ্চলে বসবাসরত আফগানরা এ অঞ্চলের বাণিজ্য পথে আগত বণিকদের ধনসম্পদ লুণ্ঠন এবং তাদের কাছ থেকে শুল্ক আদায় করে জীবিকা নির্বাহ করত। সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালের মধ্যভাগ পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলের আফগান উপজাতিরা কিছুটা শান্ত থাকলেও উত্তরাধিকার সংঘাতের সুযোগে তারা পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তারা মুঘল সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরেও লুটতরাজ, অত্যাচার ও উপদ্রব করতে থাকে। এ অবস্থায় উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের গিরিপথ উন্মুক্ত ও নিরাপদ রাখার জন্য লুটেরা আফগানদের দমন আওরঙ্গজেবের জন্য জরুরি কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। সম্রাট আওরঙ্গজেব প্রথমে উৎকোচ ও রাজনৈতিক পারিতোষিক দিয়ে তাদের করার চেষ্টা করেন। তবে তার এ নীতি সফল হয়নি। সীমান্তবর্তী অঞ্চলের ইউসুফ জাই, আফ্রিদি এবং খটক প্রভৃতি আফগান উপজাতি গোত্রের বিদ্রোহে আওরঙ্গজেব গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হন। এ অবস্থায় সম্রাট উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আগ্রাসী সমরনীতি গ্রহণে বাধ্য হন।

ইউসুফ জাই, আফ্রিদি ও খটক উপজাতির বিদ্রোহ ও সম্রাটের গৃহীত পদক্ষেপ: ১৬৬৭ খ্রিষ্টাব্দে স্বাত ও পেশোয়ারের উত্তরে বিজাপুর জেলার ইউসুফ জাই উপজাতি মুঘলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তাদের দলপতি ভাগু মোল্লা চালাক নামে স্থানীয় ধর্মগুরুর আশীর্বাদ নিয়ে কয়েকটি উপজাতি গোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করে এবং ৫ হাজার যোদ্ধা সমেত সিন্ধুনদ অতিক্রম করে মুঘলদের হাজারা জেলা অধিকার করে কাশ্মির যাওয়ার পথ বন্ধ করে দেন। তারা পেশোয়ার ও আটক আক্রমণ ও লুট করে। সম্রাট আওরঙ্গজেব আটকের ফৌজদার কালিম খান এবং সেনাপতি শমসির খান ও আমিন খানকে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। মুঘল বাহিনী নির্দয়ভাবে এ বিদ্রোহ দমনে সাফল্য লাভ করে। সম্রাট রাজা যশোবন্ত সিংহকে সীমান্তবর্তী জামরুদ নামক দুর্গের ফৌজদার নিয়োগ করে তার বিজয়কে দীর্ঘস্থায়ী করার চেষ্টা করেন।

১৬৭২ খ্রিষ্টাব্দে আফ্রিদি উপজাতি তাদের নেতা আকমল খানের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে। আকমল খান নিজেকে রাজা হিসেবে ঘোষণা করে রাজমুকুট ধারণ ও নিজ নামে মুদ্রা জারি করেন। তিনি পাঠান উপজাতিদের মুঘলদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। তাকে দমনের উদ্দেশ্যে সম্রাট আওরঙ্গজেবের প্রেরিত মুঘল সেনানায়ক আমিন খান আলী যুদ্ধে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়ে পেশোয়ারে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হন। যুদ্ধে মুঘল পক্ষের প্রায় দশ হাজার সৈনিক নিহত হয়। আফ্রিদিরা মুঘলদের দু'কোটি টাকার অর্থ ও সম্পদ লুট করে নেয়। হাজার হাজার লোককে বন্দি করে আফ্রিদিরা দাস হিসেবে বিক্রির জন্য মধ্য এশিয়ায় প্রেরণ করে।

মুঘলদের বিরুদ্ধে সাফল্যে আফ্রিদি নেতা আকমল খানের প্রভাব-প্রতিপত্তি যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। মুঘলবিরোধী আফগানরা দলে দলে তার পতাকাতলে সমাবেত হতে থাকে। তবে কোহাট ও বানু অঞ্চলের খটক উপজাতি ও তাদের নেতা বিখ্যাত যোদ্ধা ও আদর্শবাদী কবি খুশহাল খান আন্দোলনে যুক্ত হওয়ায় আফগানদের বিদ্রোহ ক্রমে জাতীয় অভ্যুত্থানে রূপান্তরিত হয়। আটোক থেকে কান্দাহার পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলে আফগানরা মুঘলদের বিরুদ্ধে জেগে ওঠে। বিপুল পাঠান

অভ্যুত্থান দমনের উদ্দেশ্যে সম্রাট ফরিদ খান, সুজাত খাঁ, মহাবত খাঁ প্রমুখ বিখ্যাত সেনাপতিদের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে প্রেরণ করেন। কিন্তু তারা বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ হওয়ায় স্বয়ং সম্রাট আওরঙ্গজেব ১৬৭৪ খ্রিষ্টাব্দে আকবর খান, শাহজাদা আকবর ও উজির আসাদ খানসহ বিখ্যাত সেনানায়ক ও বিপুল সেনাবাহিনী নিয়ে পেশোয়ারের কাছে আসান আবদাল এ উপস্থিত হন। স্বয়ং সম্রাটের উপস্থিতি মুঘলদের উজ্জীবিত করে তোলে। তবে আফগান বিদ্রোহ দমনে সম্রাট শক্তি প্রয়োগের পাশাপাশি কূটনীতির আশ্রয় নেন। প্রচুর উপঢৌকন, বার্ষিক ভাতা, জায়গির ও রাজকীয় পদ দ্বারা অনেক আফগান সর্দারকে দলে টানা হয়। এছাড়া পরস্পরের বিরুদ্ধে পরস্পরকে প্ররোচিত করে বিদ্রোহীদের মধ্যকার ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করা হয়। অবশ্য ঘোরাই, গিলজাই, শিরানী ও ইউসুফ জাই উপজাতিরা তাদের প্রতিরোধ অব্যাহত রাখে। তবে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের পরাস্থ করা হয়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আসলে সম্রাট আওরঙ্গজেব ১৬৭৫ খ্রিষ্টাব্দে রাজধানীতে ফিরে আসেন। কাবুলের সুবাদার আমিন খান আওরঙ্গজেবের মতো পারিতোষিক ও ভেদনীতি প্রয়োগের পাশাপাশি আফগানদের প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যবহারের মাধ্যমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সফল হন। খটক নেতা খুশহাল খান একাকী প্রতিরোধ অব্যাহত রাখেন। অবশ্য তার পুত্র বিশ্বাসঘাতকতা করে পিতাকে মুঘল সম্রাটের হাতে তুলে দিলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মুঘলবিরোধী প্রতিরোধের অবসান ঘটে।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতির ফলাফল: উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সমস্যা সমাধানে সম্রাট আওরঙ্গজেব বাহ্যত সফল হলেও এর অন্তর্নিহিত ও সুদূরপ্রসারী ফলাফল মুঘলদের জন্য গৌরব ও মর্যাদাকর ছিল না। এর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব নেতিবাচক হয়েছিল। প্রথমত, যদুনাথ সরকার বলেন, "আফগান যুদ্ধ রাজকোষকে যেমন বিপর্যস্ত করেছিল তেমনি এর রাজনৈতিক ফলাফল ছিল আরও অধিক ক্ষতিকর।" যুদ্ধ পরিচালনা, উপঢৌকন ও পারিতোষিক বাবদ মুঘলদের বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়। দ্বিতীয়ত, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের আফগানরা ছিল মুঘল সেনাবাহিনীর মেরুদণ্ড। আফগানদের সাথে এ বিরোধের ফলে মুঘল বাহিনীতে আফগানদের নিয়োগের পথ রুদ্ধ হয়ে পড়ে। আওরঙ্গজেব রাজপুত ও মারাঠা শক্তির বিরুদ্ধে সাহসী ও বিশ্বস্ত আফগান যোদ্ধাদের সাহায্য থেকে বঞ্চিত হলো। তৃতীয়ত, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ব্যস্ত থাকায় এবং অধিকাংশ সেনাবাহিনী উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে নিয়োজিত থাকায় রাজপুত ও দাক্ষিণাত্যের শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠাদের উত্থানের সুবর্ণ সুযোগ ঘটে। এসব দিক বিবেচনা করে বলা যায়, রণনীতি ও কূটনীতির সার্থক প্রয়োগে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে রাজ্যরক্ষায় সম্রাট আওরঙ্গজেব নিঃসন্দেহে সফল হয়েছিলেন, কিন্তু এ জয়ের মূল্য বাবদ তাকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে যথেষ্ট মাশুল দিতে হয়েছিল।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ সফল সম্রাট কে?
২. শাহজাদা আওরঙ্গজেব কত বছর দাক্ষিণাত্যে সুবাদার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন?
৩. 'আলমগীর বাদশাহ গাজী' উপাধি ধারণ করেন কোন মুঘল সম্রাট?
৪. শায়েস্তা খানকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন কে?
৫. সম্রাট আওরঙ্গজেব কত প্রকার বেআইনি কর মওকুফ করেছিলেন?
৬. কার অনুমতি নিয়ে চট্টগ্রামের নাম ইসলামাবাদ করা হয়?

উত্তরের জন্য ২৪৪ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. প্রজাকল্যাণে সম্রাট আওরঙ্গজেবের গৃহীত পদক্ষেপগুলো ছক আকারে লেখো।
২. সাল ও স্থানের নামসহ সম্রাট আওরঙ্গজেবের বিজয়াভিযানগুলোর একটি তালিকা তৈরি করো।

পাঠ ২৮

সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজপুত নীতি
Rajput Policy of Aurangzeb

ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও সমৃদ্ধির কথা বিবেচনা করে সম্রাট আকবর রাজপুতদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের শাসনকালেও এ সম্পর্কে বিশেষ ছেদ পড়েনি। অবশ্য সম্রাট আওরঙ্গজেব রাজপুতদের ব্যাপারে তার পূর্বসূরি সম্রাটদের অনুসৃত নীতি বজায় রাখতে পারেননি। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার আওরঙ্গজেবের রাজপুত নীতিকে অদূরদর্শী রাজনৈতিক পদক্ষেপ বলে আখ্যায়িত করেছেন। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন ধর্মীয় কারণেই আওরঙ্গজেব রাজপুতদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন। আওরঙ্গজেব ছিলেন গোঁড়া সুন্নি মুসলমান। বলপূর্বক হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করার উদ্দেশ্যে হিন্দু জাগরণের পথিকৃৎ রাজপুতদের বিরুদ্ধে আওরঙ্গজেব অস্ত্রধারণ করেছিলেন বলে কোনো কোনো ঐতিহাসিক অভিযোগ করেন।

আওরঙ্গজেব তার রাজত্বের প্রথম দিকে রাজপুতদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। রাজা জয় সিংহ এবং রাজা যশোবন্ত সিংহ প্রমুখ বিখ্যাত রাজপুত অধিপতিদের তিনি যোগ্য সম্মান দিয়ে রাজকাজে নিয়োজিত করেছিলেন। হিন্দুদের সর্বজনস্বীকৃত নেতা হওয়ার বিষয়ে যশোবন্ত সিংহের মনোভাব জানা এবং তার বিশ্বাসঘাতকতা সত্ত্বেও সম্রাট তাকে দায়িত্বপূর্ণ পদে বহাল রেখেছিলেন। এমনকি সম্রাট মুঘল সাম্রাজ্যের ক্ষতি করতে পারেন এ আশঙ্কা সত্ত্বেও যশোবন্ত সিংহকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের জামরুদ দুর্গের ভার তার হাতে অর্পণ করেছিলেন। রাজপুতদের বিরুদ্ধে সম্রাটের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ—

মারওয়ার অধিকার: ১৬৭৮ খ্রিষ্টাব্দে মারওয়ারের অধিপতি রাজা যশোবন্ত সিংহ মৃত্যুবরণ করেন। তার কোনো পুত্র সন্তান না থাকায় এ সময় মারওয়ার রাজ্যের উত্তরাধিকার প্রশ্নে সমস্যা দেখা দেয়। অবশ্য এ সময় তার দুই স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা ছিল। দুই রানির গর্ভে দুই পুত্র সন্তান জন্ম নেয় এবং এদের এক জন মারা যায়। রাজপুতরা এ সময় যশোবন্ত সিংহের জীবিত শিশুপুত্র অজিত সিংহকে যশোবন্ত সিংহের উত্তরাধিকার এবং মারওয়ার অধিপতি বলে স্বীকৃতির দাবি জানালে সম্রাট তাতে সম্মত হন। তবে প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত তাকে রাজদরবারে রেখে লালন-পালনের কথা বলেন। রাজপুত সামন্তরা সম্রাটের এ প্রস্তাবকে তাদের প্রতি চরম অসম্মানসূচক বলে মনে করেন। তাই তারা সম্রাটের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের সিদ্ধান্ত নেয়। অবশ্য ইতোমধ্যে সম্রাট যশোবন্ত সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র ইন্দ্রসিংহকে বার্ষিক ৩৬ লাখ টাকা করের বিনিময়ে মারওয়ারের শাসনভার অর্পণ করলে যশোবন্ত সিংহের বিধবা দুই স্ত্রী এবং শিশু পুত্র অজিত সিংহ লাহোর থেকে মারওয়ারে পালিয়ে যান। রাঠোর রাজপুত সর্দারেরা যোধপুরে শিশু অজিত সিংহকে 'রাজা' বলে ঘোষণা করে মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করেন। রাঠোর বিদ্রোহীদের প্রতিহত করতে না পারায় সম্রাট আওরঙ্গজেব ইন্দ্রসিংহকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। সম্রাট শাহজাদা আকবর ও আজমিরের ফৌজদার তহাওর খানের নেতৃত্বে মারওয়ারের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান প্রেরণ করেন। সমর ব্যবস্থাপনা তদারক ও যুদ্ধ পরিচালনার উদ্দেশ্যে স্বয়ং সম্রাট আজমিরে উপস্থিত হন। ১৬৭৯ খ্রিষ্টাব্দে যোধপুর অধিকৃত হলে মারওয়ারে মুঘল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

মেবার আক্রমণ: মেবারের রাজা ছিলেন রানা রাজসিংহ। সম্রাট আওরঙ্গজেবের মারওয়ার অধিকারে তিনি নিজ রাজ্যের নিরাপত্তার ব্যাপারে আতঙ্কিত হন। তাছাড়া জিজিয়া কর পরিশোধ সংক্রান্ত সম্রাটের আদেশেও রাজসিংহ অপমান বোধ করেন। মারওয়ারের অজিত সিংহের মাতা ছিলেন মেবারের রাজকন্যা। তিনি মারওয়ার রক্ষার জন্য রাজসিংহের কাছে সাহায্যের আবেদন করলে রানা মুঘল ঔদ্ধত্য মোকাবিলায় মারওয়ারের সাথে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম পরিচালনায় সম্মত হন। রানা জয় সিংহ ও দুর্গাদাস যুগ্মভাবে মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। রানা রাজসিংহের মুঘলবিদ্বেষী তৎপরতা এবং দুর্গাদাস ও অজিত সিংহের সাথে মৈত্রী স্থাপনে আওরঙ্গজেব ক্ষুব্ধ হন। সম্রাট এক বিশাল বাহিনীসহ মেবারের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করেও সম্মিলিত রাজপুত শক্তি পরাজিত হয়। রানা রাজসিংহ পার্বত্যাঞ্চলে পলায়ন করলে মুঘল বাহিনী চিতোর ও উদয়পুর অধিকার করতে সমর্থ হয়। সম্রাট আওরঙ্গজেব যুবরাজ আকবরের হাতে মেবারের ভার অর্পণ করে আজমিরে ফিরে যান।

যুবরাজ আকবরের বিদ্রোহ: মুঘলদের কাছে পর্যুদস্ত.হলেও রাজপুতরা সাহস হারায়নি বা সংকল্পচ্যুত হয়নি। তবে সম্মুখ যুদ্ধে সাফল্যলাভ কঠিন ভেবে রাজপুতরা মুঘলদের বিরুদ্ধে গেরিলা (হঠাৎ অতর্কিত আক্রমণ) আক্রমণ পরিচালনা করে তাদের ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। সম্মুখ যুদ্ধে রাজসিংহের কাছে শাহজাদা আকবর পরাজিত হন। আওরঙ্গজেব শাহজাদা আজমের ওপর মেবারের দায়িত্ব দিয়ে যুবরাজ আকবরকে মারওয়ার থেকে ডেকে পাঠান। সম্রাটের এ সিদ্ধান্তে যুবরাজ আকবর বেশ অপমান বোধ করেন। পদচ্যুতির অপমানে জর্জরিত যুবরাজ বিদ্রোহী রাজপুতদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে ১৬৮১ খ্রিষ্টাব্দে নিজেকে মুঘল ভারতের সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। আজমিরে অবস্থানকারী সম্রাট আওরঙ্গজেব প্রথমে যুবরাজ আকবরের এক বিশ্বস্ত সহযোগীকে কৌশলে নিজ পক্ষভুক্ত করেন। অতঃপর তিনি আকবরের নামে এমন এক চাতুর্যপূর্ণ পত্র লেখেন যা পাঠে রাজপুতদের মনে সন্দেহ হয় যে, আকবর বিশ্বাসঘাতক। সম্রাট এ পত্রটি রাজপুতদের হাতে পড়ারও ব্যবস্থা করেন। পত্রপাঠে সত্যি সত্যি রাজপুতদের মনে আকবরের বিশ্বস্ততা সম্পর্কে সন্দেহ জাগে এবং তারা আকবরের পক্ষ ত্যাগ করে। বিচক্ষণ পিতার কূটনীতিতে আকবরের বিপর্যয় ঘটে।

উদয়পুরের চুক্তি: ইতোমধ্যে মেবারের রাজা রাজসিংহ মৃত্যুবরণ করলে তার পুত্র জয়সিংহ উত্তরাধিকার লাভ করেন। আওরঙ্গজেব যখন যুবরাজ আকবরের বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত তখন সুযোগ বুঝে জয়সিংহ মালব ও গুজরাট আক্রমণ করেন। অবশ্য দীর্ঘদিন মুঘলবিরোধী তৎপরতা চালানোর মতো ব্যক্তিত্ব তার ছিল না। অন্যদিকে, রাজস্থানে যুদ্ধ পরিচালনায় মুঘলরাও পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাই শেষ পর্যন্ত উভয়ে সন্ধি চুক্তির মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তিতে একমত হয়। ১৬৮১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ জুন উদয়পুরে দু'পক্ষের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির শর্তানুসারে জয় সিংহকে মেবারের রাজা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ১৭০৯ খ্রিষ্টাব্দে আওরঙ্গজেবের পুত্র ও উত্তরাধিকার বাহাদুর শাহ অজিত সিংহকে মারওয়ারের মহারাজা হিসেবে স্বীকৃতি দিলে রাজপুত-মুঘল যুদ্ধের অবসান ঘটে।

রাজপুত নীতির ফলাফল: রাজপুতদের ব্যাপারে সম্রাট আওরঙ্গজেবের নীতিকে ঐতিহাসিকেরা তার রাজনৈতিক ভুল বলে অভিহিত করেছেন। এ নীতি সাম্রাজ্যের জন্য শুভ ফল বয়ে আনেনি। মারোয়ার ও মেবারের দুই সামন্ততান্ত্রিক রাজপুত রাজ্যের বিরুদ্ধে সম্রাট কোনো নিশ্চিত জয়লাভ করতে পারেননি। অথচ দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে বিপুল লোক ক্ষয় ও অর্থ বিনষ্ট হয় এবং বিশ্বস্ত বন্ধুদের শত্রুতে পরিণত করে। ফলে মুঘল সেনাবাহিনী রাজপুত যোদ্ধাদের সেবা থেকে বঞ্চিত হয়। রাজপুত ও সম্রাটের ব্যস্ততা মারাঠাদের উত্থানের সুযোগ তৈরি করে। কাজেই এসব দিক বিবেচনায় আওরঙ্গজেবের রাজপুত নীতিকে তার রাজনৈতিক অপরিপক্বতা ও দূরদৃষ্টির অভাবই বলা চলে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সম্রাট আওরঙ্গজেবের অদূরদর্শী রাজনৈতিক পদক্ষেপ বলা হয় কোনটিকে?
২. দাক্ষিণাত্যের মারওয়ারে মুঘল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় কত খ্রিষ্টাব্দে?
৩. সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় মেবারের রাজা কে ছিলেন?
৪. মেবার জয় করে সম্রাট আওরঙ্গজেব কার ওপর এর ভার অর্পণ করেন?
৫. রাজপুত ও মুঘল সম্রাটের ব্যস্ততা দাক্ষিণাত্যে কোন শক্তির উত্থান ঘটিয়েছিল?
৬. সম্রাট আওরঙ্গজেবের কোন নীতি সাম্রাজ্যের জন্য অশুভ ফল বয়ে এনেছিল?

উত্তরের জন্য ২৪৪ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজপুত নীতির উদ্দেশ্যগুলো নিয়ে একটি চার্ট তৈরি করো।
২. সম্রাট আওরঙ্গজেব রাজপুত নীতির অংশ হিসেবে যেসব রাজ্যে অভিযান চালান তার একটি তালিকা তৈরি করো।

পাঠ ২৯

সম্রাট আওরঙ্গজেবের ধর্মীয় নীতি
Religious Policy of Aurangzeb

সম্রাট আওরঙ্গজেবের ধর্মনীতি সম্পর্কে ইতিহাসে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। একথা সর্বজনবিদিত যে, আওরঙ্গজেবের জীবনে ধর্ম বিশেষ স্থান করে নিয়েছিল। সমসাময়িক মুসলিম সমাজে তিনি 'জিন্দাপির' কিংবা 'বাদশাহর ছদ্মবেশধারী দরবেশ' হিসেবে পরিগণিত । অন্যদিকে, আধুনিক ঐতিহাসিকদের অনেকের মতে, আওরঙ্গজেব ধর্মান্ধ ছিলেন এবং এ কারণে তিনি অমুসলমান এমনকি শিয়াদের প্রতিও বিরূপ ছিলেন। যদুনাথ সরকার, এস. আর. শর্মা, এ. এল. শ্রীবাস্তব, লেনপুল প্রমুখের বর্ণনায় আওরঙ্গজেবের হিন্দুবিদ্বেষী মনোভাবের কথা বিশেষভাবে বলা হয়। কর্নেল টড, মানুচি এবং টেভার্নিয়ার প্রমুখের কণ্ঠেও একই সুর উচ্চারিত। অভিযোগ করা হয় যে, অমুসলিমদের বিরুদ্ধে জেহাদের ব্যাপারে সম্রাট দৃঢ়সংকল্প ছিলেন। সর্বত্র ইসলামের বিজয় পতাকা উত্তোলন করে তিনি দারুল হারবকে দারুল ইসলামে রূপান্তরের স্বপ্ন দেখেছিলেন। বিধর্মী নিধনের অভিজ্ঞানস্বরূপ তিনি 'গাজি' উপাধি নিয়েছিলেন বলেও অভিযোগ করা হয়।

ইতিহাসের আলোকে নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সম্রাট আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে ধর্মান্ধতা, পরধর্ম বিদ্বেষ, অমুসলমানদের নিধন, হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে পৌত্তলিকতার বিনাশ এবং দারুল হারবকে দারুল ইসলামে রূপান্তরের অভিযোগ অসংগত, বিভ্রান্তিকর ও তথ্যভিত্তিক নয়। বলাবাহুল্য যে, সম্রাট একজন নিষ্ঠাবান সুন্নি মুসলমান ছিলেন। তিনি ধর্মীয় দৃষ্টিতে পরিশুদ্ধ জীবনযাপন করতেন। সিংহাসনে আরোহণ করে রাজ্যশাসনের ব্যাপারে তিনি ইসলাম ধর্মানুমোদিত বিধান জারি করেন। দরবারে প্রচলিত ইসলামের বিধিবিধান ও মুসলিম ঐতিহ্যের সাথে সামঞ্জস্যহীন আচার-অনুষ্ঠান ও রীতি-নীতি বন্ধ করেন। তিনি ইসলামি আচার-আচরণ বিরোধী উৎসবাদি বন্ধ করেন। নওরোজ উৎসব ও রাজদরবারে নৃত্যগীত বন্ধ করে দেওয়া হয়। ঝরোকা দর্শন রহিত করা হয়। মুদ্রার ওপর কালেমা অঙ্কন, রাজসভায় অনৈসলামিক জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চা এবং মহরমের উৎসবে শরিয়ত গর্হিত কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করা হয়। মদ ও মাদকদ্রব্য প্রস্তুত ও ব্যবহার, জুয়াখেলা এবং বিলাসী পোশাক পরিধান নিষিদ্ধ করা হয়।

শ্রীরাম শর্মা, যদুনাথ সরকার প্রমুখ ঐতিহাসিক অভিযোগ করেন যে, হিন্দুবিদ্বেষী মনোভাবের জন্য আওরঙ্গজেব নতুন মন্দির নির্মাণ নিষিদ্ধ এবং অসংখ্য হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে দেন। *নাসির ই আলমগীর* গ্রন্থ প্রণেতা মুস্তামিদ খানের বর্ণনা মতে, সম্রাট অমুসলমানদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ধ্বংস এবং তাদের শিক্ষা ও ধর্মীয় আচার পালনে বাধা দানের আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু এসব ঢালাও অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে আধুনিক ঐতিহাসিকেরা অনেকেই একমত নন। বস্তুত ধর্মীয় কারণে বা উৎপীড়নের উদ্দেশ্যে সম্রাট কোনো মন্দির ধ্বংসের নির্দেশ দেননি। এ সময় অনেক বিদ্রোহী অঞ্চলে মন্দির ছিল বিদ্রোহীদের গোপন যোগাযোগের স্থান এবং অস্ত্রাগার। সম্রাট এসব ক্ষেত্রে সামরিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজনে মন্দির ভাঙার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাছাড়া মন্দির ভাঙার সরকারি নীতির অংশ ছিল না। বরং বারানসীর শাসনকর্তার কাছে প্রেরিত ফরমানে সম্রাট সেখানকার মন্দির রক্ষা এবং ব্রাহ্মণ ও হিন্দু অধিবাসীদের ওপর কোনোরূপ অন্যায় অত্যাচার না করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সবাই স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারতেন। আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষভাগে ভারত পরিভ্রমণকারী আলেকজান্ডার হ্যামিল্টনের বর্ণনায় তার প্রমাণ মেলে। ঐতিহাসিক আতাহার আলী তথ্য পরিসংখ্যান দিয়ে প্রমাণ করেছেন দুর্নীতি, কর্তব্যে অবহেলা এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিবেচনায় কিছু হিন্দু কর্মচারীকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। কিন্তু তার সময় যশোবন্ত সিংহ, রাজসিংহ, ভীম সিংহ, জয় সিংহ, ইন্দ্র সিংহ প্রমুখ গুরুত্বপূর্ণ রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

সম্রাট আওরঙ্গজেব ১৬৭৯ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে অমুসলিম নাগরিকদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার বিনিময়ে তাদের ওপর জিজিয়া (অমুসলিম নাগরিকদের ওপর ধার্য নিরাপত্তা কর)কর পুনঃপ্রবর্তন করেন। ধর্মান্ধতাবশত তিনি এ কাজ করেছিলেন বলে অভিযোগ করা হয়। কিন্তু টমাস রো, মানুজি প্রমুখের বর্ণনা মতে, ধর্মীয় বিদ্বেষ নয় বরং অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায় সম্রাট জিজিয়া পুনঃপ্রবর্তন করেছেন। প্রকৃতপক্ষে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র, মনসবদারিতে অব্যবস্থা, জায়গির সংকট ও কৃষক বিদ্রোহ ইত্যাদি কারণে সাম্রাজ্যে তীব্র অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়। সংকট মোকাবিলায় আওরঙ্গজেব অন্যান্য করের মতো জিজিয়া কর পুনঃপ্রবর্তন করেন। এজন্য তিনি জিজিয়া প্রদানকারীদের বাধ্যতামূলক সামরিক দায়িত্ব থেকেও অব্যাহতি দিয়েছিলেন।

আওরঙ্গজেবের ধর্মীয় নীতির প্রতিক্রিয়া (Reactions of Religious Policy of Aurangzeb)

সৎনামী বিদ্রোহ: অনেকেই মনে করেন, আওরঙ্গজেবের ধর্মনীতির প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। এর মধ্যে সৎনামী বিদ্রোহ অন্যতম। সৎনামীরা ছিল পাতিয়ালা ও মেওয়াট অঞ্চলের একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং বীরভান নামক একজন ধর্ম প্রচারক এ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। বলা হয় যে, আওরঙ্গজেবের ধর্মীয় নীতির প্রতিক্রিয়াস্বরূপ এ হিন্দু সম্প্রদায় বিদ্রোহ করেছিল। অবশ্য আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত হয় যে ধর্মীয় কারণে নয় বরং মুঘল সেনা কর্তৃক একজন সৎনামী কৃষককে হত্যার প্রতিক্রিয়াই সৎনামী বিদ্রোহের কারণ। গরিবদাস হাজোর নেতৃত্বে সৎনামীরা মুঘলদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। অবশ্য শেষ পর্যন্ত মুঘল বাহিনী তা দমনে সক্ষম হয়।

শিখ বিদ্রোহ: সম্রাট জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের রাজত্বকালেই শিখদের সাথে মুঘলদের দ্বন্দ্ব-সংঘাত হয়েছিল। আওরঙ্গজেবের সময় শিখদের নবম গুরু তেগবাহাদুর সম্রাটের বিরুদ্ধে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার অভিযোগ আনেন। তিনি সম্রাট প্রবর্তিত নীতি ও আইন অমান্য করতে কাশ্মিরের ব্রাহ্মণদের উৎসাহিত করেন। ১৬৭৫ খ্রিষ্টাব্দে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনে তাকে হত্যা করা হয়। তেগবাহাদুরের হত্যাকাণ্ড শিখদের মধ্যে মুঘল সম্রাটের প্রতি মারাত্মক প্রতিশোধস্পৃহা জাগ্রত করে। শিখরা তেগবাহাদুরের পুত্র গুরু গোবিন্দ সিংহের নেতৃত্বে মুঘল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করে। ১৬৯৫ খ্রিষ্টাব্দে মুঘল বাহিনী গুরু গোবিন্দকে পরাজিত করে।

জাঠ বিদ্রোহ: কৃষিজীবী জাঠ সম্প্রদায়ের বাস ছিল দিল্লি- আগ্রা অঞ্চলে যমুনার দুই তীরে। ১৬৬৯ খ্রিষ্টাব্দে গোকলা নামে এক জমিদারের নেতৃত্বে জাঠরা বিদ্রোহ করে। জাঠরা ছিল অত্যন্ত আত্মসচেতন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় থেকেই তাদের বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল। শাহজাহানের সময়ও তা অব্যাহত থাকে। আওরঙ্গজেবের সময় তারা মথুরা ফৌজদার আবদুন নবীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভের মাধ্যমে বিদ্রোহের সূচনা করে। মুঘল বাহিনী সাফল্যের সাথে বিদ্রোহ দমন করে এবং বিদ্রোহী নেতা গোকলা নিহত হন। এক পর্যায়ে রাজরাম বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন। অবশ্য মুঘল আক্রমণের তীব্রতায় রাজরাম আত্মসমর্পণে বাধ্য হন।

বুন্দেলা বিদ্রোহ: বুন্দেলখণ্ডের বুন্দেলা রাজপুতরা প্রথমে চম্পত রায় এবং পরে তার পুত্র ছত্রশালের নেতৃত্বে মুঘলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। সম্রাট আওরঙ্গজেবের নির্দেশে মুঘল বাহিনী চম্পত রায়কে পরাজিত করে। তিনি বন্দিত্ব এড়ানোর জন্য আত্মহত্যা করেন। তার পুত্র ছত্রশাল রায় বিদ্রোহী হলেও শেষ পর্যন্ত তিনিও মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করে তাদের অধীনে চাকরি গ্রহণে বাধ্য হন। অবশ্য পরবর্তী সময়ে তিনি মুঘল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে মালবে একটি ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. 'জিন্দাপির' উপাধি ছিল কার? *[সকল বোর্ড ২০১৬]*
২. 'জিজিয়া' কর পুনঃপ্রবর্তন করেন কে?
৩. সৎনামী সম্প্রদায় কোন মুঘল সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল?
৪. সৎনামীরা কোন অঞ্চলের অধিবাসী ছিল?
৫. শিখ নবম গুরু তেগবাহাদুরকে কত খ্রিষ্টাব্দে হত্যা করা হয়?
৬. যমুনার দুই তীরে বসবাসকারী জাঠ সম্প্রদায় পেশায় কী ছিল?

উত্তরের জন্য ২৪৪ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

সম্রাট আওরঙ্গজেবের ধর্মীয় নীতির বিরুদ্ধে যে সব বিদ্রোহ দেখা দেয় তার একটি চার্ট তৈরি করো।

পাঠ ৩০

সম্রাট আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি
Deccan Policy of Aurangzeb

দাক্ষিণাত্য নীতি সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনকালের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। উত্তর ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করে সম্রাট দক্ষিণ ভারতের দিকে নজর দেন। ১৬৮১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে তার জীবনের শেষ পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যে মারাঠা দমনের প্রচেষ্টা এবং বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা অধিকার করেই জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটান। সম্রাটের দাক্ষিণাত্য নীতির পেছনে নানা রাজনৈতিক, সামরিক ও প্রশাসনিক কারণ ছিল।

পূর্বপুরুষদের নীতি অনুসরণ: অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি সম্রাট আকবরের সম্প্রসারণ নীতিরই অনুসরণ মাত্র। ভৌগোলিক বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধির জন্য ভারতের আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় আকবরসহ সব সম্রাটই চেষ্টা করেছিলেন। সম্রাট আওরঙ্গজেব পূর্বপুরুষদের এ নীতি অনুসরণ করেন। ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড ও গ্যারেট বলেন, "আওরঙ্গজেব ষোড়শ শতাব্দীতে আকবর প্রবর্তিত আক্রমণাত্মক নীতি এবং পূর্বসূরি জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের নীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।"[৩৯]

মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিরক্ষা: বিজাপুর, গোলকুণ্ডাসহ দাক্ষিণাত্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলিম রাজ্যসমূহ মুঘল সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাছাড়া মহারাষ্ট্রীয় অভ্যুত্থান মোকাবিলার জন্যও বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা নিয়ন্ত্রণ জরুরি বলে সম্রাট আওরঙ্গজেব মনে করেছিলেন।

প্রশাসনিক কারণ: বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা মুঘল সাম্রাজ্যকে নিয়মিত করদানে চুক্তিবদ্ধ ছিল। কিন্তু তারা চুক্তি ভঙ্গ করে কর দানে বিরত থাকায় সম্রাট প্রশাসনিক প্রয়োজনে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি বলে মনে করেছিলেন।

মারাঠা অভ্যুত্থান রোধ: শিবাজি ও তার পুত্র শম্ভুজির নেতৃত্বে দাক্ষিণাত্যে মারাঠা শক্তির অভ্যুত্থান সম্রাট আওরঙ্গজেবের অস্তিত্বের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মারাঠাদের জাতীয়তাবাদী অভ্যুত্থান মুঘল সার্বভৌমত্বের প্রতি বিশেষ হুমকি ছিল। এ হুমকি মোকাবিলায় মারাঠা শক্তির অভ্যুত্থান রোধ করার জন্য সম্রাট আওরঙ্গজেবকে দাক্ষিণাত্য নীতি গ্রহণ করতে হয়।

যুবরাজ আকবরের বিদ্রোহ দমন: সম্রাট আওরঙ্গজেবের বিদ্রোহী পুত্র যুবরাজ আকবরের সাথে মারাঠা নেতা শম্ভুজির মৈত্রী ও সন্ধি স্থাপনে সম্রাট বিচলিত বোধ করেন। পুত্রের বিদ্রোহ দমন ও তাকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে সম্রাট দাক্ষিণাত্যে অভিযানের সিদ্ধান্ত নেন।

দাক্ষিণাত্য নীতির পর্যায় (Stages fo Deccan Policy)

সম্রাট আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতিকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। যথা:

প্রথম পর্যায়: প্রথম পর্যায়ে ১৬৫৮-৮০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত এ পর্বে সম্রাট দাক্ষিণাত্যে মারাঠা নেতা শিবাজির বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিলেন।

দ্বিতীয় পর্যায়: ১৬৮০-৮৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্যাপ্ত সময়কালে সম্রাট দাক্ষিণাত্যের মুসলিম রাষ্ট্র বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা অধিকার করেন। তাছাড়া বিদ্রোহী যুবরাজ আকবরের আশ্রয়দাতা এবং তৎকালীন মারাঠা নেতা শম্ভুজির বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন।

তৃতীয় পর্যায়: ১৬৮৭–১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেব মারাঠা নেতা শম্ভুজি ও অন্যান্য মারাঠা নেতাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ছিলেন।

---

[৩৯] Aurangzeb was following the policy of aggressive imparialism initiated by Akbar in the 16th century and encouraged by his successors Jahangir and Shahjahan. –Ref. Illiot & Dawson, *History of India as Told by its Own Historians.*

প্রথম পর্যায়

শিবাজির উত্থান: ভারতে মারাঠা অভ্যুত্থানের মহানায়ক শিবাজি। তার পিতার নাম শাহজি ভোসলে এবং মাতা জিজাবাঈ। মারাঠা অভ্যুত্থানের প্রধান নায়ক শিবাজির জন্ম ১৬২৭ খ্রিষ্টাব্দে। তার পিতা শাহজী দ্বিতীয় তুকবাঈকে নিয়ে শিবাজির জন্মের আগেই কর্নাটক চলে গেলে শিবাজি এবং তার মা পুনাতে দাদা কোন্দদেব নামে এক ব্রাহ্মণের তত্ত্বাবধানে বাস করতে থাকেন। এ সময় রামায়ণ ও মহাভারতের নানা বীরত্বগাথার সাথে পরিচিত হতে থাকে শিবাজি। এসব বীরত্বের কাহিনি শিবাজির মধ্যেও বীর হওয়ার বাসনা জাগ্রত করে। গুরু রামদাস ও তুকরাম শিবাজীকে ভারতে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেন। এ লক্ষ্যে শিবাজী পার্বত্যাঞ্চলের মারাঠা কৃষিজীবীদের সংগঠিত করে মারাঠাদের জাতীয়তাবাদ ও ধর্মীয় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে ঐক্যবদ্ধ এক সংগ্রামী জাতিতে পরিণত করেন।

শিবাজির বিরুদ্ধে অভিযান: আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের সুবাদার থাকা অবস্থায়ই শাহজি ভোসলে ও তার পুত্র শিবাজির তৎপরতা লক্ষ করেন। ১৬৪৬ খ্রিষ্টাব্দে শিবাজী বিজাপুরের তোর্না দুর্গ এবং এরপর রায়গড় দুর্গ অধিকার করে একে একে তিনি চাকান, বারমতী, ইন্দ্রপুর, পুরন্দর ও কোন্দার দুর্গ জয় করেন। শিবাজির তৎপরতায় ক্ষুব্ধ হয়ে বিজাপুরের সুলতান তার পিতা শাহজি ভোসলেকে জিম্মি করলে ১৬৬৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত শিবাজী তার সমর (যুদ্ধ) তৎপরতা বন্ধ রাখেন। কিন্তু শিবাজী ১৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দে চন্দ্ররাও মোরের কাছে থেকে অর্ধস্বাধীন সামন্ত রাজ্য জাবালী দখল এবং ১৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দে আহমদনগর ও জুনার লুণ্ঠন করেন। শিবাজির শক্তি বৃদ্ধিতে আওরঙ্গজেব শঙ্কা বোধ করেন এবং দাক্ষিণাত্যে সুবাদার থাকা অবস্থায়ই তাকে দমনের চেষ্টা করেন। কিন্তু উত্তরাধিকার সংঘাতের কারণে তিনি পদক্ষেপ নিতে পারেননি। ক্ষমতায় বসে সম্রাট শিবাজির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী আফজাল খানকে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু ১৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দের ১০ নভেম্বর শিবাজি কৌশলে আফজাল খানকে তার প্রতাপগড় দুর্গে ডেকে নিয়ে হত্যা করেন। নেতৃত্বহীন বিজাপুর বাহিনী পরাজিত হলে সম্রাট শিবাজিকে তার অধিকৃত অঞ্চলের স্বাধীন শাসক হিসেবে স্বীকৃতি দানে বাধ্য হন।

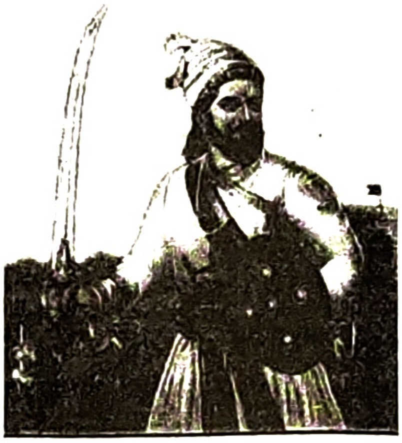

শিবাজি

আফজাল খানের মৃত্যুর পর প্রথমে শায়েস্তা খান ও পরে শাহজাদা মুয়াজ্জমকে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার করে পাঠানো হয়। শায়েস্তা খান সফল না হলেও মুয়াজ্জম রায়গড় ও পুরন্দর দুর্গসহ একে একে শিবাজির নিয়ন্ত্রিত বেশ কয়েকটি দুর্গ দখল করে তাকে কোণঠাসা করে ফেলে। শেষ পর্যন্ত শিবাজি মুঘলদের সাথে পুরন্দরের চুক্তি সম্পাদনে বাধ্য হন। চুক্তি মোতাবেক শিবাজি তার অধিকৃত ২৫টি দুর্গ মুঘলদের হাতে ছেড়ে দেন। বিজাপুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুঘলদের সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেন। মুঘলরাও শিবাজিকে বিজাপুর রাজ্যের কয়েকটি জেলার চৌথ আদায়ের অনুমতি দেয়। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সাথে শিবাজি যেন কোনো ঐক্য গড়তে না পারে সেজন্য জয় সিংহ কৌশলে শিবাজিকে মুঘল রাজদরবার আগ্রায় নিয়ে নজরবন্দি করে রাখেন। অবশ্য শিবাজি কৌশলে আগ্রা থেকে মহারাষ্ট্রে যান। প্রায় তিন বছর শক্তি সঞ্চয় করে ১৬৭০ খ্রিষ্টাব্দে শিবাজি পুনরায় মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আওরঙ্গজেবের ব্যস্ততার সুবাদে মুঘল প্রদেশ মেবার, বাগলানা ও খান্দেশ আক্রমণ এবং সুরাট থেকে সমর্থন আদায় করে নিজেকে শাসক হিসেবে ঘোষণা করেন। ১৬৭৪ খ্রিষ্টাব্দের ৬ জুন রায়গড় দুর্গে শিবাজির রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠিত হয়। শিবাজি 'ছত্রপতি' উপাধি গ্রহণ করেন। শিবাজির অভিষেকের মধ্য দিয়ে দাক্ষিণাত্যে একটি হিন্দু রাজ্য গঠিত হয়। ১৬৮০ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে মহারাষ্ট্রে শিবাজির মৃত্যু হয়।

জেনে রাখো

শায়েস্তা খান ছিলেন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সম্রাজ্ঞী মমতাজমহলের ভাই আসফ খানের পুত্র। তিনি ৬৩ বছর বয়সে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হওয়ার আগে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার ছাড়াও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৬৬০ সালে দাক্ষিণাত্যের বিদ্রোহী মারাঠা নেতা শিবাজিকে দমন করার জন্য সম্রাট আওরঙ্গজেব শায়েস্তা খানকে নিযুক্ত করেন। অবশ্য তিনি এ কাজে ব্যর্থ হন। তিনি দুবার বাংলার সুবাদার পদে [(১৬৬৪-১৬৭৮ খ্রি.) এবং (১৬৮০-১৬৮৮ খ্রি.)] দায়িত্ব পালন করেন। তার সুদীর্ঘ ২২ বছরের শাসনামলে বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার চরম উন্নতি সাধিত হয়েছিল। শায়েস্তা খানের সময় বাংলায় এক টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেত। তার আমলে বাংলায় নির্মিত স্থাপত্য নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে— লালবাগ কেল্লা, হোসেনি দালান, শায়েস্তা খাঁর মসজিদ, ছোট কাটরা, সাত গম্বুজ মসজিদ প্রভৃতি।

দ্বিতীয় পর্যায়

ছত্রপতি শিবাজির মৃত্যুতেও মারাঠা শক্তি দুর্বল হয়নি বরং দাক্ষিণাত্যে ক্রমে মুঘল বিরোধিতা বাড়তে থাকে। আগেই বলা হয়েছে, মেবারে রাজপুত দমনে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হলে সম্রাট আওরঙ্গজেব শাহজাদা আকবরকে সেখান থেকে প্রত্যাহার করেন। এতে রুষ্ট হয়ে আকবর বিদ্রোহ করেন এবং মারাঠা নেতা শিবাজির পুত্র শম্ভুজির সাথে যোগ দেন। এতে মারাঠাদের শক্তি বৃদ্ধি পায়। এ ঘটনায় সম্রাট শঙ্কাবোধ করেন এবং দাক্ষিণাত্যের ব্যাপারে নতুন নীতি গ্রহণ করেন। সব দিক বিবেচনা করে সম্রাট নিজে রাজধানী ছেড়ে দাক্ষিণাত্যে চলে আসেন এবং আহমদনগরে বসবাস শুরু করেন। ১৬৮২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে তার রাজত্বের শেষ পর্যন্ত আহমদনগরই তার প্রধান রাজনৈতিক কেন্দ্র ছিল।

বিজাপুর অভিযান: দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর রাজ্য মুঘলদের বার্ষিক করদানে চুক্তিবন্ধ ছিল। কিন্তু তারা চুক্তি ভঙ্গ করলে ১৬৬৫, ১৬৮০ ও ১৬৮২ খ্রিষ্টাব্দে যথাক্রমে জয় সিংহ, দিলিরখান এবং শাহজাদা মোয়াজ্জমের তিনটি ব্যর্থ অভিযান পরিচালিত হয়। ১৬৮৫ খ্রিষ্টাব্দে শাহজাদা মোয়াজ্জমের নেতৃত্বে মুঘল বাহিনী পুনরায় বিজাপুর অবরোধ করে। দীর্ঘ পনেরো মাসের অবরোধ সত্ত্বেও বিজাপুর দখল করা সম্ভব না হওয়ায় সম্রাট স্বয়ং বিজাপুর উপস্থিত হন। সম্রাটের উপস্থিতিতে মুঘল বাহিনীর মনোবল বৃদ্ধি পায় এবং ১৬৮৬ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বিজাপুরের সুলতান সিকান্দার শাহ আত্মসমর্পণ করেন। এ আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে আদিলশাহী সালতানাতের অবসান ঘটে এবং বিজাপুর মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

গোলকুণ্ডা অধিকার: গোলকুণ্ডার কুতুবশাহী সুলতান আবুল হাসান মুঘলদের বিরুদ্ধে মারাঠা ও বিজাপুরকে সমর্থন দিয়ে সম্রাটের বিষদৃষ্টিতে পড়েছিলেন। তাই সম্রাট ১৬৮৫ খ্রিষ্টাব্দে গোলকুণ্ডা আক্রমণ করেন। সুলতান পরাজিত হয়ে গোলকুণ্ডা দুর্গে আশ্রয় নিলে সম্রাট স্বয়ং ১৬৮৭ খ্রিষ্টাব্দের ৭ ফেব্রুয়ারি দুর্গ অবরোধ করেন। ৮ মাস অবরোধের পরও দুর্গ অধিকৃত না হওয়ায় উৎকোচ দিয়ে গোলকুণ্ডার প্রধানমন্ত্রী আবদুল্লাহ পনি দুর্গের ফটক খোলার ব্যবস্থা করেন। নিরুপায় হয়ে সুলতান আবুল হাসান আত্মসমর্পণ করলে তাকে বার্ষিক ৫০,০০০ টাকা বৃত্তি দিয়ে দৌলতাবাদ দুর্গে আবন্ধ রাখা হয়। গোলকুণ্ডা মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

তৃতীয় পর্যায়

মারাঠাদের বিরুদ্ধে পুনরায় অভিযান: বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা জয়ের পর আওরঙ্গজেব পুনরায় মারাঠাদের দিকে নজর দেন। নবনিযুক্ত মুঘল সামরিক অধিনায়ক মুকাররম খান সঙ্গমেশ্বর থেকে শম্ভুজিকে বন্দি করেন। ১৬৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ মার্চ শম্ভুজিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। মুঘলরা মারাঠা রাজধানী রায়গড় অধিকার করেন। শম্ভুজির পুত্র শাহুকে বন্ধি করা হয়। ত্রিলোচনপাল ও তাঞ্জোরের হিন্দু রাজারা আওরঙ্গজেবের আনুগত্য স্বীকার করে নেন। তবে তখনও মারাঠা প্রতিরোধের অবসান ঘটেনি। শিবাজির পুত্র রাজরাম মুঘলদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ অব্যাহত রাখেন। এ সময় মুঘলরা জিঞ্জি (১৬৯৮ খ্রি.) দুর্গসহ মারাঠাদের বেশ কিছু দুর্গ দখল করে বটে তবে রাজরামের নেতৃত্বে মারাঠা গেরিলারা তাদের ব্যতিব্যস্ত করে রাখে। ১৭০০ খ্রিষ্টাব্দে রাজারাম মৃত্যুবরণ করলে তার বিধবা স্ত্রী তারাবাঈ শিশু পুত্র তৃতীয় শিবাজির নামে শাসনভার নেন। প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন এই নারী মারাঠাদের সুসংঘবদ্ধ করে মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। আওরঙ্গজেব অনেক চেষ্টা করেও মারাঠাদের নির্মূল করতে ব্যর্থ হন।

দাক্ষিণাত্য নীতির যৌক্তিকতা: সম্রাট আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতির যৌক্তিকতা সম্পর্কে ঐতিহাসিকেরা একমত নন। অনেকেই মনে করেন, দাক্ষিণাত্য নীতি বিশেষ করে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা বিজয় আওরঙ্গজেবের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার পরিচায়ক। স্মিথ, এলফিনস্টোন প্রমুখের মতে, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্য বিজয় সুলতানের অদূরদর্শী পদক্ষেপ। কারণ এর ফলে তাদের প্রতিরোধের মতো আর কোনো শক্তি না থাকায় দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের উত্থানের পথ প্রশস্ত হয়। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার, রায় চৌধুরী প্রমুখ বলেন, গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর রাজ্যের স্বাধীনতা বজায় থাকলেও তাদের দ্বারা মারাঠাদের প্রতিহত করা সম্ভব হতো এমনটা নিশ্চিত করে বলা যায় না। কারণ এ দুটি রাজ্য ছিল আত্মকলহে লিপ্ত দুর্বল ও পতনোন্মুখ। তাছাড়া সম্রাটের দাক্ষিণাত্য নীতির পেছনে ধর্মীয় উন্মাদনা কাজ করেছিল এরূপ বলাও সংগত নয়। বস্তুতপক্ষে দাক্ষিণাত্য নীতি সম্রাটের সাম্রাজ্যবাদী নীতিরই বহিঃপ্রকাশ।

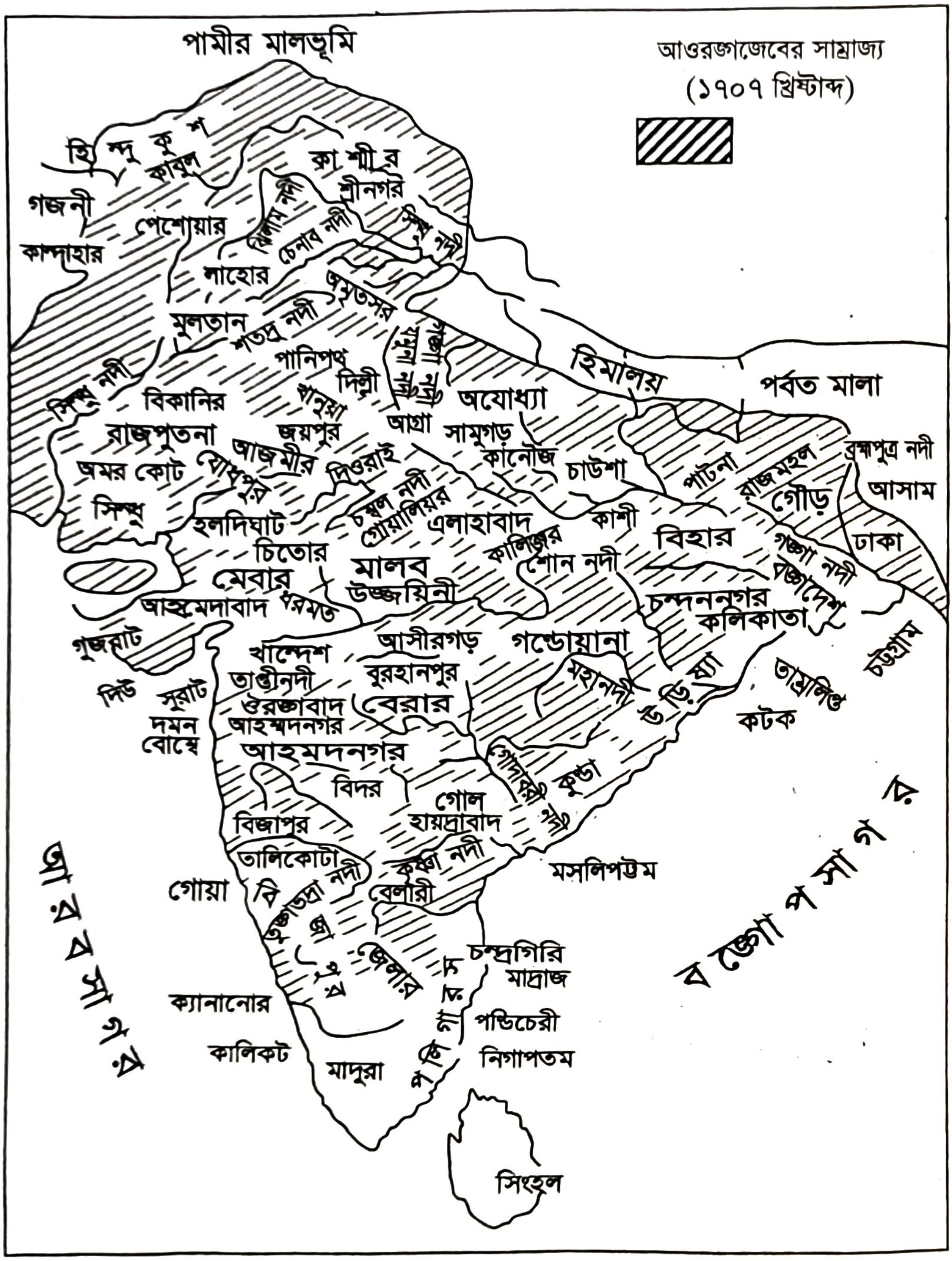
পামীর মালভূমি
আওরঙ্গজেবের সাম্রাজ্য
(১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দ)
হিন্দুকুশ
কাবুল
কাশ্মীর
শ্রীনগর
গজনী
পেশোয়ার
কান্দাহার
ঝিলাম নদী
চেনাব নদী
সিন্ধু নদী
লাহোর
অমৃতসর
মুলতান
শতদ্রু নদী
পানিপথ
দিল্লী
গঙ্গা
যমুনা
হিমালয়
পর্বত মালা
সিন্ধু নদী
বিকানির
অযোধ্যা
আগ্রা
রাজপুতনা
জয়পুর
সামুগড়
ব্রহ্মপুত্র নদী
আজমীর
কানৌজ
চাউশা
পাটনা
রাজমহল
আসাম
অমর কোট
যোধপুর
দিওরাই
চম্বল নদী
গৌড়
সিন্ধু
হলদিঘাট
গোয়ালিয়র
এলাহাবাদ
কাশী
ঢাকা
কালিঞ্জর
বিহার
চিতোর
মালব
শোন নদী
গঙ্গা নদী
মেবার
পদ্মা
উজ্জয়িনী
আহমেদাবাদ
নর্মদা
চন্দননগর
কলিকাতা
গুজরাট
খান্দেশ
আসীরগড়
গন্ডোয়ানা
চট্টগ্রাম
দিউ
সুরাট
তাপ্তীনদী
বুরহানপুর
মহানদী
উড়িষ্যা
তাম্রলিপ্ত
দমন
ওরঙ্গাবাদ
আহম্মদনগর
বেরার
কটক
বোম্বে
আহমদনগর
বিদর
গোদাবরী
কুন্ডা
গোলকুণ্ডা
বিজাপুর
হায়দ্রাবাদ
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
তালিকোটা
কৃষ্ণা নদী
মসলিপট্টম
গোয়া
বিজয়নগর
তুঙ্গভদ্রা নদী
বেল্লারী
চন্দ্রগিরি
মাদ্রাজ
কর্ণাট
ক্যানানোর
করমণ্ডল
পন্ডিচেরী
কালিকট
মাদুরা
নিগাপতম
সিংহল

দাক্ষিণাত্য নীতির ফলাফল (Results of Deccan Policy)

দাক্ষিণাত্য নীতির ফলে সম্রাট আওরঙ্গজেব আপাতদৃষ্টিতে অনেক কিছু লাভ করলেও প্রকৃতপক্ষে সব কিছুই হারান। এ সময় থেকে তার পতন শুরু হয়। এ নীতি তার জীবনে অত্যন্ত মর্মান্তিক ও নৈরাশ্যজনক অধ্যায়ের সূচনা করেছিল, যা মুঘল সাম্রাজ্যের পতনকেও ত্বরান্বিত করে।

প্রথমত, দাক্ষিণাত্য বিজয়ের ফলে সম্রাট আওরঙ্গজেব কাবুল থেকে চট্টগ্রাম এবং কাশ্মির থেকে কাবেরী পর্যন্ত এক বিশাল বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিপতি হলেন। এ আগে অন্য কোনো মুঘল সম্রাট আর এরূপ বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিপতি হতে পারেননি। তবে এত বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনা ও সর্বত্র সুশাসন প্রতিষ্ঠা একটি বড় সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। উপরন্তু এর ফলে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড গিবন বলেন, 'দাক্ষিণাত্যে রাজধানী থেকে বেশ দূরে হওয়ায় কেন্দ্রীয় শাসনে বেশ শৈথিল্য দেখা দেয়।' ফলে উত্তর ও মধ্য ভারতে চরম বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দেয়।

দ্বিতীয়ত, দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের ফলে সাম্রাজ্যের অর্থনীতিতেও সংকট দেখা দেয়। কৃষিব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা দেখা দেয়। ফলে রাজকোষের ওপর ব্যাপক চাপ পড়ে। এর ফলে সৈন্যদের বেতন বকেয়া পড়ায় সাম্রাজ্যে সেনাবিদ্রোহের পরিস্থিতি তৈরি হয়।

তৃতীয়ত, দাক্ষিণাত্যে দীর্ঘ ২৫ বছরের যুদ্ধে বহু সৈন্য প্রাণ হারায়। মারাঠাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় অর্জনে ব্যর্থতায় মুঘল বাহিনীর সামরিক ক্ষমতা, দক্ষতা ও আত্মপ্রত্যয় হ্রাস পায়।

চতুর্থত, উত্তর ভারতে সম্রাটের দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে সেখানে তার প্রভাব হ্রাস পায়। উত্তর ও মধ্য ভারতে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা যায়। মুঘলদের বিরুদ্ধে মারাঠাদের প্রতিরোধ যুদ্ধে উৎসাহিত হয়ে আফগান, শিখ, জাঠ, মেওয়াটি ও রাজপুতরা চারদিক থেকে মাথা তুলে দাঁড়ায়। মুঘলদের বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহ সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূলকে দুর্বল করে দেয়। উত্তর ভারতে সম্রাটের অনুপস্থিতিতে বাংলায় ইংরেজ শক্তির উত্থান নিষ্কণ্টক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় মুঘল সাম্রাজ্যকে পতনের দিকে নিয়ে যায়।

পঞ্চমত, দাক্ষিণাত্য বিজয়ের পর সম্রাট দাক্ষিণাত্য নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাই সার্বিকভাবে সাম্রাজ্যের উন্নতির দিকে তিনি মনোযোগ দিতে পারেননি। ফলে সাম্রাজ্যের ভিত নড়বড়ে হয়ে পড়ে, কৃষ্টি ও সভ্যতার বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়।

সার্বিক দিক বিবেচনায় বলা যায়, দাক্ষিণাত্য নীতি সম্রাট ও সাম্রাজ্যের জন্য ইতিবাচক ফল বয়ে আনেনি। স্মিথ বলেন, "দাক্ষিণাত্য সম্রাটের খ্যাতি ও দেহের সমাধিভূমি ছিল।"[৪০] যদুনাথ সরকার বলেন, স্প্যানিশ ক্ষত নেপোলিয়নকে যেভাবে ধ্বংস করে, আওরঙ্গজেবকেও অনুরূপভাবে দাক্ষিণাত্য ক্ষত ধ্বংস করে।"[৪১]

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনকালের একটি বিশেষ অধ্যায় কী ছিল?
২. কোন শক্তি সম্রাট আওরঙ্গজেবের অস্তিত্বের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল?
৩. ভারতে মারাঠা অভ্যুত্থানের মহানায়ক কে?
৪. 'ছত্রপতি' উপাধি গ্রহণ করেন কে?
৫. দাক্ষিণাত্যে সম্রাট আওরঙ্গজেব কত বছর অভিযান চালান?
৬. সম্রাট আওরঙ্গজেবের খ্যাতি ও দেহের সমাধিভূমি কী ছিল?

উত্তরের জন্য ২৪৪ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. সম্রাট আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতির পর্যায়গুলো চিহ্নিত করো।
২. সম্রাট আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতির পাঁচটি ফলাফল ছক আকারে লেখো।

গ. দলীয় কাজ

আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য দায়ী ছিল কি না— এ বিষয়ের ওপর একটি বিতর্কের আয়োজন করো।

---

[৪০] The Deccan was the grave of his body as well as his empire. Ref. V. A Smith, *The Oxford History of India*

[৪১] Ref. Jadu Nath Sarker, *The History of Aurangzeb*

পাঠ ৩১

সম্রাট আওরঙ্গজেবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্ব
Characteristics and Achievements of Emperor Aurangzeb

সম্রাট আওরঙ্গজেবের শেষ জীবন সুখকর হয়নি। অর্ধশতাব্দীর রাজত্বকালের শেষ ২৫ বছর দাক্ষিণাত্যে নিরন্তর যুদ্ধবিগ্রহ তার স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলে এবং ১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দের ৩ মার্চ নব্বই বছর বয়সে সম্রাট আওরঙ্গজেব মৃত্যুবরণ করেন। দৌলতাবাদের বিখ্যাত মুসলিম সাধক শেখ বোরহান উদ্দিনের সমাধি পাশে তাকে সমাহিত করা হয়।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্ব: সম্রাট আওরঙ্গজেব ছিলেন উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও রাজোচিত গুণাবলির অধিকারী। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি উন্নত নীতিবোধ দ্বারা পরিচালিত হতেন। তিনি অতি সাধারণ ও পূত-পবিত্র জীবনযাপন করতেন। মধ্যযুগীয় নৈতিক কলুষতা তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি উদ্যমী, বুদ্ধিমান ও অধ্যবসায়ী ছিলেন। সম্রাট আওরঙ্গজেব একজন নিষ্ঠাবান আদর্শ মুসলমান ছিলেন। শরিয়তের অনুশাসন মেনে চলার ক্ষেত্রে তিনি খুবই সচেতন ছিলেন। যদুনাথ সরকারের মতে, "তিনি ব্যক্তিগত জীবনে কুরআনের বিধিবিধানসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসরণ এবং এটি প্রত্যেকের ওপর বলবৎ করা নিজ কর্তব্য বলে মনে করতেন।"[৪২] কাফি খানের মতে, "শুধু তৈমুর বংশের সুলতান নয়, দিল্লির সকল সুলতানদের মধ্যে সিকান্দার লোদির পর ধর্মানুরক্তি, পবিত্র জীবন ও ন্যায়পরায়ণতা তার মতো আর কারও ছিল না।"[৪৩] ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামি আইনশাস্ত্রে তার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি পবিত্র কুরআনের হাফিজ ছিলেন।

সম্রাট আওরঙ্গজেব সহজ সরল ও আড়ম্বরহীন জীবনযাপন করতেন। এজন্য তিনি রাজকোষ থেকে কোনো অর্থ গ্রহণ করতেন না। কুরআন নকল ও টুপি সেলাই করে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। পিতার প্রতি অসদাচরণ ও ক্ষমতার জন্য ভাই ও আত্মীয়দের হত্যা তার নিষ্কলুষ চরিত্র মহিমার ওপর কিছুটা হলেও কালিমা লেপন করেছে। তবে লক্ষণীয় যে, মুঘল বংশের ইতিহাসে এরূপ ঘটনা বিরল নয়।

শ্রেষ্ঠ শাসক: আওরঙ্গজেব মুঘল বংশের সর্বশেষ শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন। তার যোগ্যতা তাকে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মুঘল বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসকের মর্যাদায় অভিসিক্ত করেছে। দাক্ষিণাত্যের সুবাদার থেকে শুরু করে পরবর্তী সময়ে সম্রাট হিসেবে প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল তিনি যোগ্যতা ও কৃতিত্বের সাথে শাসনকাজ পরিচালনা করেছেন। শাসনকাজ পরিচালনায় তিনি প্রশাসনের সব বিষয় তদারকি করতেন। ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে তিনি দুর্নীতি, অনৈসলামিক ও অনৈতিক কাজ নিষিদ্ধ করেন। অন্যায় কর আদায় বন্ধ করেন। তার সময় ৮০ প্রকার বেআইনি কর রহিত করা হয়েছিল। অবশ্য তিনি শরিয়ত আরোপিত জিজিয়া কর পুনঃপ্রবর্তন করেছিলেন। তিনি নিজে ন্যায়বিচার করতেন এবং অন্য বিচারকদেরও তা অনুসরণের নির্দেশ দেন। তার সময়ে ইসলামি আইন অনুযায়ী নিরপেক্ষ বিচার করা হতো। তিনি আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি প্রায়ই বলতেন আমি আইন অমান্য করলে প্রজারা আইন অমান্য করবে। প্রজাবৎসল শাসক হিসেবেও আওরঙ্গজেবের খ্যাতি রয়েছে। তিনি নিজেই বলতেন, "নিজের জন্য নয়, অন্যের জন্য পরিশ্রম করতে আমি আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত হয়েছি। যে সুখ আমার প্রজাদের সুখের সাথে সম্পর্কিত নয় সে সুখের জন্য চিন্তা না করাই আমার কর্তব্য।"

সাহসী যোদ্ধা ও কুশলী সমরনেতা: সম্রাট আওরঙ্গজেব কেবল একজন সুদক্ষ শাসক, রাজনীতিক ও কুশলী কূটনীতিবিদই ছিলেন না, তিনি একজন সুনিপুণ সমরনীতিবিদ ও সাহসী যোদ্ধাও ছিলেন। উত্তরাধিকার যুদ্ধ, বিদ্রোহ দমন ও দাক্ষিণাত্য অভিযানে সৈনিক ও সেনাপতি হিসেবে তার শক্তিমত্তা, কৌশল ও বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। নানা পরিস্থিতির কারণে তিনি মারাঠাদের বিরুদ্ধে সফল হতে পারেননি সত্য, তবে তার সময় মুঘল সাম্রাজ্য সর্বাপেক্ষা বিস্তৃতি লাভ করে। এ সময় রাজ্যসীমা উত্তরে কাশ্মির থেকে দক্ষিণে তাঞ্জোর, পূর্বে বাংলা ও আসাম থেকে পশ্চিমে কান্দাহার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। শাসনকার্যের সুবিধার্থে তিনি এ বিশাল সাম্রাজ্যকে ২১টি সুবায় বিভক্ত করেছিলেন।

---

[৪২] Ref. Jadu Nath Sarker, *The History of Aurangzeb*

[৪৩] Ref. Khafi Khan, *Muntakhab-ul-Lubub.*

শিক্ষা ও সংস্কৃতির একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক: সম্রাট আওরঙ্গজেব একজন শিক্ষাবিদ এবং সংস্কৃতির উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ধর্মতত্ত্ব, নীতিবিদ্যা, ইসলামি আইনশাস্ত্র, আরবি ভাষা ও ফার্সি সাহিত্যে তার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও অগাধ ব্যুৎপত্তি ছিল। তার পৃষ্ঠপোষকতায় 'ফতোয়া-ই-আলমগিরি' নামে প্রামাণ্য ইসলামি আইন গ্রন্থ রচিত হয়। মুনতাখার আল জাবুর, আলমগিরনামা বা মা-সীর-ই-আলমগিরি এবং খুলাসাত আত-তাওয়ারিখ প্রভৃতি তার রাজত্বকালে প্রণীত অমূল্য ইতিহাস গ্রন্থ। সম্রাট আওরঙ্গজেব অসাধারণ ধী-শক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি একজন সুদক্ষ লিপিকার ছিলেন। তার আমলে দিল্লি, থাট্টা, জৌনপুর ও শিয়ালকোট প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। সম্রাট আওরঙ্গজেব শিল্পকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, সংগীত ও চিত্রকলার ব্যাপারে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন না। সংগীত, ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পচর্চাকে তিনি অনৈসলামিক বলে মনে করতেন। তারপরও লাহোরের বাদশাহী মসজিদ ও আওরঙ্গাবাদে তার স্ত্রী রাবী আল দৌরানীর সমাধি অনুপম স্থাপত্যের সাক্ষ্য বহন করছে।

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনে আওরঙ্গজেবের দায়ভার: অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন আওরঙ্গজেব খ্যাতিমান যুদ্ধবাজ, সুপণ্ডিত ও কূটনীতিক হলেও শাসক হিসেবে তিনি সফল হতে পারেননি। তার গৃহীত নীতিমালা বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের পতনে বহুলাংশে দায়ী ছিল বলে তারা মনে করেন। অভিযোগ করা হয় যে, আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্যে ভ্রান্তনীতি এবং তার গোঁড়া সুন্নি দৃষ্টিভঙ্গি ও ধর্মনীতি, রাজপুত নীতির কারণে মুঘল সাম্রাজ্যে নানা বিদ্রোহ ও সমস্যা দেখা দিয়েছিল। যার ফলে সাম্রাজ্যের ভিত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। অন্যদিকে, ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা, সন্দেহবাতিকতা সম্রাটকে এককেন্দ্রিক করে তুলেছিল। বয়স বৃদ্ধির কারণে সম্রাটের একার পক্ষে সবদিক সামলানো কঠিন ছিল। এমতাবস্থায় প্রশাসন ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মুঘল সাম্রাজ্য পতনের পথে ধাবিত হয়।

সার্বিক বিচারে বলা যায়, ব্যক্তিবিশেষের কোনো রাজনৈতিক পদক্ষেপ বা ভুল নীতি এককভাবে কোনো সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হতে পারে না। সন্দেহ নেই, সম্রাট আওরঙ্গজেবের কোনো কোনো নীতি সাম্রাজ্যের জন্য কল্যাণকর হয়নি। তারপরেও সাম্রাজ্যের পতনের দায়ভার তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া যুক্তিসংগত নয়। আধুনিক গবেষকেরা মনে করেন, সে যুগের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কাঠামোর দুর্বলতার মধ্যেই মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ খুঁজতে হবে। আর এ দুর্বলতার সূচনা আওরঙ্গজেবের আগ থেকেই। আওরঙ্গজেবের কর্মদক্ষতায় এ পতন প্রক্রিয়া প্রতিভাত না হলেও তার দুর্বল উত্তরাধিকারীদের সময় তা স্পষ্ট হয় এবং সাম্রাজ্য দ্রুত পতনের দিকে এগিয়ে যায়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব কত বছর মুঘল সাম্রাজ্য শাসন করেন?
২. কোন মুঘল সম্রাট কুরআন নকল ও টুপি সেলাই করে জীবিকা নির্বাহ করতেন?
৩. সম্রাট আওরঙ্গজেব কোথায় মৃত্যুবরণ করেন? *[সকল বোর্ড ২০২৫]*
৪. সম্রাট আওরঙ্গজেব মুঘল সাম্রাজ্যকে কতটি সুবায় ভাগ করেন?
৫. 'ফতোয়া-ই-আলমগিরি' কার পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত হয়?
৬. সম্রাট আওরঙ্গজেবের কোন নীতি মুঘল সাম্রাজ্যের ভিতকে দুর্বল করে দেয়?

উত্তরের জন্য ২৪৪ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

সম্রাট আওরঙ্গজেবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্বের উল্লেখযোগ্য দিক নিয়ে একটি চার্ট তৈরি করো।

পাঠ ৩২

সম্রাট আওরঙ্গজেব পরবর্তী মুঘল সম্রাটগণ
Mughal Emperors after Aurangzeb

সম্রাট আওরঙ্গজেবের জীবদ্দশাতেই মুঘল সম্রাজ্যের অবক্ষয় ও পতন প্রক্রিয়া শুরু হয়। বিশাল বিস্তৃত সাম্রাজের পতন প্রক্রিয়া রোধ করে এর সংহতি বিধানের জন্য প্রয়োজন ছিল সামর্থ্যবান সম্রাটের। কিন্তু দুর্ভাগজনক হলেও সত্য যে, আওরঙ্গজেব পরবর্তী সময়ে মুঘল সাম্রাজ্যে এরূপ সম্রাটের আবির্ভাব ঘটেনি। সম্রাট আওরঙ্গজেবের উত্তরসূরি মুঘল সম্রাটেরা প্রায় সবাই ছিলেন দুর্বল ও বিলাসী। ফলে তাদের পক্ষে মুঘল সাম্রাজ্য রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর প্রায় দেড় শতাব্দীকাল ভারতে মুঘল রাজবংশ বহাল ছিল। কিন্তু এ দীর্ঘ সময়ে চরিত্র মাধুর্য ও শাসন নৈপুণ্যে খ্যাতিমান কোনো সম্রাটের খোঁজ পাওয়া যায় না। এ সময়ের মুঘল সম্রাটরা হলেন—

বাহাদুর শাহ (১৭০৭-১৭১২ খ্রি.): আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর সিংহাসনকে কেন্দ্র করে তার তিন পুত্রের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। এ সংঘাতে শাহজাহা আজম ও শাহজাদা কামবক্সকে পরাজিত করে সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্র শাহজাহা মুয়াজ্জম ক্ষমতা দখল করেন এবং 'বাহাদুর শাহ' উপাধি নিয়ে ৬৩ বছর বয়সে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। বাহাদুর শাহ প্রায় পাঁচ বছর রাজত্ব করেন। এ সময় তিনি তার পিতার প্রশাসনিক ও ধর্মনীতি অব্যাহত রেখেছিলেন। তার সময়ে অজিত সিংহের নেতৃত্বে মারওয়ারে রাজপুত এবং বান্দা বাহাদুরের নেতৃত্বে পাঞ্জাবে শিখ অভ্যুত্থান ঘটে। বাহাদুর শাহ দুই শক্তির দমনে পদক্ষেপ নিলেও তাদেরকে চূড়ান্তভাবে দমন করতে পারেননি।

জাহান্দর শাহ (১৭১২-১৭১৩ খ্রি.): বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বে জয়ী হয়ে তার পুত্র জাহান্দর শাহ সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি ছিলেন বিলাসী ও অকর্মণ্য শাসক। তার দুর্বল শাসনে সাম্রাজ্যে চরম অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ১৭১৩ খ্রিষ্টাব্দের ১০ জানুয়ারি তিনি নিহত হন।

ফররুখ শিয়ার (১৭১৩-১৭১৯ খ্রি.): জাহান্দর শাহ নিহত হলে বাহাদুর শাহের পৌত্র বাংলার ফররুখ শিয়ার দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। সম্রাট হিসেবে তিনিও অযোগ্য ছিলেন। তার সময় সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় নামে খ্যাত দুই অমাত্য সাম্রাজ্যের সব ক্ষমতা কুক্ষিগত করে। তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী অমাত্যদের পারস্পরিক ক্ষমতা, দ্বন্দ্ব ও বিবাদ-বিসংবাদে সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল দুর্বল হয়ে পড়ে। শিখদের তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। ১৭১৯ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বাধীন অভিজাত চক্রের ষড়যন্ত্রে সম্রাট ফররুখ শিয়ার নিহত হন।

মুহাম্মদ শাহ (১৭১৯-১৭৪৮ খ্রি.): ফররুখ শিয়ারের মৃত্যুর পর রাফি-উস-শানের দুই পুত্র রাফি-উদ-দারাজাত (ফেব্রুয়ারি-জুন ১৭১৯ খ্রিষ্টাব্দ) এবং রাফি-উদ-দৌলা (জুন-সেপ্টেম্বর ১৭৭৯ খ্রিষ্টাব্দ) যথাক্রমে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। শেষোক্ত সম্রাটের অকাল মৃত্যুর পর জাহান শাহের পুত্র রোশন আখতার মুহাম্মদ শাহ দিল্লির সিংহাসনে বসেন এবং ৩০ বছর রাজ্য শাসন করেন। মুহাম্মদ শাহ অযোগ্য, বিলাসী ও ইন্দ্রিয়াসক্ত সম্রাট ছিলেন। তার সময় মুঘল সাম্রাজ্যের প্রশাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। সাম্রাজ্যের সীমাও সংকুচিত হয়। নিজাম-উল-মুলক হায়দ্রাবাদের স্বাধীন নিজাম রাজ্য, সাফাত খান অযোধ্যায়, আলীবর্দী খান বাংলায়, আলী মুহাম্মদ খানের নেতৃত্ব রোহিলা আফগানরা রোহিলাখণ্ডে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। মারাঠারা মালব ও গুজরাটে, শিখরা পাঞ্জাবে এবং জাঠ সম্প্রদায় ভরতপুরে প্রাধান্য বিস্তার করে। রাজ্যের এ চরম দুর্দিনে পারস্যের নাদির শাহ ভারত আক্রমণ করেন। তিনি দিল্লি আক্রমণ করে ব্যাপক হত্যা এবং ময়ুর সিংহাসনসহ প্রচুর সম্পদ লুণ্ঠন করেন। ১৭৪৮ খ্রিষ্টাব্দে আফগানিস্তানের আহমদ শাহ আবদালি দিল্লি আক্রমণ করেন। অবশ্য তিনি মুঘলদের হাতে পরাজিত হন। মুঘল ভারতে বহিরাক্রমণে তাদের সামরিক দৈন্যতা প্রকাশ পায়। ১৭৪৮ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ শাহ মৃত্যুবরণ করেন।

আহমদ শাহ (১৭৪৮-১৭৫৪ খ্রি.): মুহাম্মদ শাহের মৃত্যুর পর তার পুত্র আহমদ শাহ মুঘল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনিও ছিলেন একজন অদক্ষ ও বিলাসী সম্রাট। তার সময় ১৭৪৯ ও ১৭৫২ খ্রিষ্টাব্দে আহমদ শাহ আবদালি দুই বার ভারত আক্রমণ করেন। এ সময় মারাঠাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তার প্রধানমন্ত্রী সফদর জং মারাঠাদের সহায়তায় তাকে ক্ষমতাচ্যুত করেন।

দ্বিতীয় আলমগীর (১৭৫৪-১৭৫৯ খ্রি.): আহমদ শাহের পদচ্যুতির পর জাহান্দর শাহের পুত্র আজউদ্দিন 'দ্বিতীয় আলমগীর' উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন। তিনিও অযোগ্য ও অকর্মণ্য ছিলেন। এ সুযোগে প্রধানমন্ত্রী ইমাদ-উল-মুলক সম্রাটকে তার ক্রীড়নকে পরিণত করেন। দ্বিতীয় আলমগীরের সময় ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে আহমদ শাহ আবদালি পুনরায় ভারত আক্রমণ করে। তিনি দিল্লিতে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ লুণ্ঠনের মাধ্যমে মুঘল সম্রাটের শক্তি ও সম্ভ্রম ধুলোয় মিশিয়ে দেন। তার রাজত্বকালেই ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে বাংলার নবাব সিরাজ উদ-দৌলা ইংরেজদের হাতে পরাজিত হন। ফলে বঙ্গ-ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন শুরু হয়।

দ্বিতীয় শাহ আলম (১৭৫৯-১৮০৬ খ্রি.): দ্বিতীয় আলমগীর নিহত হওয়ার পর তার পুত্র দ্বিতীয় শাহ আলম সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার সময় আহমদ শাহ আবদালি পুনরায় ভারত আক্রমণ করেন। তিনি ১৭৬১ খ্রিষ্টাব্দে তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে মারাঠাদের পরাজিত করে ভারতে হিন্দু মারাঠা সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন নস্যাৎ করেন। ১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধে সম্রাটের যৌথ বাহিনী ইংরেজদের হাতে পরাজিত হয়। এলাহাবাদের চুক্তিতে ইংরেজ কোম্পানি শাহ আলমকে সম্রাট হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং বার্ষিক ২৬ লাখ টাকার বিনিময়ে তারা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করে। ১৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দে মারাঠারা দিল্লি দখল করে এবং তাদের নিরাপত্তায় শাহ আলম সম্রাট হিসেবে বহাল থাকেন। ১৮০৩ খ্রিষ্টাব্দে ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে জয় লাভের পর তিনি ইংরেজ কোম্পানির বৃত্তিভোগীতে পরিণত হন। ১৮০৬ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয় শাহ আলম মৃত্যুবরণ করেন।

দ্বিতীয় আকবর (১৮০৬-১৮৩৭ খ্রি.) এবং দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ (১৮৩৭-১৮৫৮ খ্রি.): দ্বিতীয় শাহ আলমের মৃত্যুর পর তার পুত্র দ্বিতীয় আকবর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৩০ বছরের অধিক রাজত্ব করলেও তার ক্ষমতার পরিধি লালকেল্লার বাইরে তেমন ছিল না। ১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয় আকবরের মৃত্যু হলে বাহাদুর শাহ পতনোন্মুখ মুঘল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ছিলেন মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট। সুপণ্ডিত ও কবি হিসেবে তার খ্যাতি ছিল, তবে শাসক হিসেবে তিনি মোটেই উজ্জ্বল ছিলেন না। ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ইংরেজদের ভাতাভোগী হয়ে নামমাত্র সম্রাট হিসেবে সিংহাসনে বহাল থাকেন। ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের মহাবিদ্রোহে (সিপাহি বিদ্রোহ নামে সমধিক খ্যাত) নেতৃত্বদানের অভিযোগ ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে পদচ্যুত করা হয়। তাকে বর্তমান মিয়ানমারের রেঙ্গুনে (বর্তমান ইয়াঙ্গুন) নির্বাসন দেওয়া হয়। তিনি ১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দের ঘটনার মধ্য দিয়ে ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে জহিরুউদ্দিন মুহাম্মদ বাবরের প্রতিষ্ঠিত মুঘল সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত পতন ঘটে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর কত শতাব্দী মুঘল রাজবংশ বহাল ছিল?
২. বাংলার ফররুখ শিয়ার কত খ্রিষ্টাব্দে দিল্লির মুঘল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন?
৩. কার সময়ে আফগানিস্তানের আহমেদ শাহ আবদালি প্রথম দিল্লি আক্রমণ করেন?
৪. ময়ুর সিংহাসন লুট করে নিয়ে যান কে?
৫. পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয় কত খ্রিষ্টাব্দে?
৬. সর্বশেষ মুঘল শাসক কে ছিলেন?

উত্তরের জন্য ২৪৪ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

সম্রাট আওরঙ্গজেব পরবর্তী মুঘল শাসকদের সময়সহ নামের একটি তালিকা তৈরি করে তাদের ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করো।

পাঠ ৩৩

মুঘল সাম্রাজ্যের পতন: কারণ ও ফলাফল
Fall of Mughal Empire: Causes and Results

১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট বাবরের প্রতিষ্ঠিত মুঘল সাম্রাজ্য তার উত্তরাধিকারী সম্রাট আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান ও আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে বিস্তৃতি ও গৌরবের চরম শিখরে আরোহণ করে। ১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর এর অবক্ষয় ও ক্রমাবনতি শুরু হয়। ১৮৫৭ সালে ভারতে সংঘটিত মহাবিদ্রোহে (সিপাহি বিদ্রোহ নামে সমধিক খ্যাত) নেতৃত্ব দানের অভিযোগে সর্বশেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরকার ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে বার্মার (আধুনিক মিয়ানমার) রাজধানী রেঙ্গুনে (বর্তমান ইয়াংগুন) নির্বাসন দেয়। ফলে প্রায় ৩০০ বছর ভারত শাসনকারী মুঘলদের পরিসমাপ্তি ঘটে। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পেছনে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম 'উত্থানের পর পতন হয়' এ তত্ত্ব কাজ করেছে সন্দেহ নেই। তবে এটিই শেষ কথা নয়। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে মুঘলদের পতন ঘটলেও এর বাইরেও মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পেছনে পারিপার্শ্বিক আরও নানা কারণ ছিল। এসব কারণকে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক— এ দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

অভ্যন্তরীণ কারণ (Internal Causes)

আওরঙ্গজেবোত্তর দুর্বল মুঘল সম্রাট: সম্রাট আওরঙ্গজেবের জীবদ্দশাতেই মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয় ও পতন প্রক্রিয়া শুরু হয়। সম্রাট আওরঙ্গজেবের পর মুঘল শাসনের শৌর্যবীর্য কমতে শুরু করে। বিশাল বিস্তৃত সাম্রাজ্যের পতন রোধ করার জন্য এ সময় প্রয়োজন ছিল সুযোগ্য ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সম্রাটের। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আওরঙ্গজেব পরবর্তী প্রায় দেড় শতাধিক বছর সময়ে মুঘল সাম্রাজ্যে এরূপ সুযোগ্য সম্রাটের আবির্ভাব ঘটেনি। এ সময়ের প্রায় সব সম্রাটই ছিলেন দুর্বল ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ। তখন চরিত্র মাধুর্য ও শাসন নৈপুণ্যের অধিকারী কোনো সম্রাটের আবির্ভাব না হওয়ায় এ সাম্রাজ্যের পতন রোধ সম্ভব হয়নি।

এককেন্দ্রিক রাজতন্ত্র: প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যগতভাবে মুঘল শাসন ব্যবস্থা ছিল এককেন্দ্রিক রাজতান্ত্রিক। এতে সম্রাট সুদক্ষ ও সুযোগ্য হলে সাম্রাজ্যের উন্নতি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত ছিল। কিন্তু সম্রাট দুর্বল ও অকর্মণ্য হলে বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা দেখা দিত। কিন্তু মুঘলদের ১৭ জন সম্রাটের মধ্যে আওরঙ্গজেব পর্যন্ত প্রথম ছয় জন সম্রাট ছিলেন সুদক্ষ, প্রতাপশালী ও যোগ্য। তাঁদের সময় মুঘল সাম্রাজ্য গৌরব ও সমৃদ্ধির শীর্ষ শিখরে আরোহণ করে। কিন্তু আওরঙ্গজেব পরবর্তী সম্রাটদের মধ্যে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ ছাড়া সবাই ছিলেন অযোগ্য, অকর্মণ্য, বিলাসপ্রিয় ও ইন্দ্রিয়াসক্ত। তাদের অনেকেই অমাত্যদের হাতে রাজ্য শাসনের ভার ন্যস্ত করে নিজেরা বিলাসব্যসনে নিমগ্ন থাকতেন। সম্রাটদের দুর্বলতার সুযোগে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে নানারূপ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সাম্রাজ্যের শান্তিরক্ষা, বিদ্রোহ দমন ও বৈদেশিক আক্রমণ মোকাবিলায় সম্রাটদের ব্যর্থতায় মুঘল সাম্রাজ্য ক্রমশ দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে থাকে।

সুষ্ঠু উত্তরাধিকার আইনের অভাব: মুঘল সাম্রাজ্যে উত্তরাধিকার নির্বাচনে কোনো সুষ্ঠু আইন ও নীতি অনুসরণ করা হতো না। সিংহাসনে জ্যেষ্ঠ পুত্রের উত্তরাধিকার অবধারিত সত্য হিসেবে বিবেচিত হয়নি। ফলে প্রায় প্রত্যেক সম্রাটের রাজত্বের শেষ এবং শুরুতে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও ভ্রাতৃযুদ্ধ ছিল প্রায় অবধারিত। একমাত্র আকবর ছাড়া প্রায় সব ক্ষেত্রেই সম্রাটের মৃত্যুর পর অথবা তার জীবদ্দশাতেই তরবারির মাধ্যমে উত্তরাধিকার নির্ধারিত হয়েছে। হুমায়ুনের রাজত্বে ভ্রাতৃবিরোধ দেখা যায়। জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান উভয়েই পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছিলেন। শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন প্রশ্নে ভ্রাতৃযুদ্ধ মুঘল ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছে। বলাবাহুল্য যে, প্রতিটি উত্তরাধিকার সংঘাতই সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় শাসনের ভিত্তিকে দুর্বল করে ফেলেছিল।

অভিজাতবর্গের নৈতিক স্খলন: শুরুর দিকে অভিজাতশ্রেণি মুঘল শাসনের মেরুদণ্ড ছিল। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বৈরাম খান, আবদুর রহিম, মহাব্বত খান, সাদুল্লাহ খান, মীর জুমলা প্রমুখ অভিজাতরা অসীম সাহসিকতা, যুদ্ধকৌশল ও শাসন দক্ষতার মাধ্যমে মুঘল সাম্রাজ্যের গৌরব ও খ্যাতির অনবদ্য ইতিহাস নির্মাণ করেন। কিন্তু তাদের উত্তরসূরি আমিররা সে ধারা বজায় রাখতে ব্যর্থ হন। অভিজাতরা ক্রমান্বয়ে ইরানি, তুরানি ও হিন্দুস্থানি ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে

বিভক্ত হয়ে পড়ে। ইন্দ্রিয়াসক্তি ও বিলাসিতায় তারা তাদের স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। ইন্দ্রিয়াসক্তি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, সেনাপতিরা যুদ্ধ শিবিরেও তাদের অন্তঃপুরিকাদের নিয়ে যেতেন। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এরূপ অধঃপতনে সামরিক বাহিনীর রণদক্ষতা, শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধ লোপ পায়। তারা অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন বা বৈদেশিক আক্রমণ থেকে সাম্রাজ্যকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়। অভিজাতদের দ্বিধাবিভক্ত চারিত্রিক অধঃপতন ও নৈতিক স্খলন মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংস ত্বরান্বিত করে।

সাম্রাজ্যের বিশালতা: সাম্রাজ্যের বিশালতা মুঘলদের জন্য যেমন অহংকার ছিল তেমনি এটি তাদের বিপর্যয়েরও কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আওরঙ্গজেবের সময় মুঘল সাম্রাজ্য আফগানিস্তান থেকে আসাম এবং কাশ্মির থেকে মহীশুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এ বিশাল সাম্রাজ্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজন ছিল সুদক্ষ শাসকের। কিন্তু আওরঙ্গজেব উত্তর মুঘল রাজবংশে এরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন শাসকের আবির্ভাব ঘটেনি। তদুপরি যাতায়াত ও যোগাযোগব্যবস্থার সুব্যবস্থা না থাকায় কেন্দ্র থেকে দূরবর্তী প্রদেশসমূহের ওপর নজরদারি রাখা কঠিন ছিল। ফলে সেখানে কোনো বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে দ্রুত তা দমনে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া অসম্ভব ছিল।

নীতি-আদর্শহীন রাজনীতি: নীতি ও আদর্শহীন রাজনীতির কারণে মুঘল সাম্রাজ্যে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের ব্যাপক বিস্তার ঘটে। এ সময় মুঘল সাম্রাজ্যে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র এতটাই স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায় যে, যুদ্ধে ভাই, বোন শ্যালক, ভগ্নিপতি সবাই কোনো না কোনো পক্ষে যুক্ত হয়ে যেতেন। এসব ঘটনা সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূলকে কেবল দুর্বল করেনি পতন প্রক্রিয়াকেও ত্বরান্বিত করেছিল।

সামরিক শক্তির অবনতি: মুঘল সাম্রাজ্যের অগ্রগতি ও গৌরবের যুগে এর মূলশক্তির উৎস ছিল বিশাল ও সুদক্ষ সেনাবাহিনী। বাবর থেকে আওরঙ্গজেব পর্যন্ত সেনাবাহিনীর সাহস, শৃঙ্খলা ও সংগঠন ছিল চমৎকার। কিন্তু সাম্রাজ্যের অধঃগতির সাথে সাথে এর সামরিক শক্তির অবনতি ঘটতে থাকে। সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলাবোধ ও আনুগত্যের অভাব দেখা দেয়। আফগান, পারসিক, হিন্দুস্থানি প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে গঠিত সেনাবাহিনীর মধ্যে কোনো স্বদেশপ্রীতি ছিল না। সাম্রাজ্যের বৃহত্তর কল্যাণ ও স্বার্থ চিন্তা না করে তারা নিজ নিজ দলের আধিপত্য স্থাপনে তৎপর ছিল। ঐতিহাসিক আরভিন বলেন, "সংক্ষেপে ব্যক্তিগত বীরত্ব ছাড়া বিশৃঙ্খলা, সংহতির অভাব, বিলাসপরায়ণতা, অকর্মণ্যতা, কর্মবিমুখতা, সেনাবাহিনীর রসদ সরবরাহকারী বিভাগের অবহেলা এবং অবৈজ্ঞানিক ভারী সমরাস্ত্র প্রভৃতির দোষত্রুটিতে মুঘল সামরিক শক্তির অবনতি ঘটেছিল।"

নৌবাহিনীর দুর্বলতা: স্মিথ, ভি. ডি. মহাজন প্রমুখ পণ্ডিত নৌশক্তির অভাব এবং এর প্রতি অবহেলাকে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ বলে অভিহিত করেছেন। বস্তুত মধ্য এশিয়া থেকে আগত মুঘলরা স্থলযুদ্ধের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ ছিল। ভারতীয় বাস্তবতায় তারা নৌশক্তি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পারেনি। সম্রাট আকবর 'নাওয়ারা' নামে একটি নৌ-বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। উপকূলে পর্তুগিজ জলদস্যুদের তাণ্ডব এবং ফরাসি ও ইংরেজ নাবিকদের তৎরপতা লক্ষ করেও পরবর্তী সম্রাটরা নৌশক্তির উন্নয়নে কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ না নেওয়ায় সাম্রাজ্যের উপকূলভাগে ইউরোপীয় বণিককুল বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন এবং লুটতরাজে প্রবৃত্ত হয় এবং বাণিজ্যের আড়ালে শাসন ক্ষমতা দখল করার সুযোগ পায়।

অর্থনৈতিক সংকট: বিদ্রোহ দমন ও ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহের জন্য বিশাল সেনাবাহিনী প্রতিপালন, সম্রাট শাহজাহানের বিপুল ব্যয়নির্ভর স্থাপত্য ইমারত নির্মাণ, বিশাল মাথাভারী প্রশাসন পরিচালনা ও আওরঙ্গজেবের দীর্ঘ ২৫ বছর দাক্ষিণাত্যে অলাভজনক যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদি কারণে রাষ্ট্রের বিপুল অর্থ ব্যয় হয়। সাম্রাজ্যের কোষাগারে প্রচুর চাপ পড়ে এবং কোষাগার ক্রমে শূন্য হয়ে যায়। সংকট মোকাবিলায় জনগণের ওপর অধিকহারে করারোপ রাজস্বব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। জনঅসন্তোষ বৃদ্ধি পায় এবং সম্রাটরা সাধারণ মানুষের আস্থা হারায়।

প্রদেশসমূহের স্বাধীনতা: মুঘল কেন্দ্রীয় শাসনের শৈথিল্যের ফলে বিভিন্ন প্রদেশে কেন্দ্রীয় শাসনকে অবজ্ঞা ও অমান্য করার প্রবণতা দেখা যায়। অনেক উচ্চাভিলাষী প্রাদেশিক শাসনকর্তা কেন্দ্রকে অবজ্ঞা করে নিজ নিজ অঞ্চল স্বাধীনভাবে শাসন করতে থাকেন। এভাবে দাক্ষিণাত্যে নিজামুল-উল- মুলক, বাংলা বিহারে নবাব মুর্শিদকুলী খান এবং অযোধ্যায় সাদাত খান প্রায় স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। রোহিলাখণ্ডেও স্বাধীনতা ঘোষিত হয়। শিখ ও জাঠও স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে, যা মুঘলদের দুর্বল করে দিয়েছিল।

হিন্দু জাগরণ: মুঘল সাম্রাজ্যের অনৈক্য ও অরাজকতার সুযোগে স্থানীয় অনেক শক্তি বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের জাগরণ ঘটে। শিবাজির নেতৃত্বে গড়ে ওঠা এ ধারা হিন্দু জাতীয়তাবাদী চেতনার ব্যাপক বিকাশ ঘটায়। এতে উদ্বুদ্ধ হয়ে মারাঠারা মুঘল সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের প্রতি প্রবল হুমকি সৃষ্টি করে। হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মারাঠা, জাঠ ও রাজপুতদের বিদ্রোহ মুঘল সাম্রাজ্যের শক্তি ও সংহতি বিনষ্ট করে।

শিয়া-সুন্নি বিরোধ: শিয়া-সুন্নি বিরোধ মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন। তাদের মতে, আওরঙ্গজেবের অনুদার ধর্মনীতি, দাক্ষিণাত্যের স্বাধীন শিয়া সালতানাত অধিকার ইত্যাদি মুঘল শাসনের প্রতি শিয়া সম্প্রদায়কে বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছিল। ঐতিহাসিক জ্যারেট মনে করেন, এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে শিয়াদের মনে অসন্তুষ্টির সৃষ্টি হয়, যা রাজনৈতিক সংহতির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে।

বাহ্যিক কারণ (External Causes)

নাদির শাহের আক্রমণ: সুনিপুণ যোদ্ধা ও দক্ষ কূটনীতিবিদ পারস্য সম্রাট নাদির শাহ সম্রাট আওরঙ্গজেব উত্তর মুঘল সাম্রাজ্যের দৈন্যদশা সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন। তাই তিনি নিশ্চিত সাফল্যের সম্ভাবনায় ১৭৩৮ খ্রিষ্টাব্দে কান্দাহার অধিকার করেন। গজনি ও কাবুল অধিকারের পর তিনি বিখ্যাত পানিপথের কাছে কর্ণাটকে এসে উপস্থিত হন। ১৭৩৯ খ্রিষ্টাব্দে নাদির শাহকে প্রতিহত করতে সম্রাট মুহাম্মদ শাহ যুদ্ধে লিপ্ত হন। কিন্তু সেনা সংগঠনের অভাব, রসদ সরবরাহে অব্যবস্থাপনা এবং পর্যাপ্ত গোলন্দাজ সৈন্যের অভাবে মুঘল বাহিনী পরাজিত হয়। কিছু পারসিক সৈন্যকে হত্যার কারণে নাদির শাহ সেনাবাহিনীকে দিল্লি লুণ্ঠনের নির্দেশ দিলে দিল্লি ধ্বংস হয় এবং লক্ষাধিক লোক প্রাণ হারায়। মুহাম্মদ শাহ চুক্তি করতে বাধ্য হন। চুক্তি অনুযায়ী তিনি সিন্ধু, কাবুল ও পশ্চিম পাঞ্জাব নাদির শাহকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। এছাড়াও স্বদেশে ফেরার সময় নাদির শাহ প্রায় পনেরো কোটি টাকার মণিমুক্তা, অলংকারাদিসহ সম্রাট শাহজাহানের জগদ্বিখ্যাত ময়ূর সিংহাসন ও কোহিনুর মণি সাথে নিয়ে যান। নাদির শাহ ফিরে যাওয়ার পর সম্রাট মুহাম্মদ শাহ সিংহাসন আঁকড়ে থাকলেন বটে কিন্তু এ আক্রমণের ফলে রাজনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে যায়।

আহমদ শাহ আবদালীর আক্রমণ: নাদির শাহের মৃত্যুর পর নাদিরের সেনাপতি আহমদ শাহ আবদালি পারস্যের পূর্বাংশে স্বাধীন আফগানিস্তান (দুরানি সাম্রাজ্য) প্রতিষ্ঠা করেন। পাঞ্জাব জয় করার পর আহমদ শাহ আবদালি তার পুত্র তৈমুর শাহকে সেখানকার শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। রঘুনাথ রাওয়ের নেতৃত্বে মারাঠারা তৈমুরকে বিতাড়িত করে পাঞ্জাব অধিকার করলে ক্রোধান্ধ আবদালি ভারত আক্রমণ করেন। রোহিলা নেতা নজিব-উদ-দৌলা তার সাথে যোগ দেন। ১৭৬১ খ্রিষ্টাব্দে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে আহমদ শাহ আবদালি নজিব-উদ-দৌলার সহায়তায় মারাঠাদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি শিখদের বিরুদ্ধে পুনরায় অভিযান পরিচালনা করেন। অবশ্য এ পর্বে তিনি বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পারেননি। ১৭৪৮-১৭৬৭ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে আহমদ শাহ আবদালি কয়েকবার ভারত আক্রমণ করেন। ১৭৪৮ খ্রিষ্টাব্দে আবদালি কান্দাহার, কাবুল ও পেশোয়ার জয় করে পাঞ্জাব আক্রমণ করেন। তবে মুঘলদের হাতে পরাজিত হয়ে ফিরে যান। ১৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি পুনরায় আক্রমণ করে পাঞ্জাব অধিকার করেন। ১৭৫১ খ্রিষ্টাব্দে আহমদ শাহ কাশ্মির জয় করেন। পূর্বে সরহিন্দ পর্যন্ত এলাকা তার অধিকারে আসে। ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে আবদালি পুনরায় ভারত আক্রমণ করেন। সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীরকে পরাজিত করে দিল্লি এসে উপস্থিত হন। দিল্লিতে হত্যা, লুণ্ঠনযজ্ঞ চালানো হলে মুঘল সম্রাট আহমদ শাহ আবদালির সাথে আপস মীমাংসায় উপনীত হন। তার অধিকৃত পাঞ্জাব, কাশ্মির, সিন্ধু ও সরহিন্দে তার কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়। আহমদ শাহের এসব আক্রমণ পতনোন্মুখ মুঘল সাম্রাজ্যের ভিতকে আরও দুর্বল করে দিয়েছিল।

ইউরোপীয়দের হস্তক্ষেপ: ইউরোপীয় বিভিন্ন গোষ্ঠী বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে ভারতে আসে। কিন্তু মুঘল সাম্রাজ্যের এ বিপদসংকুল রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগে ইউরোপীয় ইংরেজ ও ফরাসি শক্তি ক্ষমতা দখলের দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। তারা বিভিন্ন রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ শুরু করে রাজ্যের প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের সুযোগে ষড়যন্ত্রকারী অথবা রাজন্যের পক্ষ নিয়ে সংকটে ইন্ধন দিয়ে রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধি করে। নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর পারস্পরিক প্রতিযোগিতা এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।

সিপাহি বিদ্রোহ ও মুঘল সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত পতন: ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ধীরে ধীরে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যাসহ ভারতবর্ষের নানা কেন্দ্র দখল করে পুরো ভারতবর্ষ দখলের চেষ্টায় মেতে ওঠে। ইংরেজদের শাসননীতি, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অপশাসনের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ব্যাপক ক্ষোভ দানা বেঁধে ওঠে। এ পরিস্থিতিতে ইংরেজদের রাইফেলে শূকর ও গরুর চর্বি মিশ্রিত কার্তুজ চালুর কারণে সারা ভারতবর্ষে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সিপাহি-জনতার ব্যাপক বিদ্রোহ শুরু হয়। বিপ্লবীরা মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহকে নিজেদের নেতা ঘোষণা করে বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিযোগে ইংরেজরা মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে রেঙ্গুনে (বর্তমান মিয়ানমার) নির্বাসন দিয়ে ভারতবর্ষের সব ধরনের শাসনক্ষমতা দখল করে। ফলে মুঘল সাম্রাজ্যে দীর্ঘ তিনশত বছরের শাসনের চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি ঘটে।

মুঘল শাসন পতনের ফলাফল: ভারতবর্ষের ইতিহাসে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন এক গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ১৮৫৮ সালে মুঘল শাসনের পতনের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে এক বিশাল পরিবর্তন সাধিত হয়। যেমন— ১. মুঘল শাসকেরা নামেমাত্র (symbolic ruler) শাসক হলেও ভারতবর্ষের রাজনীতিতে ঐক্য স্থাপনের জন্য তাদের শেষ আশ্রয় মনে করা হতো। কিন্তু মুঘল রাজবংশের পতনের মধ্য দিয়ে তাও শেষ হয়ে যায়; ২. ইংরেজরা ভারতবর্ষের দণ্ডমুণ্ডের অধিকর্তা হয়ে আবির্ভূত হয়; ৩. ইংরেজদের প্রতিহত করার মতো আর কোনো শক্তিশালী রাজনৈতিক শক্তির অস্তিত্ব থাকল না; ৪. সর্বোপরি প্রায় ১৯০ বছরের জন্য সমগ্র ভারতবর্ষ পরাধীনতার জিঞ্জিরে বাধা পড়ে। এর মধ্য দিয়ে ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসেরও তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। ইংরেজ শাসনাধীনে মুসলিম সমাজ বঞ্চনা ও নিপীড়নের মুখে পড়ে। অর্থনৈতিক ও শিক্ষা-সংস্কৃতির দিক থেকে ভারতীয় মুসলমানরা এক পশ্চাদপদ জাতিতে পরিণত হয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মুঘল শাসকগণ কত বছর ভারত শাসন করে? *[সকল বোর্ড ২০২৫]*
২. কোন মুঘল শাসকের সময়ে সিপাহি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়?
৩. দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে কারা নির্বাসন দেয়?
৪. পারস্য সম্রাট নাদির শাহ কত খ্রিষ্টাব্দে দিল্লি আক্রমণ করেন?
৫. পারস্যের কোন সেনাপতি বেশ কয়েকবার দিল্লি আক্রমণ করেন?
৬. কত সালে ভারতে মুঘল শাসনের অবসান ঘটে?

উত্তরের জন্য ২৪৪ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

মুঘল শাসনের পতনের ফলে ভারতের রাজনীতিতে কী ধরনের পরিবর্তন আসে? ছক তৈরি করে উপস্থাপন করো।

গ. দলীয় কাজ

দুটি দলে ভাগ হয়ে একদল মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের অভ্যন্তরীণ এবং অন্যদল বাহ্যিক কারণগুলো ছক আকারে লেখো।

পাঠ ৩৪

মুঘল আমলের প্রশাসন
Administration of the Mughal Period

ভারত উপমহাদেশে কেবল একটি বিশাল বিস্তৃত স্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাই মুঘলদের কৃতিত্বপূর্ণ কাজ নয়, এ সাম্রাজের জন্য একটি উপযোগী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমেও তারা ভারতের ইতিহাসে নিজেদের স্মরণীয় করে গেছেন। তাদের এ শাসন ব্যবস্থা পূর্ববর্তী সুলতানি শাসন থেকে বৈশিষ্ট্যগতভাবে অনেক আলাদা ছিল। যা হোক, ভারতে প্রবর্তিত মুঘল প্রশাসন ব্যবস্থাকে দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়— (ক) কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা ও (খ) প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা।

(ক) কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা: মুঘল যুগে একটি অনন্য ও শক্তিশালী কেন্দ্রীয় প্রশাসন গঠন করা হয়েছিল। সম্রাট এবং তার নিয়োজিত একটি অমাত্য দল নিয়েই এ কেন্দ্রীয় প্রশাসন পরিচালিত হতো। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান ভাগগুলো হলো—

সম্রাট: মুঘল কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান ছিলেন সম্রাট। মূলত তাকে ঘিরেই সমগ্র প্রশাসনযন্ত্র আবর্তিত হতো। সম্রাট ছিলেন সাম্রাজ্যের সকল নির্বাহী ও ক্ষেত্রবিশেষে আইনগত ক্ষমতার উৎস। তিনি একাধারে সাম্রাজ্যের প্রধান সমরকর্তা, প্রধান বিচার ও ধর্মীয় বিষয়ে চূড়ান্ত মীমাংসাকারী ছিলেন। অধস্তন উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগ, তাদের বদলি ও পদোন্নতি বা পদচ্যুতি সম্পূর্ণভাবে সম্রাটের ইচ্ছাধীন ছিল। কারও বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা বা শান্তি স্থাপনের বিষয়েও সম্রাট ছিলেন সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী। এক কথায় মুঘল সম্রাট ছিলেন অবাধ ও অসীম ক্ষমতাধর। তবে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হলেও সাধারণত সম্রাটরা স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। বেশির ভাগ সম্রাটই ছিলেন প্রজাহিতৈষী।

সম্রাট ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হলেও তার একার পক্ষে সাম্রাজ্যের প্রশাসন পরিচালনা করা সম্ভব ছিল না। এজন্য কেন্দ্রীয় প্রশাসনে বেশ কিছু মন্ত্রণালয় প্রবর্তন করা হয়েছিল। প্রত্যেকটি মন্ত্রণালয়ে একজন করে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা মন্ত্রী নিয়োগ দেওয়া হতো। সাধারণ সম্রাটের প্রিয়ভাজন অমাত্যদের মন্ত্রীপদে নিয়োগ দেওয়া হতো। মুঘল আমলে কেন্দ্রীয় সরকারের উল্লেখযোগ্য মন্ত্রী ও তাদের দপ্তরের মধ্যে ছিল—

১. **ভকিল:** পদমর্যাদায় সম্রাটের পরই ছিল ভকিলের স্থান। ভকিল ছিলেন মূলত প্রধানমন্ত্রী। সাম্রাজ্যের এ প্রধান বিধায়ক সম্রাট ও কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনব্যবস্থার মধ্যে যোগসূত্র হিসেবে কাজ করতেন। ভকিলের মাধ্যমে সম্রাটের সকল ফরমান প্রাদেশিক সরকারের কাছে পৌছানো হতো। এ কাজে তাকে সহায়তা করতেন তার সহযোগী কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারী।

২. **দিউয়ান:** দিউয়ান ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ ও রাজস্ব বিষয়ক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের কর্মকর্তাদের কার্যক্রম তদারকি করাও দায়িত্বের অংশ ছিল।

৩. **মীর বকশি:** কেন্দ্রীয় সরকারের সমর (যুদ্ধ) ব্যবস্থাপনা বিষয়ক দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন মীর বকশি। সেনাবাহিনীর নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, পদোন্নতি, বেতন-ভাতা প্রদান এবং রসদ সরবরাহের দায়িত্ব ছিল এ মন্ত্রী এবং তার সমর মন্ত্রণালয়ের ওপর।

৪. **মীর সামান:** মীর সামান ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের রাজকীয় গৃহস্থালি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রধান। তাকে অনেক সময় খান-ই সামানও বলা হতো। রাজপ্রাসাদ ও অন্তপুরের প্রয়োজনীয় রসদ সরবরাহ এবং রাজকীয় উৎসব ও ভোজ অনুষ্ঠান আয়োজন ছিল এ মন্ত্রীর দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

৫. **সদর-উস-সুদুর:** সদর-উস-সুদুর ছিলেন দাতব্য ও ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী। ধর্ম ও ধর্মীয় শিক্ষা এবং সম্রাটের প্রজাহিতৈষী নানা দাতব্য বিষয়ক কর্মকাণ্ড তিনি দেখাশুনা করতেন।

৬. **কাজি-উল-কুজ্জাত:** মুঘল কেন্দ্রীয় প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় ছিল বিচার বিভাগ বা দিউয়ান-উস-কাজা। এ বিভাগের প্রধান ছিলেন কাজি-উল-কুজ্জাত বা প্রধান বিচারপতি।

আলোচ্য মন্ত্রী বা কর্মকর্তা ছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী কর্মকর্তা বা মন্ত্রী ছিলেন। জনসাধারণের নৈতিক চরিত্র উন্নয়ন ও পর্যবেক্ষণকারী 'মুহতাসিব' ও আইন-শৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী ছিলেন 'কোতোয়াল'। সরকারের গোলন্দাজ বিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব ছিল 'মীর আতশ' বা 'দারোগা-ই তোপখানা'র ওপর। গোয়েন্দা বিভাগ পরিচালনা করতেন 'দারোগো-ই-ডাক চৌকি' এবং রাজকীয় টাকশালের দায়িত্বে নিয়োজিত 'টাকশাল দারোগা'।

(খ) প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা: সুষ্ঠভাবে প্রশাসন পরিচালনার সুবিধার্থে মুঘল যুগে বিশাল বিস্তৃত সাম্রাজ্যকে সুবা বা প্রদেশে বিভক্ত করা হয়েছিল। সম্রাট আকবরের সময় সুবার সংখ্যা ছিল পনেরটি। অন্য সময় এ সংখ্যা কমবেশি হয়েছে। মুঘল যুগে প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের অবিকল ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি (Exact miniature of that of the central Government)। প্রাদেশিক সরকারের কর্মকর্তারা ছিলেন–

সুবাদার বা প্রদেশপাল: কেন্দ্রে যেমন সম্রাট তেমনি প্রদেশে সুবাদার বা প্রদেশপাল ছিলেন প্রশাসনিক প্রধান নির্বাহী। কখনো কখনো তাকে সিপাহসালারও বলা হতো। সম্রাটের প্রতিনিধি হিসেবে সুবার সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসন পরিচালনায় তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর অমাত্য। প্রশাসন পরিচালনার জন্য দিউয়ান ছাড়া অন্য প্রায় সব কর্মকর্তার নিয়োগ ও তাদের কার্যক্রম তদারকির দায়িত্ব ছিল সুবাদারের ওপর।

দিউয়ান: সুবাদারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীন কর্মকর্তা হলেও পদমর্যাদায় দিউয়ান ছিলেন সুবার দ্বিতীয় নির্বাহী কর্মকর্তা। কেন্দ্রের মতো প্রদেশেও কর্মকর্তা অর্থ ও রাজস্ব প্রশাসন পরিচালনা করতেন। দিউয়ান তার কাজের জন্য কেন্দ্রীয় দিউয়ানের কাছে জবাবদিহি করতেন।

সদর ও কাজি: প্রদেশের বিচার, ধর্ম ও দাতব্য বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা ছিলেন সদর ও কাজী। এই পদাধিকারী ব্যক্তি প্রাদেশিক গভর্নরের অধীনস্থ ছিলেন না। কেন্দ্রীয় বিচার মন্ত্রণালয় থেকে তিনি নিয়োগ পেতেন এবং তার কাজের জন কাজি-উল-কুজ্জাতের কাছে জবাবদিহি করতেন।

বকশি: প্রদেশের সমরপ্রশাসন ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ছিল বকশি পদবিধারী কর্মকর্তার ওপর।

উপরে বর্ণিত কর্মকর্তা ছাড়াও প্রদেশে নিয়োজিত অন্যান্য কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিলেন ওয়াকিয়া নবিশ (গোয়েন্দা প্রধান), কোতোয়াল (আইন-শৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা বিষয়ক কর্মকর্তা) এবং আমিল (রাজস্ব আদায়কারী কর্মকর্তা) ইত্যাদি।

সরকার, পরগনা ও গ্রাম প্রশাসন: মুঘল যুগে প্রাদেশিক প্রশাসনের পরবর্তী প্রশাসনিক ইউনিট ছিল 'সরকার' বা জেলা। সরকারের প্রধান নির্বাহীর পদবি ছিল ফৌজদার। এছাড়াও আমলগুজার (রাজস্ব কর্মকর্তা), বিতিকচি (দলিল রক্ষক) এবং আমলগুজার (কোষাগার প্রধান) ছিলেন সরকারের উল্লেখযোগ্য কর্মকর্তা। পরগনা প্রশাসনের প্রধান কর্তাব্যক্তি ছিলেন শিকদার। প্রশাসন পরিচালনায় তার সহযোগী কর্মর্কতারা ছিলেন আমিল, কানুনগো এবং ফতাদার ইত্যাদি। মুঘল আমলে স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন ইউনিট ছিল গ্রাম প্রশাসন। গ্রাম প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব ছিল গ্রাম পঞ্চায়েতের ওপর।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মুঘল কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান কে ছিলেন?
২. মুঘল প্রশাসনে পদ মর্যাদায় সম্রাটের পর কার স্থান ছিল?
৩. মুঘল সরকারের গোলন্দাজ বিভাগ পরিচালনার দায়িত্বে কে ছিলেন?
৪. মুঘল প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থায় প্রশাসনিক প্রধান নির্বাহী কে ছিলেন?
৫. প্রদেশে অর্থ ও রাজস্ব প্রশাসন পরিচালনা করতেন কে?
৬. মুঘল আমলে গ্রাম প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব ছিল কার?

উত্তরের জন্য ২৪৪ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

মুঘল শাসকদের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক প্রশাসনের ধাপগুলো উল্লেখ করে দায়িত্বরত ব্যক্তিদের পদবি লেখো।

পাঠ ৩৫

মুঘল আমলে ভারতের আর্থ-সামাজিক অবস্থা
Socio-Economic Conditions of India of Mughal Era

অর্থনৈতিক অবস্থা (Economic Conditions)

আর্থিক সমৃদ্ধি: মুঘল আমলের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল খুবই সন্তোষজনক। বৈদেশিক পর্যটকেরা মুঘল দরবারে ঐশ্বর্য এবং মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা স্বচক্ষে দেখে এর ভূয়সী প্রশংসা করে গেছেন। মুঘল সম্রাট বাবরের মেয়ে এবং 'হুমায়ুননামা' গ্রন্থের লেখক গুলবদন বেগম (ভারতের ইতিহাসে প্রথম মহিলা ইতিহাসবিদ) উল্লেখ করেন যে, আকবরের আকিকার জন্য এক টাকা দিয়ে অমরকোটে চারটি ছাগল ক্রয় করা হয়। আকবরের রাজত্বে আর্থিক সচ্ছলতা ও সার্বিক উন্নতি সাধিত হয়। এই সময়ে আগ্রা, লাহোর ও ফতেহপুর সিক্রি সমৃদ্ধ নগরীতে রূপান্তরিত হয়।

ব্যবসা-বাণিজ্য: শুধু জল ও স্থলপথে যাতায়াত ব্যবস্থা থাকায় মুঘল রাজত্বে ব্যবসা-বাণিজ্যের পৃষ্ঠপোষকতা এবং পলিক ও বণিকদের সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় সরাইখানা ও বিশ্রামাগার নির্মাণ করা হয়। এ সময় মুঘল বহিঃবাণিজ্য বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। কে. কে. দত্ত বলেন, "মুঘল শাসনের উল্লেখযোগ্য সময় জুড়ে ভারতের সাথে বহিঃবিশ্বের সক্রিয় এবং গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য সম্পাদিত হতো।"[৪৪] ভারতবর্ষের কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে চাল, গম, চিনি, নানা প্রকারের মসলা, গন্ধক, লবণ, সিল্ক ও সুতিবস্ত্র ইউরোপ ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি করা হতো। ভারতবর্ষের সুতিবস্ত্র, বিশেষ করে ঢাকার মসলিন ইউরোপে প্রায় একচেটিয়া প্রভাব বিস্তার করে। চাল, গম ইত্যাদি পণ্যদ্রব্যও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হতো। শুল্কের হার কম থাকায় বিদেশি ব্যবসায়ীরা অত্যন্ত উৎসাহবোধ করত। ইউরোপ ও এশিয়া থেকে বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী তখন ভারতে আমদানি করা হতো। যেমন— হাতির দাঁত, মূল্যবান পাথর, ভেলভেট, সিল্ক, মৃৎপাত্র, ওষুধ, সুগন্ধী দ্রব্য প্রভৃতি। এ সময়ে মসলিপট্টম, সুরাট, কালিকট, সোনারগাঁ, চট্টগ্রাম, বোম্বাই, ভারুচ প্রভৃতি সমুদ্র ও নদীবন্দর অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল।

মুদ্রা ব্যবস্থা: মুঘল যুগে দাম, পয়সা অথবা ফুলুস মুদ্রা প্রচলিত ছিল। এক টাকার চল্লিশ ভাগের এক ভাগকে দাম বলা হতো এবং এ তাম্রমুদ্রা শ্রমিক শ্রেণিকে দেওয়া হতো।

কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন: মুঘল আমলে কৃষিকার্য ছিল প্রজাদের প্রধান উপজীবিকা। বাংলা ও বিহারে আখ উৎপাদন হতো বলে এ অঞ্চলে চিনি ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে সরবরাহ করা হতো। এছাড়া উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কার্পাস, নীল, পশম, তামাক প্রভৃতি। সম্রাট আকবর কৃষির উন্নয়নে যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা করতেন এবং রাজা টোডরমলের নির্দেশে অনেক পতিত জমি আবাদ করা হয়।

শিল্পদ্রব্য উৎপাদন: শিল্পোৎপাদিত দ্রব্যাদির প্রাচুর্য ছিল মুঘল যুগের অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সম্রাট আকবর বস্ত্র উৎপাদনে বিশেষ সুনজর দেন। এ সময়ে লাহোরে শাল, ফতেহপুর সিক্রিতে কার্পেট, গুজরাট ও বুরহানপুরে সুতি বস্ত্রাদি এবং ঢাকায় মসলিন তৈরি হতো। বার্নিয়ার বলেন, শিল্পজাত দ্রব্যাদির কারখানা আওরঙ্গজেবের রাজত্বকাল পর্যন্ত উৎপাদনে নিয়োজিত ছিল এবং এরপর বিভিন্ন কারণে এর অবনতি ঘটে।

গ্রাম্য অর্থনীতি: মুঘল আমলে গ্রাম্য জীবনে রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে গ্রাম্য প্রধানরা রায়ত ও সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে মধ্যস্থতা করত। রায়তরা যদি ঠিকমতো রাজস্ব আদায় করে, শান্তি ভঙ্গের চেষ্টা না করে, পথিকেরা যদি চোর-ডাকাতের হাত থেকে রক্ষা পায় তবে শাসকেরা গ্রামে যাওয়ার প্রয়োজনবোধ করত না। গ্রামের ছোটখাটো ঝগড়া-বিবাদে বয়োজ্যেষ্ঠরাই সব মীমাংসা করে দিতেন। গ্রামে বসবাসকারীদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা কম ছিল। তাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা সনাতনি পন্থায় সামাজিক জীবনযাপন করত।

---

[৪৪] India had an active and considerable foreign trade during the greater part of the Mughal period. –Ref. K . K. Datta. *An Advanced History of India, p.368.*

সামাজিক অবস্থা (Social Conditions)

সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা: মুঘল যুগে ভারতবর্ষের সামাজিক অবস্থা খুব চমকপ্রদ ও নানাদিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কে. কে. দত্ত বলেন, "সমাজ ব্যবস্থা দেখতে ছিল সামন্ততান্ত্রিক, যার কেন্দ্রে ছিল রাজা।"[৪৫] তখন সমাজ ব্যবস্থা ছিল সামন্ততান্ত্রিক এবং এটা প্রধানত তিন শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল, যথা— ক. অভিজাত শ্রেণি খ. মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও গ. নিম্ন শ্রেণি।

ক. অভিজাত শ্রেণি: সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সম্রাট ছিলেন সর্বময় কর্তা। তার নিচে ছিলেন মন্ত্রী ও আমিরগণ। এরা ছিলেন সমাজের প্রধান অভিজাত। এ অভিজাতরা খুব জাঁকজমক ও বিলাস-ব্যসনের মধ্যে জীবনযাপন করতেন। অভিজাত সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মান খুবই উন্নত ছিল। তবে জাঁকজমক, পোশাক ও ভোগ-বিলাসে নিয়োজিত অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যমান বিদ্বেষ, ঈর্ষাপরায়ণতা ও ষড়যন্ত্র মুঘল সাম্রাজ্যকে বিষণ্ন করে তোলে।

খ. মধ্যবিত্ত শ্রেণি: মুঘল যুগে নিম্নশ্রেণির সরকারি কর্মচারী, উকিল, চিকিৎসক, আইনজীবী, কবি, সাহিত্যিক, সংগীতজ্ঞ, ধর্মপ্রচারক, শিক্ষক, বেনিয়া-ব্যাংকার, দোকানদার, ব্যবসায়ী, বণিক, মহাজন প্রভৃতি সমন্বয়ে একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে উঠেছিল। বর্তমান সময়ের মতো এ মধ্যবিত্তশ্রেণি বুদ্ধিদীপ্ত, সচ্ছল ও রাজনীতি সচেতন ছিল না। তারা সংখ্যায় ছিল অল্প এবং তাদের জীবনযাত্রা ছিল অতি সাধারণ ও জাঁকজমকহীন। মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোক অভিজাত শ্রেণির মতো বিত্তশালী ছিল না।

গ. নিম্ন শ্রেণি: মুঘল সমাজের সর্বশেষ স্তরে ছিল নিম্ন শ্রেণিভুক্ত অতি নগণ্য জনসাধারণ। সাধারণ কৃষক, শ্রমিক, কারিগর, দিনমজুর, জেলে, মুটে এই শ্রেণির অর্ন্তভুক্ত ছিল। এ নিম্ন শ্রেণির লোকদের জীবনযাত্রা ছিল খুবই কঠিন এবং তারা খুবই সাধারণ পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করত। তারা অভিজাত সম্প্রদায় কর্তৃক নিষ্পেষিত হতো। ঐতিহাসিক বিবরণ থেকে জানা যায়, সাধারণ লোকদের অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক ছিল না। তারা মাটির ঘরে বাস করত। তাদেরকে মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করে উৎপীড়ন করা হতো।

সামাজিক রীতিনীতি: মুঘল সমাজে বাল্যবিবাহ, পণ প্রথা, কৌলীন্য প্রথা, সতীদাহ প্রথা ইত্যাদি নানা রকম কুসংস্কার বিদ্যমান ছিল। তখন হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে আন্তরিক সম্পর্ক ছিল। হিন্দুদেরকে ধর্ম ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করার পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়েছিল। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পর্দা প্রথা ও কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত ছিল। সম্রাট আকবর সতীদাহ, বাল্যবিবাহ ও কৌলীন্য প্রথা হিন্দুসমাজ থেকে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু হিন্দুসমাজের গোঁড়ামির জন্য তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। মুঘল যুগে অবস্থান ও পদমর্যাদা অনুযায়ী পোশাক-পরিচ্ছদের তারতম্য ছিল। বিত্তশালী পুরুষ ও নারী প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার করত।

জেনে রাখো

যে কোনো জাতি, গোষ্ঠী, বর্ণ বা সম্ভ্রান্ত বংশের মানুষের সামাজিক সম্মান ভোগ এবং ঐতিহ্যগতভাবে নিজেদের সামাজিক অবস্থান ও 'কুল' (পরিচিতি) ধরে রাখার রীতিই কৌলীন্য প্রথা নামে পরিচিত। কুলীন অর্থ উত্তম পরিবার বা সম্ভ্রান্ত বংশজাত। নৈয়ায়িক ও স্মৃতিশাস্ত্রকার বাচস্পতি মিশ্র-এর মতে, এটি চিহ্নিত হয় আচার, বিদ্যা, বিনয়, প্রতিষ্ঠা, তীর্থ-দর্শন, নিষ্ঠা, তপস্যা, আবৃত্তি (সমবর্ণে বিবাহ) এবং দান দিয়ে। বলা হয়ে থাকে, ব্রাহ্মণদের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির ফলস্বরূপ বাংলায় সামাজিক প্রথা হিসেবে কৌলীন্য প্রথার সূত্রপাত হয়েছে। সেন রাজা বল্লাল সেনকে কৌলীন্য প্রথার স্রষ্টা হিসেবে কৃতিত্ব দেওয়া হয়।

সামাজিক উৎসব: মুঘল যুগে বাংলায় খাওয়া-দাওয়ার ক্ষেত্রেও রুচির পরিবর্তন হয়। বাঙালির মাছ-ভাত তরকারির পাশাপাশি কাবাব, রেজালা, কোর্মা ও অন্যান্য মুঘলাই খাবার এদেশের মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। মুসলিম সমাজে নবজাতকের জন্ম এবং নামকরণকে কেন্দ্র করে আকিকা প্রদান ও ভোজ উৎসবের প্রচলন ছিল। তাছাড়া মুসলিম সমাজে পুত্র সন্তানদের খাৎনা, ছেলেমেয়ের বিবাহ উপলক্ষে সংগতি অনুযায়ী সামাজিক উৎসব পালনের রীতি প্রচলিত ছিল। মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তি কামনা করে কুলখানি ও চেহলামের মতো ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব পালন করা হতো। হিন্দুসমাজেও নানা উপলক্ষে সামাজিক উৎসব পালিত হতো। মুঘল যুগে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় ছিল। আমোদ-প্রমোদ, সংগীত, চিত্রশিল্প চর্চা, দাবা, পোলো প্রভৃতি খেলার ব্যবস্থা ছিল।

---

[৪৫] Society looked like a feudal organization with the king at its apex. Ref. K.K. Datta, *An Advanced History of India, p.559*

সমাজে দাসপ্রথা ও নারীর অবস্থান: মুঘল যুগেও বাংলার সমাজে দাসপ্রথার প্রচলন ছিল। দাসদের সামাজিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ। যুবতী দাসীরা প্রভুদের উপপত্নী হিসেবে ব্যবহৃত হতেন। সমাজে নারীদের সম্মান ছিল। তবে তাদের শিক্ষাদানের কোনো সাধারণ প্রথা ছিল না। ফলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নারীরা নিরক্ষর থাকত। তবে অভিজাত পরিবারে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। এ যুগে গুলবদন বেগম, নূরজাহানসহ অনেক নারীই সাহিত্যানুরাগের পরিচয় দেন। তবে সাধারণভাবে নারীদের অবস্থা খারাপ থাকলেও মুঘল যুগে রানি যোধবাঈ, রানি দুর্গাবতী, চাঁদ সুলতানা, নূরজাহান বেগম, মমতাজ মহল, জাহানারা বেগম, জীজাবাঈ, তারাবাঈ, মীরাবাঈ প্রমুখ নারী তাদের নিজ যোগ্যতায় ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছেন।

ধর্মীয় উৎসব: ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা, মহররম, শবেবরাত, নবি (স) এর জন্ম ও মৃত্যু দিবস ইত্যাদি ছিল মুসলিম সমাজের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। মুসলিম শাসকেরা বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে এসব ধর্মীয় উৎসব পালনের ব্যবস্থা করতেন। সাধারণ মানুষ এসব উৎসবে ভালো পোশাক-পরিচ্ছদ পরে একে অন্যের বাড়ি দাওয়াত ও কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ববোধকে দৃঢ় রাখতেন। হিন্দুসমাজেও নানা ধর্মীয় উৎসব পালনের রেওয়াজ ছিল।

মদ পান: মুঘল আমলে আর্থিক অবস্থা সাপেক্ষে প্রায় সবাই মদ পান করত। সম্রাট, আমির-ওমরাহ কেউ বাদ ছিল না। কোনো সম্রাট মদ পান না করলে সেটা ছিল তার ব্যক্তিগত চরিত্রের একটা উন্নত দিক। মদ পানের সাথে নারীদের ভোগ করা মুঘল আমলে অভিজাতশ্রেণিতে প্রচলিত ছিল। নর্তকিরা নেচেগেয়ে মনিবের মনোরঞ্জন করত। মাত্র কয়েকজন সম্রাট ছাড়া প্রায় সবাই উপপত্নী রাখতেন। তবে পূর্ববর্তী সম্রাটেরা এসব ব্যাপারে সংযমশীল ছিলেন।

শিক্ষা ও সাহিত্য: কে. কে. দত্ত বলেন, "ভারতের মুঘল শাসকেরা শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।"[৪৬] তারা শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তারা মসজিদ, মঠ এবং পণ্ডিতদের অর্থদান করে বিদ্যাশিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। মুঘল সম্রাটেরা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তারা নিজেদের আত্মজীবনী রচনা করেই যশস্বী হননি, সাহিত্য ও ইতিহাসচর্চায়ও তারা অকুণ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

স্থাপত্যশিল্প: মুঘল সম্রাটেরা শিল্পের উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাদের প্রায় দুই শত বছরের শাসনকালের মধ্যে উপমহাদেশের স্থাপত্য শিল্পকলার বিস্ময়কর উন্নতি সাধিত হয়। ভারতীয় স্থাপত্যিক পার্সি ব্রাউন বলেন, মুঘল স্থাপত্য শিল্প ভারতীয় মুসলিম শিল্প ও স্থাপত্যের ইতিহাসে স্বর্ণযুগের সৃষ্টি করে। মুঘল সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে মুঘল স্থাপত্য অগ্রগতির চরম শিখরে উন্নীত হয়। মুঘল আমলে নির্মিত তাজমহল, আগ্রাফোর্ট, লালকেল্লা, মতি মসজিদসহ বিভিন্ন সমাধি, প্রাসাদ, মসজিদ, দুর্গ ইত্যাদি আজও মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সংগীত: শুধু আওরঙ্গজেব ছাড়া সব মুঘল সম্রাটই সংগীতের সমঝদার ছিলেন। এ সময়ে সংগীতবিদ্যা যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। সম্রাট বাবর ছিলেন একাধারে কবি ও শিল্পরসিক। লেনপুলের মতে, 'সংগীতপ্রিয় বাবরের রাজত্বকালে যন্ত্র ও কণ্ঠ সংগীতের উৎকর্ষ সাধিত হয়।' আকবরের সময় সংগীতের ব্যাপক চর্চা হতো। প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী মিয়া তানসেন আকবরের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। এছাড়াও রামদাস, বৈজুবাওরা ও সুরদাস, বিলাস খান, লাল খান ও রাজবাহাদুর মুঘল আমলের বিখ্যাত সংগীত শিল্পী ছিলেন।

চিত্রকলা: মুঘল চিত্রকলা ভারতীয় ও পারসিক রীতির সংমিশ্রণে এক অভিনব ও অপূর্ব রূপ পরিগ্রহ করে। হুমায়ুনকে মুঘল চিত্রকলার প্রতিষ্ঠাতা বলা হলেও জাহাঙ্গীরের আমলকে চিত্রকলা চর্চার দিক দিয়ে স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। ড. ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, "জাহাঙ্গীর সৌন্দর্য ও প্রকৃতির একনিষ্ঠ পূজারী ছিলেন। তার শাসনামলে চিত্রশিল্প নব উদ্দীপনা পেয়েছিল।"[৪৭] মুঘল চিত্রকরদের মধ্যে আবুল হাসান, ঈশা খাঁ, কিষণ দাস, উস্তাদ মনসুর প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

---

[৪৬] The Mughal rulers of India were patrons of education. – Ref. K.K. Datta, *An Advanced History of India, p-571*

[৪৭] Jahangir was a great lover of nature and beauty. The school of painting received a fresh impetus in his reign.– Ref. Dr. Ishwari Prasad. *A Short history of Muslim Rule in India.* p-473

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. 'হুমায়ুননামা' গ্রন্থের লেখক কে?
২. মুঘল আমলে প্রজাদের প্রধান উপজীবিকা কী ছিল?
৩. মুঘল আমলে ঢাকার কোন বস্ত্র একচেটিয়াভাবে ইউরোপে প্রভাব বিস্তার করেছিল?
৪. মুঘল সমাজ কয়টি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল?
৫. মুঘল অভিজাত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন কারা?
৬. কাবাব, রেজালা, কোর্মা— এগুলো কোন আমলের খাবার?

উত্তরের জন্য ২৪৪ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. দলীয় কাজ

দুটি দলে ভাগ হয়ে মুঘল আমলে ভারতবর্ষের যেসব কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানি হতো তার একটি তালিকা প্রস্তুত করো এবং সমৃদ্ধ অর্থনীতির পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লেখো।

গ. একক কাজ

১. মুঘল আমলের সামাজিক অবস্থা সন্তোষজনক ছিল কি না— পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে প্রমাণ করো।
২. মুঘল আমলে ভারতের ধর্মীয় উৎসবগুলোর একটি তালিকা তৈরি করো।

পাঠ মূল্যায়নের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর

পাঠ-১:	১. মোঙ্গল; ২. মহাবীর চেঙ্গিস খান; ৩. মধ্য এশিয়া; ৪. সিংহ; ৫. মাতার; ৬. মাত্র ১১ বছর ৪ মাস।
পাঠ-২:	১. জহিরউদ্দিন মুহাম্মদ বাবর; ২. সুলতান ইব্রাহিম লোদি; ৩. ১৫২৬; ৪. ভারতের হরিয়ানা রাজ্যে; ৫. জহিরউদ্দিন মুহাম্মদ বাবর (পানিপথের প্রথম যুদ্ধে); ৬. পানিপথের প্রথম যুদ্ধ।
পাঠ-৩:	১. মেবারের রানা সংগ্রাম সিংহের; ২. ১৫২৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ মার্চ; ৩. খানুয়ার; ৪. সম্রাট বাবর; ৫. তুর্কি; ৬. ১৫৩০ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ ডিসেম্বর।
পাঠ-৪:	১. সৌভাগ্যবান; ২. সিংহাসনের দাবি; ৩. মুঘল-আফগান সংঘর্ষ; ৪. সম্রাট হুমায়ুন; ৫. ১৫৩৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ জুন; ৬. কনৌজ বা বিলগ্রামের যুদ্ধ (১৫৪০ খ্রি.)।
পাঠ-৫:	১. নানা জাতি-গোষ্ঠীর; ২. কনৌজের; ৩. পারস্যের সাফাভি সম্রাট শাহ তাহমাসপের; ৪. ভাই কামরানকে; ৫. ১৫৫৫; ৬. সম্রাট হুমায়ুন।
পাঠ-৬:	১. শের শাহ; ২. ১৫৪০-১৫৫৫ খ্রি.; ৩. ফরিদ; ৪. শের খান; ৫. চৌসার; ৬. ১৫৪০ খ্রিষ্টাব্দের ৭ মে।
পাঠ-৭ ও ৮:	১. মুঘল সম্রাট আকবরের; ২. ৪৭টি; ৩. গ্রাম; ৪. অর্থ ও রাজস্ব সংস্কারে; ৫. শের শাহ; ৬. শের শাহ।
পাঠ-৯:	১. শুরি; ২. শের শাহ; ৩. প্রাচীন ও মধ্যযুগীয়; ৪. শের শাহের; ৫. শের শাহের দ্বিতীয় পুত্র জালাল খান (ইসলাম শাহ); ৬. মাচিওয়ার ও সরহিন্দের।
পাঠ-১০ ও ১১:	১. তৃতীয়; ২. সিন্ধুর অমরকোটে; ৩. বৈরাম খান; ৪. ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ৫ নভেম্বর; ৫. পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ; ৬. সম্রাট আকবর (১৫৭৬ খ্রি.)।

পাঠ-১২: ১. সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা; ২. রাজপুত; ৩. রাজপুতদের; ৪. সম্রাট আকবর; ৫. ৯; ৬. সম্রাট আকবর।

পাঠ-১৩: ১. মুঘল সম্রাট আকবর; ২. ফতেহপুর সিক্রিতে; ৩. ১৫৮২; ৪. সাম্রাজ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা; ৫. আঠারো; ৬. রাজা বীরবল।

পাঠ-১৪: ১. সম্রাট আকবর; ২. পনেরোটি; ৩. রাজা টোডরমল; ৪. আবুল ফজল; ৫. সম্রাট আকবর; ৬. পদ বা পদমর্যাদা।

পাঠ-১৫: ১. সম্রাট আকবরকে; ২. সম্রাট আকবর; ৩. সম্রাট আকবর; ৪. সম্রাট আকবর; ৫. নয়; ৬. সম্রাট আকবরের।

পাঠ-১৬: ১. নূরউদ্দিন মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর; ২. সম্রাট জাহাঙ্গীরকে; ৩. ভুবন বিজয়ী, পৃথিবীর অধিকারী; ৪. সম্রাট জাহাঙ্গীর; ৫. সম্রাট জাহাঙ্গীর; ৬. মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর।

পাঠ-১৭: ১. ইসলাম খান চিশতিকে; ২. ১৬১০ ৩. সুবাদার ইসলাম খান; ৪. পর্তুগিজরা; ৫. সম্রাট জাহাঙ্গীরের; ৬. সম্রাট জাহাঙ্গীর।

পাঠ-১৮ ও ১৯: ১. মেহর-উন-নিসা; ২. পৃথিবীর আলো; ৩. ১২টি; ৪. সম্রাট জাহাঙ্গীর; ৫. সম্রাট জাহাঙ্গীর; ৬. সম্রাট জাহাঙ্গীরকে।

পাঠ-২০: ১. খুররম; ২. পিতা সম্রাট জাহাঙ্গীর; ৩. আসফ খানের কন্যা আরজুমান্দ বানু বেগমের; ৪. ১৬২৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি; ৫. সম্রাট শাহজাহান; ৬. সম্রাট শাহজাহান।

পাঠ-২১: ১. পারসিকদের উন্নত যুদ্ধ কৌশল ও গোলন্দাজ বাহিনী তৎপরতা; ২. সম্রাট শাহজাহানের অপরিণামদর্শিতা; ৩. চার কোটি; ৪. পাঁচ হাজার; ৫. আহমদনগর, বিজাপুর ও গোলকুন্ডা অধিকার; ৬. শাহজাদা আওরঙ্গজেবকে।

পাঠ-২২: ১. ১৬৫৭; ২. দারাশিকো; ৩. পাঞ্জাব ও দিল্লির; ৪. শাহ সুজা; ৫. তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেব; ৬. ১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দের ২১ জুলাই।

পাঠ-২৩: ১. সম্রাট শাহজাহানকে; ২. মুঘল সম্রাট শাহজাহানের; ৩. তাজমহল; ৪. আগ্রায় যমুনা নদীর তীরে; ৫. ইরানের ওস্তাদ ঈসা সিরাজী; ৬. মুঘল সম্রাট শাহজাহানের।

পাঠ-২৪ ও ২৫: ১. সম্রাট শাহজাহানের; ২. সম্রাট শাহজাহানের স্ত্রী; ৩. ১৬১২; ৪. সম্রাট শাহজাহান; ৫. ১৬৩১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ জুন; ৬. মমতাজমহল (আরজুমান্দ বানু বেগম)।

পাঠ-২৬ ও ২৭: ১. সম্রাট আওরঙ্গজেব; ২. আট বছর; ৩. সম্রাট আওরঙ্গজেব; ৪. সম্রাট আওরঙ্গজেব; ৫. আশি প্রকার; ৬. মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের।

পাঠ-২৮: ১. দাক্ষিণাত্য নীতিকে; ২. ১৬৭৯; ৩. রানা রাজসিংহ; ৪. যুবরাজ আকবর; ৫. মারাঠা; ৬. দাক্ষিণাত্য নীতি।

পাঠ-২৯: ১. মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের; ২. মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব; ৩. আওরঙ্গজেবের; ৪. পাতিয়ালা ও মেওয়াটি; ৫. ১৬৭৫; ৬. কৃষিজীবী।

পাঠ-৩০: ১. দাক্ষিণাত্য নীতি; ২. মারাঠা শক্তি; ৩. শিবাজি; ৪. শিবাজি; ৫. ২৫ বছর; ৬. দাক্ষিণাত্য।

পাঠ-৩১: ১. প্রায় ৫০ বছর; ২. সম্রাট আওরঙ্গজেব; ৩. দাক্ষিণাত্যে; ৪. ২১টি; ৫. মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব; ৬. দাক্ষিণাত্য নীতি।

পাঠ-৩২: ১. প্রায় দেড় শতাব্দী; ২. ১৭১৩; ৩. মুহাম্মদ শাহ (১৭৪৮ খ্রি.); ৪. পারস্যের নাদির শাহ; ৫. ১৭৬১ (মারাঠা শক্তি এবং আহমেদ শাহ আবদালির মধ্যে); ৬. দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ।

পাঠ-৩৩: ১. প্রায় ৩০০ বছর; ২. দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ (১৮৫৭); ৩. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকার; ৪. ১৭৩৯; ৫. নাদির শাহের সেনাপতি আহমেদ শাহ আবদালি; ৬. ১৮৫৮।

পাঠ-৩৪: ১. সম্রাট; ২. ভকিল (প্রধানমন্ত্রী); ৩. মীর আতশ বা দারোগা-ই-তোপখানা; ৪. সুবাদার বা প্রদেশ পাল; ৫. দিউয়ান; ৬. গ্রাম পঞ্চায়েতের।

পাঠ-৩৫: ১. গুলবাদন বেগম (সম্রাট বাবরের মেয়ে); ২. কৃষিকাজ; ৩. মসলিন; ৪. তিনটি; ৫. সম্রাট, মন্ত্রী ও আমিরাগণ; ৬. মুঘল আমল।

৫ এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

মোঙ্গাল	'মোঙ্গা' শব্দ থেকে মোঙ্গাল শব্দের উদ্ভব হয়েছে এবং এ শব্দ থেকে 'মুঘল' (মোগল) কথাটি এসেছে। মহাবীর চেঙ্গিস খান প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ ইতিহাসে 'মোঙ্গাল' নামে পরিচিত। এরা মঙ্গোলিয়ার অধিবাসী। মোঙ্গালরা ছিল দুর্ধর্ষ ও নির্ভীক। চেঙ্গিস খান (তেমুচিন) তাদের বিচ্ছিন্ন উপদলগুলো একত্র করে এশিয়ার একটি শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তিতে পরিণত করেন। তিনি উত্তরে সাইবেরিয়া থেকে দক্ষিণে জর্জিয়া এবং পূর্বে চীন থেকে পশ্চিমে রুশ দেশ পর্যন্ত বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। সুলতানি যুগ থেকেই এ মোঙ্গালরা ভারতে রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করতে থাকে এবং বিভিন্ন সময়ে ভারত আক্রমণ করে।
গোলন্দাজ বাহিনী	গোলন্দাজ বাহিনী বলতে পদাতিক বাহিনীকে বোঝায়, যারা যুদ্ধে কামান ও গোলা ব্যবহার করে। মুঘল সম্রাট বাবর ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম গোলন্দাজ বাহিনী গঠন করেন। এদের কারণেই বাবর ভারতে পরিচালিত তার যুদ্ধগুলোতে সফল হন।
সড়ক-ই-আযম	ব্যবসা-বাণিজ্যের গতিশীলতা বৃদ্ধি, সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ সুবিধা বৃদ্ধি, সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য সেনাবাহিনীর চলাচল এবং ডাকব্যবস্থার সুবিধার জন্য আফগান শাসক শের শাহ বহু সুন্দর ও প্রশস্ত রাস্তা নির্মাণ করেছিলেন। তার নির্মিত রাস্তাসমূহের মধ্যে প্রধান ছিল 'সড়ক-ই-আযম' বা গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড'। প্রায় ১৫০০ মাইল দীর্ঘ এ রাস্তাটি পূর্ববঙ্গের সোনারগাঁও থেকে সিন্ধু নদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।
নবরত্ন	সম্রাট আকবরের সময় মির্জা আবদুর রহিম, মির্জা আবদুল আজিজ কোকলতাস, আবুল ফজল, কবি ফৈজী, হোসায়ন খান, বাক্যবাগীশ আবুল ফাতাহ গিলানী, রাজা টোডরমল, রসিক প্রবর রাজা বীরবল এবং সংগীতজ্ঞ মিয়া তানসেন প্রমুখ নয় জন বিদ্বান ও গুণী ব্যক্তি তার রাজসভাকে অলংকৃত করেছিলেন। তারা একত্রে দরবারের 'নওরতনে আকবর' বা আকবরের দরবারের নবরত্ন নামে পরিচিত ছিলেন। তাদের অবদানে মুঘল রাজদরবার বিদ্যা ও সাহিত্যচর্চার তীর্থকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।
বাংলা নববর্ষ	বাংলা সনের প্রথম দিনটি অর্থাৎ পহেলা বৈশাখকে বাংলা নববর্ষ হিসেবে উদযাপন করা হয়। ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ৫ নভেম্বর মুঘল সম্রাট আকবর পানি পথের দ্বিতীয় যুদ্ধে হিমুকে পরাজিত করে মুঘল শাসন সুদৃঢ় করেন। তখন থেকেই রাজস্ব আদায়কে সহজ ও তার বিজয়কে স্মরণীয় করে রাখার জন্য তিনি তারিখ-ই এলাহি সনটির প্রবর্তন করেন। প্রথমে এটি তারিখ-ই এলাহি নামে পরিচিতি লাভ করে। সম্রাট আকবর ১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দে তার রাজত্বের উনত্রিশতম বর্ষে বাংলা বর্ষপঞ্জি প্রবর্তন করেন। ১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দের ১০ বা ১১ মার্চ নতুন এই সালটি তারিখ-ই এলাহি থেকে বঙ্গাব্দে পরিচিতি পায়। উপমহাদেশে দীর্ঘদিন মুঘল শাসন থাকায় এখানে নওরোজ উৎসব হতো। কিন্তু বাংলা সন প্রবর্তনের পর নওরোজ উৎসবের স্থান দখল করে নিয়েছে পহেলা বৈশাখের উৎসব। বাংলা সনের ১ম দিনটি অর্থাৎ পহেলা বৈশাখকে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে উদযাপন করা হয়ে থাকে।
সুলহ-ই-কুল	'সুলহ-ই-কুল' শব্দের অর্থ পূর্ণাঙ্গ শান্তি। ধর্মান্ধতা পরিহার এবং পরধর্মে হস্তক্ষেপ না করাই সুলহ-ই-কুল এর মূলকথা। ধর্মীয় সহিষ্ণুতার এ নীতি অনুসরণ করে সম্রাট আকবর মুঘল সাম্রাজ্যে এক বিশাল পরিবর্তন নিয়ে এসেছিলেন। সব ধর্মের মানুষকে একই পতাকাতলে নিয়ে আসার জন্য তিনি এ উদার নীতি গ্রহণ করেন। তার পরবর্তী মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরও এ নীতি অনুসরণ করেন।
দ্বীন-ই-ইলাহি	মুঘল সম্রাট জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ আকবর সর্ব ধর্মের ভালো ও উৎকৃষ্ট দিকগুলো নিয়ে ১৫৮২ খ্রিষ্টাব্দে একটি নতুন ধর্মমত প্রবর্তন করেন, যা দ্বীন-ই-ইলাহি নামে পরিচিত। এটি ছিল একটি উদার সর্বেশ্বরবাদী ধর্ম। এ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণকারীদের সম্রাটের নামে চারটি স্তরে তাদের জীবন, ধর্ম, সম্মান ও জীবন উৎসর্গ করতে হতো। দ্বীন-ই-ইলাহির কালিমা ছিল— 'লা ইলাহ ইল্লাল্লাহু ওয়া আকবারু খলিফাতুল্লাহ।' এর অনুসারি সংখ্যা ছিল মাত্র আঠারো জন। সম্রাটের মৃত্যুর সাথে সাথে 'দ্বীন-ই-ইলাহি' ধর্মমতের অবসান ঘটে।

মনসব	'মনসব' শব্দের অর্থ পদ বা মর্যাদা। এ পদের অধিকারীকে 'মনসবদার' এবং সমগ্র ব্যবস্থাটিকে মনসবদারি প্রথা বলা হয়। সেনাবাহিনীতে নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য ১৫৭১ খ্রিষ্টাব্দে মুঘল সম্রাট আকবর মনসবদারি প্রথা চালু করেন। এ সংস্কারধর্মী উদ্যোগ সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের নানা অব্যবস্থাপনা দূর করতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এ ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ পর্যায়ের মনসবদার দশ হাজার এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ে একজন মনসবদার দশ জন সৈন্য নিজেদের অধীনে রাখতে পারতেন।
তাজমহল	ভারতের আগ্রায় অবস্থিত তাজমহল সম্রাট শাহজাহান নির্মিত মুঘল স্থাপত্যশৈলীর একটি আকর্ষণীয় নিদর্শন। তিনি তার প্রিয়তমা স্ত্রী মমতাজমহলের স্মৃতি মনেপ্রাণে ধরে রাখার জন্য সব ভালোবাসা দিয়ে যমুনা নদীর তীরে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেন। এটা মমতাজের সমাধির ওপর নির্মিত ও তার নামানুসারে নামকরণ হয়। ১৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে তাজমহলের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। তিন কোটি মুদ্রা ব্যয়ে ২০ হাজার লোকের ২২ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ১৬৫৩ খ্রিষ্টাব্দে তাজমহলের নির্মাণ কাজ শেষ হয়। তাজমহলের প্রধান স্থপতি ইরানের ওস্তাদ ঈসা সিরাজি। ইন্দো-পারসিক রীতির সংমিশ্রণে তৈরি তাজমহল মধ্যযুগীয় বিশ্বের অন্যতম সপ্তাশ্চর্য হিসেবে স্বীকৃত।
দস্তুরুল আমল	সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় (শাসনকাল: ১৬০৫-১৬২৭ খ্রি.) শাসনব্যবস্থায় অনাচার রোধ এবং শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও জননিরাপত্তা রক্ষায় তিনি দস্তুরুল আমল নামে ১২টি বিধান চালু করেন। এগুলো হলো— ১. বিভিন্ন ধরনের অতিরিক্ত ও অন্যায্য শুল্ক রহিত করা; ২. রাহাজানি এবং চুরি নিয়ন্ত্রণে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ; ৩. অপরাধের শাস্তি হিসেবে অঙ্গচ্ছেদ প্রথা বন্ধ এবং বলপূর্বক ঘরবাড়ি দখল নিষিদ্ধ; ৪. মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্ণয়; ৫. বলপূর্বক অন্যের সম্পদ হরণ নিষিদ্ধ; ৬. মাদক ও অন্যান্য উত্তেজক পানীয় সেবন ও বিক্রয় নিষিদ্ধ; ৭. রবিবারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন; ৮. নির্দিষ্ট দিনে পশুহত্যা নিষিদ্ধ; ৯. আর্তপীড়িতের সেবার জন্য হাসপাতাল নির্মাণ ও চিকিৎসক নিয়োগ; ১০. ওয়াকফ্ (আইমা) জমি নির্দিষ্ট করা; ১১. মনসব ও জায়গির প্রথার স্থিতিশীলতা বিধান এবং ১২. বন্দিদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন।
বারো ভূঁইয়া	বারো ভূঁইয়া বলতে বাংলার কয়েকজন স্বাধীন ও আধা স্বাধীন জমিদারদেরকে বোঝায় যারা মুঘল আমলে দিল্লির অধীনতা অস্বীকার করে নিজ নিজ রাজ্যে স্বাধীন শাসন পরিচালনা করতেন। তারা মুঘল সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ভাটি অঞ্চলের জমিদার ঈসা খান মসনদ-ই-আলা ও তার পুত্র মুসা খানের নেতৃত্বে যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য, বুকাইনগরের ওসমান খান লোহানী, সরাইলের সোনা গাজী, নাটোরের কংস নারায়ণ, বিক্রমপুরের চাঁদ রায় ও কেদার রায়, ভুলুয়ার রাজা অনন্ত মাণিক্য প্রমুখ জমিদারেরা মুঘল কর্তৃত্ব অস্বীকার করে বিদ্রোহ ও প্রতিরোধ যুদ্ধ চালাতে থাকেন। আকবরের পক্ষে এ ভূঁইয়াদের দমন করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তী সময়ে সম্রাট জাহাঙ্গীর বাংলার তৎকালীন সুবাদার ইসলাম খানের নেতৃত্বে তাদেরকে মুঘল কর্তৃত্ব স্বীকারে বাধ্য করেন।
মারাঠা সাম্রাজ্য	মারাঠা সাম্রাজ্য একটি ঐতিহাসিক সাম্রাজ্য, যা খ্রিষ্ট্রীয় সপ্তদশ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে (১৬৭৪-১৮১৮) পর্যন্ত, ভারতবর্ষের প্রায় সমগ্র অংশ জুড়ে বিদ্যমান ছিল। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ছত্রপতি শিবাজি। মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মারাঠা সাম্রাজ্য বহুগুণে বিস্তৃত হয়। মারাঠা সাম্রাজ্যকেই ভারতের সর্বশেষ হিন্দু সাম্রাজ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ১৮৬১ সালে মারাঠারা পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে পরাজিত হলে উত্তর দিকে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার রোধ হয়। ১৭৭০ সালে আবার উত্তর ভারত মারাঠা অধীনে আসে। ১৮১৮ সালের মধ্যে ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে ব্রিটিশদের কাছে মারাঠা সাম্রাজ্য চূড়ান্ত পরাজয় বরণ করে।
জিন্দাপির	মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবকে জিন্দাপির বলা হতো। সম্রাট আওরঙ্গজেব ছিলেন খাঁটি সুন্নি মুসলমান। ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামের বিধি-বিধান পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মেনে চললেও তিনি পরধর্মের প্রতি সহিষ্ণু ছিলেন। আকবরের শাসনামলে ধর্মের বন্ধন শিথিল হয়ে পড়েছিল। আওরঙ্গজেব তা মজবুত করেন। এটা করতে গিয়ে হিন্দুদের কাছে অপ্রিয় হলেও মুসলমানদের কাছ থেকে তিনি 'জিন্দাপির' উপাধি লাভ করেন।

অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ সাল ও ঘটনা

সাল	ঘটনা
১৫২৬	পানিপথের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং জহিরউদ্দিন মুহাম্মদ বাবর ভারত উপমহাদেশে মুঘল রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন।
১৫২৭	খানুয়ার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে রাজপুত নেতা রানা সংগ্রাম সিংহ মুঘল বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়।
১৫৩০	সম্রাট বাবর মৃত্যুবরণ করেন ও হুমায়ুন সিংহাসন লাভ করেন।
১৫৩৯	চৌসার যুদ্ধে শের খানের কাছে সম্রাট হুমায়ুন পরাজিত হন।
১৫৪০	কনৌজের বা বিলগ্রামের যুদ্ধে শের শাহের কাছে হুমায়ুনের পরাজয় ঘটে।
১৫৫৬	হুমায়ুন হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন, জালালউদ্দিন মুহাম্মদ আকবর সিংহাসনে আরোহণ করেন, পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়।
১৫৭৬	সম্রাট আকবর রাজমহলের যুদ্ধে দাউদ খান কররানিকে পরাজিত করে বাংলা জয় করেন।
১৫৭৭	সম্রাট আকবর মনসবদারি প্রথা চালু করেন।
১৫৮২	সম্রাট আকবর 'দীন-ই-ইলাহি' ধর্মমত প্রবর্তন করেন।
১৬০৮	সম্রাট জাহাঙ্গীর ইসলাম খান চিশতিকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন।
১৬১০	সুবাদার ইসলাম খান রাজমহল থেকে ঢাকায় (জাহাঙ্গীরনগর) রাজধানী স্থানান্তর করেন।
১৬২৮	সম্রাট শাহজাহান মুঘল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।
১৬৩২	সম্রাট শাহজাহান তাজমহলের নির্মাণ কাজ শুরু করেন।
১৬৩৮	সম্রাট শাহজাহান আগ্রা থেকে দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তর করেন।
১৬৫৮	মুঘল সম্রাট হিসেবে আওরঙ্গজেবের অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়।
১৬৫৮-১৭০৭	মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে অভিযান চালান।
১৮৫৭	সিপাহি বিদ্রোহ সংঘটিত হয় এবং মুঘল সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে।

সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

ক. জ্ঞানমূলক

■ ভারতে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠা: বাবর, চরিত্র ও কৃতিত্ব

প্রশ্ন-১. 'মুঘল' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে কোন শব্দ থেকে?

[রা. বো., কু. বো., য. বো. ২০২২]

উত্তর: 'মোঙ্গল' শব্দ থেকে মুঘল শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে।

প্রশ্ন-২. 'মোঙ্গল' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে কোন শব্দ থেকে?

উত্তর: 'মোঙ্গল' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে 'মোঙ্গ' শব্দ থেকে।

প্রশ্ন-৩. 'মোঙ্গল' শব্দটির অর্থ কী?

উত্তর: 'মোঙ্গল' শব্দটির অর্থ নির্ভীক।

প্রশ্ন-৪. মোঙ্গল কারা?

উত্তর: মহাবীর চেঙ্গিস খান প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ ইতিহাসে 'মোঙ্গল নামে পরিচিত।

প্রশ্ন-৫. মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে?

[ম. বো., দি. বো. ২০২৫; সকল বোর্ড ২০১৬]

উত্তর: মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা জহিরউদ্দিন মুহাম্মদ বাবর।

প্রশ্ন-৬. কোন বংশের ধ্বংসস্তূপের ওপর মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়?

উত্তর: লোদি বংশের ধ্বংসস্তূপের ওপর মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন-৭. পানিপথের প্রথম যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়?

[সকল বোর্ড ২০২৫; ঢা. বো., রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৩; ঢা., রা., চ. বো. ২০১৭]

উত্তর: ১৫২৬ সালে পানিপথের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

প্রশ্ন-৮. কত সালে ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়?

[দি. বো., কু. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০১৭]

উত্তর: ১৫২৬ সালে ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন-৯. 'বাবর' শব্দের অর্থ কী? *[ঢা. বো., ম. বো., দি. বো., চ. বো., সি. বো., ব. বো. ২০২২; সকল বোর্ড ২০১৫]*
উত্তর: 'বাবর' শব্দের অর্থ সিংহ।

প্রশ্ন-১০. ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম কে কামান ব্যবহার করেন? *[ঢা. বো., রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো. ২০২৩]*
উত্তর: ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম কামান ব্যবহার করেন সম্রাট বাবর।

প্রশ্ন-১১. 'তুযুক-ই-বাবরি' গ্রন্থটির লেখক কে?
উত্তর: 'তুযুক-ই-বাবরি' গ্রন্থটির লেখক মুঘল সম্রাট জহিরউদ্দিন মুহাম্মদ বাবর।

■ সম্রাট হুমায়ুন: মুঘল-আফগান দ্বন্দ্ব

প্রশ্ন-১২. সম্রাট হুমায়ুনের পিতার নাম কী? *[সকল বোর্ড ২০১৯]*
উত্তর: সম্রাট হুমায়ুনের পিতার নাম বাবর।

প্রশ্ন-১৩. 'হুমায়ুন' শব্দের অর্থ কী? *[ঢা. বো., রা. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., ব. বো., য. বো. ২০২৫; য. বো. ২০২৩; সকল বোর্ড ২০১৮]*
উত্তর: 'হুমায়ুন শব্দের অর্থ সৌভাগ্যবান।

প্রশ্ন-১৪. হুমায়ুন কত সালে সিংহাসনে বসেন? *[রা. বো., কু. বো., য. বো. ২০২২]*
উত্তর: হুমায়ুন ১৫৩০ সালের ৩০ ডিসেম্বর সিংহাসনে বসেন।

প্রশ্ন-১৫. বাংলার নাম জান্নাতাবাদ রাখেন কে?
উত্তর: মুঘল সম্রাট হুমায়ুন বাংলার নাম রাখেন জান্নাতাবাদ।

প্রশ্ন-১৬. দিনপানাহ অর্থ কী?
উত্তর: দিনপানাহ অর্থ বিশ্বাসীদের আশ্রম।

প্রশ্ন-১৭. কোন যুদ্ধের ফলে ভারতে সাময়িকভাবে মুঘল সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে?
উত্তর: কনৌজ বা বিলগ্রামের (১৫৪০ খ্রি.) যুদ্ধের ফলে ভারতে সাময়িকভাবে মুঘল সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে।

প্রশ্ন-১৮. কত খ্রিষ্টাব্দে কনৌজ বা বিলগ্রামের যুদ্ধ সংঘটিত হয়?
উত্তর: ১৫৪০ খ্রিষ্টাব্দের ৭ মে কনৌজ বা বিলগ্রামের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

প্রশ্ন-১৯. শাহ তাহমাসপ কে ছিলেন?
উত্তর: শাহ তাহমাসপ ছিলেন পারস্যের সাফাভি সম্রাট।

প্রশ্ন-২০. কত খিষ্টাব্দে ভারতে মুঘল আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর: ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে ভারতে মুঘল আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

■ শের শাহ: শাসনব্যবস্থা ও জনহিতকর কার্যাবলি

প্রশ্ন-২১. ভারতে শুর আফগান রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?
উত্তর: ভারতে শুর আফগান রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট শের শাহ।

প্রশ্ন-২২. শের শাহের বাল্যনাম কী ছিল? *[সকল বোর্ড ২০১৮]*
উত্তর: শের শাহের বাল্যনাম ছিল ফরিদ।

প্রশ্ন-২৩. শের শাহের পিতার নাম কী?
উত্তর: শের শাহের পিতার নাম হাসান খান শুর।

প্রশ্ন-২৪. চৌসার যুদ্ধ কত খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়?
উত্তর: চৌসার যুদ্ধ ১৫৩৯ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়।

প্রশ্ন-২৫. চৌসার যুদ্ধে কে পরাজিত হয়?
উত্তর: চৌসার যুদ্ধে সম্রাট হুমায়ুন পরাজিত হয়।

প্রশ্ন-২৬. শের খান কখন 'শের শাহ' উপাধি গ্রহণ করেন?
উত্তর: চৌসার যুদ্ধে (১৫৩৯) বিজয়ী হয়ে শের খান 'শের শাহ' উপাধি গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন-২৭. কবুলিয়ত ও পাট্টা কে প্রবর্তন করেন?
উত্তর: ভারতবর্ষের আফগান শাসক শের শাহ কবুলিয়ত ও পাট্টা প্রবর্তন করেন।

প্রশ্ন-২৮. শের শাহ কত খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন?
উত্তর: শের শাহ ১৫৪৫ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

প্রশ্ন-২৯. শের শাহ তার বিশাল সাম্রাজ্যকে কয়টি প্রশাসনিক ইউনিটে ভাগ করেন?
উত্তর: শের শাহ তার বিশাল সাম্রাজ্যকে ৪৭টি (মতান্তরে ৬৬টি) প্রশাসনিক ইউনিটে ভাগ করেন।

প্রশ্ন-৩০. শের শাহের পরগনার প্রধান সামরিক অধিকর্তার নাম কী ছিল?
উত্তর: শের শাহের পরগনার প্রধান সামরিক অধিকর্তার নাম ছিল 'শিকদার'।

প্রশ্ন-৩১. শের শাহের প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থার সর্বনিম্ন ইউনিটের নাম কী ছিল?
উত্তর: শের শাহের প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থার সর্বনিম্ন ইউনিটের নাম ছিল 'গ্রাম'।

প্রশ্ন-৩২. গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড নির্মাণ করেন কে?
উত্তর: গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড নির্মাণ করেন শের শাহ।

প্রশ্ন-৩৩. শের শাহের প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রার নাম কী?
উত্তর: শের শাহের প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রার নাম আশরাফি।

প্রশ্ন-৩৪. রোটাস দুর্গ কে নির্মাণ করেন?
উত্তর: শের শাহ রোটাস দুর্গ নির্মাণ করেন।

প্রশ্ন-৩৫. পাট্টা কী?
উত্তর: পাট্টা হলো জমির ওপর কৃষকদের স্বত্ব (অধিকার) দলিল।

প্রশ্ন-৩৬. তাকাভী কী?
উত্তর: তাকাভী হলো সম্রাট শের শাহের প্রবর্তিত কৃষিঋণ ব্যবস্থা।

■ সম্রাট আকবর: রাজ্য বিজয়, ধর্মীয় নীতি, রাজপুত নীতি ও শাসন পদ্ধতি

প্রশ্ন-৩৭. সম্রাট আকবরের উপাধি কী ছিল?
উত্তর: সম্রাট আকবরের উপাধি ছিল 'জালালউদ্দিন মুহাম্মদ আকবর'।

প্রশ্ন-৩৮. মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বা শ্রেষ্ঠ শাসক কে?
উত্তর: মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বা শ্রেষ্ঠ শাসক জালালউদ্দিন মুহাম্মদ আকবর।

প্রশ্ন-৩৯. সম্রাট আকবর কত খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন?

উত্তর: সম্রাট আকবর ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি মুঘল সিংহাসনে আরোহণ করেন।

প্রশ্ন-৪০. বৈরাম খান কে ছিলেন?

উত্তর: বৈরাম খান মুঘল সম্রাট আকবরের তত্ত্বাবধায়ক ও সেনাপতি ছিলেন।

প্রশ্ন-৪১. পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ কত খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়? *[ঢা. বো., ম. বো., দি. বো., চ. বো., সি. বো., ব. বো. ২০২২]*

উত্তর: ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ৫ নভেম্বর পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

প্রশ্ন-৪২. পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে কে বিজয়ী হন?

উত্তর: পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে সম্রাট আকবর বিজয়ী হন।

প্রশ্ন-৪৩. হিমু কে ছিলেন?

উত্তর: হিমু আফগান শাসক আদিল শাহের প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপতি ছিলেন।

প্রশ্ন-৪৪. কোন যুদ্ধের মাধ্যমে মুঘল-আফগান দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে?

উত্তর: ১৫৫৬ সালে পানি পথের দ্বিতীয় যুদ্ধের মাধ্যমে মুঘল আফগান দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে।

প্রশ্ন-৪৫. 'দ্বীন-ই-ইলাহি' কী?

উত্তর: 'দ্বীন-ই-ইলাহি' হলো মুঘল সম্রাট আকবর প্রবর্তিত একটি ধর্মমত।

প্রশ্ন-৪৬. সম্রাট আকবর দ্বীন-ই-ইলাহি প্রবর্তন করেন কত সালে?

উত্তর: ১৫৮২ সালে সম্রাট আকবর দ্বীন-ই-ইলাহি ধর্ম প্রবর্তন করেন।

প্রশ্ন-৪৭. দ্বীন-ই-ইলাহি ধর্মমত গ্রহণকারীর সংখ্যা কত?

উত্তর: দ্বীন-ই-ইলাহি ধর্মমত গ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল আঠারো জন।

প্রশ্ন-৪৮. সম্রাট আকবর তার সাম্রাজ্যকে কতটি সুবা বা প্রদেশে বিভক্ত করেন?

উত্তর: সম্রাট আকবর তার সাম্রাজ্যকে পনেরোটি সুবা বা প্রদেশে বিভক্ত করেন।

প্রশ্ন-৪৯. সম্রাট আকবর কত খ্রিষ্টাব্দে 'মনসবদারি প্রথা' চালু করেন?

উত্তর: সম্রাট আকবর ১৫৭৭ খ্রিষ্টাব্দে 'মনসবদারি প্রথা' চালু করেন।

প্রশ্ন-৫০. 'মনসব' শব্দের অর্থ কী? *[ম. বো., দি. বো. ২০২৫; সকল বোর্ড ২০১৬]*

উত্তর: 'মনসব' শব্দের পদ·বা মর্যাদা।

প্রশ্ন-৫১. মনসবদারি ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন কে?

উত্তর: মুঘল সম্রাট আকবর মনসবদারি ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

প্রশ্ন-৫২. কোন মুঘল সম্রাট 'মহামতি' উপাধি পেয়েছিলেন?

উত্তর: মুঘল সম্রাট আকবর মহামতি উপাধি পেয়েছিলেন।

প্রশ্ন-৫৩. 'আইন-ই-আকবরী' বা 'আকবরনামা' কে রচনা করেন? *[সকল বোর্ড ২০২৪]*

উত্তর: 'আইন-ই-আকবরী' বা 'আকবরনামা' রচনা করেন আবুল ফজল।

■ সম্রাট জাহাঙ্গীর: নূরজাহানের প্রভাব, চরিত্র ও কৃতিত্ব

প্রশ্ন-৫৪. A Child of many prayers বলা হয় কাকে?

উত্তর: মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরকে A Child of many prayers বলা হয়।

প্রশ্ন-৫৫. জাহাঙ্গীর শব্দের অর্থ কী?

উত্তর: জাহাঙ্গীর শব্দের অর্থ ভুবন বিজয়ী, পৃথিবীর অধিকারী।

প্রশ্ন-৫৬. 'Bell of Justice' বা ন্যায়বিচারের ঘণ্টা প্রবর্তন করেন কে?

উত্তর: সম্রাট জাহাঙ্গীর 'Bell of Justice' বা ন্যায়বিচারের ঘণ্টা প্রবর্তন করেন।

প্রশ্ন-৫৭. সম্রাট জাহাঙ্গীর কী উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন?

উত্তর: সম্রাট জাহাঙ্গীর 'নূরউদ্দিন মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাদশাহ গাজী' উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

প্রশ্ন-৫৮. জাহাঙ্গীরের প্রবর্তিত আইনবিধির নাম কী ছিল?

উত্তর: জাহাঙ্গীরের প্রবর্তিত আইনবিধির নাম ছিল 'দস্তুরুল আমল'।

প্রশ্ন-৫৯. জাহাঙ্গীরের প্রবর্তিত 'দস্তুরুল আমল' এর আইনবিধি ছিল কয়টি?

উত্তর: জাহাঙ্গীরের প্রবর্তিত 'দস্তুরুল আমল' এর ১২টি আইনবিধি ছিল।

প্রশ্ন-৬০. বার ভূঁইয়া কারা?

উত্তর: মুঘল আমলে বাংলার কয়েকজন স্বাধীনচেতা জমিদারকে বার ভূঁইয়া বলা হয়।

প্রশ্ন-৬১. কার নামানুসারে ঢাকার নাম 'জাহাঙ্গীরনগর' করা হয়েছিল?

উত্তর: সম্রাট জাহাঙ্গীরের নামানুসারে ঢাকার নাম 'জাহাঙ্গীরনগর' করা হয়েছিল।

প্রশ্ন-৬২. নূরজাহানের প্রকৃত নাম কী ছিল? *[ঢা. বো., ম. বো., দি. বো., চ. বো., সি. বো., ব. বো. ২০২২; সকল বোর্ড ২০১৫]*

উত্তর: নূরজাহানের প্রকৃত নাম ছিল মেহের-উন-নিসা।

প্রশ্ন-৬৩. নূরজাহান কোন মুঘল সম্রাটের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

উত্তর: নূরজাহান মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

প্রশ্ন-৬৪. শিল্পীদের রাজা বলা হতো কোন মুঘল সম্রাটকে?

উত্তর: সম্রাট জাহাঙ্গীরদেরকে শিল্পীদের রাজা বলা হতো।

প্রশ্ন-৬৫. সম্রাট জাহাঙ্গীরের রচিত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের নাম কী?

উত্তর: সম্রাট জাহাঙ্গীরের রচিত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের নাম 'তুযুক-ই-জাহাঙ্গীরী'।

■ সম্রাট শাহজাহান: স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ, পুত্রদের মধ্যকার উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব, চরিত্র ও কৃতিত্ব

প্রশ্ন-৬৬. সম্রাট শাহজাহানের পিতার নাম কী ছিল? */ঢা. বো., রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫; সকল বোর্ড ২০১৫/*
উত্তর: সম্রাট শাহজাহানের পিতার নাম জাহাঙ্গীর।

প্রশ্ন-৬৭. শাহজাহানের প্রকৃত নাম কী ছিল?
উত্তর: শাহজাহানের প্রকৃত নাম খুররম।

প্রশ্ন-৬৮. শাহজাহান শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: শাহজাহান শব্দের অর্থ জগতের অধীশ্বর।

প্রশ্ন-৬৯. সম্রাট শাহজাহানের কতজন পুত্র ছিল? */সকল বোর্ড ২০১৯/*
উত্তর: সম্রাট শাহজাহানের ৪ জন পুত্র ছিল।

প্রশ্ন-৭০. সম্রাট শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে কে সবচেয়ে যোগ্য ছিলেন?
উত্তর: সম্রাট শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে আওরঙ্গজেব সবচেয়ে যোগ্য ছিলেন।

প্রশ্ন-৭১. দারাশিকো কে ছিলেন?
উত্তর: দারাশিকো ছিলেন সম্রাট শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

প্রশ্ন-৭২. সম্রাট শাহজাহানের স্ত্রী কে ছিলেন?
উত্তর: সম্রাট শাহজাহানের স্ত্রী ছিলেন মমতাজ।

প্রশ্ন-৭৩. মমতাজের প্রকৃত নাম কী ছিল?
/দি. বো., কু. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০১৭/
উত্তর: মমতাজের প্রকৃত নাম ছিল আরজুমান্দ বানু বেগম।

প্রশ্ন-৭৪. 'Prince of Builders' বলা হয় কোন মুঘল সম্রাটকে?
উত্তর: মুঘল সম্রাট শাহজাহানকে।

প্রশ্ন-৭৫. তাজমহলের স্থপতি কে? */ম. বো. ২০২০/*
উত্তর: তাজমহলের স্থপতি ইরানের ওস্তাদ ঈসা সিরাজী।

প্রশ্ন-৭৬. তাজমহল নির্মাণ করেন কে?
/ম. বো., দি. বো. ২০২৫; ঢা. বো., রা. বো., চ. বো. ২০১৭/
উত্তর: মুঘল সম্রাট শাহজাহান তাজমহল নির্মাণ করেন।

প্রশ্ন-৭৭. মমতাজের উপাধি কী ছিল?
উত্তর: মমতাজের উপাধি ছিল 'মালিকা-ই-জামান।'

প্রশ্ন-৭৮. তাজমহল কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: তাজমহল ভারতের আগ্রায় যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত।

প্রশ্ন-৭৯. ময়ূর সিংহাসন নির্মাণ করেন কে?
উত্তর: মুঘল সম্রাট শাহজাহান ময়ূর সিংহাসন নির্মাণ করেন।

প্রশ্ন-৮০. কে ভারত থেকে ময়ূর সিংহাসন নিয়ে যান?
উত্তর: পারস্যের সম্রাট নাদির শাহ ভারত থেকে ময়ূর সিংহাসন নিয়ে যান।

প্রশ্ন-৮১. কার তত্ত্বাবধানে ময়ূর সিংহাসনটি নির্মিত হয়েছে?
উত্তর: শিল্পী বেবাদল খানের তত্ত্বাবধানে ময়ূর সিংহাসনটি নির্মিত হয়েছে।

■ সম্রাট আওরঙ্গজেব: দাক্ষিণাত্য নীতি, চরিত্র ও কৃতিত্ব

প্রশ্ন-৮২. মুঘল রাজবংশের সবশেষ সফল সম্রাট কে ছিলেন?
উত্তর: মুঘল রাজবংশের সবশেষ সফল সম্রাট ছিলেন আওরঙ্গজেব।

প্রশ্ন-৮৩. কোন মুঘল সম্রাটকে 'জিন্দাপির' বলা হয়?
উত্তর: মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবকে জিন্দাপির বলা হয়।

প্রশ্ন-৮৪. আওরঙ্গজেবের সাম্রাজ্য কয়টি সুবায় বিভক্ত ছিল?
উত্তর: আওরঙ্গজেবের সাম্রাজ্য ২১টি সুবায় বিভক্ত ছিল।

প্রশ্ন-৮৫. আওরঙ্গজেবের বিখ্যাত সেনাপতির নাম কী ছিল?
উত্তর: আওরঙ্গজেবের বিখ্যাত সেনাপতির নাম ছিল মীর জুমলা।

প্রশ্ন-৮৬. শায়েস্তা খানকে বাংলার সুবাদার নিয়োগ করেন কে?
উত্তর: সম্রাট আওরঙ্গজেব শায়েস্তা খানকে বাংলার সুবাদার নিয়োগ করেন।

প্রশ্ন-৮৭. বাংলায় আরাকানি মগ ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের দমন করেন কে?
উত্তর: সুবাদার শায়েস্তা খান বাংলায় আরাকানি মগ ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের দমন করেন।

প্রশ্ন-৮৮. কাকে পরাজিত করার মাধ্যমে বাংলায় মুঘল আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর: বারো ভূঁইয়া ঈশা খানের পুত্র উসমানকে পরাজিত ও নিহত করার মাধ্যমে বাংলায় মুঘল আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন-৮৯. কে চট্টগ্রামের নাম ইসলামাবাদ রাখেন?
উত্তর: সুবাদার শায়েস্তা খান চট্টগ্রামের নাম রাখেন ইসলামাবাদ।

প্রশ্ন-৯০. ভারতে মারাঠা অভ্যুত্থানের মহানায়ক কে ছিলেন?
উত্তর: ভারতে মারাঠা অভ্যুত্থানের মহানায়ক ছিলেন শিবাজি।

প্রশ্ন-৯১. আওরঙ্গজেবের কোন নীতি মুঘল সাম্রাজ্যের পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল?
উত্তর: আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি মুঘল সাম্রাজ্যের পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল।

■ মুঘল সাম্রাজ্যের পতন: কারণ ও ফলাফল

প্রশ্ন-৯২. সর্বশেষ মুঘল সম্রাটের নাম কী? */ম. বো. ২০২৩/*
উত্তর: সর্বশেষ মুঘল সম্রাটের নাম বাহাদুর শাহ জাফর।

প্রশ্ন-৯৩. পারস্যের কোন সম্রাট মুঘল সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন?
উত্তর: পারস্যের সম্রাট নাদির শাহ মুঘল সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন।

প্রশ্ন-৯৪. পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয় কত সালে?
উত্তর: পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১৭৬১ সালে।

প্রশ্ন-৯৫. পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠাদের পরাজিত করেন কে?
উত্তর: পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে নাদির শাহের সেনাপতি আহমদ শাহ আবদালি মারাঠাদের পরাজিত করেন।

প্রশ্ন-৯৬. সিপাহি বিদ্রোহ কত সালে সংঘটিত হয়?
উত্তর: ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়।

প্রশ্ন-৯৭. কখন মুঘল সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত পতন ঘটে?
উত্তর: সিপাহি বিদ্রোহের পর ১৮৫৮ সালে মুঘল সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত পতন ঘটে।

প্রশ্ন-৯৮. কাদের কাছে মুঘলদের চূড়ান্ত পতন ঘটে?
উত্তর: ইংরেজদের কাছে মুঘলদের চূড়ান্ত পতন ঘটে।

প্রশ্ন-৯৯. কোন সম্রাটকে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করা হয়?
উত্তর: সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফরকে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করা হয়।

■ মুঘল আমলের শাসন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা

প্রশ্ন-১০০. মুঘল কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রে কে ছিলেন?
উত্তর: মুঘল কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রে ছিলেন সম্রাট।

প্রশ্ন-১০১. মুঘল যুগে প্রধান বিচারপতিকে কী বলা হতো?
উত্তর: মুঘল যুগে প্রধান বিচারপতিকে বলা হতো কাজি-উল-কুজ্জাত।

প্রশ্ন-১০২. আকবরের সময় প্রধানমন্ত্রী পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির পদ কী ছিল?
উত্তর: আকবরের সময় প্রধানমন্ত্রী পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির পদ ভকিল (Vakil) ছিল।

প্রশ্ন-১০৩. মুঘল আমলে স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন ইউনিট কী ছিল?
উত্তর: মুঘল আমলে স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন ইউনিট ছিল গ্রাম প্রশাসন।

খ. অনুধাবনমূলক

প্রশ্ন-১. মুঘলদের পরিচয় দাও। *[ঢা. বো., রা. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫; সকল বোর্ড ২০১৮]*
উত্তর: ভারতে সম্রাট বাবর প্রতিষ্ঠিত রাজবংশটি 'মুঘল' রাজবংশ নামে পরিচিত।

'মোঙ্গ' শব্দ থেকে 'মোঙ্গল' শব্দের উৎপত্তি। মহাবীর চেঙ্গিস খান প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ ইতিহাসে মোঙ্গল নামে পরিচিত। এই মোঙ্গল শব্দ থেকে 'মুঘল' নামকরণ হয়েছে বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন। উল্লেখ্য যে, ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর ছিলেন মায়ের দিক থেকে মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খান, আর পিতার দিক থেকে চাঘতাই তুর্কি নেতা তৈমুর লঙের বংশধর। চেঙ্গিস-তৈমুরের বংশধর জহিরউদ্দিন মুহাম্মদ বাবরের ভারতে প্রতিষ্ঠিত রাজবংশটি 'মুঘল' নামে পরিচিতি লাভ করে।

প্রশ্ন-২. পানিপথের প্রথম যুদ্ধ কেন সংঘটিত হয়েছিল?
উত্তর: ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার উচ্চাকাঙ্ক্ষার কারণে সম্রাট বাবর এবং দিল্লির শাসনকর্তা ইব্রাহিম লোদির মধ্যে পানিপথের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

বাবর মধ্য এশিয়ায় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে তার উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার জন্য ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টি দেন। অপরদিকে ইব্রাহিম লোদির অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে দৌলত খান লোদি, আলম খান এবং অপরাপর আফগান আমির-ওমরাহ বাবরকে ভারতবর্ষ আক্রমণের আহ্বান জানান। তাই বাবর ভারতে অভিযান পরিচালনা করেন। এ প্রেক্ষিতে ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

প্রশ্ন-৩. পানিপথের প্রথম যুদ্ধের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো।
উত্তর: পানিপথের প্রথম যুদ্ধের ফলাফলের ভিত্তিতেই ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল।

পানিপথের প্রথম (১৫২৬ খ্রি.) যুদ্ধে সম্রাট বাবর লোদি বংশের শেষ শাসক ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এ যুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত মুঘল সাম্রাজ্য (১৫২৬-১৮৫৭ খ্রি.) পর্যন্ত সুদীর্ঘ তিন শতাব্দীকাল স্থায়ী হয়েছিল। যদিও বাবরকে এ যুদ্ধের পর আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ করতে হয়েছিল। পানিপথের প্রথম যুদ্ধে প্রথম কামানের ব্যবহার এবং গোলন্দাজ বাহিনী গঠন করা হয়।

প্রশ্ন-৪. পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবরের জয় লাভের কারণ কী? ব্যাখ্যা করো। *[সকল বোর্ড ২০১৫]*
উত্তর: ভারত উপমহাদেশে সাম্রাজ্য বিস্তারের অদম্য স্পৃহা ও অসামান্য নির্ভীকতা পানিপথের প্রথম যুদ্ধে (১৫২৬ খ্রি.) বাবরের জয় লাভের পেছনে বড় ভূমিকা রেখেছে।

তৎকালীন ভারত উপমহাদেশে ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যগুলোর মধ্যে অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলা অনায়াসে বাবরকে সাফল্য এনে দেয়। চীন দেশে আবিষ্কৃত বারুদের সাহায্যে বাবরের বাহিনী কামান ও গাদা বন্দুকের ব্যবহার করে সাফল্য নিশ্চিত করে। সর্বোপরি বাবর ছিলেন একজন বিজ্ঞ ও সুনিপুণ সেনাপতি। তার সৈন্যবাহিনী ছিল সুশৃঙ্খল, যা বিরোধী পক্ষের ইব্রাহিম লোদির বিশৃঙ্খল বাহিনীর বিরুদ্ধে সহজেই জয়লাভ করে।

প্রশ্ন-৫. খানুয়ার যুদ্ধকে ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকারী যুদ্ধ বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।
উত্তর: খানুয়ার যুদ্ধে ভারতে রাজপুতদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার আশা চিরতরে নির্মূল হয় বলেই এ যুদ্ধকে চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকারী যুদ্ধ বলা হয়।

পানিপথের প্রথম যুদ্ধ অপেক্ষা খানুয়ার যুদ্ধ ছিল নিঃসন্দেহে অধিক তাৎপর্যপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী। কেননা, পানিপথের যুদ্ধে দিল্লির নামমাত্র সুলতান ইব্রাহিম লোদির পরাজয় ঘটেছিল। কিন্তু খানুয়ার যুদ্ধে ভারতের শক্তিশালী রাজপুত সংঘের পরাজয় ঘটে এবং ভারতে রাজপুতদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। এ যুদ্ধের ফলে ভারতের সার্বভৌম ক্ষমতা রাজপুতদের হাত থেকে মুঘলদের কাছে স্থানান্তরিত হয়।

প্রশ্ন-৬. তুজুক-ই-বাবরি বা বাবরনামা কী? ব্যাখ্যা করো।
/ম. বো., দি. বো. ২০২৫; ঢা. বো., ম. বো., দি. বো., চ. বো., সি. বো., ব. বো. ২০২২; সকল বোর্ড ২০১৯; ২০১৬/

উত্তর: তুজুক-ই-বাবরি বা বাবরনামা তুর্কি ভাষায় রচিত মুঘল সম্রাট জহিরউদ্দিন মুহাম্মদ বাবরের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ।

বাবরনামা ইতিহাস অধ্যয়নে একটি আকরগ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। চমৎকার রচনাশৈলী, ভাষার মাধুর্য ও কারুকাজ, উন্নত বর্ণনারীতি এবং তথ্যের নির্ভরযোগ্যতার জন্য এ গ্রন্থটি পাঠক সমাজে প্রশংসা অর্জন করেছে। এ গ্রন্থে এশিয়া ও আফগানিস্তান বিশেষ করে সমকালীন ভারতের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। তাছাড়া এ গ্রন্থে বাবর তার ব্যক্তিজীবনের নানা দিক, তার দোষ-গুণ, সীমাবদ্ধতা-বিচক্ষণতা, সুখ-দুঃখ এবং সাফল্য-ব্যর্থতার কথা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন।

প্রশ্ন-৭. কীভাবে মুঘল-আফগান দ্বন্দ্বের শুরু হয়?

উত্তর: মুঘলদের সাম্রাজ্য বিস্তৃতিকে কেন্দ্র করে আফগানদের সাথে মুঘলদের দ্বন্দ্ব শুরু হয়।

পানিপথের প্রথম যুদ্ধের মধ্য দিয়ে মুঘল-আফগান দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। ১৫২৬ সালে বাবর আফগান সেনাপতি ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করেন। সম্রাট হুমায়ুনের সময় এ দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করে। পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে মুঘল সম্রাট আকবর বিজয় লাভ করেন এবং আফগানদের পরাজয় ঘটে। এর কিছুদিন পর আফগান শাসক ইব্রাহিম শুরের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শের শাহের প্রতিষ্ঠিত শুর বংশের পতন ঘটে এবং মুঘল-আফগান দ্বন্দ্বের অবসান হয়।

প্রশ্ন-৮. কে এবং কেন বাংলার নাম জান্নাতাবাদ রাখেন?

উত্তর: মুঘল সম্রাট হুমায়ুন বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে এর নাম রাখেন জান্নাতাবাদ।

প্রাচীনকাল থেকেই বাংলা ছিল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি। এদেশের সবুজ-শ্যামল প্রকৃতি বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করেছে। শের শাহের কাছ থেকে ১৫৩৮ সালে বাংলা পুনরুদ্ধারের জন্য সম্রাট হুমায়ুন এদেশে আগমন করেন। বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তিনি এর নাম দেন জান্নাতাবাদ।

প্রশ্ন-৯. কবুলিয়ত ও পাট্টা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো।
/ঢা. বো., রা. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫; সকল বোর্ড ২০২২; ২০১৬/

উত্তর: কবুলিয়ত ও পাট্টা বলতে ভূমির ওপর প্রজাদের স্বত্ব রক্ষার জন্য আফগান শাসক শের শাহের প্রবর্তিত এক অভিনব ব্যবস্থাকে বোঝায়।

পাট্টা ছিল জমির স্বত্ব (অধিকার) দলিল। জমির ওপর কৃষকের অধিকার স্বীকার করে সরকারের পক্ষ হতে কৃষকদের পাট্টা দেওয়া হতো। অন্যদিকে প্রদেয় করসহ ভূমিতে তার দায় ও কর্তব্য বর্ণনা করে কৃষক রাষ্ট্রকে কবুলিয়ত নামক দলিল সম্পাদন করে দিতেন।

প্রশ্ন-১০. গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড কী? সংক্ষেপে লেখো। */ম. বো., দি. বো. ২০২৫; ম. বো. ২০২৩; রা. বো., কু. বো., য. বো. ২০২২/*

উত্তর: আফগান শাসক শের শাহের সময়ে নির্মিত একটি ঐতিহাসিক মহাসড়ক এর নাম হলো গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড।

শের শাহ বহু সুন্দর ও প্রশস্ত রাস্তা নির্মাণ করেছিলেন। তার নির্মিত রাস্তাসমূহের মধ্যে প্রধান ছিল 'সড়ক-ই-আযম' বা গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড। এটি ছিল প্রায় ১৫০০ মাইল দীর্ঘ। এই রাস্তাটি পূর্ববঙ্গের সোনারগাঁ থেকে সিন্ধু নদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সাধারণ পথিককে সূর্যের উত্তাপ থেকে রক্ষার জন্য রাস্তার দু'ধারে ছায়াপ্রদ ও ফলদ গাছ লাগানো হয়েছিল। এছাড়া দু'ক্রোশ অন্তর মুসাফিরখানা ছিল।

প্রশ্ন-১১. দ্বীন-ই-ইলাহি কী? ব্যাখ্যা করো।
/ঢা. বো., রা. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫/

উত্তর: 'দ্বীন-ই-ইলাহি' মুঘল সম্রাট আকবরের প্রবর্তিত একটি নতুন ধর্মমত।

সম্রাট আকবর ১৫৮২ খ্রিষ্টাব্দে 'দ্বীন-ই-ইলাহি' নামে একটি নতুন ধর্মমত প্রবর্তন করেন। এটি ছিল একটি একেশ্বরবাদী ধর্ম। সকল ধর্মের ভালো ও উৎকৃষ্ট নীতিগুলো এতে সমন্বিত হয়েছিল। আকবরের প্রবর্তিত 'দ্বীন-ই-ইলাহি' ধর্মমতে কোনো নবি বা দেব-দেবীর অস্তিত্ব ছিল না। প্রতি রোববার সম্রাট নির্দিষ্ট আসনে বসে আগ্রহীদের দীক্ষা দিতেন। এ সময় দীক্ষা গ্রহণকারীকে সম্রাটের নামে ৪টি স্তরে ব্যক্তির জীবন, ধর্ম, সম্মান ও সম্পত্তি উৎসর্গ করতে হতো।

প্রশ্ন-১২. সম্রাট আকবরের হিন্দুদের প্রতি উদার নীতি গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: মুঘল সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা এবং স্থিতিশীল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সম্রাট আকবর হিন্দুদের প্রতি উদার নীতি গ্রহণ করেছিলেন।

বিচক্ষণ রাজনীতিকের মতো আকবর উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, স্থিতিশীল সাম্রাজ্য গঠনে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের সমর্থন অত্যন্ত প্রয়োজন। আর এ কারণেই আকবর তীর্থকর, জিজিয়া প্রভৃতি বৈষম্যমূলক কর রহিত করেন। এছাড়া হিন্দু মন্দির নির্মাণ, হিন্দুদের উৎসব পালনে স্বাধীনতা প্রদান, হিন্দু সমাজের কুপ্রথা দূরীকরণ প্রভৃতির মাধ্যমে আকবর হিন্দুদের সক্রিয় সমর্থন লাভ করেন। আর এভাবে তিনি একটি স্থিতিশীল বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করতে সক্ষম হন।

প্রশ্ন-১৩. পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ সম্পর্কে একটি টীকা লেখো।
/ম. বো., দি. বো. ২০২৫/

উত্তর: ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ মুঘলদের ইতিহাসে এক চূড়ান্ত ভাগ্য নিষ্পত্তিকারী যুদ্ধ হিসেবে পরিচিত। কারণ এ যুদ্ধের মাধ্যমে মুঘল-আফগান দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে।

পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে সম্রাট আকবর জয় লাভ করেন এবং আফগান সেনাপতি হিমু পরাজিত হন। ফলে আফগানদের হিন্দুস্থানে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার বাসনা চিরতরে নিভে যায় এবং ভারতে মুঘল-আফগান দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। এ যুদ্ধের ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং সাম্রাজ্য বিস্তারের পথ উন্মুক্ত ও প্রশস্ত হয়।

প্রশ্ন-১৪. মনসবদারি প্রথা বলতে কী বোঝায়? *[সকল বোর্ড ২০২৩; ঢা. বো., ম. বো., দি. বো., চ. বো., সি. বো., ব. বো. ২০২২; সকল বোর্ড ২০১৯; দি. বো., কু. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০১৭]*

উত্তর: মনসবদারি প্রথা বলতে সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের অব্যবস্থাপনা দূর করার লক্ষ্যে মুঘল সম্রাট আকবরের প্রবর্তিত একটি সামরিক সংস্কারকে বোঝায়।

সম্রাট আকবর সেনাবাহিনীতে নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য ১৫৭১ খ্রিষ্টাব্দে শাহবাজ খানকে মীর বকশী নিয়োগ করে একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। এটি মনসবদারি প্রথা হিসেবে পরিচিত। 'মনসব' শব্দের অর্থ পদ বা পদমর্যাদা। এ পদের অধিকারীকে 'মনসবদার' এবং সমগ্র ব্যবস্থাটিকে 'মনসবদারি প্রথা' বলা হয়। সর্বোচ্চ পর্যায়ের মনসবদার মোট দশ হাজার এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ে ১০ জন সৈন্য নিজেদের অধীনে রাখতে পারতেন।

প্রশ্ন-১৫. সম্রাট আকবরকে 'দ্য গ্রেট আকবর' বলা হয় কেন?

উত্তর: রাজ্য বিস্তার ও শাসন ব্যবস্থা আধুনিকীকরণে অসামান্য অবদানের জন্য সম্রাট আকবরকে 'দ্য গ্রেট আকবর' বলা হয়।

মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের ইতিহাসে সম্রাট আকবর ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক। তিনি যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন মুঘল সাম্রাজ্যের সীমা পাঞ্জাব, দিল্লি ও আগ্রার মধ্যে সীমাবন্ধ ছিল। কিন্তু তিনি তার সুদীর্ঘ ৫০ বছরের রাজত্বকালে মুঘল সাম্রাজ্য হিমালয় থেকে কৃষ্ণা নদী এবং হিন্দুকুশ থেকে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত বিস্তৃত এক বিশাল সাম্রাজ্যে রূপায়িত করেন। এছাড়া তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে রাজস্ব সংস্কার, শাসন সংস্কার, সেনাবাহিনী সংস্কার প্রভৃতির মাধ্যমে শাসন ব্যবস্থাকে সমৃদ্ধ ও সাম্রাজ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এসব কারণেই তাকে 'দ্য গ্রেট আকবর' বলা হয়।

প্রশ্ন-১৬. সম্রাট জাহাঙ্গীরের নাম সেলিম রাখার কারণ ব্যাখ্যা করো। *[সকল বোর্ড ২০১৫]*

উত্তর: বিখ্যাত সাধক শেখ সেলিম চিশতির নামানুসারে সম্রাট জাহাঙ্গীরের নাম সেলিম রাখা হয়।

সম্রাট জাহাঙ্গীর ছিলেন সম্রাট আকবরের পুত্র। একাধিক শিশু সন্তানের মৃত্যু হওয়ায় উত্তরাধিকার হিসেবে পুত্রসন্তান লাভের আশায় সম্রাট আকবর প্রতি বছর আজমিরে হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতির দরগাহ জিয়ারত করে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতেন। একই উদ্দেশ্যে সম্রাট প্রতি সপ্তাহে ফতেহপুর সিক্রির বিখ্যাত সাধক শেখ সেলিম চিশতির খানকাহ্তে যেতেন। পরবর্তী ১৫৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ আগস্ট রানি যোধবাঈ-এর গর্ভে এক সন্তানের জন্ম হয়। আর শেখ সেলিম চিশতির নামানুসারে এ পুত্রের নাম রাখা হয় সেলিম।

প্রশ্ন-১৭. 'দস্তুরুল আমল' কী? ব্যাখ্যা করো। *[ম. বো. ২০২৩]*

উত্তর: শাসনব্যবস্থায় অনাচার রোধ এবং শৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা রক্ষায় মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর ১২টি বিধি জারি করেন, যা 'দস্তুরুল আমল' নামে পরিচিত।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় (শাসনকাল: ১৬০৫-১৬২৭ খ্রি.) সাম্রাজ্যে নানা ধরনের বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দিয়েছিল, যা জনমনে ভীতি সৃষ্টি করেছিল। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে তিনি কিছু আইনি বিধান চালু করেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে— বিভিন্ন ধরনের শুল্ক রহিতকরণ, মাদকদ্রব্য তৈরি ও বিক্রয় নিষিদ্ধকরণ, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকারি নির্ণয়, চুরি ও ডাকাতি বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা, রবিবারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে পশুহত্যা নিষিদ্ধকরণ ইত্যাদি। জাহাঙ্গীর এসব আইন জারি করে ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় দেন।

প্রশ্ন-১৮. সম্রাট শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে সংঘটিত উত্তরাধিকার যুদ্ধের প্রধান কারণটি ব্যাখ্যা করো। *[ঢা. বো., রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৩; সকল বোর্ড ২০১৫]*

উত্তর: সম্রাট শাহজাহানের জীবদ্দশায় তার চার পুত্রের মধ্যে যে সংঘর্ষ হয় তার প্রথম কারণ ছিল মুঘল সাম্রাজ্যে সুষ্ঠু ও সুনির্দিষ্ট উত্তরাধিকার নীতির অভাব।

মুঘল সম্রাট হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর এবং শাহজাহান তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে যুদ্ধ করে সিংহাসন লাভ ও সংরক্ষণ করেন। আবার শাহজাদা সেলিম ও শাহজাদা খুররম মুঘল সিংহাসনে সমাসীন হওয়ার পূর্বে তাদের পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এভাবে মুঘল সাম্রাজ্যে যারা অধিষ্ঠিত হয়েছেন, প্রত্যেকেই সংঘাতের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা লাভ করেছেন। সুতরাং, মুঘল সিংহাসনকে কেন্দ্র করে ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব অথবা পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মূল কারণ ছিল সুষ্ঠু উত্তরাধিকার নীতির অভাব।

প্রশ্ন-১৯. উত্তরাধিকার যুদ্ধে আওরঙ্গজেবের সাফল্যের কারণ ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: উত্তরাধিকার যুদ্ধে আওরঙ্গজেবের সাফল্যের কারণ তার যোগ্যতা।

সম্রাট শাহজাহানের চার পুত্রের মধ্যে আওরঙ্গজেব ছিল সবার থেকে যোগ্য। কিন্তু সম্রাট স্নেহের বশে তাকে উপেক্ষা করে দারাকে বেশি প্রাধান্য দেন। যা উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বের সূচনা করে যা পরবর্তীতে যুদ্ধে রূপ নেয়। এ যুদ্ধে দারার সেনাবাহিনী অপেক্ষা আওরঙ্গজেবের সেনাবাহিনী ছিল রণনিপুণ এবং সুশৃঙ্খল। তার সেনাপতিরাও শ্রেষ্ঠ ছিল। এভাবেই কূটনীতি, রাজনীতি ও সমরণীতিতে নিজ যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে উত্তরাধিকার যুদ্ধে আওরঙ্গজেবের সাফল্য লাভ করেছিল।

প্রশ্ন-২০. ময়ূর সিংহাসন কী? ব্যাখ্যা করো।

[ম. বো., দি. বো. ২০২৫; সকল বোর্ড ২০১৯]

উত্তর: পৃথিবী বিখ্যাত ময়ূর সিংহাসন মুঘল সম্রাট শাহজাহানের নির্মিত অনুপম শিল্পকীর্তির অন্যতম নিদর্শন।

শিল্পী বেবাদল খানের তত্ত্বাবধানে প্রায় ৮ কোটি টাকা ব্যয়ে সাত বছরে ময়ূর সিংহাসনটি নির্মিত হয়েছিল। সিংহাসনের স্বর্ণনির্মিত চারটি স্তম্ভের ওপর একটি কারুকার্যমণ্ডিত চন্দ্রাতপ ছিল। প্রতিটি স্তম্ভ শীর্ষে মুখোমুখি বসানো একজোড়া ময়ূর স্থাপন করা হয়েছিল। এদের মাঝখানে ছিল বহু মূল্যবান মণিমুক্তা খচিত ফলবান বৃক্ষ। সিংহাসনে ওঠার জন্য মণিমুক্তা খচিত তিনধাপ বিশিষ্ট একটি সিঁড়ি ছিল। এটি দৈর্ঘ্যে সাড়ে তিন গজ, প্রস্থে আড়াই গজ এবং উচ্চতায়

ছিল ৫ গজ। অনিন্দ্যসুন্দর ও মূল্যবান এ ময়ূর সিংহাসনটি সম্রাট শাহজাহানের সৌন্দর্য জ্ঞান ও ঐশ্বর্যের উজ্জ্বলতম নিদর্শন। ১৭৩৯ খ্রিষ্টাব্দে পারস্যের নাদির শাহ ভারত আক্রমণকালে ময়ূর সিংহাসনটি নিয়ে যান এবং পরে তা হারিয়ে যায়।

প্রশ্ন-২১. কোন সম্রাটের আমলে মুঘল স্থাপত্য স্বর্ণযুগে উপনীত হয়?

উত্তর: সম্রাট শাহজাহানের শাসনকালে মুঘল স্থাপত্য স্বর্ণযুগে উপনীত হয়।

'স্থাপত্যের রাজপুত্র' হিসেবে খ্যাত সম্রাট শাহজাহানের শাসনামলেই মুঘল স্থাপত্য শিল্প সাফল্যের স্বর্ণশিখরে উন্নিত হয়। কেননা শাহজাহানই জগদ্বিখ্যাত আগ্রার তাজমহল, মতি মসজিদ, জামে মসজিদ, ময়ূর সিংহাসন, আগ্রার খাস মহল, শীশমহল, দিল্লির দিওয়ান-ই-আম, দিল্লির দিওয়ান-ই-খাস এবং দিল্লির উপকণ্ঠে শাহজানাবাদ নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। অন্য কোনো মুঘল শাসকের শাসনামলে এতো বেশি স্থাপত্য নির্মিত হয়নি। তাই বলা যায়, শাহজাহানের শাসনামলেই মুঘলদের স্থাপত্যের স্বর্ণযুগের সূচনা ঘটে।

প্রশ্ন-২২. তাজমহল কী? ব্যাখ্যা করো। *[ঢা. বো., রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৩]*

উত্তর: সম্রাট শাহজাহানের নির্মিত মুঘল স্থাপত্যশৈলীর আকর্ষণীয় নিদর্শন হলো ভারতের আগ্রায় অবস্থিত তাজমহল।

মমতাজ ছিলেন সম্রাট শাহজাহানের প্রিয়তমা স্ত্রী। মমতাজের আকস্মিক মৃত্যুতে শাহজাহান ভেঙে পড়েন। তিনি তার প্রিয়তমা স্ত্রীর স্মৃতি মনেপ্রাণে ধরে রাখার জন্য যমুনা নদীর তীরে এক স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেন। এটা মমতাজের সমাধির ওপর নির্মিত হয় ও তার নামানুসারে এর নামকরণ হয় 'তাজমহল'। ১৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে তাজমহল নির্মাণের কাজ আরম্ভ এবং ১৬৫৩ খ্রিষ্টাব্দে এর কাজ সমাপ্ত হয়। ২০ হাজার লোকের ২২ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে তিন কোটি মুদ্রা ব্যয়ে তাজমহলের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছিল।

প্রশ্ন-২৩. সম্রাট শাহজাহানকে 'The Prince of Builders of Engineer King' বলা হয় কেন?

উত্তর: স্থাপত্যশিল্পের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করার কারণে সম্রাট শাহজাহানকে 'The Prince of Builders of Engineer King' বলা হয়।

সম্রাট শাহজাহান ছিলেন সৌন্দর্যপিপাসু এবং শিল্পীমনের মানুষ। সাম্রাজ্যের প্রাচুর্য থাকায় সম্রাট ললিতকলা বিশেষ করে স্থাপত্যশিল্পের অনবদ্য অবদান রেখেছেন। আর তা শুধু তার রাজত্বকালকেই নয় প্রকারান্তরে মুঘল যুগকেই উজ্জ্বল করেছে। তার উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যগুলো হলো- মতি মসজিদ, শীষ মহল, লালকেল্লা দুর্গ, তাজমহল, দিউয়ান-ই-খাস ইত্যাদি।

প্রশ্ন-২৪. কাকে, কেন 'A Child of Many Prayers' বলা হয়?

উত্তর: বহু সাধনার ফলে সম্রাট জাহাঙ্গীরের জন্ম হওয়ায় তাকে 'A Child of Many Prayers' বলা হয়।

কথিত আছে যে, পুত্র সন্তান লাভের আশায় সম্রাট আকবর প্রতিবছর আজমিরে হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতির দরগাহ জিয়ারত করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতেন। একই উদ্দেশ্যে সম্রাট প্রতি সপ্তাহে ফতেহপুর সিক্রির বিখ্যাত সাধক শেখ সেলিম চিশতির খানকাহতে যেতেন। ধারণা মতে, সেলিম চিশতির দোয়ার ফলে সম্রাট জাহাঙ্গীরের জন্ম হয়। বহু সাধনার পরে তার জন্ম হওয়ায় তাকে 'A Child of Many Prayers' বলা হয়।

প্রশ্ন-২৫. আওরঙ্গজেবকে জিন্দাপির বলা হয় কেন? *[ম. বো., দি. বো. ২০২৫; রা. বো., কু. বো., য. বো. ২০২২; ঢা., রা., চ. বো. ২০১৭]*

উত্তর: ইসলামি অনুশাসনের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান হওয়ায় মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবকে জিন্দাপির বলা হতো।

সম্রাট আওরঙ্গজেব ছিলেন খাঁটি সুন্নি মুসলমান। ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামের বিধি-বিধান পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মেনে চললেও তিনি পরধর্মের প্রতি সহিষ্ণু ছিলেন। আকবরের শাসনামলে ধর্মের বন্ধন অত্যন্ত শিথিল হয়ে পড়েছিল। আওরঙ্গজেব তা মজবুত করেন। এটা করতে গিয়ে হিন্দুদের কাছে অপ্রিয় হলেও মুসলমানদের কাছ থেকে তিনি 'জিন্দাপির' উপাধি লাভ করেন।

প্রশ্ন-২৬. আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতির ফলাফল কী ছিল?

উত্তর: সম্রাট আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতির চূড়ান্ত ফলাফল হলো, এটি মুঘল সাম্রাজ্যের পতনকে ত্বরান্বিত করে।

দাক্ষিণাত্য (দক্ষিণ ভারত) মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হওয়ার পর সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে তার ওপর আধিপত্য কায়েম রাখা সম্ভব ছিল না। সুদীর্ঘ ২৬ বছর ক্রমাগত দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধের ফলে রাজকোষ শূন্য হয়ে পড়ে। রাজধানীতে সম্রাটের দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির ফলে উত্তর ও মধ্য প্রদেশে মুঘল শাসনব্যবস্থা শিথিল হয়ে পড়ে। শিখ ও জাঠগণ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এককথায়, আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি মুঘল সাম্রাজ্যের পক্ষে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

প্রশ্ন-২৭. মারাঠা কারা? তাদের পরিচয় দাও।

উত্তর: ভারতের মহারাষ্ট্রের অধিবাসীরা মারাঠা নামে পরিচিত।

মারাঠারা ছিল অসীম সাহসী, পরিশ্রমী ও আত্মনির্ভরশীল। তাদের ছিল অপরিসীম তেজ ও কর্মশক্তি। মুম্বাই, কোঙ্কন, খান্দেশ ও বেরা ছিল তাদের আবাসস্থল। তাদের আবাসস্থলকে একসাথে মারাঠাবাদ বলে অভিহিত করা হতো। মারাঠাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের নাম ছিল মহারাষ্ট্র। মারাঠারা সুলতান আলাউদ্দিনের শাসনামলে নিজেদের স্বাধীনতা হারায়।

? অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ভারত উপমহাদেশে মুঘল বংশের গোড়াপত্তন করেন কে?
ক. বাবর খ. হুমায়ুন
গ. আকবর ঘ. জাহাঙ্গীর

২. কত সালে ভারতবর্ষে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক. ১৫২৯ খ. ১৭২৯
গ. ১৫২৬ ঘ. ১৭৭৬

৩. মুঘল সাম্রাজ্যের শাসনকাল কোনটি?
ক. ১৫২৬-১৮৫৭ খ. ১৫২৮-১৮৩৮
গ. ১৫৪০-১৮৬৬ ঘ. ১৫৫০-১৮৯৯

৪. জন্মগতভাবে মুঘলরা কোথাকার অধিবাসী?
ক. মধ্য এশিয়া খ. মধ্য প্রাচ্য
গ. দূর প্রাচ্য ঘ. দক্ষিণ এশিয়া

৫. বাবরের ভারত অভিযানের অন্যতম কারণ ছিল—
ক. ইসলাম প্রচার খ. হিন্দুদের দমন
গ. মধ্য এশিয়ায় ব্যর্থতা ঘ. ধন-সম্পদ অর্জন

৬. কোন যুদ্ধে প্রথম কামান ব্যবহার করা হয়?
ক. তরাইনের প্রথম যুদ্ধ খ. তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ
গ. পানিপথের প্রথম যুদ্ধ ঘ. পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ

৭. 'তুযুক-ই-বাবুরি কার প্রণীত গ্রন্থ?
ক. হুমায়ুন খ. বাবর
গ. আকবার ঘ. শের শাহ

৮. কত বছর পর হুমায়ুন তার রাজত্ব পুনরায় দখল করেন?
ক. ১২ বছর খ. ১৪ বছর
গ. ১৫ বছর ঘ. ১৮ বছর

৯. গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড কে নির্মাণ করেন?
ক. শের শাহ খ. আকবর
গ. মুহাম্মদ বিন তুঘলক ঘ. জাহাঙ্গীর

১০. ভারতীয় উপমহাদেশে ঘোড়ার ডাকের প্রচলন করেন কে?
ক. আকবর খ. শের শাহ
গ. আলাউদ্দিন খলজি ঘ. মুহাম্মদ বিন তুঘলক

১১. শের শাহের পরবর্তী শাসক কে ছিলেন?
ক. ইসলাম শাহ খ. ফিরোজ শাহ
গ. আদিল শাহ ঘ. শিকান্দার শাহ

১২. শের শাহের সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম শাসন ইউনিট কোনটি?
ক. গ্রাম খ. ইউনিয়ন
গ. পৌরসভা ঘ. মহল্লা

১৩. মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে?
ক. বাবর খ. আকবর
গ. জাহাঙ্গীর ঘ. আওরঙ্গজেব

১৪. মনসবদারি প্রথা সম্রাট আকবরের কোন ধরনের সংস্কার?
ক. সামরিক খ. অর্থনৈতিক
গ. ধর্মীয় ঘ. সাংস্কৃতিক

১৫. মনসবদারি ব্যবস্থা কোন সম্রাট প্রবর্তন করেছিলেন?
ক. বাবর খ. হুমায়ুন
গ. আকবর ঘ. শাহজাহান

১৬. পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ কত খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়?
ক. ১৫২৬ খ. ১৫৫০
গ. ১৫৫৬ ঘ. ১৫৬১

১৭. ঢাকা সর্বপ্রথম কত খ্রিষ্টাব্দে বাংলার রাজধানী হয়?
ক. ১৬১০ খ. ১৬১২
গ. ১৬১৪ ঘ. ১৬১৬

১৮. দস্তুরুল আমল কে জারি করেন?
ক. সম্রাট আওরঙ্গজেব খ. সম্রাট জাহাঙ্গীর
গ. সম্রাট আকবর ঘ. সম্রাট বাবর

১৯. কোন সম্রাটকে The Prince of Builders বলা হয়?
ক. সম্রাট হুমায়ুন খ. সম্রাট আকবর
গ. সম্রাট জাহাঙ্গীর ঘ. সম্রাট শাহজাহান

২০. তাজমহল কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
ক. পদ্মা খ. যমুনা
গ. মেঘনা ঘ. ব্রহ্মপুত্র

২১. সম্রাট আওরঙ্গজেব কেন প্রজাকল্যাণকামী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন?
ক. জনদুর্ভোগ লাঘব করার জন্য
খ. উপঢৌকন প্রাপ্তির আশায়
গ. সম্মান পাওয়ার আশায়
ঘ. খ্যাতি ও যশ লাভের আশায়

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন

২২. 'তুযুক-ই-বাবরি' একটি—
i. ঐতিহাসিক গ্রন্থ ii. আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ
iii. কাব্যগ্রন্থ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২৩. কনৌজের যুদ্ধে শের শাহের জয়লাভের ফলে—
i. হুমায়ুন ভারতবর্ষ ত্যাগ করতে বাধ্য হন
ii. শের শাহ দিল্লির সিংহাসন দখল করেন
iii. আফগানরা ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২৪. সম্রাট আকবরের রাজপুত নীতির তাৎপর্য ছিল—
i. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বৃদ্ধি
ii. হিন্দু-মুসলিম সমন্বয় সাধন
iii. সাম্রাজ্যে শান্তি বিধান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৫ ও ২৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
বিখ্যাত তুর্কি নৌ অধ্যক্ষ সিদি আলী রইস তার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে বিভিন্ন রাজবংশ ও শাসনপ্রণালী ছাড়াও অনেক সাধারণ ঘটনা অসাধারণভাবে তুলে ধরেছেন। তার রচনায় বিভিন্ন জনপথ, প্রকৃতি, জীবজন্তু, ফলমূল ছাড়াও সাধারণ মানুষের জীবনচিত্র ফুটে উঠেছে।

২৫. উদ্দীপকে বর্ণিত সিদি আলী রইসের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের মতো কোন মুঘল সম্রাট আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ লিখেছেন?
ক. বাবর খ. শাহজাহান
গ. আজিমুশশান ঘ. শাহ আলম

২৬. উক্ত মুঘল সম্রাটের রচনায় ভারতীয়দের যেসব বিষয় তুলে ধরা হয়েছে—
i. প্রকৃতি, জীবজন্তু, ফলমূল ও খাদ্যশস্য সম্বন্ধে
ii. আর্থ-সামাজিক অবস্থা
iii. রাজনৈতিক উত্থান-পতন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৭ ও ২৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
পারস্যের শাসক গাজান খানের রাজ্যবিস্তার অপেক্ষা সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রতি অধিক নজর ছিল। তার আগে কৃষকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত কর আদায় করা হতো। অত্যাচারিত হবার ভয়ে সাধারণ প্রজারা খাজনা আদায়কারীদের আগমনের খবরে ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যেত। এ অবস্থার প্রতিকারকল্পে গাজান খান চাষোপযোগী জমি জরিপ করে কর নির্ধারণ করেন। এতে জনমনে স্বস্তি ফিরে আসে।

২৭. উদ্দীপকে শুর বংশের কোন শাসকের কাজের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়?
ক. শের শাহ খ. ইসলাম শাহ
গ. ফিরোজ শাহ ঘ. আদিল শাহ

২৮. উক্ত শাসকের এ ধরনের কাজের ফলে—
i. অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটে
ii. রাজকর্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়
iii. কৃষকেরা অভূতপূর্ব উৎসাহ লাভ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৯ ও ৩০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
বিখ্যাত মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খান তার সেনাবাহিনীকে পিরামিডের মতো ক্রমধাপে বিন্যস্ত করে পদ ও মর্যাদার বিভিন্ন ধাপ সৃষ্টি করেন। সামরিক বাহিনীতে শৃঙ্খলা ও অধীনদের নিয়ন্ত্রণ করে সাম্রাজ্য বিস্তার ও রক্ষা করার জন্য তার এরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল।

২৯. উদ্দীপকে চেঙ্গিস খানের সামরিক ব্যবস্থার সাথে কোন মুঘল সম্রাটের সামরিক ব্যবস্থার সাদৃশ্য রয়েছে?
ক. বাবর খ. হুমায়ুন
গ. আকবর ঘ. জাহাঙ্গীর

৩০. উদ্দীপকে বর্ণিত সামরিক ব্যবস্থা মুঘল ভারতে পরিচিত ছিল—
i. জায়গির নামে
ii. মনসবদারি নামে
iii. দাগ ও চেহরা নামে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i ও ii

খ. বোর্ড পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৩১. মুঘল শাসকগণ কত বছর ভারত শাসন করেন? /সকল বোর্ড ২০২৫/
ক. দুইশত বছর খ. তিনশত বছর
গ. চারশত বছর ঘ. পাঁচশত বছর

৩২. কত খ্রিস্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল? /সকল বোর্ড ২০১৭/
ক. ১৫২৬ খ. ১৫২৭
গ. ১৫৩০ ঘ. ১৫৫৬

৩৩. ভারতের ইতিহাসে কে সর্বপ্রথম কামানের ব্যবহার করেন? /সকল বোর্ড ২০২২/
ক. সুলতান মাহমুদ খ. মুহাম্মদ ঘুরি
গ. ইব্রাহিম লোদি ঘ. সম্রাট বাবর

৩৪. বাবর কাদের আমন্ত্রণে ভারতীয় উপমহাদেশে অভিযান পরিচালনা করেন? /সকল বোর্ড ২০২৩/
ক. আলম খান ও দৌলত খান
খ. আলম খান ও তাজ খান
গ. দৌলত খান ও দাউদ খান
ঘ. তাজ খান ও ইসা খান

৩৫. বাবর তার আত্মজীবনী কোন ভাষায় লিখেছেন? /সকল বোর্ড ২০২৫; ২০১৯/
ক. ফারসি খ. তুর্কি
গ. হিন্দি ঘ. ইংরেজি

৩৬. কোন মুঘল সম্রাট বাংলার নাম রাখেন 'জান্নাতাবাদ'? /সকল বোর্ড ২০১৬/
ক. বাবর খ. হুমায়ুন
গ. আকবর ঘ. শাহজাহান

৩৭. শের শাহের প্রকৃত নাম ছিল— /সকল বোর্ড ২০২২; ২০১৯/
ক. হাসান খ. ইব্রাহিম
গ. ফরিদ ঘ. ফজল

৩৮. শের শাহের সাম্রাজ্য কয়টি সরকারে বিভক্ত ছিল? /সকল বোর্ড ২০২৩/
ক. ৫০ খ. ৪৭
গ. ৪০ ঘ. ৩৭

৩৯. শের শাহ মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দেন— /সকল বোর্ড ২০১৭/
ক. রাজস্ব সংস্কারে খ. স্থাপত্য শিল্পের বিকাশে
গ. পুলিশ বিভাগের উন্নয়নে ঘ. শিক্ষার উন্নয়নে

৪০. মনসব শব্দের অর্থ কী? *[সকল বোর্ড ২০২৫]*
ক. পদ বা মর্যাদা খ. প্রদেশ
গ. সরকার ঘ. সিংহাসন

৪১. সম্রাট জাহাঙ্গীর কেন 'Bell of Justice' টাঙিয়ে দেন? *[সকল বোর্ড ২০২৩]*
ক. আজান দেওয়ার জন্য
খ. সম্রাটের ফরমান ঘোষণা করতে
গ. রাজস্ব আদায়ের আপডেট নিতে
ঘ. নিরীহ প্রজাদের অভিযোগ শুনতে

৪২. 'দস্তুরুল আমল' -এ কয়টি আদেশ সন্নিবেশিত হয়? *[সকল বোর্ড ২০২২; ২০১৮]*
ক. ১১ খ. ১২
গ. ১৩ ঘ. ১৫

৪৩. নূরজাহানের প্রকৃত নাম কী? *[সকল বোর্ড ২০২২; ২০১৬]*
ক. মেহের-উন-নিসা খ. লাডলী বেগম
গ. নূর মহল ঘ. আরজুমান্দ বানু

৪৪. কোন মুঘল সম্রাটকে জিন্দাপির বলা হয়? *[সকল বোর্ড ২০১৬]*
ক. বাবর খ. আকবর
গ. শাহজাহান ঘ. আওরঙ্গজেব

৪৫. মুঘল ও আফগানরা ভারতবর্ষে এসেছিল— *[সকল বোর্ড ২০১৯]*
i. ভারতবর্ষে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য
ii. ভাগ্য পরিবর্তনের আশায়
iii. লুটতরাজ করার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪৬. পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবরের সাফল্যের কারণ— *[সকল বোর্ড ২০২৩]*
i. বাবরের উচ্চাশা
ii. কামান ও গোলা বারুদের ব্যবহার
iii. অদম্য সাহস
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪৭. বাদশাহ হুমায়ুনকে ভাগ্যবিড়ম্বিত বলার কারণ— *[সকল বোর্ড ২০২৫]*
i. পিতার অকাল মৃত্যু
ii. পা পিছলে নিজের মৃত্যু
iii. ভিস্তিওয়ালার সাহায্য গ্রহণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪৮. ১৫৩৯ খ্রিষ্টাব্দে একটি যুদ্ধে মুঘল সম্রাট হুমায়ুন পরাজিত হয় এবং পালাতে গিয়ে গঙ্গা নদীতে ডুবে মরার উপক্রম হয়। এ যুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কিত হলো— *[সকল বোর্ড ২০২৩; ২০১৬]*
i. চৌসার যুদ্ধ
ii. বিলগ্রামের যুদ্ধ
iii. শের খানের শের শাহ উপাধি লাভ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪৯. আকবরের ধর্মনীতির কারণ ছিল— *[সকল বোর্ড ২০১৮]*
i. আধ্যাত্মিক অনুসন্ধিৎসা
ii. পরধর্মসহিষ্ণুতা
iii. গৃহশিক্ষক আবদুল লতিফের প্রভাব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫০. সম্রাট আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্য নীতি গ্রহণ করেছিলেন, কারণ— *[সকল বোর্ড ২০২২]*
i. বিজাপুর ও গোলকুন্ডা রাজ্য মুঘল সাম্রাজ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ ছিল
ii. শিবাজির নেতৃত্বে মারাঠা জাতির উত্থানে ভবিষ্যৎ ক্ষতির আশঙ্কা ছিল
iii. অর্থনৈতিকভাবে সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী করার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ৫১ ও ৫২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

নুসরাত গল্প শুনতে ভালোবাসে। এই গল্পের ছলে সে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারে। যে যুদ্ধের মাধ্যমে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, সে যুদ্ধে জয়লাভের কারণ, ঘটনা, ফলাফল ইত্যাদি আরো সুন্দর করে জানার জন্য সে পাঠাগারে যায় এবং এ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। *[সকল বোর্ড ২০১৬]*

৫১. উদ্দীপকে যে যুদ্ধের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে—
ক. পানিপথের প্রথম যুদ্ধ খ. পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ
গ. চৌসার যুদ্ধ ঘ. পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ

৫২. উদ্দীপকে উল্লিখিত যুদ্ধটির যৌক্তিক ফলাফল—
i. দিল্লি সালতানাতের পতন
ii. মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা
iii. লোদি বংশ প্রতিষ্ঠা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৫৩ ও ৫৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

বর্তমান সরকার এল.জি.এস.পি প্রোগ্রামের আওতায় গ্রাম উন্নয়নের জন্য প্রত্যেকটি ইউনিয়নের আওতাধীন গ্রামগুলোকে একটি আলাদা আলাদা প্রশাসনিক ইউনিটে বিভক্ত করেছেন। ফলে একদিকে গ্রামগুলোর উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে এবং ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমেও গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। *[সকল বোর্ড ২০১৫]*

৫৩. উদ্দীপকে উল্লেখিত ব্যবস্থা ভারতবর্ষের কোন শাসক গ্রহণ করেছিলেন?
ক. ফিরোজ শাহ খ. শের শাহ
গ. ইব্রাহিম খাঁ ঘ. ইসলাম খাঁ

৫৪. উক্ত শাসকের এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্য ছিল—
i. সুষ্ঠু শাসন প্রণয়ন
ii. জনমঙ্গল সাধন
iii. আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৫৫ ও ৫৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

মধ্যগড়ের রাজা ভূমি সংস্কারের অংশ হিসেবে প্রজাদের জমির মালিকানা সত্ত্ব স্বীকার করে তাদের দলিল প্রদান করেন এবং প্রজারাও নিয়মিত খাজনা প্রদান করবেন মর্মে অঙ্গীকারনামা দেন। *[সকল বোর্ড ২০২২]*

৫৫. উদ্দীপকের ভূমি সংস্কার কোন শাসকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?
ক. বাবর খ. শের শাহ
গ. আকবর ঘ. জাহাঙ্গীর

৫৬. উক্ত শাসক ছিলেন—
i. একজন সাহসী বীর
ii. সমরকুশলী সেনানায়ক
iii. একজন সুদক্ষ শাসক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ৫৭ ও ৫৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

বাংলা নববর্ষসহ বিভিন্ন লোকজ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্ম ও জাতিগোষ্ঠীর মানুষ একাত্ম হয়ে আনন্দ-উৎসব করে থাকে। এতে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি আরও সুন্দর হয়। রাষ্ট্র এক্ষেত্রে নিরাপত্তা রক্ষার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। *[সকল বোর্ড ২০২৫]*

৫৭. উদ্দীপকে উল্লেখিত সম্প্রীতির এই সম্পর্কটি কোন মুঘল সম্রাটের সময় বেশি পরিলক্ষিত হয়?
ক. বাবর খ. আকবর
গ. শাহজাহান ঘ. আওরঙ্গজেব

৫৮. উদ্দীপক ও পাঠ্যবইয়ের উক্ত সম্প্রীতির ফলে—
i. সহনশীলতা বৃদ্ধি পাবে
ii. জননিরাপত্তা বাড়বে
iii. শাসকের অবস্থান সুদৃঢ় থাকবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ৫৯ ও ৬০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

সম্রাট ইব্রাহীম তার রাজ্যের সকল ধর্মাবলম্বীকে একই পতাকাতলে আনার জন্য একটি ধর্মমত প্রচার করেন। কিন্তু ধর্মমতটি জনগণের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে না পারায় তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে এ ধর্মমতটির পরিসমাপ্তি ঘটে। *[সকল বোর্ড ২০১৬]*

৫৯. সম্রাট ইব্রাহীম কার পরিচয় বহন করছে?
ক. বাবরের খ. আকবরের
গ. হুমায়ুনের ঘ. জাহাঙ্গীরের

৬০. সম্রাট ইব্রাহীমের প্রণীত ধর্মমতের সাথে নিচের কোন ধর্মমতটির সাদৃশ্য রয়েছে?
ক. সুলহ-ই-কূল খ. দীন-ই-ইলাহি
গ. দীন-ই-ইসলাম ঘ. দস্তুরুল আমল-ই-দীন

উদ্দীপকটি পড়ে ৬১ ও ৬২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

ব্যবসা-বাণিজ্য করতে গিয়ে ফরাসিরা একসময় মরক্কোর একজন উদার শাসকের নিকট থেকে বিনা শুল্কে বাণিজ্য সুবিধা লাভ করে। আর তারই ধারাবাহিকতায় একদিন পরবর্তী দুর্বল শাসকদের উৎখাত করে ফরাসিরা মরক্কোর শাসন ক্ষমতা দখল করে নেয়। *[সকল বোর্ড ২০২৫]*

৬১. উদ্দীপকের উদার শাসকের সাথে কোন মুঘল বাদশাহর সামঞ্জস্য রয়েছে?
ক. আকবর খ. হুমায়ুন
গ. জাহাঙ্গীর ঘ. আওরঙ্গজেব

৬২. ফরাসিদের মতো কোন ইউরোপীয় শক্তি ভারতে তাদের আধিপত্য বিস্তার করেছিল?
ক. পর্তুগিজ খ. ডাচ
গ. ইংরেজ ঘ. ফ্রেঞ্চ

উত্তরমালা

১	ক	২	গ	৩	ক	৪	ক	৫	গ	৬	গ	৭	খ	৮	গ	৯	ক	১০	খ	১১	ক	১২	ক
১৩	খ	১৪	ক	১৫	গ	১৬	গ	১৭	ক	১৮	খ	১৯	ঘ	২০	খ	২১	ক	২২	ক	২৩	ক	২৪	ঘ
২৫	ক	২৬	ক	২৭	ক	২৮	ঘ	২৯	গ	৩০	খ	৩১	খ	৩২	ক	৩৩	ঘ	৩৪	ক	৩৫	খ	৩৬	খ
৩৭	গ	৩৮	খ	৩৯	ক	৪০	ক	৪১	ঘ	৪২	খ	৪৩	ক	৪৪	ঘ	৪৫	ক	৪৬	ঘ	৪৭	ঘ	৪৮	গ
৪৯	ঘ	৫০	ক	৫১	ক	৫২	ক	৫৩	খ	৫৪	ঘ	৫৫	খ	৫৬	ঘ	৫৭	খ	৫৮	ঘ	৫৯	খ	৬০	খ
৬১	গ	৬২	গ																				

গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. সম্রাট বাবরের প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে লেখো।
২. পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবরের সাফল্যের কারণ ব্যাখ্যা করো।
৩. চৌসার যুদ্ধের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো।
৪. শের শাহের কাছে সম্রাট হুমায়ুনের পরাজয়ের কারণ কী ছিল? ব্যাখ্যা করো।
৫. যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিতে শের শাহের অবদান ব্যাখ্যা করো।
৬. পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
৭. বার ভূঁইয়াদের পরিচয় দাও।
৮. সম্রাট আকবর রাজপুত নীতি গ্রহণ করেছিলেন কেন?
৯. সম্রাট জাহাঙ্গীরের ওপর নূরজাহানের প্রভাব কীরূপ ছিল?
১০. তাজমহল সম্পর্কে ধারণা দাও।

ঘ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সুলতান উসমান পিতার সিংহাসনে আরোহণ করে অল্প দিনের মধ্যেই ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে রাজ্য ছাড়া হন। পরবর্তীতে তিনি পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সেখানে আক্রমণ করেন। উন্নত সমরাস্ত্রের সাহায্যে তিনি প্রতিবেশীর বিশাল সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। অতঃপর ঐ রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের ওপর একটি নতুন সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করার গৌরব অর্জন করেন।
[ঢা. বো., রা. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫]

ক. 'হুমায়ুন' শব্দের অর্থ কী?
খ. 'দ্বীন-ই-ইলাহি' কী? ব্যাখ্যা করো।
গ. উদ্দীপকের শাসকের সাথে কোন মুঘল শাসকের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. নতুন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় উক্ত শাসকের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করো।

২. মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খানের বয়স যখন এগারো বছর তখন তার পিতা মারা যান। পিতার মৃত্যুতে চেঙ্গিস খানের জ্ঞাতিরা তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে এবং তাকে কারাকোরামের সিংহাসন থেকে বিতাড়িত করার জন্য সংঘাত ও যুদ্ধ শুরু করেন। কিন্তু চেঙ্গিস খান সব আত্মীয় ও শত্রুদের পরাজিত করে কারাকোরামে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

ক. বাবর কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
খ. 'তুজুক-ই-বাবরি'-এর সাহিত্যিক মূল্য ব্যাখ্যা করো।
গ. উদ্দীপকের চেঙ্গিস খানের সাথে কোন মুঘল সম্রাটের জীবনের ঘটনাবলির মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উক্ত মুঘল সম্রাটের ক্ষমতার ভরকেন্দ্র ও প্রেক্ষাপটের সাথে উদ্দীপকের ঘটনার বৈসাদৃশ্য পর্যালোচনা করো।

৩. উসমানের পূর্ব পুরুষরা গোবি মরুভূমির একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসক ছিলেন। যেখানে শত্রুপক্ষের শক্তির কারণে সুবিধা করতে না পেরে তারা এশিয়া মাইনরে চলে আসেন। এশিয়া মাইনরে বহুদিন ধরে সেলজুকরা শাসন করলেও উত্তরাঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেশ কিছু স্বাধীন ও শক্তিশালী গ্রিক রাজ্য বিদ্যমান ছিল। উসমান শেষ সেলজুক সুলতান আলাউদ্দিনের পতন ঘটিয়ে সেখানে উসমানীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শক্তিশালী গ্রিক রাজাদেরও পরাজিত করে যে বিশাল উসমানীয় সাম্রাজ্য গঠন করেন তা কয়েক শতাব্দী স্থায়ী হয়েছিল। *[ঢা. বো., রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৩; সকল বোর্ড ২০১৫]*

ক. পানিপথের প্রথম যুদ্ধ কবে সংঘটিত হয়?
খ. তাজমহল কী? ব্যাখ্যা করো।
গ. উদ্দীপকে উসমানীয়দের এশিয়া মাইনরে আগমনের সাথে ভারতে কোন মুঘল শাসকের আগমনের সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় উক্ত শাসকের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করো।

৪. প্রাথমিক জীবনে তৈমুর লঙ সিস্তান অভিযানকালে নির্বিঘ্নে রাজধানীতে প্রবেশ করেন। সিস্তান অধিপতি রাজধানী ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নেন। তৈমুর যখন নিশ্চিন্তে রাজধানীতে বিশ্রামরত তখন সিস্তানের সৈন্যরা তাকে ঘিরে ফেলে। এরূপ অতর্কিত আক্রমণে তৈমুর লঙ পরাজিত হয়ে কোনোমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যান। এমনকি কিছু দিনের জন্য তিনি রাজ্যহারা হন। *[ঢা. বো., ম. বো., দি. বো., চ. বো., সি. বো., ব. বো. ২০২২]*

ক. 'বাবর' শব্দের অর্থ কী?
খ. কবুলিয়ত ও পাট্টা বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো।
গ. উদ্দীপকের সিস্তান অভিযানের সাথে মুঘল সম্রাট হুমায়ুনের কোন অভিযানের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উক্ত যুদ্ধের ফলাফল মূল্যায়ন করো।

৫. তাহমিদ বিমাতার অত্যাচারে পিতৃগৃহ ত্যাগ করে এক সামন্তরাজার অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন। অল্প দিনে রাজার প্রিয়পাত্র হয়ে রাজকীয় ও কূটনৈতিক গুণাবলি অর্জন করেন। অর্জিত কূটনৈতিক জ্ঞান ও উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে একটি বিশাল এলাকার অধিপতি হয়ে যোগাযোগ ও ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসে বৈপ্লবিক পরিবর্তন করেন। *[য. বো. ২০২৩]*

ক. 'হুমায়ুন' শব্দের অর্থ কী?
খ. 'গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড' কী? সংক্ষেপে লেখো।
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত তাহমিদের সাথে তোমার পঠিত কোন শাসকের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. ভূমি রাজস্ব ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে তোমার পঠিত উক্ত শাসকের অবদান উদ্দীপকের আলোকে মূল্যায়ন করো।

৬. শিখ ধর্মের প্রবর্তক গুরু নানক পাকিস্তানের লাহোরে এক হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্মের বাইরে গিয়ে এক নতুন ধর্মমত প্রচার করেন। হিন্দুধর্ম ও ইসলাম ধর্মের সংমিশ্রণে একেশ্বরবাদী শিখ ধর্ম অনেকেই গ্রহণ করে। এ ধর্মের গ্রন্থসাহেব নামে একটি ধর্মগ্রন্থ রয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বর্তমানে অনেক শিখ ধর্মানুসারীরা বসবাস করছে। *[ঢা. বো., রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৩]*

ক. ভারতীয় উপমহাদেশে কে প্রথম কামানের ব্যবহার করেন?
খ. মনসবদারি প্রথা বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো।
গ. উদ্দীপকের গুরু নানকের সাথে কোন মুঘল সম্রাটের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. "উদ্দীপকের ধর্মমত এখনো টিকে থাকলেও উক্ত শাসকের ধর্মমতটি তার মৃত্যুর সাথে সাথেই বিলুপ্ত হয়"— উক্তিটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

৭. সালমান সাহেব একজন চেয়ারম্যান ছিলেন। তার এলাকার অধিকাংশ মানুষ ছিল ভিন্ন ধর্মাবলম্বী। তিনি বুঝতে পারলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে অসন্তুষ্ট রেখে এলাকার উন্নয়ন করা সম্ভব নয়। তাই তিনি ভিন্ন ধর্মের এক রমণীকে বিয়ে করলেন এবং উক্ত সম্প্রদায়ের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের সুব্যবস্থা করে দিলেন। ফলে উক্ত সম্প্রদায়ের সাথে সালমান সাহেবের সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে।
[রা. বো., কু. বো., য. বো. ২০২২]

ক. কোন শব্দ থেকে 'মুঘল' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে?

খ. কবুলিয়ত ও পাট্টা কী? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে কোন মুঘল সম্রাটের কোন নীতির কথা ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উক্ত নীতির ফলাফল বিশ্লেষণ করো।

৮. সর্বধর্ম মতবাদের প্রবক্তা শ্রী আনন্দ স্বামী। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীতে ত্রিপুরা জেলার সরাইল পরগনার কালিস্থ গ্রামে এক কৌলীন জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। জমিদারের দায়িত্ব পালনকালে প্রজাদের ধর্মভিত্তিক বিভাজন ও আন্তঃধর্মবিবাদ তাকে চিন্তামগ্ন করে তোলে। ধর্ম নিয়ে হত্যা, হানাহানি, রক্তপাত নিরসন ও শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি ইসলাম, সনাতন ও খ্রিষ্ট ধর্মের সমন্বয়ে 'সর্বধর্ম' মতবাদ প্রবর্তন করতে সক্রিয় হন। তার এ সর্বধর্ম মতবাদে প্রকৃত মানবতার আহ্বান থাকলেও তিনি ধর্মভীরু মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেননি। তবে এর মাধ্যমে তিনি সকল শ্রেণির মানুষের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হন।

[সি. বো., দি. বো. ২০২৫; সকল বোর্ড ২০১৬]

ক. 'মনসব' শব্দের অর্থ কী?

খ. পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ সম্পর্কে একটি টীকা লেখো।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আনন্দ স্বামীর সাথে কোন মুঘল সম্রাটের নীতির সাদৃশ্য পাওয়া যায়? উক্ত নীতির মতবাদসমূহ ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উক্ত নীতির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

৯. সুলতান ওরহান সামরিক ক্ষেত্রে কতগুলো সংস্কার সাধন করেন। তিনি অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর সমন্বয়ে স্থায়ী সামরিক বাহিনী গঠন করেন। আকিঞ্জী নামে একটি অনিয়মিত অশ্বারোহী বাহিনীও গঠন করেন। জেনিসারি নামে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত একটি নতুন বাহিনী গড়ে তুলেন।

[ঢা. বো., রা. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫]

ক. পানিপথের প্রথম যুদ্ধ কত খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়?

খ. মুঘলদের পরিচয় দাও।

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত শাসকের সামরিক সংস্কারের সাথে কোন মুঘল সম্রাটের সামরিক সংস্কারের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উক্ত শাসকের সামরিক সংস্কার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করো।

১০. কাশেম খান মসনদে অধিষ্ঠিত হয়ে জনকল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত হন। তিনি মাত্র পাঁচ বছর শাসন করেন। বহু রাস্তাঘাট, সরাইখানা, সেতু ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেন। জমি জরিপ, সামরিক সংস্কার, পুলিশ ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, ডাক বিভাগ ইত্যাদি সংস্কারমূলক কাজের জন্য ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

[ম. বো., দি. বো. ২০২৫]

ক. পানিপথের প্রথম যুদ্ধ কত খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়?

খ. আওরঙ্গজেবকে জিন্দাপির বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের শাসকের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন শাসকের কার্যকলাপের মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উক্ত শাসকের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করো।

১১. ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট মার্কোস আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তার চরিত্রে দোষ ও গুণের সমাবেশ ছিল। তিনি একই সাথে কোমল ও কঠোর ছিলেন। তিনি অনেক জনকল্যাণমূলক কাজ সম্পন্ন করেন এবং ন্যায়বিচারও প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তার শাসনামলে তার স্ত্রী ইমেলদা এতই প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন যে, সমস্ত প্রশাসনযন্ত্র তাকে প্রেসিডেন্টের চালিকাশক্তি হিসেবে গণ্য করে।

[সকল বোর্ড ২০১৫]

ক. নূরজাহানের প্রকৃত নাম কী ছিল?

খ. সম্রাট জাহাঙ্গীরের নাম সেলিম রাখার কারণ ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের প্রেসিডেন্ট মার্কোসের সাথে কোন মুঘল সম্রাটের তুলনা করা যায়?

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ইমেলদার কার্যাবলির সাথে সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের কার্যাবলির তুলনামূলক আলোচনা করো।

১২. মাহমুদা আক্তারের স্বামী একটি বেসরকারি কোম্পানির মালিক। কোম্পানির বিভিন্ন কাজে মাহমুদা তার স্বামীর ওপর প্রভাব বিস্তার করেন। তিনি তার দুই ভাইকে কোম্পানির উচ্চপদে বসান। মাহমুদার প্রভাবের কারণে এক পর্যায়ে তার স্বামী কোম্পানির নামমাত্র মালিকে পরিণত হন। *[ঢা. বো.; রা. বো.; চ. বো. ২০১৭]*

ক. কোন সম্রাট তাজমহল নির্মাণ করেন?

খ. সম্রাট আওরঙ্গজেবকে 'জিন্দাপির' বলা হয় কেন?

গ. উদ্দীপকের মাহমুদা আক্তারের মধ্যে সম্রাট জাহাঙ্গীরের স্ত্রী নূরজাহানের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. চারিত্রিক মিল থাকলেও উদ্দীপকের মাহমুদা আক্তার এবং পাঠ্যবইয়ের নূরজাহানের প্রেক্ষাপট ছিল ভিন্ন— বিশ্লেষণ করো।

১৩. সুলতানা তারুব তার সৌন্দর্য ও বুদ্ধিমত্তার কারণে আমির দ্বিতীয় আব্দুর রহমানের প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। হেরেম থেকে শুরু করে বিচারকার্য প্রায় সকল ক্ষেত্রেই তিনি স্ত্রীর প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন। রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে স্ত্রীর সিদ্ধান্তকেই চূড়ান্ত বলে গণ্য করতেন। সুলতানার নির্দেশেই আমির-উমরাদের পদায়ন, পদচ্যুতি এবং নিকট আত্মীয়দের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করা হতো। তবে শাসন ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণের ইচ্ছা তার ছিল না। *[ঢা. বো., রা. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫]*

ক. 'আকবরনামা' কে রচনা করেন? ১

খ. 'কবুলিয়ত ও পাট্টা' বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের সুলতানার কর্মকাণ্ডের সাথে কোন মুঘল সম্রাজ্ঞীর সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মুঘল সম্রাটের ওপর উক্ত সম্রাজ্ঞীর প্রভাব আলোচনা করো। ৪

১৪. জহিরুল ইসলাম সাহেব একটি স্বনামধন্য কোম্পানির মালিক। তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে কোম্পানির মালিকানা নিয়ে তার পুত্রদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এক ভাই অন্য ভাইয়ের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে পিতার মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। পরবর্তীকালে ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব প্রকট আকার ধারণ করে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে রূপ নেয়। পরবর্তীতে বিজয়ী ভ্রাতা কোম্পানিটিকে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। *[ঢা. বো., ম. বো., দি. বো., চ. বো., সি. বো., ব. বো. ২০২২]*

ক. সর্বশেষ মুঘল সম্রাটের নাম কী?

খ. 'ময়ূর সিংহাসন' কী? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব মুঘল আমলের কোন সম্রাটের রাজত্বকালের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উক্ত ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে সম্রাটের বিজয়ী পুত্রের সফলতা উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

১৫. মুসলিম স্পেনের বিখ্যাত শাসক ৩য় আব্দুর রহমান স্থাপত্য শিল্পের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রাজধানী কর্ডোভাকে রূপকথার নগরী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তিনি ১০০ প্রাসাদ, ৩০০ মসজিদ, ৩৮০টি হাম্মাম খানা নির্মাণ করেন। রাজধানী শহরের তিন মাইল অদূরে নিজ স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসার নিদর্শনস্বরূপ আজ-জোহরা প্রাসাদ নির্মাণ করে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। *[ম. বো. ২০২৩]*

ক. তাজমহলের স্থপতি কে?

খ. দস্তুরুল আমল কী? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত ৩য় আব্দুর রহমানের সাথে তোমার পঠিত কোন মুঘল শাসকের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. স্থাপত্য শিল্পে উক্ত শাসকের অবদান মূল্যায়ন করো।

১৬. এক সাম্রাজ্যের শাসক তার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে অধিক ভালোবাসতেন। তার কনিষ্ঠ পুত্র শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-গরিমায় জ্যেষ্ঠ পুত্র অপেক্ষা অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও জ্যেষ্ঠপুত্রকে তার পরবর্তী উত্তরাধিকার ঘোষণা করেন। ফলে কনিষ্ঠ পুত্র এটা মেনে নিতে পারেননি বিধায় বড় ভাইয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে এক প্রত্যক্ষ যুদ্ধে তার বড় ভাইকে পরাজিত করে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। *[ম. বো., দি. বো. ২০২৫]*

ক. তাজমহল কে নির্মাণ করেন?

খ. ময়ূর সিংহাসন কী? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের বর্ণিত ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের সাথে তোমার পঠিত মুঘল আমলের কোন ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের মিল আছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. কনিষ্ঠ পুত্রের যোগ্যতাই তার সফলতার মূল কারণ— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো।

১৭. নেপোলিয়ন বোনাপার্ট (১৭৬৯-১৮২১) ছিলেন ফরাসি প্রজাতন্ত্রের প্রথম কনসল (First Consul)। রাজ্য জয় ছিল তার নেশা। তিনি স্পেনসহ অনেক দেশ যেমন- রোম, প্রুশিয়া, পর্তুগাল, সিসিলি প্রভৃতি জয় করেন। কিন্তু স্পেন জয় ছিল তার পতনের অন্যতম কারণ। যার জন্য তার এই জয়কে স্পেনীয় ক্ষত বলা হয়। নেপোলিয়ন বলতেন, স্পেনীয় ক্ষত আমার ধ্বংস সাধন করেছিল।

ক. কাকে জিন্দাপির বলা হয়?

খ. দস্তুরুল আমল কী?

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত শাসকের স্পেন জয়ের সাথে কোন মুঘল শাসকের দাক্ষিণাত্য জয়ের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. নেপোলিয়নের শেষোক্ত উক্তিটি উক্ত সম্রাটের দাক্ষিণাত্য জয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কি? যৌক্তিক মত দাও।

১৮. দিল্লির সুলতান ফিরোজশাহ তুঘলক ছিলেন অনাড়ম্বর জীবনের অধিকারী। তিনি ইসলামি অনুশাসন মেনে চলতেন। কুরআন নকল ও টুপি সেলাই করে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে তিনি দুর্নীতি, অনৈসলামিক ও অনৈতিক কাজ নিষিদ্ধ করেন। তার সময়ে (১৩৫১-১৩৮৮ খ্রি.) প্রায় ২৩ প্রকারের বেআইনি কর নিষিদ্ধ ছিল। অবশ্য তিনি শরিয়ত আরোপিত জিজিয়া কর পুনঃপ্রবর্তন করেছিলেন। তবে তিনি তার শাসনকালে কোনো বড় সামরিক অভিযান পরিচালনা করেননি এবং তিনি রক্তপাত পছন্দ করতেন না বলে রাজ্যজয়ের কোনো মনোভাব তার ছিল না।

ক. সম্রাট শাহজাহানের বাল্যনাম কী ছিল?

খ. পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবরের জয়লাভের কারণ কী? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের শাসকের সাথে কোন মুঘল শাসকের কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের শাসকের সাথে উক্ত বৈসাদৃশ্য চিহ্নিত করো।

১৯. খলিফা দ্বিতীয় হাকাম পর্যন্ত স্পেনে উমাইয়া খিলাফত সুসংহত ছিল। তার পরবর্তী খলিফাগণ ছিলেন দুর্বল শাসক। উমাইয়া খিলাফতে সুষ্ঠু উত্তরাধিকার নীতির অভাব ছিল। ফলে রাজপ্রাসাদের ক্ষমতার দ্বন্দ্বে শক্তি-সামর্থ্যও দুর্বল হয়ে পড়ে। দুর্বল ও বিলাসপ্রিয় সুলতানদের বিলাসিতা, নিজেদের পরিবারকে পারিতোষিক প্রদান ও স্থাপত্য শিল্পে অর্থ ব্যয়ে রাজকোষ শূন্য হয়ে পড়ে। আর এ সকল কারণেই ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে।

ক. হিমু কে ছিলেন?

খ. শের শাহের শাসনকালে 'সরকার' বলতে কী বোঝানো হতো? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে মুঘল সাম্রাজ্য পতনের কোন কারণগুলো ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত কারণগুলোর ফলেই মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

ঙ. সমন্বিত অধ্যায়ের সৃজনশীল প্রশ্ন

২০. ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে জাবের যুদ্ধে উমাইয়া খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ানকে পরাজিত করে আবুল আব্বাস আস-সাফ্‌ফাহ আব্বাসি খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেন। বাগদাদ নগরীকে কেন্দ্র করে আব্বাসি খলিফারা ৫০০ বছর ধরে মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। অবশেষে ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে মোঙ্গল নেতা হালাকু খানের আক্রমণে আব্বাসি বংশের পতন ঘটে। আব্বাসি খিলাফতের ধ্বংসস্তূপের ওপর হালাকু খান ইলখানি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ◄ সমন্বিত অধ্যায় ২ ও ৩

ক. দিল্লি সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা কে?
খ. বাবরনামা কী? ব্যাখ্যা করো।
গ. উদ্দীপকে দিল্লি সালতানাত পতনের কোন কারণটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. হালাকু খানের মতো সম্রাট বাবরও দিল্লি সালতানাতের ধ্বংসস্তূপের ওপর মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন— বিশ্লেষণ করো।

২১. শিল্প ও সাহিত্য-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হিসেবে স্পেনের উমাইয়া খলিফা তৃতীয় আবদুর রহমানের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তার প্রতিষ্ঠিত কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল জগদ্বিখ্যাত। এখানে সাহিত্য, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, ইতিহাস, চিকিৎসাশাস্ত্র, রসায়ন প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হতো। তৃতীয় আবদুর রহমানের শাসনকালে কর্ডোভা নগরী জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়। তার পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপত্যশিল্পেরও বিকাশ ঘটে। ঐ সময় রাজধানী কর্ডোভাতে ৩০০ মসজিদ, ১০০ প্রাসাদ ১,১৩,০০০ গৃহ এবং ৩৮০টি হাম্মামখানা (গোসলখানা) ছিল। এছাড়া আবদুর রহমানের অনন্য কীর্তি হলো আজ-জোহরা প্রাসাদ নির্মাণ। প্রিয়তমা স্ত্রীর নামে তিনি এ প্রাসাদ নির্মাণ করেন। ◄ সমন্বিত অধ্যায় ১ ও ৩

ক. মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে?
খ. আরবদের সিন্ধু বিজয়ের আগে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা কীরূপ ছিল?
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত আজ-জোহরা প্রাসাদের সাথে সম্রাট শাহজাহানের নির্মিত কোন স্থাপত্যের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. তৃতীয় আবদুর রহমানের সময় কর্ডোভা নগরীর সমৃদ্ধি সুলতান মাহমুদের সময়কার গজনির সমৃদ্ধির কথাই মনে করিয়ে দেয়— বিশ্লেষণ করো।

২২. নেপোলিয়ন বোনাপার্টকে বলা হয় ফরাসি বিপ্লবের সন্তান। তিনি পুরো ইউরোপ জয় করার স্বপ্ন দেখতেন। রোম, প্রুশিয়া স্পেন, পর্তুগাল, সিসিলি প্রভৃতি দেশ ও অঞ্চল তিনি জয় করেছিলেন। তবে নেপোলিয়নের স্পেন বিজয় দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। স্পেনে তার ব্যর্থতা 'স্পেনীয় ক্ষত' নামে পরিচিত। এ ক্ষতই তার পতন ডেকে এনেছিল। ◄ সমন্বিত অধ্যায় ২ ও ৩

ক. লাখ বখস উপাধি কার?
খ. মুঘল-আফগান দ্বন্দ্ব বলতে কী বোঝায়?
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত নেপোলিয়নের রাজ্য বিজয়ের সাথে দিল্লির কোন সুলতানের সাম্রাজ্য বিস্তারকে তুলনা করা যায়? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. নেপোলিয়নের স্পেনীয় ক্ষতের মতো সম্রাট আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য ক্ষত মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ডেকে এনেছিল— উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করো।

২৩. আদিল রহমান একজন নাট্যকার। তার লেখা 'রাজা' নাটকটি সম্প্রতি মঞ্চে অভিনীত হয়েছে। নাটকটিতে দুজন রাজার কাহিনি রয়েছে। প্রথম রাজা তার রাজ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে মূল্যতালিকা নির্ধারণ করে দেন। এই মূল্যতালিকা বাস্তবায়নে তিনি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপও গ্রহণ করেন। অন্যদিকে, দ্বিতীয় রাজা তার রাজ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন। রাজা নিজেই বিচার প্রশাসনের শীর্ষে থেকে সমগ্র বিচারব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করেন। বিচারের ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্র, জাতি-ধর্ম কোনো কিছুর ভিত্তিতেই তিনি ভেদাভেদ করেন না। ◄ সমন্বিত অধ্যায় ২ ও ৩

ক. দিল্লি সালতানাতের চূড়ান্ত পতন ঘটেছিল কোন যুদ্ধে?
খ. দস্তরুল আমল কী? ব্যাখ্যা করো।
গ. 'রাজা' নাটকের প্রথম রাজার সাথে দিল্লি সালতানাতের কোন সুলতানের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. 'রাজা' নাটকের দ্বিতীয় রাজার বিচার ব্যবস্থায় শের শাহের বিচার ব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো।

২৪. নাজমা বেগম সম্প্রতি তার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। কিন্তু এক শ্রেণির লোক তাকে চেয়ারম্যান হিসেবে মেনে নিতে চাচ্ছে না। কারণ তিনি একজন নারী। নাজমা বেগম নিজের যোগ্যতা বলেই চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন এবং এলাকার উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছেন। তার আরকটি বৈশিষ্ট্য হলো তিনি সাহিত্যমনা। সম্প্রতি এলাকার নানা অসংগতি এবং তা দূরীকরণের উপায় সংবলিত তিনি একটি বই লিখেছেন। তার বাড়িতে প্রায়ই গান-কবিতার আসর বসে। গুণী ব্যক্তিদের তিনি সম্মান ও সমাদর করেন। এ গুণটির কারণে এলাকায় তিনি অনেক খ্যাতি অর্জন করেছেন। ◄ সমন্বিত অধ্যায় ২ ও ৩

ক. 'তুযুক-ই-বাবরি' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করেন কে?
খ. সম্রাট আকবর গুজরাট আক্রমণ করেছিলেন কেন?
গ. নাজমা বেগমকে দিল্লি সালতানাতের কোন সুলতানের সাথে তুলনা করা যায়? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. মুঘল সম্রাট আকবর ও নাজমা বেগমের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনকারী বিষয়টি মূল্যায়ন করো।

৪

বাংলায় কোম্পানি ও ঔপনিবেশিক শাসন

Company and Colonial Rule in Bengal

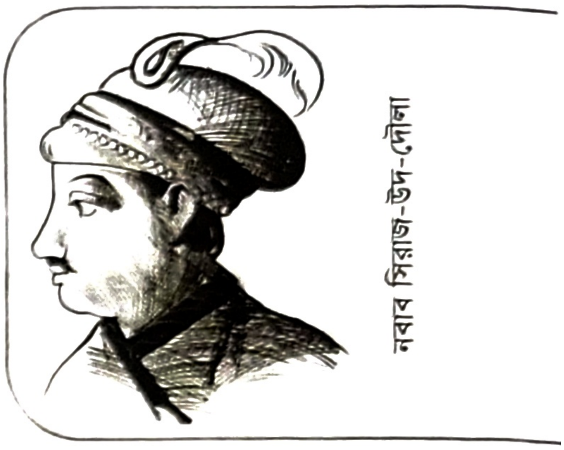

নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা

প্রধান প্রধান শব্দ

- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি
- উপনিবেশ
- দিওয়ানি
- দ্বৈত শাসন
- ছিয়াত্তরের মন্বন্তর
- ফরায়েজি
- বাঁশের কেল্লা
- স্বত্ববিলোপ নীতি
- খেলাফত
- দ্বিজাতি তত্ত্ব

সমৃদ্ধ অর্থনীতিই বাংলায় কোম্পানি ও ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার প্রধান সহায়ক হিসেবে কাজ করেছে। ভারতের ধন-সম্পদে প্রলুব্ধ হয়ে যুগে যুগে অনেক বিদেশি এ উপমহাদেশে আগমন করেছে। একই উদ্দেশ্যে এদেশে এসেছে বিভিন্ন ইউরোপীয় বণিকগোষ্ঠী। এদের মধ্যে সর্বপ্রথম বাণিজ্য করতে আসে পর্তুগিজ বণিকেরা। ১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগালের নাবিক ভাস্কো-দা-গামার আবিষ্কার করা নৌপথ ধরেই একে একে ভারতীয় উপমহাদেশে বাণিজ্য করতে আসে ওলন্দাজ, দিনেমার, ইংরেজ, ফরাসি বণিকেরা। ইংরেজরা ভারতবর্ষ ও এর পূর্বদিকে অবস্থিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমুদ্র অঞ্চলে বাণিজ্য করার জন্য ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দে একটি কোম্পানি গঠন করে। এটির আনুষ্ঠানিক নাম ছিল 'দি গভর্নর অ্যান্ড কোম্পানি অব মার্চেন্টস অব লন্ডন ট্রেডিং ইনটু দি ইস্ট ইন্ডিজ'। প্রতিষ্ঠানটি সংক্ষেপে পরিচিত ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নামে। ১৬০৮ খ্রিষ্টাব্দে বাণিজ্যের অনুমতি নিতে এ কোম্পানির প্রতিনিধি ক্যাপ্টেন হকিন্স ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমসের চিঠি নিয়ে মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন। দিনে দিনে তাদের প্রতিপত্তি বাড়তে থাকে এবং তারা বাংলার রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্র শুরু করে। তাদের এ ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে বাংলার শেষ নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয় ঘটলে বাংলার শাসনক্ষমতা চলে যায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে। আর এভাবে ভারত উপমহাদেশ প্রায় দু'শ বছর ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনের বেড়াজালে বন্দি হয়।

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখব

- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভ: লর্ড ক্লাইভ ও দ্বৈত শাসন
- ফরায়েজি আন্দোলন, তিতুমীরের বিদ্রোহ
- ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ
- সংস্কার আন্দোলন: হাজি মুহম্মদ মোহসিন, নবাব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী
- রাজনৈতিক দল: কংগ্রেস, মুসলিম লীগ
- বঙ্গভঙ্গ: ঘটনা ও ফলাফল
- খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন
- লাহোর প্রস্তাব ও দ্বিজাতি তত্ত্ব (১৯৪০)
- ভারত বিভক্তি (১৯৪৭): পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম

পাঠ পরিকল্পনা

পাঠ ১	বাংলার শাসনতান্ত্রিক প্রেক্ষাপট এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আগমন
পাঠ ২	ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভ
পাঠ ৩	লর্ড ক্লাইভ ও দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা
পাঠ ৪	ফরায়েজি আন্দোলন
পাঠ ৫	তিতুমীরের বিদ্রোহ
পাঠ ৬	১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ
পাঠ ৭	১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের ফলাফল
পাঠ ৮	সংস্কার আন্দোলন: হাজি মুহম্মদ মোহসিন (১৭৩২-১৮১২ খ্রি.)
পাঠ ৯	নবাব আবদুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩): সংস্কার আন্দোলনে ভূমিকা
পাঠ ১০	সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮): মুসলমানদের রাজনৈতিক জাগরণে ভূমিকা
পাঠ ১১	ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস
পাঠ ১২	নিখিল ভারত মুসলিম লীগ
পাঠ ১৩	বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫): কারণ ও ঘটনা
পাঠ ১৪	বঙ্গভঙ্গের ফলাফল
পাঠ ১৫ ও ১৬	খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন
পাঠ ১৭ ও ১৮	লাহোর প্রস্তাব ও দ্বিজাতি তত্ত্ব (১৯৪০)
পাঠ ১৯ ও ২০	ভারত বিভক্তি (১৯৪৭): পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম

পাঠ ১

বাংলার শাসনতান্ত্রিক প্রেক্ষাপট এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আগমন
Administrative Background of Bengal and the Arrival of East India Company

বাংলার শাসনতান্ত্রিক পটভূমি (Administrative Background of Bengal)

প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম সমৃদ্ধ অঞ্চল ছিল বাংলা। মধ্যযুগে তুর্কি সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির বাংলা জয়ের (১২০৪) ফলে এ অঞ্চল মুসলিম শাসনাধীনে আসে। ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লি সালতানাত প্রতিষ্ঠার পর বাংলা দিল্লির একটি প্রদেশে পরিণত হয়। তবে বিশাল দূরত্ব এবং অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে বাংলায় দিল্লির কর্তৃত্ব কখনোই সুদৃঢ় হয়নি। এ সময় বাংলার শাসনকর্তারা প্রায়ই দিল্লির কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করতেন। তবে দিল্লি থেকে প্রথম স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্ববঙ্গে স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠা করেন ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ (১৩৩৮-১৩৫০ খ্রি.)। তাকে অনুসরণ করেন লক্ষৌর শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-১৩৫৭ খ্রি.) সমগ্র বাংলার ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে এখানে দিল্লির সমান্তরাল একটি স্বাধীন সালতানাত যুগের সূচনা করেন। এ স্বাধীন সালতানাত যুগে চারটি রাজবংশ বাংলা শাসন করে। এগুলো হলো— ১. ইলিয়াস শাহি বংশ (১৩৪২-১৪১৪ ও ১৪৪২-১৪৮৭ খ্রি.), ২. হাবসি বংশ (১৪৮৭-১৪৯৩ খ্রি.), ৩. হোসেন শাহি বংশ (১৪৯৩-১৫৩৮ খ্রি.) এবং ৪. কররানি বংশ (১৫৬৪-১৫৭৬ খ্রি.)। ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে রাজমহলের যুদ্ধে দাউদ খান কররানিকে পরাজিত করে সম্রাট আকবর বাংলায় মুঘল শাসনের গোড়াপত্তন করেন। তবে বাংলায় মুঘল কর্তৃত্ব সুদৃঢ় হয় ১৬১০ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে। এ সময়ে 'বারো ভূঁইয়া' নামে পরিচিত স্থানীয় স্বাধীনচেতা প্রভাবশালী ভূস্বামীদের প্রতিরোধকে চূড়ান্তভাবে পরাস্ত করে মুঘলরা বাংলাকে তাদের অন্যতম সুবা অর্থাৎ প্রদেশে পরিণত করে। ১৭১৬ খ্রিষ্টাব্দে মুর্শিদকুলি খান বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হলে এখানে মুঘল নিয়ন্ত্রণের অবসান ঘটে। কাগজে-কলমে মুঘল সম্রাটের কর্তৃত্ব মেনে নিলেও মুর্শিদকুলি খান এবং তার উত্তরসূরি শাসকেরা বাংলায় কার্যত স্বাধীন শাসনযুগের সূচনা করেন। বাংলার ইতিহাসে এ শাসনামল 'নবাবি যুগ' নামে পরিচিত।

নবাবি যুগে বাংলার সম্পদের প্রতি লোভাতুর দৃষ্টি পড়ে ইউরোপীয় বণিকদের। ভারতে বাণিজ্য করার জন্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশ পৃথক কোম্পানি গঠন করে। পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী এসব ইউরোপীয় কোম্পানির মধ্যে ছিল— পর্তুগিজ, দিনেমার, ওলন্দাজ, ফরাসি এবং ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। এর মধ্যে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শুধু বাংলার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই প্রভাব বিস্তার করেনি, শাসকদের অন্তর্কোন্দল ও প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের সুযোগে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও নিজেদের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণকারী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। ব্রিটিশ এই বণিকগোষ্ঠী দেশীয় কুচক্রী অভিজাত শক্তির সহায়তায় ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশি যুদ্ধে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাকে পরাজিত করে বাংলা তথা ভারতে তাদের ঔপনিবেশিক শাসনের ভিত্তি রচনা করে। এ দেশে কোম্পানির শাসন চলে দীর্ঘ প্রায় একশ বছর। ১৮৫৭ সালের আলোড়ন তোলা সিপাহি বিদ্রোহের পর কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে। শুরু হয় ব্রিটেনের প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক শাসন। এ শাসন চলে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত। বিংশ শতকের প্রায় মাঝামাঝি ভারতে রাজনৈতিক সচেতনতা ও জাতীয়তাবাদী চেতনা জোরদার হয়, স্বাধীনতা আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। এর পরিণতিতে ১৯৪৭ সালে ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটে এবং উপমহাদেশে 'ভারত' ও 'পাকিস্তান' নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হয়।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠন, বাংলায় আগমন ও কর্তৃত্ব বিস্তার (Foundation of East India Company, Arrival in Bengal and Expansion of Controling)

সতেরো শতকের শুরুর দিকে ভারতবর্ষে ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিদেশি বণিকগোষ্ঠীর আগমন শুরু হয়। তবে ১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামার ভারতে আসার সমুদ্রপথ আবিষ্কারের সূত্রে ইউরোপীয় বণিকদের ভারত তথা প্রাচ্যে আগমন শুরু হয় পনেরো শতকের শেষ দিক থেকেই। এক্ষেত্রে পর্তুগিজরাই প্রথম ভারতে আসে। তাদের অনুসরণ করে ইংরেজরা প্রাচ্যে আসে। ইংল্যান্ডের একদল বণিক ভারতের সাথে বাণিজ্য করার জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নামে একটি বাণিজ্য সংঘ গঠন করে। ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর ইংল্যান্ডের রানি প্রথম এলিজাবেথ এ কোম্পানিকে প্রাচ্যে বাণিজ্য পরিচালনার জন্য রাজকীয় সনদ প্রদান করেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৬১২ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের পশ্চিম

উপকূলে গুজরাটের সুরাটে প্রথম বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে। বাংলার বাণিজ্যে তারা পুরোপুরি সম্পৃক্ত হয় এর ১৬৫১ খ্রিষ্টাব্দে। সে বছরই ইংরেজরা বাংলার তখনকার প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র হুগলিতে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে। এরপর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার সুবাদার শাহ সুজার কাছ থেকে প্রাপ্ত একটি নিশানের (রাজকীয় আদেশ) বলে বার্ষিক মাত্র তিন হাজার টাকার বিনিময়ে বাংলায় বিনা শুল্কে ব্যবসার অনুমতি লাভ করে। ১৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দে কোম্পানি বাংলায় একটি স্বাধীন বাণিজ্য এজেন্সি প্রতিষ্ঠা করে। ১৬৬০ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজরা বাংলায় আরও বাণিজ্য সম্প্রসারণে উদ্যোগী হয়। এ নিয়ে মুঘল সুবাদার শায়েস্তা খানের সাথে তাদের সংঘর্ষ বাধে। চার বছর (১৬৮৬-১৬৯০ খ্রি.) সংঘাত চলার পর কোম্পানি মুঘলদের কাছে নতিস্বীকার করে। মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তারা পুনরায় বাণিজ্য করার অধিকার লাভ করে। ইংরেজরা বাংলায় ভাগীরথী নদীর তীরে কলকাতা, সুতানটি ও গোবিন্দপুর নামে তিনটি গ্রাম কিনেছিল। সুবাদার ইব্রাহিম খান কোম্পানিকে সুতানটিতে বাণিজ্যকুঠি নির্মাণের অনুমতি দেন। কালক্রমে এ গ্রাম তিনটিই তৎকালীন প্রাচ্যের বৃহত্তম নগরী কলকাতা মহানগরে পরিণত হয় এবং ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে। সুবাদার ইব্রাহিমের শাসনকালেই শোভা সিংহ ও রহিম খানের বিদ্রোহের সূত্রে নিজেদের নিরাপত্তার অজুহাতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সুতানটিতে 'ফোর্ট উইলিয়াম' নামে একটি সুরক্ষিত দুর্গ নির্মাণ করে। এ দুর্গই পরবর্তী সময়ে ইংরেজদের রাজনৈতিক তৎপরতার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।

জেনে রাখো

বাণিজ্যকুঠি বলতে ভারতে আগত ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর ব্যবসায়িক কেন্দ্রকে বোঝায়। উপমহাদেশে প্রথম বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে পর্তুগিজরা। তারা দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের কালিকটে কুঠি স্থাপন করে। ওলন্দাজরা নাগাপট্টম, বাংলার চুঁচুড়া ও কাশিমবাজারে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে। ফরাসিরা পন্ডিচেরি ও বাংলার চন্দননগর এবং দিনেমাররা ত্রিবাঙ্কুর ও শ্রীরামপুরে কুঠি নির্মাণ করে। ইংরেজদের বাণিজ্যকুঠি ছিল সুরাট, আগ্রা, আহমেদাবাদ, মুসলিপট্টম এবং ঢাকা, কাশিমবাজার, মালদহসহ বাংলার বিভিন্ন স্থানে।

বাংলা তথা ভারতে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আধিপত্য বিস্তারের অভিযাত্রায় পরবর্তী সাফল্য অর্জিত হয় ১৭১৭ খ্রিষ্টাব্দে। সে বছর তারা ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য মুঘল সম্রাট ফররুখশিয়ারের ফরমান (অনুমতিপত্র) লাভ করে। এর বদৌলতে কোম্পানি বাণিজ্যিক সুবিধার পাশাপাশি রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বিস্তারেরও সুযোগ পায়। তারা বাংলার অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার সুযোগে কৌশলে রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু করে। নবাব আলিবর্দী খানের আমল থেকেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। আলিবর্দী খান কৌশলে কোম্পানির এই উচ্চাভিলাষ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হলেও তার উত্তরসূরি তরুণ, অনভিজ্ঞ নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা তা পারেননি।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলা কত খ্রিষ্টাব্দে মুসলিম শাসনাধীনে আসে?
২. পূর্ব বাংলায় প্রথম স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠা করেন কে?
৩. কোন যুদ্ধের পর বাংলায় উপনিবেশিক শাসনের ভিত্তি রচিত হয়?
৪. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কত খ্রিষ্টাব্দে গঠিত হয়? */দি. বো., কু. বো., সি. বো. ২০১৭/*
৫. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রথম কোথায় বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করে?
৬. 'ফোর্ট উইলিয়াম' দুর্গ কোথায় অবস্থিত? */রাবি ২০১১-১২/*

উত্তরের জন্য ৩০৬ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আগমনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য চিহ্নিত করে তাদের প্রাথমিক কার্যাবলি ছক আকারে লেখো।

পাঠ ২

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভ
Acquiring Diwani by the East India Company

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভের পটভূমি
Background of Acquiring Diwani by the East India Company

বঙ্গ-ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভ একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। কারণ, বাংলার রাজস্ব আদায়ের এ অনুমোদনের ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে ইংরেজরা বঙ্গ-ভারতে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

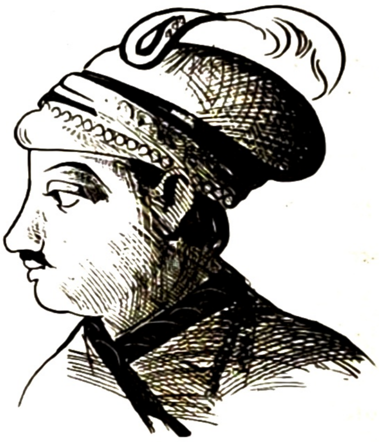
নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা

পলাশির যুদ্ধ ও বঙ্গ-ভারতে কোম্পানি শাসনের ভিত্তি তৈরি: বাংলার তরুণ নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার স্বল্পকালীন রাজত্বের সময় ইংরেজরা তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়। নবাবের সাথে উস্কানিমূলক আচরণের মাধ্যমে তারা যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চতুর কর্মকর্তারা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য স্বার্থান্বেষী কিছুসংখ্যক অমাত্য ও প্রাসাদের বাইরের অভিজাত চক্রের সাথে হাত মেলায়। শেষ পর্যায়ে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও দেশীয় ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ জুন ভাগীরথী নদীর তীরে পলাশির আম্রকাননে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার যুদ্ধ হয়। নবাবের প্রধান সেনাপতি মীরজাফর আলী খান ইংরেজদের সাথে হাত মেলানোয় তার অনুগত সৈন্যরা যুদ্ধের এক পর্যায়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এ কারণে এ যুদ্ধ প্রহসনে পরিণত হয় এবং নবাবের পরাজয় ঘটে। পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলার স্বাধীন নবাবি যুগের অবসান ঘটে। ক্রমে সম্পূর্ণ ভারতবর্ষে ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। সিরাজ-উদ-দৌলার পতনের পর তারা মীরজাফরকে বাংলার পুতুল শাসক বানায়।

বক্সারের যুদ্ধ ও দিওয়ানি লাভের পথে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি: পলাশি যুদ্ধের পর মীরজাফর বাংলার নবাব হয়ে কোম্পানি ও কোম্পানি কর্মকর্তাদের জন্য সর্বস্ব বিলিয়ে দেন। কিন্তু চতুর ও উচ্চাভিলাষী ইংরেজদের কাছ থেকে তিনিও রক্ষা পাননি। এক পর্যায়ে ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তিলাভের জন্য গোপন ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে মীরজাফরকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। কোম্পানি ১৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দে তার জামাতা মীর কাসিমকে মসনদে বসানো হয়। মীর কাসিম কোম্পানিকে অনেক সুবিধাদানের শর্তে ক্ষমতা লাভ করেন। কিন্তু স্বাধীনচেতা হওয়ায় তিনি ইংরেজদের হাতের ক্রীড়নক হয়ে থাকতে রাজি ছিলেন না। তাই মীর কাসিম প্রকৃত নবাব হিসেবে দেশ শাসনের উদ্দেশ্যে বাংলার প্রশাসনে বেশকিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেন। এসব পদক্ষেপ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির স্বার্থের অনুকূল না হওয়ায় নবাবের সাথে কোম্পানির বিরোধ বাধে, যা শেষ পর্যন্ত রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে রূপ নেয়। ইংরেজরা পাটনা দখল করলে নবাবের সাথে তাদের যুদ্ধের সূচনা ঘটে। নবাব ইংরেজদের মোকাবিলায় সর্বশক্তি নিয়োগ করেও একের পর এক যুদ্ধে পরাজিত হতে থাকেন। গিরিয়া, উদয়নালা ও কাটোয়া ইংরেজদের দখলে যাওয়ায় নবাব মীর কাসিম পাটনা হয়ে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার দরবারে আশ্রয় নেন। মীর কাসিমের অনুরোধে সুজাউদ্দৌলা ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাকে সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেন। মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমও ইংরেজদের বিরুদ্ধে সহায়তা করতে এগিয়ে আসেন। ১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দের ২২ অক্টোবর বিহারের বক্সারে উভয় বাহিনী যুদ্ধে মুখোমুখি হয়। এ যুদ্ধে ভারতীয়দের সম্মিলিত বাহিনী ইংরেজ কোম্পানির কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়।

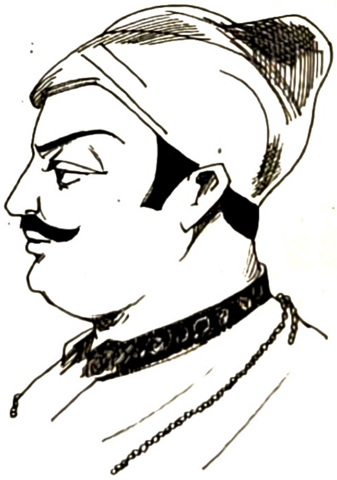
নবাব মীর কাসিম

বক্সারের যুদ্ধ ছিল পলাশির যুদ্ধ অপেক্ষা অধিকমাত্রায় মীমাংসাত্মক যুদ্ধ। শিক্ষাবিদ ও ঐতিহাসিক আজিজুর রহমান মল্লিক বলেন, "বক্সারের যুদ্ধ বাংলার স্বাধীনতার সমাপ্তি ঘটায়।"

বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজদের বিজয়ের ফলে বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠা সুনিশ্চিত হয়। শুধু তাই নয়, এ যুদ্ধে জয়লাভের ফলে কালক্রমে গোটা ভারতে ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। এ যুদ্ধে জয়লাভের তাৎক্ষণিক অর্জন ছিল কোম্পানির বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দিওয়ানি লাভ।

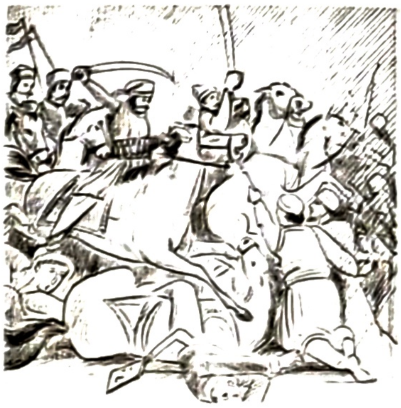

বক্সারের যুদ্ধ

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভ: বক্সার যুদ্ধে জয় লাভের পর কৌশল হিসেবে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেয়, তারা এমনভাবে বাংলার ক্ষমতা ভাগাভাগি করবে যাতে সরাসরি ক্ষমতা গ্রহণ না করেও রাজনৈতিক আধিপত্য বজায় রাখা এবং সর্বোচ্চ আর্থিক সুবিধা পাওয়া যায়। এ বিবেচনা থেকেই কোম্পানি তখনকার মতো বাংলার দিওয়ানি ক্ষমতা লাভ করেই সন্তুষ্ট থাকে। উল্লেখ্য, মুঘল প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা 'নিজামত' (সামরিক-বেসামরিক প্রশাসন) ও 'দিওয়ানি' (রাজস্ব প্রশাসন) -এ দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল। একটি মুনাফামুখী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নিজামত শাসন অপেক্ষা দিওয়ানি শাসন কুক্ষিগত করাকেই তাদের জন্য অধিক লাভজনক বিবেচনা করেছিল। তাই বক্সার যুদ্ধে জয়ের পর ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দিওয়ানি লাভের উদ্দেশ্যে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম ও বাংলার নবাব নাজিম-উদ-দৌলার সাথে দুটি পৃথক চুক্তি সম্পাদন করে। কোম্পানি রাজস্ব আদায়ের অধিকারের জন্য বাংলার নবাবকে বার্ষিক ৫৩ লক্ষ টাকা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়।

দিওয়ানি লাভের গুরুত্ব: ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভ বাংলার ইতিহাসে এক মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা। এটি ছিল কোম্পানির এক বড় ধরনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিজয়। পি ই রবার্টস তার *'History of British India'* গ্রন্থে বলেন, "বাংলার বিখ্যাত দিওয়ানি লাভ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের ক্ষেত্রে ছিল কোম্পানির প্রথম পদক্ষেপ।" এর ফলে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আইনত ও কার্যত বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার পূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকারী হয় এবং দেউলিয়া অবস্থা থেকে রক্ষা পায়। দিওয়ানি লাভের মধ্য দিয়ে কোম্পানি বাংলায় দ্বৈতশাসন প্রবর্তন করে। এ ব্যবস্থায় কোম্পানির কাছে দিওয়ানি ক্ষমতা ও নবাবের কাছে নিজামতি ক্ষমতা বণ্টন করা হয়। তবে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ বাংলার দিওয়ানি ক্ষমতা হারানোর ফলে নবাবের কাছ থেকে প্রকৃত ক্ষমতা কোম্পানির হাতে চলে যায়। এ সময়ে কোম্পানির কর্মচারীদের সীমাহীন দুর্নীতির ফলে বাংলার অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তবে এর ফলে কোম্পানি এবং কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যাপক আর্থিক উন্নতি ঘটে। এই দিওয়ানি শাসনের ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তী পর্যায়ে প্রথমে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় এবং পরে সমগ্র ভারতে কোম্পানির রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলার শেষ নবাব কে ছিলেন?
২. পলাশির যুদ্ধ কত খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়? *[ঢাবি ২০১১-১২]*
৩. পলাশির যুদ্ধে নবাবের সাথে কে বিশ্বাসঘাতকতা করে?
৪. বক্সারের যুদ্ধ কত খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়?
৫. কত খ্রিষ্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার দিওয়ানি লাভ করে? *[রাবি ২০১১-১২]*
৬. কোন ঘটনার মধ্য দিয়ে বাংলায় দ্বৈতশাসন প্রবর্তন করা হয়?

উত্তরের জন্য ৩০৬ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভ বাংলার অর্থনীতিতে যে বিরূপ প্রভাব ফেলেছিল তার একটি তালিকা তৈরি করো।

পাঠ ৩

লর্ড ক্লাইভ ও দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা
Lord Clive & Dual Government System

লর্ড ক্লাইভ (১৭২৫-১৭৭৪ খ্রি.) [Lord Clive (1725-1774 A.D.)]

লর্ড ক্লাইভ

রবার্ট ক্লাইভ ভারত উপমহাদেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠায় মূল ভূমিকা পালন করেন। তিনি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন সেনাপতি ছিলেন। ১৭৫৭ সালের পলাশির যুদ্ধে তার নেতৃত্বেই ইংরেজরা নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাকে পরাজিত করে বাংলার ক্ষমতা দখল করে। ক্লাইভকে 'পলাশির প্রথম ব্যারন' উপাধি দেওয়া হয়েছিল। তিনি বাংলায় দ্বৈত শাসন (দুই ব্যক্তি পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা) নামে এক অভিনব শাসন ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। ক্লাইভ ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্যও হয়েছিলেন এবং এ সূত্রে তিনি 'লর্ড ক্লাইভ' হিসেবেই অধিক পরিচিত। পলাশির যুদ্ধ জয়ের নায়ক হিসেবে ইংরেজ কোম্পানির কাছে তার গুরুত্ব ও প্রভাব বৃদ্ধি পায়। এ সময় বাংলার শাসন ক্ষমতা কার্যত ক্লাইভের হাতে ছিল। ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে ক্লাইভ কোম্পানির চাকরি থেকে অবসর নিয়ে ইংল্যান্ডে ফিরে যান। তবে বঙ্গ-ভারতের রাজনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ পর্বে ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে তাকে দ্বিতীয়বারের মতো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। এ পর্যায়ে তিনি ভারতে ব্রিটিশ শাসন পুনর্গঠন করেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সাফল্যের পাশাপাশি তার বিরুদ্ধে শঠতা, কৃষক ও সাধারণ প্রজাদের ওপর নিষ্ঠুরতা ও ব্যক্তিগত সম্পদের পাহাড় গড়ার অভিযোগ ছিল। পরে লন্ডনের পার্লামেন্টে তিনি বিচারের সম্মুখীনও হয়েছিলেন। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত অবস্থায় ক্লাইভ ১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দের ২২ নভেম্বর লন্ডনে আত্মহত্যা করেন।

দ্বৈত শাসন প্রবর্তনের প্রেক্ষাপট (The Context of the Introduction of Dual Government)

দ্বিতীয়বার বাংলার গভর্নর নিযুক্ত হয়ে রবার্ট ক্লাইভ কোম্পানির মৌলিক বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যবাদী (Commercial Imperialist) চরিত্র বজায় রাখার দিকে দৃষ্টি দেন। ক্লাইভ বুঝতে পেরেছিলেন, কোম্পানিকে অযোধ্যা ও দিল্লির ওপর সরাসরি আধিপত্য স্থাপন করতে হলে ভৌগোলিক সাম্রাজ্যবাদের (Territorial Imperialism) পথে পা বাড়াতে হবে। কিন্তু কোম্পানির তখনকার যে পরিস্থিতি তাতে ক্লাইভ ভৌগোলিক সাম্রাজ্যবাদের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাই তিনি আপাতত শুধু বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় কোম্পানির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার সাথে সন্ধি করেন। সন্ধির শর্তানুযায়ী নবাব সুজাউদ্দৌলাকে তার রাজ্য ফিরিয়ে দেওয়া হয়। বিনিময়ে নবাব কোম্পানিকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে ৫০ লক্ষ টাকা এবং কারা ও এলাহাবাদ জেলা দুটি ছেড়ে দেন। এ চুক্তির শর্তানুসারে কোম্পানিকে রাজস্ব আদায় করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। কোম্পানি বাংলার নাবালক নবাব নাজিম-উদ-দৌলাকে শাসনকার্য চালানোর জন্য বার্ষিক ৫৩ লক্ষ টাকা প্রদান করবে বলে স্থির হয়। এছাড়া ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে এলাহাবাদ চুক্তির মাধ্যমে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা প্রদানে সম্মত হয়ে কোম্পানি বাংলার দিওয়ানি লাভ করে।

জেনে রাখো

ল্যাটিন শব্দ ইম্পোরিয়াম (Imporiam) থেকে 'ইম্পেরিয়ালিজম' বা 'সাম্রাজ্যবাদ' (Imperialism) কথাটির উৎপত্তি হয়েছে। এর অর্থ 'সামরিক কর্তৃত্ব'। 'সাম্রাজ্যবাদ' বলতে বোঝায় কোনো একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র কর্তৃক অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাষ্ট্র বা জাতির ওপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার তত্ত্বকে। বর্তমানে যেকোনো দেশ কর্তৃক বিদেশ নীতি হিসেবে যে আগ্রাসনমূলক বিস্তার নীতি গ্রহণ করা হয় তাকে সাম্রাজ্যবাদ বলা হয়। অন্যদিকে, কোনো দেশ সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতাকে চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে অন্য কোনো দেশে বসতি গড়ে তোলে ও শাসন শুরু করে তখন তা উপনিবেশবাদ হিসেবে বিবেচিত হয়। সুতরাং উপনিবেশ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে যখন সাম্রাজ্যবাদী নীতি কার্যকর করা হয় তখন তাকে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ বলে।

দ্বৈত শাসন ও এর সমালোচনা (Dual Government and Its Criticism)

১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার দিওয়ানি লাভ করেন এবং লর্ড ক্লাইভ বাংলার নবাবকে নিছক বৃত্তিভোগীতে পরিণত করে এক অদ্ভুত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ভারতের ইতিহাসে লর্ড ক্লাইভের এ শাসন ব্যবস্থা দ্বৈত শাসন নামে পরিচিত। দ্বৈত শাসনের অর্থ হলো দু'জনের শাসন। এ ব্যবস্থায় বাংলার 'নিজামতি' অর্থাৎ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, ফৌজদারি বিচার, শান্তিরক্ষা, দৈনন্দিন প্রশাসন পরিচালনা ইত্যাদির দায়িত্ব ছিল নবাবের হাতে। অন্যদিকে 'দিওয়ানি' অর্থাৎ রাজস্ব আদায় এবং ভূমি সম্পর্কিত বিচারকাজ কোম্পানির ওপর ন্যস্ত হয়। বাংলার শাসনের দায়িত্ব এভাবে দুটি পৃথক কর্তৃপক্ষের হাতে চলে যাওয়াই হচ্ছে দ্বৈত শাসন। তবে একটু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলেই দেখা যায় যে, দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা ছিল একটি 'সাংবিধানিক মুখোশ'। প্রকৃতপক্ষে আর্থিকসহ আসল ক্ষমতা চলে যায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে। কোম্পানি দিওয়ানি পেলেও রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব নিজের হাতে না রেখে নায়েবে নাযিম রেজা খানের হাতে দেয়। অন্যদিকে কাগজে-কলমে নিজামতির দায়িত্ব নবাবের থাকলেও বাস্তবে তাও নায়েবে নাযিমের হাতে চলে যায়। এই রেজা খান ছিলেন কোম্পানির অনুগত কর্মকর্তা বা সেবাদাস। কাজেই মূল ক্ষমতা ছিল কোম্পানির হাতেই।

দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার প্রভাব (Impact of Dual Government System)

দ্বৈত শাসন ব্যবস্থায় দুই ধরনের প্রভাব পড়ে— ১. রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রভাব এবং ২. অর্থনৈতিক প্রভাব।

রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রভাব: দ্বৈত শাসন ছিল বাস্তবতা বিবর্জিত ও অভিনব এক শাসন ব্যবস্থা। এ শাসন ব্যবস্থা তৎকালীন বাংলার মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। বাংলা তথা ভারতবর্ষের জনজীবনে দ্বৈত শাসনের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রভাব ছিল ব্যাপক।

প্রথমত: ক্লাইভের দ্বৈত শাসনে নবাবের হাতে কোনো ক্ষমতা ছিল না। অর্থের জন্য নবাবকে কোম্পানির দিকে তাকিয়ে থাকতে হতো। অন্যদিকে কোম্পানির হাতে প্রচুর অর্থ ছিল। কোম্পানির দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীরা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন না করায় সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষা করার কার্যত কোনো উপায় ছিল না।

দ্বিতীয়ত: দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা অনুযায়ী জনকল্যাণের ক্ষেত্রে কোম্পানির কার্যত কোনো দায়িত্ব ছিল না। কোম্পানির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দায়িত্বহীনতার কারণে প্রশাসন ছিল স্থবির ও অরাজকতায় পরিপূর্ণ।

তৃতীয়ত: দ্বৈত শাসন অনুসারে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব কোম্পানির হাতে ন্যস্ত হওয়ায় একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী তথা বণিকেরা রাতারাতি প্রশাসক হিসেবে আবির্ভূত হয়। ভারতীয় শাসনপদ্ধতি, রীতিনীতি এবং সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে এসব প্রশাসকের কোনো ধারণা না থাকায় তারা এখানে ইংল্যান্ডের রীতিনীতি প্রয়োগ করতে থাকেন। এতে প্রশাসনিক জটিলতা মারাত্মক আকার ধারণ করে। এর ফলে কোম্পানির সাথে নবাবের দূরত্ব বেড়ে যায়।

চতুর্থত: দ্বৈত শাসনের ফলে রাজনৈতিক ও পরোক্ষভাবে প্রশাসনিক ক্ষমতা লাভের সাথে সাথে কোম্পানির কর্মচারীদের নিজেদের অবৈধ ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে এবং একই সাথে দুর্নীতি বৃদ্ধি পায়।

পঞ্চমত: দ্বৈত শাসন বাংলায় কোম্পানির চরম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। বৈদেশিক নিরাপত্তা ও অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য নবাবকে কোম্পানির সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল করে রাখা হয়। দিওয়ানি লাভের পর কোম্পানি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব সরাসরি আদায় করার ক্ষমতা অর্জন করে। এছাড়া নায়েবজাতীয় পদে নিয়োগ দেওয়ার ক্ষমতা কোম্পানির হাতে থাকায় নিজামতের সাধারণ প্রশাসনের ওপরও কোম্পানির একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

ষষ্ঠত: দ্বৈত শাসনে রেজা খান নবাবের পক্ষে নিজামতের দায়িত্ব লাভ করলেও কোম্পানির নির্দেশ ছাড়া তিনি কোনো কাজ করতেন না। তাছাড়া তিনি রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে তৎপর থাকলেও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় চরম অবহেলা প্রদর্শন করেন। দেশে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি ইত্যাদি অপরাধ বৃদ্ধি পেয়ে জনজীবনে চরম নিরাপত্তাহীনতা নেমে আসে।

অর্থনৈতিক প্রভাব: বাংলার অর্থনীতি তথা মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের ওপর দ্বৈত শাসনের নেতিবাচক প্রভাব ছিল। এর ফলে দেশের অর্থনীতিতে যেমন ধস নামে, তেমনি সাধারণ মানুষের জীবনযাপন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। যেমন—

প্রথমত: ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভ ও দ্বৈত শাসনের নির্মম বলি হয় এদেশের অর্থনীতি। রাজস্ব আদায়ের জন্য নায়েবদের উৎপীড়ন এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। পলাশির যুদ্ধের পর থেকে দেশের সম্পদ কমতে থাকে, অথচ রাজস্বের হার প্রতি বছর বৃদ্ধি পেতে থাকে। আলীবর্দী খানের আমলে পুর্ণিয়া জেলার বাৎসরিক রাজস্ব যেখানে চার লক্ষ টাকা ছিল সেখানে ১৭৬৯ খ্রিষ্টাব্দে তা বৃদ্ধি পেয়ে ২৫ লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়। দিনাজপুর জেলার রাজস্ব ১২ লক্ষ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৭ লক্ষ টাকা হয়। এভাবে জোর-জবরদস্তি রাজস্ব আদায় এবং উৎপীড়ন বাংলার মানুষের জীবনে চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয় সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয়ত: দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইংরেজ বণিকদের একচেটিয়া প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরেজ বণিকেরা দস্তকের ব্যাপক অপব্যবহার করলে প্রতিযোগিতায় দেশীয় বণিকেরা পরাজিত হতে বাধ্য হয়। ফলে তারা আস্তে আস্তে ব্যবসা গুটিয়ে নিতে থাকে।

তৃতীয়ত: দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে বাংলার ঐতিহ্যবাহী তাঁত ও রেশমশিল্প মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইংল্যান্ডের দামি রেশম বস্ত্রকে বেশি জনপ্রিয় করে তোলার জন্য ব্রিটিশ সরকার সস্তা মুর্শিদাবাদী রেশমের কাপড় ইংল্যান্ডে আমদানি নিষিদ্ধ করেন। অন্যদিকে কোম্পানির কর্মচারীদের নির্যাতনের ফলে তাঁতিরা তাদের কাছে কম মূল্যে কাপড় বিক্রি করতে বাধ্য হয়। এভাবে বাংলার তাঁত ও রেশম শিল্প ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে যায়।

চতুর্থত: দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার ফলে বাংলায় কুখ্যাত আমিলদারি প্রথার উদ্ভব ঘটে। কোম্পানি নায়েবে নাযিম অথবা আমিলদের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করত। আমিলরা আবার যে জমিদার সর্বাধিক রাজস্ব দিতে রাজি হতো তাকে দায়িত্ব দিত। এভাবে প্রজাদের ওপর করের বোঝা বাড়ে। আমিলরা বিভিন্ন খাতে অতিরিক্ত কর আদায় করত। এতে বাংলার মানুষের অর্থনৈতিক জীবন চরমভাবে বিপর্যস্ত হয়।

পঞ্চমত: কৃষি ছিল বাংলার অর্থনীতির ভিত্তি। কোম্পানির হাতে অর্থ এবং ক্ষমতা থাকলেও তারা কৃষকের জন্য অর্থ ব্যয় করেনি। ক্ষমতাহীন নবাবও সেচের ব্যবস্থা করে বা ঋণ দিয়ে কৃষককে সহায়তা করতে পারেননি। এতে বাংলার কৃষি চরম দুর্দশায় পড়ে এবং শস্য উৎপাদন কমে যায়।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর: লর্ড ক্লাইভ প্রবর্তিত দ্বৈতশাসন এবং বিরূপ প্রকৃতি-এ দুইয়ের প্রভাবে কারণে বাংলায় ১১৭৬ সালে (বঙ্গাব্দ) এক মহাদুর্ভিক্ষ বা মন্বন্তর ঘটেছিল। বাংলার ইতিহাসে এটি 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' হিসেবে পরিচিত। ঐ দুর্ভিক্ষে ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছিল। লাখ লাখ লোক অনাহার ও মহামারিতে মৃত্যুবরণ করেছিল। ঐতিহাসিক আর সি মজুমদারের মতে, দেশ যখন নানা অত্যাচার, উৎপীড়ন, দুর্নীতি ও হতাশায় জর্জরিত তখন ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দে (১১৭৬ বাংলা সনে) বাংলায় ঐ মারাত্মক দুর্ভিক্ষ ঘটে। ইতিহাসবিদ উইলিয়াম উইলসন হান্টারের মতে, "ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের দুর্নীতির কারণে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছিল।"মোটকথা, ক্লাইভের দ্বৈত শাসন ইংরেজ স্বার্থের অনুকূলে হলেও তা ভারতবর্ষের মানুষের দুঃখ-দুর্দশা বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছিল।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ভারত উপমহাদেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠায় মূল ভূমিকা পালন করে কে?
২. পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাকে পরাজিত করেছিল কে?
৩. লর্ড ক্লাইভ কত খ্রিষ্টাব্দে বাংলায় দ্বৈত শাসন প্রবর্তন করেন? */রাবি ২০১০-১১/*
৪. দিওয়ানি লাভের জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কোন মুঘল সম্রাটের সাথে চুক্তি করেছিল?
৫. দ্বৈত শাসনের ফলে মূল ক্ষমতা কার হাতে চলে গিয়েছিল?
৬. দ্বৈত শাসনের ফলে বাংলায় সৃষ্টি হওয়া দুর্ভিক্ষের নাম কী?

উত্তরের জন্য ৩০৬ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. দলীয় কাজ

কয়েকজন শিক্ষার্থী একত্র হয়ে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার প্রভাব সম্পর্কে দুটি স্লাইড তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করো।

পাঠ ৪

ফরায়েজি আন্দোলন
Faraizi Movement

হাজি শরীয়তউল্লাহ'র পরিচয় (Identification of Hazi Shariatullah)

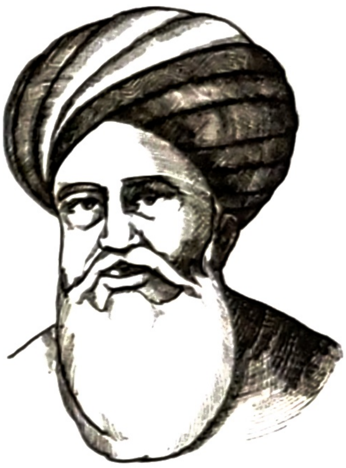
হাজি শরীয়তউল্লাহ

ফরায়েজি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হাজি শরীয়তউল্লাহ ১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দে ফরিদপুর জেলার মাদারিপুর মহকুমার শ্যামাইল গ্রামে তালুকদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম আবদুল জলিল তালুকদার। আবদুল জলিল একজন কৃষক ছিলেন বলে জানা যায়। শরীয়তউল্লাহ দেশে প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণ শেষে তরুণ বয়সে ১৭৯৯ খ্রিষ্টাব্দে আরবে যান। ১৮ বছর বয়সে পবিত্র হজব্রত পালন করার পর পরবর্তী দীর্ঘ ১৯ বছর তিনি আরবে অবস্থান করেন। শরীয়তউল্লাহ এ সময় কয়েক বছর তাহের সম্বল নামে একজন হানাফি শাস্ত্রবিদের কাছে থাকেন এবং কাদেরিয়া মতবাদে দীক্ষা গ্রহণ করেন। দুই বছর তিনি কায়রোর জামিয়া আল-আজহার শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষাগ্রহণ করেন। শাহ ওয়ালিউল্লাহর পিতা শাহ আব্দুর রহিম প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা আল-রহিমীয়াতেও শিক্ষালাভ করেন তিনি। আরবে অবস্থানকালে শরীয়তউল্লাহ সেখানকার তৎকালীন সংস্কার আন্দোলনের নেতা ইবনে আব্দুল ওয়াহাবের সংস্পর্শে আসেন এবং ওয়াহাবি মতবাদে দীক্ষিত হন। হাজি শরীয়তউল্লাহ ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দে বাংলায় ফিরে তৎকালীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলমান সমাজকে জাগ্রত করার লক্ষ্যে ফরায়েজি আন্দোলন নামে একটি ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলন শুরু করেন। ঐ আন্দোলন চলাকালে ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ফরায়েজি আন্দোলন (Faraizi Movement)

'ফরায়েজি' শব্দটি আরবি 'ফরজ' শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ অবশ্যপালনীয়। যে সকল ধর্মীয় কর্মকাণ্ড আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের জন্য অবশ্য পালনীয় হিসেবে নির্ধারণ করেছেন সেগুলোই ফরজ। দেশে ফিরে হাজি শরীয়তউল্লাহর উপলব্ধি হয়, বাংলার মুসলিম সমাজের অধঃপতন ঘটেছে। তাদের জীবনাচরণে নানাবিধ কুসংস্কার ও অনৈসলামিক বিষয় বিরাজ করছে। তিনি মুসলিম সমাজকে এসব থেকে দূরে থেকে ইসলাম ধর্মের প্রকৃত রূপে ফিরে যাওয়ার তাগিদ দেন এবং এ লক্ষ্য অর্জনে ইসলামের ফরজগুলো সম্পাদনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। হাজি শরীয়তউল্লাহর এ সংস্কার আন্দোলন ফরজের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়েছিল বলে একে 'ফরায়েজি আন্দোলন' এবং এর অনুসারীদের 'ফরায়েজি' বলা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে এ আন্দোলনে একটি রাজনৈতিক মাত্রা যোগ হয় এবং এটি কৃষকসহ প্রজাদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে পরিণত হয়।

আন্দোলনের উদ্দেশ্য: হাজি শরীয়তউল্লাহ ছিলেন একাধারে ধর্মীয় নেতা, সমাজসংস্কারক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন তৎকালীন বাংলার অত্যাচারী ভূস্বামী ও ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। স্থানীয় মুসলিম সমাজ একদিকে ছিল বিভিন্ন কুসংস্কার আর অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডে নিমজ্জিত। অন্যদিকে জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচারে তাদের জীবন হয়ে উঠেছিল দুর্বিষহ। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দরিদ্র প্রজামাত্রই তাদের নিপীড়নের শিকার হতো। এমন পরিস্থিতিতে হাজি শরীয়তউল্লাহ ফরায়েজি আন্দোলনের প্রয়োজন অনুভব করেন। তার এ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল একদিকে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলমানদের সচেতন করে তোলা এবং অন্যদিকে অত্যাচারী ইংরেজদের এদেশ থেকে বিতাড়িত করা। এছাড়া এ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল—

১. মুসলমানদের ইসলামের ফরজ বা অবশ্যপালনীয় কর্তব্যগুলো আদায়ে উদ্বুদ্ধ করা।
২. মুসলমানদের ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করে প্রকৃত ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত করা।
৩. ইসলাম পরিপন্থি রীতিনীতি ও কুসংস্কার ত্যাগ করা।
৪. মুসলমানদের অধিকার ও কর্তব্যসচেতন হিসেবে গড়ে তোলা।
৫. মুসলমানদের ধার্মিক ও উন্নত নৈতিকতাবোধসম্পন্ন মানুষে পরিণত করা।
৬. ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মুসলমানদের প্রতিবাদী করে তোলা।

আন্দোলনের কেন্দ্র ও বিস্তৃতি: ফরায়েজি আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল ফরিদপুর জেলা। পরবর্তী পর্যায়ে তা বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ফরায়েজি আন্দোলন ফরিদপুর থেকে ঢাকা, ময়মনসিংহ ও বরিশালসহ বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে এবং সব এলাকায় কৃষক-শ্রমিকসহ মেহনতি মানুষের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

ফরায়েজি আন্দোলনের প্রকৃতি (Nature of Faraizi Movement)

অনৈসলামিক কার্যকলাপ বন্ধের চেষ্টা: ফরায়েজি আন্দোলনের অন্যতম প্রধান দিক ছিল শিরক, বিদআত ইত্যাদি অনৈসলামিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার চালানো। শরীয়তউল্লাহ মুসলমানদের কবরপূজা, পিরপূজা ইত্যাদি শিরকমূলক কাজ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেন। তিনি মহানবি (স) এর দুই দৌহিত্র ইমাম হাসান ও হোসেনের শাহাদত দিবসে অস্বাভাবিক উন্মাদনাপূর্ণ শোক প্রকাশকে শরিয়তবহির্ভূত বলে আখ্যা দেন। বাংলায় সে সময়ে অনেক পিরের জন্মদিবস উপলক্ষে 'ভেলা উৎসব' হতো, যাতে কলা পাতায় প্রদীপ জ্বালিয়ে পানিতে ভাসিয়ে দেওয়া হতো। শরীয়তউল্লাহ এ ধরনের কাজকে শিরক ও বিদআত ঘোষণা করে তা বর্জন করার নির্দেশ দেন। তিনি পির ও মুরিদের পরিবর্তে 'ওস্তাদ ও সাগরেদের' সম্পর্ক স্থাপন করেন। বিবাহ অনুষ্ঠানকে আড়ম্বরহীনভাবে পালনেরও পরামর্শ দেন শরীয়তউল্লাহ।

ইংরেজ শাসনের বিরোধিতা: এদেশে ইংরেজ শাসনকে হাজি শরীয়তউল্লাহ অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখতেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, ইংরেজদের হাত থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত দেশের সার্বিক মঙ্গল সম্ভব নয়। সে কারণে তিনি ইংরেজ শাসনাধীনে থাকা এদেশকে 'দারুল হরব' (বিধর্মীর রাজ্য) বলে ঘোষণা করেন। এ. আর. মল্লিক বলেন, "তার ধর্মসংস্কার আন্দোলনের প্রধান শর্ত ছিল দুই ঈদের এবং শুক্রবারের নামাজ না পড়া।"[১] ভারতবর্ষে মুসলমান শাসক না থাকায় হাজি শরীয়তউল্লাহ এখানকার মুসলমানদের জুমা ও ঈদের নামাজ আদায় করতে নিষেধ করেন। তিনি ঘোষণা করেন, মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত জুমা ও ঈদের নামাজ আদায় স্থগিত থাকবে।

ফরায়েজিদের সাথে অন্যদের বিরোধ: হাজি শরীয়তউল্লাহর ফরায়েজি আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করলে সাবেকি মতবাদের অনুসারীরা ব্যাপকভাবে ক্ষুব্ধ হন। শরীয়তউল্লাহ পিরবাদের বিরোধিতা করায় সমকালীন মাওলানা শাহ কেরামত আলী জৈনপুরি তার বিরোধিতা করেন। তিনি ফতোয়া দেন, ফরায়েজিরা ইসলাম ধর্ম ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে নেমেছে। মাওলানা কেরামত আলী জৈনপুরি এদেশকে 'দারুল আমান' (নিরাপত্তার দেশ) বলে আখ্যায়িত করেন এবং ইংরেজ শাসকদের সাথে সম্প্রীতি রক্ষার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করেন।

ফরায়েজিদের ভ্রাতৃত্ববোধ: ফরায়েজি আন্দোলনের অন্যতম দিক ছিল এর অনুসারীদের ভ্রাতৃত্ববোধ। ফরায়েজিরা সৎ পথে উপার্জন, নৈতিক জীবন ও শ্রমের মর্যাদা ইত্যাদি অভিন্ন মূল্যবোধের প্রতি অনুগত ছিলেন। শরীয়তউল্লাহ পরিশ্রম করে সৎপথে অর্থ উপার্জনের আদর্শ তুলে ধরছেন। ফরায়েজিদের মধ্যে শ্রমের মর্যাদাবোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে সব পেশার মানুষকেই তিনি শ্রমিক বলে সম্মান জানান। এসব আদর্শ অনুসরণের মধ্য দিয়ে ফরায়েজিদের মধ্যে এক প্রকার ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হয়েছিল।

পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রবর্তন: হাজি শরীয়তউল্লাহ সর্বপ্রথম বাংলার মুসলিম সমাজে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রচলন করেন। পরবর্তীকালে তার পুত্র দুদু মিয়ার নেতৃত্বে পূর্ববঙ্গের ফরায়েজি প্রভাবিত অঞ্চলে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে কার্যত সমান্তরাল আরেকটি সরকারি ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। প্রত্যেক ফরায়েজি গ্রামের অধিবাসীরা একজন নেতা নির্বাচিত করত যাকে বলা হতো 'গাঁও খলিফা'। আবার গাঁও খলিফারা মিলিত হয়ে প্রত্যেক থানার জন্য একজন 'পির খলিফা' নির্বাচিত করতেন।

স্থানীয় জমিদারদের সাথে সংঘর্ষ: তৎকালীন কোনো কোনো অত্যাচারী হিন্দু জমিদার বিভিন্ন পূজার সময় মুসলমান প্রজাদেরও উৎসব কর দিতে বাধ্য করতেন। জমিদারদের কেউ কেউ মুসলমান প্রজাদের দাড়ি রাখার জন্যও কর আরোপ করেন। হাজি শরীয়তউল্লাহ মুসলমানদের এসব অবৈধ কর না দেওয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু তার সংস্কার কর্মকাণ্ডকে হিন্দু জমিদার ও এক শ্রেণির কায়েমি স্বার্থবাদী মুসলমান সহ্য করতে পারেনি। তারা শরীয়তউল্লাহর চরম বিরোধিতা করে। এ প্রেক্ষাপটে হাজি শরীয়তউল্লাহ অত্যাচারী জমিদারদের হাত থেকে তার অনুসারীদের রক্ষা করার জন্য একটি লাঠিয়াল বাহিনী গড়ে তোলেন। জমিদাররা নানা অজুহাতে ফরায়েজিদের ওপর অত্যাচার করতেই থাকে। ফরায়েজিদের বিরুদ্ধে তারা অত্যাচারী ইংরেজ নীলকরদের সাথে হাত মেলায়। এছাড়া ইংরেজ প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও বিচারকমণ্ডলীকে ফরায়েজিদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করতে সচেষ্ট হয়।

---

[১] The chief innovations introduced by him were the non-observance of Friday prayers and the two 'Ids (Eids). Ref. A. R. Mallick- *British Policy and the Muslims in Bengal (1757-1856), Bangla Academy, 1977, p-79)*

শরীয়তউল্লাহর মৃত্যু ও দুদু মিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণ: ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে হাজি শরীয়তউল্লাহর মৃত্যুর পর তার সুযোগ্য পুত্র মোহসেন উদ্দিন আহমেদ ওরফে দুদু মিয়া ফরায়েজি আন্দোলনের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন। শরীয়তউল্লাহর সময় ফরায়েজি আন্দোলন ছিল মূলত ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন। দুদু মিয়া তার প্রজ্ঞা ও অসাধারণ সাংগঠনিক দক্ষতার বলে একে একটি ব্যাপকতর প্রজা আন্দোলনে পরিণত করেন। তার নেতৃত্বে ফরায়েজি আন্দোলন অত্যাচারী জমিদার, নীলকর ও মহাজন শ্রেণির বিরুদ্ধে বাংলার শোষিত কৃষক ও মেহনতি মানুষের এক দুর্বার অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংগ্রামে রূপ নেয়। দুদু মিয়া পূর্ব বঙ্গের ঢাকা, সাতক্ষীরা, যশোর, পাবনা এবং পশ্চিমবঙ্গের বারাসাত ও নদীয়া অঞ্চলে ফরায়েজি আন্দোলনের বিস্তার ঘটান।

পঞ্চায়েত ও লাঠিয়াল বাহিনী গঠন: দুদু মিয়া ফরায়েজি আন্দোলনকে একটি শক্তিশালী সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় আনেন। তিনি তার নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলকে কয়েকটি ইউনিটে বিভক্ত করেন এবং গ্রামাঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী "পঞ্চায়েত ব্যবস্থা" পুনরুজ্জীবিত করেন। অত্যাচারী জমিদার, জোতদার, মহাজন ও নীলকরদের হাত থেকে তার অনুসারী প্রজাদের রক্ষার জন্য দুদু মিয়াও পিতার মতো লাঠিয়াল বাহিনী গঠন করেছিলেন। এক পর্যায়ে এ আন্দোলনে ভীত হয়ে জমিদার ও নীলকররা দুদু মিয়ার বিরুদ্ধে অনেকগুলো মামলা করেন। তবে সরকার দুদু মিয়াকে গ্রেপ্তার করলেও প্রমাণের অভাবে শাস্তি দিতে ব্যর্থ হয়। ১৮৬২ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

পরবর্তী নেতৃত্ব: দুদু মিয়ার মৃত্যুর পর ১৮৮৪ সাল পর্যন্ত তার পুত্র নয়া মিয়া ফরায়েজি আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। এরপর তার ভাই সৈয়দ উদ্দিন আহমেদ ফরায়েজিদের নেতা নির্বাচিত হন। সৈয়দ উদ্দিনের পর তার জ্যেষ্ঠ পুত্র রশিদ উদ্দিন আহমেদ বাদশাহ মিয়া এ আন্দোলন পরিচালনা করেন। তার নেতৃত্বে ফরায়েজিরা ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারতের স্বাধীনতার পর সৃষ্টি হওয়া পাকিস্তান রাষ্ট্রকে 'দারুল ইসলাম' বলে ঘোষণা করে। তখন এর অনুসারীদের জুমা ও ঈদের নামাজ পড়ার অনুমতি দেওয়া হয়।

ফরায়েজি আন্দোলনের তাৎপর্য

অষ্টাদশ শতকে যেসব আন্দোলন-সংগ্রাম বাংলার ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল ফরায়েজি আন্দোলন তার অন্যতম। একে বাংলার মুসলিম সমাজের বিকাশ এবং ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য পর্ব হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

পূর্ব বাংলার মুসলিম সমাজ যখন কুসংস্কারে নিমজ্জিত, গরিব কৃষকসহ নিরীহ জনসাধারণ ইংরেজদের কুশাসন এবং জমিদার, মহাজন ও নীলকরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ, ঠিক সেই ক্রান্তিকালে আবির্ভাব ঘটে হাজি শরীয়তউল্লাহর। শরীয়তউল্লাহ ফরায়েজি আন্দোলনের মাধ্যমে ধর্মীয় সংস্কারের পাশাপাশি বাংলার মুসলমান সম্প্রদায় তথা গরিব কৃষকশ্রেণির ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা করেন। ফরায়েজি আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী না হলেও মুসলিমদের জাগিয়ে তোলার পাশাপাশি অত্যাচারী ব্রিটিশ শাসক, হিন্দু জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ফরায়েজি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা কে? *[রাবি ২০১৬-১৭; ঢাবি ২০১০-১১]*
২. 'ফরায়েজি' শব্দটি কোন শব্দ থেকে এসেছে?
৩. ফরায়েজি আন্দোলনের কেন্দ্র কোথায় ছিল? *[রাবি ২০১১-১২]*
৪. ইংরেজ শাসনাধীনে এদেশকে 'দারুল হারব' ঘোষণা করেন কে?
৫. বাংলার মুসলিম সমাজে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন কে?
৬. ফরায়েজি আন্দোলনকে সাংগঠনিক রূপ দেন কে?

উত্তরের জন্য ৩০৬ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

ফরায়েজি আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য চিহ্নিত করে এর গতি-প্রকৃতির আলোকে একটি ছক তৈরি করো।

পাঠ ৫

তিতুমীরের বিদ্রোহ
Revolt of Titumir

তিতুমীরের পরিচয় (Identification of Titumir)

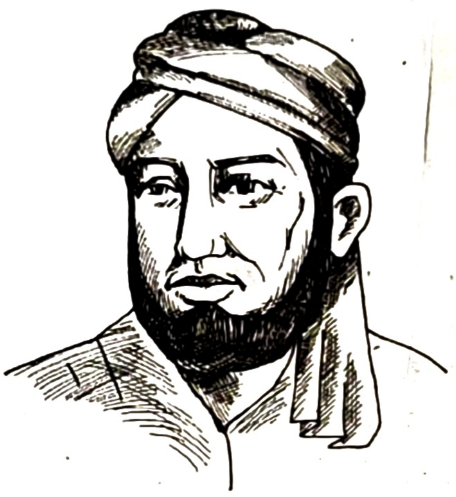

তিতুমীর

সৈয়দ মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমীর বাঙালির বিদ্রোহ আর প্রতিরোধের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল নাম। তিনি ১৭৮২ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের উত্তর-চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসাত মহকুমার অন্তর্গত চাঁদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিতুমীরের বাবার নাম সৈয়দ মীর হাসান আলী এবং মায়ের নাম আবিদা রুকাইয়া খাতুন। তিনি নিজ গ্রামে শিক্ষাগ্রহণ শুরু করেন। পরে মাদ্রাসায় পড়াশোনা করে অল্প বয়সের মধ্যেই বাংলা, আরবি, ফার্সি ও উর্দু ভাষা, শরিয়ত ও তরিকত এবং গণিত বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন। ১৮ বছর বয়সে তিনি কুরআনের হাফেজ হন। পাশাপাশি তরুণ বয়সেই লাঠিয়াল ও কুস্তিগীর হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। তিতুমীর ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দে মক্কায় হজব্রত পালন করতে গিয়ে তিনি তৎকালীন ভারতের অন্যতম নেতৃস্থানীয় মুসলিম ব্যক্তিত্ব সৈয়দ আহম্মদ শহীদ বেরলভীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। আহম্মদ রেলভীর কাছ থেকে সমাজ সংস্কার ও জিহাদের অনুপ্রেরণা নিয়ে তিতুমীর ১৮২৭ খ্রিষ্টাব্দে স্বদেশে ফিরে আসেন। এরপর তিনি বাংলার মুসলিম সমাজে এক ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলন পরিচালনা করেন। দরিদ্র কৃষকদের স্বার্থরক্ষা করতে তিনি অত্যাচারী জমিদার ও ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এবং প্রথম অস্ত্রধারণ করে শহিদ হন। তিতুমীর ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রাম ও মুসলিম জাগরণের এক অগ্রসৈনিক হিসেবে বাংলার ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

বাংলায় ব্রিটিশ শাসনবিরোধী সংগ্রামে তিতুমীর-এর অবদান
Contributions of Titumir in the anti-British Movement in Bengal

তিতুমীরের কর্মপ্রচেষ্টা ও লক্ষ্য: সৈয়দ আহমদ বেরলভীর বিপ্লবী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিতুমীর এদেশের মুসলমানদের মধ্যে নবজাগরণ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। তার প্রধান লক্ষ্য ছিল তিনটি—

প্রথমত, সবাইকে সমাজসংস্কার ও ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারে উদ্বুদ্ধ করা; **দ্বিতীয়ত,** অত্যাচারী জমিদার ও নীলকরদের শোষণ থেকে জনগণকে মুক্ত করা এবং **তৃতীয়ত,** ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

লক্ষ্য অর্জনে তিতুমীরের গৃহীত কর্মপন্থা: তিতুমীর তার লক্ষ্য অর্জনে বেশ কিছু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। এগুলো হলো—

সমাজসংস্কার ও ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তার: তিতুমীর মক্কায় হজব্রত পালন শেষে ১৮২৭ খ্রিষ্টাব্দে দেশে ফেরার পর পশ্চিমবঙ্গের নারিকেলবাড়িয়ার নিকটবর্তী হায়দারপুরে খানকাহ নির্মাণ করেন। তিনি সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরলভীর 'তরিকা-ই-মোহাম্মদীয়া' সুন্নি মতবাদ প্রচার শুরু করেন। তিতুমীর ইসলাম ধর্মের প্রকৃত আদর্শ অনুসরণ এবং পিরপূজা, কবর পূজাসহ বিভিন্ন অনৈসলামিক রীতিনীতি পরিত্যাগ করার জন্য বাংলার মুসলিম সমাজের প্রতি আহ্বান জানান। তিতুমীরের ধর্মীয় শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারমূলক কার্যক্রমে আকৃষ্ট হয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে অসংখ্য সাধারণ মানুষ তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। বিভিন্ন মহলের বিরোধিতা সত্ত্বেও দিনে দিনে বাংলার অনেক অঞ্চলে তিতুমীরের আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার বলেন, "কলকাতার উত্তর ও পূর্বের জেলাগুলোতে গিয়ে তিনি বহু লোককে নিজের মতবাদে দীক্ষিত করেন।"[১]

---

[১] Ref: W. W. Hunter, *The Indian Musalmans*, অনু. আবদুল মওদুদ; *দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস*, পৃ. ২৮-২৯

শোষিত ও উৎপীড়িত কৃষক সম্প্রদায়কে সংগঠিতকরণ: তিতুমীর শোষণ, নিপীড়ন ও নির্যাতন দূর করে একটি আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেন। এ সময় বাংলার দরিদ্র কৃষক সম্প্রদায়ের ওপর জমিদার ও নীলকরদের শোষণ ও উৎপীড়ন মারাত্মক আকার ধারণ করেছিল। তিতুমীর অত্যাচারী জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগঠিত করতে থাকেন। ইতিহাসবিদ উইলিয়াম উইলসন হান্টার বলেন, "হিন্দু জমিদাররা তার প্রজাদের ওপর যেসব ছোট-খাটো অত্যাচার করত তার ফলে এ সময় একটা কৃষক আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং তিনি এর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।"[৩] তিতুমীর কৃষকদের তাদের অধিকারসহ বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করে তোলেন। তিতুমীরের নেতৃত্বে হাজারও কৃষক কায়েমি স্বার্থবাদীদের শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় এবং এক পর্যায়ে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

জেনে রাখো

বাংলায় আগত ইউরোপীয় বেনিয়া গোষ্ঠী যারা নীল চাষের ব্যবসা করত তারা 'নীলকর সাহেব' নামে পরিচিত ছিল। চন্দননগরে বসতি স্থাপনকারী ফরাসি নাগরিক লুই বোনার্ড হচ্ছেন প্রথম ইউরোপীয় নীলকর, যিনি ১৭৭৭ সালে বাংলায় আসেন। নীল একটি প্রাকৃতিক রং। কৃত্রিম নীল রং আবিষ্কারের আগে এ রং দিয়ে কাপড় রঙিন করা হতো। এজন্য নীলের খুব চাহিদা ছিল। বাংলায় ভালো নীল জন্মাত বলে ইংরেজরা এদেশের কৃষকদের নীল চাষে বাধ্য করত। কেউ অস্বীকৃতি জানালে নীলকরেরা তাদের ওপর অমানবিক নির্যাতন চালাত। ফলে বাংলায় ১৮৬০ সালে নীল বিদ্রোহ দেখা দেয়। এ বিদ্রোহের পর নীলচাষ চাষীদের ইচ্ছাধীন করা হয়।

জমিদার ও নীল কুঠিয়ালদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ: জমিদারদের অত্যাচারে তখন বাংলার কৃষকদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। এ জমিদারদের বেশিরভাগ ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের। তারা কৃষকের ওপর নানা অজুহাতে বিভিন্ন রকম কর, খাজনা আরোপ করে তা জোর করে আদায় করত। অন্যদিকে বিদেশি নীলকরেরা কৃষকদের ধানপাট বা অন্য শস্যের পরিবর্তে নীলচাষে বাধ্য করত। তিতুমীর একজন অসাম্প্রদায়িক নেতা হিসেবে এসব হিন্দু জমিদার ও অত্যাচারী বিদেশি নীলকরদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। তিনি অন্যদের মধ্যে সরফরাজপুরের প্রভাবশালী জমিদার কৃষ্ণদেব রায় এবং উত্তর চব্বিশ পরগনার টাকি ও গোবরডাঙার জমিদার কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ও মোল্লাহাটির নীলকুঠিয়াল ডেভিসের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন (১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর ও তার পরে)। এরা সবাই তিতুমীরের বাহিনীর কাছে পরাস্ত হন।

ব্রিটিশ শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও বাঁশের কেল্লা: বিভিন্ন যুদ্ধে স্থানীয় জমিদার ও নীলকররা তিতুমীরের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। এতে তারা তিতুমীরের বাহিনীকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে ইংরেজ শাসকদের তার বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে। এ প্রক্রিয়ায় তারা প্রথমে তিতুমীরকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসকদের কাছে দেশদ্রোহী হিসেবে তুলে ধরে। কিন্তু তিতুমীরের পক্ষ থেকে জানানো হয়, তার সংগ্রাম কোম্পানির শাসনের বিরুদ্ধে নয়। তিনি জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচার থেকে দরিদ্র কৃষকদের রক্ষা করার চেষ্টা করছেন মাত্র। কিন্তু কোম্পানি কর্তৃপক্ষ তিতুমীরের কথায় কর্ণপাত না করে তাকে শায়েস্তা করার উদ্যোগ নেয়। এ পরিস্থিতিতে তিতুমীর ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তিনি ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে চব্বিশ পরগনা, নদীয়া এবং ফরিদপুর এই তিনটি অঞ্চলের কিছু কিছু অংশে স্বাধীন এলাকা গঠন করেন। বাংলার ইতিহাসে এ ঘটনা 'বারাসাত বিদ্রোহ' নামে পরিচিত। এ বিদ্রোহের খবরে বারাসাতের ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডার কয়েকশ সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে তিতুমীরের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। কিন্তু তিতুমীরের সুযোগ্য নেতৃত্বে ও তার সেনাপতি গোলাম মাসুম খানের রণনৈপুণ্যে ইংরেজ বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। তিতুমীর জানতেন, ইংরেজরা তার বিদ্রোহ দমনে আবার হামলা করবে। তাই সম্ভাব্য আক্রমণ মোকাবিলা করতে তিনি ১৮৩১ সালে নারিকেলবাড়িয়ায় একটি ঘাঁটি স্থাপন করেন। ঘাঁটির প্রতিরক্ষার জন্য সেখানে বাঁশ দিয়ে একটি মজবুত কেল্লা অর্থাৎ দুর্গ নির্মাণ করেন। এটাই ছিল তিতুমীরের ঐতিহাসিক 'বাঁশের কেল্লা'। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক উইলিয়াম হান্টারের মতে, তিতুমীরের গণবাহিনীর সদস্যদের ঐ বাঁশের কেল্লায় সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। গণবাহিনীর সদস্যসংখ্যা ছিল প্রায় ৮৩ হাজার।

---

[৩] Ref: W. W. Hunter, *The Indian Musalmans*, অনু. আবদুল মওদুদ; *দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস*, পৃ. ২৯

ব্রিটিশদের সঙ্গে শেষ মোকাবিলা: বিদ্রোহী তিতুমীরের অব্যাহত শক্তিবৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে উদ্বিগ্ন জমিদারেরা ভারতের তৎকালীন বড়লাট লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংকের কাছে তাকে দমন করার আবেদন করেন। বেন্টিংকের নির্দেশে কোম্পানির কর্মকর্তারা তিতুমীরকে শায়েস্তা করতে লেফটেন্যান্ট কর্নেল স্টুয়ার্টের নেতৃত্বে একটি সুসজ্জিত বাহিনী প্রেরণ করেন। স্টুয়ার্টের বাহিনী ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ নভেম্বর তিতুমীরের কেল্লা আক্রমণ করে। তিতুমীর ও তার বাহিনী তীর-ধনুক, লাঠি, বর্শা ও তলোয়ার ইত্যাদি দেশি অস্ত্র নিয়ে বীরবিক্রমে কোম্পানির বাহিনীর মোকাবিলা করে। কিন্তু ইংরেজদের আগ্নেয়াস্ত্র ও কামানের গোলার আঘাতে বাঁশের কেল্লা একসময় ভেঙে পড়ে। পরাজয় হয় তিতুমীরের। বিশ্লেষকেরা বলেন, অতিমাত্রায় ধর্মীয় আবেগ নির্ভরতা, রাজনৈতিক ও যুদ্ধকৌশলগত সীমাবদ্ধতা এবং আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের অভাবে তিতুমীরের বাহিনী পরাজিত হয়। বিদ্রোহী তিতুমীর যুদ্ধ করতে করতে শহিদ হন। তার বাহিনীর সদস্যরা একপর্যায়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। অনেকেই শহিদ বা আহত হন। বিদ্রোহের অভিযোগে ইংরেজরা সেনাপতি মাসুম খানকে মৃত্যুদণ্ড এবং তার ১৪০ জন যোদ্ধাকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেয়। এভাবেই প্রতিবাদী বীর তিতুমীরের সংগ্রামের পরিসমাপ্তি ঘটে।

তিতুমীরের আন্দোলনের স্বরূপ বা প্রকৃতি: তিতুমীরের আন্দোলনের স্বরূপ বা প্রকৃতি বিষয়ে ঐতিহাসিকেরা একমত নন। ঐতিহাসিকদের কেউ একে একটি ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন, কেউ প্রজাবিদ্রোহ আবার কেউবা সাম্প্রদায়িক আন্দোলন বলে আখ্যা দিয়েছেন। সার্বিকভাবে এ আন্দোলনের প্রকৃতি নির্ধারণে একে একটি ধর্মীয়-সামাজিক আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। প্রজাবিদ্রোহ বিষয়ক মতটিও অগ্রহণযোগ্য নয়। তবে তিতুমীরের সংগ্রামকে একটি সাম্প্রদায়িক বিদ্রোহ বলাটা যৌক্তিক নয়। কারণ তার আন্দোলন কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ছিল না। তা ছিল অত্যাচারী ইংরেজ শাসক ও এদেশীয় জমিদারদের বিরুদ্ধে। ঘটনাক্রমে বাংলার জমিদারদের বেশিরভাগই হিন্দু সম্প্রদায়ের হওয়ায় তিতুমীরের বিরোধীরা একে হিন্দুদের বিরুদ্ধে একটি ধর্মীয় আন্দোলন বলে আখ্যা দিয়েছেন। এটি তাদের একটি অপকৌশল মাত্র। বস্তুত তিতুমীরের পরিচালিত আন্দোলনটি ছিল একটি ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার এবং প্রজা অধিকার রক্ষার আন্দোলন।

তিতুমীরের বিদ্রোহের তাৎপর্য: ইংরেজ ও জমিদারদের বিরুদ্ধে তিতুমীরের বিদ্রোহ সফল হয়নি। কিন্তু এ বিদ্রোহকে কোনোভাবেই নিরর্থক বলা যাবে না। কারণ এই সশস্ত্র আন্দোলন ছিল গণবিপ্লব। যদিও অত্যাচারী জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে বাংলার নিপীড়িত কৃষক ও তাঁতি-জোলাদের নিয়ে পরিচালিত তিতুমীরের সংগ্রাম ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। তিতুমীরের প্রতিরোধ পরবর্তীকালে ভারতীয়দের— বিশেষ করে বাঙালির কাছে নিঃসন্দেহে স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম বড় প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল। ইংরেজদের সঙ্গে তিতুমীরের চূড়ান্ত যুদ্ধের মাত্র আড়াই দশক পর, ১৮৫৭ সালে ঘটে সিপাহি বিদ্রোহ। অনেকে এ বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলে থাকেন। কারো কারো মতে, তিতুমীরের বিদ্রোহ ছিল সিপাহি বিদ্রোহের পেছনে অন্যতম প্রেরণাদায়ী ঘটনা। ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার পর পাকিস্তান আমলে পূর্ব বাংলার মানুষের অধিকার আদায়ের বিভিন্ন আন্দোলন এবং স্বাধীনতার সংগ্রামেও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে তিতুমীরের অদম্য প্রতিরোধের স্মৃতি।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. তিতুমীরের প্রকৃত নাম কী?
২. ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে প্রথম শহিদ হন কে?
৩. তিতুমীর জমিদারদের বিরুদ্ধে কাদের সংগঠিত করেন?
৪. মুসলমানদের দাঁড়ির ওপর কর ধার্য করে কে?
৫. নারিকেলবাড়িয়ায় বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন কে?
৬. ব্রিটিশরা কত সালে বাঁশের কেল্লা ধ্বংস করে?

উত্তরের জন্য ৩০৬ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. দলীয় কাজ

দুটি দলে বিভক্ত হয়ে বাংলার ব্রিটিশ শাসনবিরোধী সংগ্রামে শহিদ তিতুমীরের অবদান সম্পর্কিত দুটি স্লাইড তৈরি করে শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিতে উপস্থাপন করো।

পাঠ ৬

১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ
The Sepoy Mutiny of 1857

সিপাহি বিদ্রোহের পটভূমি (Background of the Sepoy Mutiny)

ইংরেজ বণিকেরা ভারতবর্ষে বাণিজ্য করতে এলেও কালক্রমে তাদের বাণিজ্যের তুলাদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত হয়। ১৭৫৭ সালের ঐতিহাসিক পলাশি যুদ্ধের পর একশ বছরের মধ্যে বিশাল ভারতবর্ষে ইংরেজদের সর্বসময় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতবর্ষের প্রভু হয়ে ইংরেজ সরকার ভারতীয় মুসলমানদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতমূলক আচরণ করে। ব্রিটিশরা মুঘল শাসকদের কাছ থেকেই ভারতের ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল বলে মুসলিম সম্প্রদায়ের মনে ছিল ক্ষোভের আগুন। এমন প্রেক্ষাপটে ভারতীয়দের মধ্যে প্রতিরোধের চেতনা দানা বাঁধতে থাকে। মুসলমানরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটায় ওহাবি ও জিহাদি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। তবে এসব আন্দোলন ক্ষুদ্র পরিসরে সংঘটিত হয়েছিল। ১৮৫৭-১৮৫৮ সালের সিপাহি বিদ্রোহ ছিল সর্বভারতীয় আন্দোলন। এ বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধও বলা হয়। হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের সিপাহিরাই এতে অংশ নেয়। ভারতের ইতিহাসে সিপাহি বিদ্রোহকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের কারণসমূহ (The Causes of the Sepoy Mutiny of 1857)

রাজনৈতিক কারণ: পলাশির যুদ্ধের পর থেকে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আর্থিক ও সামরিক ক্ষমতা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ব্রিটিশদের সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রবণতা ক্রমেই বৃদ্ধি পায়, যা আঠারো শতকের মাঝামাঝি চরম পর্যায়ে পৌঁছায়। ভারতের তখন পর্যন্ত স্বাধীন 'দেশীয় রাজ্যগুলো' প্রচণ্ড চাপ অনুভব করতে থাকে। ১৮৪৮ থেকে ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর জেনারেল থাকা লর্ড ডালহৌসি 'স্বত্ববিলোপ নীতি' নামে রাজ্য বিস্তারের এক বিতর্কিত নীতি অনুসরণ করে বেশ কয়েকটি দেশীয় রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তারা আরও বেশ কয়েকবছর আগেই স্বত্ববিলোপ নীতি অনুমোদন ও প্রয়োগ করলেও লর্ড ডালহৌসি সবচেয়ে ব্যাপকভাবে এটি ব্যবহার করেন। এ কারণে তার নামের সঙ্গেই এ নীতি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। স্বত্ববিলোপ নীতিতে দেশীয় রাজারা বৈধ পুরুষ উত্তরাধিকারী না রেখে মারা গেলে তাদের রাজ্য ব্রিটিশ শাসনাধীনে নেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়। এতে নিঃসন্তান রাজাদের বহুদিনের অনুসৃত দত্তক পুত্র গ্রহণের অধিকার অস্বীকার করা হয়। ডালহৌসি এ নীতি অনুসারে সাতারা, নাগপুর, ঝাঁসি এবং অন্য কয়েকটি রাজ্য দখল করেন। স্বত্ববিলোপ নীতি দ্বারা বিশেষ উপাধি ও রাজাদের উত্তরাধিকারীদের বৃত্তি বাতিল করা, শেষ মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে দিল্লির প্রাসাদ থেকে বের করার পরিকল্পনা ইত্যাদি ভারতীয় রাজন্যবর্গ ও সাধারণ মানুষ উভয়ের মধ্যে দারুণ ক্ষোভ সৃষ্টি করে। এছাড়া লর্ড কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত প্রশাসনিক সংস্কারে ভারতীয় মুসলমানদের উচ্চ পদ থেকে বাদ দেওয়ার ঘটনায় এ জনগোষ্ঠী ক্ষুব্ধ ছিল। সার্বিকভাবে বলা যায়, ব্রিটিশ রাজকর্মচারীদের অত্যাচার তথা ঔপনিবেশিক শোষণ প্রথম থেকেই ভারতীয়দের ইংরেজ শাসনের প্রতি বিরূপ করে তুলেছিল।

জেনে রাখো

লর্ড চার্লস কর্নওয়ালিস (Lord Charles Cornwallis) একজন ব্রিটিশ সামরিক অধিনায়ক ছিলেন। তিনি ১৭৮৬ সালে ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। ১৭৯৩ সাল পর্যন্ত তিনি ভারত শাসন করেন। কর্নওয়ালিস ১৭৯৩ সালে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' আইন পাস করে বিখ্যাত হয়ে আছেন। এছাড়া তার প্রণীত উল্লেখযোগ্য আইন হলো— অ্যাক্ট অব ইউনিয়ন (বাংলার জমি মালিক ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে সম্পাদিত একটি চুক্তি)। লর্ড কর্নওয়ালিস ১৮০৫ সালের ৫ অক্টোবর ভারতের গাজীপুরের গাউসপুরে মারা যান।

সামরিক কারণ: সিপাহি বিপ্লবের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল সামরিক। ভারতে মুঘল শাসনের সময় মুসলমানরা বিশেষ করে রাজস্ব ও বিচার বিভাগ এবং সেনাবাহিনীতে চাকরির ক্ষেত্রে এগিয়ে ছিল। কিন্তু ইংরেজরা ক্ষমতা দখলের পর ওইসব দপ্তর থেকে তাদের বহিষ্কার করা হয়। ফলে মুসলমান সৈনিকসহ কর্মজীবী শ্রেণির অনেকের অবস্থাই খারাপ হয়ে পড়ে। ইংরেজরা সেনাবাহিনীতে পদোন্নতি, বেতনভাতা ও সুযোগ-সুবিধার দিক থেকে দেশীয় সৈনিকদের সাথে পক্ষপাতমূলক আচরণ করত। এক হিসাবে দেখা যায়, মোট ৩ লক্ষ ১৮ হাজার ২০ জন সিপাহি এবং দেশীয় অফিসারের জন্য ৯৮ লক্ষ পাউন্ড ব্যয় করা হতো। অথচ মাত্র ৫১ হাজার ৩১৬ জন ইউরোপীয় সিপাহি ও অফিসারের জন্য ব্যয় করা হতো ৫৬ লক্ষ ৬৮ হাজার পাউন্ড। দেশীয় সৈন্যদের ভারতের বাইরে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করত। ব্রাহ্মণ সৈন্যদের সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বিদেশে চাকরি করতে যাওয়া ধর্মীয় দিক থেকে নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু ১৮৫০ সালে নতুন করে তাদের বিদেশে যুদ্ধ করতে যেতে বাধ্য করা হয়। দেশের বাইরে যুদ্ধ করতে গেলে সৈন্যদের যে বাড়তি ভাতা দেওয়া হতো তাও বাতিল করা হয়। ফলে দেশীয় সৈন্যদের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

অর্থনৈতিক কারণ: ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের পেছনে অর্থনৈতিক কারণও বিদ্যমান ছিল।

প্রথমত: ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আগ্রাসী ভূমিনীতির (চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত) ফলে বহু ভূস্বামী মালিকানা স্বত্ব প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়ে তাদের ভূসম্পত্তি হারায়। এতে এক সময়ের প্রভাবশালী এ শ্রেণিটি ভূমিদখলকারী কোম্পানির শাসনের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয়ত: বেনিয়া থেকে শাসকে পরিণত হওয়া ইংরেজরা সাম্রাজ্যবাদী নীতি প্রয়োগ করে অনেক দেশীয় রাজ্য ও জমিদারি আত্মসাৎ করে নেয়। ফলে জমিদার ও তালুকদারশ্রেণির অনেকেই তাদের ভূসম্পত্তি ও সামাজিক মর্যাদা হারায়। শ্রমজীবী কৃষক-শ্রমিকদের পাশাপাশি জমিদারদেরও দুর্দিন নেমে এলে দেশের অর্থনীতিতে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এতে প্রায় সব শ্রেণির মানুষের মধ্যে কোম্পানি সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ দানা বেঁধে ওঠে।

তৃতীয়ত: ভারতে ইংরেজদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে তারা এদেশের বাজার দখলের জন্য অনেক নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যও ব্রিটেন থেকে আমদানি করতে থাকে। ফলে ধীরে ধীরে দেশীয় শিল্প ধ্বংস হতে থাকে এবং অর্থনীতিতে বিপর্যয় নেমে আসে।

চতুর্থত: ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষের স্বর্ণ, রৌপ্য, বিভিন্ন রকম রত্ন ও মূল্যবান সামগ্রী (বিখ্যাত হিরা 'কোহিনূর' অন্যতম) লুটপাট বা কৌশলে হস্তগত করে ব্রিটেনে পাচার করে। এটিও ভারতের অর্থনীতির দুর্গতিতে ভূমিকা রাখে। এ কারণে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি সমাজের সর্বস্তরের মানুষের ক্ষোভ বাড়তে থাকে।

সামাজিক কারণ: সিপাহি বিদ্রোহের বিভিন্ন সামাজিক কারণ ছিল।

প্রথমত: ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী বরাবরই সাধারণ ভারতীয়দের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলত। ভারতীয়দের তারা জাতিগতভাবে পশ্চাদপদ ও নিজেদের শাসন করতে অক্ষম হিসেবে দেখত। গোলাম হোসেন তবাতবাইয়ের রচিত গ্রন্থে *(সিয়ার উল মুতাখিরিন)* ভারতীয়দের প্রতি কোম্পানির ইংরেজ শাসকদের এরূপ মনোভাবের বিবরণ পাওয়া যায়। শ্বেতাঙ্গ ইংরেজদের এ মনোভাব ভারতীয়দের সাথে তাদের স্থায়ী দূরত্ব সৃষ্টি করেছিল।

দ্বিতীয়ত: ঔপনিবেশিক ভারতে দেশীয় সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে বৈষম্যমূলক ও অবমাননাকর আচরণ করা হতো। ব্রিটিশ সৈন্যরা সর্বোচ্চ সুবিধাভোগের পরও ভারতীয় সহকর্মীদের সাথে দুর্ব্যবহার করত। এতে সিপাহিদের মনে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়েছিল।

তৃতীয়ত: ব্রিটিশ সামরিক কর্মচারীদের ব্যভিচার, অনেক স্ত্রীলোক নিয়ে হেরেম গঠন, মদপান ইত্যাদি অনৈতিক কর্মকাণ্ড রক্ষণশীল ভারতীয় সমাজে ছিল খুবই দৃষ্টিকটু। ইংরেজদের এ ধরনের আচরণ ভারতীয় সিপাহি ও সাধারণ মানুষের কাছে তাদের একটি নেতিবাচক ভাবমূর্তি সৃষ্টি করে।

ধর্মীয় কারণ: ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের পেছনে ধর্মীয় কারণও দায়ী ছিল। এর প্রত্যক্ষ কারণটিই (এনফিল্ড রাইফেলের কার্তুজে গরু ও শূকরের চর্বি) ছিল ধর্মীয়।

প্রথমত: অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতীয় সমাজ ও ধর্মের প্রতি ব্রিটিশ শাসকেরা সহনশীল মনোভাব দেখিয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে শাসনক্ষমতা অনেকাংশে করায়ত্ত করার পর তারা ইংরেজি ভাষা ও নারী শিক্ষার প্রচলনের পাশাপাশি সতীদাহ, অস্পৃশ্যতা ও পূজার জন্য শিশু উৎসর্গসহ অনেক ধর্মীয় ও সামাজিক প্রথা নিষিদ্ধ এবং সংস্কার করে। ধর্মভীরু ও রক্ষণশীল ভারতীয় সমাজ এগুলো ভালোভাবে নেয়নি।

দ্বিতীয়ত: ভারতের দুই প্রধান ধর্মবিশ্বাস হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে ইংরেজরা অনেক সময় বিদ্রূপ করত। ইংল্যান্ডসহ ইউরোপীয় ধর্ম প্রচারকেরা সারা বিশ্বের মতো ভারতেও খ্রিষ্টধর্ম প্রচার করতেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে হতদরিদ্র ও বিপন্ন লোককে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করা হতো। ধর্মান্তরিত হলে আর্থিক সাহায্য ও সমর্থন মিলত। ১৮৫০ সালে ধর্মান্তরিতদের পৈত্রিক সম্পত্তি লাভ করার অধিকার দেওয়া হয়। এছাড়া ইংরেজ শাসকেরা ইসলামি প্রতিষ্ঠানের জন্য ওয়াকফকৃত বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করলে তা ভারতীয় মুসলমানদের ব্যাপকভাবে ক্ষুব্ধ করে।

সিপাহি বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ: রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বহুমুখী অপশাসনের কারণে যে বিপ্লবের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল, এনফিল্ড নামে নতুন রাইফেলের প্রচলন তাকে বিস্ফোরণোন্মুখ করে তোলে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকার ১৮৫৬ সালে সেনাবাহিনীতে এনফিল্ড রাইফেল চালু করে, যার কার্তুজ দাঁত

দিয়ে কেটে ঢুকাতে হতো। একসময় গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে যে, ঐ কার্তুজে গরু ও শূকরের চর্বি মাখানো রয়েছে। অভিযোগ ওঠে, হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সিপাহিদের ধর্মনাশ করতেই পরিকল্পিতভাবে তা করা হয়েছে। এ নিয়ে দেশীয় সিপাহিদের মধ্যে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এমন প্রেক্ষাপটে ১৮৫৭ সালের ২৯ মার্চ পশ্চিমবঙ্গের ব্যারাকপুরে মঙ্গাল পান্ডে নামের একজন সিপাহি প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এভাবেই সিপাহি বিদ্রোহ শুরু হয়।

১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের ঘটনাবলি (The Occurence of the Sepoy Mutiny of 1857)

১৮৫৭ সালের ২৯ মার্চ কলকাতার কাছাকাছি দমদম ও ব্যারাকপুরে মঙ্গাল পান্ডের নেতৃত্বে সিপাহি বিদ্রোহ শুরু হয়। খুব দ্রুত তা মিরাট, দিল্লি ও ভারতের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে। ১০ মে মিরাটের ৩টি রেজিমেন্টের সিপাহিরা বিদ্রোহ করে ইংরেজ সেনা অফিসারদের হত্যা করে দিল্লি অভিমুখে যাত্রা করে। স্বাধীনতাকামী ওই সিপাহিরা ১১ মে ইংরেজদের ক্ষমতাচ্যুত শেষ মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে তাদের নেতা হিসেবে ঘোষণা দেয়। এর ফলে বিদ্রোহ দ্রুতগতিতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে ও অনেক দেশীয় সৈন্য সম্রাট বাহাদুর শাহের পতাকাতলে সমবেত হয়। পরে সম্রাট একটি মন্ত্রিসভাও গঠন করেন। সম্রাটের পুত্রকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়। সিপাহি বিদ্রোহ ক্রমে ভারতজুড়ে লক্ষ্ণৌ, কানপুর, অযোধ্যা, কলকাতা এবং পূর্ব বঙ্গের ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহসহ বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। ইংরেজ সেনাদের সাথে সিপাহিদের বিভিন্ন জায়গায় প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। কানপুরে বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন নানা সাহেব, অযোধ্যায় আহম্মদ উল্লাহ, বিহারে কুমার সিংহ, রোহিলাখণ্ডে হাফিজ। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে ছিলেন সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর।

মহাবিদ্রোহ দমন: সিপাহি বিদ্রোহ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লেও শেষ পর্যন্ত তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তৎকালীন বড়লাট লর্ড ক্যানিং বিদ্রোহ দমনের জন্য সেনাপতি জন নিকলসনকে দায়িত্ব দেন। নিকলসন ১৮৫৭ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর দিল্লি দখল করেন এবং দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফরকে লালকেল্লায় নজরবন্দি করে রাখেন। এরপর ১৮৫৮ সালের মার্চ মাসে ইংরেজ সেনাপতি স্যার কলিন ক্যাম্বেল বিদ্রোহীদের পরাজিত করে লক্ষ্ণৌ দখল করেন। তবে মারাঠা বীর নানা সাহেবের নেতৃত্বে থাকা কানপুরের বিদ্রোহীদের দমন করা ইংরেজদের জন্য কঠিন হয়ে ওঠে। ১৮৫৮ সালের জুলাই মাসে ইংরেজ সেনাপতি হ্যাভলক কানপুর দখল করলে নানা সাহেব নেপালের জঙ্গালে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করেন। আরেক মারাঠা নেতা তাঁতিয়া টোপী ও ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ মধ্যভারতে ইংরেজদের মোকাবেলা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা ইংরেজ সেনানায়ক স্যার হিউ রোজের কাছে পরাজিত হন। তাঁতিয়া টোপী পরাজিত হয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় ধরা পড়েন ও পরে নিহত হন। ১৮৫৮ সালের জুন মাসে তলোয়ার হাতে লড়াই করতে করতে বীরাঙ্গানা লক্ষ্মীবাঈ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দেন। এভাবে ১৮৫৮ সালের মধ্যেই সিপাহি বিদ্রোহ দমন করা হয় এবং গোটা ভারতবর্ষে ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা, উপযুক্ত নেতৃত্ব, সংগঠন ও সাধারণ ভারতীয়দের আশানুরূপ সমর্থনের অভাবে সিপাহি বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। সাধারণ জনগণ মূলত এ বিষয়ে ছিল উদাসীন। এছাড়া সামরিক অস্ত্রসরঞ্জাম, রসদ, উন্নত নৌসেনা ও বহর এবং দেশীয় স্বার্থান্বেষী জমিদারদের অসহযোগিতা সিপাহি বিদ্রোহের ব্যর্থতার জন্য দায়ী ছিল।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সিপাহি বিদ্রোহ কত সালে সংঘটিত হয়?
২. সিপাহি বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ কী ছিল?
৩. এন্ডফিল্ড রাইফেল কত সালে চালু করা হয়?
৪. সিপাহি বিদ্রোহ কোথায় শুরু হয়? /ঢাবি ২০১১-১২/
৫. সিপাহি বিদ্রোহ প্রথম শুরু করেন কে?
৬. সিপাহি বিদ্রোহের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে কে ছিলেন?

উত্তরের জন্য ৩০৬ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. দলীয় কাজ

দুটি দলে বিভক্ত হয়ে এক দল ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের কারণ এবং অন্য দল এর ব্যর্থতার কারণ ছক আকারে লেখো।

পাঠ ৭

১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের ফলাফল
Outcome of the Sepoy Mutiny of 1857

সিপাহি বিদ্রোহের ফলাফল (Outcome of the Sepoy Mutiny)

সিপাহি বিদ্রোহ আপাতদৃষ্টিতে ব্যর্থ হলেও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে এটি যুগসন্ধিক্ষণের সূচনা করে। এই বিদ্রোহের ফলাফল নিম্নরূপ—

কোম্পানির শাসনের অবসান: সিপাহি বিদ্রোহ ভারতে ব্রিটিশ সরকারের নীতিতে এক বিরাট পরিবর্তন আনে। এ পরিবর্তনের মধ্যে কোম্পানির শাসনের অবসান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৫৮ সালে ইংল্যান্ডের রানির ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে ভারত প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশ সরকারের কর্তৃত্বাধীনে চলে আসে। এতদিন ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ব্রিটিশ সরকারের পরামর্শে ও সমর্থনের মাধ্যমে ভারত শাসন করছিল। 'গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট-১৮৫৮' আইনের মাধ্যমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বিলুপ্ত করে ভারতের শাসনভার ব্রিটিশরাজের অধীনে নেওয়া হয়।

স্বত্ববিলোপ নীতি রহিতকরণ ও সামরিক সংস্কার: মহাবিদ্রোহ অবসানের পর ব্রিটিশ সরকার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রবর্তিত বিতর্কিত স্বত্ববিলোপ নীতি পরিত্যাগ করে। মহারানি ঘোষণা করেন যে, ভারতে রাজ্যসীমা বিস্তার করার ইচ্ছা ব্রিটেনের নেই। দেশীয় রাজাদের সাথে স্বাক্ষরিত সন্ধিগুলো রক্ষা করা হবে। ভারতের সবার আচার-অনুষ্ঠান ও ধর্মকে সুরক্ষা দেওয়া হবে। সব প্রজা যোগ্যতা অনুসারে সরকারি চাকরি পাবে। মহাবিদ্রোহের পর সৈন্যবিভাগে ভারতীয়দের সংখ্যা কমিয়ে ব্রিটিশ সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। ভবিষ্যতে এরূপ বিদ্রোহ যাতে আর না ঘটে তা নিশ্চিত করার জন্য অস্ত্রাগারের দায়িত্ব ব্রিটিশ সৈন্যদের ওপর ন্যস্ত করা হয়।

দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে নির্বাসন: সিপাহি বিদ্রোহের পর ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত অবসান ঘটে। নামমাত্র মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ ইতোমধ্যেই ক্ষমতাহীন হয়ে পড়েছিলেন। ব্রিটিশ সরকার সিপাহি বিদ্রোহে নেতৃত্বদানকারী আখ্যায়িত করে বিচারে তাকে দোষী সাব্যস্ত করে। সাজা হিসেবে ব্রিটিশরা বাহাদুর শাহকে রেঙ্গুনে (মিয়ানমারের সাবেক রাজধানী) নির্বাসিত করে। কয়েক বছর রেঙ্গুনে নির্বাসিত জীবনযাপন করার পর ১৮৬২ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সিপাহি ও সাধারণ মুসলমানদের ওপর নির্যাতন: বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ার পর শত শত সিপাহিকে নামমাত্র সংক্ষিপ্ত বিচারে সাজা দেওয়া হয়। পুরান ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্ক এলাকার বড় বড় গাছে অনেককে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। জনগণকে ব্রিটিশ শাসনের কঠোরতা ও বিদ্রোহের চরম শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করে দিতে অনেক দিন মৃতদেহগুলো গাছেই ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। মুঘল সম্রাটকে নেতা ঘোষণা করায় বিদ্রোহের জন্য ইংরেজ সরকার মূলত মুসলমানদের দায়ী করে। এজন্য বহু মুসলমানকে সম্পত্তি বাজেয়াপ্তসহ বিভিন্ন সাজা দেওয়া হয়।

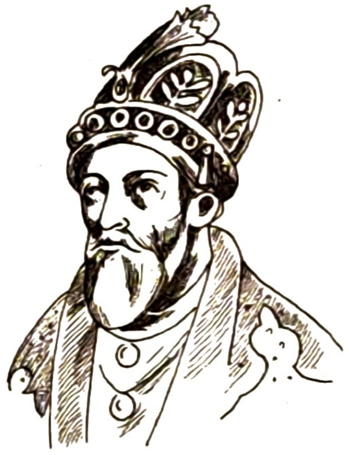
দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ

রাজনৈতিক দলের জন্ম: সিপাহি বিপ্লবের ব্যর্থতার প্রেক্ষাপটে ভারতবর্ষের মানুষের শিক্ষিত ও সচেতন অংশের মধ্যে এরূপ উপলব্ধি জন্মে যে, কোনো বৃহৎ শক্তিকে মোকাবিলা করতে সংগঠিত রাজনৈতিক শক্তি অত্যাবশ্যক। অন্যদিকে, ব্রিটিশ সরকারও অনেকটা তাদের নিজেদের স্বার্থেই নিয়মতান্ত্রিক বিরোধিতাকে উৎসাহিত করতে চাইছিল। এমন প্রেক্ষাপটেই ১৮৮৫ সালে ভারতের প্রথম জাতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক দল জাতীয় কংগ্রেস আত্মপ্রকাশ করে।

সংগ্রামের দৃষ্টান্ত স্থাপন: সিপাহি বিদ্রোহ ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বপ্রথম ব্রিটিশবিরোধী বৃহত্তর সংগ্রাম। এই সংগ্রামের প্রতিক্রিয়ায় ভারতীয়দের মধ্যে ক্রমে জাতীয়তাবাদী চেতনার সৃষ্টি হয়। ঐ চেতনা পরবর্তীকালে সব আন্দোলন- সংগ্রাম এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে স্বাধীনতার লড়াইয়ে অনুপ্রেরণা দান করে। ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ বা মহাবিদ্রোহকে ব্রিটিশ শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে প্রথম সর্বভারতীয় বৃহত্তর সশস্ত্র সংগ্রাম হিসেবে গণ্য করা হয়। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহকে ভারতীয়দের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলা যায়।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের প্রকৃতি (Nature of the Mutiny of 1857)

১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ বা মহাবিদ্রোহের স্বরূপ সম্পর্কে ঐতিহাসিকেরা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। কারও মতে, এটি ছিল সিপাহিদের বিদ্রোহ, কারো মতে তা জাতীয় সংগ্রাম বা স্বাধীনতার সংগ্রাম। ভারতে ১৮৫৭ সালের এ আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা সম্পর্কে তদানীন্তন ভারত সচিব আর্ল স্ট্যানলি তার প্রতিবেদনে 'সিপাহি বিদ্রোহ' শব্দটি ব্যবহার করেন।

তবে ১৮৫৭ সালের জুলাই মাসে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এক বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন ডিজরেলি সরকারি যুক্তি খণ্ডন করে এই বিদ্রোহকে জাতীয় বিপ্লব (National Revolt) বলে আখ্যায়িত করেন। ১৮৫৭ সালের মহাবিপ্লবের প্রকৃতি সম্পর্কে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের মধ্যেও মতভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এ সব ঐতিহাসিকের অনেকে যেমন— নর্টন, ডাফ প্রমুখ একে নিছক 'সিপাহি বিদ্রোহ' বলে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু খ্যাতনামা ইংরেজ ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, "বেসামরিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছিল এবং সিপাহিদের বিদ্রোহের আগেই তারা বিদ্রোহী হয়েছিল।"[৪] চার্লস রেইকস ও ডব্লিউ টেইলরও এ ঘটনাকে শুধু সিপাহিদের সামরিক বিদ্রোহ বলতে নারাজ। বরং তারা মনে করেন, এ বিদ্রোহে দেশের সাধারণ জনগণেরও ব্যাপক অংশগ্রহণ ছিল। ব্রিটিশ জেনারেল আউট্রামও প্রথম সিপাহি বিদ্রোহকে স্বাধীনতার সংগ্রাম হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

উপমহাদেশের ঐতিহাসিকদের মধ্যে আর সি মজুমদারের মতে, এ মহাবিপ্লবের কোনো নির্দিষ্ট রূপ ছিল না। তার মতে, এ মহাবিদ্রোহ ছিল মূলত সিপাহিদের বিদ্রোহ। তবে আর সি মজুমদার তার *'The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857'* গ্রন্থে এ বিদ্রোহকে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি ভারতীয়দের ব্যাপক ও প্রত্যক্ষ চ্যালেঞ্জ হিসেবে আখ্যায়িত করেন। ড. সুরেন্দ্রনাথ সেন তার *'Eighteen Fifty-Seven'* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ১৮৫৭ সালের আন্দোলন সিপাহিদের বিদ্রোহরূপে শুরু হলেও সর্বত্র তা সিপাহিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। সুরেন্দ্রনাথ সেনের মতে, একে জাতীয় সংগ্রাম হিসেবে গণ্য না করা গেলেও বিপ্লব ঘটানোই ছিল বিদ্রোহীদের লক্ষ্য। ঐতিহাসিক কিশোরীচাঁদ মিত্র বলেন, "এ বিপ্লব অবশ্যই সিপাহি অভ্যুত্থান ছিল।" ড. শশীভূষণ চৌধুরী *'Theories of the Indian Mutiny'* - তে লিখেছেন, ১৮৫৭ সালের বিপ্লব সিপাহিদের বিক্ষোভ থেকে শুরু হলেও শেষ পর্যন্ত তা ব্রিটিশ অপশাসনের বিরুদ্ধে ভারতের সব শ্রেণির মানুষের ক্ষোভে পরিণত হয়। শশীভূষণ চৌধুরী এ বিপ্লবকে ভারতের ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনা বলে অভিহিত করেছেন। ঐতিহাসিক ভি ডি সাভারকর তার *'The Indian War of Independence'* গ্রন্থে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম জাতীয় সংগ্রাম বলে আখ্যায়িত করেছেন।

ঐতিহাসিকদের মতের মূল্যায়ন: ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের প্রকৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের মত বিবেচনায় নিয়ে একথা বলা যায়, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনে নিষ্পেষিত সর্বস্তরের ভারতীয়দের অসন্তোষ সিপাহিদের মধ্য দিয়েই সর্বপ্রথম সংগঠিত ও বৃহৎ আকারে প্রকাশ পেয়েছিল। ভারতীয়দের হৃত রাজনৈতিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও আর্থ-সামাজিক স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্য নিয়ে এই বিপ্লব বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন মাত্রা ও প্রকৃতি ধারণ করে। সেনাবাহিনীর দেশীয় সিপাহিদের মধ্যকার অসন্তোষ প্রথম বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে দিলেও এর গভীরে ছিল ভারতের সর্বস্তরের মানুষের দীর্ঘদিনের ক্ষোভ। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল একটি মহাবিদ্রোহ এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ভারতে কখন কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটে?

২. সিপাহি বিদ্রোহের পর ভারতের শাসনভার কার অধীনে নেওয়া হয়?

৩. সিপাহি বিদ্রোহের পর কাকে রেঙ্গুনে নির্বাসন দেওয়া হয়?

৪. ব্রিটিশরা কোথায় সিপাহিদের গাছে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেয়?

৫. ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলা হয় কোনটিকে?

৬. 'সিপাহি বিদ্রোহ' শব্দটি প্রথম কে ব্যবহার করেন?

উত্তরের জন্য ৩০৬ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. দলীয় কাজ

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ছিল জাতীয় অভ্যুত্থান— দুটি দলে বিভক্ত হয়ে বক্তব্যটির পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করো।

---

[৪] Discount and unrest were widely prevalent among the civil population and in several places the population rose before the sepoys at those stations mutinied. –Ref. V.A Smith, *The Oxford History of India*. p-722

পাঠ ৮

সংস্কার আন্দোলন: হাজি মুহম্মদ মোহসিন (১৭৩২-১৮১২ খ্রি.)
Reform Movement: Hazi Muhammad Muhsin (1732-1812 AD)

সংস্কার আন্দোলন (Reform movement)

সংস্কার আন্দোলন বলতে সাধারণত সমাজের ক্ষতিকর প্রথা, নিয়ম-নীতি, কুসংস্কার দূর করে কাঙ্ক্ষিত সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে সংগঠিত উদ্যোগ বা প্রচেষ্টাকে বোঝায়। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে ইংরেজদের কাছে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা হারিয়ে বাঙালি জাতি অনিশ্চয়তার অন্ধকারে পড়ে যায়। আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিকসহ প্রায় সব ক্ষেত্রে অবক্ষয়ের কারণে বাঙালি জাতি, বিশেষ করে মুসলমান সমাজ নৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। জাতির এ দুর্দিনে বাংলায় কয়েকজন চিন্তাশীল মনীষীর আবির্ভাব ঘটে। তাদের বিভিন্ন ধরনের সংস্কারসহ ইতিবাচক প্রয়াসের ফলে বঙ্গ তথা বৃহত্তর ভারতের অনেক অংশে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে পুনর্জাগরণের ঢেউ জাগে। মুসলমান সম্প্রদায়সহ মানুষের মধ্যে নতুন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাবাদর্শ সৃষ্টি হয়। ঐ সংস্কার আন্দোলনের পথিকৃতদের মধ্যে ছিলেন হাজি মুহম্মদ মোহসিন, নবাব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখ।

হাজি মুহম্মদ মোহসিনের পরিচয় এবং তার অবদান (Identification of Hazi Muhammad Muhsin and His Contribution)

পরিচিতি ও প্রাথমিক জীবন: হাজি মুহম্মদ মোহসিন ঔপনিবেশিক ভারতের এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। তিনি একজন ধর্মপ্রাণ ও জনহিতৈষী মানুষ ছিলেন। অনন্য দানশীলতার জন্য তিনি দানবীর হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। ১৭৩২ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের হুগলিতে এক সম্ভ্রান্ত শিয়া মুসলিম পরিবারে হাজি মুহম্মদ মোহসিনের জন্ম হয়। তার পিতার নাম হাজি ফয়জুল্লাহ এবং মাতা জয়নব খানম। তার গৃহশিক্ষক আগা সিরাজী ছিলেন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। মোহসিন তার কাছে আরবি ও ফারসি ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করেন। মেধাবী মোহসিন জন্মস্থান হুগলিতেই কুরআন-হাদিস এবং ফিকাহ (ইসলামি আইনশাস্ত্র) শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। এরপর উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য মুর্শিদাবাদে যান। কিন্তু তরুণ মোহসিন বিশ্বাস করতেন, ভ্রমণ মানুষের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করে। এজন্য পিতার মৃত্যুর পর তিনি ১৭৬২ খ্রিষ্টাব্দে বিশ্বভ্রমণে বের হন। ইরান, তুরস্ক এবং ইরাকসহ আরব দেশ ভ্রমণ করেন। মোহসিন ইরাকের কুফা এবং কারবালার ইসলামি তীর্থস্থান সফর করেন। তিনি মক্কা ও মদিনায় যান এবং পবিত্র হজ পালন করেন।

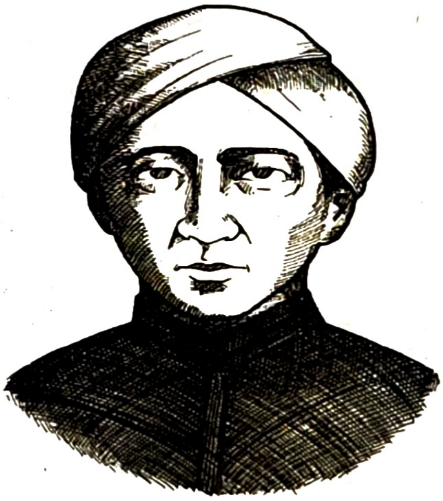
হাজি মুহম্মদ মোহসিন

দেশে প্রত্যাবর্তন ও জমিদারি পরিচালনা: হাজি মুহম্মদ মোহসিন দীর্ঘ ২৭ বছর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে কাটান। ইতোমধ্যে পিতা-মাতা মৃত্যুবরণ করায় দেশে ফেরার তেমন কোনো তাগিদ তার মধ্যে ছিল না। তবে বোন মন্নুজানের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত মোহসিন দেশে ফিরে আসেন। প্রসঙ্গত, মন্নুজান ছিলেন তার বৈপিত্রেয় বোন। তিনি ছিলেন মোহসিনের মাতা জয়নব খানমের আগের স্বামী ইরানি বংশোদ্ভূত ধনাঢ্য ব্যবসায়ী আগা মোতাহারের ঔরসজাত। হুগলি, যশোর, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া অঞ্চলে আগা মোতাহারের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের জায়গির ছিল। তিনি তার এ ভূ-সম্পত্তি একমাত্র সন্তান মন্নুজানের নামে উইল করে দেন। তাছাড়া মন্নুজানের স্বামী হুগলির নায়েব-ফৌজদার সালাউদ্দিনেরও বিপুল সম্পত্তি ছিল। স্বামীর অকাল মৃত্যুতে মন্নুজান তার সম্পত্তিরও উত্তরাধিকারী হন। তার কোনো সন্তান ছিল না। বিধবা নিঃসন্তান মন্নুজান তার বিশাল ধনসম্পত্তি দেখাশুনা করার জন্য ভাই মোহসিনকে অনুরোধ করেন। বোনের অনুরোধে সাড়া দিয়ে তিনি দেশে ফিরে আসেন। ১৮০৩ খ্রিষ্টাব্দে মন্নুজানের মৃত্যুর পর হাজি মুহম্মদ মোহসিন তার সৈয়দপুর জমিদারিসহ (খুলনা ও যশোর জেলা) সমস্ত সম্পত্তির মালিক হন।

জনকল্যাণমূলক কাজ: হাজি মুহম্মদ মোহসিন বিপুল বিত্তের মালিক হলেও সংযমী ও সাধারণ জীবনযাপন করতেন। তিনি ছিলেন চিরকুমার। তাই নিজের বিপুল সম্পদ মানব হিতৈষণার কাজে দান করার উদ্যোগ নেন। বোন মন্নুজানের কাছ থেকে পাওয়া সম্পদ দিয়ে বহু দাতব্য চিকিৎসালয়, স্কুল.কলেজ, মাদ্রাসা, ছাত্রাবাস নির্মাণ করা হয়। দুর্ভিক্ষের সময় ক্ষুধার্তদের অন্ন যোগানোসহ আরও নানাভাবে তিনি আর্ত-মানবতার সেবা করেছেন। এজন্য হাজি মুহম্মদ মোহসিনকে 'বাংলার হাতেম তাঈ' বলা হয়।

মোহসিন ফান্ড গঠন: হাজি মুহম্মদ মোহসিন তার বিপুল সম্পত্তি ধর্মীয় ও মানব কল্যাণে ব্যয় করার লক্ষ্যে ১৮০৬ খ্রিষ্টাব্দে একটি ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করেন। তিনি জমিদারির সব আয় ঐ ট্রাস্ট ফান্ডে ওয়াকফ্ করে দেন। তার সম্পত্তিকে ধর্মীয় কাজ, শিক্ষাবৃত্তি, পেনশন ও চিকিৎসা সেবা এবং কিছু অংশ পরিবারের পালক সদস্য, ভৃত্য এবং ট্রাস্ট ফান্ডের মুতাওয়াল্লিদের বেতনভাতা খাতে ব্যয়ের জন্য বিভিন্ন হারে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। হাজি মুহম্মদ মোহসিনের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তার নির্দেশনা মতো ওয়াকফ্ ফান্ড পরিচালিত হয়। ১৮১২ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ নভেম্বর মোহসিনের মৃত্যুর পর তার ফান্ড পরিচালনার অচলাবস্থা দেখা দেয়। অবশেষে ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দে সরকার এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নেয়। ইতোমধ্যে মোহসিন ফান্ডের অর্থে হুগলি মাদ্রাসা ও হুগলি মোহসিন কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। প্রথম দিকে সরকার মোহসিন ফান্ডের অর্থ হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ছাত্রদের কল্যাণে ব্যয় করত। তবে ১৮৭৩ সালের পর থেকে দাতার অভিপ্রায় অনুসারে এ ফান্ডের অর্থ কেবল মুসলমান শিক্ষার্থীদের শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হয়। মোহসিন ফান্ডের অর্থে হুগলি, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীসহ প্রদেশজুড়ে নতুন নতুন স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও শিক্ষার্থী হোস্টেল নির্মিত হতে থাকে।

জেনে রাখো

হাতেম আল-তাঈ বা হাতেম তাঈ-এর পূর্ণনাম হাতেম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ আত-তাঈ। তিনি তার মহানুভবতা ও দানশীলতার জন্য আরবদের আইকন হয়ে রয়েছেন। খ্রিস্টান এই আরব মহানুভব ছিলেন তাঈ গোত্রের লোক। এই গোত্রটি আরব উপদ্বীপের মধ্যভাগে হাইলে বসবাস করত। হাতেম তাঈ-এর জন্মসন সুনির্দিষ্ট নয়, তবে 'রজত-উল সূফা' গ্রন্থ মতে, মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর জন্মের প্রায় আট বৎসর পর ৫৭৮ সালের দিকে তিনি মারা যান। তিনি আব্বাসি খলিফা হারুন-অর রশিদকে নিয়ে রচিত বিখ্যাত উপন্যাস 'আরব্য রজনী'-র একটি অনবদ্য চরিত্র।

শিক্ষার বাইরে বাংলার মুসলমান জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনের উন্নয়নেও মোহসিন ফান্ডের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এই ফান্ড থেকে হুগলির নতুন ইমামবাড়া ও মসজিদ নির্মাণ, পুরাতন ইমামবাড়ার রক্ষণাবেক্ষণ কাজ ও মুসলমানদের অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে মুক্ত হস্তে সহায়তা করা হয়। বিভিন্ন মুসলিম ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব আয়োজনেও এ ফান্ড ভূমিকা রাখত। হাজি মোহসিন তৎকালীন বাংলায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময় আর্তমানবতার সেবায় বহু লঙ্গারখানা স্থাপন করেন। সরকারি দুর্ভিক্ষ মোকাবেলা তহবিলেও তিনি বহু অর্থ দান করেছিলেন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কোন যুদ্ধের পর বাঙালি তাদের স্বাধীনতা হারায়?
২. হাজি মুজম্মদ মোহসিন কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
৩. মুন্নুজান সম্পর্কে হাজি মুহম্মদ মোহসিনের কী হতেন?
৪. 'বাংলার হাতেম তাঈ' বলা হয় কাকে?
৫. 'মোহসিন ফান্ড' গঠন করা হয় কত সালে?
৬. হুগলির 'ইমামবাড়া' কে নির্মাণ করেন?

উত্তরের জন্য ৩০৬ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

মোহসিন ফান্ডের অর্থ যেসব কাজে ব্যয় করা হতো তার একটি তালিকা তৈরি করো।

পাঠ ৯

নবাব আবদুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩ খ্রি.): সংস্কার আন্দোলনে ভূমিকা

Nawab Abdul Latif (1828-1893 AD): Contribution in Reform Movement

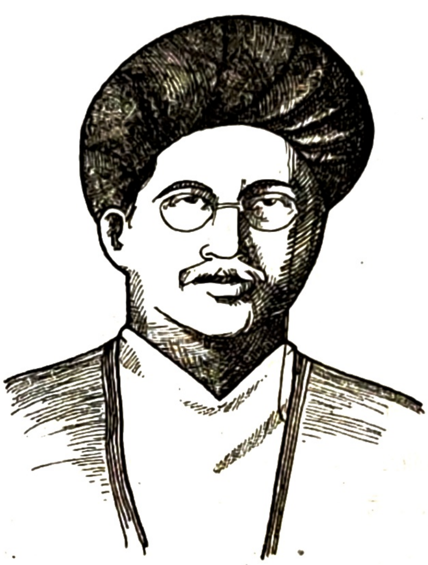

নবাব আবদুল লতিফ

নবাব আবদুল লতিফ ছিলেন উনবিংশ শতকে বাংলার মুসলমান সমাজের জাগরণের অন্যতম অগ্রদূত। তিনি ইংরেজ রাজশক্তির ছত্রছায়ায় থেকেই রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে চরমভাবে অধঃপতিত বাংলার মুসলমান সমাজকে উন্নতি ও প্রগতির পথে এগিয়ে নিতে আন্তরিকভাবে কাজ করেছেন।

পরিচয়, শিক্ষা ও কর্মজীবন: নবাব আবদুল লতিফ ১৮২৮ সালে ফরিদপুর জেলার রাজাপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা কাজী ফকির মাহমুদ ছিলেন কলকাতা সদর দিওয়ানি আদালতের একজন আইনজীবী। কলকাতা মাদ্রাসায় উচ্চশিক্ষা লাভের পর আবদুল লতিফ প্রথমে ঢাকার প্রথম স্কুল ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে (প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৩৫) শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় আরবি ও ইংরেজির শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। ১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দে 'ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট' হিসেবে সরকারি চাকরিতে যোগ দেন। পরবর্তীকালে 'প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট' পদে পদোন্নতি লাভ করেন। ১৮৮৪ সালে বিশেষ পেনশন সুবিধাসহ সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন আবদুল লতিফ। তিনি আয়কর কমিশনার এবং কলকাতা পৌর কর্তৃপক্ষের শান্তিপাল বা 'জাস্টিস অব পিস' হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। নিজের ধর্মের মানুষের অগ্রগতির জন্য প্রচেষ্টা, সরকারি প্রশাসনিক কাজে নিষ্ঠা ও দক্ষতা এবং জনহিতকর কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৮৬২ সালে সরকার তাকে বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য মনোনীত করে। মুসলমানদের মধ্যে তিনিই প্রথম এ গৌরবের অধিকারী। ইংরেজ শাসকদের প্রতি আনুগত্য এবং মুসলমান সমাজের জন্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ১৮৭৭ সালে সরকার তাকে 'খান বাহাদুর', ১৮৮০ সালে 'নবাব', ১৮৮৩ সালে 'সিআইই' এবং ১৮৮৭ সালে উচ্চতর সম্মান 'নবাব বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করে।

মুসলিম সমাজের অগ্রগতির জন্য আবদুল লতিফের গৃহীত উদ্যোগ

Initiatives taken by Abdul Latif for the Development of Muslim Community

নবাব আব্দুল লতিফ একজন শিক্ষিত মানুষ ছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, মুসলমানদের সামাজিক অগ্রগতির জন্য তাদের শিক্ষিত বিশেষ ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। এ কারণে তিনি মুসলিম সমাজকে সংগঠিত করেন এবং তাদের মধ্যকার গোঁড়ামি দূর করে সচেতনতা সৃষ্টির চেষ্টা করেন। মুসলিম সমাজের অগ্রগতির জন্য তার অবদান অনন্য। যেমন—

মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজ আনুগত্য সৃষ্টি: ভারতবর্ষে মুসলমানদের জেহাদি আন্দোলন এবং ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের (সিপাহি বিদ্রোহ) কারণে ইংরেজরা মুসলমানদের সন্দেহ ও অবিশ্বাস করত। এজন্য তারা মুসলমানদের অবহেলা করতে থাকে এবং মুসলমান সম্প্রদায় বিভিন্ন বিষয়ে বঞ্চিত হয়। নবাব আবদুল লতিফ উপলব্ধি করেন, এ অবস্থা চলতে থাকলে বাংলা তথা ভারতের মুসলমানদের ধ্বংস অনিবার্য। এ অবস্থায় নবাব আবদুল লতিফ নিজে রাজদণ্ডধারী ইংরেজদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। তার ধারণা হয়েছিল, নিজেদের স্বার্থেই মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজ শাসকদের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এ কারণে আবদুল লতিফ মুসলমানদের ইংরেজবিদ্বেষী মনোভাব পরিহার করে তাদের সাথে সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ করার জন্য নানা ধরনের উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি গ্রহণ করেন। তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজ বিরোধী মনোভাব কমে আসে। ফলে ইংরেজ সরকার মুসলমানদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে।

মুসলমান সমাজে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার: বাংলার মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা, বিশেষ করে আধুনিক পাশ্চাত্য তথা ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারে নবাব আবদুল লতিফের অবদান অসামান্য। ইংরেজিকে 'বিধর্মীর ভাষা' আখ্যা দিয়ে তা না শিখে ভারতের মুসলমানরা সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে পিছিয়ে পড়েছিল। আবদুল লতিফ মনে করতেন, অগ্রগতির জন্য বাংলার মুসলমানদের আধুনিক ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। বাংলার মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার পক্ষে জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে নবাব আবদুল লতিফ ১৮৫৩ সালে 'মুসলমান ছাত্রদের পক্ষে ইংরেজি শিক্ষার সুফল' শিরোনামে এক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা আহ্বান করেন। তার প্রচেষ্টায় সরকার মুসলমান শিক্ষার্থীদের জন্য কলকাতা মাদ্রাসায় অ্যাংলো-ফারসি বিভাগ খোলে এবং উর্দু ও বাংলা ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করে। হুগলি মাদ্রাসায় অ্যাংলো-ফারসি বিভাগ চালুর পেছনেও নবাব আবদুল লতিফ মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। তার দাবি ও চেষ্টাতেই হিন্দু কলেজকে প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তরিত করা হয়। ফলে ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলমান ছাত্রদের আধুনিক উচ্চশিক্ষার সুযোগ তৈরি হয়।

জেনে রাখো

ইউরোপীয় নীলকরদের বিরুদ্ধে বাংলার রায়তদের আন্দোলনের ফলে ১৮৫০-এর দশকের শেষদিকে নীল কমিশন গঠিত হয়। শুরু থেকেই বাংলায় নীলচাষ নিপীড়ন ও নির্যাতনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল। জমির মালিকানা লাভের পর নীলকরেরা নীলচাষে বাধ্য করার জন্য চাষীদের ওপর বল প্রয়োগ করত এবং নীলের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে না পারলে কর বৃদ্ধির হুমকি দিত। শুধু তা-ই নয়, তারা চাষীদেরকে উৎপাদিত নীলের ন্যায্যমূল্য থেকেও বঞ্চিত করত। এ পরিস্থিতিতে ১৮৫৯ সালে নীলচাষীরা সমগ্র বাংলা জুড়ে নীলকরদের বিরুদ্ধে এক সংগঠিত আন্দোলন শুরু করে। এ আন্দোলনের মুখে ১৮৬০ সালের ৩১ মার্চ সরকার নীল উৎপাদন ব্যবস্থা ও এর অর্থনৈতিক অবস্থা তদন্ত করার জন্য 'নীল কমিশন' গঠন করে। নীলচাষ যে নানা ধরনের নির্যাতনের সাথে জড়িত একথা নীল কমিশনের রিপোর্টে প্রথমবারের মতো স্বীকৃত হয়।

নীলকরদের হাত থেকে কৃষকদের মুক্তি: আবদুল লতিফ সাতক্ষীরায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালে সেখানকার দরিদ্র মুসলিম চাষিদের ওপর ইংরেজ নীলকরদের অত্যাচার দেখে মর্মাহত হন। তিনি সরকারকে এ বিষয়টি অবহিত করে এর প্রতিকার প্রার্থনা করেন। ১৮৬০ সালে সরকারের 'নীল কমিশন' (Indigo Commission) গঠন করার পেছনে নবাব আবদুল লতিফের চেষ্টার বড় অবদান ছিল। নীল কমিশনের সুপারিশক্রমে নীলচাষ করা না করার বিষয়ে কৃষকদের স্বাধীনতা দেওয়া হয়। এতে ভারতের কৃষকেরা ইংরেজসহ ইউরোপীয় নীলকরদের অত্যাচার থেকে রেহাই পায়।

মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা: নবাব আবদুল লতিফ ১৮৬৩ সালে কলকাতায় 'মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি' বা মুসলিম সাহিত্য সমাজ নামে একটি সামাজিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তার এবং তাদের বিশ্বের পরিবর্তিত অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করাই ছিল এ সংগঠন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য। মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটানো ও তাদের ওপর থেকে ব্রিটিশ শাসকদের সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূর করার ক্ষেত্রে মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। সংগঠনটি কোনো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান না হলেও এর মাধ্যমে মুসলমানদের ন্যায়সংগত দাবি তথা মৌলিক সমস্যাবলি ও আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা সরকারের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করা হতো। উর্দু, ফারসি, ইংরেজি ও বাংলা এ চারটি ভাষায় এ সংগঠনের কার্যক্রম চলত।

এ সংগঠনটির উল্লেখযোগ্য সাফল্যের মধ্যে রয়েছে মুসলমানদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার প্রসার এবং মোহসিন ফান্ডের টাকা কেবল মুসলমানদের শিক্ষার কাজে ব্যয় করার সরকারি সিদ্ধান্ত। নবাব আব্দুল লতিফের নিরলস প্রচেষ্টায় মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি মুসলমানদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অগ্রগতি অর্জনের ফোরাম হিসেবে গড়ে ওঠে। মুসলিম ইনস্টিটিউট অব ক্যালকাটা নামে মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি মুসলমানদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্নায়ুকেন্দ্র হিসেবে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত টিকে ছিল।

মোহসিন ফান্ডের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ: হুগলির শিক্ষাব্রতী ও দানবীর হাজি মুহম্মদ মোহসিন জনকল্যাণ এবং বিশেষ করে মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে তার সব সম্পদ ওয়াকফ্ করে দেন। হাজি মোহসিনের দানকৃত অর্থে 'মোহসিন ফান্ড' গঠন করে এর দ্বারা হুগলি ছাড়াও বাংলার অন্যান্য স্থানে অনেক স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়। নবাব আবদুল লতিফের আন্তরিক চেষ্টায় সরকার ১৮৭৩ সালে হুগলি কলেজকে সরকারি করে। সরকার মোহসিন ফান্ডের অর্থে এ কলেজের দরিদ্র মুসলমান ছাত্রদের বৃত্তির ব্যবস্থাও করে। এছাড়াও আবদুল লতিফের উদ্যোগে মোহসিন ফান্ডের অর্থে কলকাতা মাদ্রাসার উন্নয়ন এবং ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রামে নতুন মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান: ইসলামি আদর্শ ও অনুশাসনের প্রতি নবাব আবদুল লতিফের গভীর শ্রদ্ধাবোধ ছিল। বস্তুত তার আগ্রহ ও উদ্যোগেই বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে মুসলিম বিবাহ ও তালাকের স্বেচ্ছামূলক নিবন্ধীকরণ বিল পাস হয়। তাছাড়া মুসলিম বিবাহ ও তালাকের 'রেজিস্ট্রার'-পদ সৃষ্টির মাধ্যমে নবাব আবদুল লতিফ কাজি অফিস পুনঃপ্রবর্তনের ব্যবস্থা করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার চরম দুর্দশাগ্রস্ত মুসলিম সমাজের জাগরণে নবাব আবদুল লতিফের অবদান অনস্বীকার্য। তিনি ব্যক্তিগত চেষ্টা ও মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি সংগঠনের মাধ্যমে বাংলার মুসলমানদের এক ঘোর সংকটকালে তাদের সঠিক পথের সন্ধান দেন। মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্টি হয় এক নবচেতনা ও জাগরণের। নবাব আবদুল লতিফই বাংলার মুসলিম সমাজের আধুনিকায়ন শুরু করে। তার চেষ্টার ফলেই কালক্রমে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণি গড়ে ওঠে। মুসলমানদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতিতে বিশেষ ভূমিকা রেখে এ মহান সংস্কারক বাংলার মুসলিম জাগরণের অগ্রদূত হিসেবে স্বীকৃতি পান। ১৮৯৩ সালের ১০ জুলাই নবাব আবদুল লতিফ মৃত্যুবরণ করেন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. নবাব আবদুল লতিফ কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?
২. আবদুল লতিফকে নবাব ও খান বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করে কোন সরকার?
৩. কত সালে আবদুল লতিফকে 'খান বাহাদুর' উপাধি দেওয়া হয়?
৪. মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন কে? *[সকল বোর্ড ২০১৭]*
৫. 'মোহসিন ফান্ডের' টাকা শুধু দরিদ্র মুসলমান ছাত্রদের কল্যাণে ব্যয় করার উদ্যোগ নেন কে?
৬. বাংলায় মুসলিম গণজাগরণের অগ্রদূত বলা হয় কাকে?

উত্তরের জন্য ৩০৬ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

বাংলার মুসলমান সমাজের উন্নতির জন্য নবাব আবদুল লতিফের গৃহীত উদ্যোগসমূহের একটি তালিকা তৈরি করো।

গ. বাড়ির কাজ

মোহাম্মদ আলী চৌধুরী একজন সমাজপতি। তিনি তার এলাকায় একটি সাহিত্য সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। নানা জায়গা থেকে তার সমিতিতে জ্ঞানী-গুণীজন আসতে থাকেন। সমাজে প্রচলিত নানা অসংগতি নিয়ে তাদের আলোচনায় এলাকার বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার দূর হতে থাকে এবং নানা সমস্যার সমাধান হয়। এছাড়া শিক্ষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সমিতিটি কার্যকর ভূমিকা রাখে। এর কল্যাণে পশ্চাৎপদ এলাকাটি ধীরে ধীরে সংস্কৃতিমান হয়ে ওঠে এবং মোহাম্মদ আলী চৌধুরীকে এলাকাবাসী বিশেষ সম্মানে ভূষিত করে।

১. মোহাম্মদ আলী চৌধুরীর সাহিত্য সমিতির সাথে উনিশ শতকের কোন সাহিত্য সমিতির মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
২. উক্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা বাংলার মুসলিম জাগরণের অগ্রদূত— যুক্তি সাপেক্ষে প্রমাণ করো।

পাঠ ১০

সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮): মুসলমানদের রাজনৈতিক জাগরণে ভূমিকা [Syed Ameer Ali (1849-1928): Contributions towards Political awareness of Muslims]

পরিচিতি ও কর্মজীবন (Introduction and Practical Life)

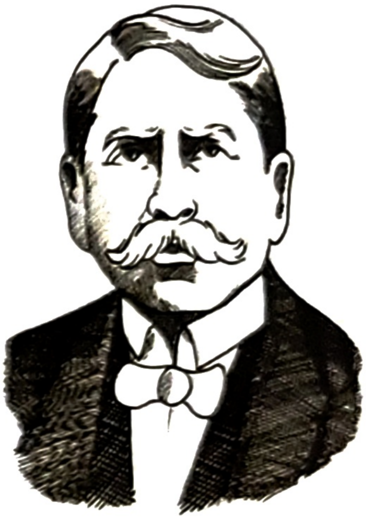

সৈয়দ আমীর আলী

সৈয়দ আমীর আলী ছিলেন একজন প্রখ্যাত আইনজীবী এবং ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ক খ্যাতিমান লেখক। তিনি ছিলেন ভারতে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণ, বিশেষ করে বাংলার মুসলমানদের নবজাগরণের অন্যতম অগ্রদূত। সৈয়দ আমীর আলী ১৮৪৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের হুগলির এক সম্ভ্রান্ত শিয়া মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম সৈয়দ সাদাত আলি। বাল্যকাল থেকেই আমীর আলী অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। তিনি ১৮৬৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে অনার্সসহ এমএ পাস করেন এবং ১৮৬৯ সালে বিএল ডিগ্রি লাভ করেন। সৈয়দ আমীর আলী ইংল্যান্ড গিয়ে ১৮৭৩ সালে ব্যারিস্টারি পাস করেন। এরপর দেশে ফিরে এসে কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন। কর্মজীবনে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে আইনের অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে টেগোর অধ্যাপক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। আমীর আলী ১৮৯০ সালে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন এবং ১৯০৪ সালে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ১৮৭৮-১৮৮৩ সাল পর্যন্ত বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য এবং ১৮৮৩-১৮৮৫ সাল পর্যন্ত গভর্নরের আইনসভার সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম ইংল্যান্ডের প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত হন। আইনশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী সৈয়দ আমীর আলীকে ইংল্যান্ডের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানসূচক ডিগ্রি দেয়। সৈয়দ আমীর আলী ১৯০৪ সালে অবসর গ্রহণের পর ইংল্যান্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং ১৯২৮ সালে সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন।

মুসলিম সমাজের উন্নতিতে আমীর আলীর অবদান

Contributions of Ameer Ali for the Advancement of Muslim Community

মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি: সৈয়দ আমীর আলী ছিলেন একজন দূরদর্শী চিন্তাবিদ ও সমাজ সংস্কারক। তিনি মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। সৈয়দ আমীর আলী মনে করতেন, পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ না করলে এবং রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত না হলে ভারতের মুসলমানদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে যাবে। তবে তিনি সহিংস আন্দোলন বা বিপ্লবের পথে রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে বিশ্বাসী ছিলেন না। নিয়মতান্ত্রিক বা সাংবিধানিক পন্থায় দাবি আদায়ের পক্ষপাতী ছিলেন।

সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা: মুসলমান সমাজের অগ্রগতির জন্য কাজ করতে সৈয়দ আমীর আলী ১৮৭৭ সালে কলকাতায় 'ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এর শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮৩ সালে কেন্দ্রীয় সংগঠনটির নামকরণ করা হয় 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন'। এটি ছিল ভারতীয় মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন। এ সংগঠনের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল— (১) মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার সঞ্চার ও তাদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা, (২) মুসলমানদের নৈতিক উন্নতি সাধন, (৩) নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে মুসলমানদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া সরকারের কাছে পেশ করা এবং (৪) ভারতের হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে মৈত্রী ও সম্প্রীতি সৃষ্টি করা ইত্যাদি।

এসোসিয়েশনের কার্যাবলি: শিক্ষা ও চাকরি ক্ষেত্রে মুসলমানদের সুযোগ-সুবিধা আদায়ের জন্য সৈয়দ আমীর আলী তার এসোসিয়েশনের মাধ্যমে সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। ১৮৮১ সালে এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে মোহসিন ফান্ডের টাকায় কলকাতায় একটি কলেজ ও মুসলমান ছাত্রদের জন্য একটি ছাত্রাবাস নির্মাণের দাবি করা হয়। ১৮৮২ সালে ভারতের শিক্ষা সংস্কারের জন্য হান্টার কমিশন গঠন করা হয়। আমীর আলী এ কমিশনের কাছে মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য ছাত্রবেতন হ্রাস, মুসলিম এলাকায় মুসলিম শিক্ষক ও পরিদর্শক নিয়োগ এবং আরবি-ফারসি শিক্ষার ব্যবস্থা করার প্রস্তাব

দেন। তিনি কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় উচ্চমানের ইংরেজি শিক্ষা চালুরও দাবি জানান। ১৮৮২ সালে লর্ড রিপনের কাছে প্রদত্ত এক স্মারকলিপিতে আমীর আলী মুসলমানদের চাকরির বিশেষ ব্যবস্থা, বিচার বিভাগে মুসলমানদের নিয়োগ এবং বিহারের আদালতে স্থানীয় মুসলমানদের ব্যবহৃত উর্দু ভাষা প্রচলনের দাবি জানান।

সৈয়দ আমীর আলী ও তার সংগঠনের দাবি এবং হান্টার কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে বড়লাট ডাফরিন ১৮৮৫ সালে একটি প্রস্তাব পাস করেন। এতে মুসলমানরা শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পায়। মুসলমানদের উচ্চশিক্ষার জন্য বৃত্তি এবং মুসলমান শিক্ষক ও পরিদর্শক নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়। চাকরির ক্ষেত্রে মুসলমানদের দাবি যথাসম্ভব পূরণের কথা বলা হয়। আমীর আলীর প্রস্তাবের ফলশ্রুতিতে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় কলেজ মানের ইংরেজি ক্লাস চালু করা হয়। তাছাড়া কারিগরি ও মেডিকেল শিক্ষায় মুসলমান ছাত্রদের বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়।

আমীর আলীর রচনাবলি ও মুসলিম রেঁনেসার সূত্রপাত: সৈয়দ আমীর আলী ছিলেন ভারতের ঊনবিংশ শতকের মুসলিম রেনেসাঁর অগ্রদূত। ইসলামি ও পাশ্চাত্য উভয় জ্ঞানের অধিকারী আমীর আলী ছিলেন একজন সুলেখক। তিনি ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ক বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দুটি গ্রন্থ হচ্ছে- (১) *দ্য স্পিরিট অব ইসলাম (The Spirit of Islam)* এবং (২) *এ শর্ট হিস্ট্রি অব দ্য স্যারাসিনস (A Short History of the Saracens)*। আইন বিষয়ে তার লিখিত গ্রন্থসংখ্যা আট।[৫] সমসাময়িক দেশি-বিদেশি পত্র-পত্রিকা ও গবেষণা জার্নালেও তার অনেক মূল্যবান লেখা প্রকাশিত হয়েছে। তবে পণ্ডিত হিসেবে সৈয়দ আমীর আলীকে অমরত্ব দান করেছে প্রথমোক্ত দুটি গ্রন্থ। সৈয়দ আমীর আলী তার লেখায় ইসলাম ধর্মের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দান করেছেন। তার প্রচেষ্টায় এখানকার হতাশাগ্রস্ত মুসলিম সমাজে নতুন প্রাণের সঞ্চার ঘটে। এটাই ছিল ভারতের মুসলমানদের রেঁনেসা বা পুনর্জাগরণের সূচনা।

লন্ডনে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা: ১৯০৬ সালে ভারতের মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। সৈয়দ আমীর আলী ১৯০৮ সালে লন্ডনে এ দলের একটি শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৯ সালের 'মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন'-এর প্রাক্কালে তিনি ব্রিটিশ সরকারের কাছে ভারতের মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের দাবি জানান। ১৯০৯ সালে সংস্কার আইনে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

বাংলার দুর্দশাগ্রস্ত মুসলিম সমাজের পুনর্জাগরণে যেসব মনীষী অসামান্য অবদান রেখেছেন সৈয়দ আমীর আলী তাদের অন্যতম। পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক ও বৈষয়িক উন্নতির পাশাপাশি তিনি মুসলমানদের রাজনৈতিক জাগরণের ওপর গুরুত্ব দেন। সৈয়দ আমীর আলী সর্বতোভাবে ভারতের মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করেন। তবে তিনি সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। তিনি হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সৈয়দ আমীর আলী কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?
২. ভারতীয়দের মধ্যে কে প্রথম ইংল্যান্ডের প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত হন?
৩. বাংলার মুসলমানদের প্রথম কে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করেন?
৪. ভারতীয় মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন কোনটি?
৫. 'The Spirit of Islam' এবং 'A Short History of the Saracens' গ্রন্থের লেখক কে?
৬. সৈয়দ আমীর আলী কত সালে লন্ডনে মুসলিম লীগের শাখা প্রতিষ্ঠা করেন?

উত্তরের জন্য ৩০৬ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশনের লক্ষ্যসমূহ চিহ্নিত করে তালিকা আকারে লেখো।

---

[৫] এসব গ্রন্থের মধ্যে *Mohammedan Law, The Personal Law of the Mohammedan, Civil Procedure in British India* ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

পাঠ ১১

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস
Indian National Congress

ব্রিটিশ শাসনামলে ভারতে ইংরেজি শিক্ষার বিস্তারের ফলে উনিশ শতকের শুরু থেকে আধুনিক ধাঁচের সভা-সমিতি গঠন শুরু হয়। ১৮১৫ খ্রিষ্টাব্দে খ্যাতনামা সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহন রায় 'আত্মীয় সভা' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এর পরপরই বঙ্গ-ভারতে সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠার জোয়ার আসে। এসব সংগঠনের মধ্যে ছিল 'বেঙ্গাল ল্যান্ড হোল্ডার্স সোসাইটি' (১৮৩৭), 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি' (১৮৪৩), 'ইন্ডিয়া এসোসিয়েশন' (১৮৭৬) এবং 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' (১৮৭৭) ইত্যাদি। তবে এ সংগঠনগুলো সর্বভারতীয় ছিল না। সর্বভারতীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের মধ্যে ছিল ১৮৮৫ সালে গঠিত 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' ছিল প্রথম।

জেনে রাখো

আত্মীয় সভা ছিল ভারতের একটি দার্শনিক আলোচনা কেন্দ্র। রাজা রামমোহন রায় এ সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে ব্রহ্মনিষ্ঠদের একেশ্বর উপাসনার পথ দেখান। এ সমিতির সদস্যরা বিভিন্ন দার্শনিক বিষয়ে বিতর্ক ও আলোচনার অধিবেশন পরিচালনা করতেন এবং অবাধ ও সম্মিলিত চিন্তা-ভাবনা ও সামাজিক সংস্কারমূলক মতামত প্রচার করতেন। এ আত্মীয় সভাকেই রামমোহন রায় পরে ব্রাহ্মসমাজ নামে নতুন রূপ দেন।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫) প্রতিষ্ঠা [Foundation of Indian National Congress (1885)]

ভারতীয় উপমহাদেশে জাতীয়তাবাদের বিকাশ তথা রাজনীতির ইতিহাসে ১৮৮৫ সাল বিশেষভাবে স্মরণীয়। কারণ, এ বছরই প্রথম সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকারি সমর্থন নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় কংগ্রেস দল প্রথম দিকে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় সরকারের কাছ থেকে দাবি-দাওয়া আদায়ের চেষ্টা করে। তবে সময়ের দাবি মোতাবেক কালক্রমে কংগ্রেস ভারতে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দেয়।

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পটভূমি: উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি থেকে ভারতের ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণি তাদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া ও অধিকার আদায়ের জন্য সর্বভারতীয় একটি রাজনৈতিক দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিল। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মাধ্যমে একটি বড় সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল গঠনের প্রস্তুতিও চলতে থাকে। এ অবস্থায় ভারতীয় রাজনীতির কিছু ঘটনা জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে ত্বরান্বিত করে। ১৮৭৬ সালে লর্ড লিটন ভারতে ভাইসরয় অর্থাৎ ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি হয়ে আসেন। নতুন ভাইসরয় কর্তৃক সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার বয়সসীমার শর্ত পরিবর্তন, ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টের মাধ্যমে ভারতীয় সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ, ভারতীয়দের ওপর আফগান যুদ্ধের ব্যয়ভার চাপানো, দিল্লি দরবার প্রতিষ্ঠা এবং সুতা আমদানি কর রহিতকরণ ইত্যাদি নানা পদক্ষেপ ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের বিক্ষুব্ধ করে তোলে। এ অবস্থায় 'ইলবার্ট বিল' নিয়ে বিতর্ক ভারতীয়দের ক্ষোভের মাত্রাকে আরও বৃদ্ধি করে। উল্লেখ্য, ১৮৮৩ সালে ভাইসরয় কাউন্সিলের সদস্য সিরিল ইলবার্ট ইউরোপীয়দের পাশাপাশি ভারতীয় বিচারকদেরও ব্রিটিশদের বিচার করার ক্ষমতা দানের প্রস্তাব করেন। তার এ প্রস্তাবটি 'ইলবার্ট বিল' নামে পরিচিত। তবে ব্রিটিশ নাগরিকদের বিরোধিতা ও বিক্ষোভের কারণে সরকার এ বিলটি কার্যকর করতে পারেনি। ইলবার্ট বিল প্রত্যাখ্যানের এ ঘটনা ভারতীয়দের তীব্র অসন্তোষের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই সময় জাতীয়তাবাদী নেতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জিকে আদালত অবমাননার অভিযোগে কারাদণ্ড প্রদান করা হলে সারাদেশ প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। কারামুক্তির পর সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ও তার সহযোগীরা অভিন্ন আদর্শে অনুপ্রাণিত ভারতীয়দের ঐক্যবদ্ধ করে একটি রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। ১৮৮৩ ও ১৮৮৫ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারত সভার জাতীয় মহাসম্মেলন সর্বভারতীয় পর্যায়ে একটি রাজনৈতিক দল গঠনের বিষয়টিকে ত্বরান্বিত করে। অনেক ঐতিহাসিক ভারত সভার জাতীয় সম্মেলনকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গঠনের পূর্বাভাস বলে গণ্য করেন।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা: ভারতীয় মধ্যবিত্ত জাতীয়তাবাদীরা সর্বভারতীয় পর্যায়ে একটি রাজনৈতিক দল গঠনের সিদ্ধান্ত নিলে এ ব্যাপারে এগিয়ে আসেন ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ কর্মকর্তা অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম (Allan Octavian Hume)। কংগ্রেস দলের প্রতিষ্ঠায় এ সাবেক ইংরেজ সিভিল সার্ভেন্ট বিশেষ ভূমিকা রাখেন। এ ক্ষেত্রে হিউমের বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। জীবনীকার উইলিয়াম ওয়েডার বার্নের মতে, হিউম উপলব্ধি করেছিলেন ভারতের রাজনৈতিক

পরিস্থিতি বিস্ফোরণোন্মুখ। যেকোনো সময় ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিদ্রোহ দেখা দিতে পারে। এ কারণে ভারতীয়দের নিয়মতান্ত্রিকভাবে মনোভাব প্রকাশের একটি সুযোগ দেওয়া উচিত। এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখেই ভারতের জাতীয়তাবাদী মধ্যবিত্ত শ্রেণির ক্ষোভ বা বিরোধিতাকে নিয়মতান্ত্রিক পথে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেন হিউম। এ ব্যাপারে ভাইসরয় লর্ড ডাফরিন, লর্ড রিপন, জন ব্রাইট প্রমুখ ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ তাকে সমর্থন দেন। অক্টাভিয়ান হিউমের উদ্যোগে ১৮৮৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর বন্দরনগরী বোম্বের (বর্তমানে মুম্বাই) গোকুলদাস তেজপাল সংস্কৃত কলেজে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতার প্রখ্যাত আইনজীবী ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র ব্যানার্জির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভা থেকেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়।

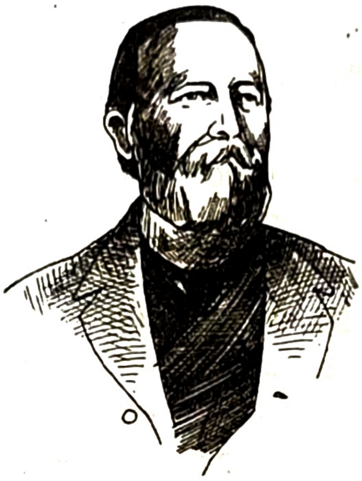
অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: ভারতীয়দের মনোভাব সম্পর্কে সরকারকে সচেতন করা এবং ভারতীয়দের হিংসাত্মক বিপ্লবের পথ থেকে নিয়মতান্ত্রিক দাবি-দাওয়ার পথে পরিচালিত করার অভিপ্রায় নিয়েই হিউম কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। বোম্বের সভার সভাপতি উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি তার অভিভাষণে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার চারটি উদ্দেশ্যের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন। যথা- ১. ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের দেশপ্রেমিকদের মধ্যে যোগাযোগ ও সৌহার্দ স্থাপন করা, ২. দেশপ্রেমিক ভারতীয়দের মধ্য থেকে জাতিগত, ধর্মীয় ও আঞ্চলিক ভেদাভেদ এবং সংকীর্ণতা দূর করে জাতীয় ঐক্য ও সংহতির পথ প্রশস্ত করা, ৩. ভারতীয় শিক্ষিত সমাজের সাথে আলাপ-আলোচনা করে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশ করা এবং ৪. পরবর্তী এক বছরের জন্য রাজনৈতিক নীতি ও কর্মসূচি নির্ধারণ করা।

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব: ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দলের প্রতিষ্ঠা উপমহাদেশের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে একটি বিশাল তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। কংগ্রেসের আত্মপ্রকাশকে সাধারণভাবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আনুষ্ঠানিক রূপায়ন বলা হয়। ব্রিটিশ পৃষ্ঠপোষকতায় আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল বলে প্রথম পর্যায়ে কংগ্রেস সরকারের সাথে সহযোগিতা ও নরমপন্থার পথ অবলম্বন করে। তবে পরবর্তী সময়ে ভারতীয়দের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে দলটির কর্মসূচির ধরনে পরিবর্তন ঘটে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা পালনের মাধ্যমে কংগ্রেস ভারতীয় রাজনৈতিক অঙ্গনে স্থায়ী আসন করে নেয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. 'আত্মীয় সভা' সংগঠনটি কে গড়ে তোলেন?
২. সর্বভারতীয় পর্যায়ে গঠিত প্রথম রাজনৈতিক দল কোনটি?
৩. কংগ্রেস কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
৪. কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা কে? *[রাবি ২০১২-১৩]*
৫. কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি কে?
৬. আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার কয়টি উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে?

উত্তরের জন্য ৩০৬ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গঠনের উদ্দেশ্য ছক আকারে লেখো।

পাঠ ১২

নিখিল ভারত মুসলিম লীগ
All India Muslim League

মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা (Foundation of Muslim League)

১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (Indian National Congress) দলটির সব সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত দলটি ভারতীয় মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠের আস্থা ও সমর্থন লাভ করতে পারেনি। এক পর্যায়ে ভারতীয় মুসলমানদের উপলব্ধি হয়, কংগ্রেস তাদের স্বার্থ পরিপূর্ণভাবে রক্ষা করছে না। এ অবস্থায় মুসলমান সমাজ এমন একটি সংগঠনের প্রয়োজন উপলব্ধি করে যার মাধ্যমে তারা তাদের নিজস্ব দাবি-দাওয়া সরকারের কাছে তুলে ধরতে সক্ষম হবে। এ ভাবনা থেকেই মুসলমানরা 'সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ' (All India Muslim League) নামে জাতীয় রাজনৈতিক সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করে। সংক্ষেপে এটি 'মুসলিম লীগ' নামে পরিচিত হয়।

মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট: গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কংগ্রেস ছিল অসাম্প্রদায়িক সংগঠন। এর সদস্যপদ বরাবরই সব সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য উন্মুক্ত ছিল এবং অনেক বিশিষ্ট মুসলিম এর নেতা বা সদস্য হয়েছিলেন। তবে লক্ষ্য ও আদর্শ অনুযায়ী অসাম্প্রদায়িক সংগঠন হলেও কংগ্রেস মূলত দেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করত। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ভারতের মুসলিম নেতৃবৃন্দ ইংরেজি শিক্ষার প্রসারসহ নানামুখী উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টা চালান। মুসলিম নেতাদের মধ্যে স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখ মুসলমানদের রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বার্থরক্ষার জন্য নিজেদের রাজনৈতিক ঐক্য ও নিজস্ব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সৈয়দ আমীর আলী 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' (১৮৭৭ খ্রি.) নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। বলা হয়ে থাকে, মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার আগে এটিই ছিল ভারতের মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক সংগঠন। অন্যদিকে স্যার সৈয়দ আহমদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'ইউনাইটেড ইন্ডিয়ান প্যাট্রিয়টিক এসোসিয়েশন' (১৮৮৭ খ্রি.) ও 'মোহামেডান ডিফেন্স এসোসিয়েশন' নামে রাজনৈতিক সংগঠন। প্রথমোক্ত সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে। তবে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা এবং শক্ত সাংগঠনিক ভিত্তি না থাকায় সংগঠনটি কংগ্রেসের বিকল্প রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে দাঁড়াতে পারেনি।

স্যার সৈয়দ আহমদের মৃত্যুর পর আলীগড়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত মুসলমান নেতারা বৃহত্তর রাজনৈতিক অঙ্গনে মুসলমানদের মর্যাদাকর অবস্থান প্রতিষ্ঠা তথা তাদের সার্বিক স্বার্থরক্ষায় ব্রতী হন। সেই লক্ষ্যে ১৯০১ সালের ২১ ও ২২ অক্টোবর উত্তর ভারতের লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য পৃথক রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত হয়। ১৯০৩ সালে শাহরানপুরে এবং ১৯০৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পাঞ্জাবে পৃথক দুটি মুসলিম রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়।

এদিকে ১৯০৫ সালে সরকার প্রশাসনিক সুবিধার কারণ দেখিয়ে বঙ্গপ্রদেশ বিভক্ত করে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নিয়ে পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ গঠন করে। সব দিক থেকে পিছিয়ে থাকা বাংলার অবহেলিত মুসলমানরা নতুন প্রদেশ সৃষ্টির মাধ্যমে ভাগ্যোন্নয়নের আশায় বুক বাঁধে। কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায় (বিশেষ করে স্বার্থান্বেষী জমিদার ও উচ্চশিক্ষিত শ্রেণি) ও কংগ্রেস দল বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে। তারা বঙ্গভঙ্গকে মাতৃভূমিকে দ্বিখণ্ডিত করার শামিল আখ্যা দিয়ে এর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আন্দোলন শুরু করে। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের অবস্থান বাংলার মুসলমানদের মর্মাহত করে। তাদের ধারণা হয়, কংগ্রেস কখনোই মুসলমানদের স্বার্থের পক্ষে কাজ করবে না। এমন প্রেক্ষাপটে ঢাকার নবাব খাজা সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার মুসলমান সমাজ বঙ্গভঙ্গ রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ হয়। এ সময় ব্রিটিশ সরকার ভারতে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের আভাস দিলে ১৯০৬ সালের অক্টোবর মাসে আগা খানের নেতৃত্বে উচ্চশ্রেণির একটি মুসলিম প্রতিনিধি দল সিমলাতে বড়লাট লর্ড মিন্টোর সাথে সাক্ষাৎ করে বিভিন্ন দাবি তুলে ধরে। নবাব সলিমুল্লাহ ঐ প্রতিনিধি দলের মাধ্যমে বড়লাটের কাছে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য একটি পৃথক রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত একটি প্রস্তাব বিবেচনার জন্য পাঠান। সিমলা বৈঠকে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধি দলের সদস্যরা সলিমুল্লাহর প্রস্তাবের নিরিখে একটি রাজনৈতিক দল গঠনের বিষয়ে নীতিগতভাবে একমত হন। তবে তারা ঠিক করেন, এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া

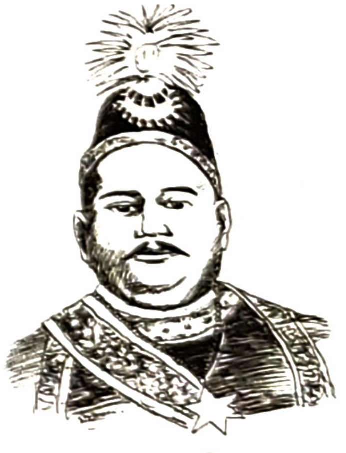
নবাব স্যার সলিমুল্লাহ

হবে ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য সর্বভারতীয় মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে (All India Mohammedan Educational Conference)। ঐ সিদ্ধান্ত মোতাবেক সর্বভারতীয় মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন শেষে ৩০ ডিসেম্বর নবাব ভিকারুল মুলকের সভাপতিত্বে একটি রাজনৈতিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে নবাব সলিমুল্লাহ কর্তৃক 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' (All India Muslim League) নামে একটি রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এভাবেই ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর মুসলমানদের পৃথক রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে মুসলিম লীগের যাত্রা শুরু হয়।

মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যসমূহ: প্রতিষ্ঠালগ্নে মুসলিম লীগের যেসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করা হয় সেগুলো ছিল:

ক. ব্রিটিশ সরকারের প্রতি ভারতবর্ষের মুসলমানদের আনুগত্য বৃদ্ধি করা এবং ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সব 'ভুল বোঝাবুঝির অবসান' করা, খ. মুসলমানদের স্বার্থ ও অধিকার আদায় করা এবং তাদের দাবি-দাওয়া ব্রিটিশ সরকারের কাছে শ্রদ্ধার সাথে পেশ করা এবং গ. উল্লিখিত দুটি উদ্দেশ্য ব্যাহত না করে ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখা। পরবর্তীকালে মুসলিম লীগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আরও সম্প্রসারণ করা হয়। নবাব মোহসীন-উল-মুলক ও নবাব ভিকারুল মুলক মুসলিম লীগের যুগ্ম সম্পাদক (Joint Secretary) নির্বাচিত হন। সংগঠনের গঠনতন্ত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ৬০ সদস্যের একটি অস্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। ক্রমে ভারতের প্রদেশে প্রদেশে দলের শাখা গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১৯০৯ সালে সৈয়দ আমীর আলী লন্ডনে মুসলিম লীগের একটি শাখা প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রতিক্রিয়া: কংগ্রেস দল এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের মালিকানাধীন সংবাদপত্রসমূহ মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার তীব্র নিন্দা জানায়। সুরেন্দ্রনাথ সম্পাদিত *The Bengalee* পত্রিকায় একে 'Salimullah League' বলে কটাক্ষ করা হয়। ইংল্যান্ডের সংবাদপত্রসমূহও মুসলিম লীগ গঠনকে সুনজরে দেখেনি। অবশ্য *The Times of India, The Daily Telegraph,* এবং *The Englishman*-এ মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার ঘটনাকে স্বাগত জানানো হয়।

গুরুত্ব ও তাৎপর্য: মুসলিম লীগ ভারতের মুসলমানদের মধ্যে আত্মজাগরণের সৃষ্টি করে। ফলে দেশের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়। মুসলিম জাতীয়তাবাদী চেতনা ক্রমে সুসংহত রূপ লাভ করে। মুসলমানরা মুসলিম লীগের ব্যানারে ভারতীয় রাজনীতিতে সংগঠিত শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলে তাদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া আদায় সহজ হয়। পৃথক নির্বাচনের দাবিসহ মুসলমানদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করায় মুসলিম লীগের জনসমর্থন ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। পরবর্তী ৪০ বছরের মধ্যে দলটি ভারতের অন্যতম প্রধান ও জনপ্রিয় রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়। ভারতের হিন্দু ও মুসলমানদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ইত্যাদি পৃথক এবং এ কারণে তারা দুটি পৃথক জাতি— জনপ্রিয় মুসলিম লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর এ দ্বিজাতি তত্ত্বের আলোকে মুসলিম লীগ ভারতের মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্রের দাবি তোলে। এর চূড়ান্ত পরিণতি হলো ভারত বিভক্তি ও মুসলিমদের জন্য স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? *[রা. বো., দি. বো., কু. বো., সি. বো., চ. বো., য. বো., ব. বো. ২০১৭]*
২. মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠায় প্রধান ভূমিকা পালন করেন কে?
৩. কার সভাপতিত্বে মুসলিম লীগ যাত্রা শুরু করে?
৪. মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাকালীন উদ্দেশ্য ছিল কয়টি?
৫. কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে স্যার সৈয়দ আহমদ খান কোন সংগঠনটি গড়ে তোলেন?
৬. কোন সংগঠন সৃষ্টির পর মুসলিম জাতীয়তাবাদী চেতনা সুসংহত রূপ লাভ করে?

উত্তরের জন্য ৩০৬ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. মুসলিম লীগ গঠনের আগে মুসলমানদের গঠিত রাজনৈতিক দলগুলোর নামসহ মুসলিম লীগকে যে সব পত্রিকা স্বাগত জানায় তার একটি তালিকা তৈরি করো।
২. মুসলিম লীগ গঠনের উদ্দেশ্যগুলো চিহ্নিত করে এর গুরুত্ব ছক আকারে লেখো।

পাঠ ১৩

বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫): কারণ ও ঘটনা
Bengal Partition (1905): Causes and Events

লর্ড কার্জন

ব্রিটিশ ভারতের শাসনতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর ব্রিটিশ ভারতের ভাইসরয় লর্ড ন্যাথানিয়েল কার্জন (Lord Nathaniel Curzon) তৎকালীন বঙ্গ প্রেসিডেন্সিকে ভাগ করে দুটি নতুন প্রদেশ গঠন করেন। ভারতের ইতিহাসে এটিই 'বঙ্গভঙ্গ' নামে পরিচিত। বিশ্বের ইতিহাসে প্রশাসনিক বা রাজনৈতিক কারণে কোনো দেশ বা অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ মানচিত্রের পরিবর্তনের অনেক ঘটনাই আছে। তবে বঙ্গভঙ্গের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বঙ্গ-ভারতের রাজনৈতিক অঙ্গনে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

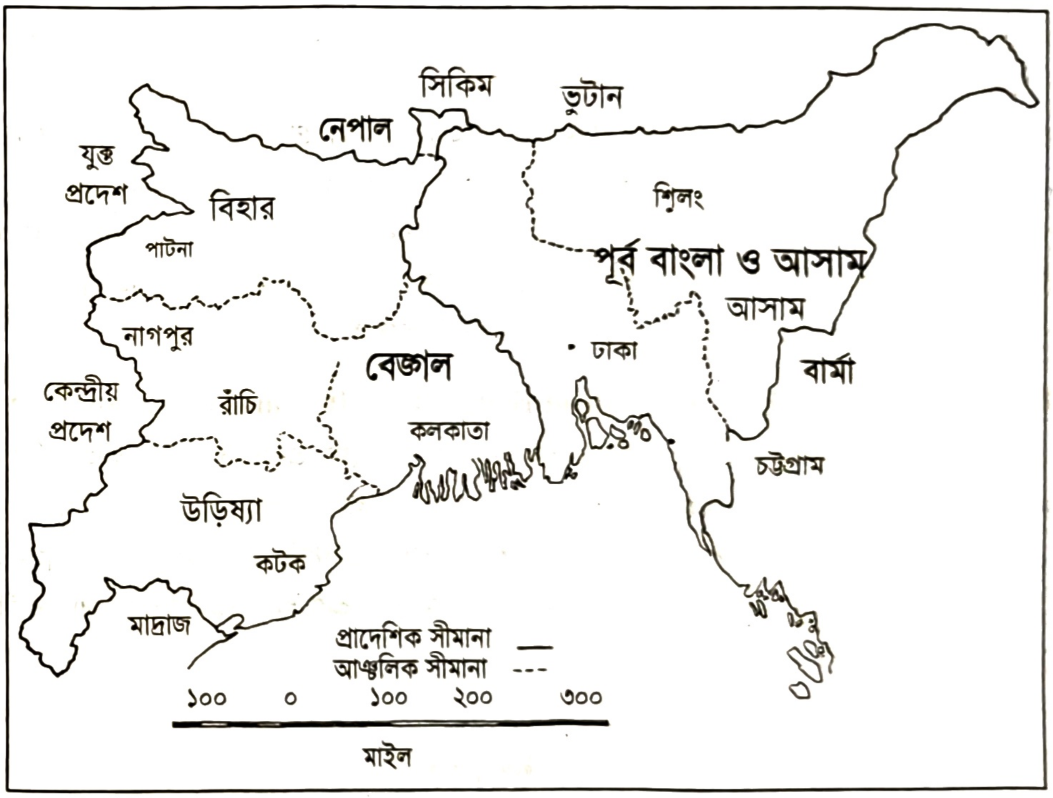
সিকিম
ভুটান
নেপাল
যুক্ত প্রদেশ
বিহার
পাটনা
শিলং
পূর্ব বাংলা ও আসাম
আসাম
নাগপুর
ঢাকা
বেঙ্গল
বার্মা
কেন্দ্রীয় প্রদেশ
রাঁচি
কলকাতা
চট্টগ্রাম
উড়িষ্যা
কটক
মাদ্রাজ
প্রাদেশিক সীমানা
আঞ্চলিক সীমানা
১০০ ০ ১০০ ২০০ ৩০০
মাইল

বঙ্গভঙ্গ পরবর্তী বাংলা, ১৯০৫-১৯১২

Source: *Elite Conflict in a Plural Society: Twentieth Century Bengal*, H. Broomfield, P-28, California, 1968

বঙ্গভঙ্গের কারণ (Causes of the Bengal Partition)

কোনো একক কারণে বঙ্গভঙ্গ হয়েছিল এমনটি নয়। বস্তুত এর পেছনে একাধিক কারণ ছিল বলে ঐতিহাসিকেরা মনে করেন। যেমন—

প্রশাসনিক কারণ: ভাইসরয় লর্ড কার্জন, মেকলে, রিজলে, গডলেক প্রমুখ ব্রিটিশ কর্মকর্তার ভাষ্যমতে মূলত প্রশাসনিক কারণেই বঙ্গভঙ্গ করা হয়েছিল। তাদের যুক্তি, বাংলা ছিল ব্রিটিশ ভারতের সবচেয়ে বড় প্রদেশ। ভাগের আগে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা এবং মধ্যপ্রদেশ ও আসামের কিছু অঞ্চল নিয়ে গঠিত বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির আয়তন ছিল ১ লক্ষ ৮৯ হাজার বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে ৭ কোটি। যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থার বেহালদশা, অধিক জনসংখ্যা প্রভৃতি কারণে একজন গভর্নরের পক্ষে এ বিশাল প্রদেশের শাসনকাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা ছিল প্রায় অসম্ভব। বিভিন্ন সময়ে বাংলায় দায়িত্ব পালনকারী ব্রিটিশ কর্মকর্তারা এ সমস্যাটি তুলে ধরে ১৮৫৩ সাল থেকে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে এ প্রদেশ পুনর্গঠনের প্রস্তাব করেছেন। এরূপ একটি পরিস্থিতির মধ্যে লর্ড কার্জন ভাইসরয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করে প্রশাসনিক সুবিধার জন্যই বঙ্গ প্রদেশ বিভক্তির উদ্যোগ নিয়েছিলেন বলে সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়।

আর্থ-সামাজিক কারণ: ১৯০৫ সালের বজ্গভজ্গের পেছনে আর্থ-সামাজিক কারণও ক্রিয়াশীল ছিল বলে অনেক বিশ্লেষক মনে করেন। পশ্চিমবজ্গে অবস্থিত মহানগরী কলকাতা ছিল অবিভক্ত বাংলার প্রাণকেন্দ্র। কলকাতাই ছিল বিশাল ব্রিটিশ ভারতের তৎকালীন রাজধানী। এ কারণে বাংলা তথা ভারতের বড় ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প সেখানেই বিশেষভাবে গড়ে ওঠে। পক্ষান্তরে নদনদী, খালবিলে পরিপূর্ণ পূর্ববজ্গ প্রত্যন্ত অঞ্চল হিসেবে অবহেলিত হতে থাকে। পাট মূলত পূর্ববজ্গে উৎপন্ন হলেও পাটকলগুলো প্রধানত গড়ে উঠেছিল কলকাতায়। কলকাতা দেশের রাজধানী হওয়ায় তা ছিল রাজনীতিরও প্রাণকেন্দ্র। এককথায়, কলকাতাকে কেন্দ্র করেই বাংলার সব ধরনের আর্থ-সামাজিক ও প্রশাসনিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এসব কারণে কলকাতা তথা পশ্চিম বাংলা ক্রমশ উন্নত হতে থাকে এবং পূর্ব বাংলার অবনতি ঘটতে থাকে। এ অবস্থায় ভারতের ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান জনগোষ্ঠীকে বোঝাতে চেষ্টা করে যে, বজ্গভজ্গ করা হলে তাদের ভাগ্যের উন্নতি হবে। এছাড়া তাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হিসেবে স্বার্থ সংরক্ষিত হবে। মুসলমানরা ব্রিটিশদের এ কথায় আস্থা স্থাপন করে এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ কল্যাণ চিন্তায় বজ্গ বিভাগ পরিকল্পনাকে সমর্থন জানায়।

রাজনৈতিক কারণ: বজ্গভজ্গের পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই প্রধান ছিল বলে অধিকাংশ ঐতিহাসিক মনে করেন। তাদের মতে, বজ্গভজ্গ ছিল ব্রিটিশ সরকারের কুখ্যাত 'ভাগ কর ও শাসন কর' (Divide and Rule Policy) নীতির বহিঃপ্রকাশ। তারা মনে করেন, ব্রিটিশ শাসকেরা বাংলাকে বিভক্ত করে বাঙালি জাতির ঐক্য ও সংহতি নষ্ট করে তাদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে দুর্বল করার চেষ্টা করেছিল। বস্তুত, বিশ শতকের শুরুতে ভারতে যে ব্রিটিশবিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়, বাংলা বিশেষ করে কলকাতাই ছিল তার কেন্দ্রবিন্দু। ঐ আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি। তাই ভারতীয় উপমহাদেশীয় ঐতিহাসিকদের অনেকেই মনে করেন, লর্ড কার্জন বাংলার মুসলিম সমাজকে হিন্দু মধ্যবিত্তদের আধিপত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে রাজনৈতিক সুবিধা নেওয়ার অশুভ উদ্দেশ্যেই বজ্গভজ্গ কার্যকর করেছিলেন।

বজ্গভজ্গ কার্যকর ও নতুন প্রদেশ সৃষ্টি (Execution Bengal Partition and Creation New State)

১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বজ্গভজ্গ পরিকল্পনা কার্যকর করা হয়। এ পরিকল্পনা অনুসারে বাংলা প্রেসিডেন্সিকে ভেঙে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগ (দার্জিলিং বাদে জলপাইগুড়ি, পার্বত্য ত্রিপুরা ও মালদহ জেলাসহ) এবং আসাম নিয়ে 'পূর্ব বাংলা ও আসাম' নামে একটি নতুন প্রদেশ সৃষ্টি করা হয়। ঢাকাকে নতুন প্রদেশের রাজধানী করা হয়। স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার (Sir Bampfylde Fuller)-কে নতুন প্রদেশের প্রথম লেফটেন্যান্ট গভর্নর নিয়োগ করা হয়। কলকাতাকে রাজধানী করে অবিভক্ত বাংলার অন্যান্য অংশ নিয়ে গঠিত হয় 'বজ্গ প্রদেশ'।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কত সালে বজ্গভজ্গ করা হয়? *[ঢাবি ২০১০-১১]*

২. বজ্গভজ্গ করেন কে? *[জবি ২০১৭-১৮]*

৩. ব্রিটিশ ভারতের সবচেয়ে বড় প্রদেশ ছিল কোনটি?

৪. অবিভক্ত বাংলার প্রাণকেন্দ্র ছিল কোনটি?

৫. পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের গভর্নর করা হয় কাকে?

৬. 'ভাগ কর, শাসন কর'— কাদের নীতি ছিল?

উত্তরের জন্য ৩০৬ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. বজ্গভজ্গের ফলে সৃষ্ট প্রদেশগুলোকে মানচিত্রে চিহ্নিত করো।

২. বজ্গভজ্গের পেছনে ব্রিটিশ সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পাঁচটি বাক্যে লেখো।

পাঠ ১৪

বঙ্গভঙ্গের ফলাফল
Outcome of the Bengal Partition

বঙ্গভঙ্গের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে বঙ্গভঙ্গ ছিল একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বাংলা প্রদেশ বিভক্ত হওয়ার ফলে পূর্ববঙ্গ নতুন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। এ অঞ্চলের বৃহত্তম নগরী ঢাকা হয় প্রদেশের প্রশাসনিক কেন্দ্র। পূর্ব বাংলা ও আসাম অঞ্চলের মুসলমান সম্প্রদায়ের সমাজ ও রাজনীতিতে প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের অগ্রগতি হওয়ায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। নতুন প্রদেশের প্রশাসনে দেখা যায় নতুন প্রাণশক্তি ও উদ্দীপনা। ঢাকায় নতুন নতুন সুরম্য অট্টালিকা, হাইকোর্ট ভবন, সেক্রেটারিয়েট, আইনপরিষদ ভবনসহ বিভিন্ন ইমারত নির্মিত হতে থাকে। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও ব্যাপক অগ্রগতি ঘটে যা মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে। মুসলমানদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা জেগে ওঠে। বঙ্গভঙ্গের প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে একটি পত্রিকায় নতুন প্রদেশ সৃষ্টির কারণে ৮টি সুবিধা হওয়ার কথা বলা হয়। যথা: ১. ঢাকা নগরের পুনর্জন্ম ও চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নতি, ২. রেললাইনের সম্প্রসারণসহ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ৩. প্রাদেশিক পরিষদ গঠিত হওয়ায় জনপ্রতিনিধিদের পক্ষে জনসাধারণের অভাব-অভিযোগের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের সুযোগ তৈরি, ৪. সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ফলে মানুষের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত, ৫. উন্নত পূর্ব বাংলার সংস্পর্শে এসে আসামের উন্নতি, ৬. পূর্ব বাংলার আইনশৃঙ্খলা রক্ষার্থে পুলিশ বাহিনীর উন্নয়ন, ৭. নতুন প্রদেশের শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষণীয় অগ্রগতি অর্জিত এবং ৮. প্রদেশের প্রধান কর্মকর্তার সাথে জনসাধারণের সরাসরি যোগাযোগ করার সুযোগ হয়।

বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতায় অভিজাত হিন্দু সমাজ ও কংগ্রেসের পরিচালিত আন্দোলন মোকাবিলার প্রয়োজন থেকেই নবাব সলিমুল্লাহ মুসলমানদের একটি পৃথক রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার তাগিদ অনুভব করেন। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মুসলিম নেতাদের কাছে সলিমুল্লাহ এ বিষয়ে প্রস্তাব পাঠান। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯০৬ সালে মুসলমানদের জন্য মুসলিম লীগ নামে একটি পৃথক সংগঠনের জন্ম হয়। পরবর্তীকালে এ দলটি মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক স্বাধীন পাকিস্তান সৃষ্টিতে অগ্রণী ভূমিকা রাখে।

বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়া ও বঙ্গভঙ্গ রদ
Reactions of the Bengal Partition and Its Annulment

বাংলার হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মধ্যে বঙ্গভঙ্গের ব্যাপারে বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া বঙ্গভঙ্গের ব্যাপারে মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া ছিল ইতিবাচক। অন্যদিকে, এ ব্যাপারে অভিজাত হিন্দু সমাজ ও কংগ্রেস দল তীব্র নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিল। নিচে এ প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো:

মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া: শুরুতে মুসলমানরা বঙ্গভঙ্গের বিষয়ে তেমন উৎসাহ দেখায়নি। তবে ব্রিটিশ শাসকেরা যখন বঙ্গ প্রদেশ ভাগ করে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নিয়ে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রদেশ গঠনের পরিকল্পনা প্রকাশ করেন, তখন মুসলমানরা এ ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী হয়ে ওঠে। কারণ, এর মধ্যে তারা নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ, সার্বিক উন্নতি এবং একটি স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠী হিসেবে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভের সম্ভাবনা দেখতে পায়। তাই ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ বাংলার মুসলিম জনমতকে বঙ্গভঙ্গের পক্ষে সংগঠিত করার উদ্যোগ নেন। সলিমুল্লাহ মনে করতেন, বঙ্গভঙ্গ মুসলমানদের স্থবিরতা ও নিষ্ক্রিয়তা থেকে মুক্তি দেবে। তাদের কর্মের আদর্শে উদ্দীপ্ত করবে। পূর্ব বাংলার মুসলমানদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বঙ্গভঙ্গকে তাদের স্বার্থের অনুকূল বিবেচনা করে মনে-প্রাণে এ পরিকল্পনাকে গ্রহণ করে। হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের মুখে সরকার যেন বঙ্গভঙ্গ বাতিল না করে সে জন্য মুসলমানরা মুসলিম লীগসহ নানা সংগঠনের ব্যানারে ঐক্যবব্ধ হয়ে তাদের দাবি উত্থাপন করতে থাকে। তবে কিছু অভিজাত মুসলমান বঙ্গভঙ্গের বিপক্ষে অবস্থান নেন। এদের মধ্যে ছিলেন নবাব সলিমুল্লাহর সৎ ভাই খাজা আতিকুল্লাহ, আব্দুর রসুল, খান বাহাদুর মো: ইউসুফ, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, আব্দুল কাশেম প্রমুখ।

হিন্দুদের প্রতিক্রিয়া: বঙ্গভঙ্গের প্রতি বাংলার অভিজাত হিন্দু সমাজ ও কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া ছিল তীব্র ও নেতিবাচক। ১৯০৩ সালে সরকারের বঙ্গবিভাগ পরিকল্পনা প্রকাশ থেকে শুরু করে ১৯০৫ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে হিন্দু সমাজের পক্ষে প্রায় দুই হাজার সভা হয়। এছাড়া সরকারের কাছে শত শত প্রতিবাদপত্র পাঠানো হয়। এর পরও ১৯০৫

সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করা হলে অভিজাত হিন্দু সম্প্রদায় চরমভাবে ক্ষুব্ধ হয়। মূলত কলকাতাভিত্তিক উচ্চ ও মধ্যবিত্ত হিন্দুরা এ নিয়ে ঝড় তোলেন। এদের মধ্যে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ শেখ, অশ্বিনী কুমার দত্ত, বালগঙ্গাধর তিলক প্রমুখ। এ প্রতিক্রিয়ার পেছনে তাদের বৈষয়িক স্বার্থ জড়িত ছিল। নতুন প্রদেশে পৃথক হাইকোর্ট গঠনের সিদ্ধান্তে কলকাতার আইনজীবীরা পেশাগত স্বার্থ ক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে পড়েন। হিন্দুরা নতুন প্রদেশে মুসলমানদের একচেটিয়া প্রাধান্যের সম্ভাবনায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে।.অনেকে বাংলা প্রদেশ বিভক্ত করাকে মাতৃভূমিকে দ্বিখণ্ডিত করার শামিল হিসেবেও দেখেন। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বঙ্গভঙ্গের উদ্যোক্তা লর্ড কার্জনের তীব্র সমালোচনা করেন। তারা বলেন, বাঙালিরা এক জাতি এবং এভাবে বাংলাকে বিভক্ত করাটা প্রকৃতিবিরুদ্ধ এবং অন্যায় কাজ। কংগ্রেস বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্য প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলে। দলটি ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক আন্দোলন হিসেবে 'স্বদেশি' কর্মসূচি ঘোষণা করে। এ আন্দোলনে স্বদেশি পণ্য ব্যবহার ও ব্রিটিশ পণ্য বয়কটের আহ্বান জানানো হয়। বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন এক পর্যায়ে অনেকটা হিন্দু পুনর্জাগরণবাদী ও সন্ত্রাসবাদী রূপ নেয়। ইংরেজদের ওপর বিপ্লবীরা বিভিন্ন রকম হামলা চালায়।

বঙ্গভঙ্গ রদ ও মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া
Annulment of the Bengal Partition and the Reaction of the Muslims

বঙ্গভঙ্গবিরোধী হিন্দুসমাজ এবং কংগ্রেস ও বিভিন্ন চরমপন্থি সংগঠনের কর্মী-সমর্থকরা স্বদেশি আন্দোলন ছাড়াও ইংরেজ কর্মকর্তা-কর্মচারিদের ভয়ভীতি প্রদর্শন করতে থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের ওপর হামলাও চলে। বঙ্গভঙ্গবিরোধী পত্রপত্রিকায় উস্কানিমূলক খবর ও সম্পাদকীয় লেখা হতে থাকে। আন্দোলনকারীরা ক্রমে কর্মসূচির গতিবেগ ও তীব্রতা বৃদ্ধি করে। ক্রমে এটি 'ব্রিটিশ তাড়াও' আন্দোলনে রূপ নিতে থাকে। এ অবস্থায় ব্রিটিশ সরকার আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। রাজা পঞ্চম জর্জ ভারত সফরে এসে ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে দিল্লির দরবারে বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা দেন।

বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে পূর্ব বাংলার মুসলমানরা হতাশ হয়ে পড়ে। মুসলমানদের বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারের আন্তরিকতা সম্পর্কে তারা কিছুটা সন্দিহানও হয়ে পড়ে। এ ঘটনা থেকে বঙ্গভারতের মুসলমানরা শিক্ষা পায় যে, স্বাধীন ও আত্মনির্ভরশীল হতে হলে তাদের আরও বেশি সংগঠিত হতে হবে। বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণার পর ৩০ ডিসেম্বর নবাব সলিমুল্লাহর আহ্বানে উভয় বাংলার নেতৃস্থানীয় মুসলিমদের এক সভায় ভাইসরয়ের কাছে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে স্মারকলিপি উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়। বঙ্গভঙ্গ রদের প্রতিক্রিয়াতে মুসলমানদের স্বার্থকে সংগঠিতভাবে উপস্থাপনের জন্যে মুসলিম লীগকে মুখপাত্র করা হয়। ১৯১২ সালে কলকাতায় গঠিত হয় বঙ্গীয় মুসলিম লীগ। পরবর্তীকালে এ দলই পূর্ব বাংলার মুসলমানদের নেতৃত্ব দেয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের রাজধানী করা হয় কোনটিকে?
২. বঙ্গভঙ্গকে কারা স্বাগত জানায়?
৩. কারা বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে?
৪. বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়ার স্বদেশি কর্মসূচি ঘোষণা করে কোন দল?
৫. কত সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়? *[রা. বো., কু. বো., য. বো. ২০২২]*
৬. কলকাতায় বঙ্গীয় মুসলিম লীগ গঠিত হয় কত সালে?

উত্তরের জন্য ৩০৬ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. দলীয় কাজ

দলীয় কাজ: দুটি দলে বিভক্ত হয়ে একদল বঙ্গভঙ্গের প্রতি মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া এবং অন্য দল এর প্রতি হিন্দুদের প্রতিক্রিয়া নিয়ে দুটি ছক তৈরি করো।

পাঠ ১৫ ও ১৬

খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন
Khilafat and Non-Cooperation Movement

ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে আছে। এগুলো ছিল ভারতে প্রথম দিকের ব্রিটিশবিরোধী গণআন্দোলন। আন্দোলন দুটি যুগপৎ পরিচালিত হয়। অবশ্য খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। তবে এসব আন্দোলন ভারতীয়দের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা, দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ গড়ে তোলায় সহায়তা করে।

খেলাফত আন্দোলনের পটভূমি (Background of Khilafat Movement)

খেলাফত ইসলামের একটি ধর্মীয়-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। বর্তমান সৌদি আরবের মদিনায় খেলাফতের জন্ম হলেও রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের ধারায় প্রতিষ্ঠানটি দামেস্ক, বাগদাদ, কায়রো এবং কর্ডোভা (স্পেন) হয়ে শেষ পর্যায়ে তুরস্কের অটোমান সুলতানদের অধিকারে যায়। খেলাফত বিশ্ব মুসলমানের কাছে ঐক্য ও মর্যাদার প্রতীক। এ মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের অধিকারী হওয়ায় বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের মুসলমানদের মতো ভারতীয় মুসলমানরাও তুরস্কের সুলতানের প্রতি আনুগত্য ও শ্রদ্ধা পোষণ করত। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) শুরু হয়। এ যুদ্ধে তুরস্ক নিজের স্বার্থে মিত্রশক্তির (ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়া ইত্যাদি) বিরুদ্ধে অক্ষশক্তির (জার্মানি, ইতালি, জাপান ইত্যাদি) পক্ষে অবস্থান নেয়। এতে ভারতীয় মুসলমানরা বিরাট রাজনৈতিক দোটানায় পড়ে যায়। নিজেদের ঔপনিবেশিক শাসক ব্রিটেন না খিলাফতের অধিকারী তুরস্ক কোন পক্ষে যাওয়া উচিত তা নিয়ে তারা দ্বিধায় পড়ে। এ অবস্থায় চতুর ব্রিটিশ শাসকেরা ভারতীয় মুসলমানদের পক্ষে টানতে আশ্বাস দেয় যে, অক্ষশক্তি যুদ্ধে হেরে গেলেও তুরস্কের খিলাফতের মর্যাদা রক্ষা করা হবে। কিন্তু অক্ষশক্তি যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর ব্রিটিশ সরকার খলিফার মর্যাদা ও তার সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষার ব্যাপারে সহায়তার বিষয়ে গড়িমসি করতে থাকে। এতে বিশ্বের মুসলমানরা খলিফার মর্যাদা ও তুরস্কের বিষয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়ে। এ পরিস্থিতিতে ভারতীয় মুসলমানরা তুরস্কের খেলাফত রক্ষার দাবিতে যে আন্দোলন গড়ে তোলে ইতিহাসে তা-ই 'খেলাফত আন্দোলন' নামে পরিচিত। মাওলানা মুহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলী ('আলী ভ্রাতৃদ্বয়' নামে অধিক পরিচিত), মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, ড. এম এ আনসারী, মাওলানা হযরত মোহানী ও শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক প্রমুখের নেতৃত্বে এ আন্দোলন পরিচালিত হয়।

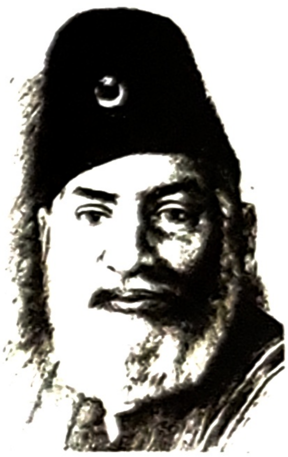

মাওলানা শওকত আলী

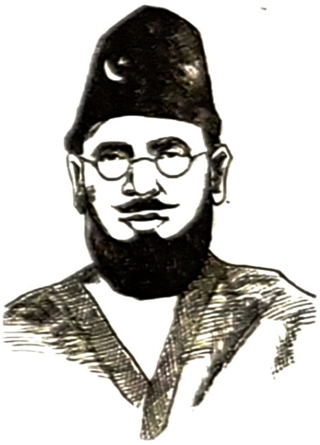

মাওলানা মুহাম্মদ আলী

অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমি (Background of Non-Co-operation Movement)

খেলাফত আন্দোলনের সাথে যুগপৎভাবে পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলন ছিল শক্তিশালী ব্রিটিশবিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। কংগ্রেস নেতা মহাত্মা গান্ধীর উদ্যোগে এ আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ঐ সময় জরুরি অবস্থায় সন্দেহভাজন ভারতীয়দের বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করা সংক্রান্ত নিবর্তনমূলক 'রাওলাট আইন' ভারতীয়দের মধ্যে প্রবল ক্ষোভের সঞ্চার করেছিল। এ ঘটনার প্রতিবাদে ভারতীয়রা ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগ ময়দানে এক প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করে। সরকারের নির্দেশে জেনারেল ডায়ারের নেতৃত্বে একদল সেনাসদস্য সেখানে নিরস্ত্র প্রতিবাদী মানুষের ওপর নির্বিচারে গুলি চালায়। এতে সরকারি ভাষ্যমতেই, ৩০৯ জন নিহত এবং ২০০ জন আহত হয়। বেসরকারি হিসেবে হতাহতের সংখ্যা ছিল এর অনেক বেশি। ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে

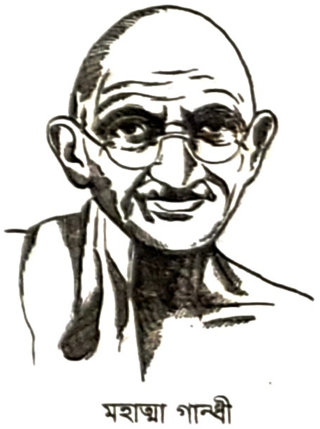

মহাত্মা গান্ধী

এ ঘটনা 'জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড' নামে পরিচিত। জালিয়ানওয়ালাবাগের নির্মমতা ভারতীয়দের মনে তীব্র ব্রিটিশবিরোধী অসন্তোষ তৈরি করে। এর প্রতিবাদে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া 'নাইট' উপাধি বর্জন করেন। এদিকে ১৯১৯ সালে ভারতে প্রবর্তিত সংস্কার আইনে প্রবর্তিত সরকারের প্রতিশ্রুত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন উপেক্ষা করা হয়। এতে জাতীয় কংগ্রেস তীব্র অসন্তোষ ব্যক্ত করে। একই সময়ে তুরস্কের খলিফার সাম্রাজ্য খণ্ডিত করার প্রতিবাদে ভারতের মুসলমানরা খিলাফত আন্দোলন শুরু করেন। মহাত্মা গান্ধী ঐ পরিস্থিতিকে দেশের স্বার্থে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি ও ঐক্যের এক অপূর্ব সুযোগ বলে মনে করেন। তিনি তখন খেলাফত আন্দোলনের পাশাপাশি নিয়মতান্ত্রিক অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করে স্বরাজ অর্থাৎ স্বায়ত্তশাসন অর্জনের প্রয়াস চালান।

খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি

Trends of Khilafat and Non-Co-operation Movement

১৯১৯ সালের অক্টোবর মাসে সর্বভারতীয় খেলাফত কমিটি গঠন করা হয়। বোম্বেকে কেন্দ্র করে সব প্রদেশে কমিটির শাখা গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। নভেম্বর মাসে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের সভাপতিত্বে খেলাফত কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সিদ্ধান্ত হয় ব্রিটিশ সরকার তুরস্কের খলিফার মর্যাদা রক্ষার প্রতিশ্রুতি না দিলে ব্রিটিশ পণ্য বর্জন ও সরকারকে অসহযোগিতা করার নীতি গ্রহণ করা হবে। এ সময়ে কংগ্রেস নেতা মহাত্মা গান্ধী জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ও রাওলাট আইনসহ (১৯১৯) বিভিন্ন সরকারি নির্যাতন ও দুঃশাসনের প্রতিবাদে অহিংস জাতীয়তাবাদী আন্দোলন 'সত্যাগ্রহ' শুরু করেন। গান্ধী তার আন্দোলনের প্রতি মুসলমানদের সমর্থন আদায়ের জন্য খেলাফত আন্দোলনকে সমর্থন করেন এবং নিজেও কেন্দ্রীয় খেলাফত কমিটির সদস্য হন। খেলাফত আন্দোলনের প্রতি জনপ্রিয় নেতা গান্ধীর সমর্থনের বিনিময়ে খেলাফত নেতৃবৃন্দও গান্ধীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। এভাবে ভারতের হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায় ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের একটি সম্মিলিত ফ্রন্ট গড়ে তোলে। ব্রিটেনসহ বিশ্বযুদ্ধের মিত্রপক্ষ সেভার্স চুক্তির (২৩ আগস্ট, ১৯২০) মাধ্যমে তুর্কি সাম্রাজ্যকে খণ্ড-বিখণ্ড করার উদ্যোগ নিলে খেলাফত আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। মুসলমানরা ৩১ আগস্ট 'খেলাফত দিবস' পালন করে। ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি এবং পূর্ণ স্বরাজের দাবি ঘোষণা করা হয়। কংগ্রেস অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি হিসেবে সরকারি চাকরি ও পদবি ত্যাগ, সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, আদালত ও আইন ব্যবসা বর্জন এবং ব্রিটিশ পণ্য পরিহার ইত্যাদি প্রস্তাব গ্রহণ করে। খেলাফত কমিটি ও মুসলিম লীগ কংগ্রেসের অসহযোগ কর্মসূচি অনুমোদন করে এবং উভয় পক্ষেরই মূল উদ্দেশ্য স্বরাজ অর্জন বলে ঘোষণা দেয়।

বাংলায় খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন একটি জনপ্রিয় গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়। এতে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় অংশ নেয়। বাংলায় এ দু'টি আন্দোলনকে জনপ্রিয় করার ব্যাপারে মাওলানা আকরাম খান, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মজিবুর রহমান খান, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বিভিন্ন জেলায় বহুসংখ্যক কমিটি গঠিত হয়। *মোহাম্মদী, আল ইসলাম* ও *দ্য মুসলমানসহ* বিভিন্ন সংবাদপত্র আন্দোলনের পক্ষে জনসমর্থন সৃষ্টিতে মূল্যবান ভূমিকা রাখে।

আন্দোলনের তীব্রতা ও সরকারের দমননীতি

Intensity of the Movement and Repression by Government

১৯২১ সালের শুরুতে খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন ব্যাপক আকার ও তীব্র মাত্রা পায়। ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জন করে। শ্রমিকেরা কল-কারখানা ত্যাগ করে। সরকারি চাকরিজীবীরা চাকরিতে ইস্তফা দেয় বা অনুপস্থিত থাকে। আইনজীবীরা আদালত ত্যাগ করেন। বিদেশি পণ্য পরিহার এবং দেশি পণ্য ব্যবহার জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। আন্দোলনের ব্যাপকতায় ভীত হয়ে ব্রিটিশ সরকার দমননীতি গ্রহণ করে। হাজার হাজার লোককে গ্রেফতার করা হয়। অনেকে আবার স্বেচ্ছায় কারাবরণ করে। অমুসলিম ব্রিটিশশাসিত ভারতকে 'দারুল হারব' ঘোষণা করে একদল মুসলমান ভারত ত্যাগ করে আফগানিস্তানে চলে যায়।

মুসলমান সেনারা ব্রিটিশ সেনাবাহিনী ত্যাগ করার হুমকি দেয়। কংগ্রেস আইন অমান্য আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করে। সরকারকে কর ও খাজনা প্রদান স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এক পর্যায়ে আন্দোলন সহিংস রূপ ধারণ করে। ১৯২১ সালের আগস্ট মাসে ভারতের উপকূলীয় অঞ্চল মালাবারে কৃষক বিদ্রোহ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি হয়। ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে উত্তর প্রদেশের চৌরিচৌরায় বিক্ষুব্ধ জনতা একটি থানা আক্রমণ করে ২১ জন সিপাহি ও একজন দারোগাকে পুড়িয়ে হত্যা করে। এ সহিংসতায় উদ্বিগ্ন হয়ে মহাত্মা গান্ধী আন্দোলন বন্ধ ঘোষণা করেন।

আন্দোলনের পরিণতি (Results of the Movement)

নিয়মতান্ত্রিক ও অহিংস আন্দোলন সহিংসতায় পরিণত হলে গান্ধী মর্মাহত হন এবং অবিলম্বে আন্দোলনের কর্মসূচি বাতিল করেন। সরকার তাকে গ্রেফতার করে। এতে আন্দোলনকারীরা হতাশ হয়ে পড়ে। মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করায় খেলাফত আন্দোলনও দুর্বল হয়ে পড়ে। অন্যদিকে আধুনিক তুরস্কের জনক মুস্তফা কামাল আতাতুর্ক ১৯২৩ সালে সালতানাত এবং ১৯২৪ সালে খেলাফত বাতিল করে দেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। এর ফলে ভারতের খেলাফত আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি ঘটে।

খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের গুরুত্ব ও প্রভাব
Importance and Impact of Khilafat & Non-co-operation Movement

খেলাফত আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল তুরস্কের খেলাফত রক্ষা এবং অসহযোগ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল স্বরাজ অর্জন। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ভিন্নতা থাকলেও আন্দোলন দুটি যুগপৎ ও যৌথ নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। উভয় আন্দোলনই পরিচালিত হয় ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে। নানা কারণে খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হয়। কিন্তু এ আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতীয়দের মধ্যে যে সংগ্রামের অভিজ্ঞতা অর্জিত হয় তা ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনকে বেগবান করে স্বাধীনতা অর্জনকে ত্বরান্বিত করে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায়, ব্রিটিশ ভারতের স্বাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের গুরুত্ব ও প্রভাব অপরিসীম। তবে মুসলমানদের সাথে কোনোরূপ আলোচনা ছাড়াই মহাত্মা গান্ধী হঠাৎ করে অসহযোগ আন্দোলন বাতিল করায় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্পর্কে তিক্ততা সৃষ্টি হয়। অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলন দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে নতুন করে যে মৈত্রীর বন্ধন প্রতিষ্ঠিত করেছিল এ ঘটনায় তাতে ফাটল ধরে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও দাঙ্গার ঘটনা ঘটে। তা সত্ত্বেও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এ দুটি আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. 'খেলাফত' ইসলামের কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান?
২. কত সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়?
৩. প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতীয় মুসলমানরা কীসের দাবিতে ব্রিটিশদের পক্ষ নেয়?
৪. আলী ভ্রাতৃদ্বয় কোন আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন?
৫. কোন প্রেক্ষাপটে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রিটিশদের দেওয়া 'নাইট' উপাধি বর্জন করেন? *[রাবি ২০১২-১৩]*
৬. অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেন কে?

উত্তরের জন্য ৩০৬ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. খেলাফত আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারীদের একটি তালিকা তৈরি করো।
২. খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থতার কারণ ছকে উপস্থাপন করো।

পাঠ ১৭ ও ১৮

লাহোর প্রস্তাব ও দ্বিজাতি তত্ত্ব (১৯৪০)
Lahore Resolution and Two Nations Theory (1940)

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর 'দ্বিজাতি তত্ত্ব' ঘোষণা ও এর ভিত্তিতে ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন ব্রিটিশ ভারতের মুসলমানদের রাজনৈতিক ইতিহাসে তাৎপর্যপূর্ণ ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা। কারণ, এ দুটি ঘটনার ফলে ভারতের মুসলমানদের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় যে পরিবর্তনের জোয়ার আসে তার পরিণতিতেই ভারত বিভক্ত হয়ে মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। আর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর চরম বৈষম্য ও নিপীড়নের শিকার হয়ে দুই দশক পর বাঙালি মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটায়। অনেকে তাই বলে থাকেন, লাহোর প্রস্তাবের মধ্যেই স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ রোপিত হয়েছিল।

দ্বিজাতি তত্ত্ব ও লাহোর প্রস্তাবের পটভূমি
Background of the Two Nations Theory and Lahore Resolution

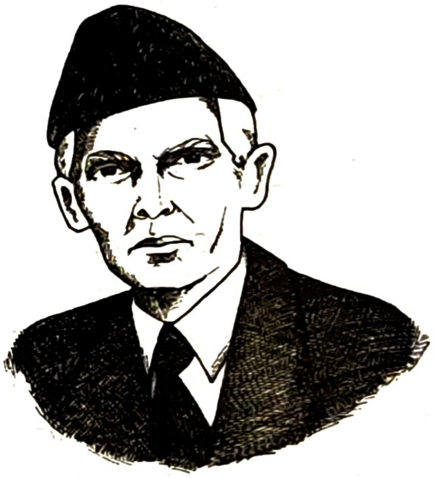
মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ

ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলাম আসার পর থেকে দীর্ঘ সময় ধরে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় শান্তিপূর্ণভাবে পাশাপাশি বসবাস করে আসছিল। মাঝে মাঝে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বা সংঘাত হলেও তা মূলত ছিল ছোট মাত্রার বিক্ষিপ্ত বা সাময়িক ঘটনা। রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা নিয়ে দরকষাকষির প্রেক্ষাপটে লক্ষ্ণৌ চুক্তি (১৯১৬) এবং পরবর্তীকালে খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সেতুবন্ধ রচনা করে। তবে আইনসভায় মুসলমানদের জন্য আসন সংরক্ষণ ও স্বতন্ত্র নির্বাচন চালুর প্রশ্নে আবার হিন্দু-মুসলমান বিরোধ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। বিশ শতকের তৃতীয় দশকে ভারতে রাজনৈতিক সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে। রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারি পর্যায়ে সাইমন কমিশন (১৯২৭) এবং বেসরকারি পর্যায়ে ভারতীয়দের উদ্যোগে নেহেরু কমিশন গঠন (১৯২৮) করা হয়। কিন্তু এ দু'টি কমিশনের রিপোর্টই সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। সংকট নিরসনে জিন্নাহর চৌদ্দ দফাও (১৯২৯) কোনো ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়। এ অবস্থায় সরকার কর্তৃক ১৯৩৩ সালে 'সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ' (Communal Award) ঘোষণার পর পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। ভারতীয়দের ক্ষোভ প্রশমনে ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন প্রণয়ন করে। এ আইন ভারতীয়দের সন্তুষ্ট করতে পারেনি। তবে এর আওতায় ১৯৩৭ সালে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক নির্বাচনে প্রায় সব রাজনৈতিক দল অংশ নেয়। এ নির্বাচনে অধিকাংশ প্রদেশে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। অন্যদিকে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহেও পরাজিত হয় মুসলিম লীগ। এ অবস্থায় মুসলিম লীগ কংগ্রেসের সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠনের প্রস্তাব করলে কংগ্রেস তা প্রত্যাখ্যান করে। এ সময় নির্বাচনে বিপুল সাফল্য পাওয়া কংগ্রেসশাসিত প্রদেশসমূহে মুসলিমবিরোধী কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। প্রদেশের স্কুলগুলোর পাঠ্যসূচিতে হিন্দু ধর্ম-দর্শন ও সাহিত্যকে বাধ্যতামূলক করা, নামাজের সময় মসজিদের সামনে দিয়ে বাদ্যযন্ত্রসহ মিছিল এবং সরকারি ভবনসমূহে কংগ্রেস দলের পতাকা উত্তোলন ইত্যাদি মুসলিম অনুভূতিকে আহত করে। তদুপরি "ভারতে কেবল দুটি শক্তির অস্তিত্ব লক্ষণীয়, একটি ব্রিটিশ সরকার এবং অন্যটি কংগ্রেস দল"— কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল নেহেরুর এরূপ মন্তব্য মুসলমানদের বিক্ষুব্ধ করে। রাজনীতিতেও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার প্রভাব পড়ে। নেহেরুসহ কোনো কোনো কংগ্রেস নেতার মনোভাব মুসলিম লীগের নেতাদের মনে এ ধারণা সৃষ্টি করে যে, হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অখণ্ড ভারতে কংগ্রেসের নেতৃত্বে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ সম্ভব নয়। তাই তারা অখণ্ড ভারতের আদর্শ ত্যাগ করেন। এমন প্রেক্ষাপটেই হিন্দু-মুসলিম মিলনের বড় প্রবক্তা এবং ধর্মনিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক আদর্শের অনুসারী মুসলিম লীগ সভাপতি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তার ঐতিহাসিক 'দ্বিজাতি তত্ত্ব' ঘোষণা করেন। এ তত্ত্বের মধ্যেই ছিল ভবিষ্যত পাকিস্তান রাষ্ট্রের বীজ।

দ্বিজাতি তত্ত্ব (Two Nations Theory)

১৯৪০ সালের ২২-২৩ মার্চ লাহোরে মুসলিম লীগের ২৭তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অধিবেশনের প্রথম দিন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ আনুষ্ঠানিকভাবে তার বহুল আলোচিত দ্বিজাতি তত্ত্ব (Two Nations Theory) ঘোষণা করেন। দ্বিজাতি তত্ত্বের মূলকথা হলো— ভারতের অধিবাসী হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায় দুটি আলাদা জাতি। তাদের ধর্মীয় ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক রীতি-প্রথা ও ঐতিহ্য সম্পূর্ণ আলাদা। সুতরাং সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও সংঘাত নিরসনে ভারতের দুই প্রধান সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, ১৯৩০ সালে ভারতের মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের দাবি প্রথম উত্থাপন করেন প্রখ্যাত কবি, দার্শনিক ও রাজনীতিক আল্লামা ইকবাল। ১৯৩৩ সালে ইংল্যান্ডের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঞ্জাবি ছাত্র চৌধুরী রহমত আলী ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলো নিয়ে 'পাকিস্তান' নামে পৃথক রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করেন। জিন্নাহ তার দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের ওই প্রসঙ্গটি আবার উত্থাপন করেন।

লাহোর প্রস্তাব ও এর মূল বক্তব্য (Lahore Resolution and Its Main Features)

১৯৪০ সালের ২২ মার্চ লাহোরের বাদশাহী মসজিদ প্রাঙ্গণে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সভাপতিত্বে মুসলিম লীগের ২৭তম বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন শুরু হয়। অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন ২৩ মার্চ জিন্নাহ তার বক্তৃতায় মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমির যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে বক্তব্য দেন। এরপর বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক (আপসহীনতা ও সাহসের জন্য ২২ মার্চ তাকে 'শেরেবাংলা' উপাধি দেওয়া হয়েছিল) ভারতে ভবিষ্যত স্বাধীন রাষ্ট্র সম্পর্কিত একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ফজলুল হক উপস্থাপিত এ প্রস্তাবটিই ঐতিহাসিক 'লাহোর প্রস্তাব'। এ প্রস্তাবের মূল বক্তব্য ছিল—

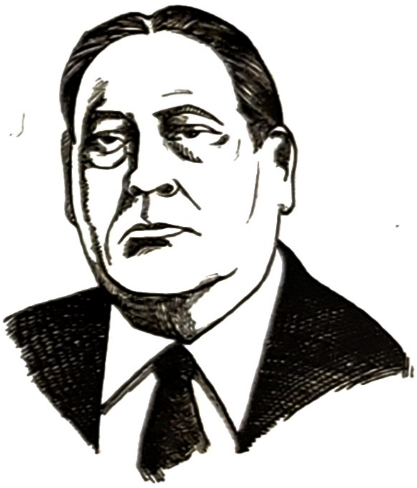
এ কে ফজলুল হক

- প্রয়োজনবোধে সীমানার পুনর্বিন্যাস করে এবং ভৌগোলিক দিক থেকে পরস্পর নিকটবর্তী মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা যথা— ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহ নিয়ে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করতে হবে।
- পূর্বোক্ত স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের প্রদেশগুলো হবে স্বশাসিত ও সার্বভৌম।
- সর্বক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের বিভিন্ন স্বার্থ ও অধিকার রক্ষাকল্পে সংবিধানে প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত রক্ষাকবচের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

এ কে ফজলুল হক উপস্থাপিত এ প্রস্তাবটি সমর্থন করেন মুসলিম লীগ নেতা চৌধুরী খালিকুজ্জামান। প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অধিবেশনে অংশগ্রহণকারী নেতৃবৃন্দ দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে উপস্থাপিত প্রস্তাবটি অনুমোদন করেন।

লাহোর প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া (Reactions Against Lahore Resolution)

মুসলিম লীগের অধিবেশনে লাহোর প্রস্তাব উত্থাপিত হলে তা মানুষের সামনে প্রকাশিত হয়। এতে কংগ্রেস, ব্রিটিশ সরকার এবং মুসলমানরা ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে।

কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া: লাহোর প্রস্তাবের প্রতি কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া ছিল তীব্র। কংগ্রেস নেতা জওহরলাল নেহেরু ও মহাত্মা গান্ধী উভয়েই এ প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন। গান্ধী মত দেন, লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ভারত বিভাগ হবে অধর্মের কাজ। নেহেরু মুসলমানদের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবিকে অবান্তর আখ্যায়িত করেন। হিন্দু মালিকানাধীন সংবাদপত্র ও সাময়িকীগুলো লাহোর প্রস্তাবকে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' হিসেবে আখ্যায়িত করে এর তীব্র সমালোচনা করে। মূল লাহোর প্রস্তাবে মুসলমানদের স্বাধীন রাষ্ট্রের কথা থাকলেও সুনির্দিষ্ট করে 'পাকিস্তান' শব্দটির উল্লেখ ছিল না।

ব্রিটিশ সরকারের প্রতিক্রিয়া: লাহোর প্রস্তাবের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের প্রতিক্রিয়া ছিল সতর্কতামূলক। এর ফলে মুসলিম লীগ সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের মনোভাব ইতিবাচক হয়। সরকার অনুধাবন করে যে, তাদেরকে পাশ কাটিয়ে সাংবিধানিক সংস্কার সম্ভব নয়। তাই তারা মুসলিম লীগের ভারত বিভক্তি প্রস্তাবের প্রতি সম্মান জানান এবং অখণ্ড ভারতবর্ষের স্থলে ভারত বিভক্তির নীতি গ্রহণ করেন।

মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া: লাহোর প্রস্তাবের প্রতি ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া ছিল ইতিবাচক। বিশেষ করে শেরে বাংলার প্রস্তাবটি উপস্থাপিত হওয়ায় বাংলার মুসলমান সমাজ একে বিশেষভাবে স্বাগত জানায়।

লাহোর প্রস্তাবের গুরুত্ব ও তাৎপর্য (Importance and Significance of Lahore Resolution)

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে লাহোর প্রস্তাবের গুরুত্ব অপরিসীম। এ প্রস্তাবের মাধ্যমে জিন্নাহর দ্বিজাতি তত্ত্ব সুস্পষ্ট রূপ লাভ করে। মুসলমানরা মুসলিম লীগের নেতৃত্বে তাদের জন্য একটি পৃথক আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত হয়। উল্লেখ্য, মূল লাহোর প্রস্তাবে মুসলমানদের জন্য একটি রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হয়নি, সেখানে বিশাল ভারতের একাধিক প্রান্তের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলোতে স্টেটস্ (States) অর্থাৎ একাধিক রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হয়েছিল। তবে মূলত পশ্চিমাঞ্চলের অবাঙালি মুসলিম লীগ নেতাদের আগ্রহে পরে লাহোর প্রস্তাব সংশোধন করে একটি মাত্র রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হয়। ১৯৪৬ সালের ৯ এপ্রিল দিল্লিতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ দলীয় আইনসভার সদস্যদের এক সম্মেলনে লাহোর প্রস্তাবে ঐ সংশোধনী আনা হয়। এই সংশোধনীতে 'একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ' সংশোধন করে 'একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতেই ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হয় এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলো নিয়ে পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র 'পাকিস্তান' রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ: লাহোর প্রস্তাব বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়কে একটি জাতীয় চেতনা দান করেছিল। এর ভিত্তিতেই তারা স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। লাহোর প্রস্তাবে সংশোধনের কারণে পূর্ব বাংলার বাঙালি মুসলমানরা ১৯৪৭ সালে পৃথক রাজনৈতিক অস্তিত্ব বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। তবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এর শাসকেরা স্বার্থপরতার কারণে দেশের সংহতি ধরে রাখতে ব্যর্থ হন। মূলত বাঙালির ওপর তাদের অপশাসন, বৈষম্য ও নিপীড়ন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মনে ক্ষোভ সৃষ্টি করে এবং তারা নিজেদের স্বাধীন করার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফলে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তান ভেঙে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। এজন্য কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন লাহোর প্রস্তাবের মধ্যে স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ নিহিত ছিল।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. দ্বিজাতি তত্ত্বের উদ্ভাবক কে? *[সকল বোর্ড ২০১৮]*
২. দ্বিজাতি তত্ত্ব কত সালে উত্থাপন করা হয়?
৩. লাহোর প্রস্তাবের উত্থাপক কে? *[সকল বোর্ড ২০১৫-১৬]*
৪. লাহোর প্রস্তাব কত সালে উত্থাপন করা হয়?
৫. অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন কে? *[চবি ২০১৫-১৬]*
৬. কোন প্রস্তাবের মধ্যে স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ নিহিত ছিল?

উত্তরের জন্য ৩০৬ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. লাহোর প্রস্তাবের মূল বক্তব্য চিহ্নিত করে একটি চার্টে উপস্থাপন করো।
২. লাহোর প্রস্তাবের মধ্যে স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ লুকায়িত ছিল— পাঁচটি যুক্তি দিয়ে বক্তব্যটি প্রমাণ করো।

পাঠ ১৯ ও ২০

ভারত বিভক্তি (১৯৪৭): পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম
India Partition (1947): Birth of Pakistan

ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে ১৯৪৭ সাল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় দুইশ বছর শাসন করার পর এ বছরই ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেয়। ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 'ভারত স্বাধীনতা আইন' নামে একটি আইন পাস করা হয়। এ আইনের ভিত্তিতেই ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হয় এবং স্বাধীন ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে।

ভারত বিভক্তির প্রেক্ষাপট (Background of the India Partition)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ভারতে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন বিশেষ গতি লাভ করে। এ সংকটময় পরিস্থিতিতে ভারতীয়দের সন্তুষ্টি অর্জন এবং যুদ্ধ প্রচেষ্টায় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সমর্থন আদায়ের জন্য ব্রিটিশ সরকার বিভিন্ন সংস্কার প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে আসে। এসব প্রস্তাবের মধ্যে ছিল ১৯৪০ সালের 'আগস্ট প্রস্তাব' এবং ১৯৪২ সালের 'ক্রিপস প্রস্তাব'। এ দুটি প্রস্তাব দিয়ে ভারতীয়দের সন্তুষ্ট করতে না পেরে ১৯৪৫ সালে ব্রিটিশ সরকার 'ওয়াভেল পরিকল্পনা' প্রকাশ করে। তবে এটিও ভারতীয়দের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ১৯৪২ সালে মহাত্মা গান্ধী 'ভারত ছাড়' আন্দোলন শুরু করেন। তিনি ভারতের স্বাধীনতা দাবি করেন এবং স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ভারতীয়দের লড়াইয়ে নামার আহ্বান জানান। ব্রিটিশ সরকার গান্ধী, নেহেরু, মাওলানা আজাদ প্রমুখ কংগ্রেস নেতাকে গ্রেফতার করে। ফলে পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করে। এ অবস্থায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়। বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ী পক্ষে থাকলেও ব্রিটেন তখন রণক্লান্ত ও অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত। এ পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সরকার অচিরেই ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনা করে। এ উদ্দেশ্যে ১৯৪৬ সালে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার তিনজন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত 'ক্যাবিনেট মিশন' ভারতে পাঠানো হয়। এ মিশন ভারতের স্বাধীনতা সংক্রান্ত বিষয়ে একটি পরিকল্পনা প্রকাশ করে। এ প্রস্তাবটি 'ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান' নামে পরিচিত। এ প্রস্তাবে কেন্দ্রে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করার কথা বলা হয়। ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলো নিয়ে একটি স্বায়ত্তশাসিত ভারত ইউনিয়ন গঠন করার প্রস্তাব করা হয়। ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাবে প্রদেশগুলোকে হিন্দু প্রধান গ্রুপ, মুসলিম প্রধান গ্রুপ এবং আসাম ও বাংলা গ্রুপে ভাগ করার কথা বলা হয়। তবে এ প্রস্তাবটি ভারতীয়দের মনঃপুত হয়নি। এ অবস্থায় ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধি পায়। হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কেরও দ্রুত অবনতি ঘটে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবিতে মুসলিম লীগ তীব্র আন্দোলন শুরু করে। চরম সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার মধ্যে মুসলিম লীগ ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট হরতাল ও 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে'র ডাক দেয়। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে কলকাতায় ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেধে যায়। এতে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কয়েকহাজার মানুষ প্রাণ হারায়। এ অবস্থায় ব্রিটেনের সদ্যনির্বাচিত শ্রমিক দলীয় (Labour Party) সরকারের প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট অ্যাটলি অবিলম্বে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, ভবিষ্যত শাসনতন্ত্র সম্পর্কে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে সমঝোতা হোক আর না-ই হোক, ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে। প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলির এ ঘোষণা 'ফেব্রুয়ারি ঘোষণা' নামে পরিচিত। এ ঘোষণার পরও কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ কোনো সমঝোতায় আসতে পারেনি। উভয় দল যার যার অবস্থানে অনঢ় থাকায় পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারণ করে। ফলে ভারত বিভক্তি অনিবার্য হয়ে পড়ে।

সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে ভারতের সর্বশেষ ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন ব্রিটিশ সরকারের পরামর্শক্রমে একটি চূড়ান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। এটি ঐতিহাসিক '৩ জুন পরিকল্পনা' নামে পরিচিত। এ পরিকল্পনায় মুসলমানদের 'পাকিস্তান দাবি' নীতিগতভাবে স্বীকার করে ভারত বিভক্তির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারত স্বাধীনতা বিল উত্থাপন করা হবে বলেও পরিকল্পনায় বলা হয়। এ সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 'ভারত স্বাধীনতা আইন ১৯৪৭' (The Indian Independence Act 1947) পাস হয়।

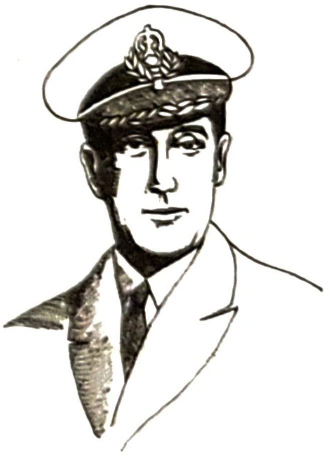

লর্ড মাউন্টব্যাটেন

অখণ্ড স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার প্রস্তাব

Proposal For United and Independent Bengal

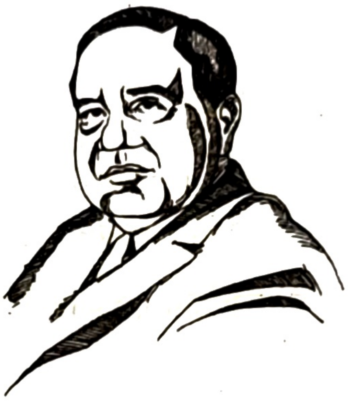
হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদী

১৯৪৭ সালের ২৭ এপ্রিল 'গণতন্ত্রের মানসপুত্র' হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদী ভারতের স্বাধীনতার পাশাপাশি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা তথা অখণ্ড বাংলা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বাংলার কংগ্রেস নেতা শরৎচন্দ্র বসু, কিরণ শঙ্কর রায় প্রমুখ এ প্রস্তাব সমর্থন করেন। অন্যদিকে বাংলার মুসলিম লীগ নেতা আবুল হাশিম এতে সমর্থন জানান। এ প্রস্তাব বসু-সোহরাওয়াদী প্রস্তাব নামে পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে বাংলার স্বাধীন সত্তা প্রতিষ্ঠা ও বাংলায় হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি পুনরুদ্ধারে এটি ছিল সর্বশেষ প্রচেষ্টা। মূলত কংগ্রেসের অবাঙালি ও রক্ষণশীল নেতাদের বিরোধিতায় এ প্রস্তাব বাস্তবায়িত হতে পারেনি।

১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

The Main Characteristics of the Indian Independence Act, 1947

১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এটি ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের পরিবর্তিত রূপ। এ আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ ছিল—

১. এই আইন ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটায়। ভারতকে বিভক্ত করে ভারত ইউনিয়ন এবং পাকিস্তান নামে দুটি ডোমিনিয়ন সৃষ্টি করে। ডোমিনিয়ন দুটির আইনগত সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা হয়।

২. এ আইনে বলা হয়, কেন্দ্রীয় শাসনের ব্যাপারে উভয় ডোমিনিয়নে একজন করে গভর্নর জেনারেল থাকবেন। ডোমিনিয়ন মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী গভর্নর জেনারেল ইংল্যান্ডের রাজা কর্তৃক নিযুক্ত হবেন।

৩. ১৯৩৫ সালের আইন অনুযায়ী গঠিত আইনসভা গণপরিষদের মর্যাদা লাভ করে। এ গণপরিষদের হাতে স্ব স্ব ডোমিনিয়নের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

৪. উভয় ডোমিনিয়ন স্ব স্ব আইনসভা গঠন এবং ডোমিনিয়নের জন্য আইন প্রণয়ন করার অধিকার লাভ করবে।

৫. প্রতিষ্ঠিত ডোমিনিয়ন দুটি ব্রিটিশ কমনওয়েলথভুক্ত থাকবে কি না, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের স্বাধীনতা দেওয়া হয়।

৬. সিভিল সার্ভিস ও সশস্ত্র বাহিনীকে আনুপাতিক হারে দুই ডোমিনিয়নের মধ্যে ভাগ করা হবে।

৭. দেশীয় রাজ্যগুলোর ওপর ব্রিটিশ সরকারের সব ধরণের প্রাধান্যের অবসান ঘটে। এদের স্বাধীন থাকতে বা ইচ্ছামতো ভারত বা পাকিস্তানে যোগদানের স্বাধীনতা দেওয়া হয়।

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়া (Reaction of Congress and Muslim League)

১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের প্রতি কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। এতে ভারত বিভক্তির যে প্রস্তাব করা হয় কংগ্রেস নেতা মহাত্মা গান্ধী ও মাওলানা আবুল কালাম আজাদ তা মেনে নিতে অস্বীকার করেন। অবশ্য মাউন্টব্যাটেনের পরামর্শে নেহেরু ও প্যাটেল বিভক্তি প্রস্তাব মেনে নেন। মাউন্টব্যাটেন ও প্যাটেলের সাথে সাক্ষাতের পর গান্ধীও তার মনোভাব পরিবর্তন করেন। একমাত্র মাওলানা আজাদ অখণ্ড ভারত দাবিতে অটল থাকেন।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও তার দল মুসলিম লীগ মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। মুসলিম লীগের দাবি ছিল পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু, বেলুচিস্তান এবং বৃহৎ বাংলা ও আসাম নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। কিন্তু মাউন্টব্যাটেন এ

দাবি পুরোপুরি মেনে নেননি। মুসলমান ছাড়াও বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হিন্দু ও শিখ ছিল। এ কারণে প্রদেশ দুটিকে ধর্মীয় ভিত্তিতে বিভক্ত করা হয়। পাকিস্তানের মধ্যে পড়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ (বর্তমান নাম খাইবার পাখতুনখাওয়া), সিন্ধু, বেলুচিস্তান, পাঞ্জাবের পূর্বাংশ এবং পূর্ব বাংলা। মাউন্টব্যাটেন জিন্নাহকে 'অখণ্ড ভারত' অথবা খণ্ডিত পাঞ্জাব ও বাংলা নিয়ে 'পাকিস্তান'— এ দুয়ের মধ্য থেকে যেকোনো একটি বেছে নিতে বলেন। সুতরাং মুসলিম লীগের অনেকের আপত্তি সত্ত্বেও জিন্নাহ তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র পাকিস্তান মেনে নিতে বাধ্য হন।

ভারত বিভক্তি ও স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয়

India Partition and the Emergence of Pakistan as an Independent State

১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন ঐ বছরের ১৪ এবং ১৫ আগস্ট কার্যকর করা হয়। ফলে ভারতে প্রায় দু'শ বছরের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটে। ভারত বিভক্ত হয়ে ১৪ আগস্ট 'পাকিস্তান' এবং ১৫ আগস্ট 'ভারত' নামে দুটি স্বতন্ত্র, স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হয়। পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয়কে ব্রিটেনের রাজা ষষ্ঠ জর্জের (ব্রিটিশ ভারতের সর্বশেষ সম্রাট) পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানানোর জন্য ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন করাচি উপস্থিত হন। ১৪ আগস্ট গণপরিষদে প্রদত্ত ভাষণে তিনি পাকিস্তান সৃষ্টিকে ঐতিহাসিক ঘটনা বলে আখ্যায়িত করে।

স্বাধীন পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব লাভ করেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পান লিয়াকত আলী খান। হাজার মাইলের বেশি ভৌগোলিক দূরত্ব সত্ত্বেও কেবল ধর্মীয় ঐক্যের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলা নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। অন্যদিকে ভারত ইউনিয়ন নামে যে স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে তার প্রথম গভর্নর ছিলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন এবং প্রধানমন্ত্রী ছিলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু।

জেনে রাখো

গণপরিষদ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রাণ। আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের অভিব্যক্তির সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটে সংবিধানে। তাই সংবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রাপ্তবয়স্ক তথা ভোটাধিকারপ্রাপ্ত অংশের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত হয় গণপরিষদ। পাকিস্তান রাষ্ট্রের সংবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে ১৯৪৭ সালে গঠিত হয় পাকিস্তান গণপরিষদ। ১৯৪৭ সালের ১১ আগস্ট মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তান গণপরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন। ভারত স্বাধীনতা আইন ১৯৪৭ অনুযায়ী গণপরিষদের দুটি সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ছিল: দেশের সংবিধান প্রণয়ন এবং তা কার্যকর করার পূর্ব পর্যন্ত একটি ফেডারেল আইনসভা (সংসদ) হিসেবে কাজ করা।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কত সালে ভারত বিভক্ত হয়?
২. ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড় আন্দোলন' শুরু করেন কে?
৩. '৩ জুন পরিকল্পনা' প্রণয়ন করেন কে?
৪. অখণ্ড বাংলার প্রস্তাব দেন কে?
৫. কীসের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়?
৬. স্বাধীন পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল কে ছিলেন?

উত্তরের জন্য ৩০৬ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করে ছকে উপস্থাপন করো।

পাঠ মূল্যায়নের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর

পাঠ-১: ১. ১২০৪; ২. ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ; ৩. পলাশির যুদ্ধ (১৭৫৭); ৪. ১৬০০; ৫. ভারতের সুরাটে; ৬. কলকাতায়।

পাঠ-২: ১. নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা; ২. ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ জুন; ৩. মীরজাফর; ৪. ১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দের ২২ অক্টোবর; ৫. ১৭৬৫; ৬. দিওয়ানি লাভের ঘটনা।

পাঠ-৩: ১. লর্ড ক্লাইভ; ২. লর্ড ক্লাইভ; ৩. ১৭৬৫; ৪. দ্বিতীয় শাহ আলম (এলাহাবাদ চুক্তি); ৫. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির; ৬. ছিয়াত্তরের মন্বন্তর।

পাঠ-৪: ১. হাজি শরীয়তউল্লাহ; ২. আরবি 'ফরজ' শব্দ থেকে; ৩. ফরিদপুর জেলা; ৪. হাজি শরীয়তউল্লাহ; ৫. হাজি শরীয়তউল্লাহ; ৬. দুদুমিয়া (মোহসেন উদ্দিন আহমেদ)।

পাঠ-৫: ১. সৈয়দ মীর নিসার আলী; ২. তিতুমীর; ৩. বাংলার কৃষকদের; ৪. রাজা কৃষ্ণদেব; ৫. তিতুমীর; ৬. ১৮৩১।

পাঠ-৬: ১. ১৮৫৭; ২. এনফিল্ড রাইফেলের কার্তুজে গরু ও শূকরের চর্বি মেশানোর গুজব; ৩. ১৮৫৬; ৪. পশ্চিমবঙ্গের ব্যারাকপুরে; ৫. সিপাহি মঙ্গল পান্ডে; ৬. সর্বশেষ মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ।

পাঠ-৭: ১. ১৮৫৮ সালে (সিপাহি বিদ্রোহের পর); ২. ব্রিটিশ রানির; ৩. মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরকে; ৪. ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্কে; ৫. সিপাহি বিদ্রোহকে; ৬. ভারত সচিব আর্ল স্ট্যানলি।

পাঠ-৮: ১. পলাশির যুদ্ধ (১৭৫৭); ২. ভারতের হুগলিতে; ৩. বৈপিত্রেয় বোন; ৪. হাজি মুহম্মদ মোহসিনকে; ৫. ১৮০৬ সালে; ৬. হাজি মুহাম্মদ মোহসিন।

পাঠ-৯: ১. ১৮২৮; ২. ব্রিটিশ সরকার; ৩. ১৮৭৭; ৪. নবাব আবদুল লতিফ; ৫. নবাব আবদুল লতিফ; ৬. নবাব আবদুল লতিফকে।

পাঠ-১০: ১. ১৮৪৯; ২. সৈয়দ আমীর আলী; ৩. সৈয়দ আমীর আলী; ৪. সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন; ৫. সৈয়দ আমীর আলী; ৬. ১৯০৯।

পাঠ-১১: ১. রাজা রামমোহন রায়; ২. কংগ্রেস; ৩. ১৮৮৫; ৪. অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম; ৫. ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি; ৬. চারটি।

পাঠ-১২: ১. ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর; ২. নবাব স্যার সলিমুল্লাহ; ৩. নবাব ভিকারুল মূলক; ৪. তিনটি; ৫. ইউনাইটেড ইন্ডিয়ান প্যাট্রিয়াটিক এসোসিয়েশন; ৬. মুসলিম লীগ।

পাঠ-১৩: ১. ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর; ২. লর্ড কার্জন; ৩. বাংলা; ৪. কলকাতা; ৫. ব্যামফিল্ড ফুলার; ৬. ব্রিটিশদের।

পাঠ-১৪: ১. ঢাকাকে; ২. মুসলমান সমাজ; ৩. অভিজাত হিন্দু সমাজ; ৪. কংগ্রেস; ৫. ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর; ৬. ১৯১২।

পাঠ-১৫ ও ১৬: ১. ধর্মীয়-রাজনৈতিক; ২. ১৯১৪; ৩. তুরস্কের খেলাফতের অখণ্ডতা রক্ষার; ৪. খেলাফত আন্দোলন (১৯১৯); ৫. জালিয়ান ওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড (১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল); ৬. মহাত্মা গান্ধী।

পাঠ-১৭ ও ১৮: ১. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ; ২. ১৯৪০; ৩. শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক; ৪. ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ; ৫. শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক; ৬. লাহোর প্রস্তাবে।

পাঠ-১৯ ও ২০: ১. ১৯৪৭; ২. মহাত্মা গান্ধী; ৩. ভারতের সর্বশেষ ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন; ৪. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী; ৫. ধর্মীয় ঐক্য; ৬. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।

৫ এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি	ভারতীয় উপমহাদেশে বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে ১৬০০ সালে ইংল্যান্ডের একটি বণিক দল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠন করে। এর আনুষ্ঠানিক নাম ছিল 'দি গভর্নর অ্যান্ড কোম্পানি অব মার্চেন্টস অব লন্ডন ট্রেডিং ইন্টু দি ইস্ট ইন্ডিয়া।' ১৬০০ সালের ৩১ ডিসেম্বর রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ এ কোম্পানিকে প্রাচ্যে বাণিজ্য করার রাজকীয় সনদ দেয়। ১৬১৮ সালে এ কোম্পানির প্রতিনিধি ক্যাপ্টেন হকিন্স রাজা প্রথম জেমসের চিঠি নিয়ে মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন। ১৬১২ সালে তারা গুজরাটের সুরাটে প্রথম বাণিজ্যকুঠি নির্মাণ করে। বাণিজ্য সম্প্রসারণের পাশাপাশি ধীরে ধীরে তারা এদেশে রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালায়। অবশেষে ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশির যুদ্ধে বাংলার শেষ নবাব সিরাজ উদ-দৌলাকে পরাজিত করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের পর কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটলেও ইংরেজরা প্রায় দুশ বছর ভারত শাসন করে।
উপনিবেশ	উপনিবেশ (Colony) শব্দটি ল্যাটিন শব্দ কলোনিয়া থেকে উদ্ভূত। এটি একটি স্থান বা এলাকাকে নির্দেশ করে যা অন্য কোনো দেশ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রধান নগর হিসেবে দেশটি উপনিবেশের বৈধ দখলদার হিসেবে পরিচিতি পায়। একটি দেশের যখন অনেকগুলো উপনিবেশ থাকে তখন মূল দেশটি সাম্রাজ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রাচীন গ্রিসে উপনিবেশের নিয়ন্ত্রককে মেট্রোপোলিশ বা প্রধান নগর বলা হতো। বিশ্বের প্রাচীনতম উপনিবেশ পুয়ের্তোরিকো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। ভারত উপমহাদেশ প্রায় দুশ বছর ব্রিটিশ উপনিবেশ হিসেবে শাসিত হয়েছে।
দিওয়ানি	দিওয়ানি বলতে রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতাকে বোঝায়। ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজদের বিজয়ের ফলে ভারতে ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। এ যুদ্ধে জয়লাভের তাৎক্ষণিক অর্জন ছিল কোম্পানির বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দিওয়ানি লাভ। এ যুদ্ধে জয়ের পর ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দিওয়ানি লাভের উদ্দেশ্যে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম ও বাংলার নবাব নাজিম-উদ-দৌলার সাথে দুটি পৃথক চুক্তি সম্পাদন করে। কোম্পানি রাজস্ব আদায়ের অধিকারের জন্য বাংলার নবাবকে বার্ষিক ৫৩ লক্ষ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। এভাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার অর্থনীতিতে প্রভুত্ব করার সুযোগ পায়।
দ্বৈত শাসন	দ্বৈত শাসন মানে দুই জনের শাসন। লর্ড ক্লাইভ দ্বিতীয়বার বাংলায় গভর্নর হয়ে এসে দ্বৈত শাসন নামে বাংলা শাসন করার এক অভিনব শাসনব্যবস্থা চালু করেন। ১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি (রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা) লাভের পর এদেশে দ্বৈত শাসন চালু করা হয়। এ ব্যবস্থায় কোম্পানি রাজস্ব আদায় ও দেশরক্ষার ভার গ্রহণ করে। আর নবাবকে দেওয়া হয় বিচার ও শাসনের ভার। অর্থাৎ নবাব পেল ক্ষমতাহীন দায়িত্ব আর কোম্পানি পেল দায়িত্বহীন ক্ষমতা। বাংলার ক্ষমতা ভাগাভাগির এ পদ্ধতিই দ্বৈত শাসন নামে পরিচিত। দ্বৈত শাসনব্যবস্থা ছিল মূলত একটি 'সাংবিধানিক মুখোশ'।
ছিয়াত্তরের মন্বন্তর	লর্ড ক্লাইভ প্রবর্তিত দ্বৈত শাসন এবং বিরূপ প্রকৃতি-এ দুইয়ের প্রভাবে বাংলায় ১১৭৬ বঙ্গাব্দে এক মহাদুর্ভিক্ষ বা মন্বন্তর দেখা দেয়। ইতিহাসে এটি 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' হিসেবে পরিচিত। ঐ দুর্ভিক্ষে ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় ঘটে। এ সময় লাখ লাখ লোক অনাহার ও মহামারিতে মৃত্যুবরণ করে। ঐতিহাসিক আর. সি. মজুমদারের মতে, দেশ যখন নানা অত্যাচার, উৎপীড়ন, দুর্নীতি ও হতাশায় জর্জরিত তখন ১৭৭০ সালে (১১৭৬ বাংলা সনে) বাংলায় ঐ মারাত্মক দুর্ভিক্ষ ঘটে। ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টারের মতে, "ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের দুর্নীতির কারণে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছিল।"
ফরায়েজি	'ফরায়েজি' শব্দটি আরবি 'ফরজ' শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ অবশ্য পালনীয়। যে সব ধর্মীয় কর্মকাণ্ড আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের জন্য অবশ্য পালনীয় হিসেবে নির্ধারণ করেছেন সেগুলোই ফরজ। সমাজসংস্কারক হাজি শরীয়তউল্লাহ বাংলার মুসলিম সমাজে প্রচলিত নানাবিধ কুসংস্কার ও অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড দূর করতে ফরায়েজি আন্দোলনের ডাক দেন। তিনি মুসলিম সমাজে ইসলাম ধর্মের প্রকৃত রূপ নিয়ে আসার লক্ষ্যে ইসলামের ফরজগুলো আদায়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। হাজি শরীয়তউল্লাহর এ সংস্কার আন্দোলন ফরজের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়েছিল বলে একে 'ফরায়েজি আন্দোলন' এবং এর অনুসারীদের 'ফরায়েজি' বলা হয়।
বাঁশের কেল্লা	মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমীর ১৮৩১ সালে পশ্চিমবঙ্গের বারাসাতের নারিকেলবাড়িয়া গ্রামে বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন। দ্বি-স্তর বিশিষ্ট এ কেল্লা নির্মাণ করা হয় বাঁশ এবং কাদা দিয়ে। ১৮৩১ সালের ১৯ নভেম্বর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাহিনীর সাথে যুদ্ধরত অবস্থায় এ কেল্লাতেই তিতুমীরের মৃত্যু হয়। বীরত্বের সাথে লড়লেও ইংরেজদের শক্তিশালী কামানের গোলায় তার বাঁশের কেল্লা গুঁড়িয়ে যায়। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তিতুমীর প্রথম শহিদ হওয়ার মর্যাদা লাভ করেন।

স্বত্ববিলোপ নীতি	স্বত্ববিলোপ নীতি হলো ১৮৪৮ থেকে ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত কর্মরত ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসি প্রবর্তিত একটি সাম্রাজ্য সম্প্রসারণমূলক নীতি। এ নীতি অনুসারে, যদি কোনো দেশীয় রাজা স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী না রেখে মারা যান তাহলে ওই স্বাধীন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের হাতে ন্যস্ত হবে। এ আইনে দত্তকপুত্র গ্রহণের অধিকার অবৈধ ঘোষণা করা হয়। স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগ করে তিনি সাতারা, সম্বলপুর, উদয়পুর, ঝাঁসি ও নাগপুর রাজ্যসমূহ দখল করেন। ডালহৌসি কর্নাটক ও তাঞ্জোরের খেতাবসার সার্বভৌমত্বের বিলোপ সাধন করেন। প্রাক্তন পেশোয়ার দ্বিতীয় বাজি রাও মারা গেলে তিনি তাঁর দত্তকপুত্র নানা সাহেবকে পেনশন প্রদান করতে অসম্মতি জানান।
খেলাফত	খেলাফত (khilafat) আরবি শব্দ, যার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে প্রতিনিধিত্ব, স্থলাভিষিক্ত। অক্সফোর্ড অভিধানে এটিকে মুসলিম নেতা বা বাদশা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। চতুর্দশ শতাব্দীর বিশিষ্ট আরব সমাজবিজ্ঞানী ইবনে খালদুনের মতে, আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলামের সংরক্ষণ, সে অনুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন এবং সে রাষ্ট্র পরিচালনার নাম খেলাফত। এ ধরনের শাসন ব্যবস্থার সরকার প্রধানকে খলিফা বলা হয়। ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ (স) মদিনায় প্রথম ইসলামি রাষ্ট্র কায়েম করে খেলাফতের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। তার ইন্তেকালের পর সাহাবি হযরত আবু বকর (রা) পরবর্তী খলিফা নির্বাচিত হন এবং ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে রাশিদুন খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪) পরবর্তী সময়ে ১৯২৪ সালে সর্বশেষ ওসমানীয় খলিফা দ্বিতীয় আবদুল মজিদকে নির্বাসিত করে তুরস্কের জাতীয়তাবাদী নেতা কামাল আতাতুর্ক আনুষ্ঠানিকভাবে খিলাফত বিলুপ্ত করেন।
দ্বিজাতি তত্ত্ব	১৯৪০ সালের ২২-২৩ মার্চ লাহোরে মুসলিম লীগের ২৭তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অধিবেশনের প্রথম দিন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ আনুষ্ঠানিকভাবে তার বহুল আলোচিত দ্বিজাতি তত্ত্ব (Two Nations Theory) ঘোষণা করেন। দ্বিজাতি তত্ত্বের মূলকথা হলো; ভারতের অধিবাসী হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায় দুটি আলাদা জাতি। তাদের ধর্মীয় ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক রীতি-প্রথা ও ঐতিহ্য সম্পূর্ণ আলাদা। সুতরাং সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও সংঘাত নিরসনে ভারতের দুই প্রধান সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রয়োজন। এটি পাকিস্তান প্রস্তাব বলে খ্যাত।

▶ অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ সাল ও ঘটনা

সাল	ঘটনা
১৬০০	ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হয়।
১৬১২	ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারতের সুরাটে প্রথম বাণিজ্যকুঠি নির্মাণ করে।
১৭৫৭	পলাশির প্রান্তরে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার সাথে ইংরেজদের যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা পরাজিত হন।
১৭৬৪	ইংরেজদের সাথে মীর কাসিমের বক্সারের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।
১৭৬৫	ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এলাহাবাদ চুক্তির মাধ্যমে দিওয়ানি লাভ করে ও লর্ড ক্লাইভ দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা চালু করেন।
১৭৭০ (বাংলা ১১৭৬)	বাংলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, যাকে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বলা হয়।
১৮৩১	তিতুমীর বারাসাতের নারিকেলবাড়িয়ায় বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন।
১৮৫৭	সিপাহি বিপ্লব সংঘটিত হয় এবং কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটে।
১৮৬০	নীল কমিশন গঠন করা হয় ও নীল বিদ্রোহের অবসান ঘটে।
১৮৬৩	নবাব আবদুল লতিফ কলকাতায় মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন।
১৮৮৫	জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়।
১৯০৫	বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করা হয়।
১৯০৬	মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়।
১৯১১	বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়।
১৯১৬	লক্ষ্মৌ চুক্তি সম্পাদিত হয়।
১৯২০	খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়।
১৯২৭	সাইমন কমিশন গঠন করা হয়।
১৯৪০	লাহোর প্রস্তাব ও দ্বিজাতি তত্ত্ব উপস্থাপন করা হয়।
১৯৪৭	ভারত বিভক্তি ঘটে এবং ভারত ও পাকিস্তান নামে স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

ক. জ্ঞানমূলক

■ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভ: লর্ড ক্লাইভ ও দ্বৈত শাসন

প্রশ্ন-১. কোন ইউরোপীয় বণিকেরা প্রথম ভারতে বাণিজ্য করতে আসে?

উত্তর: পর্তুগিজ বণিকেরা প্রথম ভারতে বাণিজ্য করতে আসে।

প্রশ্ন-২. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠন করে কারা?

উত্তর: ইংল্যান্ডের এক দল বণিক ভারতের সাথে বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠন করে।

প্রশ্ন-৩. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কত সালে গঠিত হয়?

[দি., কু., সি., ব. বোর্ড ২০১৭]

উত্তর: ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৬০০ সালে গঠিত হয়।

প্রশ্ন-৪. ইংরেজরা কোথায় সর্বপ্রথম বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে?

উত্তর: ইংরেজরা গুজরাটের সুরাটে সর্বপ্রথম বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে।

প্রশ্ন-৫. পলাশির যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়?

উত্তর: ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

প্রশ্ন-৬. বাংলার শেষ নবাব কে ছিলেন?

উত্তর: বাংলার শেষ নবাব ছিলেন সিরাজ-উদ-দৌলা।

প্রশ্ন-৭. বক্সারের যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়?

উত্তর: ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

প্রশ্ন-৮. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কত সালে বাংলার দিওয়ানি লাভ করে?

উত্তর: ১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার দিওয়ানি লাভ করে।

প্রশ্ন-৯. কার কাছ থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দিওয়ানি লাভ করে?

উত্তর: মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহআলমের কাছ থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দিওয়ানি লাভ করে।

প্রশ্ন-১০. ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ কোথায় অবস্থিত?

[ঢা., রা., চ. বোর্ড ২০১৭, সকল বোর্ড ২০১৮]

উত্তর: ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ কলকাতায় অবস্থিত।

প্রশ্ন-১১. দ্বৈত শাসনের প্রবর্তক কে?

উত্তর: দ্বৈত শাসনের প্রবর্তক লর্ড রবার্ট ক্লাইভ।

প্রশ্ন-১২. দ্বৈত শাসন কী?

উত্তর: নবাবের ক্ষমতাহীন দায়িত্ব এবং কোম্পানির দায়িত্বহীন ক্ষমতা সম্পর্কিত লর্ড ক্লাইভের উদ্ভাবিত বাংলা শাসনের অভিনব পদ্ধতিই দ্বৈত শাসন নামে পরিচিত।

প্রশ্ন-১৩. ছিয়াত্তরের মন্বন্তর কী?

উত্তর: ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দ্বৈত শাসন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাংলা ১১৭৬ সনে (১৭৭০ খ্রি.) বাংলায় যে মহাদুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তাই ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে প্ররিচিত।

প্রশ্ন-১৪. ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ইংরেজি কত সালে হয়েছিল?

উত্তর: ইংরেজি ১৭৭০ সালে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হয়েছিল।

প্রশ্ন-১৫. ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল কে ছিলেন?

উত্তর: ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৭২-১৭৮৫)।

■ ফরায়েজি আন্দোলন, তিতুমীরের বিদ্রোহ

প্রশ্ন-১৬. কার নেতৃত্বে ফরায়েজি আন্দোলন গড়ে ওঠে?

উত্তর: হাজি শরীয়তউল্লাহর নেতৃত্বে ফরায়েজি আন্দোলন গড়ে ওঠে।

প্রশ্ন-১৭. ফরায়েজি আন্দোলন কী?

উত্তর: মুসলমান সমাজ থেকে অনৈসলামিক কার্যকলাপ দূর করে তাদেরকে ইসলামি ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করতে হাজি শরীয়তউল্লাহর নেতৃত্বে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে, তাই ফরায়েজি আন্দোলন।

প্রশ্ন-১৮. হাজি শরীয়তউল্লাহ কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর: হাজি শরীয়তউল্লাহ ১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রশ্ন-১৯. হাজি শরীয়তউল্লাহ কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর: হাজি শরীয়তউল্লাহ ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমার অন্তর্গত শ্যামায়েল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রশ্ন-২০. আরবি কোন শব্দ থেকে ফরায়েজি শব্দের উৎপত্তি হয়েছে?

উত্তর: আরবি 'ফরজ' শব্দ থেকে ফরায়েজি শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।

প্রশ্ন-২১. কোন জেলা ফরায়েজি আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল ছিল?

উত্তর: ফরিদপুর জেলা ফরায়েজি আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল ছিল।

প্রশ্ন-২২. মুসলিম সমাজে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রচলন করেন কে?

উত্তর: মুসলিম সমাজে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রচলন করেন হাজি শরীয়তউল্লাহ।

প্রশ্ন-২৩. 'দারুল হারব' অর্থ কী?

উত্তর: 'দারুল হারব' অর্থ যুদ্ধরত দেশ।

প্রশ্ন-২৪. দারুল আমান অর্থ কী?

উত্তর: দারুল আমান অর্থ নিরাপত্তার দেশ।

প্রশ্ন-২৫. ফরায়েজি আন্দোলনকে রাজনৈতিক রূপ দেন কে?

উত্তর: মোহসেন উদ্দিন আহম্মদ ওরফে দুদু মিয়া ফরায়েজি আন্দোলনকে রাজনৈতিক রূপ দেন।

প্রশ্ন-২৬. কত সালে নীল বিদ্রোহ সংঘটিত হয়?
উত্তর: ১৮৬০ সালে নীল বিদ্রোহ সংঘটিত হয়।

প্রশ্ন-২৭. 'নীলদর্পণ' নাটকের রচয়িতা কে?
উত্তর: 'নীলদর্পণ' নাটকের রচয়িতা দীনবন্ধু মিত্র।

প্রশ্ন-২৮. 'হান্টার কমিশন' কত সালে গঠিত হয়?
উত্তর: 'হান্টার কমিশন' ১৮৮২ সালে গঠিত হয়।

প্রশ্ন-২৯. 'ইন্ডিয়ান মুসলমানস' গ্রন্থটি কার লেখা?
উত্তর: 'ইন্ডিয়ান মুসলমানস' গ্রন্থটি ব্রিটিশ ঐতিহাসিক উইলিয়াম উইলসন হান্টার-এর লেখা।

প্রশ্ন-৩০. তিতুমীর কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন?
উত্তর: তিতুমীর ১৭৮২ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন।

প্রশ্ন-৩১. তিতুমীরের প্রকৃত নাম কী?
উত্তর: তিতুমীরের প্রকৃত নাম মীর নিসার আলী।

প্রশ্ন-৩২. তিতুমীর কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উত্তর: তিতুমীর বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগনার বারাসাত মহকুমার অন্তর্গত চাঁদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রশ্ন-৩৩. বাঁশের কেল্লা আক্রমণে ইংরেজ বাহিনীর নেতৃত্ব দেন কে?
উত্তর: বাঁশের কেল্লা আক্রমণে ইংরেজ বাহিনীর নেতৃত্ব দেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল স্টুয়ার্ট।

প্রশ্ন-৩৪. বাঁশের কেল্লা কে নির্মাণ করেন?
উত্তর: বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন তিতুমীর।

প্রশ্ন-৩৫. তিতুমীর কোথায় বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন?
উত্তর: তিতুমীর বারাসাতের কাছাকাছি বাকুড়িয়ার ১০ কি. মি. দূরে নারিকেলবাড়িয়া গ্রামে বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন।

প্রশ্ন-৩৬. ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রথম কে যুদ্ধ করে শহিদ হন?
উত্তর: মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমীর প্রথম ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে শহিদ হন।

প্রশ্ন-৩৭. তিতুমীর কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?
উত্তর: তিতুমীর ১৮৩১ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

■ ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ

প্রশ্ন-৩৮. সিপাহি বিদ্রোহ কত সালে সংঘটিত হয়?
উত্তর: ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়।

প্রশ্ন-৩৯. ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রথম মহাবিদ্রোহ ছিল কোনটি?
উত্তর: ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রথম মহাবিদ্রোহ ছিল সিপাহি বিদ্রোহ।

প্রশ্ন-৪০. সিপাহি বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ কী ছিল?
উত্তর: সিপাহি বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকারের 'এনফিল্ড' রাইফেলের প্রচলন।

প্রশ্ন-৪১. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকার কত সালে এনফিল্ড রাইফেলের ব্যবহার শুরু করে?
উত্তর: ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকার ১৮৫৬ সালে এনফিল্ড রাইফেলের ব্যবহার শুরু করে।

প্রশ্ন-৪২. দিল্লির সম্রাট পদ বিলুপ্ত করেন কে?
উত্তর: দিল্লির সম্রাট পদ বিলুপ্ত করেন লর্ড ডালহৌসি।

প্রশ্ন-৪৩. স্বত্ববিলোপ নীতি গ্রহণ করেন কে?
উত্তর: স্বত্ববিলোপ নীতি গ্রহণ করেন লর্ড ডালহৌসি।

প্রশ্ন-৪৪. সিপাহি বিদ্রোহ প্রথম শুরু করেন কে?
উত্তর: সিপাহি বিদ্রোহ প্রথম শুরু করেন মঙ্গল পাণ্ডে।

প্রশ্ন-৪৫. সিপাহি বিদ্রোহ প্রথম শুরু হয় কোথায়?
উত্তর: সিপাহি বিদ্রোহ প্রথম শুরু হয় ব্যারাকপুরে।

প্রশ্ন-৪৬. সিপাহি বিপ্লবের সময় মুঘল সম্রাট কে ছিলেন?
উত্তর: সিপাহি বিপ্লবের সময় মুঘল সম্রাট ছিলেন দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফর।

প্রশ্ন-৪৭. ভারতে কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটে কখন?
উত্তর: ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের পর ভারতে কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটে।

■ সংস্কার আন্দোলন: হাজি মুহম্মদ মোহসিন, নবাব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী

প্রশ্ন-৪৮. হাজি মুহাম্মদ মোহসিনের পূর্ব পুরুষেরা কোথাকার অধিবাসী ছিল? *[সকল বোর্ড ২০১৫]*
উত্তর: হাজি মুহাম্মদ মোহসিনের পূর্ব পুরুষেরা পারস্যের (ইরান) অধিবাসী ছিল।

প্রশ্ন-৪৯. হাজি মুহাম্মদ মোহসিনের বোনের নাম কী?
উত্তর: হাজি মুহাম্মদ মোহসিনের বোনের নাম মুন্নুজান।

প্রশ্ন-৫০. 'মোহসিন ফান্ড' গঠন করেন কে?
উত্তর: হাজি মুহাম্মদ মোহসিন মানবকল্যাণে ১৮০৬ সালে 'মোহসিন ফান্ড' গঠন করেন।

প্রশ্ন-৫১. মোহামেডান লিটারারি সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা কে? *[সকল বোর্ড ২০১৭, ২০১৬]*
উত্তর: মোহামেডান লিটারারি সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা নবাব আবদুল লতিফ।

প্রশ্ন-৫২. বাংলার নবজাগরণের অগ্রদূত বলা হয় কাকে?
উত্তর: বাংলার নবজাগরণের অগ্রদূত বলা হয় নবাব আব্দুল লতিফকে।

প্রশ্ন-৫৩. নবাব আবদুল লতিফ কত সালে 'নবাব' উপাধি পান? *[সকল বোর্ড ২০১৯]*
উত্তর: ১৮৮০ সালে নবাব আবদুল লতিফ 'নবাব' উপাধি পান।

প্রশ্ন-৫৪. নবাব আবদুল লতিফকে ইংরেজ সরকার কী উপাধি দেয়?
উত্তর: নবাব আবদুল লতিফকে ইংরেজ সরকার 'খান বাহাদুর' উপাধি দেয়।

প্রশ্ন-৫৫. 'আত্মীয় সভা' সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন কে?

উত্তর: 'আত্মীয় সভা' সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন রাজা রামমোহন রায়।

প্রশ্ন-৫৬. নবাব আবদুল লতিফের প্রচেষ্টায় ১৮৬০ সালে কোন কমিশন গঠন করা হয়?

উত্তর: নবাব আবদুল লতিফের প্রচেষ্টায় ১৮৬০ সালে নীল কমিশন গঠন করা হয়

প্রশ্ন-৫৭. 'The Spirit of Islam' বইটির লেখক কে?

উত্তর: 'The Spirit of Islam' বইটির লেখক সৈয়দ আমীর আলী।

প্রশ্ন-৫৮. বাংলার মুসলমানদের রাজনৈতিকভাবে সচেতন করনে কে?

উত্তর: বাংলার মুসলমানদের রাজনৈতিকভাবে সচেতন করনে সৈয়দ আমীর আলী।

■ রাজনৈতিক দল: কংগ্রেস, মুসলিম লীগ

প্রশ্ন-৫৯. কত সালে 'জাতীয় কংগ্রেস' গঠিত হয়?

উত্তর: ১৮৮৫ সালে 'জাতীয় কংগ্রেস' গঠিত হয়।

প্রশ্ন-৬০. কার প্রচেষ্টায় কংগ্রেস গঠিত হয়?

উত্তর: ইংরেজ কর্মকর্তা অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউমের প্রচেষ্টায় কংগ্রেস গঠিত হয়।

প্রশ্ন-৬১. কার সভাপতিত্বে জাতীয় কংগ্রেস যাত্রা শুরু করে?

উত্তর: ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র ব্যানার্জির সভাপতিত্বে জাতীয় কংগ্রেস যাত্রা শুরু করে।

প্রশ্ন-৬২. কত সালে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ গঠিত হয়?

[রা. বো., দি. বো., ব. বো., কু. বো., য. বো., সি. বো., চ. বো. ২০১৭]

উত্তর: ১৯০৬ সালে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ গঠিত হয়।

প্রশ্ন-৬৩. নিখিল ভারত মুসলিম লীগ গঠনের উদ্যোক্তা কে?

উত্তর: নিখিল ভারত মুসলিম লীগ গঠনের উদ্যোক্তা নবাব স্যার সলিমুল্লাহ।

প্রশ্ন-৬৪. মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠনের নাম কী?

উত্তর: মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠনের নাম 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ।'

■ বঙ্গভঙ্গ: ঘটনা ও ফলাফল

প্রশ্ন-৬৫. কত সালে 'বঙ্গভঙ্গ' কার্যকর হয়?

উত্তর: ১৯০৫ সালে 'বঙ্গভঙ্গ' কার্যকর হয়।

প্রশ্ন-৬৬. বঙ্গভঙ্গের পর পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের রাজধানী করা হয় কোথায়?

উত্তর: বঙ্গভঙ্গের পর পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের রাজধানী করা হয় ঢাকায়।

প্রশ্ন-৬৭. বঙ্গভঙ্গের সময় বাংলা প্রদেশের লোকসংখ্যা কত ছিল?

উত্তর: বঙ্গভঙ্গের সময় বাংলা প্রদেশের লোকসংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে ৭ কোটি।

প্রশ্ন-৬৮. বঙ্গভঙ্গ করেন কে?

উত্তর: বঙ্গভঙ্গ করেন ব্রিটিশ বড়লাট লর্ড ন্যাথানিয়েল কার্জন।

প্রশ্ন-৬৯. বঙ্গভঙ্গের ফলে কারা লাভবান হয়েছিল?

উত্তর: বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলমানরা লাভবান হয়েছিল।

প্রশ্ন-৭০. বঙ্গভঙ্গ রক্ষায় কাজ করেন কোন নেতা?

উত্তর: বঙ্গভঙ্গ রক্ষায় কাজ করেন নবাব সলিমুল্লাহ।

প্রশ্ন-৭১. 'বঙ্গভঙ্গ' রদ করা হয় কত সালে?

[রা. বো., কু. বো., য. বো. ২০২২]

উত্তর: ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়।

প্রশ্ন-৭২. কাদের বিরোধিতার জন্য বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়?

উত্তর: হিন্দুদের বিরোধিতার জন্য বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়।

■ খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন

প্রশ্ন-৭৩. খেলাফত আন্দোলন কী?

উত্তর: প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে তুরস্কের খলিফার মর্যাদা ও এর অখণ্ডতা রক্ষায় ভারতীয় মুসলমানরা যে আন্দোলন গড়ে তোলে তাই খেলাফত আন্দোলন নামে পরিচিত।

প্রশ্ন-৭৪. খেলাফত কী?

উত্তর: খেলাফত মুসলমানদের একটি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান।

প্রশ্ন-৭৫. কত সালে সর্বভারতীয় খেলাফত কমিটি গঠন করা হয়?

উত্তর: ১৯১৯ সালের অক্টোবর মাসে সর্বভারতীয় খেলাফত কমিটি গঠন করা হয়।

প্রশ্ন-৭৬. সর্বভারতীয় খেলাফত কমিটির প্রথম সভার সভাপতি কে ছিলেন?

উত্তর: সর্বভারতীয় খেলাফত কমিটির প্রথম সভার সভাপতি ছিলেন এ. কে. ফজলুল হক।

প্রশ্ন-৭৭. সরকারের নির্যাতনের প্রতিবাদে মহাত্মা গান্ধীর পরিচালিত অহিংস জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নাম কী?

উত্তর: মহাত্মা গান্ধীর পরিচালিত অহিংস জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নাম 'সত্যাগ্রহ।'

প্রশ্ন-৭৮. লক্ষ্ণৌ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় কত সালে?

উত্তর: লক্ষ্ণৌ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯১৬ সালে।

প্রশ্ন-৭৯. সেভার্স চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় কত সালে?

উত্তর: সেভার্স চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯২০সালে।

প্রশ্ন-৮০. অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন কে?

উত্তর: অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন মহাত্মা গান্ধী।

প্রশ্ন-৮১. তুরস্কে খেলাফত উচ্ছেদ করেন কে?

উত্তর: তুরস্কে খেলাফত উচ্ছেদ করেন মুস্তফা কামাল আতাতুর্ক।

■ লাহোর প্রস্তাব ও দ্বিজাতি তত্ত্ব (১৯৪০)

প্রশ্ন-৮২. লাহোর প্রস্তাবের উত্থাপক কে? */সকল বোর্ড ২০১৬/*

উত্তর: লাহোর প্রস্তাবের উত্থাপক শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক।

প্রশ্ন-৮৩. কত সালে লাহোর প্রস্তাব উত্থাপিত হয়?

উত্তর: ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব উত্থাপিত হয়।

প্রশ্ন-৮৪. লাহোর প্রস্তাবের মূল বক্তব্য কী ছিল?

উত্তর: লাহোর প্রস্তাবের মূল বক্তব্য ছিল সীমানা পুনর্বিন্যাস।

প্রশ্ন-৮৫. দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রবর্তক কে? */সকল বোর্ড ২০১৮/*

উত্তর: দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রবর্তক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।

প্রশ্ন-৮৬. দ্বিজাতি তত্ত্বের মূলকথা কী ছিল?

উত্তর: দ্বিজাতি তত্ত্বের মূলকথা ছিল হিন্দু-মুসলিম আলাদা জাতি।

প্রশ্ন-৮৭. কে মুসলমানদের জন্য প্রথম আলাদা রাষ্ট্র গঠনের দাবি তোলেন?

উত্তর: আল্লামা ইকবাল প্রথম মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্রের দাবি তোলেন।

■ ভারত বিভক্তি (১৯৪৭): পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম

প্রশ্ন-৮৮. ভারতবর্ষে ইংরেজরা কত বছর শাসন করে?

উত্তর: ভারতবর্ষে ইংরেজরা প্রায় ২০০ বছর শাসন করে।

প্রশ্ন-৮৯. ভারতের সর্বশেষ ভাইসরয়ের নাম কী?

উত্তর: ভারতের সর্বশেষ ভাইসরয়ের নাম লর্ড মাউন্টব্যাটেন।

প্রশ্ন-৯০. অখণ্ড বাংলা প্রস্তাব প্রথম উত্থাপন করেন কে?

উত্তর: অখণ্ড বাংলা প্রস্তাব প্রথম উত্থাপন করেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদী।

প্রশ্ন-৯১. 'ক্রিপস প্রস্তাব' পাস হয় কত সালে?

উত্তর: 'ক্রিপস প্রস্তাব' পাস হয় ১৯৪২ সালে।

প্রশ্ন-৯২. 'ভারত স্বাধীনতা আইন ১৯৪৭' পাস হয় কত সালে?

উত্তর: 'ভারত স্বাধীনতা আইন ১৯৪৭' পাস হয় ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই।

প্রশ্ন-৯৩. কত সালে ভারত উপমহাদেশ ভাগ হয়?

উত্তর: ১৯৪৭ সালে ভারত উপমহাদেশ ভাগ হয়।

প্রশ্ন-৯৪. ভারত স্বাধীন হয় কত তারিখে?

উত্তর: ভারত স্বাধীন হয় ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট।

প্রশ্ন-৯৫. পাকিস্তান স্বাধীন হয় কত তারিখে?

উত্তর: পাকিস্তান স্বাধীন হয় ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট।

প্রশ্ন-৯৬. স্বাধীন পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল কে ছিলেন?

উত্তর: মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ স্বাধীন পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল ছিলেন।

প্রশ্ন-৯৭. স্বাধীন পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?

উত্তর: স্বাধীন পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন লিয়াকত আলী খান।

খ. অনুধাবনমূলক

প্রশ্ন-১. প্রাচীনকালে অনেকেই বাংলা অঞ্চলে ব্যবসা করতে এসেছিল কেন?

উত্তর: বাংলার মোহনীয় সৌন্দর্য এবং সম্পদের প্রাচুর্যে লোভাতুর হয়ে হয়ে প্রাচীনকালে অনেকেই বাংলা অঞ্চলে ব্যবসা করতে এসেছিল।

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশ ছিল ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ এক অপার সৌন্দর্যের লীলাভূমি। বাংলার অপার সৌন্দর্য এবং ধন-সম্পদের মোহে পড়ে পর্তুগিজ, ফরাসি, ইংরেজরাসহ আরো অনেকেই এখানে ব্যবসা করতে আসে। এদেশের ধন-সম্পদ ও রূপ-ঐশ্বর্য তাদের প্রবলভাবে আকৃষ্ট করে। যার ফলে ব্যবসায়িক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য তারা বাংলা অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে আসে।

প্রশ্ন-২. পর্তুগিজরা এদেশে কেন এসেছিল? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: ব্যবসা-বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে পর্তুগিজরা এ দেশে এসেছিল।

প্রাচীনকাল থেকেই বাংলা তথা ভারতীয় উপমহাদেশ ছিল ধন-সম্পদে ভরপুর। ইউরোপীয়রা এদেশের ধন-সম্পদ ও রূপ-ঐশ্বর্যে আকৃষ্ট ছিল। ১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা ভারতে আসার সমুদ্রপথ আবিষ্কার করলে ইউরোপীয়দের ভারতে আসার পথ অনেকটা সুগম হয়ে যায়। এরই ধারাবাহিকতায় সর্বপ্রথম পর্তুগিজরা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে আগমন করে। তারা এ দেশে একচেটিয়া বাণিজ্যিক আধিপত্য বিস্তার করে।

প্রশ্ন-৩. দিনেমার কারা? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: ভারতবর্ষে বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে আগত ডেনমার্কের অধিবাসীদের দিনেমার বলা হয়।

দিনেমার বা ডেনমার্কের একদল বণিক বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে ডেনিস ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠন করেন। ১৬২০ খ্রিষ্টাব্দে তারা দক্ষিণ ভারতের পাঞ্জাব জেলার ত্রিবাঙ্কুর এবং ১৬৭৬ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার শ্রীরামপুরে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেন। কিন্তু এদেশে তারা লাভজনক ব্যবসা করতে ব্যর্থ হয়। ১৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজদের কাছে বাণিজ্য কুঠি বিক্রি করে কোনো রকম বাণিজ্যিক সফলতা ছাড়াই দিনেমাররা এদেশ ত্যাগ করে।

প্রশ্ন-৪. ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠন করা হয়েছিল কেন?

উত্তর:. ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত সামুদ্রিক অঞ্চলে বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠন করা হয়েছিল।

১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামার ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কারের পর থেকেই এসেছে ইউরোপীয় বণিকেরা বাণিজ্য করতে আসতে শুরু করে। কারণ প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষ ছিল ধন-সম্পদে ভরপুর একটি সমৃদ্ধ অঞ্চল। তাই ব্রিটিশ বণিকেরা এদেশে আসার জন্য একটি বাণিজ্য সংঘ গঠন করে। ইংল্যান্ডের রানি প্রথম এলিজাবেথের কাছ থেকে ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর এ বাণিজ্য সংঘটি প্রাচ্যে বাণিজ্য করার রাজকীয় সনদ লাভ করে। এ বাণিজ্য সংঘটি ছিল ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। তারা ১৬১২ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের পশ্চিম উপকূলে গুজরাটের সুরাটে প্রথম বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করে।

প্রশ্ন-৫. ইংরেজদের এদেশে আসার প্রধান উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: ইংরেজদের এদেশে আসার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্য করা।

প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় উপমহাদেশ ছিল ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ এক অপার সৌন্দর্যের লীলাভূমি। বাংলার মোহনীয় সৌন্দর্য এবং সম্পদের প্রাচুর্যে লোভাতুর হয়ে ইংরেজরা এদেশে আসে। ব্যবসায়িক স্বার্থ চরিতার্থ তাদের প্রধান উদ্দেশ্য থাকলেও ধীরে ধীরে তারা এদেশের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব দখল করে।

প্রশ্ন-৬. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে প্রদত্ত ফররুখ শিয়রের ফরমানকে 'মহাসনদ' বলে অভিহিত করা হয় কেন?

উত্তর: ১৭১৭ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট ফররুখ শিয়রের ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে দেওয়া ফরমান ইংরেজদের বাণিজ্য প্রসারিত করেছিল বলে একে মহাসনদ বলা হয়।

ফররুখ শিয়রের ফরমান বলেই ইংরেজ কোম্পানি বার্ষিক তিন হাজার টাকার বিনিময়ে বাংলায় অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ পায়। তারা কলকাতা সংলগ্ন কতকগুলো গ্রাম কিনে নিয়ে শক্তি বৃদ্ধি করে। তাছাড়া এ ফরমান জারির ফলে ইংরেজ কোম্পানি বিনাশুল্কে সুরাটে বাণিজ্য করার অধিকার পায়। এভাবে ইংরেজ কোম্পানি এ ফরমান বলে তাদের বাণিজ্য বৃদ্ধি করেছিল, তাই এটি মহাসনদ নামে পরিচিত।

প্রশ্ন-৭. পলাশির যুদ্ধে নবাবের পরাজয়ের কারণ কী ছিল? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: প্রধান সেনাপতি মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা এবং ষড়যন্ত্রই ছিল পলাশির যুদ্ধে নবারের পরাজয়ের প্রধান কারণ।

বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আসলেও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ধীরে ধীরে এদেশের শাসনক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে। এরই প্রচেষ্টা হিসেবে তারা বাংলার তরুণ নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার সাথে নানা ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। তারা তাদের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য নবাবের কিছু স্বার্থান্বেষী অমাত্যদের সাথে হাত মেলায়। অবশেষে ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন ভাগীরথী নদীর তীরে পলাশির প্রান্তরে নবাবের সাথে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের ময়দানে প্রধান ষড়যন্ত্রকারী সেনাপতি মীরজাফরের নির্দেশে তার অনুগত সৈন্যরা নিষ্ক্রিয় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। নবারের একান্ত সহযোগী উমিচাঁদ, রায় দুর্লভ নবাবের বিজয় ছিনিয়ে আনতে। প্রাণপণ যুদ্ধ করে। কিন্তু মীরজাফরের পরামর্শে হঠাৎ নবাব যুদ্ধ বন্ধের ঘোষণা দেন। এ সুযোগে ইংরেজরা আক্রমণ করে নবাবের পরাজয়কে ত্বরান্বিত করে। এভাবে মীরজাফর ও তার সহযোগীদের ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতায় নবাবের পরাজয় ঘটে এবং বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়।

প্রশ্ন-৮. বক্সারের যুদ্ধের ফলাফল কী ছিল? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: ১৭৬৪ সালে সংঘটিত বক্সারের যুদ্ধে মীর কাসিমের পরাজয়ের ফলে এদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠা সুনিশ্চিত হয়।

বাংলার স্বাধীনচেতা নবাব মীর কাসিম সব ক্ষেত্রে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জারি করা নিয়ম নীতি মেনে চলেননি। তিনি দেশ শাসনের উদ্দেশ্যে বাংলার প্রশাসনে বেশ কিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেন, যা ইংরেজদের স্বার্থে আঘাত হেনেছিল ফলে তার সাথে ইংরেজদের বিরোধ সৃষ্টি হয় এবং ১৭৬৪ সালে ভারতীয়দের সম্মিলিত বাহিনী ও ইংরেজদের সাথে বিহারের বক্সার প্রান্তরে মুখোমুখি যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে নবাবের বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। আর এ পরাজয়ের ফলে বাংলার স্বাধীনতার শেষ অস্তিত্বটুকুও মুছে যায়। গোটা ভারতে ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। ইংরেজরা তাৎক্ষণিক বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করে। ভারতবর্ষ প্রায় ২০০ বছর ইংরেজদের শোষণের বেড়াজালে আটকে পড়ে।

প্রশ্ন-৯. কীভাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার দিওয়ানি লাভ করে?

উত্তর: বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভের মাধ্যমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় দিওয়ানি লাভ করে।

বক্সার যুদ্ধে জয়লাভের ফলে সরাসরি শাসন প্রতিষ্ঠা ছিল ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জন্য শুধু সিদ্ধান্তের ব্যাপার। বাস্তব অসুবিধা বিবেচনায় কোম্পানি মুঘল সরকারের সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগি করার সিদ্ধান্ত নেয়। মূলত একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নিজামত শাসন অপেক্ষা দিওয়ানি শাসন কুক্ষিগত করাকে অধিক লাভজনক বিবেচনা করে। তাই বক্সার যুদ্ধের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম ও বাংলার নবাব নাজিমুদ্দৌলার সাথে দুটি পৃথক চুক্তি করে দিওয়ানি লাভ করে।

প্রশ্ন-১০. দেওয়ানি লাভ বাংলার অর্থনীতিতে কীরূপ প্রভাব ফেলেছিল?

উত্তর: ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভ বাংলার অর্থনীতিতে অত্যন্ত বিরূপ প্রভাব ফেলেছিল।

কোম্পানির দেওয়ানি লাভের মাধ্যমে বাংলায় দ্বৈতশাসন প্রবর্তন করা হয়। এর ফলে একটি মুনাফামুখী কোম্পানি (রাজস্ব প্রশাসন)

লাভ করে বাংলার জনগণর ওপর অর্থনৈতিক শোষণ শুরু করে। এতে কোম্পানি ও কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যাপক আর্থিক উন্নতি ঘটলেও বাংলার অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। কোম্পানির শোষণের ফলে বাংলার শিল্প ও বাণিজ্য ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হয়। সর্বোপরি কোম্পানির দেওয়ানি লাভের ফলে ১৭৭০ সালে (বাংলা ১১৭৬) এক মহাদুর্ভিক্ষ ঘটেছিল। এতে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ লোক মারা যায়।

প্রশ্ন-১১. দ্বৈত শাসন কী? ব্যাখ্যা করো। */দি. বো., রা. বো., চ. বো. ২০১৭/*

উত্তর: লর্ড ক্লাইভ দ্বিতীয়বার বাংলায় গভর্নর হয়ে এসে বাংলা শাসন করার যে অভিনব ব্যবস্থা চালু করেন তা দ্বৈতশাসন নামে পরিচিত।

১৭৬৫ সালে দিওয়ানি (রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা) লাভের পর রবার্ট ক্লাইভ এদেশে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা চালু করেন। দ্বৈত শাসন মানে দুই জনের শাসন। এ ব্যবস্থায় কোম্পানি রাজস্ব আদায় ও দেশরক্ষার ভার গ্রহণ করে। আর নবাবকে দেওয়া হয় বিচার ও শাসনের ভার। অর্থাৎ নবাব পেল ক্ষমতাহীন দায়িত্ব আর কোম্পানি পেল দায়িত্বহীন ক্ষমতা। রবার্ট ক্লাইভের বাংলার ক্ষমতা ভাগাভাগির এ পদ্ধতিই দ্বৈত শাসন নামে পরিচিত।

প্রশ্ন-১২. রবার্ট ক্লাইভ কেন দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা চালু করেন?

উত্তর: অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের মাধ্যমে সম্পদ আত্মসাৎ এবং নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রবার্ট ক্লাইভ দ্বৈতশাসন চালু করেন।

১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে মুঘল সম্রাটের কাছ থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বার্ষিক নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব সম্রাটকে দেওয়ার শর্তে দিওয়ানি লাভ করে। কিন্তু দেওয়ানি শাসন পরিচালনার জন্য কোম্পানির প্রয়োজনীয় জনবল ছিল না। তাছাড়া এদেশের ভাষা, আইন-কানুন ও রাজস্ব শাসনের রীতিনীতি সম্পর্কে কোম্পানির কর্মচারীদের কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। সরাসরি রাজস্ব আদায়ের ভার থাকায় এদেশে বাণিজ্যরত অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকদের সাথে তাদের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কাও ছিল। এসব কারণেই সুচতুর ক্লাইভ দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা চালু করে নিজের অবস্থান পাকাপোক্ত করার চেষ্টা করেন।

প্রশ্ন-১৩. ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: লর্ড ক্লাইভের প্রবর্তিত দ্বৈতশাসনের বিরূপ প্রভাবের কারণে বাংলায় ১১৭৬ বঙ্গাব্দে যে মহাদুর্ভিক্ষ হয় তা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত।

দ্বৈত শাসনব্যবস্থায় কোম্পানি রাজস্ব সংগ্রহের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ফলে বাংলায় অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দেয়। তাছাড়া ১৭৬৮ সাল থেকে ১৭৭০ সাল পর্যন্ত টানা তিন বছর বৃষ্টির অভাবে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হয়। ভালো ফসল না হওয়ার পরও কোম্পানি করের হার না কমিয়ে বরং বৃদ্ধি করতে থাকে। যার চূড়ান্ত ফলাফল হিসেবে ১৭৭০ সালে দেখা দেয় মহাদুর্ভিক্ষ। বাংলা ১১৭৬ সালে এ দুর্ভিক্ষ হয় বলে একে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বলা হয়।

প্রশ্ন-১৪. ছিয়াত্তরের মন্বন্তর কেন ঘটেছিল? */সকল বোর্ড ২০১৬/*

উত্তর: লর্ড ক্লাইভের প্রবর্তিত দ্বৈত শাসনের ফলে এবং প্রাকৃতিক কারণে বাংলায় মহাদুর্ভিক্ষ বা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ঘটেছিল।

দ্বৈত শাসনব্যবস্থায় কোম্পানি রাজস্ব সংগ্রহে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ফলে বাংলায় অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দেয়। তাছাড়া ১৭৬৮ সাল থেকে ১৭৭০ সাল পর্যন্ত টানা তিন বছর বৃষ্টির অভাবে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হয়। ভালো ফসল না হওয়ার পরও কোম্পানি করের হার না কমিয়ে বরং বৃদ্ধি করতে থাকে। যার চূড়ান্ত ফলাফল হিসেবে ১৭৭০ সালে দেখা দেয় মহাদুর্ভিক্ষ। বাংলা ১১৭৬ সনে এ দুর্ভিক্ষ হয় বলে একে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বলা হয়।

প্রশ্ন-১৫. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কী? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দের ২২ মার্চ ভারতের জমিদারদের সাথে ভূমি রাজস্ব বিষয়ে কোম্পানির একটি স্থায়ী চুক্তি হয়, যা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নামে পরিচিত।

ইংরেজ গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিশ বাংলায় একটি স্থায়ী রাজস্বব্যবস্থা সৃষ্টি এবং ব্রিটিশদের অনুগত একটি শ্রেণি তৈরির জন্য জমিদারদের সাথে রাজস্বের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে এ চুক্তি করেন। এর ফলে জমিদাররা স্থায়ীভাবে ভূমির মালিকানা লাভ করে এবং চাষযোগ্য জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। তবে এ ব্যবস্থায় জমিদাররা লাভবান হলেও সাধারণ কৃষকেরা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

প্রশ্ন-১৬. ফকির বিদ্রোহের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: ফকির বিদ্রোহের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশদের বিতাড়িত করা।

ফকির বিদ্রোহ ছিল একটি ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন। ফকির সন্ন্যাসিদের অবাধ চলাফেরায় বাধা সৃষ্টি, তীর্থস্থান দর্শনের ওপর করারোপ এবং মুষ্টি সংগ্রহ বেআইনি ঘোষণা করলে ফকির সন্ন্যাসীরা ক্ষুব্ধ হয়। ফলে এদেশ হতে ব্রিটিশদের উচ্ছেদের লক্ষ্যে ফকিররা ইংরেজদের বিরুদ্ধে ফকির বিদ্রোহ তথা দীর্ঘ আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়।

প্রশ্ন-১৭. ফরায়েজি আন্দোলন কী? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: হাজি শরীয়তউল্লাহ কর্তৃক পরিচালিত আন্দোলনই ফরায়েজি আন্দোলন নামে পরিচিত।

'ফরায়েজি' শব্দটি আরবি 'ফরজ' থেকে এসেছে যার অর্থ অবশ্য পালনীয়। আর যে সকল ধর্মীয় কর্মকাণ্ড আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের জন্য অবশ্য পালনীয় হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা পালন করাই ফরজ। হাজী শরীয়তুল্লাহ পূর্ব বাংলায় অধঃপতিত মুসলিম সমাজে বিদ্যমান নানাবিধ কুসংস্কার দূরীকরণ ও ইসলাম ধর্মের আদি অবস্থায় ফিরে যাওয়ার মানসিকতা নিয়ে আল্লাহ মনোনীত সকল ফরজ কাজ সম্পাদনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তার এই আন্দোলন ফরজের ওপর ভিত্তি করে পরিচালনা করায় এ আন্দোলনকে 'ফরায়েজি আন্দোলন' বলা হয়।

প্রশ্ন-১৮. ফরায়েজি আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে কেন? ব্যাখ্যা করো। *[সকল বোর্ড ২০১৮]*

উত্তর: নেতৃত্বের অভাবে ফরায়েজি আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে।

দুদু মিয়ার মৃত্যুর পর নেতৃত্ব গ্রহণের মতো কেউ না থাকায় এ আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তাছাড়া দুদু মিয়ার যোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাব, সংকীর্ণ ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি, যথার্থ সংগ্রামে অভিজ্ঞতার অভাব, আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের অস্পষ্ট রাজনৈতিক চেতনা, লক্ষ্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণার অভাবে এ আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায়। তথাপিও এটি পরবর্তী স্বাধিকার আন্দোলনের অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে।

প্রশ্ন-১৯. নীল বিদ্রোহ কী ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: ইংরেজ বণিক, নীলকরদের অত্যাচার ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে ১৮৫৯ সালে যে বিদ্রোহ শুরু হয় তাই নীল বিদ্রোহ নামে পরিচিত।

নীল বিদ্রোহে গ্রামে গ্রামে কৃষকেরা সংগঠিত ও ঐক্যবন্ধ হতে থাকে। নীল চাষিরাই এসব বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেয় । যশোরে নবীন মাধব ও বেনী মাধব, হুগলিতে বৈদ্যনাথ ও বিশ্বনাথ সর্দার ও নদীয়ায় মেঘনা সর্দার প্রমুখ নীল বিদ্রোহের নেতা ছিলেন। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও পত্রিকাগুলো বিদ্রোহীদের পক্ষে ছিল। ১৮৬০ সালে শেষ পর্যন্ত বাংলার সংগ্রামী কৃষকদের জয় হয়।

প্রশ্ন-২০. স্বত্ববিলোপ নীতি বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: লর্ড ডালহৌসি দেশীয় রাজ্যগুলোর দত্তক পুত্র গ্রহণের দাবি অস্বীকার করে তা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করার নিয়ম চালু করেন যা স্বত্ববিলোপ নীতি নামে পরিচিত।

লর্ড ডালহৌসি ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তৃতি সাধনের জন্য যেসব পন্থা অনুসরণ করেছিলেন তার মধ্যে অন্যতম ছিল তার বিখ্যাত স্বত্ববিলোপ নীতি। এ নীতির মূলকথা ছিল এই যে, ব্রিটিশের আশ্রিত যেকোনো দেশীয় রাজ্যের রাজা অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে এবং তার রাজবংশের কোনো উত্তরাধিকার না থাকলে সেই রাজ্য সরাসরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হবে এবং দত্তক বা পালিত পুত্রের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে না। এ নীতির সার্থক প্রয়োগ করেন ডালহৌসি। এ নীতি প্রয়োগ করে সাঁতারা, নাগপুর ও সম্বলপুর ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত করা হয়।

প্রশ্ন-২১. ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ কী ছিল? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: ভারতীয়দের ধর্মীয় অনুভূতিতে ব্রিটিশদের আঘাত হানাই ছিল ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ।

হিন্দু জাতির মধ্যে বদ্ধমূল ধারণা ছিল, সমুদ্র পাড়ি দিলে ধর্ম নষ্ট হয় কিন্তু হিন্দুদের সমুদ্র পাড়ি দিতে বাধ্য করে ব্রিটিশ সরকার তাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে। এছাড়া হিন্দু-মুসলিম উভয় জাতির ব্যবহারের জন্য 'এনফিল্ড' রাইফেলের প্রচলন করা হয়। এ রাইফেলের টোটা দাঁত দিয়ে কেটে বন্দুকে প্রবেশ করাতে হতো। ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়ে, এ টোটায় গরু ও শূকরের চর্বি মিশ্রিত আছে। এই ঘটনা হিন্দু-মুসলিম উভয় জাতির ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে। ফলে তারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন-২২. ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছিল কেন? ব্যাখ্যা করো। *[সকল বোর্ড ২০১৬]*

উত্তর: সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও সুযোগ্য নেতৃত্বের অভাবে ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছিল।

১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লব ছিল বিচ্ছিন্ন ও অসংগঠিত। তাছাড়া এ বিপ্লবের কোনো যোগ্য নেতা ছিলেন না। সর্বোপরি আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের অভাব, দুর্বল সংগঠন, বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর মধ্যে একতার অভাব, সংহতি ও সর্বভারতীয় আদর্শের অভাব প্রভৃতি কারণে এ বিপ্লব সাফল্য লাভ করতে পারেনি। অন্যদিকে বিদ্রোহীদের তুলনায় ইংরেজরা ছিল অধিক দক্ষ, রণকুশলী, নিষ্ঠাবান ও আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত, যা বিপ্লবীদের চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে।

প্রশ্ন-২৩. 'মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি' সম্পর্কে যা জান লেখো।

উত্তর: নবাব আবদুল লতিফ প্রতিষ্ঠিত সমাজ সংস্কারমূলক একটি প্রতিষ্ঠান হলো মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি।

কলকাতায় ১৮৬৩ সালে মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি বা মুসলিম সাহিত্য সমাজ নামের একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ সমিতির উদ্দেশ্য ছিল আধুনিক শিক্ষা জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে মুসলমানদের মাঝে জনমত তৈরি ও তাদের সচেতন করা। মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি কোনো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিল না।

প্রশ্ন-২৪. 'মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি' গঠন করা হয় কেন?

উত্তর: আধুনিক শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে জনমত তৈরি এবং তাদেরকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে 'মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি' গঠন করা হয়।

নবাব আবদুল লতিফ ১৮৬৩ সালে কলকাতায় 'মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি' বা মুসলিম সাহিত্য সমাজ নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মুসলমানদের ন্যায়সংগত দাবি ও আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা সরকারের কাছে তুলে ধরে তা পূরণের চেষ্টা করা হয়।

প্রশ্ন-২৫. জনাব আব্দুল লতিফের সংস্কারের মূল লক্ষ্য কী ছিল?

উত্তর: নবাব আবদুল লতিফের সংস্কারের মূল লক্ষ্য ছিল বাংলার মুসলমানদের ইংরেজি তথা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করে তাদেরকে অধিকার সচেতন করা।

বাংলার মুসলিম সমাজের জাগরণে যেসব মনীষী অবদান রেখেছেন নবাব আবদুল লতিফ তাদের অন্যতম। তিনি লক্ষ করেন ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অনীহার কারণে মুসলমানরা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছে। তাই মুসলমানদের ইংরেজি তথা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে নবাব আবদুল লতিফ 'মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা, কলকাতা মাদ্রাসায় এ্যাংলো-ফারসি বিভাগ চালুসহ নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তার এসব কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হলো মুসলিম সমাজে আধুনিক ধ্যান-ধারণা প্রসারের মাধ্যমে মুসলমানদের আত্মসচেতন করা।

প্রশ্ন-২৬. ঔপনিবেশিক যুগে বাংলার মুসলিম সমাজে শিক্ষা সংস্কার প্রয়োজন হয়েছিল কেন? *[সকল বোর্ড ২০১৬]*

উত্তর: ঔপনিবেশিক যুগে বাংলার মুসলিম সমাজে বিদ্যমান নানা কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস তাদেরকে উন্নয়নের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে, তাই তখন শিক্ষা সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দেয়।

পলাশির যুদ্ধে (১৭৫৭) পরাজয়ের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা হারিয়ে বাঙালি এক অনিশ্চয়তার অন্ধকারে পড়ে যায়। মুসলমানরা ইংরেজি শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ফলে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে দেখা দেয় পশ্চাৎপদতা, অনগ্রসরতা, অশিক্ষা, কুসংস্কার প্রভৃতি। তাই এ সময়ে বাংলার মানুষকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য সমাজে শিক্ষা সংস্কার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

প্রশ্ন-২৭. 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠা করা হয় কেন?

উত্তর: ভারতীয়রা তাদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠা করে।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের শুরু থেকেই ভারতীয়রা নানাভাবে শোষণের স্বীকার এবং ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে থাকে। আর এই শোষণ থেকে মুক্তি এবং ন্যায্য অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে তারা একটি রাজনৈতিক প্লাটফর্মের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। অবস্থায় ১৮৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসে এক সম্মেলনে তাদের দাবি সফলভাবে আদায়ের লক্ষ্যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করা হয়।

প্রশ্ন-২৮. মুসলিম লীগ গঠন করা হয় কেন?

উত্তর: মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্য ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ গঠন করা হয়।

১৮৮৫ সালে কংগ্রেস দল সর্বভারতীয় আদর্শ নিয়ে গঠিত হলেও এটি এক পর্যায়ে হিন্দু ঘেঁষা নীতি অনুসরণ করে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করা হয়। বাংলার মুসলিমরা এটিকে স্বাগত জানালেও হিন্দুরা কংগ্রেসের নেতৃত্বে এর তীব্র বিরোধিতা করে। শেষ পর্যন্ত তাদের তীব্র বিরোধিতার কারণে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়। মুসলমান নেতাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় যে, হিন্দু নেতারা কখনোই মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা করবেন না। ফলে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজেদের স্বার্থ আদায়ের জন্য মুসলিম লীগ গঠন করেন।

প্রশ্ন-২৯. বঙ্গভঙ্গ বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: ১৯০৬ সালে লর্ড কার্জন কর্তৃক তৎকলীন বাংলা প্রেসিডেন্সিকে বিভক্ত করার ঘটনাই ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ নামে পরিচিত।

ব্রিটিশ ভারতের শাসনতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কলকাতাকেন্দ্রিক গড়ে ওঠা ভারতীয়দের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নস্যাৎ করার লক্ষ্যে ব্রিটিশ সরকার 'ভাগ কর, শাসন কর' নীতির দিকে ঝুঁকে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর ব্রিটিশ ভারতের ভাইসরয় লর্ড কার্জন তৎকালীন বাংলা প্রেসিডেন্সিকে ভাগ করে নতুন দুটি প্রদেশ গঠন করে। ইতিহাসে এটি বঙ্গভঙ্গ নামে পরিচিত।

প্রশ্ন-৩০. বঙ্গভঙ্গের রাজনৈতিক কারণ কী? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: বঙ্গভঙ্গের রাজনৈতিক কারণ হলো ভারতীয়দের ঐক্য বিনষ্ট করে ব্রিটিশ শাসন দীর্ঘস্থায়ী করা।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ছিল ব্রিটিশ সরকারের চিরাচরিত ভাগ কর ও শাসন কর (Divide and Rule Policy) নীতির বহিঃপ্রকাশ। বিশ শতকের শুরুতে ভারতে যে ব্রিটিশবিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয় তার কেন্দ্রবিন্দু ছিল বাংলা, বিশেষ করে কলকাতা নগরী। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল বাঙালি মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা। তাই ব্রিটিশরা বাঙালি জাতির ঐক্য ও সংহতি নষ্ট এবং সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল কংগ্রেস ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির আধিপত্য ধ্বংস করে তাদের জাতীয়তাবাদী চেতনাকে দুর্বল করার জন্য বাংলাকে বিভক্ত করে।

প্রশ্ন-৩১. বঙ্গভঙ্গের প্রধান কারণ কী? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: কোনো একক কারণে বঙ্গভঙ্গ হয়নি। তবে প্রশাসনিক কারণকে বঙ্গভঙ্গের প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

ভাইসরয় লর্ড কার্জন এবং মেকলে, রিজলে, গডলেক প্রমুখ ব্রিটিশ কর্মকর্তার ভাষ্যমতে, মূলত প্রশাসনিক কারণেই বঙ্গভঙ্গ করা হয়েছিল। তাদের যুক্তি, বাংলা ছিল ব্রিটিশ ভারতের সর্ববৃহৎ প্রদেশ। বিভক্তির আগে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা এবং মধ্যপ্রদেশ ও আসামের কিছুঅংশ নিয়ে গঠিত বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির আয়তন ছিল ১ লক্ষ ৮৯ হাজার বর্গমাইল। একজন গভর্নরের পক্ষে এই বিশাল প্রদেশের শাসনকাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব ছিল না বলে বঙ্গভঙ্গ করা হয়।

প্রশ্ন-৩২. মুসলমানরা বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন করছিল কেন?

উত্তর: স্বার্থের অনুকূলে ছিল বলে মুসলমানগণ ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন করেছিল।

বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলমানরা নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ, উন্নতি এবং একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী হিসেবে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভের সম্ভাবনা দেখতে পায়। তাই নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ বঙ্গভঙ্গের পক্ষে মুসলিম জনমতকে সংগঠিত করার উদ্যোগ নেন। তিনি মনে করতেন বঙ্গভঙ্গ মুসলমানদের উদ্দীপ্ত করেছে কর্ম-সাধনায় এবং সংগ্রামে। সর্বোপরি বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলমানদের স্বার্থরক্ষা পেয়েছিল। তাই তারা এর প্রতি পূর্ণ সমর্থন দিয়েছিল।

প্রশ্ন-৩৩. 'বঙ্গভঙ্গ রদ' করা হয় কেন?

উত্তর: বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে হিন্দুদের প্রবল আন্দোলন ও সন্ত্রাসী কার্যক্রমের ফলে ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী হিন্দু সমাজ ও কংগ্রেস বিলেতি দ্রব্য বর্জন তথা স্বদেশি আন্দোলন শুরু করে এবং অপরদিকে ভয়-ভীতি ও হত্যাযজ্ঞের সূত্রপাত ঘটায়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় চরম উত্তেজনাকর খবর ও সম্পাদকীয় লেখা হতে থাকে। ভারত-মাতাকে 'কালী হিসেবে চিহ্নিত করে আন্দোলনকারীরা আন্দোলনের গতিবেগ ও তীব্রতা বৃদ্ধি করেন। ক্রমে এ আন্দোলন 'ব্রিটিশ খেদাও' আন্দোলনে রূপ নিতে থাকে। এ অবস্থায় ব্রিটিশ সরকার আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং বিক্ষোভ ও হত্যাযজ্ঞের মুখে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয় এবং ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়।

প্রশ্ন-৩৪. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে খেলাফত আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল কেন? *[সকল বোর্ড ২০১৬]*

উত্তর: তুরস্কের খলিফার মর্যাদা ও তুরস্কের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য খেলাফত আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল।

ভারতীয় মুসলমানরা তুরস্কের সুলতানকে মুসলিম বিশ্বের খলিফা বা ধর্মীয় নেতা হিসেবে শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক জার্মানির পক্ষাবলম্বন করে এবং যুদ্ধে মিত্রশক্তির কাছে তারা পরাজয় বরণ করে। মিত্রশক্তি একজন হাইকমিশনারের মাধ্যমে তুরস্কের শাসনভার গ্রহণ করেন এবং তুরস্কের সুলতানের সঙ্গে অবমাননাকর আচরণ করে। তুরস্কের প্রতি মিত্রশক্তির এমন আচরণ মুসলমানদের মর্মাহত করে। ফলে ভারতীয় মুসলমানরা ১৯২০ সালে আন্দোলন গড়ে তোলে।

প্রশ্ন-৩৫. খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হয় কেন? *[সকল বোর্ড ২০১৮]*

উত্তর: এক পর্যায়ে সহিংস হয়ে ওঠা এবং যৌক্তিকতা হারানোর জন্য খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হয়।

১৯২০ সালে শুরু হওয়া খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন শুরুর দিকে অহিংসভাবে পরিচালিত হচ্ছিল। কিন্তু ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে উত্তর প্রদেশের চৌরিচৌরায় বিক্ষুব্ধ জনতা থানা আক্রমণ করে ২১ জন সিপাহি ও একজন দারোগাকে পুড়িয়ে হত্যা করে। এ মারাত্মক সহিংস ঘটনায় অসহযোগ আন্দোলনের নেতা মহাত্মা গান্ধী মর্মাহত হয়ে আন্দোলনের কর্মসূচি বাতিল করেন। অপরদিকে খেলাফত আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল তুরস্কের খিলাফত রক্ষা। কিন্তু আধুনিক তুরস্কের জনক মুস্তফা কামাল আতাতুর্ক ১৯২৪ সালে খেলাফত প্রথা বাতিল করেন। এর ফলে খেলাফত আন্দোলন যৌক্তিকতা হারিয়ে ফেলে।

প্রশ্ন-৩৬. অসহযোগ আন্দোলনের প্রধান কারণ কী ছিল? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: ব্রিটিশ সরকারের রাওলাট আইন প্রবর্তন ছিল অসহযোগ আন্দোলনের প্রধান কারণ।

ব্রিটিশ সরকার যে কোনো মামলা বিচারক ছাড়াই নিষ্পত্তি করা এবং সন্দেহভাজন সন্ত্রাসীদেরকে জেলখানায় রাখার জন্য ১৯১৯ সালে 'রাওলাট' আইন প্রণয়ন করে। রাওলাট আইনের প্রতিবাদ করতে গিয়ে বেশ কিছু ভারতীয় নিহত হয়। আর এ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে এক সভায় দশ হাজার লোক জমায়েত হয়। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার এ সভাস্থলে নিরস্ত্র ও আলোচনারত ভারতীয়দের ওপর নির্বিচারে গুলি চালিয়ে কয়েক হাজার লোককে হত্যা করে। আর এ কারণেই ভারতীয়রা গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে।

প্রশ্ন-৩৭. লাহোর প্রস্তাবের মূল বিষয় কী ছিল? ব্যাখ্যা করো। *[রা. বো., কু. বো., য. বো. ২০২২]*

উত্তর: লাহোর প্রস্তাবের মূল বিষয় ছিল ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলীয় মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ নিয়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করা।

১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের ২৭ তম অধিবেশনে ভারতের ভবিষ্যৎ স্বাধীন রাষ্ট্র সম্পর্কিত শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের উত্থাপিত প্রস্তাবই লাহোর প্রস্তাব। লাহোর প্রস্তাব একটি ঐতিহাসিক প্রস্তাব। এ প্রস্তাবের মূল বক্তব্যের ভিত্তিতেই ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগ হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় এবং পরবর্তী সময়ে ১৯৭১ সালে পাকিস্তান বিভক্ত হয়ে বাংলাদেশ নামে একটি নতুন রাষ্ট্র আত্মপ্রকাশ করে। লাহোর প্রস্তাবের মূল বক্তব্যে ভৌগোলিক সীমানা পুনর্বিন্যাসের পাশাপাশি পূর্বাঞ্চলীয় স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর প্রদেশগুলোর সার্বভৌমত্বের কথা বলা হয়। ঐতিহাসিক এ প্রস্তাবের মূল বক্তব্যেই স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ লুকায়িত ছিল।

প্রশ্ন-৩৮. 'দ্বিজাতি তত্ত্ব' সম্পর্কে ধারণা দাও। *[ঢা. বো., রা. বো., চ. বো. ২০১৭]*

উত্তর: ১৯৪০ সালের ২২-২৩ মার্চ লাহোরে মুসলিম লীগের ২৭তম অধিবেশনে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ হিন্দু-মুসলিম দুটি আলাদা জাতি- এ ধারণার ভিত্তিতে যে তত্ত্ব ঘোষণা করেন তাই দ্বিজাতি তত্ত্ব নামে পরিচিত।

দ্বিজাতি তত্ত্বের মূলকথা হলো— হিন্দু ও মুসলিমরা তাদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ধ্যান-ধারণার দিক থেকে দুটি আলাদা জাতি। ভারতের অধিবাসী হলেও তাদের ধর্মীয় ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক রীতি, প্রথা ইত্যাদি সম্পূর্ণ ভিন্ন। সুতরাং সাম্প্রদায়িক জটিলতা নিরসনে তাদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন অপরিহার্য। জিন্নাহর এ ধারণাই দ্বিজাতি তত্ত্ব নামে পরিচিত।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সর্বপ্রথম কোন ইউরোপীয় বণিকেরা ভারতবর্ষে আসে?
ক. ইংরেজ খ. ওলন্দাজ
গ. পর্তুগিজ ঘ. ফরাসি

২. কত খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হয়?
ক. ১৬০০ খ. ১৬১০
গ. ১৬২০ ঘ. ১৬৩০

৩. ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া প্রথম কোথায় বাণিজ্যকুঠি নির্মাণ করে?
ক. সুরাটে খ. নাগাপট্টমে
গ. আগ্রায় ঘ. পন্ডিচেরিতে

৪. পলাশির যুদ্ধ কত খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়?
ক. ১৭১৬ খ. ১৭২০
গ. ১৭৫৭ ঘ. ১৭৬৬

৫. বাংলার শেষ নবাব কে ছিলেন?
ক. নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা খ. নবাব মীর কাসিম
গ. নবাব আলীবর্দী খান ঘ. নবাব আবদুল লতিফ

৬. সিপাহি বিদ্রোহ কত সালে সংঘটিত হয়?
ক. ১৭৫৭ খ. ১৭৬০
গ. ১৮৫৭ ঘ. ১৮৬০

৭. ভারতীয়দের মধ্যে কোন ব্যক্তি প্রথম ইংল্যান্ডের প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন?
ক. হাজি মুহম্মদ মোহসিন খ. নবাব আবদুল লতিফ
গ. সৈয়দ আমীর আলী ঘ. রাজা রামমোহন রায়

৮. 'মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠাতার নাম কী?
ক. সৈয়দ আমীর আলী খ. রামমোহন রায়
গ. সৈয়দ আহমদ খান ঘ. নবাব আবদুল লতিফ

৯. জাতীয় কংগ্রেস কত সালে গঠিত হয়?
ক. ১৮৩৭ খ. ১৮৪৩
গ. ১৮৭৬ ঘ. ১৮৮৫

১০. কত সালে মুসলিম লীগ গঠিত হয়?
ক. ১৯০২ খ. ১৯০৪
গ. ১৯০৬ ঘ. ১৯০৮

১১. সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি কে ছিলেন?
ক. মতিলাল নেহেরু খ. বিপিন পাল
গ. উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি ঘ. সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি

১২. কত খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়?
ক. ১৯১০ খ. ১৯১১
গ. ১৯১২ ঘ. ১৯১৩

১৩. কত খ্রিষ্টাব্দে লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়?
ক. ১৯৪৫ খ. ১৯৩৫
গ. ১৯৪০ ঘ. ১৯৩০

১৪. ভারতের সর্বশেষ ভাইসরয় কে ছিলেন?
ক. লর্ড কার্জন খ. লর্ড রিপন
গ. লর্ড ডালহৌসি ঘ. লর্ড মাউন্টব্যাটেন

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন

১৫. দ্বৈতশাসনের ফলে—
i. প্রশাসনিক জটিলতা তৈরি হয়
ii. কোম্পানির কর্মচারীদের অবৈধ বাণিজ্যের প্রসার ঘটে
iii. বাংলার জনগণ লাভবান হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৬. ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের পরিণতি হলো—
i. ভারতে কোম্পানি শাসনের অবসান
ii. ভারতে ব্রিটিশ রাজকীয় ঔপনিবেশিক শাসনের সূচনা
iii. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পতন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৭. আব্দুল লতিফ মুসলমানদের জন্য ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা করেন—
i. মুসলমানদের জীবনের উন্নতির জন্য
ii. মুসলমানদের ব্রিটিশদের অনুগত করার জন্য
iii. ইংরেজদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৮ ও ১৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
খান মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ একজন জনদরদি ও দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। দরিদ্র ছাত্রদের লেখাপড়ার জন্য এবং চিকিৎসার জন্য আহ্‌সানিয়া মিশন নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।

১৮. আহ্‌সানিয়া মিশনের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন সংগঠনের মিল রয়েছে?
ক. কলকাতা মিশন
খ. মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি
গ. ব্রাহ্ম সমাজ
ঘ. মোহসিন ফান্ড

১৯. উক্ত সংগঠন অবদান রাখে—
i. মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তারে
ii. গরিবদের কল্যাণে
iii. মুসলমানদের রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টিতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২০ ও ২১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার ঢাকা নগরীকে দু' ভাগে ভাগ করেছে। নগরীর উন্নয়নকে প্রধান লক্ষ্য ধরে সরকার এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে গণমাধ্যমে জানানো হয়।

২০. উদ্দীপকের নগরী বিভক্তি ইতিহাসের কোন ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?
ক. বঙ্গভঙ্গ খ. স্বত্ববিলোপ নীতি
গ. ইলবার্ট বিল ঘ. লক্ষ্ণৌ চুক্তি

২১. উদ্দীপকের সাথে উক্ত ঘটনার সাদৃশ্য রয়েছে—
i. উদ্দেশ্যগত
ii. পটভূমিগত
iii. ফলাফলগত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

খ. বোর্ড পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২২. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হয়েছিল কেন? *[সকল বোর্ড ২০১৫]*
ক. ভারতবর্ষ শাসনের জন্য
খ. বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে
গ. ফরাসিদের দমনের জন্য
ঘ. পর্তুগিজদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে

২৩. ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গটি কোথায় অবস্থিত? *[সকল বোর্ড ২০১৯]*
ক. সুতানটি খ. গোবিন্দপুর
গ. কলকাতা ঘ. বিহার

২৪. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কত খ্রিষ্টাব্দে দেওয়ানি লাভ করে? *[সকল বোর্ড ২০১৫]*
ক. ১৭৫৭ খ. ১৭৬৪
গ. ১৭৬৫ ঘ. ১৭৭২

২৫. দ্বৈত শাসন কত সালে প্রবর্তিত হয়? *[সকল বোর্ড ২০১৮]*
ক. ১৭৬৩ খ. ১৭৬৪
গ. ১৭৬৫ ঘ. ১৭৬৭

২৬. ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বা মহাদুর্ভিক্ষ কত খ্রিষ্টাব্দে হয়েছিল? *[সকল বোর্ড ২০১৬]*
ক. ১১৭০ খ. ১৫৭০
গ. ১৭৭০ ঘ. ১৮৭০

২৭. ফরায়েজি আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন কে? *[সকল বোর্ড ২০১৭, ২০১৬]*
ক. হাজি শরীয়তউল্লাহ খ. দুদু মিয়া
গ. তিতুমীর ঘ. সৈয়দ আহমদ খান

২৮. ফরায়েজি আন্দোলনের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল— *[সকল বোর্ড ২০১৫]*
ক. ধর্মীয় সংস্কার খ. অর্থনৈতিক মুক্তি
গ. ক্ষমতা লাভ ঘ. নীলকরদের উৎখাত

২৯. নিচের কোন ব্যক্তিত্ব দক্ষ কুস্তিগীর ছিলেন? *[সকল বোর্ড ২০১৯]*
ক. হাজি শরীয়তউল্লাহ খ. দুদু মিয়া
গ. তিতুমীর ঘ. গোলাম মাসুম

৩০. তিতুমীর কোথায় বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন? *[সকল বোর্ড ২০১৭]*
ক. নদীয়া খ. সোনারগাঁও
গ. বারাসত ঘ. নারিকেলবাড়িয়া

৩১. সিপাহি বিপ্লবের প্রাক্কালে ভারতের গভর্নর জেনারেল ছিলেন— *[সকল বোর্ড ২০১৯]*
ক. লর্ড ডালহৌসি খ. লর্ড ক্যানিং
গ. লর্ড কর্নওয়ালিশ ঘ. লর্ড কার্জন

৩২. মুঘল বংশের সর্বশেষ শাসক কে ছিলেন? *[সকল বোর্ড ২০১৬]*
ক. ১ম বাহাদুর শাহ খ. মুহাম্মদ শাহ
গ. আহমদ শাহ ঘ. ২য় বাহাদুর শাহ জাফর

৩৩. হাজি মুহম্মদ মোহসিনের পৈতৃক নিবাস কোথায়? *[সকল বোর্ড ২০১৮]*
ক. পারস্য খ. আরব
গ. ইরাক ঘ. আফগানিস্তান

৩৪. 'মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি' কে প্রতিষ্ঠা করেন? *[সকল বোর্ড ২০১৫]*
ক. হাজি মুহম্মদ মোহসিন খ. নওয়াব আবদুল লতিফ
গ. সৈয়দ আমির আলী ঘ. স্যার সৈয়দ আহমেদ

৩৫. 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' কে প্রতিষ্ঠা করেন? *[সকল বোর্ড ২০১৭, ২০১৬]*
ক. সৈয়দ আমির আলী খ. আবদুল লতিফ
গ. হাজি মুহম্মদ মোহসিন ঘ. তিতুমীর

৩৬. লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন কে? *[সকল বোর্ড ২০১৬, ২০১৫]*
ক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
খ. এ কে ফজলুল হক
গ. আব্দুল হামিদ খান ভাসানী
ঘ. নবাব আব্দুল লতিফ

৩৭. ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান জাতীয়তাবাদের ভিত্তি কী ছিল? *[সকল বোর্ড ২০১৯]*
ক. ধর্ম খ. ভাষা
গ. শিক্ষা ঘ. বর্ণ

৩৮. ইংরেজদের সাথে যুদ্ধে তিতুমীরের পরাজয়ের কারণ ছিল— */সকল বোর্ড ২০১৫/*
i. তিতুমীরের সমর্থকদের অসহযোগিতা
ii. ইংরেজদের উন্নত যুদ্ধ কৌশল
iii. তিতুমীর কর্তৃক প্রচলিত অস্ত্রের ব্যবহার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩৯. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আশু লক্ষ্য ছিল— */সকল বোর্ড ২০১৮/*
i. ভারতীয়দের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন
ii. বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি
iii. সামরিক খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪০. বঙ্গভঙ্গের (১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দ) কারণ হলো— */সকল বোর্ড ২০১৮/*
i. প্রশাসনিক
ii. রাজনৈতিক
iii. ধর্মীয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪১. বঙ্গভঙ্গের উদ্দেশ্য ছিল— */সকল বোর্ড ২০১৫/*
i. ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন দমন
ii. পূর্ব বাংলার উন্নয়ন সাধন
iii. ইংরেজ শাসন দীর্ঘস্থায়ীকরণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪২. খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল— */সকল বোর্ড ২০১৮/*
i. ভারতের স্বাধীনতা অর্জন
ii. তুরস্কের অখণ্ডতা রক্ষা
iii. বিদেশি পণ্য বর্জন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ৪৩ ও ৪৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

বালিয়াটির বাজারটির মালিকানা বংশানুক্রমিকভাবে বালিয়াটির জমিদারদেরই ছিল। একপর্যায় ঢাকার ব্যবসায়ীরা বাজারের ইজারা নিয়ে ইচ্ছেমতো খাজনা আদায় করতে থাকে। কিন্তু বাজার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নামে মাত্র জমিদারদের দুর্বল উত্তরাধিকারীদেরই পালন করতে হয়। */সকল বোর্ড ২০১৫/*

৪৩. উদ্দীপকে ঢাকার ব্যবসায়ীদের আচরণের সাথে বাংলার কোন বিদেশিদের আচরণগত সাদৃশ্য রয়েছে?
ক. পর্তুগিজ খ. ফরাসি
গ. দিনেমার ঘ. ইংরেজ

৪৪. উক্ত ইজারা লাভের ফলে ইতিহাসের আলোকে যা ঘটেছিল তা হলো—
i. নবাবের ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছিল
ii. ব্রিটিশ প্রভুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল
iii. মুঘল শাসনের অবসান ঘটেছিল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪৫ ও ৪৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

জুমার নামাজের খুৎবায় ইমাম সাহেব মুসল্লিদেরকে সঠিকভাবে ধর্মচর্চার মাধ্যমে ইসলাম কর্তৃক অবশ্য পালনীয় কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করার পরামর্শ দেন। */সকল বোর্ড ২০১৯/*

৪৫. উদ্দীপকে বাংলার কোন সংস্কারকে ইঙ্গিত করা হয়েছে?
ক. তিতুমীর খ. বেগম রোকেয়া
গ. আবদুল লতিফ ঘ. হাজি শরীয়তউল্লাহ

৪৬. উক্ত সংস্কারকের আন্দোলনের মূলে ছিল-
i. অনৈসলামিক রীতিনীতি পরিহার
ii. ইসলামকে কুসংস্কারমুক্ত করা
iii. মুসলিম সমাজকে আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪৭ ও ৪৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

জলিল মিসর থেকে ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করেন। দেশে ফিরে তিনি ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। হাসান তার সাথে যুক্ত হয়ে এটিকে রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ দেয়। */সকল বোর্ড ২০১৮/*

৪৭. উদ্দীপকের জলিল ও হাসানের আন্দোলনের সাথে মিল পাওয়া যায়—
ক. তিতুমীর ও গোলাম মাসুম
খ. হাজি শরীয়তউল্লাহ ও দুদু মিয়া
গ. তিতুমীর ও মিসকিন শাহ
ঘ. দুদু মিয়া ও গাজিউদ্দিন হায়দার

৪৮. এ আন্দোলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল—
i. ইসলামের শুদ্ধিকরণ
ii. মুসলমানদের রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কার সাধন
iii. বিধর্মীদের ইসলামি ভাবাদর্শে আকৃষ্ট করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ৪৯ ও ৫০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

আড়াইহাজার উপজেলার ভূমি মহাজনেরা কৃষকদের ধান চাষের পরিবর্তে আখ চাষে বাধ্য করে। এ বাধ্যতা স্বীকার না করলে তাদের অত্যাচার ও নির্যাতনের ফলে কৃষকদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। এমন অবস্থায় জহির হোসেন ভূমি মহাজনদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য কৃষকদের সংগঠিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। */সকল বোর্ড ২০১৬/*

৪৯. জহির হোসেনের সাথে বাংলার কোন বীরের কর্ম প্রচেষ্টার সাদৃশ্য দেখা যায়?

ক. হাজি শরীয়তউল্লাহ   খ. দুদু মিয়া
গ. ফকির মজনু শাহ   ঘ. তিতুমীর

৫০. কৃষকদের পক্ষে উক্ত বীরের কর্ম প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে—

i. কৃষকেরা প্রতিবাদী শক্তিতে পরিণত হয়
ii. কৃষকদের প্রতি নির্যাতন বন্ধ হয়
iii. জমিদারদের ধ্বংস নিশ্চিত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i   খ. i ও ii
গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ৫১ ও ৫২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে লন্ডন থেকে ফিরে এসে সবুজ ভূঁইয়া সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে কুসংস্কার ও গোঁড়ামি পরিত্যাগ করে বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা গ্রহণের আহ্বান জানান। এ লক্ষ্যে তিনি একটি ক্লাব গঠন করেন। এর মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করার চেষ্টা চালান। *[সকল বোর্ড ২০১৭]*

৫১. উদ্দীপকের সবুজ ভূঁইয়ার কার্যাবলিতে কোন সংস্কারকের কর্মকাণ্ডের প্রভাব পড়েছে?

ক. সৈয়দ আহমদ খান
খ. নবাব আবদুল লতিফ
গ. হাজি মুহম্মদ মোহসিন
ঘ. সৈয়দ আমীর আলী

৫২. উক্ত সংস্কারকের কর্মকাণ্ডে প্রকাশ পেয়েছে—

i. সহমর্মিতা
ii. বিদ্যোৎসাহিতা
iii. স্বজনপ্রীতি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii   খ. i ও iii
গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

উত্তরমালা

১	গ	২	ক	৩	ক	৪	গ	৫	ক	৬	গ	৭	গ	৮	ঘ	৯	ঘ	১০	গ	১১	গ	১২	খ
১৩	গ	১৪	ঘ	১৫	ক	১৬	ক	১৭	খ	১৮	ঘ	১৯	ক	২০	ক	২১	ক	২২	খ	২৩	গ	২৪	গ
২৫	গ	২৬	গ	২৭	ক	২৮	ক	২৯	গ	৩০	ঘ	৩১	খ	৩২	ঘ	৩৩	ক	৩৪	খ	৩৫	ক	৩৬	খ
৩৭	ক	৩৮	গ	৩৯	ক	৪০	ঘ	৪১	খ	৪২	ঘ	৪৩	ঘ	৪৪	ঘ	৪৫	ঘ	৪৬	ঘ	৪৭	খ	৪৮	ক
৪৯	ঘ	৫০	ক	৫১	খ	৫২	ক																

গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠনের কারণ ব্যাখ্যা করো।
২. বাণিজ্য কুঠি সম্পর্কে ধারণা দাও।
৩. ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিওয়ানি লাভের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো।
৪. বাংলায় লর্ড ক্লাইভের দ্বৈতশাসন প্রবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করো।
৫. ফরায়েজি আন্দোলনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করো।
৬. ফরায়েজি আন্দোলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।
৭. তিতুমীরের পরিচয় দাও।
৮. তিতুমীরের আন্দোলনের স্বরূপ বা প্রকৃতি ব্যাখ্যা করো।
৯. ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহকে মহাবিদ্রোহ বলার কারণ ব্যাখ্যা করো।
১০. মুসলমানদের রাজনৈতিক জাগরণে সৈয়দ আমীর আলীর ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।

ঘ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. 'পার্ল ও এন্টিলিজ' খ্যাত কিউবা প্রায় ১৪৯২ সাল থেকে দীর্ঘ চারশত বছর স্পেনের ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে ছিল। স্পেনীয় ঔপনিবেশিক শাসকেরা দেশটির শাসনব্যবস্থায় এক নতুন শাসনপদ্ধতির সূচনা করেছিল, যেখানে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, ফৌজদারি বিচার ও শান্তি রক্ষার দায়িত্ব স্থানীয়দের হাতে ন্যস্ত ছিল। আর রাজস্ব আদায়, জমিজমা সম্পর্কিত বিষয়াদির বিচারের দায়িত্ব ঔপনিবেশিক শাসকদের হাতে ন্যস্ত হয়। এভাবে কিউবার অর্থনীতি ও রাজনীতিতে স্পেনীয় ঔপনিবেশিক শাসনের একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

ক. পলাশির যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়?
খ. পলাশির যুদ্ধে নবাবের পরাজয়ের কারণ কী ছিল? ব্যাখ্যা করো।
গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে ব্রিটিশ শাসনামলের কোন বিষয়ের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকে উক্ত বিষয়ের প্রভাবগত সার্বিক দিক ফুটে উঠেছে কি? মতামত দাও।

২. উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে জামাল উদ্দিন আফগানির আবির্ভাব মুসলিম বিশ্বের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি মিসর থেকে শুরু করে পারস্য পর্যন্ত সারা মুসলিম জাহান ভ্রমণ-করেন এবং বিভিন্ন অনাচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করেন। একই সাথে বিদেশি আগ্রাসন থেকে মুসলিম জাহানকে রক্ষা করার জন্য ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান। অবশ্য কোনো কোনো মুসলিম রাষ্ট্র তার এ প্রচেষ্টাকে সন্দেহের চোখে দেখতো। তারপরেও তার প্রচেষ্টায় তৎকালীন মুসলিম বিশ্বে তিনি ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেন।

ক. 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' কত বঙ্গাব্দে হয়েছিল?
খ. 'স্বত্ববিলোপ নীতি' কী? ব্যাখ্যা করো।
গ. জামাল উদ্দিন আফগানির কর্মতৎপরতার সাথে কোন ব্যক্তির আন্দোলনের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উক্ত ব্যক্তির আন্দোলন সংস্কারবাদী হলেও পরবর্তীকালে তা ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের প্রেরণা হিসেবে কাজ করে— বিশ্লেষণ করো।

৩. ১৮৯৮ সালের সংস্কার আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই চীন এক ব্যাপক গণবিদ্রোহের সম্মুখীন হয়েছিল। এই গণবিদ্রোহ 'বক্সার বিদ্রোহ' নামে পরিচিত। প্রথম চীন-জাপান যুদ্ধের (১৮৯৪-১৮৯৫ খ্রি.) পর যখন বিদেশি শক্তিগুলো নিজেদের স্বার্থে চীনের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট করতে তৎপর হয়, তখন বিদেশিদের অপসারণের জন্য বক্সার নামে একটি গুপ্ত সমিতি আন্দোলন করে। উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে চীনের এ আন্দোলন শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়।

ক. তিতুমীরের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন কে?
খ. তিতুমীরের বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছিল কেন?
গ. উদ্দীপকের বক্সার বিদ্রোহের সাথে তিতুমীরের বিদ্রোহের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো।
ঘ. ইতিহাসে উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম জনগণের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষারই সাক্ষ্য বহন করে— উদ্দীপক ও পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

৪. ইনসান আলি বাল্যকাল থেকে সাহসী, মেধাবী ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন। পরাধীন দেশে স্বজাতির নানা অসংগতি দেখে তিনি ব্যথিত হন। বিদেশি শাসকগোষ্ঠীর শোষণে ও অত্যাচারে তিনি প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন। জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে তিনি বিদেশি শক্তির বিনাশে সশস্ত্র সংগ্রামে জড়িয়ে পড়েন। তিনি স্বদেশকে পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তির লক্ষ্যে দলবলসহ জীবনের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে লড়াই চালিয়ে যান। তার এ সংগ্রাম ব্যর্থ হলেও পরবর্তী প্রজন্মকে স্বাধীনতার চেতনায় উদ্দীপ্ত করে। *[সকল বোর্ড ২০১৮]*

ক. আরবি কোন শব্দ থেকে 'ফরায়েজি' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে?
খ. ফরায়েজি আন্দোলন ব্যর্থ হয় কেন?
গ. উদ্দীপকের চরিত্রের সাথে উনবিংশ শতকের বাংলার কোন নেতার মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত নেতার সংগ্রামী জীবনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

৫. সমাজ উন্নয়ন ও শিক্ষার মান উন্নয়নের অগ্রপথিক খান বাহাদুর আহছান উল্লাহ মুসলিম শিক্ষার বিপুল সংস্কার সাধন করেন। তিনি মাদ্রাসা শিক্ষার মান উন্নীত করে মাদ্রাসা-ছাত্রদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ করে দেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'History of the Muslim World' (১৯১৩) মুসলমান লেখকদের উৎসাহিত করে। 'আহছানিয়া মিশন' তার প্রতিষ্ঠিত একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

ক. কার নেতৃত্বে ফরায়েজি আন্দোলন গড়ে ওঠে?
খ. ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ কী ছিল? ব্যাখ্যা করো।
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত ব্যক্তির সাথে কোন শিক্ষা সংস্কারকের মিল রয়েছে? নিরূপণ করো।
ঘ. খান বাহাদুর আহছান উল্লাহর প্রতিষ্ঠিত সংগঠনটির সাথে উক্ত সংস্কারকের প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের উদ্দেশ্যগত সাদৃশ্য রয়েছে কি? বিশ্লেষণ কর।

৬. জ্ঞানান্বেষী হাজি আহমদ তার এলাকায় শিক্ষার সুযোগ তৈরি ও শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে এবং জনহিতকর কাজে ব্যয়ের উদ্দেশ্যে নিজের বিশাল সম্পত্তি ওয়াকফ করে দেন। এ ওয়াকফকৃত সম্পত্তি থেকে শিক্ষা বিস্তারের জন্য ফান্ড গঠন করা হয়। তার এ উদ্যোগে গরিব ও মেধাবী ছাত্ররা শিক্ষার সুযোগ পায় এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মিত হয়।

ক. তিতুমীরের প্রকৃত নাম কী ছিল?
খ. মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি কী? ব্যাখ্যা করো।
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত হাজি আহমদের কর্মকাণ্ডের সাথে কোন বিখ্যাত দাতার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা দাও।
ঘ. 'সমাজের উন্নয়নে উক্ত দাতার দান অতুলনীয়'— পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

৭. বাসির উদ্দিন মোল্লা অগাধ ধন-সম্পত্তির মালিক ছিলেন। কিন্তু তিনি অপুত্রক হওয়ায় তার সমস্ত সম্পত্তি মৃত্যুর পূর্বে মেয়ের জামাই হারুন মিয়াকে উইল করে দিয়ে যান। হারুন মিয়া চরাঞ্চলের একজন উচ্চ শিক্ষিত মানুষ হলেও তার এলাকায় কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। তাই হারুন মিয়া প্রাপ্ত অর্থ ব্যয়ে শ্বশুরের নামে একটি কলেজ, মায়ের নামে একটি মাদ্রাসা এবং নিজের নামে একটি স্কুল অত্র-এলাকায় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি গরিব ও মেধাবী ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনার জন্য বৃত্তিরও ব্যবস্থা করেন। *[সকল বোর্ড ২০১৫]*

ক. হাজি মুহম্মদ মোহসিনের পূর্বপুরুষেরা কোথাকার অধিবাসী ছিলেন?

খ. ঔপনিবেশিক যুগে বাংলার মুসলিম সমাজে শিক্ষা সংস্কার প্রয়োজন হয়েছিল কেন? ব্যাখ্যাসহ লেখো।

গ. উদ্দীপকের বাসির উদ্দিন মোল্লার সাথে হাজি মুহম্মদ মোহসিনের কোন আত্মীয়ের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে হারুন মিয়ার কর্মকাণ্ডের আলোকে হাজি মুহম্মদ মোহসিনের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করো।

৮. সৌদি আরবে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন মুহম্মদ বিন আবদুল ওহাব। মুসলিম সমাজে পিরপূজা, কবরপূজা, কোনো উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য মানত প্রভৃতি যে কুসংস্কার প্রচলিত ছিল; তিনি সেগুলোর তীব্র নিন্দা করেন। পিরপূজা, পির-দরবেশদের কবর দর্শন প্রভৃতি তিনি নিষিদ্ধ করেন। তার পরিচালিত এ আন্দোলন 'ওহাবি আন্দোলন' নামে পরিচিত ছিল। মুহম্মদ বিন আব্দুল ওহাব তার এ আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি তৎকালীন আরব সমাজকে নানা কুসংস্কার থেকে মুক্ত করেন এবং মানুষকে ধর্মীয় ও রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তোলেন।

ক. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কত খ্রিষ্টাব্দে দেওয়ানি লাভ করে?

খ. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভের প্রভাব কীরূপ ছিল?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সমাজ সংস্কারকের সাথে কোন সমাজ সংস্কারকের মিল লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. তুমি কি মনে কর, উদ্দীপকের সংস্কার আন্দোলন এবং উক্ত সংস্কারকের সংস্কার আন্দোলন এক ও অভিন্ন উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়েছে? যৌক্তিক মত দাও।

৯. ফরহাদ চৌধুরী একজন সমাজপতি। তিনি তার এলাকায় একটি সাহিত্য সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। নানা জায়গা থেকে তার সমিতিটিতে জ্ঞানী-গুণীজন আসতে থাকেন। তাদের নাতিদীর্ঘ আলোচনায় এলাকার বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার দূর হতে থাকে। নানা সমস্যার সমাধান হয়। এছাড়া শিক্ষা-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সমিতি কার্যকর ভূমিকা রাখতে থাকে। এর কল্যাণে পশ্চাৎপদ এলাকাটি ধীরে ধীরে সংস্কৃতিবান হয়ে ওঠে। *[সকল বোর্ড ২০১৯]*

ক. নবাব আব্দুল লতিফ কত সালে 'নবাব' উপাধি পান?

খ. খেলাফত আন্দোলন কী? ব্যাখ্যা করো।

গ. ফরহাদ চৌধুরীর সাহিত্য-সমিতির সাথে উনিশ শতকের কোন সাহিত্য সমিতির মিল লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উক্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা বাংলার মুসলিম জাগরণের অগ্রদূত— যুক্তি সাপেক্ষে প্রমাণ করো।

১০. বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জার্মানির পশ্চিমাঞ্চলের জনগণের চেয়ে পূর্বাঞ্চলের জনগণ অনুন্নত ও অবহেলিত ছিল। পশ্চিমাঞ্চলের শাসকগোষ্ঠীর বৈরী মনোভাব আর পূর্বাঞ্চলের জনগণের কল্যাণ ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে পূর্ব জার্মানি ও পশ্চিম জার্মানি নামে দুটি পৃথক রাষ্ট্র জন্ম লাভ করে। এ বিভক্তির ফলে উভয় দেশের জনগণের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। জনগণের একটি অংশ এ বিভক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। অবশেষে প্রবল আন্দোলনের মুখে দুই জার্মানিকে পুনরায় একত্রীকরণ করা হয়। *[সকল বোর্ড ২০১৬]*

ক. বেঙ্গল প্যাক্ট কী?

খ. খেলাফত আন্দোলনের উদ্দেশ্য কী ছিল? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দুই জার্মানির বিভক্তি ব্রিটিশ বাংলার কোন ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. জার্মানির পুনরায় একত্রীকরণ ও উক্ত ঘটনার পরিণতি কি একই ছিল?

১১. পশ্চিম আফ্রিকায় অবস্থিত বেনিন একসময় ফরাসি ঔপনিবেশিক শাসনে চরম বৈষম্য ও শোষণের শিকার হয়েছিল। দেশটিতে বিভিন্ন ধর্মের, বিভিন্ন ভাষাভাষী ও নৃগোষ্ঠীর মানুষের বসবাস। দেশটির মানুষ যখন ঔপনিবেশিক শোষণের হাতিয়ারে পরিণত হচ্ছিল তখন জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে একই সূত্রে গ্রোথিত করে আন্দোলনের ডাক দেন হুবার্ট মাগা। এ আন্দোলনের মূল বিষয়ই ছিল ফরাসিদের সহযোগিতার নীতি বর্জন করা এবং ফরাসি সরকারের অধীনে চাকরি, ব্যবসা ইত্যাদি বর্জন করে সংঘাতহীন বিপ্লব গড়ে তোলা। এ বিপ্লবের পথ ধরে অবশেষে ১৯৬০ সালে বেনিনে স্বাধীনতার সূর্য উদিত হয়েছে।

ক. কত সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়েছিল?

খ. বঙ্গভঙ্গ রদে মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া কীরূপ ছিল?

গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে কোন আন্দোলনের গতি-প্রকৃতির মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের আন্দোলন এবং উক্ত আন্দোলনের ফলাফল কি একই ধারায় প্রবাহিত হয়েছে? তোমার মতামত দাও।

১২. দক্ষিণ আফ্রিকার রাজনৈতিক দল হিসেবে ১৯১২ সালে প্রতিষ্ঠিত African National Congress বেশ জনপ্রিয়। দলটি দক্ষিণ আফ্রিকার রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অঙ্গনে এক ঐক্যের ঐকতান সৃষ্টি করেছে। বর্ণবাদের করাল গ্রাস থেকে দেশটিকে প্রশান্তির হিমশৈলীতে পরিণত করেছে দলটি। তাছাড়া জাতিগত সংঘাত নিরসন করে আফ্রিকান জাতীয়তাবাদের সমসুর তৈরিতে দলটির অবদান দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষ চিরকাল স্মরণ রাখবে।

ক. লন্ডন মুসলিম লীগ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?

খ. 'সৈয়দ আমীর আলী ছিলেন মুসলিম রেনেসাঁর অগ্রদূত'— বুঝিয়ে লেখো।

গ. উদ্দীপকের দলটির সাথে কোন রাজনৈতিক দলের মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. মিল থাকলেও উদ্দীপকের দলটির চেয়ে উক্ত দলের প্রতিষ্ঠা ছিল এক দীপ্তিময় ঘটনা— বিশ্লেষণ করো।

১৩. দেশটি বহু বর্ণে, ধর্মে ও জাতিতে বিভক্ত ছিল। ফলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পক্ষে ঐ দেশে শাসন-শোষণ খুবই সহজ ছিল। একপর্যায়ে দেশের মানুষ ক্রমেই স্বাধীনতার জন্য উন্মুখ হয়ে পড়ে। একটি রাজনৈতিক দলের নেতা ধর্মের ওপর ভিত্তি করে এক ঐতিহাসিক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি পরবর্তী সময়ে কিছুটা সংশোধিত হয়ে প্রকাশিত হওয়ার পর দেশব্যাপী ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। শেষ পর্যন্ত উক্ত প্রস্তাবের ভিত্তিতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বিদায় নেয়। দেশটি বিভক্ত হয়ে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্রে আত্মপ্রকাশ করে। *[সকল বোর্ড ২০১৮]*

ক. দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রবর্তক কে?

খ. খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হয় কেন?

গ. উদ্দীপকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক প্রস্তাব কোনটি? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত প্রস্তাবের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো।

ঙ. সমন্বিত অধ্যায়ের সৃজনশীল প্রশ্ন

১৪. মুঘল সম্রাট আকবর ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের সমর্থন লাভের জন্য তিনি একটি বিশেষ কর রহিত করেন। তার পরবর্তী একজন মুঘল সম্রাট উক্ত কর পুনরায় আরোপ করায় সম্রাজ্যে নানা বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। ফলে ভারতে মুঘল শাসন দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ে। এ সুযোগে ভারতে বাণিজ্য করতে আসা ইংরেজ বণিকগোষ্ঠী এদেশের শাসনক্ষমতা দখল করে। তাদের শাসনামলে সংঘটিত একটি বিদ্রোহের কারণে ভারতে মুঘল রাজবংশের চূড়ান্ত পতন ঘটে এবং ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। *◀ সমন্বিত অধ্যায় ৩ ও ৪*

ক. মনসবদারি প্রথা কে চালু করেন?

খ. বঙ্গভঙ্গের রাজনৈতিক কারণ কী? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে সম্রাট আকবর পরবর্তী কোন মুঘল সম্রাটকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ইংরেজ শাসনামলের একটি বিদ্রোহ ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো।

১৫. জনাব হাকামের শাসনকাল পর্যন্ত শান্তিনগর সাম্রাজ্য সুসংহত ছিল। তার পরবর্তী শাসকেরা ছিলেন দুর্বল এবং অদক্ষ। এছাড়া শান্তিনগর সাম্রাজ্যে সুষ্ঠু উত্তরাধিকার নীতির অভাব ছিল। ফলে উত্তরাধিকারীদের ক্ষমতার দ্বন্দ্বে সাম্রাজ্যের ভিত দুর্বল হয়ে পড়ে। দুর্বল ও বিলাসপ্রিয় শাসকদের বিলাসিতা, নিজেদের পরিবারকে পারিতোষিক প্রদান ও স্থাপত্য শিল্পে অর্থ ব্যয়ে রাজকোষ শূন্য হয়ে পড়ে। এ সুযোগে পার্শ্ববর্তী রাজ্য বিজয়নগর থেকে বাণিজ্য করতে আসা একটি বণিক গোষ্ঠী শান্তিনগরে প্রভাব বিস্তার করে। একপর্যায় উক্ত বণিকগোষ্ঠীর হাতে শান্তিনগরের শাসনক্ষমতা চলে যায়। তাদের নানা বৈষম্যমূলক নীতির প্রেক্ষিতে শান্তিনগরে এক মহাবিদ্রোহ সংঘটিত হয়। *◀ সমন্বিত অধ্যায় ৩ ও ৪*

ক. হিমু কে ছিলেন?

খ. সম্রাট আওরঙ্গজেবকে 'জিন্দাপির' বলা হয় কেন?

গ. উদ্দীপকে মুঘল সাম্রাজ্য পতনের কোন কারণগুলো ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. তুমি কি মনে কর, শান্তিনগরের মহাবিদ্রোহ এবং ভারতবর্ষের সিপাহি বিদ্রোহ সংঘটিত হওয়ার কারণ একই রকম? যৌক্তিক মতামত দাও।

১৬. আনিসুর রহমান একজন মুঘল সম্রাটকে নিয়ে একটি উপন্যাস লিখেছেন। সম্রাট একজন সুন্নি মুসলমান এবং ধর্মান্ধ। তিনি ইসলামি আচার-আচরণ বিরোধী উৎসবাদি বন্ধ করেন। তিনি নতুন মন্দির নির্মাণ নিষিদ্ধ করেন এবং অনেক হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেন। অমুসলিমদের ওপর তিনি জিজিয়া কর পুনঃপ্রবর্তন করেন। *◀ সমন্বিত অধ্যায় ৩ ও ৪*

ক. রাজমহলের যুদ্ধে সম্রাট আকবর কাকে পরাজিত করেছিলেন?

খ. সম্রাট শাহজাহান তাজমহল নির্মাণ করেছিলেন কেন?

গ. আনিসুর রহমান কোন মুঘল সম্রাটের জীবনকাহিনি নিয়ে উপন্যাস রচনা করেছেন? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের সম্রাট ও ফরায়েজি আন্দোলনের নেতা হাজি শরীয়তউল্লাহর ধর্মনিষ্ঠার তুলনামূলক আলোচনা করো।

১৭. পানিপথের প্রথম যুদ্ধের মাধ্যমে ভারতবর্ষে একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। উক্ত রাজবংশের শাসনামলে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল খুবই সন্তোষজনক। এই আমলে ব্যবসা-বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি ঘটে। তবে তাদের শাসনের মাঝামাঝি সময়ে এ. দেশে বাণিজ্য করতে আসা বিদেশি বণিকদের অপতৎপরতায় বাংলা তথা ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক জীবন দারুণভাবে বিপর্যস্ত হয়। *◀ সমন্বিত অধ্যায় ৩ ও ৪*

ক. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কত খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয়?

খ. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে প্রদত্ত ফররুখ শিয়রের ফরমানকে 'মহাসনদ' বলে অভিহিত করা হয় কেন?

গ. উদ্দীপকে কোন শাসনামলের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি সম্পর্কে বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিদেশিদের অপতৎপরতায় কীভাবে বাংলা তথা ভারতবর্ষের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়? বিশ্লেষণ করো।

৫

বাংলার ইতিহাস (পাকিস্তান আমল)

History of Bengal (Pakistan Period)

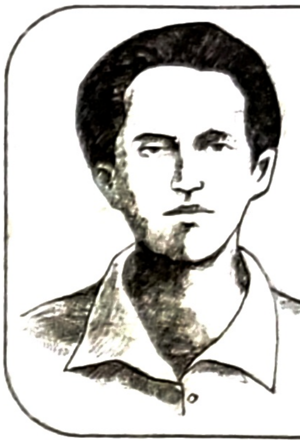
ভাষা আন্দোলনে আত্মদানকারী
প্রথম শহিদ রফিকউদ্দিন আহমদ

প্রধান প্রধান শব্দ

- বাংলা ভাষা
- তমদ্দুন মজলিশ
- ভাষা আন্দোলন
- ১৪৪ ধারা
- জাতীয়তাবাদ
- সাম্প্রদায়িকতা
- যুক্তফ্রন্ট
- ছয় দফা
- গণঅভ্যুত্থান

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ঘোষিত দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালির প্রতি বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করে। জনসংখ্যার দিক দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব বাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানিরা রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চরম বৈষম্যের শিকার হয়। পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালির স্বতন্ত্র অধিকারের দাবির প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে। কয়েক বছর ধরে চলা ভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে ১৯৫২ সালে। এ বছর ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষার দাবিতে ছাত্র সমাজ সরকারের জারি করা ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে ঢাকার রাজপথে মিছিল বের করে। পুলিশ মিছিলে গুলি চালালে মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান ভাষা আন্দোলনের প্রথম শহিদ রফিকউদ্দিন আহমদ। এছাড়া এ আন্দোলনে বরকত, শফিউর, জব্বার, সালাম প্রমুখের আত্মত্যাগের বিনিময়ে ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়। এরপর স্বাধিকারের প্রশ্নে একে একে সংঘটিত হয় শিক্ষা আন্দোলন, ছয় দফা ও এগারো দফা আন্দোলন এবং ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান। ফলে পাকিস্তানি শাসনযন্ত্রের ভিত কেঁপে ওঠে। কিন্তু এরপরও ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় অর্জন সত্ত্বেও ক্ষমতা হস্তান্তর না করে বাঙালির ওপর চালানো হয় নির্বিচার গণহত্যা। তাই বাধ্য হয়ে বাঙালি জাতি ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটায়।

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখব

- ভাষা আন্দোলন: বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ
- ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন
- পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক নীতি
- ঐতিহাসিক ছয় দফা ও এর গুরুত্ব
- ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা (১৯৬৮)
- উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান

পাঠ পরিকল্পনা

পাঠ ১ ও ২	ভাষা আন্দোলনের পটভূমি এবং গতি-প্রকৃতি
পাঠ ৩	একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনা ও প্রতিক্রিয়া
পাঠ ৪	বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষে ভাষা আন্দোলনের ভূমিকা
পাঠ ৫ ও ৬	১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন
পাঠ ৭	১৯৫৪ সালের নির্বাচনের ফলাফল, গুরুত্ব ও তাৎপর্য
পাঠ ৮	১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয় ও মুসলিম লীগের পরাজয়ের কারণ
পাঠ ৯ ও ১০	পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বৈষম্য
পাঠ ১১	পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্য
পাঠ ১২	পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার সামরিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্য
পাঠ ১৩	ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবির পটভূমি
পাঠ ১৪ ও ১৫	ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবিসমূহ, প্রতিক্রিয়া এবং ছয় দফার গুরুত্ব ও তাৎপর্য
পাঠ ১৬	আগরতলা মামলা (১৯৬৮)
পাঠ ১৭	আগরতলা মামলার বিচার প্রক্রিয়া এবং এর ফলাফল ও গুরুত্ব
পাঠ ১৮	উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের পটভূমি, কারণ এবং লক্ষ্য
পাঠ ১৯ ও ২০	উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের ঘটনাবলি, ফলাফল ও গুরুত্ব

পাঠ ১ ও ২

ভাষা আন্দোলনের পটভূমি এবং গতি-প্রকৃতি
Background and Trends of the Language Movement

ভাষা আন্দোলনের পটভূমি (Background of the Language Movement)

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাসে ভাষা আন্দোলন একটি অনন্য ঐতিহাসিক ঘটনা। বস্তুত ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পর তৎকালীন পূর্ব বাংলায় যেসব রাজনৈতিক আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল তার মধ্যে ভাষা আন্দোলন ছিল সবচেয়ে ব্যাপক, তীব্র ও তাৎপর্যপূর্ণ। এ আন্দোলন বাংলার মানুষকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা ও স্বাধিকার দাবির মন্ত্রে উজ্জীবিত করে। এ চেতনাই ধীরে ধীরে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের পথ তৈরি করে।

পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষা নিয়ে বিতর্ক: ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরপরই এর রাষ্ট্রভাষা কী হবে— এ নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। পাকিস্তান ছিল একটি বহুভাষী রাষ্ট্র। ১৯৫১ সালে এর মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৬.৪০ ভাগের মাতৃভাষা ছিল বাংলা। পক্ষান্তরে মোট জনসংখ্যার শতকরা মাত্র ৩.২৭ ভাগ ছিল উর্দুভাষী।[১] এ হিসেবে বাংলা ছিল দেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা। এ কারণে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার মর্যাদা লাভ ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং উর্দুভাষী বুদ্ধিজীবীরা উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা হিসেবে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণার দাবি উপেক্ষা করা হয়। ফলে সদ্য স্বাধীন পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষাকে কেন্দ্র করে বিতর্কের শুরু হয়।

উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার পেছনে শাসকগোষ্ঠীর উদ্দেশ্য: বহু ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির জন্য একটি ভাষাকে পাকিস্তানের সাধারণ ভাষা (Common Language) ও রাষ্ট্রভাষা করার প্রয়োজন ছিল। এক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা হিসেবে বাংলাকেই রাষ্ট্রভাষা করা যৌক্তিক ছিল। কিন্তু তা না করে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর এরূপ অন্যায়ের পেছনে তাদের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক উদ্দেশ্য ছিল। পাকিস্তানের শাসনভার যে রাজনীতিবিদ ও আমলাদের হাতে ছিল, তাদের অধিকাংশই ছিলেন উত্তর ভারত থেকে আসা উর্দুভাষী। নতুন রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান বণিকগোষ্ঠীও ছিল উর্দুভাষী। কাজেই পাকিস্তানের ভাগ্যনিয়ন্তা বলে কথিত রাজনীতিবিদ, আমলা ও ব্যবসায়ীরা নিজেদের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক ক্ষমতার প্রাধান্য বজায় রাখতে তাদের ভাষা উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করে। তাছাড়া উর্দুভাষী পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী মনে করত বাংলা হচ্ছে হিন্দুদের ভাষা। তারা মনে করতেন, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিলে পূর্ব বাংলার বাঙালিরা পশ্চিম বাংলার বাঙালিদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ভবিষ্যতে বৃহত্তর বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি করতে পারে। তাই পূর্ব বাংলার বাঙালিকে নত করে রাখার জন্য পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী প্রথমেই তাদের ভাষার ওপর আঘাত হানে। এভাবে তারা বাঙালি জাতিকে সাংস্কৃতিক দিক থেকে পঙ্গু করার অপচেষ্টা শুরু করে।

ভাষা আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি (Trends of The Language Movement)

পূর্ব বাংলায় প্রাথমিক প্রতিবাদ: উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার অন্যায় সিদ্ধান্ত পশ্চিম পাকিস্তানের লোকেরা বিনা প্রতিবাদেই মেনে নেয়। কেননা, তাদের মধ্যে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে উর্দু চর্চা থাকায় এতে তাদের কোনো সমস্যা ছিল না। প্রশাসনিক সদর দপ্তরসহ রাষ্ট্রীয় শিল্পকারখানা, ব্যাংক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান পশ্চিম পাকিস্তানে হওয়ায় এমনিতেই তারা সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল। কিন্তু সমস্যা ছিল পূর্ব বাংলার বাঙালি জনগোষ্ঠীর। তারা একে তাদের জাতিসত্তা এবং সামগ্রিক সংস্কৃতির ওপর আঘাত বলে মনে করে। তাদের আশঙ্কা হয় যে, বাঙালি জাতিসত্তাকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র হিসেবেই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে রাজি হচ্ছে না। এর পেছনে বাঙালি জাতির অর্থনৈতিক ক্ষতিরও প্রবল আশঙ্কা ছিল। পূর্ব বাংলায় বিকাশমান মধ্যবিত্তশ্রেণি ভাষাজনিত সমস্যায় সরকারি চাকরি ও

---

[১] অন্যান্য ভাষার মধ্যে ছিল পাঞ্জাবি ২৮.৫৫%, পশতু ৩.৪৮%, সিন্ধি ৫.৪৭%, বেলুচ ১.২৯% এবং ইংরেজি ও অন্যান্য ১.৫৪%। সূত্র: ড. মো. মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস, ১৯৪৭-৭১, পৃ.৮৬*

অন্যান্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা করে। তাছাড়া রাজনৈতিক সুবিধাবঞ্চিত পূর্ব বাংলার মানুষ আরো বঞ্চনার আশঙ্কায় আতঙ্ক বোধ করে। এরূপ বাস্তবতায় উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে তৎকালীন পূর্ব বাংলায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। পাকিস্তান সৃষ্টির আগে থেকেই শিক্ষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহসহ বুদ্ধিজীবীমহলের পক্ষ থেকে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানানো হয়। কিন্তু এ বিষয়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অনমনীয় মনোভাব বজায় থাকে। অপরদিকে, স্বাধীন পাকিস্তানের অভ্যুদয়ের সাথে সাথে প্রতিবাদী কণ্ঠ শোনা যায় ১৯৪৭ সালের ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান যুবকর্মী সম্মেলনে। এ সম্মেলনে দাবি করা হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষার মাধ্যম এবং অফিস ও আইন- আদালতের ভাষা হবে বাংলা।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও তমদ্দুন মজলিশ: ১৯৪৭ সালে কামরুদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে গঠিত গণআজাদী লীগ 'মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের' দাবি জানায়। একই বছরের ১ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আবুল কাশেমের উদ্যোগে ঢাকায় 'তমদ্দুন মজলিশ' নামে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্বে এ সংগঠন তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ সংগঠনের পক্ষ থেকে 'পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। এটি ছিল ভাষা আন্দোলনের প্রথম পুস্তিকা। অধ্যাপক আবুল কাশেম, ড. কাজী মোতাহার হোসেন এবং আবুল মনসুর আহমদ প্রণীত এ পুস্তিকায় উর্দুর সাথে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানানো হয়। ১৯৪৭ সালের ৫ ডিসেম্বর করাচিতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ করা হয়। এতে পূর্ব বাংলার ছাত্রসমাজ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ৬ ডিসেম্বর অধ্যাপক আবুল কাশেমের সভাপতিত্বে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ছাত্র সমাবেশে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানানো হয়। এদিকে ভাষা আন্দোলনকে সাংগঠনিক রূপ দেওয়ার জন্য তমদ্দুন মজলিশের উদ্যোগে ঢাকায় 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক নূরুল হক ভূঁইয়া এ পরিষদের আহ্বায়ক নির্বাচিত হন।

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ও ভাষা আন্দোলনের বিস্তার: ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি করাচিতে পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে পরিষদ সদস্যদের ইংরেজি অথবা উর্দুতে বক্তৃতা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়। পূর্ব পাকিস্তান কংগ্রেস দলের সদস্য কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেন। তিনি পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মাতৃভাষা বাংলাকে গণপরিষদের অন্যতম ভাষারূপে স্বীকৃতি দানের দাবি জানান। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানসহ মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং বাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন এ দাবি প্রত্যাখ্যান করলে পূর্ব বাংলার ছাত্র-শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীমহল প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠেন। মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম পরিচালনার উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালের ২ মার্চ পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও যুবসংগঠন মিলিতভাবে শামসুল আলমকে প্রধান আহবায়ক করে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয় এবং ১১ই মার্চ বাংলা ভাষা দিবস পালনের ঘোষণা করা হয়। এ পরিষদ বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ১১ মার্চ ঢাকায় সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগান দিয়ে রাজপথে মিছিল করার সময় পুলিশি আক্রমণে বহু ছাত্র আহত হন এবং বেশ কয়েকজন গ্রেফতার হন। এ ঘটনার প্রতিবাদে ১৩-১৫ মার্চ ঢাকাসহ সব জেলায় ধর্মঘট কর্মসূচি পালিত হয়। পরিস্থিতির চাপে বাধ্য হয়ে মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন ১৫ মার্চ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সাথে ৮ দফা দাবি সংবলিত একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। চুক্তিতে গ্রেফতারকৃত আন্দোলনকারীদের মুক্তি, পুলিশি অত্যাচারের তদন্ত করা, শিক্ষার মাধ্যম বাংলা করা এবং বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা সংক্রান্ত বিষয়টি ব্যবস্থাপক পরিষদের সভায় উত্থাপনের দাবি উল্লেখ ছিল।

গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ঢাকা সফর ও আন্দোলনের নতুন মাত্রা: ১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পূর্ব বাংলা সফরে আসেন। ২১ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক জনসভায় এবং ২৪ মার্চ কার্জন হলে অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে জিন্নাহ ঘোষণা করেন, 'উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা'। (Urdu and only Urdu Shall be the State language of Pakistan.) জিন্নাহর এ ঘোষণা পূর্ব বাংলায় তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। দুটি সমাবেশস্থলে উপস্থিত মানুষ তাৎক্ষণিকভাবে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। তাছাড়া ২৪ মার্চ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার যৌক্তিক দাবি তুলে ধরে জিন্নাহকে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। তবে জিন্নাহ এ ব্যাপারে কোনো ইতিবাচক মনোভাব দেখাননি।

ভাষা আন্দোলন (১৯৪৯-১৯৫১): জিন্নাহর ঢাকা ত্যাগ করার পর পূর্ব বাংলায় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। তবে ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে সরকার আরবি হরফে বাংলা লেখা চালুর চেষ্টা করে। সরকারের এ ঘৃণ্য প্রচেষ্টার প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা পাকিস্তান শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড ও বর্ণমালা বিশেষজ্ঞ কমিটির কাছে পাঠানো এক স্মারকলিপিতে বাংলা হরফ পরিবর্তন না করার দাবি জানায়। পূর্ব বাংলার প্রবল প্রতিবাদে সরকার আরবিতে বাংলা লেখার অপচেষ্টা থেকে নিবৃত্ত হয়। ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তান গণপরিষদের সাংবিধানিক মূলনীতি কমিটির রিপোর্টে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করা হয়। একই সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান গণপরিষদে প্রদত্ত ভাষণে 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' বলে ঘোষণা দেন। মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট এবং প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা পূর্ব বাংলায় প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি করে। ফলে গণপরিষদে ভাষার প্রশ্নে আলোচনা স্থগিত হয়ে যায়। তবে আন্দোলন থেমে থাকেনি। ভবিষ্যতে ভাষা আন্দোলন পরিচালনার উদ্দেশ্যে ১৯৫০ সালের ১১ই মার্চ ছাত্র নেতা আবদুল মতিনকে আহ্বায়ক করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয়।

ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্ব (১৯৫২): ১৯৫২ সালের শুরুতেই পূর্ব বাংলায় ভাষা আন্দোলন নতুন মাত্রা লাভ করে। ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি ঢাকার পল্টন ময়দানে জনসভায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন উর্দুকেই পাকিস্তানের একমাত্র 'রাষ্ট্রভাষা' হিসেবে ঘোষণা করেন। ফলে পুনরায় আন্দোলনে গতি সঞ্চারিত হয়। পূর্ব বাংলার বিক্ষুব্ধ জনতা নাজিমউদ্দীনের ঘোষণার প্রতিবাদে দেশব্যাপী ধর্মঘট ও হরতাল কর্মসূচি গ্রহণ করে। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগানে পুনরায় মুখরিত হয় রাজপথ। ১৯৫২ সালের ৩০ জানুয়ারি ঢাকায় ধর্মঘট পালিত হয়। ১৯৫২ সালের ৩১ জানুয়ারি মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে ঢাকা বার লাইব্রেরিতে অনুষ্ঠিত এক সভায় গোলাম মাহবুবকে আহ্বায়ক করে একটি সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের বাজেট অধিবেশন ছিল। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ঐ দিন রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন, সমগ্র পূর্ব বাংলায় হরতাল, জনসভা ও বিক্ষোভ কর্মসূচি গ্রহণ করে। সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে ৪ ফেব্রুয়ারি পূর্ব বাংলার সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। এসব কর্মকাণ্ডে ভয় পেয়ে সরকার আন্দোলন নস্যাতে দমন নীতি গ্রহণ করে। ১২ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের সমর্থক পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকা নিষিদ্ধ করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন ২০ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা জারি এবং মিছিল ও জনসভা নিষিদ্ধ করেন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সকাল ১১ টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলার সভা জনসমুদ্রে পরিণত হয় এবং অবশেষে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. স্বাধীন পাকিস্তানে প্রথম কী নিয়ে বিতর্কের শুরু হয়?
২. পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার শতকরা কত ভাগের মাতৃভাষা ছিল বাংলা? *[সকল বোর্ড ২০১৯; ২০১৫]*
৩. ১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর 'তমদ্দুন মজলিশ' নামে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন কে?
[ঢা. বো., রা. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫; চবি ২০১৬-১৭]
৪. ভাষা আন্দোলনের প্রথম বই কী?
৫. ভাষা আন্দোলনের সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?
৬. কত সালে ভাষা আন্দোলন সংঘটিত হয়?

উত্তরের জন্য ৩৬১ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করতে চাওয়ার পাঁচটি কারণ ছক আকারে লেখো।
২. ভাষা আন্দোলনে ভূমিকা পালনকারী সংগঠনগুলোর পরিচিতি লেখো।
৩. ভাষা আন্দোলনের সময়কে দুটি পর্যায়ে ভাগ করে কর্মকাণ্ডগুলো ছক আকারে লেখো।

পাঠ ৩

একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনা ও প্রতিক্রিয়া
The Events of the 21 February and Its Reaction

পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি বানচালে সরকারি নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্তে অটল থাকে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি (৮ ফাল্গুন, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ) বৃহস্পতিবার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় মিলিত হয়। সেখানে তারা ছাত্রনেতা গাজিউল হকের সভাপতিত্বে এক সমাবেশ করেন। সমাবেশ শেষে তারা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগান দিতে দিতে মিছিল সহকারে অধিবেশনরত প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক পরিষদের দিকে অগ্রসর হয়। এতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্রীও অংশগ্রহণ করে। ছাত্রদের মিছিল বর্তমান ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে পৌঁছলে পুলিশ তাতে বাধা দেয়। এতে ছাত্র-জনতার সাথে পুলিশের সংঘর্ষ বাঁধে। এক পর্যায়ে পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে জগন্নাথ কলেজের (বর্তমানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়) হিসাববিজ্ঞানের ছাত্র রফিকউদ্দিন আহমদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএ ক্লাসের ছাত্র আবুল বরকত, আবদুল জব্বার ঘটনাস্থলে শহিদ হন। আবদুস সালাম ২১ ফেব্রুয়ারি গুলিবিদ্ধ হন, তবে মৃত্যুবরণ করেন ৭ এপ্রিল। কয়েকজন ছাত্রীসহ আরও অনেকেই আহত হন।

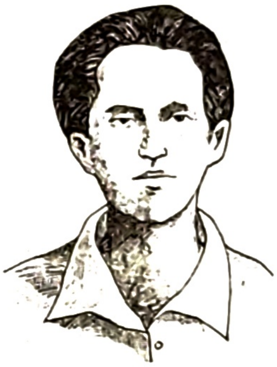

রফিকউদ্দিন আহমদ

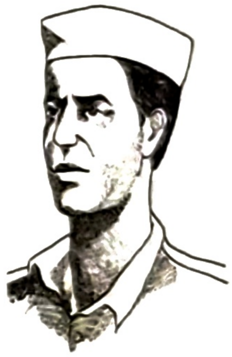

আবদুল জব্বার

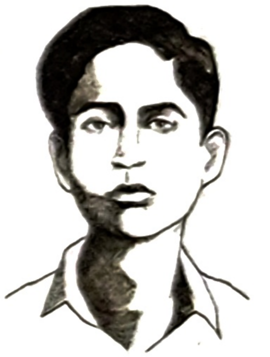

আবুল বরকত

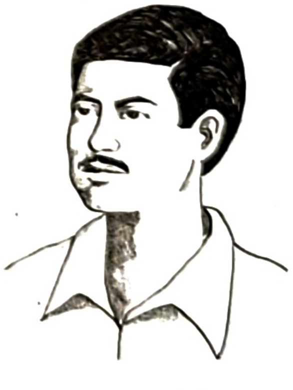

আবদুস সালাম

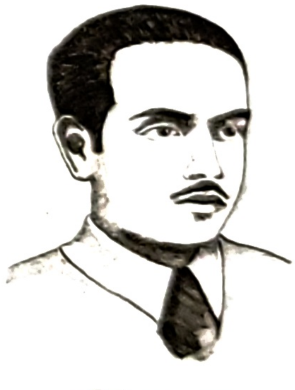

শফিউর রহমান

২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনা সারাদেশে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক পরিষদের কয়েকজন সদস্য অধিবেশন বর্জন করে বের হয়ে আসেন। ২২ ফেব্রুয়ারি ঢাকার নবাবপুর রোডে আগের দিনের ঘটনার প্রতিবাদে একটি বিশাল শোভাযাত্রা বের হয়। এতে পুনরায় পুলিশ গুলি চালালে হাইকোর্টের কর্মচারী শফিউর, লুৎফর রহমান লেন নিবাসী অহিউল্লাহ ও মৌলভীবাজার নিবাসী রিকশাচালক আবদুল আউয়াল শহিদ হন। তাছাড়া বেশ কয়েকজন আহত ও গ্রেফতার হন। ২৩ ও ২৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় হরতাল পালন করা হয়। ২৬ ফেব্রুয়ারি পরবর্তী সময়ের আল্টিমেটাম দিয়ে ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়। ঢাকার বাইরে দেশের বিভিন্ন স্থানে ২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনা ছড়িয়ে পড়ে। ২২ ফেব্রুয়ারি দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিবাদ বিক্ষোভ এবং ২৩ ও ২৪ ফেব্রুয়ারি ধর্মঘট পালিত হয়।

শহিদ মিনার নির্মাণ: কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিসৌধ। এটি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার কেন্দ্রস্থল ঢাকা মেডিকেল কলেজের বহির্প্রাঙ্গনে অবস্থিত। প্রতি বছর ২১ ফেব্রুয়ারি এখানে হাজার হাজার মানুষ উপস্থিত হয়ে ভাষা আন্দোলনের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

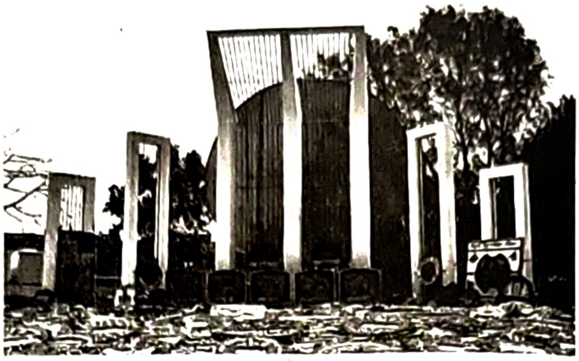

জাতীয় শহিদ মিনার

প্রথম শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয়েছিল অতিদ্রুত এবং নিতান্ত অপরিকল্পিতভাবে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা ১৯৫২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি বিকেলে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ শুরু করে এবং সেদিন রাতেই তা সম্পন্ন হয়। শহিদ মিনারের খবর পত্রিকায় পাঠানো হয় ঐ দিনই। 'শহিদ বীরের স্মৃতিতে' এই শিরোনামে দৈনিক আজাদ পত্রিকায় ছাপা হয় শহিদ মিনারের খবর।

মিনারটি তৈরি হয় ঢাকা মেডিকেলের ছাত্র হোস্টেলের (ব্যারাক) বারো নম্বর শেডের পূর্ব প্রান্তে। কোণাকুণিভাবে হোস্টেলের মধ্যবর্তী রাস্তার গা-ঘেঁষে। উদ্দেশ্য বাইরের রাস্তা থেকে যেন সহজেই চোখে পড়ে এবং যে কোনো শেড থেকে বেরিয়ে এসে ভেতরের লম্বা টানা রাস্তাতে দাঁড়ালেই চোখে পড়ে। শহিদ মিনারটি ছিল ১০ ফুট উঁচু ও ৬ ফুট চওড়া। মিনার তৈরির তদারকিতে ছিলেন জিএস শরফুদ্দিন (ইঞ্জিনিয়ার শরফুদ্দিন নামে পরিচিত), ডিজাইন করেছিলেন বদরুল আলম, সাথে ছিলেন সাঈদ হায়দার। তাদের সহযোগিতা করেন দুইজন রাজমিস্ত্রী। মেডিকেল কলেজ সম্প্রসারণের জন্য জমিয়ে রাখা ইট, বালি এবং পুরান ঢাকার পিয়ারু সর্দারের গুদাম থেকে সিমেন্ট আনা হয়। ভোর হবার পর একটি কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় মিনারটি। ঐ দিনই অর্থাৎ ২৪ ফেব্রুয়ারি সকালে শহিদ শফিউরের পিতা অনানুষ্ঠানিকভাবে শহিদ মিনারের উদ্বোধন করেন। ২৬ ফেব্রুয়ারি সকাল দশটার দিকে শহিদ মিনার উদ্বোধন করেন দৈনিক আজাদের সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিন। উদ্বোধনের দিন অর্থাৎ ২৬ ফেব্রুয়ারি পুলিশ ও সেনাবাহিনী মেডিকেলের ছাত্র হোস্টেল ঘিরে ফেলে এবং প্রথম শহিদ মিনার ভেঙে দেয়। এরপর ঢাকা কলেজেও একটি শহিদ মিনার তৈরি করা হয়, এটিও একসময় সরকারের নির্দেশে ভেঙে ফেলা হয়।

অবশেষে ১৯৫৬ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেয়। এরপর ১৯৫৭ সালে শিল্পী হামিদুর রহমানের পরিকল্পনা ও নকশায় কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। কিন্তু ১৯৫৮ সালে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান পাকিস্তানে সামরিক আইন জারির পর কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে লেফটেন্যান্ট জেনারেল আযম খানের আমলে এর নির্মাণ কাজ পুনরায় শুরু করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মাহমুদ হোসেনের নেতৃত্বে গঠিত একটি কমিটি এর নির্মাণ কাজের তত্ত্বাবধান করে। মূল নকশা কিছুটা পরিবর্তন করে দ্রুত নির্মাণ কাজ শেষ করা হয়। নির্মাণ কাজ শেষ হয় ১৯৬৩ সালের শুরুতে। ১৯৬৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের অন্যতম শহিদ আবুল বরকতের মা হাসিনা বেগম নতুন শহিদ মিনার উদ্বোধন করেন।

জেনে রাখো

কানাডার বসবাসরত দুই বাঙালি রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালাম ১৯৯৮ সালে জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি আনানের কাছে ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণার আবেদন জানান। এ আবেদনের প্রেক্ষিতে ১৯৯৯ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর ইউনেস্কোর প্যারিস অধিবেশনে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ২০০০ সাল থেকে দিবসটি জাতিসংঘের সব সদস্য দেশগুলোতে মর্যাদার সাথে পালিত হচ্ছে। ২০১০ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৬৫তম অধিবেশনে এ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব পাস হয়।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকবাহিনী শহিদ মিনারটি আবার ভেঙে দেয়। ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে শহিদ মিনার নতুন করে তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়। এবারও মূল নকশা পরিহার করে ১৯৬৩ সালের সংক্ষিপ্ত নকশার ভিত্তিতেই দ্রুত নির্মাণ কাজ শেষ করা হয়। ১৯৭৬ সালে নতুন নকশা অনুমোদিত হলেও তা আর বাস্তবায়িত হয়নি। পরে ১৯৮৩ সালে মিনারচত্বরের কিছুটা বিস্তার ঘটিয়ে শহিদ মিনারটিকে বর্তমান অবস্থায় নিয়ে আসা হয়। এই শহিদ মিনারই বাঙালির ভাষা আন্দোলনের প্রতীক হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে।

স্বাধীনতার পর থেকেই প্রবাসীদের উদ্যোগে বিদেশের মাটিতে শহিদ মিনার নির্মাণ শুরু হয়। ১৯৯৯ সালে জাতিসংঘের অঙ্গ সংগঠন (শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা) ইউনেস্কো একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিলে শহিদ মিনার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার প্রতীকস্বরূপ হয়ে ওঠে। বহির্বিশ্বে প্রথম শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয় ১৯৯৭ সালে যুক্তরাজ্যের এডিনবার্গের ওল্ডহ্যামে। ১৯৯৯ সালে লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটে শহিদ মিনার নির্মিত হয়। তাছাড়া গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ২০০৫ সালে জাপানের টোকিওতে শহিদ মিনার নির্মিত হয়। জাপান বাংলাদেশ সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে প্রতিবছর বৈশাখী মেলা অনুষ্ঠিত হওয়ার সূত্র ধরে বাংলাদেশ সরকার এই শহিদ মিনারটি নির্মাণ করে। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও ইতালিসহ বেশ কয়েকটি দেশে শহিদ মিনার নির্মিত হয়েছে।

জেনে রাখো

ভাষাশহিদদের নাম	পরিচয়
আবুল বরকত	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের এমএ শ্রেণির ছাত্র
আবদুল জব্বার	ময়মনসিংহের অধিবাসী
রফিকউদ্দিন আহমদ	জগন্নাথ কলেজের (বর্তমান জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়) হিসাববিজ্ঞানের ছাত্র
আবদুস সালাম	ডিরেক্টরেট অব ইন্ডাস্ট্রিজ বিভাগের পিয়ন
শফিউর রহমান	ঢাকা হাইকোর্টের হিসাবরক্ষণ শাখার কেরানি

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি কী বার ছিল? *[ঢাবি ২০০৮-০৯]*
২. ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে প্রথম শহিদ কে? *[বেরোবি ২০১১-১২]*
৩. ভাষা শহিদদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন কে? *[রাবি ২০১০-১১]*
৪. ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিসৌধ কোনটি?
৫. প্রথম শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয়েছিল কখন?
৬. কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার-এর নকশা কোন শিল্পীর? *[রাবি ২০১৬-১৭]*

উত্তরের জন্য ৩৬১ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

বাঙালির ভাষা আন্দোলনের প্রতীক হিসেবে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভটি বিশ্বের যেসব দেশে নির্মাণ করা হয়েছে তার একটি তালিকা তৈরি করো।

গ. দলীয় কাজ

ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে একটি রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করো।

পাঠ ৪

বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষে ভাষা আন্দোলনের ভূমিকা
The Contribution of Language Movement to the Rise of Bengali Nationalism

ভাষা আন্দোলন পূর্ব বাংলার মানুষের মধ্যে ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটায়। এ আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বাঙালি সর্বপ্রথম নিজেদের স্বতন্ত্র সত্তা ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। পূর্ব বাংলায় স্বাধিকারের চিন্তা-চেতনার আত্মপ্রকাশ ঘটে। আর এ চেতনাই পরবর্তীকালে প্রতিটি গণ-আন্দোলনে প্রেরণা জোগায় এবং মানুষের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির পথকে সুগম করে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে বাঙালি জাতি ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক নির্বাচনে শাসক দল মুসলিম লীগের বৈষম্যমূলক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম সফল প্রতিরোধ করে। বাঙালি জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ পূর্ব বাংলার মানুষ এরপর ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে স্বাধিকারের প্রশ্নে পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়। আর এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করে। ফলে বিশ্ব মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের।

ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য (Importance and Significance of the Language Movement)

ভাষা আন্দোলন বাংলার মানুষের জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এটি নিছক একটি প্রতিবাদী আন্দোলন ছিল না, পাকিস্তানের রাজনীতিতে এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য ছিল সুদূরপ্রসারী। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

জাতীয় চেতনার সূচনাকারী: ভাষা আন্দোলন ছিল বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদা আদায়ে সংঘটিত গণআন্দোলন। এ আন্দোলন পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে সংগঠিত জাতীয় চেতনা সৃষ্টি করে। এ আন্দোলন পূর্ব বাংলার অধিকারবঞ্চিত মানুষকে অধিকার সচেতন ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় উদীপ্ত করে।

অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও রাজনীতির বিকাশ: ভাষা আন্দোলন পূর্ব বাংলায় অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও রাজনীতির বিকাশ ঘটায়। ফলে পাকিস্তানে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। ধর্মই একটি জাতির ঐক্যের একমাত্র প্রতীক নয় বরং ভাষারও যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে তা প্রমাণিত হয়। ভাষা আন্দোলনের ফলে পূর্ব বাংলায় হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়। পূর্ব বাংলার বৃহত্তম রাজনৈতিক দল আওয়ামী মুসলিম লীগের নাম থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দেওয়ার মাধ্যমে রাজনীতিতে অসাম্প্রদায়িক চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সামাজিক রক্ষণশীলতার প্রাচীর দুর্বল হয়ে পড়ে। এ আন্দোলনে ছাত্রী ও নারীর প্রকাশ্যে সভা-সমিতি ও মিছিলে অংশগ্রহণ সমাজে নতুন চিন্তাধারা বিকশিত করে।

জেনে রাখো

অসাম্প্রদায়িকতা বা Cosmopolitanism হলো একটি আদর্শিক মতবাদ, যেখানে সব মানুষ পারস্পরিক নৈতিকতা ভাগাভাগি বা বিনিময়ের মাধ্যমে একটি একক সম্প্রদায়ের সদস্য হয়। যে ব্যক্তি অসাম্প্রদায়িকতার ধারণাকে নিজের মধ্যে ধারণ করেন তাকে একজন অসাম্প্রদায়িক বা ইংরেজিতে Cosmopolitan বা Cosmopolite বলা হয়। একটি অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায় বা সমাজব্যবস্থা সর্বজনীন নৈতিকতা, বিনিময়মূলক অর্থনৈতিক সম্পর্ক এবং বিভিন্ন জাতি দ্বারা পরিবেষ্টিত রাজনৈতিক কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠতে পারে। অসাম্প্রদায়িক চেতনা একটি মানবিক গুণ। এটি মানুষকে ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে দূরে রাখে। মানুষকে মানুষ হিসেবে ভাবতে শেখায়। এ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জতি-ধর্ম-বর্ণ ভুলে গিয়ে সব মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে সমাজ উন্নয়নের পথে এগিয়ে যায়।

রাজনীতিতে মুসলিম লীগের প্রাধান্য খর্ব ও যুক্তফ্রন্টের জয়লাভ: বাংলা ভাষার প্রতি মুসলিম লীগের বৈরী মনোভাব ও অবস্থানের কারণে দলটি বাঙালি জাতির আস্থা হারায়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে আওয়ামী মুসলিম লীগ, বামপন্থি গণতন্ত্রী দল, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, নেজাম-ই-ইসলাম ও খিলাফত-ই-রব্বানি পার্টি মিলে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। নির্বাচনে ভাষা আন্দোলনের সমর্থক যুক্তফ্রন্ট বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়লাভ করে এবং মুসলিম লীগের ভরাডুবি হয়। আওয়ামী মুসলিম লীগ, বামপন্থি গণতন্ত্রী দল, কৃষক-শ্রমিক পার্টি প্রভৃতি রাজনৈতিক দল সংগঠিত হওয়ায় পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে মুসলিম লীগের প্রাধান্য খর্ব হয়। এটা ছিল মূলত ভাষাভিত্তিক আন্দোলনের ফসল।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রেরণা: রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতিকে বৈষম্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী, বিদ্রোহী ও বিপ্লবী হওয়ার প্রেরণা যোগায়। এ প্রেরণাকে কাজে লাগিয়ে বাঙালি জাতি বিশেষ করে ছাত্রসমাজ সরকারের যেকোনো অন্যায় আচরণ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে।

অর্থনৈতিক মুক্তির প্রয়াস: উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়কে চাকরিহীন করে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করার ষড়যন্ত্র করেছিল। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে এ ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দিয়ে বাঙালি জাতি তাদের অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করে।

রাজনীতিতে মধ্যবিত্তশ্রেণি ও ছাত্রসমাজের অবস্থান সৃষ্টি: ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে মধ্যবিত্তশ্রেণি ও ছাত্রসমাজের অংশগ্রহণ ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে মধ্যবিত্তশ্রেণি পূর্ব বাংলার পরবর্তী রাজনীতিতে নিয়ামক বা চালকের আসনে আসীন হওয়ার সুযোগ লাভ করে। রাজনীতিতে অভিজাত পুঁজিপতি শ্রেণির একচ্ছত্র আধিপত্যের অবসান ঘটে।

বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির উন্নতি: ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে উন্মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে 'হিন্দু প্রভাবিত'- এমন অভিযোগের বিরুদ্ধে ভাষা আন্দোলন ছিল একটি জোরালো ও সোচ্চার প্রতিবাদ। এ আন্দোলনের মাধ্যমে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলা ভাষাবিদ ও সাহিত্যিকেরা নতুনভাবে ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। হাসান হাফিজুর রহমান, শামসুর রাহমান, আলাউদ্দিন আল আজাদ, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ এবং সৈয়দ শামসুল হকসহ আরও অনেকে কাব্য ও সাহিত্য রচনায় এগিয়ে আসেন। হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত 'একুশে ফেব্রুয়ারি' (১৯৫৩) এই পালাবদলের সাক্ষী। এছাড়া বাংলা ভাষার চর্চা ও ভাষাগত উন্নতির জন্য ১৯৫৫ সালে তৎকালীন বর্ধমান হাউজে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বাংলা একাডেমি'। এরই ধারাবাহিকতায় আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' এবং আবদুল লতিফ 'ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়'-এর মতো কালজয়ী সংগীত রচনা করেন।

বাংলা ভাষার স্বীকৃতি লাভ ও মর্যাদা বৃদ্ধি: বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ভাষা আন্দোলন ও আত্মত্যাগের ঘটনা ঘটলেও ১৯৫৪ সালের পূর্বে এ বিষয়ে তেমন অগ্রগতি অর্জিত হয়নি। ঐ বছর পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ে এ ব্যাপারে পরিস্থিতির পরিবর্তন শুরু হয়। ১৯৫৪ সালে পাকিস্তানের গণপরিষদে সরকারি ভাষা হিসেবে উর্দু ও বাংলা এবং পার্লামেন্টে ইংরেজি ছাড়াও উর্দু ও বাংলায় বক্তব্য রাখার বিধান করা হয়। ১৯৫৬ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ বাংলা ও উর্দু উভয় ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেয়, যা পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৯৯ সালে ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এ স্বীকৃতিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০০ সাল থেকে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোতে ২১ ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে? */জাবি ২০১৭-১৮/*
২. বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদা আদায়ে সংঘটিত গণআন্দোলন কোনটি?
৩ কোন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে মধ্যবিত্তশ্রেণির গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়?
৪. 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি'— গানটির রচয়িতা কে?
৫. বাংলা একাডেমির পূর্বনাম কী? */রাবি ২০১৬-১৭/*
৬. 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' কত তারিখে পালিত হয়? */ম. বো., দি. বো. ২০২৫/*

উত্তরের জন্য ৩৬১ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. দলীয় কাজ

বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষে ভাষা আন্দোলন ছিল প্রথম পদক্ষেপ- বিষয়টির ওপর একটি প্রতিযোগিতামূলক বক্তৃতার আয়োজন করো। (সময়- ৫ মিনিট)

পাঠ ৫ ও ৬

১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন
United Front Election in 1954

পূর্ব বাংলার স্বাধিকার অর্জনের ইতিহাসে ১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন ও যুক্তফ্রন্ট গঠনের গুরুত্ব অপরিসীম। ছয় বছরের পাকিস্তানি শোষণের বিরুদ্ধে এ নির্বাচন ছিল পূর্ব বাংলার মানুষের এক 'ব্যালট বিপ্লব'। লক্ষ্য অর্জনে পুরোপুরি সফল না হলেও এ নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক দলগুলো শাসক দল মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যে ঐক্য গড়ে তুলেছিল পাকিস্তানের পরবর্তী জাতীয় রাজনীতিতে এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে।

১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে পূর্ববাংলা প্রাদেশিক আইনসভা নির্বাচনের (যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন) পটভূমি: অবিভক্ত বাংলায় আইন পরিষদের সর্বশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৪৬ সালে। ভারত স্বাধীনতা আইন অনুসারে এ নির্বাচনে বিজয়ী প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্যরা স্বাধীন পাকিস্তানের পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য বলে গণ্য হয়। সে অনুসারে পাঁচ বছর মেয়াদকাল পূর্ণ হওয়ার পর ১৯৫২ সালে প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ইতোমধ্যে পূর্ব বাংলার টাঙ্গাইলে একটি উপনির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের প্রভাবশালী নেতা একজন তরুণ উদীয়মান নেতার কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হওয়ায় মুসলিম লীগ সরকারের মধ্যে নির্বাচনভীতি দেখা দেয়। পরাজয়ের আশঙ্কায় সরকার যথাসময়ে প্রাদেশিক নির্বাচন আয়োজন তো করেইনি বরং ইতোমধ্যে খালি হওয়া ৩৪টি আসনের উপনির্বাচনেরও ব্যবস্থা করেনি। ১৯৫৩ সালের ৯ মার্চ পাকিস্তান গণপরিষদে পাস করা 'The East Bengal Legislative Assembly (Continuation) Act 1953'এর মাধ্যমে গণপরিষদের মেয়াদ আরও এক বছর বাড়ানো হয়। অথচ পাকিস্তানের অন্য প্রদেশগুলোতে যথাসময়েই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মুসলিম লীগের ষড়যন্ত্রের রাজনীতি, অগণতান্ত্রিক মনোভাব, বৈষম্য ও নির্যাতনমূলক নীতি এবং পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচন নিয়ে সরকারের টালবাহানার ফলে পূর্ব বাংলার মানুষের মনে মুসলিম লীগ বিরোধী চেতনা চরম আকার ধারণ করে। ভাষা আন্দোলনের ফলে জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্দীপ্ত পূর্ব বাংলার মানুষ সরকারের কাছে নির্বাচনের জোর দাবি জানায়। অবশেষে বাধ্য হয়ে সরকার ১৯৫৪ সালের ৮ মার্চ পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের দিন নির্ধারণ করে। এ জন্য ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের নির্বাচন সংক্রান্ত ধারা সংশোধন করা হয়। সংশোধিত নিয়মে ২১ বছর বা এর বেশি বয়সী নাগরিকদের সর্বজনীন প্রত্যক্ষ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিধান করা হয়। সংরক্ষিত ১২টি মহিলা আসনসহ আইন পরিষদের আসন সংখ্যা নির্ধারণ করা হয় ৩০৯টি।[২] ২৩৭টি আসন মুসলমানদের জন্য এবং ৬০টি আসন অমুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত ছিল।

নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল ও জোট: ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে মোট ১৬টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। মুসলমি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ছিল মুসলিম লীগ, আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, নেজামে-ই-ইসলাম, বামপন্থি গণতন্ত্রী দল এবং খেলাফত-ই-রব্বানি পার্টি। অন্যদিকে অমুসলিম আসনের জন্য পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস, তফসিলি ফেডারেশন, গণসমিতি, পূর্ব পাকিস্তান সমাজতান্ত্রিক দল ইত্যাদি দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। হিন্দু আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী দলগুলোর মধ্যে গণসমিতি, অভয়াশ্রম দল ও পূর্ব পাকিস্তান সমাজতান্ত্রিক দল একত্রে 'সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্ট' নামে একটি নির্বাচনি জোট গঠন করেছিল।

যুক্তফ্রন্ট গঠন: পূর্ব বাংলার ছাত্রসমাজ ও প্রগতিশীল রাজনীতিবিদরা নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে মোকাবিলা করার জন্য বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য চাপ দেয়। এমতাবস্থায় মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, এ. কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখের প্রচেষ্টায় বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো একটি 'যুক্তফ্রন্ট' গঠন

---

[২] ড. মো. মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস, ১৯৪৭-৭১*, পৃ. ১০৫

করে। মূলত পাঁচটি বিরোধী রাজনৈতিক দল নিয়ে ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলো হচ্ছে— ১. আওয়ামী মুসলিম লীগ (১৯৪৯ সালে সোহরাওয়ার্দী প্রতিষ্ঠিত) ২. নেজাম-ই-ইসলাম (মাওলানা আতাহার আলীর নেতৃত্বাধীন) ৩. কৃষক-শ্রমিক পার্টি (১৯৫৩ সালে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক প্রতিষ্ঠিত) ৪. বামপন্থি গণতন্ত্রী দল (হাজী দানেশের নেতৃত্বাধীন) এবং ৫. খিলাফত-ই-রব্বানি (আবুল হাশিমের নেতৃত্বাধীন)। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট নৌকা প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। অন্যদিকে যুক্তফ্রন্টের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ হারিকেন প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করে।

যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা নির্বাচনি কর্মসূচি: দলীয় আদর্শ ও জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি খেয়াল রেখে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলসমূহ তাদের নির্বাচনি ইশতেহার প্রকাশ করে। তবে এসব নির্বাচনি ইশতেহারের মধ্যে আওয়ামী মুসলিম লীগের নির্বাচনি কর্মসূচির ৪২ দফার প্রধান প্রধান দাবি নিয়ে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা নির্বাচনি ইশতেহার বা কর্মসূচি ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এটি রচনায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেন আবুল মনসুর আহমদ। মহান ২১ ফেব্রুয়ারির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে যুক্তফ্রন্ট ২১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেছিল। এগুলো হলো—

১. বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা, ২. বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি ও সমস্ত খাজনা আদায়কারী স্বত্ব উচ্ছেদ করা, ৩. পাটশিল্পকে জাতীয়করণ করা, ৪. সমবায় কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তন এবং কুটির ও হস্তশিল্পের উন্নতি সাধন করা, ৫. পূর্ব পাকিস্তানে লবণ তৈরির কারখানা প্রতিষ্ঠা করা, ৬. শিল্প কারিগর শ্রেণির মোহাজিরদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা, ৭. বন্যা ও দুর্ভিক্ষরোধের জন্য খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা করা, ৮. পূর্ব পাকিস্তানে শিল্পকারখানা গড়ে তোলা ও দেশবাসীকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা, ৯. অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা, ১০. শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ও মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা, ১১. ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা, ১২. শাসন ব্যয় হ্রাস করা ও মন্ত্রীদের বেতন ১ হাজার টাকার বেশি না করা, ১৩. দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি বন্ধ করার কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করা, ১৪. জননিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্স বাতিল করা, ১৫. শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক করা, ১৬. বর্ধমান হাউসে বাংলা ভাষার গবেষণাগার (বাংলা একাডেমি) প্রতিষ্ঠা করা, ১৭. ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি নিহতদের স্মরণে শহিদ মিনার নির্মাণ করা, ১৮. ২১ ফেব্রুয়ারিকে শহিদ দিবস ও সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করা, ১৯. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন কায়েম করা, ২০. কোনো অজুহাতেই আইনসভার মেয়াদ বৃদ্ধি না করা এবং ২১. আইন পরিষদের কোনো সদস্য পদ খালি হলে তিন মাসের মধ্যে উপ-নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।

যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচিতে কোনো বৈপ্লবিক বিষয় ছিল না। তবে এ কর্মসূচি ছিল পূর্ব বাংলার আপামর মানুষের মনের কথারই প্রতিফলন। এতে পূর্ব বাংলার কৃষি, শিল্প ও শিক্ষার উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কথা বলা হয়। সুষ্ঠু ও পরিচ্ছন্ন রাজনৈতিক পরিবেশ এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিশ্চিতের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় তা ছিল মূলত এ অঞ্চলের মানুষেরই চাওয়া। আর এ কারণেই সাধারণ মানুষ একে তাদের মুক্তির সনদ হিসেবে গ্রহণ করে এবং যুক্তফ্রন্টের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়।

নির্বাচনি প্রচারণা: নির্বাচনকে সামনে রেখে অংশগ্রহণকারী সব রাজনৈতিক দল ও ফ্রন্ট ব্যাপক নির্বাচনি প্রচারণা চালায়। মুসলিম লীগ তাদের নির্বাচনি প্রচারণায় পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা, ইসলাম রক্ষা এবং ভারত বিরোধিতাকে প্রাধান্য দেয়। তারা তাদের প্রচার কাজে পুলিশ ও বেসামরিক প্রশাসন, সরকারি যানবাহন ও গণমাধ্যম ব্যবহার করে। নির্বাচনি প্রচারণার জন্য তারা 'সবুজকোর্তা বাহিনী' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করে। অন্যদিকে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ও

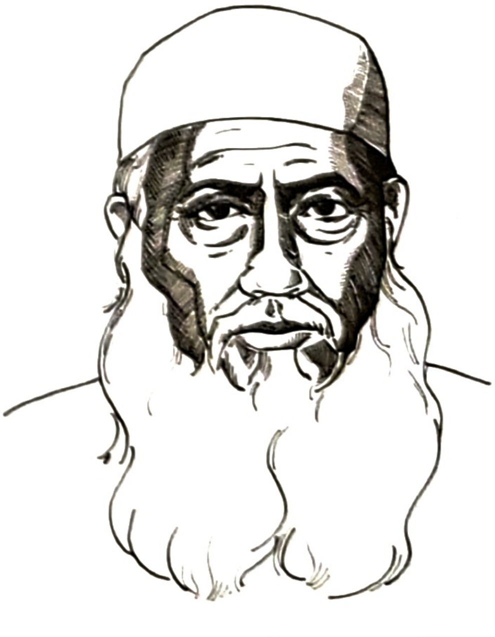

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

শেখ মুজিবুর রহমানসহ যুক্তফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ এবং তাদের বিপুল সংখ্যক ত্যাগী কর্মীবাহিনী যুক্তফ্রন্টের অনুকূলে ব্যাপক নির্বাচনি প্রচারণা চালায়। তাদের প্রচারণায় যুক্তফ্রন্টের একুশ দফা কর্মসূচির পাশাপাশি বিগত ৭ বছরে সরকারের অগণতান্ত্রিক আচরণ, পূর্ব বাংলার প্রতি তাদের বৈষম্য ও শোষণমূলক কার্যকলাপ ইত্যাদি প্রাধান্য পায়। যুক্তফ্রন্ট 'জালেম শাহীর ছয় বছর' নামে সরকার বিরোধী একটি প্রচার পুস্তিকাও প্রকাশ করে। নির্বাচনি প্রচারণাকালে প্রতিদ্বন্দ্বী দল ও ফ্রন্টের মধ্যে উত্তেজনা, গোলযোগ ও কিছু হতাহতের ঘটনাও ঘটেছিল।

নির্বাচন অনুষ্ঠান: ১৯৫৪ সালের ৮ মার্চ পূর্ব নির্ধারিত তারিখেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ৯ মার্চ প্রকাশিত আজাদ পত্রিকার প্রতিবেদনে বলা হয়, নির্বাচনটি শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পত্রিকাটি আরও বলে যে, নির্বাচন নিয়ে জনমনে এক রকমের আশঙ্কা থাকলেও শেষ পর্যন্ত শান্তি ও শৃঙ্খলার সাথেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এর ফলে পূর্ব পাকিস্তান গণতন্ত্রের প্রথম পরীক্ষায় সাফল্যজনকভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে বলে আজাদ পত্রিকার প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

জেনে রাখো

গণতন্ত্রের ইংরেজি প্রতিশব্দ Democracy শব্দটি গ্রিক শব্দ 'Demos' এবং 'Cratia' থেকে এসেছে। গণতন্ত্র বলতে জনগণের শাসন ব্যবস্থাকে বোঝায়। অর্থাৎ এ ব্যবস্থায় জনগণই সব ক্ষমতার উৎস। আমেরিকার ১৬তম প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন (Abraham Lincoln) গণতন্ত্রের সংজ্ঞায় বলেন, 'Democracy is the Government of the people, by the people and for the people. (গণতন্ত্র হলো জনগণের দ্বারা নির্বাচিত, জনগণের জন্য এবং জনগণের দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা।) অবশ্য গ্রিক দার্শনিক এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক এরিস্টটল (Aristotle) গণতন্ত্রকে নিকৃষ্ট ও মূর্খদের শাসনব্যবস্থা বলে উল্লেখ করেছেন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. অবিভক্ত বাংলায় আইন পরিষদের সর্বশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল কত সালে?
২. ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে মোট কয়টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে?
৩. কয়টি রাজনৈতিক দল নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়?
৪. কত সালে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়?
৫. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি প্রতীক কী ছিল? */য. বো. ২০২৩; সি. বো., ব. বো. ২০২১/*
৬. যুক্তফ্রন্ট কয় দফা নির্বাচনি ইশতেহার নিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে? */রাবি ২০১০-১১/*

উত্তরের জন্য ৩৬১ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোর একটি তালিকা তৈরি করো।
২. নিচের ছকে খালিঘর পূরণ করো।

রাজনৈতিক দল	নেতৃত্বাধীন নেতা
	সোহরাওয়ার্দী
নেজাম-ই ইসলাম	
	শেরে বাংলা
বামপন্থি গণতন্ত্রী দল	
	আবুল হাশিম

পাঠ ৭

১৯৫৪ সালের নির্বাচনের ফলাফল, গুরুত্ব ও তাৎপর্য
Consequences Importance and Significance of the Election in 1954

১৯৫৪ সালের নির্বাচনের ফলাফল (Results of the Election in 1954)

নির্ধারিত ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসের ৮ থেকে ১২ তারিখ পর্যন্ত পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব বাংলায় এটাই ছিল প্রথম অবাধ ও সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচন। নির্বাচনে শতকরা মাত্র ৩৭.১৯ ভাগ ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। ১৫ মার্চ থেকে ২ এপ্রিল পর্যন্ত বেসরকারিভাবে ফলাফল ঘোষিত হয়। ঘোষিত ফলাফলে দেখা যায় যে, এ নির্বাচনে বিরোধী রাজনৈতিক জোট যুক্তফ্রন্ট অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে এবং অন্যদিকে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। এ নির্বাচনের ফলাফল ছিল নিম্নরূপ:

সারণি-০১

১৯৫৪ সালের নির্বাচনের ফলাফল

আসনের প্রকৃতি ও সংখ্যা	রাজনৈতিক দল বা জোটের নাম	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা
মুসলিম আসন সংখ্যা ২৩৭টি	১. যুক্তফ্রন্ট	২২৩
	২. মুসলিম লীগ	১০
	৩. নির্দলীয়	০৩
	৪. খিলাফত-ই-রব্বানি	০১
		মোট = ২৩৭
অমুসলিম আসন সংখ্যা ৭২টি	১. কংগ্রেস	২৪
	২. তফসিলি ফেডারেশন	২৭
	৩. সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্ট	১৩
	৪. খ্রিষ্টান	০১
	৫. বৌদ্ধ	০২
	৬. কমিউনিস্ট পার্টি	০৪
	৭. নির্দলীয় সদস্য	০১
মোট = ৩০৯		মোট = ৭২

উল্লেখ্য যে, নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রাপ্ত মূল আসন সংখ্যা ছিল ২১৫ এবং মুসলিম লীগের ৯টি। পরবর্তী সময়ে নির্দলীয় সদস্যদের মধ্যে ৮ জন যুক্তফ্রন্টে এবং ১ জন মুসলিম লীগে যোগ দিলে যুক্তফ্রন্ট ও মুসলিম লীগের সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে ২২৩ এবং ১০টি।

সারণি-২

২৩৭টি মুসলমান আসনের জেলাভিত্তিক ফলাফল, ১৯৫৪

ক্রমিক নং	জেলা	মোট আসন	যুক্তফ্রন্ট	মুসলিম লীগ	খেলাফত-ই- রব্বানি	স্বতন্ত্র
১	দিনাজপুর	৬	৬	–	–	–
২	রংপুর	১৬	১১	৪	–	১
৩	বগুড়া	৮	৮	–	–	–
৪	রাজশাহী	১৩	১২	–	–	১
৫	পাবনা	৯	৯	–	–	–
৬	কুষ্টিয়া	৬	৬	–	–	–
৭	যশোর	৮	৭	১	–	–

ক্রমিক নং	জেলা	মোট আসন	যুক্তফ্রন্ট	মুসলিম লীগ	খেলাফত-ই- রব্বানি	স্বতন্ত্র
৮	খুলনা	৮	৮	–	–	–
৯	বাখেরগঞ্জ	২০	১৯	–	–	১
১০	ফরিদপুর	১৪	১৪	–	–	–
১১	ঢাকা	২৩	২৩	–	–	–
১২	মোমেনশাহী	৩৪	৩৪	–	–	–
১৩	সিলেট	১৫	১১	২	১	১
১৪	ত্রিপুরা	২২	১৫	২	–	৫
১৫	নোয়াখালী	১৩	১২	–	–	১
১৬	চট্টগ্রাম	১৩	১১	–	–	২
মহিলা আসন		৯	৯	–	–	–
মোট		২৩৭	২১৫	৯	১	১২

সূত্র: *দৈনিক আজাদ, ২৫ মার্চ ১৯৫৪, ২ এপ্রিল ১৯৫৪*

১৯৫৪ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য (Importance and Significance of the Election in 1954)

১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক নির্বাচনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। এটি ছিল শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার জনমানুষের গোপন ব্যালট বিপ্লব। এ বিজয়ের গুরুত্ব ও তাৎপর্যের প্রধান দিকগুলো হলো— ক. এটি ছিল পাকিস্তানে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটের ভিত্তিতে প্রথম অবাধ নির্বাচন, খ. এ নির্বাচন পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে এবং তাদের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য ও সংহতিবোধের জন্ম দেয়, গ. পূর্ব বাংলার জনগণের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি জোরদার করে, ঘ. ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার যে দাবি উত্থাপিত হয়েছিল, যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের মধ্য দিয়ে সে দাবি পূরণের পথ সুগম হয়, ঙ. পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে মুসলিম লীগের প্রাধান্যের অবসান ঘটে। এর স্থলে আওয়ামী লীগের উত্থান ঘটে, চ. রাজনীতিতে অবাঙালি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বাংলার মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হয়। শুধু তাই নয়, পূর্ব বাংলার জাতীয় রাজনীতিতে এলিট শ্রেণি ও ভূস্বামী অভিজাতদের প্রাধান্যের অবসান ঘটে এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও তরুণদের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, ছ. শোষিত বঞ্চিত পূর্ব বাংলার জনমনে বিপুল আশার সঞ্চার করে এবং পরবর্তীকালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি তাদের অনাস্থা বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়, যা ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়সহ পরবর্তীকালের রাজনৈতিক পরিবর্তনের গতি-প্রকৃতির ওপর গভীর প্রভাব ফেলে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. পূর্ব বাংলায় প্রথম অবাধ ও সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় কত সালে?
২. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে শতকরা কত ভাগ ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে?
৩. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট কতটি আসনে জয় লাভ করে? */সকল বোর্ড ২০২১; ২০১৬/*
৪. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ কতটি আসন লাভ করে?
৫. কোন নির্বাচন পূর্ব বাংলার মানুষের 'ব্যালট বিপ্লব' ছিল?
৬. পূর্ব পাকিস্তান গণতন্ত্রের প্রথম পরীক্ষায় সাফল্যজনকভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে কখন?

উত্তরের জন্য ৩৬১ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পর পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের গতি-প্রকৃতির পাঁচটি দিক তুলে ধরো।

পাঠ ৮

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয় ও মুসলিম লীগের পরাজয়ের কারণ
Causes of the Victory of the United Front and the Defeat of the Muslim League in the Election of 1954

যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের কারণ (Causes of the Victory of the United Front)

১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক বিজয়ের পেছনে বেশ কতগুলো কারণ ছিল। যথা—

ঐক্যজোট গঠন: মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে মধ্য, বাম ও ইসলামপন্থি রাজনৈতিক দলসমূহের ঐক্যজোট গঠিত হওয়ায় যুক্তফ্রন্টের শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং নির্বাচনে বিজয় সহজতর হয়।

জনবান্ধব ২১ দফা ইশতেহার: যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা নির্বাচনি ইশতেহার ছিল পূর্ব বাংলার মানুষের অধিকারের দলিল। এতে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো ছিল পূর্ব বাংলার জনগণের জন্য খুবই প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয়। এজন্য পূর্ব বাংলার মানুষ ২১ দফার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানায়। ফলে নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে।

নেতৃত্বের প্রকৃতি: যুক্তফ্রন্টের জয়ের অন্যতম কারণ ছিল এর নেতৃত্বের যোগ্যতা ও দূরদৃষ্টি। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানী এবং শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের মতো সুযোগ্য ও জননন্দিত নেতা এ ফ্রন্টের বিজয়কে ত্বরান্বিত করেছিলেন।

ছাত্র ও যুব সমাজের ভূমিকা: ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের পেছনে এদেশের ছাত্র ও তরুণ-যুব সমাজের বিশেষ ভূমিকা ছিল। মূলত এরাই সাধারণ মানুষের কাছে মুসলিম লীগের শোষণের চিত্র এবং যুক্তফ্রন্টের কল্যাণকামী কর্মসূচি পৌঁছে দিয়ে ফ্রন্টের প্রতি মানুষের সমর্থন নিশ্চিত করেন।

মুসলিম লীগের পরাজয়ের কারণ (The Defeat of the Muslim League)

মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীনসহ মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার ৫ জন প্রভাবশালী সদস্য এবং কয়েকজন খ্যাতিমান কেন্দ্রীয় নেতা এ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীদের কাছে পরাজিত হন। মুসলিম লীগের এ পরাজয়ের কতগুলো কারণ ছিল। যথা—

সাংগঠনিক দুর্বলতা: পাকিস্তান সৃষ্টির পর মুসলিম লীগ কিছু নেতার ব্যক্তিগত সংগঠনে পরিণত হয়। নেতা-কর্মী ও সাধারণ সমর্থকদের সাথে এর দূরত্ব বেড়ে যায়। এতে সংগঠনটি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। বস্তুত পাকিস্তান সৃষ্টির পর মুসলিম লীগের অন্তর্দলীয় কোন্দল আরও বেড়ে যায়। ফলে মুসলিম লীগ ভেঙে আওয়ামী মুসলিম লীগসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয়। প্রগতিশীল ও ত্যাগী নেতাদের মুসলিম লীগ ছেড়ে বিরোধী দলসমূহে যুক্ত হওয়ায় দলটি সাংগঠনিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। মুসলিম লীগের এ সাংগঠনিক দুর্বলতা নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়ের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল।

জনবিচ্ছিন্ন নেতৃত্ব: সাধারণ মানুষ থেকে নেতৃবৃন্দের বিচ্ছিন্নতা ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়ের অন্যতম কারণ। মূলত মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের বেশিরভাগই ছিলেন ধর্মান্ধ ও এলিট শ্রেণিভুক্ত। এরা ছিলেন শহুরে এবং গ্রামাঞ্চলে জনবিচ্ছিন্ন। তাই নির্বাচনে এরা ভোটারদের সমর্থন আদায়ে ব্যর্থ হন।

মুসলিম লীগ সরকারের দুর্নীতি: ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের সীমাহীন দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির কারণে পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষ তাদের ওপর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং যুক্তফ্রন্টকে সমর্থন জানায়।

সরকার পরিচালনায় ব্যর্থতা: প্রায় সব ক্ষেত্রেই ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের সরকার পরিচালনায় ব্যর্থতা পূর্ব বাংলায় গণ-অসন্তোষ সৃষ্টি করে। এ অবস্থায় পাট কেলেঙ্কারির সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় জনমনে পুঞ্জীভূত ক্ষোভের মাত্রা বহুগুণে বেড়ে যায়।

মুসলিম লীগের পরাজয় সম্পর্কে দৈনিক আজাদ পত্রিকার ভাষ্য: মুসলিম লীগের মুখপত্র দৈনিক আজাদ পত্রিকায়ও মুসলিম লীগের পরাজয়ের কিছু কারণের কথা বলা হয়েছে। যেমন— ক. বাংলা ভাষার দাবিকে সঠিকভাবে মোকাবিলায় ব্যর্থতা এবং

ভাষা আন্দোলনকারীদের প্রতি নূরুল আমিন সরকারের দমননীতি, খ. পূর্ব-বাংলার প্রতি কেন্দ্রের দূরদর্শিতার অভাব এবং বাঙালির প্রতি অবিচার ও শোষণনীতি, গ. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলাকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান না করার মনোভাব, ঘ. পূর্ব বাংলার জনগণের অর্থনৈতিক দুর্গতি বৃদ্ধি, ঙ. পাকিস্তানের সংবিধান রচনায় মুসলিম লীগের বিলম্ব ও ব্যর্থতা, চ. মুসলিম লীগের পর্যাপ্ত জনসংযোগের অভাব, ছ. মুসলিম লীগ ও সরকারকে একত্রীকরণ করে ফেলা। জ. মুসলিম লীগের প্রতি ছাত্র ও তরুণ সমাজের সমর্থনের অভাব, ঝ. মুসলিম লীগের কর্মী স্বল্পতা এবং ঞ. দুর্নীতি দমনে সরকারের ব্যর্থতা ইত্যাদি।

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা: গঠন ও পতন (Cabinet of the United Front: Formation and Fall)

১৯৫৪ সালের ৩ এপ্রিল পূর্ব বাংলার গভর্নর চৌধুরী খালেকুজ্জামান যুক্তফ্রন্ট সংসদীয় দলের নেতা শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হককে সরকার গঠনের আহ্বান জানান। ফজলুল হক ৪ এপ্রিল যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এ মন্ত্রিসভার স্থায়িত্ব ছিল খুবই অল্প। তবে এ সময়ের মধ্যেই এ মন্ত্রিসভা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা, ২১ ফেব্রুয়ারিকে শহিদ দিবস ও সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা এবং বর্ধমান হাউসকে বাংলা একাডেমি করার প্রস্তাব অনুমোদন করে।

যুক্তফ্রন্ট ছিল একটি নির্বাচনি মোর্চা। কোনো আদর্শিক ভিত্তিতে নয়; বরং নির্বাচন এবং মুসলিম লীগকে মোকাবিলার জন্যই এ মোর্চা গড়ে উঠেছিল। তাই ক্ষমতায় যাওয়ার পর নেতৃবৃন্দের মধ্যকার ব্যক্তিগত রেষারেষি এবং মন্ত্রিত্ব নিয়ে বিরোধ এবং শরিক দলগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে মতানৈক্যের ফলে যুক্তফ্রন্টে বিভেদ দেখা দেয়। যুক্তফ্রন্টে ভাঙন এবং মন্ত্রিসভা বাতিলের জন্য এ সময় কেন্দ্রীয় সরকারও নানা তৎপরতা শুরু করে। কেননা, যুক্তফ্রন্টের এ বিপুল বিজয় কেন্দ্রীয় সরকার সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। কাজেই তারা নানা অজুহাত খুঁজতে থাকে। এ সময় মুখ্যমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক কলকাতা গিয়ে যে বক্তব্য রাখেন, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তার অপব্যাখ্যা করে। ফজলুল হকের বিরুদ্ধে নানা রকম কুৎসা রটানো হয়। এমনকি তার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ এনে তাকে অপসারণের ষড়যন্ত্র করা হয়। একই সাথে কেন্দ্রীয় সরকার সুপরিকল্পিতভাবে আদমজী পাটকল ও চন্দ্রঘোনা পেপার মিলসহ দেশের নানা স্থানে বাঙালি-অবাঙালি দাঙ্গা বাঁধায়। এতে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে সরকার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার ওপর এর দায় চাপিয়ে দেয়। শেষে ১৯৫৪ সালের ৩০ মে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল করা হয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা নির্বাচনি ইশতেহার কাদের অধিকারের দলিল ছিল?
২. মধ্য, বাম ও ইসলামপন্থি রাজনৈতিক দলসমূহের ঐক্যজোট গঠিত হয় কোন নির্বাচনে?
৩. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়ের প্রধান কারণ কী ছিল?
৪. মুসলিম লীগের মুখপত্র ছিল কোন পত্রিকা?
৫. যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন কে? *[সকল বোর্ড ২০২৫]*
৬. যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা কখন বাতিল করা হয়?

উত্তরের জন্য ৩৬১ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়ের কারণগুলো ছক আকারে লেখো।
২. যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পতনের কারণ চিহ্নিত করে একটি চার্ট তৈরি করো।

পাঠ ৯ ও ১০

পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বৈষম্য
Political & Administrative Discrimination of West Pakistan towards East Pakistan

প্রথম থেকেই বাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পাকিস্তানি শাসকদের নীতি ছিল বৈষম্যমূলক। পাকিস্তানের জন্ম থেকে পরবর্তী সময়ের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে তা সহজেই বোঝা যায়। উল্লেখ্য যে, ভৌগোলিক দূরত্ব, ভাষা ও সংস্কৃতির পার্থক্য অস্বীকার করে ন্যায্য অধিকার লাভের প্রত্যাশা নিয়ে পূর্ব বাংলার মানুষ পাকিস্তান রাষ্ট্রের সাথে যুক্ত হয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির পর শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার প্রাপ্য ন্যায্য অধিকারের দিকে মোটেও দৃষ্টি দেয়নি। বরং রাজনৈতিক, সামরিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণের ফলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ক্রমাগত ব্যবধান বৃদ্ধি পেতে থাকে। নিচে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পাকিস্তানি শাসকদের গৃহীত বৈষম্যমূলক নীতির একটি চিত্র তুলে ধরা হলো:

রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বৈষম্য (Political and Administrative Discrimination)

পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর থেকেই পূর্ব বাংলা রাজনৈতিক বৈষম্যের শিকারে পরিণত হয়। পাকিস্তানের জনসংখ্যার ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও স্বাধিকারের প্রশ্নে পূর্ব বাংলা ক্রমাগত উপেক্ষিত হতে থাকে। পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদে পূর্ব বাংলার সংখ্যাধিক্য থাকা সত্ত্বেও গভর্নর জেনারেল ও প্রধানমন্ত্রী উভয় পদেই নিয়োগ করা হয় পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। সংখ্যাগরিষ্ঠের দাবিকে উপেক্ষা করে পাকিস্তানের রাজধানীও প্রতিষ্ঠা করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানের করাচিতে। পরে আইয়ুব খান রাজধানী ইসলামাবাদে স্থানান্তর করেন। পাকিস্তানের জনসংখ্যার শতকরা ৫৬.৪০ ভাগের ভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদাদানে শাসকগোষ্ঠী অনীহা প্রদর্শন করে। তাছাড়া মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় পূর্ব বাংলার মানুষের পরিচালিত আন্দোলন দমনে পাকিস্তানি সরকার তীব্র নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

পশ্চিম পাকিস্তানিরাই ছিল প্রকৃত অর্থে শাসন ক্ষমতার কর্ণধার। পূর্ব বাংলার জননেতা এ কে ফজলুল হকসহ এ অঞ্চলের জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়। এমনকি সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও আইনপরিষদে পূর্ব পাকিস্তানকে সংখ্যাসাম্য নীতি মানতে বাধ্য করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নেও বাঙালির অবস্থান মোটেই সন্তোষজনক ছিল না। ১৯৪৭-১৯৭১ সময়ে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার মোট ২১১ জন মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীর মধ্যে বাঙালির সংখ্যা ছিল মাত্র ৯৫ জন। আর একই সময়ে ৯ জন সরকার প্রধানের মধ্যে মাত্র ৩ জন ছিলেন (খাজা নাজিমউদ্দীন, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও বগুড়ার মোহাম্মদ আলী) পূর্ব বাংলার এবং তিন জনের মোট কার্যকালের সময় ছিল মাত্র ছয় বছর।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রের মতো প্রশাসনিক ও চাকরির ক্ষেত্রেও চরম বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। পাকিস্তানের বেসামরিক প্রশাসনের মূল চালিকাশক্তি সিভিল সার্ভিসে পাঞ্জাবি (জনসংখ্যায় যারা ছিলেন শতকরা ২৯ ভাগের সামান্য বেশি) কর্মকর্তাদের একচেটিয়া প্রাধান্য ছিল। ১৯৬৫-১৯৭০ সালের একটি পরিসংখ্যান মতে, পাকিস্তানের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, পররাষ্ট্র, স্বরাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষাসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ৬৯ জন শীর্ষপদস্থ কর্মকর্তার ৪৫ জন ছিলেন পাঞ্জাবি এবং ৩ জন ছিলেন মাত্র বাঙালি। ১৯৪৮-১৯৬৩ সালে ৩৪৬ জন বেসামরিক সিএসপি কর্মকর্তার মধ্যে ১২৬ জন ছিলেন মাত্র বাঙালি। ষাটের দশকে পাকিস্তানে সচিব পর্যায়ে দু'চারজন বাঙালির নিয়োগ হলেও তাদের অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ে নিয়োগ দেওয়া হয়। বেসামরিক উচ্চপদ ছাড়াও কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বাঙালি প্রতিনিধিত্ব ছিল অনেক কম। পাকিস্তান রেলওয়ের বোর্ড পরিচালকদের ৮ জনের মধ্যে ১ জন ছিলেন বাঙালি। রেডিও পাকিস্তানের ২০ জন প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তার মধ্যে মাত্র ১ জন ছিলেন বাঙালি। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের চাকরির ক্ষেত্রে বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। একই ধরনের বৈষম্য লক্ষ করা যায় বৈদেশিক মিশনগুলোতে। বৈদেশিক দপ্তরের ৮৫% কর্মকর্তা ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের এবং বাকি ১৫% ছিলেন বাঙালি।

নিম্নোক্ত সারণির মাধ্যমে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বৈষম্যের চিত্র আরও স্পষ্ট হবে।

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব (১৯৪৭-৭১)

সরকার প্রধান	মোট মন্ত্রিসংখ্যা	পশ্চিম পাকিস্তানি	বাঙালি	বাঙালির শতকরা হার
লিয়াকত আলী খান ১৯৪৭-১৯৫১	১৯	১৩	৬	৩১.২
খাজা নাজিমউদ্দীন	১৫	৯	৬	৪০.০
মোহাম্মদ আলী (বগুড়া)				
১৯৫৩-৫৪	১৪	৯	৫	৩৫.০
১৯৫৪-৫৫	১৬	৯	৭	৪৪.০
মোহাম্মদ আলী ১৯৫৫-৫৬	১৭	১০	৭	৪১.০
হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯৫৬-৫৭	১৪	৬	৮	৫৭.০
চুন্দ্রিগড় ১৯৫৭	১৬	৯	৭	৪৪.০
ফিরোজ খান নুন ১৯৫৭-৫৮	২৭	১৫	১২	৪৪.৫
আইয়ুব খান ১৯৫৮-৬০	১২	৯	৩	২৫.০
১৯৬০-৬২	১৬	১১	৫	২৬.০
১৯৬২-৬৫	১৭	৯	৮	৪৭.০
১৯৬৫-৬৯	১৭	১১	৬	৩৫.০
ইয়াহিয়া খান ১৯৬৯-১৯৭১	১১	৬	৫	৪৫.৪
মোট	২১১	১২৬	৯৫	৪৫%

Source: *Safdar Mahmud, The Deliberate Debacle (Lahore: Sh. Mahammad Asraf, 1976) pp. 41-42, 244-256*

তথ্য: *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯০৫-১৯৭১, পৃ. ৩৮৫; ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন।*

কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে উচ্চপদে বৈষম্যের চিত্র, ১৯৬২

পদবি	মোট অফিসারের সংখ্যা	পশ্চিম পাকিস্তান		পূর্ব পাকিস্তান	
		সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার
সচিব	১৯	১৯	১০০%	০০	০০%
যুগ্ম-সচিব	৪৬	৩৯	৮৫%	০৭	১৫%
উপ-সচিব	১২৬	১০২	৮১%	২৪	১৯%
শাখা কর্মকর্তা	৭৬৩	৬৭৫	৮৯%	৮৮	১১%
মোট	৯৫৪	৮৩৫	৮৮% (প্রায়)	১১৯	১২% (প্রায়)

বেসামরিক প্রশাসনে কর্মকর্তা-কর্মচারীর সার্বিক চালচিত্র

কর্মকর্তা-কর্মচারী	মোট সংখ্যা	পশ্চিম পাকিস্তান		পূর্ব পাকিস্তান	
		সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার
প্রথম শ্রেণি	২,৮১৬	২,০৮৪	৭৪%	৭৩২	২৬%
দ্বিতীয় শ্রেণি	৫,৯৬১	৪,৭২১	৭৯%	১,২৪০	২১%
তৃতীয় শ্রেণি	৭০,০০০	৫০,৭০০	৭২%	১৯,৩০০	২৮%
চতুর্থ শ্রেণি	২৬,০০০	১৮,০০০	৬৯% (প্রায়)	৮,০০০	৩১% (প্রায়)

পাকিস্তানি শাসকদের এসব বৈষম্যমূলক নীতির প্রতিবাদে যখন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকারের দাবি তোলে, তখন শাসকচক্র অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আন্দোলন দমনের চেষ্টা করে। এমনকি তারা এ অঞ্চলের দেশপ্রেমিক জননেতাদের দেশদ্রোহী ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী আখ্যা দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পাকিস্তানি শাসকদের নীতি কীরূপ ছিল?
২. পাকিস্তানের ৯ জন সরকার প্রধানের মধ্যে কত জন বাঙালি ছিলেন?
৩. পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতার কর্ণধার কারা ছিল?
৪. পাকিস্তানের বেসামরিক প্রশাসনের সিভিল সার্ভিসে কাদের একচেটিয়া প্রাধান্য ছিল?
৫. পাকিস্তান রেলওয়ের বোর্ড পরিচালকদের ৮ জনের মধ্যে কত জন বাঙালি ছিল?
৬. পাকিস্তানের বৈদেশিক দপ্তরের কত ভাগ বাঙালি ছিল?

উত্তরের জন্য ৩৬১ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর প্রশাসনিক বৈষম্যের একটি চার্ট তৈরি করো।

গ. বাড়ির কাজ

মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি মালিকানাধীন রেস্টুরেন্টগুলোতে অধিক সময় ও হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেও সবচেয়ে কম বেতন পাচ্ছেন বাংলাদেশি শ্রমিকেরা। আর বেশিরভাগ রেস্টুরেন্টে ম্যানেজার পদে মালয়েশিয়ানদের বসানো হলেও ধোয়া-মোছা এবং হোটেলবয়ের কাজ করানো হচ্ছে বাংলাদেশিদের দিয়ে। অন্যসব সেক্টরের শ্রমিকদের বেতন মাসে ২ হাজার রিঙ্গিত (৩৬ হাজার টাকা) হলেও রেস্টুরেন্ট শ্রমিকদের খাটানো হচ্ছে মাত্র সাতশ থেকে হাজার রিঙ্গিতে। *[সূত্র: Jagonews24.com]*

গ. উদ্দীপকের সাথে পূর্ব বাংলার প্রতি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর কোন নীতির সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপকটি পূর্ব বাংলার প্রতি পাকিস্তানি শাসকদের অবিচারের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরে না— বিশ্লেষণ করো।

পাঠ ১১

পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্য
Economic Discrimination of West Pakistan towards East Pakistan

পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তান মারাত্মক অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার হয়। ফলে পূর্ব পাকিস্তান অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারেনি। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আয়তনে বড় হলেও পশ্চিম পাকিস্তানের অধিকাংশ অঞ্চল ছিল অনুর্বর ও মরুময়। সেজন্য এখানে কৃষি উন্নয়নের কোনো সম্ভাবনা ছিল না। শিল্পকারখানাও তেমন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ফলে আর্থিক দিক থেকে প্রথম দিকে পশ্চিম পাকিস্তান ছিল দুর্বল। অন্যদিকে, পূর্ব বাংলা ছিল প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। এজন্য এর অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যের কারণে পূর্ব বাংলার মানুষ এর সুফল থেকে বঞ্চিত হয়। পাকিস্তানের মোট রাজস্ব আয়ের শতকরা ৬০ ভাগ অর্জিত হতো পূর্ব বাংলা থেকে। অথচ এর মাত্র ২৫ ভাগ ব্যয় হতো এ অঞ্চলে। মোট রপ্তানি আয়ের ৬০ ভাগ বাংলার পণ্য থেকে অর্জিত হলেও বাংলা আমদানি পণ্যের মাত্র শতকরা ৩০ ভাগ পেতো। পাকিস্তানের জনসংখ্যার শতকরা ৬০ ভাগ পূর্ব পাকিস্তানের হলেও জাতীয় আয়ের মাত্র ২৭ ভাগ ব্যয় হতো এদের জন্য। মুদ্রা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারের হাতে ছিল না। কেন্দ্র এসব সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করত বলে পূর্ব পাকিস্তানের সব আয় চলে যেতো পশ্চিম পাকিস্তানে। তাছাড়া স্টেট ব্যাংকসহ প্রায় সব ব্যাংক, বিমা, বাণিজ্য, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বিদেশি মিশনসমূহের সদর দপ্তর পশ্চিম পাকিস্তানে স্থাপন করা হয়। ফলে এ অঞ্চল থেকে অবাধে অর্থ পাচার সম্ভব হয়।

শিল্পের কাঁচামাল পূর্ব পাকিস্তানে উৎপন্ন হলেও বড় বড় সব শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। পূর্ব পাকিস্তানে যে কয়টি শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তারও মালিকানা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিদের হাতে। পাকিস্তান রাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার ছিল সবক্ষেত্রে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। ফলে রাষ্ট্রীয় সব পরিকল্পনা প্রণীত হতো কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরে। আর এ বিভাগে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধি না থাকায় পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থান্বেষী মহল কৌশলে পূর্ব বাংলাকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে।

বাংলাদেশের জন্মলগ্ন পর্যন্ত পাকিস্তানে মোট তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গৃহীত হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা করা হয়েছিল ১৯৫৫-৫৬ সাল থেকে ১৯৫৯-৬০ সাল পর্যন্ত। এ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়ন খাতে সরকারিভাবে মোট ৩০০ কোটি ২০ লাখ রুপি বরাদ্দ করা হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যয় ছিল ১১৩ কোটি ৩ লাখ ৮০ হাজার রুপি। অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নখাতে ব্যয় ছিল প্রকৃতপক্ষে ৫০০ কোটি রুপি। অন্যভাষায়, পাকিস্তানের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময় সরকারিভাবে প্রতিবছর পশ্চিম পাকিস্তানে প্রায় ৪-৫ গুণ অর্থ বেশি বিনিয়োগ করা হয়েছিল। আবার এ সময়ে ব্যক্তিগত মালিকানা খাতে পূর্ব পাকিস্তানে ৭৩ কোটি এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ২৯৩ কোটি রুপি বিনিয়োগ করা হয়েছে।

পাকিস্তানের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে (১৯৬০-৬১ থেকে ১৯৬৪-৬৫ সাল) পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের মধ্যে জনসংখ্যা অনুপাতে সম্পদ পরিকল্পনায় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বরাদ্দকৃত ব্যয় ছিল যথাক্রমে ৯৫০ কোটি এবং ১৩৫০ কোটি রুপি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আইয়ুব খান দু'প্রদেশের মধ্যে বৈষম্য হ্রাস করার প্রতিশ্রুতি দিলেও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উন্নয়ন খাতে মোট বরাদ্দের ৪৫% পড়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের ভাগে। কিন্তু পরবর্তীকালে মোট খরচের মাত্র ৩১% ভাগ পূর্ব পাকিস্তানে এবং বাকি অংশ পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হয়েছিল। সুতরাং সার্বিকভাবে বিবেচনা করলে দেখা যায়, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে মোট বরাদ্দের ৬৯% ব্যয় করা হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। সেবা ও উন্নয়ন খাতেও বৈষম্য ছিল সুস্পষ্ট। সেবা ও উন্নয়ন খাতে বৈষম্যের চিত্র নিচের দুটি সারণি হতে পাওয়া যাবে।

সেবা খাতে ব্যয় বরাদ্দ

খাত	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান
জনসংখ্যা	৫ কোটি ৫০ লাখ	৭ কোটি ৫০ লাখ
ডাক্তারের সংখ্যা	১২,৪০০	৭,৬০০
হাসপাতালের বেড সংখ্যা	১৬,০০০	৬,০০০
পল্লি স্বাস্থ্যকেন্দ্র	৩২৫	৮৮
শহর সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্র	৮১	৫২

সূত্র: *আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, বাংলাদেশের ইতিহাস (১৯০৫-১৯৭১) পৃ. ৪০৪, সংস্করণ-২০১৩*

উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে ব্যয় বরাদ্দ

বিষয়	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান
বিভিন্ন উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা	৮০%	২০%
বৈদেশিক সাহায্য (মার্কিন সাহায্য ছাড়া)	৯৬%	৪%
মার্কিন সাহায্য	৬৬%	৩৪%
পাকিস্তান শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশন	৫৮%	৪২%
শিল্পঋণ ও বিনিয়োগ কর্পোরেশন	৮০%	২০%
শিল্পোন্নয়ন ব্যাংক	৭৬%	২৪%
গৃহ নির্মাণ	৮৮%	১২%

১৯৫৮-১৯৫৯ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষের মাথাপিছু গড় আয় ছিল পূর্ব পাকিস্তানের আয় অপেক্ষা শতকরা ৩২ ভাগ বেশি। ১৯৬৯-১৯৭০ সালে এর পরিমাণ দাঁড়ায় শতকরা ৬১ ভাগে। পাকিস্তানে গৃহীত মোট ৩টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যে সব উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল তাতে পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানে বরাদ্দ ছিল অনেক কম। পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও বৈষম্য ছিল ব্যাপক।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তান কোন ক্ষেত্রে বেশি বৈষম্যের শিকার হয়?
২. পাকিস্তানের মোট রাজস্ব আয়ের শতকরা কত ভাগ পূর্ব বাংলা থেকে অর্জিত হতো?
৩. পাকিস্তানের মুদ্রা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কার হাতে ছিল?
৪. পাকিস্তান রাষ্ট্রে সবক্ষেত্রে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী ছিল কে?
৫. সৃষ্টির পর পাকিস্তানে মোট কয়টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গৃহীত হয়?
৬. পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তানে ডাক্তারের সংখ্যা ছিল কত জন?

উত্তরের জন্য ৩৬১ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. পূর্ব বাংলার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে একটি তালিকা তৈরি করো।
২. পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তানে অর্থনৈতিক বিপর্যয় সৃষ্টির পাঁচটি কারণ লেখো।

পাঠ ১২

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার সামরিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্য
Discrimination between East and West Pakistan in the Military and other Sectors

সামরিক ক্ষেত্রে বৈষম্য (Discrimination in the Military Sector)

পূর্ব পাকিস্তান ছিল ভৌগোলিক দিক থেকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকেরা এর নিরাপত্তার ব্যাপারে কোনো নিশ্চিত ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত প্রায়ই অরক্ষিত থাকত। আইয়ুব খানের এক দশকের শাসনামলে সামরিক খাতে জাতীয় বাজেটের শতকরা ৬০ ভাগ ব্যয় করা হয়েছে। এ বিপুল বরাদ্দের দায়ভার পূর্ব পাকিস্তানকেও বহন করতে হয়েছে। তবে পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এর কোনো প্রভাব দেখা যায় না। শুধু তাই নয়, এ সময় দু'অঞ্চলের মধ্যে সামরিক বাহিনীতে নিয়োগের ক্ষেত্রেও বৈষম্য ছিল সীমাহীন। পাকিস্তানের দেশরক্ষা বাহিনীর তিনটি সদর দপ্তরই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। সামরিক বাহিনীর চাকরির ক্ষেত্রেও পশ্চিম পাকিস্তানিদের অবস্থান ছিল একচেটিয়া। নিচের সারণি থেকে এর একটি চিত্র পাওয়া যাবে—

বিভাগ	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান
স্থল বাহিনী	৯৫%	৫%
নৌবাহিনী (কারিগরি)	৮১%	১৯%
নৌবাহিনী (অকারিগরি)	৯১%	৯%
বিমান বাহিনীর বৈমানিক	৯১%	৯%
সশস্ত্র বাহিনী (সংখ্যায়)	৫,০০,০০০	২০,০০০

সামরিক বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা নিয়োগে বৈষম্য

বাহিনীর নাম	পদবি	মোট সংখ্যা	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান
স্থলবাহিনী	জেনারেল	০১	০১	০০
	লে. জেনারেল	০৩	০৩	০০
	মেজর জেনারেল	২১	২০	০১
	ব্রিগেডিয়ার	৩৫	৩৪	০১
	কর্নেল	৫১	৫০	০১
	লে. কর্নেল	২০০	১৯৮	০২
	মেজর	৬০০	৫৯০	১০
বিমান বাহিনী	অফিসার	৭০০	৬৪০	৬০
নৌবাহিনী	অফিসার	৬০০	৫৯৩	০৭

Source: *Constituent Assembly of Pakistan Debates, Vol-1, 17 January, 1956, P. 1845*

উপরের আলোচনায় দেখা যায়, পূর্ব পাকিস্তান ছিল সামরিক দিক থেকে অবহেলিত, উপেক্ষিত ও অরক্ষিত। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় সবাই এর সত্যতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য (Discrimination in the Educational Sector)

শিক্ষাক্ষেত্রেও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে চরম বৈষম্য দেখা যায়। পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও আনুপাতিক হারে বিদ্যালয়ের সংখ্যা হ্রাস পায়। অথচ একই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৭ সালে পূর্ব বাংলায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র সংখ্যা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের দ্বিগুণ। ২০ বছরে এখানে ৫ গুণ ছাত্র বৃদ্ধি পেলেও পশ্চিম পাকিস্তানে বৃদ্ধি পায় ৩০ গুণ। কৃষি, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানে ১৩

এবং পূর্ব পাকিস্তানে মাত্র ৩টি গবেষণাকেন্দ্র তৈরি করা হয়। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ এবং বিভিন্ন বৃত্তির সিংহভাগ সুবিধা পায় পশ্চিম পাকিস্তানিরা। ১৯৫৫-১৯৫৬ থেকে ১৯৬৬-১৯৬৭ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের শিক্ষা খাতে ২০৮৪.৬ মিলিয়ন রুপি বরাদ্দ হলেও এ থেকে পূর্ব পাকিস্তান পেয়েছে মাত্র ৭৯৭.৬ মিলিয়ন রুপি। শিক্ষাখাতে এরূপ বৈষম্যমূলক বরাদ্দের ফলে পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষা বিস্তারের গতি মন্থর হয়ে পড়ে।

সামাজিক বৈষম্য (Social Discrimination)

অর্থনৈতিক ও উন্নয়ন পরিকল্পনাগত বৈষম্যের কারণে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সামাজিক বৈষম্যও প্রকট আকার ধারণ করেছিল। অনেকেই মনে করেন, সরকার পরিকল্পিতভাবে এ বৈষম্য বজায় রেখেছিল। মানুষের জীবনমান উন্নয়নে পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের উদাসীনতার শিকার হয়। জনসেবার লক্ষ্যে পশ্চিম পাকিস্তানে অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও পূর্ব পাকিস্তান এ থেকে বিশেষ কোনো সেবা পায়নি। মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে পশ্চিম পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল ৫ কোটি ৫০ লাখ এবং পূর্ব পাকিস্তানের ৭ কোটি ৫০ লাখ। পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা বেশি হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানের সামাজিক উন্নয়নে অনেক কম পরিমাণে ব্যয় করা হতো। নিচের সারণি থেকে এ বৈষম্যের একটি চিত্র পাওয়া যাবে।

সেবা খাত	প্রকৃতি	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান
চিকিৎসাসেবা	ডাক্তারের সংখ্যা	১২৪০০ জন	৭৬০০ জন
	হাসপাতালে বেডের সংখ্যা	১৬০০০টি	৬০০০টি
	পল্লি স্বাস্থ্যকেন্দ্র	৩২৫টি	৮৮টি
শহর উন্নয়ন সেবা	শহর উন্নয়ন কেন্দ্র	৮১টি	৫২টি

বৈষম্যমূলক নীতির প্রতি বাঙালির প্রতিক্রিয়া
The Reaction of the Bengalees towards Discriminatory Policies

পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর এরূপ নির্লজ্জ বৈষম্যনীতি স্বাভাবিকভাবেই পূর্ব পাকিস্তানের জনমনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করে। পাকিস্তানিদের ব্যাপক রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য ও শোষণ নীতির প্রতিবাদে এ অঞ্চলের জনগণের প্রতিবাদ কর্মসূচির বহিঃপ্রকাশ হলো ৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ৫৪-এর প্রাদেশিক নির্বাচনের ব্যালট বিপ্লব, ৬২-এর ছাত্র আন্দোলন, ৬৬-এর ছয় দফা এবং ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান। আর এসব আন্দোলন-সংগ্রামের পথ ধরেই বাঙালি স্বাধীনতা অর্জনের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছার চেষ্টা করে। পরিণতিতে স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের পতন হয় এবং ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ নামের স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. পূর্ব পাকিস্তান কোন দিক থেকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল?
২. পাকিস্তানের দেশরক্ষা বাহিনীর তিনটি সদর দপ্তর কোথায় ছিল?
৩. প্রথম পাক-ভারত যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়?
৪. পূর্ব পাকিস্তানে কয়টি গবেষণাকেন্দ্র তৈরি করা হয়?
৫. মুক্তিযুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা কত ছিল?
৬. পশ্চিম পাকিস্তানিদের বৈষম্য ও শোষণ নীতির প্রতিবাদে বাঙালির অবস্থান কী ছিল?

উত্তরের জন্য ৩৬১ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. পূর্ব বাংলার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের সামাজিক বৈষম্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে একটি তালিকা তৈরি করো।
২. পাকিস্তানিদের বৈষম্যমূলক নীতির প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তানে যেসব আন্দোলন হয়েছিল তার একটি তালিকা তৈরি করো।

পাঠ ১৩

ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবির পটভূমি
Background of the Historic Six Point Demand

পূর্ব পাকিস্তানকে বৈষম্যের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান 'ছয় দফা' ঘোষণা করেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রওনক জাহানের মতে, ছয় দফা আন্দোলন ক্ষণস্থায়ী হলেও তা বাঙালির রাজনীতির ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটায় এবং পরবর্তীকালে রাজনৈতিক আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করে।[৩] ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শোষণ থেকে মুক্তির মহান উদ্দেশ্য নিয়ে পূর্ব বাংলা সমধর্মী পাকিস্তান রাষ্ট্রের সাথে যুক্ত হলেও তাদের ললাট রেখা থেকে শোষণ-বঞ্চনা দূরীভূত হয়নি। পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলাকে রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শোষণের কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ করে ফেলে। বিশেষ করে ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার প্রতি পাকিস্তান সরকারের চরম অবহেলা ও উদাসীনতা প্রকাশ পায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি ছয় দফা দাবি পেশ করা হয়। ছয় দফা দাবি পেশ করার বেশকিছু প্রেক্ষাপট ছিল। যেমন—

রাজনৈতিক পটভূমি: লাহোর প্রস্তাবের অন্যতম প্রতিশ্রুতি প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বঞ্চিত রাখা হয়। স্বাধীন রাষ্ট্রের সদর দপ্তর পশ্চিম পাকিস্তানে স্থাপনের ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিপুল বিজয়ের মাধ্যমে পূর্ব বাংলায় একটি জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু প্রতিশোধপরায়ণ কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকার মাত্র ৫৬ দিনের মাথায় ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ৯২(ক) ধারা প্রয়োগ করে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল করে পূর্ব বাংলায় গভর্নরের শাসন জারি করে। পাকিস্তান সৃষ্টির প্রায় এক দশক পরে প্রণীত ১৯৫৬ সালের সংবিধানকে দু'বছরের মাথায় ১৯৫৮ সালে বাতিল করে পাকিস্তানকে সামরিক স্বৈরশাসনের অধীন করা হয়। সংসদীয় গণতন্ত্রকে গলাটিপে হত্যা করে মৌলিক গণতন্ত্র নামে এক অদ্ভুত গণতন্ত্র প্রবর্তন করে রাষ্ট্র পরিচালনায় ব্যাপক জনগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ ভূমিকাকে সংকুচিত করা হয়। ১৯৬০ ও ১৯৬৫ সালে মৌলিক গণতন্ত্রের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জনগণকে প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার প্রয়োগ থেকে বঞ্চিত করা হয়। জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠায় শুধু বাধা প্রদানই নয়, বরং শাসনতান্ত্রিক নিয়মনীতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে পূর্ব পাকিস্তানের ওপর কেন্দ্র থেকে সব পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া হয়। এরূপ রাজনৈতিক বাস্তবতায় ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা কর্মসূচি উত্থাপন করেন।

জেনে রাখো

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত একটি ধারণা। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বলতে কেন্দ্রের অধীনে প্রদেশগুলোর স্বাধীনভাবে শাসনকাজ পরিচালনার ক্ষমতাকে বোঝায়। ব্রিটিশ আমলে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রথম কার্যকরভাবে প্রদেশগুলোকে স্বাধীনভাবে প্রদেশের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়। ১৯৬৬ সালে লাহোরের এক সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমানের উপস্থাপিত ছয় দফা দাবির প্রথম দফা ছিল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন তথা পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনভাবে দেশ পরিচালনার ক্ষমতা।

সামাজিক পটভূমি: পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সামাজিক কাঠামো ও সামাজিক জীবনযাত্রা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ও বিপরীতধর্মী। কেবল ভাষাগত পার্থক্য নয়, দৈনন্দিন জীবনাচরণ, পোশাক-আশাক ও খাদ্যাভ্যাসেও ছিল উভয় অংশের মানুষের মধ্যে ব্যাপক অমিল। জীবনমানের বিবেচনায় পূর্ব অপেক্ষা পশ্চিম পাকিস্তানিদের অবস্থা ছিল অনেক উন্নত। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী এ সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেয়নি। বরং তাদের বিমাতাসুলভ আচরণের ফলে তা আরও প্রকট রূপ ধারণ করে। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জনমনে যে ক্ষোভের আগুন জ্বলে ওঠে সেই পটভূমিতেই ছয় দফা কর্মসূচি উপস্থাপিত হয়।

অর্থনৈতিক পটভূমি: স্বাধীন পাকিস্তানে পশ্চিমা শাসকদের ঔপনিবেশিক মনোভাবের কারণে পূর্ব বাংলা চরম আর্থিক শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হয়েছিল। ১৯৬২ সালে প্রণীত সংবিধানে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের বিধান রাখা হলেও বাস্তবে এ বিষয়ে সরকার কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। বরং সরকারের উদাসীনতার

---

[৩] Rounaq Jahan, *Pakistan Failure in National Integration, Dhaka, 2001*

ফলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার অর্থনৈতিক বৈষম্য ক্রমশ ব্যাপক আকার ধারণ করে। দেশের সব শিল্পকারখানা প্রায় ৬০ ভাগ উর্দুভাষী ২২টি পরিবারের হাতে কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। তাছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের কাঁচামাল দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পকারখানায় পণ্য উৎপাদন করে তা এদেশে এনে বেশি মূল্যে বিক্রি করা হতো। ফলে এ অঞ্চলের মানুষ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতো। এতে পূর্ব বাংলার জনগণের মনে যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল সে পটভূমিতে ছয় দফা পেশ করা হয়।

সামরিক পটভূমি: সামরিক দিক থেকেও পূর্ব পাকিস্তান ছিল বঞ্চনার শিকার। সেনাবাহিনীর উচ্চপদে বাঙালির সংখ্যা ছিল একেবারেই নগণ্য। সামরিক ব্যয়ের দিক থেকেও পূর্ব পাকিস্তান ছিল বঞ্চিত। সামরিক দিক দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান ছিল সম্পূর্ণ অরক্ষিত। ১৯৬৫-এর পাক-ভারত যুদ্ধে এটি প্রমাণিত হয়। এ নিয়েও বাঙালির মনে প্রবল ক্ষোভ ছিল।

ছয় দফা কর্মসূচি উপস্থাপন ও অনুমোদন: বিরূপ রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায় কাশ্মির সমস্যাকে কেন্দ্র করে ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধ এবং বিশেষ করে তৎপরবর্তী 'তাসখন্দ ঘোষণাপত্র' কেবল পূর্ব পাকিস্তানে নয়, পশ্চিম পাকিস্তানের জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরোধীদলীয় রাজনীতিবিদরা এ বিষয়ে আলোচনার জন্য ১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে 'নিখিল পাকিস্তান জাতীয় কনফারেন্স' আহ্বান করেন। সম্মেলনে প্রায় ৭০০ প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। তবে এতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি সংখ্যা ছিল মাত্র ২১ জন। তারা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। এ সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনসহ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা বিষয়ক দাবি সংবলিত একটি 'ছয় দফা প্রস্তাব' উত্থাপনের চেষ্টা করেন। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনীতিবিদদের বিরোধিতায় তিনি ব্যর্থ হন। অবশেষে লাহোরে আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে তার কর্মসূচি প্রকাশ করেন। 'ছয় দফাভিত্তিক' এ কর্মসূচি ইতিহাসে 'ঐতিহাসিক ছয় দফা' নামে পরিচিত। ৭ ফেব্রুয়ারি ঢাকার সংবাদপত্রে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হয়। এ ছয় দফা সম্পর্কে আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতাদের মধ্যে কিছুটা আপত্তি ও বিভ্রান্তি থাকলেও দলের তরুণ নেতা-কর্মীরা এর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানায়। শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফাকে 'আমাদের বাঁচার দাবি' বলে আখ্যায়িত করেন। ফলে ছয় দফার পক্ষে দ্রুত ব্যাপক জনমত গড়ে ওঠে। ২১ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের ব্যানারে এবং শেখ মুজিবুর রহমানের নামে 'ছয় দফা: আমাদের বাঁচার দাবি' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। ১৯৬৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি এবং ১৯ মার্চ কাউন্সিল অধিবেশনে 'ছয় দফা' কর্মসূচি অনুমোদন করা হয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কত সালে শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা দাবি পেশ করেন? *[জবি ২০১৭-১৮; সবি ২০১৬-১৭]*

২. ছয় দফা কর্মসূচি কোথায় পেশ করা হয়?

৩. পাকিস্তানে কত সালে সামরিক শাসন জারি করা হয়?

৪. কোন সমস্যাকে কেন্দ্র করে ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধ সংঘটিত হয়?

৫. ছয় দফা দাবি সংক্রান্ত পুস্তিকাটির নাম কী ছিল? *[ঢাবি ২০১৭-১৮]*

৬. আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি কত সালে 'ছয় দফা' কর্মসূচি অনুমোদন করে?

উত্তরের জন্য ৩৬১ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

ছয় দফা কর্মসূচি উপস্থাপনের পাঁচটি যৌক্তিক কারণ চিহ্নিত করে ছকে উপস্থাপন করো।

পাঠ ১৪ ও ১৫

ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবিসমূহ, প্রতিক্রিয়া এবং ছয় দফার গুরুত্ব ও তাৎপর্য (Historic Six-Point Demand, Reaction and Importance and Significance of the Six Point)

ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবিসমূহ (Historic Six-Point Demand)

পাকিস্তানি অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ ও বৈষম্য থেকে বাঙালিকে মুক্ত করার লক্ষ্যে শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলের সম্মেলনে ঐতিহাসিক ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা দিতে ব্যর্থ হয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এ কর্মসূচি ঘোষণা দেন। ছয় দফা দাবিসমূহ নিম্নরূপ:

প্রথম দফা:

শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রের প্রকৃতি: ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তানের জন্য একটি শাসনতন্ত্র রচনা করে একে সত্যিকার অর্থে একটি যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত করতে হবে। এর সরকার হবে সংসদীয় পদ্ধতির। প্রদেশগুলো পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন লাভ করবে। সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সকল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

জেনে রাখো

সংসদীয় গণতন্ত্র এক প্রকারের রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থা, যাতে সর্বময় ক্ষমতা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সংসদের ওপর ন্যস্ত থাকে। এ ব্যবস্থায় সরকার প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন প্রধানমন্ত্রী। এ ধরনের শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা নগণ্য। যুক্তরাজ্য, ভারত, বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক দেশেই বর্তমানে এ ব্যবস্থা চালু আছে।

দ্বিতীয় দফা:

কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতা: কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনাধীনে কেবল প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রসংক্রান্ত বিষয় থাকবে। অবশিষ্ট ক্ষমতা থাকবে প্রদেশগুলোর হাতে।

তৃতীয় দফা:

মুদ্রা ও অর্থবিষয়ক ব্যবস্থা: মুদ্রা ও অর্থবিষয়ক দুটি বিকল্প প্রস্তাব করা হয়। যথা:

ক. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটি সহজ ও অবাধ বিনিময়যোগ্য পৃথক মুদ্রা থাকবে। এ অবস্থায় দুই অঞ্চলে দুটি স্টেট ব্যাংক থাকবে এবং মুদ্রা ও ব্যাংক পরিচালনার ক্ষমতা থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে। অথবা,

খ. ফেডারেল ব্যাংকের অধীনে দুই প্রদেশে দুটি রিজার্ভ ব্যাংকসহ একই ধরনের মুদ্রা চালু থাকবে। এক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রে এমন বিধান রাখতে হবে যাতে এক অঞ্চলের মুদ্রা অন্য অঞ্চলে পাচার না হতে পারে।

চতুর্থ দফা:

রাজস্ব ও শুল্কবিষয়ক ব্যবস্থা: সকল প্রকার কর ধার্য ও আদায়ের ব্যবস্থা থাকবে প্রদেশগুলোর হাতে। আদায়কৃত রাজস্বের একটি অংশ সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিলে জমা হয়ে যাবে। এ মর্মে রিজার্ভ ব্যাংকসমূহের ওপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রেই থাকবে। এভাবে জমাকৃত অর্থই ফেডারেল সরকারের তহবিল হবে।

পঞ্চম দফা:

বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক মুদ্রাবিষয়ক ব্যবস্থা: বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা ও বৈদেশিক মুদ্রার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকবে প্রদেশের হাতে। দুই অঞ্চলের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার আলাদা হিসাব থাকবে। প্রয়োজনে দু'অঞ্চল থেকে সমান হারে অথবা সংবিধানে নির্ধারিত হারে কেন্দ্রকে বৈদেশিক মুদ্রা প্রদান করা হবে। এ দফায় আরও বলা হয়েছিল যে, দেশজাত দ্রব্যাদি বিনাশুল্কে উভয় অঞ্চলের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি চলবে। ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে বিদেশের সাথে চুক্তি সম্পাদন, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপন এবং আমদানি-রপ্তানি করার অধিকার আঞ্চলিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করে শাসনতান্ত্রিক বিধান জারি করতে হবে।

ষষ্ঠ দফা:

প্রতিরক্ষাবিষয়ক ব্যবস্থা: নিজস্ব নিরাপত্তার জন্য অঙ্গরাজ্যগুলো আঞ্চলিক সেনাবাহিনী তথা মিলিশিয়া বা প্যারামিলিশিয়া বাহিনী গঠন করতে পারবে।

ছয় দফার প্রতিক্রিয়া (Reaction of Six Point)

ছয় দফা পূর্ব পাকিস্তানের শোষিত ও নির্যাতিত মানুষের মনে নতুন আশার সঞ্চার করে। ফলে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এর প্রতি সমর্থন জানায়। ছয় দফার সমর্থনে শেখ মুজিবুর রহমান ২০ মার্চ থেকে ৮ মে পর্যন্ত মোট ৩২টি জনসভায় বক্তব্য দেন। তাছাড়া আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের ব্যাপক জনসংযোগ ও প্রচারণার ফলে পূর্ব পাকিস্তানে ক্রমশ এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অন্যদিকে সরকার, পশ্চিম পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দ ছয় দফার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। তারা ছয় দফার নানা অপব্যাখ্যা এবং একে জাতীয় সংহতির পরিপন্থি হিসেবে আখ্যায়িত করে। ১৫ মার্চ প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান বলেন, পাকিস্তানকে ধ্বংস করার অজুহাতে ছয় দফা ঘোষণা করা হয়েছে। অন্য একটি বক্তৃতায় তিনি একে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বলে আখ্যা দেন। তিনি ছয় দফাকে 'হিন্দু আধিপত্যাধীন যুক্তবাংলা গঠনের ষড়যন্ত্র' বলে মনে করেন। পূর্ব পাকিস্তানে ছয় দফা কর্মসূচির জনপ্রিয়তায় ভীত হয়ে সরকার দমননীতি প্রয়োগ করে। গভর্নর মোনায়েম খানের নির্দেশে শেখ মুজিবুর রহমানসহ বহু নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। এতে পূর্ব পাকিস্তানে দারুণ ক্ষোভের সঞ্চার হয়। বন্দিদের মুক্তির দাবিতে ১৯৬৬ সালের ৭ জুন প্রদেশব্যাপী এক সর্বাত্মক হরতালের ডাক দেওয়া হয়। ঐ দিন সরকার ঘোষিত নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে মিছিল বের করে। পুলিশ মিছিলকারীদের ওপর গুলিবর্ষণ করলে কিশোর মনুমিয়াসহ ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে ১১ জন নিহত ও শতশত লোক আহত হয়। জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের বিরোধীদলীয় সদস্যবৃন্দ এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান।

জেনে রাখো

ছয় দফার মূলকথা—

১. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতির সংসদীয় সরকার গঠন।
২. কেন্দ্রের কাছে প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রবিষয়ক ক্ষমতা রেখে অন্যান্য ক্ষমতা প্রদেশকে দেওয়া।
৩. সহজে বিনিময়যোগ্য দুটি অথবা শর্তসাপেক্ষে একটি মুদ্রার প্রচলন।
৪. শুল্ক ধার্য এবং আদায়ের ক্ষমতা প্রদেশকে দেওয়া।
৫. প্রদেশগুলো নিজেদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার মালিক হবে এবং এর নির্ধারিত অংশ কেন্দ্রকে দেবে।
৬. প্রদেশগুলো আঞ্চলিক সামরিক বাহিনী গঠন করতে পারবে।

এদিকে আইয়ুববিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো একত্রিত হয়ে ১৯৬৭ সালের ২ মে 'পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট (পিডিএম)' গঠন করে। পিডিএম-এর পক্ষ থেকে ৮ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। এগুলো ছিল ছয় দফার বর্ধিত সংস্করণ। এ দফাভিত্তিক আন্দোলন ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। এ দাবিগুলো জাতীয় দাবিতে পরিণত হয়। সরকারও আন্দোলন দমনে নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা কার্যকর রাখে।

ছয় দফার গুরুত্ব ও তাৎপর্য (Importance and Significance of Six Point)

পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকার আন্দোলনের পটভূমিতে ছয় দফার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। এর প্রত্যেকটি দফাই ছিল বাঙালির প্রত্যাশিত অধিকার। তাই ছয় দফাকে গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়।

বলিষ্ঠ প্রতিবাদ: পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের প্রতি সর্বক্ষেত্রে যে বৈষম্য ও শোষণ নীতি গ্রহণ করেছিল, ছয় দফা কর্মসূচি ছিল তার বিরুদ্ধে প্রথম বলিষ্ঠ ও সুসংগঠিত প্রতিবাদ।

মধ্যবিত্তের আকাঙ্ক্ষার প্রতীক: এটি ছিল পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যবিত্ত শ্রেণির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীকস্বরূপ। শেখ মুজিবুর রহমান নিজেই একে বাঙালির বাঁচার দাবি এবং বাংলার মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার নিশ্চিত পদক্ষেপ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। বস্তুত ছয় দফা কর্মসূচিভিত্তিক আন্দোলনের মাধ্যমেই পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে মধ্যবিত্ত শ্রেণি প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার দাবি জোরদার করা: ছয় দফা কর্মসূচিতে বাঙালি জাতির চরম প্রত্যাশিত স্বায়ত্তশাসনের সোচ্চার দাবি জানানো হয়। এর মধ্য দিয়ে বাঙালির স্বাবলম্বী হওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত হয়। অন্যভাবে বলতে গেলে ছয় দফা ছিল মূলত পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবি। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটি স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে বাঁচার দাবি। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শাসন-শোষণ ও বঞ্চনার হাত থেকে বাঙালি জাতিকে মুক্ত করার জন্য এটি ছিল বাস্তবভিত্তিক অনুপ্রেরণাসমৃদ্ধ একটি কর্মসূচি।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ: ছয় দফাভিত্তিক আন্দোলন দমনের জন্য সরকার কঠোর-নিপীড়নমূলক নীতি গ্রহণ করে। এর ফলে বাঙালি জাতির মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, তারা নবজাগ্রত চেতনাবোধে উদ্দীপ্ত হয়। এ নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদী চেতনা তাদের ঐক্য ও সংহতি জোরদার করে। বাঙালির এ ঐক্য, সংহতি ও সংগ্রামী চেতনার ফসল '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান।

স্বাধীনতার দাবি ও সংগ্রামের শক্তি: ছয় দফা আন্দোলন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মাইলফলক হিসেবে কাজ করে। এটি ছিল পূর্ব বাংলার মানুষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য একটি সুস্পষ্ট রূপরেখা। এতে প্রদেশের জন্য স্বায়ত্তশাসন, নিজস্ব মুদ্রানীতি ও কর ব্যবস্থার দাবি উঠে আসে, যা সরাসরি কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে গৃহীত হয়। এই দাবিগুলোর মাধ্যমে পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র জাতিসত্তার চেতনার সৃষ্টি হয় এবং পাকিস্তানি শাসকদের বৈষম্যমূলক নীতির বিরুদ্ধে গণআন্দোলন জোরদার হয়। ফলে ছয় দফা শুধু দাবির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

জেনে রাখো

ইংল্যান্ডে ১২১৫ সালে স্বাক্ষরিত একটি চুক্তি হলো ম্যাগনাকার্টা। ঐতিহাসিকভাবে ম্যাগনাকার্টা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে একে আধুনিক সাংবিধানিক শাসনের সূচনাকারী বলা হয়। ইংল্যান্ডের রাজা জন সামন্তদের চাপে পড়ে রাজার অধিকার সংক্রান্ত এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এর শর্তগুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে রাজা স্থানীয় প্রতিনিধিদের অনুমোদন ছাড়া কারও স্বাধীনতায় বা সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না। ক্ষমতালিপ্সু রাজা সহজেই এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে চাননি। কিন্তু সব সামন্ত মিলে রাজা জনকে লন্ডনের কাছে এক দ্বীপে বন্দি করে এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেন।

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়: বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত রূপ হলো ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ, যার মাধ্যমে বাঙালি জাতি স্বাধীনতা লাভ করে এবং অভ্যুদয় হয় স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের। এটি বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে এবং তাদের শেষ পর্যন্ত একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় প্রেরণা জোগায়। পাকিস্তানের ইতিহাসে ১৯৬৬ সালের ছয় দফা কর্মসূচি ছিল একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। ছয় দফা দাবি বাঙালির জাতীয় চেতনার মূলে স্বাধীনতার স্পৃহা জাগ্রত করছিল। অনেকেই মনে করেন, ব্রিটিশ গণতন্ত্রের ইতিহাসে 'ম্যাগনাকার্টা' (Magna Carta), ফরাসি বিপ্লবের 'অধিকার বিল' (Bill of Rights) এবং যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে 'ব্যক্তি স্বাধীনতা'র (Individual Freedom) অবদানের মতোই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ছয় দফার ভূমিকা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ছয় দফার প্রথম দাবি কী ছিল?
২. ছয় দফা দাবিতে প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রসংক্রান্ত বিষয় কার পরিচালনাধীনে থাকার কথা বলা হয়?
৩. ছয় দফাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বলে আখ্যা দেন কে?
৪. কোনটি বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ? *[রাবি ২০১২-১৩]*
৫. ব্রিটিশ ম্যাগনাকার্টা বিলের সাথে কোনটিকে তুলনা করা হয়েছে?
৬. বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত রূপ কী?

উত্তরের জন্য ৩৬১ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. ছয় দফার প্রতি পাকিস্তান সরকারের প্রতিক্রিয়া এবং পূর্ব পাকিস্তানে এর জনপ্রিয়তা সম্পর্কিত দুটি ছক তৈরি করো।
২. ঐতিহাসিক ছয় দফা কর্মসূচিকে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বলার পাঁচটি যৌক্তিক কারণ চিহ্নিত করে একটি চার্ট তৈরি করো।

পাঠ ১৬

আগরতলা মামলা (১৯৬৮)
Historic Agartala Case (1968)

সামরিক স্বৈরাচারী প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের শাসনামলের সবচেয়ে ঘৃণ্য ও প্রহসনমূলক ঘটনা হলো 'আগরতলা মামলা'। পূর্ব পাকিস্তানকে রাজনৈতিকভাবে দুর্বল ও নেতৃত্বশূন্য করে এ অঞ্চলে আইয়ুব খানের ক্ষমতা ও প্রভাব বৃদ্ধির সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা মাথায় রেখেই ১৯৬৮ সালে এ মামলাটি করা হয়েছিল। তবে গণদাবির মুখে শেষ পর্যন্ত আইয়ুব খানের উদ্দেশ্য সফল হয়নি। তিনি মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন।

আগরতলা মামলার পটভূমি (Background of the Agartala Case)

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালে ক্ষমতা দখল করে সামরিক আইন জারি করেন। তিনি সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ জনগণের রাজনৈতিক অধিকার কেড়ে নেন। ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী করার লক্ষ্যে তিনি ১৯৫৯ সালে 'মৌলিক গণতন্ত্র' নামে এক অবাস্তব ও অদ্ভুত ব্যবস্থা চালু করে রাজবন্দিদের মুক্তি দেন। এ সময় আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান কারাগার থেকে মুক্তি পান। তিনি মুক্ত হয়েই দল পুনর্গঠনসহ মানুষকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলেন। এ প্রেক্ষাপটে তিনি বাঙালির ন্যায়সংগত অধিকার সংবলিত ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেন, যা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন জনমানুষের দাবিতে পরিণত হয়। ছয় দফা দাবি আদায়ে বাঙালি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলে। সরকারও এর বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। সরকারি দমন-নিপীড়ন ও নির্যাতন সত্ত্বেও ছয় দফা কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে পূর্ব পাকিস্তানে ক্রমশ আন্দোলন জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং ছড়িয়ে পড়ে। এ পর্যায়ে ১৯৬৭ সালের জুন মাসে রেডিও, টেলিভিশনে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধ এবং হিন্দু সংস্কৃতি আখ্যা দিয়ে পহেলা বৈশাখ উদযাপনে বিধি-নিষেধ আরোপ ও বাংলা ভাষার সংস্কার করে আরবি হরফে বাংলা লেখার সরকারি উদ্যোগের প্রতিবাদে সারা পূর্ব পাকিস্তান প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। ছয় দফাভিত্তিক আন্দোলন তখন অনেকটাই গণআন্দোলনে রূপ নেয়। এ পরিস্থিতিতে সরকার ভিন্ন কৌশল গ্রহণ করে। বাঙালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নস্যাতের উদ্দেশ্যে ১৯৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারি সরকার একটি রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা করে। শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি করে মোট ৩৫ জন সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তিকে মামলায় আসামি করা হয়।

অভিযোগনামা: আগরতলা মামলায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের অভিযোগ ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলাতে ভারতীয় সরকারি কর্মকর্তাদের গোপন বৈঠক হয়। সেখানে ভারতের সহায়তায় পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার পরিকল্পনা করা হয়। এজন্য মামলাটির নাম হয় 'আগরতলা মামলা'। সরকারি নথিতে মামলাটির নাম হলো 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য'। তবে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর প্রচারণায় এটি 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামে অভিহিত হয়।

মামলার উদ্দেশ্য: আগরতলা মামলা দায়েরের পেছনে সরকারের বিভিন্ন উদ্দেশ্য ছিল। যেমন– ক. পূর্ব পাকিস্তানে পরিচালিত ছয় দফাভিত্তিক গণআন্দোলনকে নস্যাৎ করা, খ. পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ওপর বাঙালি জাতির বিশ্বাসযোগ্যতা অক্ষুণ্ন রাখা, গ. পূর্ব পাকিস্তানে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন নির্মূল করা, ঘ. পশ্চিমাদের সহানুভূতি অর্জনের লক্ষ্যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের মধ্যে বিরোধ ও বিভেদ বৃদ্ধি করা, ঙ. এ মামলার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানিদের রাজনৈতিক উত্থান প্রতিহত করা এবং চ. চাকুরিতে ন্যায্য প্রাপ্তি থেকে সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের বঞ্চিত করা। উল্লেখ্য যে, এ মামলায় দু'জন সিএসপিকে তাদের সচিব পদ লাভ থেকে বঞ্চিত করার অপচেষ্টা করা হয়। সার্বিকভাবে বাঙালির অধিকার আদায়ের আন্দোলন দাবিয়ে রাখার জন্য বাঙালি নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে আগরতলা মামলা দায়ের করা হয়েছিল।

আগরতলা মামলার আসামি (The Accused In the Agartala Case)

১৯৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারি ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার অধীনে চূড়ান্তভাবে প্রণীত আসামিদের তালিকা ছিল নিম্নরূপ:

১	শেখ মুজিবুর রহমান (ফরিদপুর)	১৯	খান শামসুর রহমান সিএসপি (ঢাকা)
২	লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন (বরিশাল)	২০	রিসালদার এ.কে.এম.শামসুল হক (ঢাকা)
৩	স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান (মাদারিপুর)	২১	হাবিলদার আজিজুল হক (বরিশাল)
৪	এল. এস. সুলতান উদ্দিন আহম্মেদ (নোয়াখালী)	২২	মাহফুজুল বারি (নোয়াখালী)
৫	এল. এস. নূর মোহাম্মদ (ঢাকা)	২৩	সার্জেন্ট সামসুল হক (নোয়াখালী)
৬	আহমেদ ফজলুর রহমান সিএসপি (ঢাকা)	২৪	মেজর ডা. শামসুল আলম (ঢাকা)
৭	ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজউল্লাহ (নোয়াখালী)	২৫	ক্যাপ্টেন মো. আবদুল মোতালেব (ময়মনসিংহ)
৮	এ.বি.এম আবদুস সামাদ (বরিশাল)	২৬	ক্যাপ্টেন শওকত আলী (ফরিদপুর)
৯	প্রাক্তন হাবিলদার দলিল উদ্দিন হাওলাদার (বরিশাল)	২৭	ক্যাপ্টেন খন্দকার নাজমুল হুদা (বরিশাল)
১০	রুহুল কুদ্দুস সিএসপি (খুলনা)	২৮	ক্যাপ্টেন এ. এস. এম. নুরুজ্জামান (নরসিংদি)
১১	ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক (বরিশাল)	২৯	ফ্লাইট সার্জেন্ট আবদুল জলিল (ঢাকা)
১২	ভূপতি ভূষণ (মানিক) চৌধুরী (চট্টগ্রাম)	৩০	মাহবুব উদ্দিন চৌধুরী (সিলেট)
১৩	বিধানকৃষ্ণ সেন (চট্টগ্রাম)	৩১	লে. এম.এম.এম. রহমান (যশোর)
১৪	সুবেদার আবদুর রাজ্জাক (কুমিল্লা)	৩২	সুবেদার এ.কে.এম. তাজুল ইসলাম (বরিশাল)
১৫	হাবিলদার মুজিবর রহমান (কুমিল্লা)	৩৩	মোহাম্মদ আলী রেজা (কুষ্টিয়া)
১৬	সাবেক ফ্লাইট সার্জেন্ট আবদুর রাজ্জাক (কুমিল্লা)	৩৪	ক্যাপ্টেন খুরশিদ উদ্দিন আহম্মেদ (ময়মনসিংহ)
১৭	সার্জেন্ট জহুরুল হক (নোয়াখালী)	৩৫	লে. আবদুর রউফ (ময়মনসিংহ)
১৮	এ.বি.এম. খুরশীদ (ফরিদপুর)		

বাঙালি জনগোষ্ঠী এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বকে দমিয়ে রাখার এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র ছিল আগরতলা মামলা। পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবি স্বাধিকার ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনকে দমন করতেই আইয়ুব সরকার এ হীন চক্রান্ত করে। এই মামলার ফলে ছাত্রদের ১১ দফা আন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়, যা এ দেশের মানুষকে স্বাধীনতা যুদ্ধের পথে পরিচালিত করে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আগরতলা মামলা দায়ের করেন কে? *[সকল বোর্ড ২০২১; ২০১৬]*
২. আগরতলা মামলা কত সালে দায়ের করা হয়? *[জাবি ২০১১-১২]*
৩. আগরতলা মামলার দাপ্তরিক নাম কী?
৪. ১৯৫৯ সালে 'মৌলিক গণতন্ত্র' চালু করেন কে?
৫. আগরতলা মামলার আসামি ছিল কত জন? *[সকল বোর্ড ২০১৯]*
৬. আগরতলা মামলার ফলে কোন আন্দোলন সংঘটিত হয়?

উত্তরের জন্য ৩৬১ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

আগরতলা মামলার আসামিদের নামের একটি তালিকা তৈরি করো।

পাঠ ১৭

আগরতলা মামলার বিচার প্রক্রিয়া এবং এর ফলাফল ও গুরুত্ব
Trials of the Agartala Case and Its Resuts and Significance

আগরতলা মামলার বিচার প্রক্রিয়া (Trials of Agartala Case)

আগরতলা মামলার বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য সরকার ১৯৬৮ সালের ১২ এপ্রিল আইন ও বিচার পদ্ধতি সংক্রান্ত একটি ফৌজদারি অধ্যাদেশ জারি করে। এ অধ্যাদেশ (অর্ডিন্যান্স নম্বর ৫-১৯৬৮) অনুযায়ী বিচারকাজ পরিচালনার জন্য পাকিস্তানের সাবেক প্রধান বিচারপতি এস এ রহমানকে চেয়ারম্যান এবং বিচারপতি এম আর খান ও বিচারপতি মাকসুম-উল-হাকিমকে সদস্য করে ৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। ১৯৬৮ সালের ১৯ জুন বেলা এগারোটায় ঢাকায় কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টের একটি কক্ষে দেশি-বিদেশি প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সংবাদ কর্মীদের উপস্থিতিতে মামলার শুনানি শুরু হয়। পাকিস্তানের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রখ্যাত পাঞ্জাবি আইনজীবী মঞ্জুর কাদের রাষ্ট্রপক্ষের প্রধান কৌশুলী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ কাজে তাকে সহায়তা করার জন্য আরও বেশকিছু আইনজীবী নিয়োগ করা হয়। অন্যদিকে আসামিপক্ষে মামলা পরিচালনার জন্য একটি 'ডিফেন্স কমিটি' গঠন করা হয়। ইংল্যান্ডের রানির আইনবিষয়ক উপদেষ্টা প্রখ্যাত ব্রিটিশ আইনজীবী টমাস উইলিয়াম এতে নেতৃত্ব দেন। এছাড়া ডিফেন্স কমিটিতে অন্য আইনজীবীদের মধ্যে ছিলেন ড. আলীম আল রাজী, মওদুদ আহমদ, আতাউর রহমান খান, আবদুস সালাম খান, খান বাহাদুর ইসলাম, খান বাহাদুর নাজিরুদ্দিন, জহিরুদ্দিন, জুলমত আলী খান ও মোল্লা জালালউদ্দিন প্রমুখ। ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত মামলার শুনানি অব্যাহত থাকে। সব আসামিই লিখিত ও মৌখিক জবানবন্দির মাধ্যমে নিজেদের নির্দোষ দাবি করেন। মামলায় প্রায় আড়াই শতাধিক সাক্ষীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। সরকারের জোর জবরদস্তির কারণে অনেকেই সাক্ষী হয়। তবে আদালতে এসে মামলার সাক্ষীদের মিথ্যা বলার অনীহা এবং আসামিদের জোরালো প্রতিবাদের মুখে মামলার বিচারকার্যক্রম ক্রমশ শিথিল হয়ে পড়ে।

জেনে রাখো

বিশেষ ট্রাইব্যুনাল হলো কোনো নির্দিষ্ট বিষয় অথবা বিবাদের তদন্ত ও বিচার করতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত একটি বিচারবিভাগীয় ট্রাইব্যুনাল। গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ ট্রাইব্যুনালের মধ্যে পাকিস্তান আমলে আগরতলা মামলার বিচারের জন্য একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়েছিল। ১৯৭২ সালে যখন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত হয়, তখন এতে ট্রাইব্যুনালের কোনো উল্লেখ ছিল না। পরে সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯১ কর্তৃক আদালত শব্দটির পর ট্রাইব্যুনাল শব্দটি সংযোজন করা হয়।

মামলা প্রত্যাহার: আগরতলা মামলা পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মনে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। মামলার আসামিদের মুক্তি ও মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনগুলোর পরিচালনায় যে আন্দোলন শুরু হয় তা আইয়ুববিরোধী গণআন্দোলনে রূপ নেয়। এ সময় পুলিশের গুলিতে ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান, বন্দি অবস্থায় ঢাকা সেনানিবাসে আগরতলা মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হক এবং রাজশাহী বিশ্বদ্যিালয়ের প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহা নিহত হলে আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। অবশেষে তীব্র আন্দোলনের মুখে সরকার ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। মামলায় গ্রেফতারকৃতদের নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়া হয়।

আগরতলা মামলার ফলাফল ও গুরুত্ব (Results and Significance of the Agartala Case)

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে আগরতলা মামলার ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। বাঙালির দৃঢ় ও ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদের মুখে এ মামলার পেছনে পাকিস্তান সরকারের অসৎ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। এ মামলা প্রত্যাহারের মধ্য দিয়ে আইয়ুব সরকারের দুর্বলতা প্রকাশিত হয়। এটি একটি প্রহসনের মামলা ছিল বলে প্রমাণিত হয়। এমনকি গণআন্দোলনের মুখে আইয়ুব খান ক্ষমতা ত্যাগে বাধ্য হন। এটি ছিল বাঙালিদের জন্য এক বিরাট বিজয়। অন্যদিকে, এ মামলা ছিল আইয়ুব খানের জন্য আত্মঘাতী পরাজয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আগরতলা মামলার বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য সরকার কখন একটি ফৌজদারি অধ্যাদেশ জারি করে?

২. আগরতলা মামলার বিচারকাজ পরিচালনার জন্য কয় সদস্যবিশিষ্ট বিশেষ ট্রাইব্যুনাল আদালত গঠন করা হয়?

৩. আগরতলা মামলার বিচার কাজ শুরু হয় কত সালে?

৪. আগরতলা মামলার আসামিপক্ষে মামলা পরিচালনায় নেতৃত্ব দেন কে?

৫. কত সালে আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করা হয়? *[ঢাবি ২০১১-১২]*

৬. কোন মামলা আইয়ুব খানের জন্য আত্মঘাতী পরাজয় ছিল?

উত্তরের জন্য ৩৬১ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. আগরতলা মামলা পরিচালনার জন্য আসামিদের পক্ষে গঠিত কমিটির পরিচয় দাও।

২. আগরতলা মামলার ফলাফল ও গুরুত্বের আলোকে একটি চার্ট তৈরি করো।

গ. বাড়ির কাজ

প্রতিবেশী গ্রাম রহমতপুরের সহায়তায় ধর্মপুর গ্রাম থেকে পূর্ব ধর্মপুর অংশকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে গ্রামের প্রধান নেতাসহ কয়েকজন সৎ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তিকে এলাকার জনগণের কাছে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে চিহ্নিত করে সরকার। তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করে পূর্ব ধর্মপুরকে নেতৃত্বশূন্য করে চলমান আন্দোলনকে স্তিমিত করার জন্য ৩৫ জনের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র মামলা করা হয়।

১. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনা তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ঘটনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো।

২. উক্ত ঘটনার প্রতিক্রিয়া পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

পাঠ ১৮

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের পটভূমি, কারণ এবং লক্ষ্য
Background, Causes and Aims of the Mass Uprising in 1969

বাঙালি জাতির রাজনৈতিক বিকাশ তথা স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। বস্তুত প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের সব গণবিরোধী কর্মকাণ্ড ও সামরিক স্বৈরাচারের অবসান এবং স্বাধিকার অর্জনের লক্ষ্যে ছয় দফা ও ছাত্রদের ১১ দফার ভিত্তিতে ১৯৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তানে পরিচালিত তীব্র গণআন্দোলনই '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান' নামে পরিচিত।

গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক পটভূমি (Background of the Mass Uprising in 1969)

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও সামরিক ক্ষেত্রে চরম বৈষম্য বাঙালির মনে যে ক্ষোভের বহ্নিশিখা প্রজ্বলিত করেছিল ছয় দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি উপেক্ষিত হওয়ায় তা আরও ব্যাপক আকার ধারণ করে। এ অবস্থায় সরকারের আগরতলার মিথ্যা মামলা দায়ের আন্দোলনের গতিকে আরও তীব্র করে। পূর্ববর্তী পাঠে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আগরতলা মামলার ফলে পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুববিরোধী আন্দোলন নতুন মাত্রা লাভ করেছিল। এ আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য ১৯৬৯ সালের ৮ই জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তানের ৮টি বিরোধী রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়ে 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি' (Democratic Action Committee) সংক্ষেপে DAC নামে একটি ঐক্যজোট গঠন করে। আইয়ুবের স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ও মৌলিক অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য আন্দোলন পরিচালনা করা ছিল 'ডাক'-এর উদ্দেশ্য। এজন্য 'ডাক' ৮ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। ডাক মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা বাতিল করে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবি জানায়। ইতোমধ্যে ১৯৬৮ সালের ২৭ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান তাঁর ক্ষমতার দশম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে পাকিস্তানে 'উন্নয়ন দশক' পালনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এ কর্মসূচি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে শোষণ-বঞ্চনা ও ষড়যন্ত্রের শিকার পূর্ব পাকিস্তানিদের মনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করে। এমতাবস্থায় বিক্ষুব্ধ জনতা আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে ডাক-এর ব্যানারে ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু করে।

ছাত্রদের এগারো দফাভিত্তিক আন্দোলন: আইয়ুববিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পূর্ব পাকিস্তানের সচেতন ছাত্রসমাজের ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিল। ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়নের মস্কো ও পিকিংপন্থি দুটি গ্রুপ এবং জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের (এসএমএফ) একাংশ ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' (Students Action Committee) গঠন করে। আন্দোলন কর্মসূচি হিসেবে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এগারো দফা দাবিনামা প্রণয়ন করে। এই এগারো দফা দাবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল— পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন, প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার ও সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন, বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিলসহ শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি, ব্যাংক ও বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ, কৃষকদের খাজনা ও ট্যাক্স হ্রাস, শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিতকরণ, সব নির্যাতনমূলক আইন বাতিল এবং বন্দিদের মুক্তি ও আগরতলা মামলাসহ সব মামলা প্রত্যাহার ইত্যাদি। ছাত্রদের এগারো দফা পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করে।

যুগপৎ আন্দোলন: ডাক এবং সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের যুগপৎ কর্মসূচিতে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৯৬৯ সালের ১৪ জানুয়ারি পূর্ব-পাকিস্তানে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। হরতাল চলাকালে আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে ১৮ জানুয়ারি ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘট পালন করা হয়। এদিনও ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ হয় এবং এতে কয়েকজন ছাত্র আহত ও কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হলে পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করে। প্রতিবাদে ডাক ও সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ২০ জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল কর্মসূচি ঘোষণা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সমাবেশের ডাক দেয়।

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের কারণ (Causes of the Mass Uprising in 1969)

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের কারণগুলো ছিল—

পাকিস্তান সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণ: পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে দীর্ঘদিনের শোষণ-বঞ্চনার পরিণতি ছিল ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান। শুরু থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক নীতির বহিঃপ্রকাশ হতে থাকে। আইয়ুব খানের ১০ বছর সামরিক শাসনে যে প্রবৃদ্ধি ঘটে তা পশ্চিম পাকিস্তানের ২২টি পরিবারের হাতেই কুক্ষিগত থাকে। ফলে এ সম্পদ পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে কোনো কাজেই আসেনি।

গণতান্ত্রিক আদর্শ লঙ্ঘন: পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক আদর্শ লঙ্ঘনের প্রবণতা দেখা যায়। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের সামরিক আইন ঘোষণার ফলে পাকিস্তানের উভয় অংশে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও ভাবধারা বিপর্যস্ত হয়। তার প্রতিবাদস্বরূপ ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান সূচিত হয়।

মৌলিক গণতন্ত্রের প্রভাব: ১৯৫৯ সালের শেষের দিকে আইয়ুবের দূরভিসন্ধিমূলক সৃষ্ট রাজনৈতিক সুবিধাভোগী মৌলিক গণতন্ত্রীদের দুর্নীতি একদিকে যেমন পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য আরও বৃদ্ধি করে, অন্যদিকে তেমনি রাজনৈতিক দালালদের তৎপরতাও বৃদ্ধি পায়। বাংলার মাটিতে মীর জাফর সৃষ্টি করে তাদের সহায়তায় বাঙালি জনগণকে পদানত রাখার চেষ্টা করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনেম খান তাদেরই প্রতিনিধি হিসেবে বাঙালি স্বার্থবিরোধী চক্রের নেতৃস্থানীয় হয়ে উঠেছিল।

আমলাতন্ত্রের প্রাণহীন অবস্থা: পাকিস্তান আমলাতন্ত্রের প্রাণহীন শাসন ব্যবস্থা এবং তাদের অত্যধিক ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রতিবাদে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান সৃষ্টি হয়।

অবহেলার ফল: পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে পূর্ব পাকিস্তানিদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক দাবি-দাওয়ার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর চরম অবজ্ঞা ও অবহেলা এবং ষড়যন্ত্রের ফলেই ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়।

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের লক্ষ্য (Aims of Mass Uprising in 1969)

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের বেশ কিছু লক্ষ্য ছিল। যেমন—

১. গণতন্ত্রের আদর্শ বাস্তবায়ন।
২. স্বায়ত্তশাসনের অলঙ্ঘনীয় দাবি পূরণ।
৩. পাহাড় সমান বৈষম্যের শেকড় ভাঙার সংকল্প।
৪. গণবিরোধী অশুভ শক্তির মূল উৎপাটন।
৫. আমলানির্ভর সামরিক চক্রের কর্তৃত্ব লোপ।
৬. সকল প্রকার মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার এবং রাজবন্দিদের মুক্তি।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাঙালির গণঅভ্যুত্থান কত সালে সংঘটিত হয়?
২. ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান কীসের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়?
৩. Democratic Action Committee বা DAC কয়টি রাজনৈতিক দল নিয়ে গঠিত হয়?
৪. 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয় কখন?
৫. 'এগারো দফা' কখন ঘোষণা করা হয়? *[রাবি ২০০৮-০৯]*
৬. এগারো দফা দাবি কাদের ছিল? *[সকল বোর্ড ২০২৫]*

উত্তরের জন্য ৩৬১ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. ছাত্রদের এগারো দফা আন্দোলনের দাবিগুলো ছক আকারে লেখো।
২. ১৯৬৯ গণঅভ্যুত্থানের কারণগুলো ছকে উপস্থাপন করো।

পাঠ ১৯ ও ২০

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের ঘটনাবলি, ফলাফল ও গুরুত্ব
Events, Consequences and Importance of the Mass Uprising 1969

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের ঘটনাবলি (Events the of Mass Uprising in 1969)

১৯৬৮ সালের শেষ দিকে ছাত্র অসন্তোষকে কেন্দ্র করে পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুববিরোধী আন্দোলন জোরদার হতে থাকে। শহর এবং গ্রামের শ্রমিক-কৃষক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৬৮ সালের নভেম্বর মাসের ছাত্র অসন্তোষ মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে গণআন্দোলনে পরিণত হয়। ফলে স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠে এক দুর্বার আন্দোলন, যা 'ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান' নামে পরিচিত। ১৯৬৯ গণঅভ্যুত্থান ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরবর্তীকালের সবচেয়ে বড় আন্দোলন।

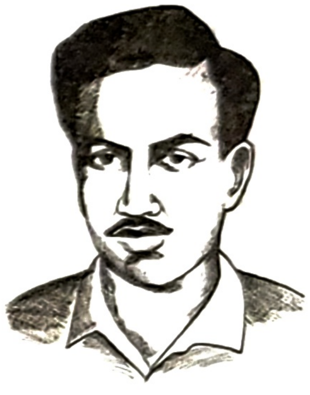
ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান

ছাত্রনেতা আসাদের মৃত্যু ও গণঅভ্যুত্থান: ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত ছাত্র সমাবেশে হাজার হাজার ছাত্র যোগদান করে। সমাবেশ শেষে একটি মিছিল পুলিশের বাধা উপেক্ষা করে শহিদ মিনারের দিকে অগ্রসর হলে পুলিশ ও ইপিআর বাহিনীর সাথে তাদের সংঘর্ষ বাঁধে। একপর্যায়ে পুলিশ বিক্ষুব্ধ ছাত্র জনতার ওপর গুলি চালালে ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামানসহ আরও তিন জন নিহত হন। এ ঘটনা যেন জ্বলন্ত বারুদে অগ্নিসংযোগ করে। এ ঘটনার প্রতিবাদে ২১ জানুয়ারি দেশব্যাপী সাধারণ হরতাল পালিত হয়। ঐ দিন পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত শহিদদের গায়েবানা জানাজা শেষে ২২, ২৩ ও ২৪ জানুয়ারি শোক কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। প্রথম দু'দিন ধর্মঘট ও বিক্ষোভ এবং শেষদিন প্রদেশব্যাপী হরতালের ডাক দেওয়া হয়। ২৪ তারিখের হরতালের দিনটি মারাত্মক গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। পুলিশের বাধা উপেক্ষা করে বাঁধভাঙা জোয়ারের মতো ছাত্র-জনতা রাজপথে নেমে আসে। তাদের পদভারে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে রাজপথ এবং নড়বড়ে হয়ে যায় স্বৈরশাসকের ভিত। এদিন উত্তেজিত ছাত্র-জনতা সচিবালয় আক্রমণ ও অগ্নিসংযোগ করলে পুলিশ গুলি চালায়। এতে নবকুমার ইনস্টিটিউটের ছাত্র মতিউর রহমানসহ কয়েকজন নিহত ও বেশ কয়েকজন আহত হয়। প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রবল আকার ধারণ করে। শহিদ মতিউরের লাশ নিয়ে উত্তেজিত জনতা বিশাল শোভাযাত্রা বের করে। এ সময় প্রবল জনরোষে আক্রান্ত হয় সরকার সমর্থক 'দৈনিক পাকিস্তান' ও 'দি মর্নিং নিউজ' পত্রিকা অফিস। কারফিউ জারির মাধ্যমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার সরকারি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। সারাদেশে প্রবলবেগে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। পশ্চিম পাকিস্তানেও এ আন্দোলনের ঢেউ লাগে। একনায়কতন্ত্রের অবসান ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে লাহোর, রাওয়ালপিন্ডি, পেশোয়ার ও করাচি থেকে শুরু হয়ে আন্দোলন ক্রমশ পশ্চিম পাকিস্তানের মফস্বল এলাকায়ও ছড়িয়ে পড়ে।

আইয়ুব খানের আলোচনার প্রস্তাব ও পরবর্তী পরিস্থিতি: পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান যখন গণবিদ্রোহের জোয়ারে উত্তাল তখন ১৯৬৯ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে বিরোধী রাজনীতিবিদদের সাথে আলোচনার প্রস্তাব দেন। ১৭ ফেব্রুয়ারি রাওয়ালপিন্ডিতে বৈঠক অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করা হয়। কিন্তু মওলানা ভাসানী বৈঠকে যোগদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। কারাগারে আটক শেখ মুজিবুর রহমান প্যারোলে মুক্তি নিয়ে আলোচনায় অংশ নিতে অস্বীকৃতি জানান। ফলে ১৭ ফেব্রুয়ারি বৈঠক অনুষ্ঠানে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। এতে গণআন্দোলন আরও তীব্র হয়। ১৪ ফেব্রুয়ারি সাধারণ হরতাল পালিত এবং বিকেলে পল্টন ময়দানে বিশাল ছাত্র-গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এদিকে ১৫ ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে ঢাকা সেনানিবাসে আটক আগরতলা মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হকের মৃত্যু এবং ১৮ ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. শামসুজ্জোহার মৃত্যুতে সারাদেশে আন্দোলনের দাবানল ছড়িয়ে পড়ে।

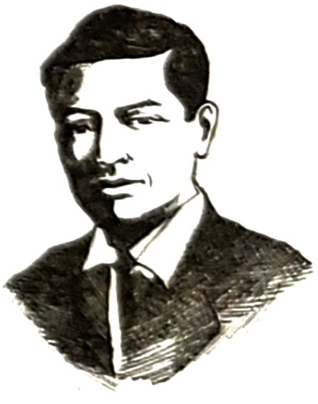
অধ্যাপক ড. শামসুজ্জোহা

আইয়ুব খানের নতিস্বীকার: প্রবল গণবিদ্রোহের মুখে আইয়ুব খান নতিস্বীকারে বাধ্য হন। আন্দোলন প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে জরুরি অবস্থা উঠিয়ে নেওয়া এবং ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করা হয়। মামলার সব আসামিকে মুক্তি দেওয়া হয়। একই সাথে তিনি আর প্রেসিডেন্ট প্রার্থী না হওয়ারও ঘোষণা দেন। কারাগার থেকে মুক্তিলাভের পর শেখ মুজিবুর রহমান

২৬ ফেব্রুয়ারি রাওয়ালপিন্ডিতে সরকারের সাথে এক গোলটেবিল বৈঠকে মিলিত হন। ঐদিন ৪০ মিনিট আলোচনার পর ১০ মার্চ পর্যন্ত বৈঠক মুলতুবি করা হয়। ১০ মার্চ অনুষ্ঠিত বৈঠকে শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা ও এগারো দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি পুনর্ব্যক্ত করেন। তবে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচন এবং সংসদীয় সরকার প্রবর্তনের দাবি মেনে নিলেও স্বায়ত্তশাসনের দাবি অগ্রাহ্য করেন। ফলে বৈঠক ব্যর্থ হয়।

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের পদত্যাগ: গোলটেবিল বৈঠকের ব্যর্থতার পর রাজনৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটে। এমতাবস্থায় ক্ষমতা রক্ষার শেষ চেষ্টা হিসেবে আইয়ুব খান গণধিকৃত মোনায়েম খানকে বরখাস্ত করে অর্থমন্ত্রী ড. এম এন হুদাকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিয়োগ করেন। কিন্তু তাতেও পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয়নি। বরং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটে। সমগ্র পরস্থিতি সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। এ অবস্থায় উপায়ান্তর না দেখে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ সেনাপ্রধান আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। এভাবে আইয়ুববিরোধী গণঅভ্যুত্থান সফলতা লাভ করে। প্রচণ্ড গণঅভ্যুত্থানে আইয়ুব খানের এক দশকের স্বৈরশাসনের অবসান ঘটে।

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের ফলাফল (Consequences of the Mass Uprising in 1969)

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের প্রত্যক্ষ ফলাফল ছিল আগরতলা মামলার সব আসামি ও রাজবন্দিদের মুক্তি দান এবং ঐ মামলা প্রত্যাহার। এর ফলে আইয়ুব খানের পতন হয়। ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা দখল করে দ্বিতীয়বার সামরিক শাসন জারি করেন। এসব প্রত্যক্ষ ফলাফল ছাড়াও ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। যেমন—

১. ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদ পূর্ণতা লাভ করে।
২. ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের ফলে পাকিস্তানি শাসকচক্রের ভিত নড়ে ওঠে। ফলে তারা বাধ্য হয়ে ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা করে।
৩. এই অভ্যুত্থান ছিল শোষকের কাছ থেকে শোষিতের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের হাতিয়ারস্বরূপ।
৪. এই আন্দোলনকে ভিত্তি করে বাঙালি জাতি স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হয় এবং মাত্র দুই বছর পরেই স্বাধীনতা লাভ করে।
৫. ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি বাংলার আপামর জনসাধারণের গণরায় পরিষ্কার হয়ে যায় এবং এটাও প্রমাণ হয় যে, শাসন-শোষণের স্টিম রোলার চালিয়ে আর বাঙালিকে দমন করা যাবে না।
৬. এই অভ্যুত্থানের ফলে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর মনোবল ভেঙে যায়।
৭. বাংলার জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচায়ক হিসেবে শ্রেণিগত ও অঞ্চলগত দ্বি-বিধ শাসন, হরতাল, মিছিল, মিটিং ও ঘেরাও আন্দোলন শুরু হয়। ফলে জন্ম হয় স্বাধীন বাংলাদেশের।

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের গুরুত্ব (Importance of the Mass Uprising in 1969)

বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। পাকিস্তানের ইতিহাসে এ যাবৎকালের সবচেয়ে বৃহৎ এ আন্দোলনের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। এ আন্দোলনের তাৎক্ষণিক সাফল্য ছিল আগরতলা মামলা প্রত্যাহার এবং শেখ মুজিবসহ রাজবন্দিদের মুক্তিলাভ। তাছাড়া এ আন্দোলনের ফলে মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার অবসান ঘটে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার সূচনাসহ সর্বজনীন প্রত্যক্ষ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক ধারায় প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ তৈরি হয়। রাজনীতিতে আইয়ুব খান সমর্থিত এলিটশ্রেণির মনোবল দুর্বল হয়ে পড়ে। বাঙালি জাতীয়তাবাদ আরও সুসংহত রূপ ধারণ করে। আইয়ুব খানের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বাঙালি ঐক্যবদ্ধ হয়। বাকস্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ তাদের চূড়ান্ত ত্যাগের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হলে প্রবল গণঅভ্যুত্থানের মুখে আইয়ুব খান পদত্যাগে বাধ্য হন। আইয়ুব খানের পদত্যাগের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মধ্যে জাতীয় ঐক্য আরও সুদৃঢ় হয়। এ পর্যায়ে তারা চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের পথে অগ্রসর হতে থাকে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পক্ষে ব্যাপক গণরায় প্রদানের মাধ্যমে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটানো হয়। তৎপরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ মহান মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রভূমি তৈরি করে, যার মধ্য দিয়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। এসব দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের গুরুত্ব অপরিসীম।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে পুলিশের গুলিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান (আসাদ) কত তারিখে শহিদ হন? *[সকল বোর্ড ২০২৫]*

২. ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে শহিদ হওয়া মতিউর রহমান কোন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন?

৩. আগরতলা মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হক কত তারিখে মৃত্যুবরণ করেন?

৪. উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে প্রথম শহিদ বুদ্ধিজীবী কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক? *[রাবি ২০১১-১২]*

৫. প্রবল গণঅভ্যুত্থানে আগরতলা মামলা প্রত্যাহারে বাধ্য হন কে?

৬. প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান কখন পদত্যাগ করেন?

উত্তরের জন্য নিচে দেখো।

খ. দলীয় কাজ

দলে বিভক্ত হয়ে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের ঘটনা ও ফলাফল নিয়ে দুটি স্লাইড তৈরি করে শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিতে উপস্থাপন করো।

পাঠ মূল্যায়নের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর

পাঠ-১ ও ২: ১. রাষ্ট্রভাষা; ২. ৫৬.৪০; ৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আবুল কাশেম; ৪. পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু; ৫. খাজা নাজিমউদ্দীন; ৬. ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি।

পাঠ-৩: ১. বৃহস্পতিবার; ২. রফিকউদ্দিন আহমদ; ৩. আবুল বরকত; ৪. কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার; ৫. ১৯৫২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি; ৬. হামিদুর রহমানের।

পাঠ-৪: ১. ভাষা আন্দোলন; ২. ভাষা আন্দোলন; ৩. ভাষা আন্দোলন; ৪. আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী; ৫. বর্ধমান হাউস; ৬. ১৯৯৯ সালে ১৭ নভেম্বর।

পাঠ-৫ ও ৬: ১. ১৯৪৬; ২. ১৬টি; ৩. পাঁচটি; ৪. ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর; ৫. নৌকা; ৬. ২১ দফা।

পাঠ-৭: ১. ১৯৫৪; ২. ৩৭.১৯ ভাগ; ৩. ২২৩টি; ৪. ১০টি; ৫. ১৯৫৪ সালের নির্বাচন; ৬. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে।

পাঠ-৮: ১. পূর্ব বাংলার মানুষের; ২. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে; ৩. সাংগঠনিক দুর্বলতা; ৪. দৈনিক আজাদ; ৫. শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক; ৬. ১৯৫৪ সালের ৩০ মে।

পাঠ-৯ ও ১০: ১. বৈষম্যমূলক; ২. ৩ জন; ৩. পশ্চিম পাকিস্তানিরা; ৪. পাঞ্জাবি কর্মকর্তাদের; ৫. ১ জন; ৬. ১৫ ভাগ।

পাঠ-১১: ১. অর্থনৈতিক; ২. ৬০ ভাগ; ৩. কেন্দ্রীয় সরকারের; ৪. কেন্দ্রীয় সরকার; ৫. তিনটি; ৬. ৭,৬০০ জন।

পাঠ-১২: ১. ভৌগোলিক; ২. পশ্চিম পাকিস্তানে; ৩. ১৯৬৫; ৪. মাত্র ৩টি; ৫. ৭ কোটি ৫০ লাখ; ৬. প্রতিবাদ কর্মসূচি গ্রহণ।

পাঠ-১৩: ১. ১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি; ২. লাহোরে সাংবাদিক সম্মেলনে; ৩. ১৯৫৮; ৪. কাশ্মির সমস্যা; ৫. ছয় দফা: আমাদের বাঁচার দাবি; ৬. ১৯৬৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি।

পাঠ-১৪ ও ১৫: ১. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন; ২. কেন্দ্রীয় সরকারের; ৩. প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান; ৪. ছয় দফা কর্মসূচি; ৫. ছয় দফাকে; ৬. ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ।

পাঠ-১৬: ১. প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান; ২. ১৯৬৮; ৩. 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য'; ৪. প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান; ৫. ৩৫ জন; ৬. ছাত্রদের ১১ দফা আন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থান।

পাঠ-১৭: ১. ১৯৬৮ সালের ১২ এপ্রিল; ২. ৩ সদস্যবিশিষ্ট; ৩. ১৯৬৮ সালের ১৯ জুন; ৪. ব্রিটিশ আইনজীবী টমাস উইলিয়াম; ৫. ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি; ৬. আগরতলা মামলা।

পাঠ-১৮: ১. ১৯৬৯; ২. ছয় দফা ও ছাত্রদের এগারো দফা; ৩. আটটি; ৪. ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে; ৫. ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে; ৬. ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের।

পাঠ-১৯ ও ২০: ১. ২০ জানুয়ারি; ২. নবকুমার ইনস্টিটিউট; ৩. ১৯৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি (ঢাকা সেনানিবাসে, পুলিশের গুলিতে); ৪. রাজশাহী; ৫. প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান; ৬. ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ।

৫ এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

বাংলা ভাষা	বাংলা ভাষা (বাঙলা, বাঙ্গালা বা বাঙালা নামেও পরিচিত) একটি ইন্দো-আর্য ভাষা, যা দক্ষিণ এশিয়ার বাঙালি জাতির প্রধান কথ্য ও লেখ্য ভাষা। মাতৃভাষার সংখ্যায় বাংলা ইন্দো-ইউরোপীয় পরিবারের চতুর্থ এবং বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম ভাষা। মোট ব্যবহারকারীর সংখ্যা অনুসারে বাংলা বিশ্বের সপ্তম বৃহত্তম ভাষা। বাংলা স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের একমাত্র রাষ্ট্র বা সরকারি ভাষা। এটি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসামের বরাক উপত্যকার সরকারি ভাষা। বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের প্রধান কথ্য ভাষা বাংলা। সারা বিশ্বে সব মিলিয়ে ২৬ কোটিরও বেশি মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবনে বাংলা ব্যবহার করে। বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন চর্যাপদ। মাগধী প্রাকৃত থেকে ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছে। অষ্টম শতক থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতকের শেষে এসে বাংলা তার বর্তমান রূপ লাভ করেছে। বাংলা ভাষার লিপি হলো বাংলা লিপি।
তমদ্দুন মজলিশ	ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা প্রথম সাংস্কৃতিক সংগঠন হলো তমদ্দুন মজলিশ। ১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক আবুল কাশেমের উদ্যোগে ঢাকায় তমদ্দুন মজলিশ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সংগঠনের পক্ষ থেকে 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। এটি ছিল ভাষা আন্দোলনের প্রথম পুস্তিকা। ভাষা আন্দোলনকে সাংগঠনিক রূপ দেওয়ার জন্য 'তমদ্দুন মজলিশ' এর উদ্যোগে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয়।
ভাষা আন্দোলন	বাঙালির মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিচালিত আন্দোলনই ভাষা আন্দোলন নামে পরিচিত। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার ওপর নানা বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করে। প্রথমেই তারা আঘাত হানে বাঙালির ভাষার ওপর। পূর্ব পাকিস্তানের মোট জনগোষ্ঠীর ৫৬.৪০ শতাংশের মুখের ভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও সংখ্যালঘিষ্ঠ মাত্র ৩.২৭ শতাংশ জনগোষ্ঠীর ভাষা উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু বাঙালি এ বৈষম্যমূলক আচরণের তীব্র প্রতিবাদ জানায়। তারা দেশব্যাপী বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি এ আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। এদিন রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে আন্দোলন করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারান রফিক, শফিউর, জব্বার, সালাম, বরকত প্রমুখ। বাঙালির এ আত্মত্যাগই ইতিহাসে ভাষা আন্দোলন নামে পরিচিত।
১৪৪ ধারা	১৪৪ ধারা হলো ভারতীয় ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর একটি ধারা। এই আইনের ক্ষমতাবলে একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কোনো এলাকায় একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সভা-সমাবেশ করা, আগ্নেয়াস্ত্র বহনসহ যেকোনো কাজ নিষিদ্ধ করতে পারেন। এ আইন প্রয়োগ করার উদ্দেশ্য হতে হবে কোনো ব্যক্তি বা জনগণের জীবন, স্বাস্থ্য বা নিরাপত্তা ক্ষতি হওয়ার ঝুঁকি দূর করা অথবা মানুষের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা। ১৯৭৬ সালে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ গঠনের পর শুধু মহানগরী এলাকার জন্য এ বিধান রহিত করে নতুন বিধান চালু করা হয়েছে। ১৮৯৮ সালে ব্রিটিশ শাসকদের চালুকৃত ১৪৪ ধারার বিধান বিভিন্ন সময়ে বিরোধী মত দমনে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ছাত্রদের আন্দোলন দমন করতে ১৪৪ ধারা জারি করা হয় এবং এ ধারা ভঙ্গ করায় পুলিশ গুলি করে সালাম, বরকত, রফিকসহ আরও অনেককে হত্যা করে। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান দমনে ১৪৪ ধারা প্রয়োগ করা হয়।
জাতীয়তাবাদ	জাতীয়তাবাদ শব্দটি ইংরেজি ন্যাশনালিজম শব্দের বাংলা পরিভাষা। ন্যাশনালিজম শব্দটি ১৮৪৪ সালে থেকে ব্যবহৃত হতে থাকে, যদিও জাতীয়তাবাদ মতবাদটি আরও আগে থেকে চলে আসছে। জাতীয়তাবাদ একটি আদর্শ যেখানে জাতিকে মানবসমাজের কেন্দ্রীয় অবস্থানে রেখে অন্যান্য সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শকে জাতিগত আদর্শের পরে স্থান দেওয়া হয়। এটি একটি রাজনৈতিক অভিব্যক্তি। জাতীয়তাবাদী চেতনার কারণে ব্যক্তি নিজেকে একটি নির্দিষ্ট জাতির অন্তর্ভুক্ত মনে করে এবং সেই জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ভৌগোলিক পরিবেশ, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতির সাথে একাত্মবোধ অনুভব করে।

সাম্প্রদায়িকতা	সাম্প্রদায়িকতা বা Communalism হচ্ছে এক ধরনের মনোভাব বা সম্প্রদায়ভিত্তিক চিন্তাভাবনা ও কর্মকাণ্ড। কোনো ব্যক্তির মনোভাবকে তখনই সাম্প্রদায়িক বলে আখ্যা দেওয়া হয় যখন সে এক বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্তির ভিত্তিতে অন্য এক ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং তার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধচারণ এবং ক্ষতিসাধনে প্রস্তুত থাকে। 'সাম্প্রদায়িকতা' শব্দের সংজ্ঞায় দুটি অর্থ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথম অর্থ হচ্ছে নিজের সম্প্রদায়কে শ্রেষ্ঠ মনে করা। আর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, এ বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে সব কার্যকলাপ পরিচালনা করা অর্থাৎ অন্যের ওপর আমার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু প্রতিটি ধর্মের শিক্ষা হচ্ছে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে শ্রদ্ধা করা এবং পারস্পরিক সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্কের মাধ্যমে দেশ ও জাতির উন্নয়ন করা।
যুক্তফ্রন্ট	যুক্তফ্রন্ট ১৯৫৪ সালের ৮-১২ মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিত পূর্ব বাংলার আইনসভার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য গঠিত বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের নির্বাচনি জোট হলো যুক্তফ্রন্ট। এ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে। ১৯৫৩ সালের ১৪ নভেম্বর ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক কাউন্সিল সম্মেলনে যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয় এবং ৪ ডিসেম্বর দলটি গঠিত হয়। পূর্ব বাংলার পাঁচটি বিরোধী দল নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল। এ দলগুলো হলো— ১. আওয়ামী মুসলিম লীগ (১৯৪৯ সালে সোহরাওয়ার্দী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত) ২. নেজাম-ই-ইসলাম (মাওলানা আতাহার আলীর নেতৃত্বাধীন), ৩. কৃষক-শ্রমিক পার্টি (১৯৫৩ সালে শেরে বাংলা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত), ৪. বামপন্থি গণতন্ত্রী দল (হাজী দানেশের নেতৃত্বাধীন) এবং ৫. খিলাফত-ই-রব্বানি (আবুল হাশিমের নেতৃত্বাধীন)।
ছয় দফা	১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরের এক সাংবাদিক সম্মেলনে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা দাবি পেশ করেন। এ দাবিতে বাঙালির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির কথা উল্লেখ ছিল। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে ছয় দফা দাবি ছিল প্রথম বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। এতে বাঙালির চরম প্রত্যাশিত স্বায়ত্তশাসনের জোর দাবি উত্থাপন করা হয়। তাছাড়া ছয় দফায় বাঙালির পৃথক অর্থ এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দাবি জানানো হয়। এতে বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের প্রত্যয় ব্যক্ত হয়।
গণঅভ্যুত্থান	অভ্যুত্থান শব্দটি ফরাসি ভাষা থেকে এসেছে, যার অর্থ হচ্ছে আকস্মিকভাবে সরকারের বিরুদ্ধে অবরোধ করা। অনানুষ্ঠানিকভাবে অভ্যুত্থান বা ক্যু শব্দটি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়ে থাকে। সুতরাং গণঅভ্যুত্থান বলতে কোনো স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সব শ্রেণির মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে বোঝায়। যেমন— ১৯৬৯ সালে স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র, পেশাজীবী, কৃষক-শ্রমিক তথা সব শ্রেণির মানুষ আন্দোলন করে, যা গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়। ফলে আইয়ুব খান ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হন। আবার ১৯৯০ সালে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবিতে এদেশের মানুষ স্বৈরশাসক এরশাদের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থান গড়ে তুলেছিল।

▶ অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ সাল ও ঘটনা

সাল	ঘটনা
১৯৪৭	ঢাকায় অধ্যাপক আবুল কাশেমের নেতৃত্বে 'তমদ্দুন মজলিশ' নামে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন গঠন করা হয়।
১৯৪৮	২ মার্চ 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয় ও ১১ই মার্চ বাংলাভাষা দিবস পালন করা হয়। এবং ২১ ও ২৪ মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে ঘোষণা করে।
১৯৫২	ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায় সংঘটিত হয় এবং কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়।
১৯৫৪	প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং যুক্তফ্রন্টের ব্যালট বিপ্লব ঘটে।
১৯৫৫	বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেওয়া হয়।
১৯৬২	ছাত্র আন্দোলন সংঘটিত হয়।
১৯৬৬	ছয় দফা দাবি উত্থাপন এবং এ প্রেক্ষিতে আন্দোলন সংঘটিত হয়।
১৯৬৮	শেখ মুজিবকে প্রধান আসামি করে ৩৫ জনের বিরুদ্ধে আগরতলা মামলা দায়ের করা হয়।
১৯৬৯	গণঅভ্যুত্থান বা গণআন্দোলন সংঘটিত হয়। ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করা হয়।

সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

ক. জ্ঞানমূলক

■ ভাষা আন্দোলন: বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ

প্রশ্ন-১. ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয় কখন?
উত্তর: ১৯৪৭ সালে ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করার প্রস্তাব করলে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।

প্রশ্ন-২. পাকিস্তানে মোট জনসংখ্যার কত অংশের মাতৃভাষা ছিল বাংলা?
উত্তর: পাকিস্তানে মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৬.৪০ অংশের মাতৃভাষা ছিল বাংলা।

প্রশ্ন-৩. পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা ছিল কী? *[সকল বোর্ড ২০১৯, ২০১৫]*
উত্তর: পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা ছিল বাংলা।

প্রশ্ন-৪. পাকিস্তানের লিয়াকত আলীর শাসনকাল কত?
উত্তর: পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলীর শাসনকাল ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত।

প্রশ্ন-৫. 'তমদ্দুন মজলিশ' কী?
উত্তর: 'তমদ্দুন মজলিশ' ১৯৪৭ সালে গঠিত একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন, যেটি বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষা ও বাঙালির মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রেখেছিল।

প্রশ্ন-৬. তমদ্দুন মজলিশের প্রতিষ্ঠাতা কে? *[ঢা. বো., রা. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫; সি. বো., ব. বো. ২০২১; সকল বোর্ড ২০১৮]*
উত্তর: তমদ্দুন মজলিশের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক আবুল কাশেম।

প্রশ্ন-৭. 'তমদ্দুন মজলিশ' থেকে প্রকাশিত পুস্তিকার নাম কী?
উত্তর: 'তমদ্দুন মজলিশ' থেকে প্রকাশিত পুস্তিকার নাম 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু'।

প্রশ্ন-৮. সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় কত সালে?
উত্তর: সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় ১৯৪৮ সালের ২ মার্চ।

প্রশ্ন-৯. প্রথম 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের' আহ্বায়ক কে ছিলেন?
উত্তর: 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের' আহ্বায়ক ছিলেন নূরুল হক ভূঁইয়া।

প্রশ্ন-১০. কে কখন উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করেন?
উত্তর: ১৯৪৮ সালের মার্চে পাকিস্তানের গর্ভনর জেনারেল মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় দুটি ভাষণে ২১ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে এবং ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসাবে ঘোষণা করেন।

প্রশ্ন-১১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয় কত সালে?
উত্তর: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয় ১৯৫০ সালের ১১ মার্চ।

প্রশ্ন-১২. ভাষা আন্দোলনের সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?
উত্তর: ভাষা আন্দোলনের সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন খাজা নাজিমউদ্দীন।

প্রশ্ন-১৩. ভাষা আন্দোলনের সময় পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন?
উত্তর: ভাষা আন্দোলনের সময় পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন নূরুল আমীন।

প্রশ্ন-১৪. ভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত রূপলাভ করে কত সালে?
উত্তর: ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ লাভ করে।

প্রশ্ন-১৫. আবুল বরকত কে ছিলেন? *[ঢা. বো., রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৩]*
উত্তর: আবুল বরকত ছিলেন একজন ভাষাশহিদ।

প্রশ্ন-১৬. ভাষা আন্দোলনে প্রথম শহিদ হয়েছিলেন কে?
উত্তর: ভাষা আন্দোলনে প্রথম শহিদ হয়েছিলেন রফিক উদ্দিন আহমদ।

প্রশ্ন-১৭. শহিদ মিনার কী?
উত্তর: ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে নিহত শহিদদের স্মরণে নির্মিত স্মৃতিসৌধই হলো শহিদ মিনার।

প্রশ্ন-১৮. শহিদ মিনারের ভাস্কর কে ছিলেন?
উত্তর: শহিদ মিনারের ভাস্কর ছিলেন শিল্পী হামিদুর রহমান।

প্রশ্ন-১৯. 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' কত তারিখে পালন করা হয়? *[ম. বো., দি. বো. ২০২৫; রা., দি., কু., চ., সি., য., ব. বোর্ড ২০১৭]*
উত্তর: ২১ ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' পালন করা হয়।

প্রশ্ন-২০. বাংলা ভাষাকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয় কত সালে?
উত্তর: ১৯৫৬ সালে বাংলা ভাষাকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

প্রশ্ন-২১. UNESCO কবে বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়?
উত্তর: ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর UNESCO ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

প্রশ্ন-২২. কোন আন্দোলন বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশে ভূমিকা রাখে?
উত্তর: ভাষা আন্দোলন বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশে ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন-২৩. কত সালে আওয়ামী লীগ গঠিত হয়? *[রা. বো., কু. বো., য. বো. ২০২২]*
উত্তর: ১৯৪৯ সালে আওয়ামী লীগ গঠিত হয়।

প্রশ্ন-২৪. কত সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দেওয়া হয়?
উত্তর: ১৯৫৫ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দেওয়া হয়।

■ ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন

প্রশ্ন-২৫. যুক্তফ্রন্ট কী? *[ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো. ও য. বো. ২০২১]*
উত্তর: ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগকে পরাজিত করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের পাঁচটি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত রাজনৈতিক দলই যুক্তফ্রন্ট।

প্রশ্ন-২৬. কখন যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়?
উত্তর: ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়।

প্রশ্ন-২৭. যুক্তফ্রন্টের শরিক দল ছিল কয়টি?
উত্তর: যুক্তফ্রন্টের শরিক দল ছিল ৫টি।

প্রশ্ন-২৮. ২১ দফার প্রথম দফা কোনটি? */সি. বো., ব. বো. ২০২১/*
উত্তর: ২১ দফার প্রথম দফা হলো বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা।

প্রশ্ন-২৯. যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন কত সালে হয়েছিল? */ম. বো. ২০২৩/*
উত্তর: যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন ১৯৫৪ সালে হয়েছিল।

প্রশ্ন-৩০. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট মোট কয়টি আসন পায়?
উত্তর: ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ২২৩টি আসন লাভ করে।

প্রশ্ন-৩১. যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি প্রতীক কী ছিল?
/ম. বো. ২০২৩; সি. বো., ব. বো. ২০২১/
উত্তর: যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি প্রতীক ছিল নৌকা।

■ পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক নীতি

প্রশ্ন-৩২. পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী কী নীতি গ্রহণ করেছিল?
উত্তর: পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করেছিল।

প্রশ্ন-৩৩. পাকিস্তানের শাসনক্ষমতার কর্ণধার ছিল কারা?
উত্তর: পশ্চিম পাকিস্তানিরা পাক্সিতানের শাসন-ক্ষমতার কর্ণধার ছিল।

প্রশ্ন-৩৪. পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তান কোন ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি বৈষম্যের শিকার হয়?
উত্তর: পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তান অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি বৈষম্যের শিকার হয়।

প্রশ্ন-৩৫. ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানের রাজধানী কোথায় ছিল?
উত্তর: ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানের রাজধানী ছিল করাচিতে।

প্রশ্ন-৩৬. পাকিস্তানের মোট রাজস্ব আয়ের শতকরা কত ভাগ পূর্ব বাংলা থেকে আসত?
উত্তর: পাকিস্তানি মোট রাজস্ব আয়ের শতকরা ৬০ ভাগ পূর্ব বাংলা থেকে আসত।

প্রশ্ন-৩৭. পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীতে কোন অঞ্চলের প্রাধান্য ছিল? */ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো. ও য. বো. ২০২১/*
উত্তর: পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীতে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাধান্য ছিল।

প্রশ্ন-৩৮. মৌলিক গণতন্ত্রের আদেশ জারি করেন কে?
/ঢা. বো., ম. বো., দি. বো., চ. বো., সি. বো., ব. বো. ২০২২/
উত্তর: মৌলিক গণতন্ত্রের আদেশ জারি করেন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান।

প্রশ্ন-৩৯. পাক-ভারত যুদ্ধ সংঘটিত হয় কত সালে?
উত্তর: পাক-ভারত যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১৯৬৫ সালে।

■ ঐতিহাসিক ছয় দফা ও এর গুরুত্ব

প্রশ্ন-৪০. 'ছয় দফা' কত সালে উত্থাপন করা হয়?
উত্তর: ১৯৬৬ সালে ছয় দফা উত্থাপন করা হয়।

প্রশ্ন-৪১. 'ছয় দফা' কে উত্থাপন করেন?
উত্তর: শেখ মুজিবুর রহমান 'ছয় দফা' উত্থাপন করেন।

প্রশ্ন-৪২. শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ছয় দফা কোথায় উত্থাপন করা হয়?
উত্তর: লাহোরে বিরোধী দলগুলোর সম্মেলনে ঐতিহাসিক ছয় দফা উত্থাপন করা হয়।

প্রশ্ন-৪৩. ছয় দফার প্রথম দফার মূলকথা কী ছিল?
উত্তর: ছয় দফার প্রথম দফার মূলকথা ছিল প্রদেশগুলোর স্বায়ত্তশাসন।

■ আগরতলা মামলা (১৯৬৮)

প্রশ্ন-৪৪. আগরতলা মামলা কত সালে দায়ের করা হয়?
উত্তর: আগরতলা মামলা ১৯৬৮ সালে দায়ের করা হয়।

প্রশ্ন-৪৫. আগরতলা মামলার আসামি কতজন ছিল?
উত্তর: আগরতলা মামলার আসামি ছিল ৩৫ জন।

প্রশ্ন-৪৬. আগরতলা মামলার প্রধান আসামি কে ছিলেন?
উত্তর: আগরতলা মামলার প্রধান আসামি ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান।

প্রশ্ন-৪৭. কার শাসনামলে আগরতলা মামলা করা হয়?
/সকল বোর্ড ২০২১, ২০১৬/
উত্তর: আইয়ুব খানের শাসনামলে আগরতলা মামলা করা হয়।

প্রশ্ন-৪৮. আগরতলা মামলার ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান কে ছিলেন?
উত্তর: আগরতলা মামলার ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান ছিলেন প্রধান বিচারপতি এস এ রহমান।

প্রশ্ন-৪৯. আগরতলা মামলার ট্রাইব্যুনালের সদস্য সংখ্যা ছিল কত জন?
উত্তর: আগরতলা মামলার ট্রাইব্যুনালের সদস্য সংখ্যা ছিল ৩ জন।

প্রশ্ন-৫০. আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করা হয় কত তারিখে?
উত্তর: আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করা হয় ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি।

■ উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান

প্রশ্ন-৫১. ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের প্রথম শহিদ কে? */ঢা. বো., রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৩; সকল বোর্ড ২০১৫/*
উত্তর: ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের প্রথম শহিদ ছিলেন ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান।

প্রশ্ন-৫২. DAC গঠন করে কারা?
উত্তর: পূর্ব পাকিস্তানের ৮টি বিরোধী রাজনৈতিক দল DAC গঠন করে।

প্রশ্ন-৫৩. 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' পরিষদ কয় দফা ঘোষণা করে?
/ঢা. বো., রা. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫/
উত্তর: ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এগারো দফা ঘোষণা করে।

প্রশ্ন-৫৪. সার্জেন্ট জহুরুল হক ১৯৬৯ সালের কত তারিখে নিহত হন?
উত্তর: সার্জেন্ট জহুরুল হক নিহত হন ১৯৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি।

প্রশ্ন-৫৫. উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে শহিদ হওয়া অধ্যাপক শামসুজ্জোহা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন?
উত্তর: উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে শহিদ হওয়া অধ্যাপক শামসুজ্জোহা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন।

প্রশ্ন-৫৬. আইয়ুব খান কখন পদত্যাগ করেন?
উত্তর: ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ আইয়ুব খান পদত্যাগ করেন।

প্রশ্ন-৫৭. আইয়ুব খান কার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন?
উত্তর: আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন।

খ. অনুধাবনমূলক

প্রশ্ন-১. স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা নিয়ে বিতর্কের শুরু হয়েছিল কেন?

উত্তর: স্বাধীন পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা করার চেষ্টা করায় এ বিষয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছিল।

পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৬.৪০ ভাগের মাতৃভাষা ছিল বাংলা এবং শতকরা মাত্র ৩.২৭ ভাগ ছিল উর্দুভাষী। এ হিসেবে বাংলা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা। আর সংখ্যাগরিষ্ঠের দিক থেকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে 'বাংলার' মর্যাদা লাভ ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং উর্দুভাষী বুদ্ধিজীবীরা উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলে বিতর্কের সূচনা হয়।

প্রশ্ন-২. তমদ্দুন মজলিশ কী? *[সকল বোর্ড ২০২৩]*

উত্তর: ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা প্রথম সাংস্কৃতিক সংগঠন হলো তমদ্দুন মজলিশ।

১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক আবুল কাশেমের উদ্যোগে ঢাকায় তমদ্দুন মজলিশ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সংগঠনের পক্ষ থেকে 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। এটি ছিল ভাষা আন্দোলনের প্রথম পুস্তিকা। ভাষা আন্দোলনকে সাংগঠনিক রূপ দেওয়ার জন্য 'তমদ্দুন মজলিশ' এর উদ্যোগে একটি 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয়।

প্রশ্ন-৩. 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' কেন গঠিত হয়? *[রা., দি., কু., চ., সি., য., ব. বো ২০১৭]*

উত্তর: পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীনের উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণার প্রতিবাদে এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়।

১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি খাজা নাজিমউদ্দীন পল্টন ময়দানের জনসভায় মুসলিম লীগের অধিবেশনে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করেন। এর প্রতিবাদে ৩১ জানুয়ারি মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ ইত্যাদি পার্টির সমন্বয়ে ৪০ সদস্য বিশিষ্ট সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়।

প্রশ্ন-৪. রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ বলতে কী বোঝায়? *[ম. বো., দি. বো. ২০২৫; দি. বো.; কু. বো.; সি. বো.; য. বো.; ব. বো. ২০১৭]*

উত্তর: বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলনকে সাংগঠনিক রূপদানের জন্য ১৯৪৭ সালের ১ অক্টোবর যে পরিষদ গঠিত হয় তাই 'রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ'।

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার আন্দোলনের গতিকে বেগবান করতে তমদ্দুন মজলিশের উদ্যোগে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয়। এ পরিষদের আহ্বায়ক নির্বাচিত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রথিতযশা তরুণ অধ্যাপক ও শিক্ষাবিদ নুরুল হক ভূঁইয়া। ভাষা আন্দোলনকে সাংগঠনিক রূপদানের ক্ষেত্রে এ পরিষদটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

প্রশ্ন-৫. ভাষা আন্দোলনকে কেন বাঙালির মুক্তির প্রথম আন্দোলন বলা হয়?

উত্তর: ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের পথ সূচিত হওয়ায় একে বাঙালির মুক্তির প্রথম আন্দোলন বলা হয়।

দেশ বিভাগের পর বাঙালি প্রথম ভাষাকেন্দ্রিক বৈষম্যের শিকার হয়। মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি বাংলা ভাষাভাষী হওয়া সত্ত্বেও তাদের প্রতি উর্দু চাপিয়ে দেওয়া হয়। ফলে বাঙালি ভাষা আন্দোলন করে এবং এর মাধ্যমে জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়। এ জাতীয়তাবাদী চেতনাই বাঙালিকে স্বাধিকার আন্দোলনের পথে পরিচালিত করে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে বিজয় অর্জনে ভূমিকা রাখে। এ জন্য ভাষা আন্দোলনকে বাঙালির মুক্তির প্রথম আন্দোলন বলা হয়।

প্রশ্ন-৬. শহিদ মিনার নির্মাণের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করো। *[ম. বো. ২০২৩; ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো. ও য. বো. ২০২১]*

উত্তর: ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে আত্মদানকারী ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার মর্যাদা লাভের প্রতীক। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে এদেশের ভাষাসৈনিকেরা বাংলা ভাষার মর্যাদা লাভের দাবিতে ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে ঢাকার রাজপথে মিছিল বের করে। পুলিশ মিছিলের ওপর কাঁদানে গ্যাস, গুলি ছোঁড়ে। এতে রফিক, বরকত, শফিউর, জব্বার, সালাম প্রমুখ নিহত হন। তাদের স্মরণে ১৯৫২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেলের ছাত্ররা প্রথম শহিদ মিনারের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করে। এরপর ১৯৫৬ সালে বাংলা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভের পর ১৯৫৭ সালে শিল্পী ভাস্কর হামিদুর রহমানের নকশায় কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। ১৯৬৩ সালের শুরুর দিকে এর নির্মাণ কাজ শেষ হয়। প্রতি বছর ২১ ফেব্রুয়ারি এ মিনারে ফুল দিয়ে এদেশের লাখো মানুষ ভাষাশহিদদের প্রতি সম্মান জানান।

প্রশ্ন-৭. একুশে ফেব্রুয়ারি স্মরণীয় কেন? *[সকল বোর্ড ২০১৯, ২০১৫]*

উত্তর: ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলনে বাঙালিকে রক্ত দিতে হয়েছিল। এ কারণেই একুশে ফেব্রুয়ারি স্মরণীয়।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানের ৫৬.৪০ ভাগ মানুষের ভাষা বাংলাকে বাদ দিয়ে মাত্র ৩.২৭ ভাগ মানুষের ভাষা উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা করার ঘৃণ্য চক্রান্ত করে। বাঙালি জাতি তাদের এ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি আন্দোলনরত অবস্থায় সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার প্রমুখ শহিদ এবং অনেকে আহত হন। আর তাদের এ আত্মত্যাগের বিনিময়েই বাংলা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। তাই এ দিনটি স্মরণীয়।

প্রশ্ন-৮. বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। *[সকল বোর্ড ২০১৮]*

উত্তর: বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা বলতে বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর লালিত চেতনাকে বোঝায়।

জাতীয়তাবাদ একটি রাজনৈতিক অভিব্যক্তি। জাতীয়তাবাদী চেতনার কারণে ব্যক্তি নিজেকে একটি নির্দিষ্ট জাতির অন্তর্ভুক্ত মনে করে এবং সেই জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ভৌগোলিক পরিবেশ, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতির সাথে একাত্মবোধ অনুভব করে। সুতরাং যে চেতনার কারণে বাংলাভাষীরা নিজেদের বাঙালি মনে করে এবং বাঙালি জাতির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি লালন করে তাই বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা।

প্রশ্ন-৯. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস কী? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায় জীবনদানকারী শহিদদের স্মরণে পালিত শহিদ দিবসই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পরিচিত।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করার দাবিতে এদেশের ছাত্র সমাজ রাস্তায় মিছিল বের করে। ভাষা আন্দোলনের এ চূড়ান্ত পর্বে পুলিশ ছাত্রদের ওপর কাঁদানে গ্যাস, গুলি ছোড়ে। পুলিশের এ নির্মমতায় প্রাণ হারান রফিক, শফিউর, সালাম, জব্বার প্রমুখ। সেদিন তাদের রক্তে রঞ্জিত হয় ঢাকার রাজপথ। তাদের আত্মদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২১ ফেব্রুয়ারিকে শহিদ দিবস হিসেবে পালন করা হয়। ১৯৯৯ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের অঙ্গ সংগঠন ইউনেস্কো এ দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। তখন থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে।

প্রশ্ন-১০. যুক্তফ্রন্ট কী? ব্যাখ্যা করো।

[ঢা. বো., রা. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫]

উত্তর: পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের রাজনৈতিক দাবি আদায়ের লক্ষ্যে বাংলার নেতৃবৃন্দ ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যে রাজনৈতিক জোট গঠন করে তাই 'যুক্তফ্রন্ট'।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর মুসলিম লীগ সরকার পূর্ব বাংলার জনগণের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করে। এজন্য পূর্ব বাংলার নেতৃবৃন্দ ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগকে পরাজিত করে নিজেদের অধিকার আদায় করতে চায়। তাই পাঁচটি প্রধান দলকে নিয়ে ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। দলগুলো হলো— আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, নেজাম-ই-ইসলাম, বামপন্থি গণতন্ত্রী দল এবং খিলাফত-ই- রব্বানি।

প্রশ্ন-১১. যুক্তফ্রন্ট কেন গঠন করা হয়েছিল? *[সি. বো., ব. বো. ২০২১]*

উত্তর: পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের রাজনৈতিক দাবি আদায়ের লক্ষ্যেই যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর (১৯৪৭) মুসলিম লীগ সরকার পূর্ব বাংলার মানুষের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করে। এজন্য পূর্ব বাংলার নেতৃবৃন্দ ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগকে পরাজিত করে নিজেদের অধিকার আদায় করতে চেয়েছিল। তাই তারা ঐক্যবন্ধ হয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। এছাড়া পূর্ব বাংলার মানুষ পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীকে মোকাবিলা করার জন্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে চাপ দিতে থাকে। তাই পাঁচটি প্রধান দল যথা- আওয়ামী মুসলিম লীগ, নেজাম-ই-ইসলাম, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, বামপন্থি গণতন্ত্রী দল এবং খিলাফত-ই-রব্বানির সমন্বয়ে ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়।

প্রশ্ন-১২. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের কারণ কী? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের মূল কারণ হলো তাদের গণমুখী নির্বাচনি ইশতেহার।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার পাঁচটি দলের সমন্বয়ে গঠিত যুক্তফ্রন্ট অংশগ্রহণ করে। এ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের পেছনে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল জোটবন্ধ হয়ে নির্বাচন করা। এছাড়া যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচিতে পূর্ব বাংলার সর্বস্তরের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছিল এবং নির্বাচনি প্রচারণায় যুক্তফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, অর্থনৈতিক শোষণ ও আঞ্চলিক বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরে তাদেরকে জনবিচ্ছিন্ন করে ফেলে। ফলে নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করে।

প্রশ্ন-১৩. যুক্তফ্রন্টের বিজয়কে 'ব্যালট বিপ্লব' বলে আখ্যায়িত করা হয় কেন?

উত্তর: ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট একচেটিয়াভাবে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। এ কারণে এটিকে 'ব্যালট বিপ্লব' বলা হয়।

মুসলিম লীগের কুশাসন থেকে মুক্তি পেতে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক দলগুলো ঐক্যবন্ধ হয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক আইনসভা নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ২৩৭টি আসনের মধ্যে ২২৩টি আসন লাভ করে। আর ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ মাত্র ১০টি আসন লাভ করে। মুসলিম লীগের কুশাসন ও শোষণে জর্জরিত পূর্ব বাংলার মানুষের পুঞ্জীভূত বেদনা ও আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ ছিল যুক্তফ্রন্টের এ বিশাল বিজয়। এ কারণেই যুক্তফ্রন্টের বিজয়কে 'ব্যালট বিপ্লব' বলে আখ্যায়িত করা হয়।

প্রশ্ন-১৪. বাঙালির কোন ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি বৈষম্যের শিকার হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: বাঙালিরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি বৈষম্যের শিকার হয়েছে।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর পূর্ব বাংলা পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। শুরু থেকেই পাকিস্তানি শাসকেরা বাঙালির প্রতি বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করে। পূর্ব বাংলা প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানিদের চক্রান্তের কারণে বাঙালি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারেনি। পাকিস্তানের মোট রাজস্ব আয়ের শতকরা ৬০ ভাগ অর্জিত হতো পূর্ব বাংলা থেকে। অথচ এর মাত্র ২৫ ভাগ ব্যয় হতো এ অঞ্চলে। রপ্তানি আয়ের ৬০ ভাগ বাংলার পণ্য থেকে অর্জিত হলেও এ অঞ্চলের জন্য আমদানি পণ্যের বরাদ্দ ছিল মাত্র ৩০% ভাগ। মুদ্রা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রণ করত। স্টেট ব্যাংকসহ, বড় বড় ব্যাংক, বিমা, বাণিজ্য, সরকারি, বেসরকারি সংস্থার সদর দপ্তর পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল, যাতে সহজেই অর্থপাচার সম্ভব হয়। বড় বড় শিল্পকারখানা পশ্চিম পাকিস্তানে গড়ে তোলা হয়। এভাবে পশ্চিম পাকিস্তানে গড়ে তোলা হয়। এভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থান্বেষীমহল পূর্ব বাংলাকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে।

প্রশ্ন-১৫. পশ্চিমা শাসকদের বৈষম্যমূলক নীতির প্রতিবাদে বাঙালির প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর নির্লজ্জ বৈষম্যলূক নীতি বাঙালির মনে তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি করে তাদের প্রতিবাদী করে তোলে।

পাকিস্তানিরা রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক প্রতিটি ক্ষেত্রে বাঙালিকে বঞ্চিত করে। তাদের শোষণ ও বৈষম্যমূলক নীতির প্রতিবাদে এ অঞ্চলের মানুষের প্রথম প্রতিবাদ কর্মসূচির বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৫২ সালের আন্দোলনের মাধ্যমে। এরপর '৫৪ এর প্রাদেশিক নির্বাচনে ব্যালট বিপ্লব, '৬২-এর ছাত্র আন্দোলন, ৬৬-এর ছয় দফা এবং ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাঙালিরা পশ্চিমা শাসকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। আর এসব আন্দোলন-সংগ্রামের পথ ধরেই বাঙালি স্বাধীনতা অর্জনের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছে এবং ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে।

প্রশ্ন-১৬. ছয় দফা আন্দোলন কী? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের উত্থাপিত ছয় দফা দাবি আদায়ের জন্য যে আন্দোলন পরিচালিত হয়, তা-ই ছয় দফা আন্দোলন নামে পরিচিত।

১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধীদলীয় নেতাদের একটি সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেন। এই ছয় দফায় প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা, প্রাদেশিক সরকারের প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রবিষয়ক ক্ষমতা, সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রাব্যবস্থা ও প্রাদেশিক সরকারের রাজস্বব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে দাবি উত্থাপন করা হয়। বাঙালির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক মুক্তির হাতিয়ার ছিল ছয় দফা। এ দাবিগুলো বাস্তবায়নের জন্য পরিচালিত আন্দোলনই ছয় দফা আন্দোলন।

প্রশ্ন-১৭. বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বলা হয় কোনটিকে? ব্যাখ্যা করো। *[ঢা. বো., ম. বো., দি. বো., চ. বো., সি. বো., ব. বো. ২০২২]*

উত্তর: ছয় দফা দাবিতে বাঙালির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির কথা ছিল বলে একে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বলা হয়।

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের উত্থাপিত ছয় দফা কর্মসূচি ছিল প্রথম বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। এতে বাঙালির চরম প্রত্যাশিত স্বায়ত্তশাসনের জোর দাবি উত্থাপন করা হয়। তাছাড়া ছয় দফায় বাঙালির পৃথক অর্থ এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দাবি জানানো হয়। এতে বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের প্রত্যয় ব্যক্ত হয়। ছয় দফার মাধ্যমে বাঙালি জাতি স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে এবং পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলে। তাই এটি বাঙালির মুক্তির সনদ হিসেবে আখ্যায়িত।

প্রশ্ন-১৮. 'মৌলিক গণতন্ত্র' বলতে কী বোঝ?

উত্তর: মৌলিক গণতন্ত্র হলো পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইয়ুব খানের প্রবর্তিত একটি বিতর্কিত স্থানীয় সরকার পদ্ধতি।

আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের শাসনক্ষমতা গ্রহণ করেন। তিনি গণতন্ত্রকে তৃণমূল পর্যায়ে ছড়িয়ে দেওয়ার নামে ১৯৫৯ সালে মৌলিক গণতন্ত্র নামে একটি নতুন স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা চালু করেন। বাস্তবে এর লক্ষ্য ছিল রাজনীতি ও প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণে রাখা। মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থায়— ১. ইউনিয়ন পরিষদ, ২. থানা পরিষদ, ৩. জেলা পরিষদ এবং ৪. বিভাগীয় পরিষদ-এ চার স্তরের কাঠামো ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ রাজনৈতিক দল এ ব্যবস্থাকে জেনারেল আইয়ুব খান ও তার সমর্থক কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর ক্ষমতা কুক্ষিগত করার কৌশল বলে গণ্য করেছিল।

প্রশ্ন-১৯. আগরতলা মামলা বলতে কী বোঝায়?

[রা. বো., কু. বো., য. বো. ২০২২; রা., দি., কু., চ., সি., য., ব. বোর্ড ২০১৭]

উত্তর: ১৯৬৮ সালে শেখ মুজিবুর রহমানসহ ৩৫ জনকে অভিযুক্ত করে স্বৈরাচারী আইয়ুব খান যে মামলা দায়ের করে, তাই আগরতলা মামলা নামে পরিচিত।

আগরতলা মামলাটি দায়ের করা হয় ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের অভিযোগ ছিল— ১৯৬৩ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলাতে ভারতীয় সরকারি কর্মকর্তাদের গোপন বৈঠক হয়। সেখানে ভারতের সহায়তায় সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার পরিকল্পনা করা হয়। এ জন্য মামলাটির নাম দেওয়া হয় আগরতলা মামলা।

প্রশ্ন-২০. আগরতলা মামলার উদ্দেশ্য কী ছিল? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: আগরতলা মামলার মূল উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানকে নেতৃত্বশূন্য করা।

১৯৬৮ সালে দায়ের করা আগরতলা মামলার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শেখ মুজিবুর রহমানসহ কয়েকজন সৎ ও সাহসী বাঙালি নেতা ও অফিসারকে দেশের জনগণের কাছে ভারতীয় চর ও বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে চিহ্নিত করা। তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করে পূর্ব পাকিস্তানকে নেতৃত্বশূন্য করে দিয়ে চলমান জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে স্তিমিত করে দেওয়াই এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এছাড়া পরবর্তী নির্বাচনে আইয়ুব খান ও তার কনভেনশন মুসলিম লীগের বিজয় সুনিশ্চিত করতেও আগরতলা মামলা দায়ের করা হয়।

প্রশ্ন-২১. ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান বলতে কী বোঝায়?

[সকল বোর্ড ২০২৫; ঢা. বো., ম. বো., দি. বো., চ. বো., সি. বো., ব. বো. ২০২২]

উত্তর: প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের গণবিরোধী কাজ ও স্বৈরশাসনের অবসান ঘটিয়ে স্বাধিকার অর্জনের লক্ষ্যে ১৯৬৯ সালে পরিচালিত আন্দোলনই ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান নামে পরিচিত।

স্বৈরশাসক আইয়ুব খান পূর্ব পাকিস্তানিদের প্রতি অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক প্রতিটি ক্ষেত্রে শোষণ ও বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করে। বাঙালির ছয় দফা দাবিকে নস্যাৎ করে দিতে আইয়ুব সরকার ১৯৬৮ সালে আগরতলা মামলা দায়ের করে। এর বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের ছয় দফা ও ছাত্রদের এগারো দফাভিত্তিক আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৯৬৯ সালে এ আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ লাভ করে এবং গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। বাঙালি জাতির রাজনৈতিক বিকাশে এ আন্দোলন তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ আন্দোলনে ছাত্রনেতা আসাদ ও শিক্ষক শামসুজ্জোহাসহ অনেকে শহিদ হন।

প্রশ্ন-২২. ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের ফলাফল ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী।

গণআন্দোলনের সাফল্য ছিল আগরতলা মামলা প্রত্যাহার এবং শেখ মুজিবসহ রাজবন্দিদের মুক্তিলাভ। তাছাড়া এ আন্দোলনের ফলে মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার অবসান ঘটে। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার সূচনাসহ সর্বজনীন প্রত্যক্ষ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ তৈরি হয়। এ গণঅভ্যুত্থানের কারণে আইয়ুব খান পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। এ অভ্যুত্থানের ফলে জাতীয় ঐক্য সুদৃঢ় হয়, যা পরবর্তী সময়ে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে প্রভাব ফেলে। এর ফলেই বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের মর্যাদা লাভ করে।

? অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ভিত্তি কী ছিল?
ক. সংস্কৃতি খ. ধর্ম
গ. ভাষা ঘ. বর্ণ

২. পাকিস্তান রাষ্ট্রে প্রথম কী নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়?
ক. ভাষা খ. ধর্ম
গ. সম্পদ ঘ. রাজনীতি

৩. ভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ লাভ করে কত সালে?
ক. ১৯৪৭ খ. ১৯৫০
গ. ১৯৫২ ঘ. ১৯৫৪

৪. উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার মূল উদ্দেশ্য কী ছিল?
ক. উর্দু ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি করা
খ. বাঙালিদের অবদমিত রাখা
গ. বাংলা ভাষা নিশ্চিহ্ন করা
ঘ. উর্দুভাষীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা

৫. ভাষা আন্দোলনের সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?
ক. লিয়াকত আলী খান
খ. খাজা নাজিমউদ্দীন
গ. ইয়াহিয়া খান
ঘ. মঞ্জুর খান

৬. ভাষা আন্দোলনের প্রথম শহিদ কে ছিলেন?
ক. আবুল বরকত খ. রফিকউদ্দিন
গ. আবদুস সালাম ঘ. আবদুল জাব্বার

৭. ভাষা আন্দোলনের সর্বোচ্চ অর্জন কোনটি?
ক. যুক্তফ্রন্টের বিজয়
খ. রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি
গ. আইয়ুব খানের পতন
ঘ. বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন

৮. সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় কেন?
ক. বাংলার বিদ্রোহ দমন করতে
খ. ভারতীয় জাতীয়তাবাদ প্রসারের জন্য
গ. বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে
ঘ. উর্দু ভাষাকে চিরতরে ধ্বংস করতে

৯. বাংলা একাডেমির পূর্বনাম কী ছিল?
ক. বর্ধমান হাউজ খ. গভর্নর হাউস
গ. রেস্ট হাউজ ঘ. সার্কিট হাউস

১০. কত সালে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়?
ক. ১৯৫৩ খ. ১৯৫৪
গ. ১৯৫৪ ঘ. ১৯৫৫

১১. যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি প্রতীক কী ছিল?
ক. হারিকেন খ. গোলাপ ফুল
গ. পাখা ঘ. নৌকা

১২. শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন কেন?
ক. বাঙালির মুক্তির জন্য
খ. স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য
গ. গণআন্দোলনের জন্য
ঘ. ৭০-এর নির্বাচনের জন্য

১৩. আগরতলা মামলা কত সালে দায়ের করা হয়?
ক. ১৯৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারি
খ. ১৯৬৭ সালের ৭ জুন
গ. ১৯৬৬ সালের ১৮ নভেম্বর
ঘ. ১৯৬৯ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি

১৪. কত সালে পূর্ব পাকিস্তানে গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছিল?
ক. ১৯৬৭ খ. ১৯৬৮
গ. ১৯৬৯ ঘ. ১৯৭০

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন

১৫. ভাষা আন্দোলনের ফলে—
i. বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকশিত হয়
ii. বাংলা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করে
iii. বাঙালি স্বাধীনতা অর্জন করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৬. ছয় দফা ছিল—
i. বাঙালির অধিকারের দলিল
ii. বাঙালির স্বায়ত্তশাসনের দাবি
iii. জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৭. উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের উদ্দেশ্য ছিল—
i. পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা
ii. শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি
iii. স্বৈরাচার পুনরুদ্ধার
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৮ ও ১৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
১৯৬০ সালে আসামের মুখ্যমন্ত্রী স্যার বিমল প্রসাদ ঘোষণা করেন 'অসমিয়া' হবে আসামের একমাত্র রাজ্য ভাষা। এ ঘোষণায় ফেটে পড়ে আসামের বাংলাভাষী জনগোষ্ঠী। তারা 'কাছাড় গণসংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে। এ পরিষদ ১৯৬০ সালের ১৯ মে হরতালের

ডাক দেয়। এদিন রাজ্য সরকার কারফিউ জারি করে। কারফিউ ভঙ্গ করে বাংলাভাষাভাষীরা মিছিল করলে পুলিশ মিছিলের ওপর গুলি করে। গুলিতে ১১ জন মানুষ নিহত হয়।

১৮. 'কাছাড় গণসংগ্রাম পরিষদ' নিচের কোন প্রতিষ্ঠানটির প্রতিনিধিত্ব করে?
ক. তমদ্দুন মজলিশ
খ. যুক্তফ্রন্ট
গ. সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ
ঘ. ভাষা সংগ্রাম পরিষদ

১৯. উদ্দীপকের মতো পরিস্থিতির ফলাফল হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানে—
i. গণঅভ্যুত্থানের সৃষ্টি হয়েছিল
ii. বাংলা ভাষা রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ করেছিল
iii. বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটেছিল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii
খ. i, iii
গ. ii, iii
ঘ. i, ii, iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২০ ও ২১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
ভিয়েতনামের জনগণ তাদের সরকারের মাধ্যমে নানাভাবে নিপীড়িত হয়। দেশের সকল গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে সরকার পক্ষের জনগণের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। সামরিক বাহিনীর উচ্চপদগুলোতেও সরকারের পক্ষপাতিত্ব বজায় থাকে।

২০. উদ্দীপকের বৈষম্যের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ধরনের বৈষম্যের মিল রয়েছে?
ক. অর্থনৈতিক বৈষম্য
খ. সামরিক বৈষম্য
গ. সামাজিক বৈষম্য
ঘ. রাজনৈতিক বৈষম্য

২১. উক্ত বৈষম্যের ফলে—
i. পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়
ii. পূর্ব পাকিস্তান অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে
iii. পূর্ব পাকিস্তান সামরিক দিক দিয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

খ. বোর্ড পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২২. 'তমদ্দুন মজলিশ' কোন ধরনের সংগঠন? */সকল বোর্ড ২০২১/*
ক. রাজনৈতিক
খ. সাংস্কৃতিক
গ. অর্থনৈতিক
ঘ. ধর্মীয়

২৩. কত সালে বাংলা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করে? */সকল বোর্ড ২০২৩/*
ক. ১৯৫৩
খ. ১৯৫৪
গ. ১৯৫৫
ঘ. ১৯৫৬

২৪. 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' কত তারিখে পালিত হয়? */সকল বোর্ড ২০২১/*
ক. ২১ ফেব্রুয়ারি
খ. ২৩ ফেব্রুয়ারি
গ. ২০ ফেব্রুয়ারি
ঘ. ১৮ ফেব্রুয়ারি

২৫. যুক্তফ্রন্টের কোন দলটি এ. কে. ফজলুল হক এর নেতৃত্বাধীন ছিল? */সকল বোর্ড ২০১৯/*
ক. আওয়ামী মুসলিম লীগ
খ. নেজামে ইসলাম
গ. কৃষক- শ্রমিক পার্টি
ঘ. গণতন্ত্রী দল

২৬. কয়টি দলের সমন্বয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়? */সকল বোর্ড ২০২৩/*
ক. ২টি
খ. ৩টি
গ. ৪টি
ঘ. ৫টি

২৭. যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন কে? */সকল বোর্ড ২০২৫/*
ক. শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক
খ. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
গ. মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী
ঘ. আবুল মনসুর আহমদ

২৮. ঐতিহাসিক ছয় দফা কত খ্রিস্টাব্দে উত্থাপিত হয়? */সকল বোর্ড ২০২১/*
ক. ১৯৬৪
খ. ১৯৬৬
গ. ১৯৬৮
ঘ. ১৯৭০

২৯. যুক্তফ্রন্ট গঠনের মূল উদ্দেশ্য কী ছিল? */সকল বোর্ড ২০২৫/*
ক. ঐক্যবন্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা
খ. মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে জয়লাভ করা
গ. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন আদায় করা
ঘ. রাজনৈতিক অনৈক্য দূর করা

৩০. ১১ দফা দাবি কাদের ছিল? */সকল বোর্ড ২০২৫/*
ক. মওলানা ভাসানীর
খ. বাম সংগঠনের
গ. ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের
ঘ. আওয়ামী লীগের

৩১. ভাষা আন্দোলনের প্রভাব পড়ে— */সকল বোর্ড ২০১৭/*
i. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে
ii. ১৯৬২ সালের ছাত্র আন্দোলনে
iii. ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৩২. যুক্তফ্রন্ট গঠনের প্রেক্ষাপট— */সকল বোর্ড ২০১৮/*
i. লাহোর প্রস্তাবের সংশোধন
ii. নির্বাচন নিয়ে টালবাহানা
iii. পূর্ব বাংলার স্বার্থ রক্ষায় প্রাদেশিক সরকারের ব্যর্থতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৩৩. ১৯৬৬ এর ছয় দফা আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ— *[সকল বোর্ড ২০২১; ২০১৯]*

i. এটা বাঙালির বাঁচার দাবি

ii. এটা ছিল বাংলার অধিকার প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ

iii. এর মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানিদের ঐক্য দৃঢ় হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩৪ ও ৩৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জুয়েল চৌধুরী। তিনি কখনো বাংলাদেশি কারও সাথে কথা বলতে অথবা ইন্টারনেটে যোগাযোগ করতে ইংরেজি কিংবা অন্য ভাষা ব্যবহার করেন না। তার কথা হলো, যে ভাষার জন্য আমার ভাই রক্ত দিয়েছে, সে ভাষার মর্যাদা আমরা নষ্ট করব না। *[সকল বোর্ড ২০১৬]*.

৩৪. জুয়েল চৌধুরী কোন আন্দোলনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল?

ক. ভাষা আন্দোলন খ. স্বাধীনতা আন্দোলন

গ. ১৯৭০-এর আন্দোলন ঘ. ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান

৩৫. এ রক্তদান আমাদের শিখিয়েছে—

i. মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে

ii. অধিকার আদায়ে সংগ্রাম করতে

iii. অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩৬ ও ৩৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

"আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি"। *[সকল বোর্ড ২০২২]*

৩৬. উদ্দীপকের চরণ দুটি কোন আন্দোলনকে স্মরণ করিয়ে দেয়?

ক. ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন

খ. ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন

গ. ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন

ঘ. ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলন

৩৭. উক্ত আন্দোলনের ফলে—

i. পূর্ব বাংলার হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়

ii. ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে

iii. জাতীয় চেতনার সূত্রপাত ঘটায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩৮ ও ৩৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

সরকারি চাকরি প্রাপ্তিতে একটি জেলার প্রাধান্য বাকি জেলাসমূহের চাকরি প্রার্থীরা মেনে নিতে পারেনি। কোটার বৈষম্যের শিকার তরুণ সমাজ এর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলে সরাসরি সরকারের পতন ঘটায়। *[সকল বোর্ড ২০২৫]*

৩৮. উদ্দীপকের আন্দোলনটি পাকিস্তান সরকার বিরোধী কোন আন্দোলনের সমতুল্য?

ক. ৫২'র ভাষা আন্দোলন খ. ৬২'র শিক্ষা আন্দোলন

গ. ৬৬'র ছয় দফা আন্দোলন ঘ. ৬৯'র গণঅভ্যুত্থান

৩৯. উদ্দীপকে উল্লেখিত আন্দোলনের মতো পাকিস্তান বিরোধী সেই আন্দোলনের পরিণতিতে বাঙালি অর্জন করেছিল—

i. স্বাধীনতা

ii. স্বায়ত্তশাসন

iii. বৈষম্যের চিরমুক্তি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উত্তরমালা

১	খ	২	ক	৩	গ	৪	গ	৫	খ	৬	খ	৭	খ	৮	গ	৯	ক	১০	ক	১১	গ	১২	ক
১৩	ক	১৪	গ	১৫	ক	১৬	ঘ	১৭	ক	১৮	গ	১৯	গ	২০	খ	২১	খ	২২	খ	২৩	ঘ	২৪	ক
২৫	গ	২৬	ঘ	২৭	ক	২৮	খ	২৯	খ	৩০	গ	৩১	ঘ	৩২	গ	৩৩	ক	৩৪	ক	৩৫	ঘ	৩৬	ক
৩৭	ঘ	৩৮	ঘ	৩৯	খ																		

গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করো।

২. ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দাও।

৩. বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো।

৪. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়ের কারণ ব্যাখ্যা করো।

৫. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো।

৬. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিদ্যমান সামরিক বৈষম্যের বিবরণ দাও।

৭. পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক নীতির বিরুদ্ধে বাঙালির প্রতিক্রিয়া কী ছিল? সংক্ষেপে লেখো।

৮. ছয় দফা দাবির মূল বিষয়গুলো উল্লেখ করো।

৯. বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশে ছয় দফা আন্দোলনের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।

১০. ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করো।

ঘ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো, একুশে-ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি?" *[ঢা. বো., রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৩]*

ক. আবুল বরকত কে ছিলেন?
খ. 'তমদ্দুন মজলিশ' কী? ব্যাখ্যা করো।
গ. উদ্দীপকের চরণ দুটি তোমার পঠিত কোন আন্দোলনকে স্মরণ করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত আন্দোলন বাঙালিকে যে চেতনায় উজ্জীবিত করেছিল তা পর্যালোচনা করো।

২.

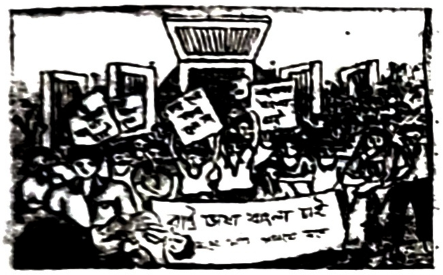

[ম. বো., দি. বো. ২০২৫]

ক. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস কত তারিখে পালন করা হয়?
খ. রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো।
গ. উদ্দীপকের চিত্রটি ইতিহাসের কোন ঘটনাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উক্ত ঘটনায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ নিহিত ছিল—বিশ্লেষণ করো।

৩. মায়ানমারের জান্তা সরকার রোহিঙ্গাদের শত বছরের সংস্কৃতিকে অস্বীকার করে জাতিগতভাবে উচ্ছেদ করার পরিকল্পনা করছে। রোহিঙ্গারা মাতৃভাষা ও বর্ণমালা ব্যবহার করে যাতে শিক্ষা গ্রহণ ও মনের ভাব প্রকাশ করতে না পারে সে জন্য রাষ্ট্র এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। শত বছরের ইতিহাস, ঐতিহ্যকে যেনো বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে না পারে তাই তাদের জোরপূর্বক নিজভূমি থেকে উচ্ছেদ করে বিশ্বের সবচেয়ে নিগৃহীত জাতিতে পরিণত করেছে। *[ম. বো. ২০২৩]*

ক. যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন কত সালে হয়েছিল?
খ. শহিদ মিনার নির্মাণের উদ্দেশ্য কী ছিল? ব্যাখ্যা করো।
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত বিষয়টি তোমার পঠিত কোন বিষয়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে উক্ত আন্দোলনের প্রভাব বিশ্লেষণ করো।

৪. রহমতগঞ্জ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর থেকেই এর পূর্ব প্রদেশ নানাভাবে নিপীড়নের শিকার হয়ে আসছিল। এ কারণে রহমতগঞ্জের অধিবাসীরা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভের জন্য একটি নির্বাচনের দাবি জানায়। নির্বাচনে সরকারি দল লেবার পার্টির বিপক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার লক্ষ্যে ওই অঞ্চলের কতগুলো ছোট ছোট দল 'United League' গঠন করে। দলটি খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভের সুযোগসহ জনগণের অধিকার পূরণের সমর্থনে একটি নির্বাচনি ইশতেহার প্রণয়ন করেন।

ক. ৬ দফা কর্মসূচি কে ঘোষণা করেন?
খ. মৌলিক গণতন্ত্র বলতে কী বোঝায়?
গ. উদ্দীপকে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন নির্বাচনের দৃশ্যপট ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উক্ত নির্বাচনে বিরোধী দলের ইশতেহারই সরকারি দলের পতন ত্বরান্বিত করেছিল— উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো।

৫. আফ্রিকার একটি দেশ হলো সুদান। সুদানের উত্তরাঞ্চলের আয়তন দক্ষিণাঞ্চলের চেয়ে অনেক বড় হলেও জনসংখ্যা ছিল তুলনামূলক কম। এছাড়া উত্তরাঞ্চলে নদী-নালা কম থাকার কারণে ভূমি ছিল অনুর্বর এবং কোথাও কোথাও মরুময়। অন্যদিকে নদীবিধৌত দক্ষিণ সুদান ছিল উর্বর এবং খনিজ সম্পদে ভরপুর। রাষ্ট্র ক্ষমতায় উত্তর সুদানের একচ্ছত্র আধিপত্য থাকায় দক্ষিণ সুদানকে অর্থনীতিসহ নানাভাবে বঞ্চিত করা হয়। পরবর্তীতে দক্ষিণ সুদান সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতার ডাক দিলে দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একটি নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। *[ঢা. বো., রা. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫; সকল বোর্ড ২০১৫]*

ক. ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কয় দফা ঘোষণা করে?
খ. ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান বলতে কী বোঝ?
গ. উদ্দীপকের দেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন দেশের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. পাঠ্যবইয়ের আলোকে উক্ত দেশের অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্র আলোচনা করো।

৬. পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানিদের ওপর চরম নির্যাতন চালাত। তারা সকল প্রকার ব্যাংক, বিমা ও বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলো পশ্চিম পাকিস্তানে গড়ে তুলেছিল। পূর্ব পাকিস্তানের সস্তা কাঁচামাল দিয়ে তাদের অধিকাংশ বাণিজ্য কেন্দ্র ও কলকারখানা চালাত। ফলে সহজেই সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হয়ে যেত। এ কারণেই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ কখনোই আলোর মুখ দেখেনি। *[রা. বো., কু. বো., য. বো. ২০২২]*

ক. তমদ্দুন মজলিশ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ কে নেন?
খ. 'আগরতলা মামলা' বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো।
গ. উদ্দীপকে পূর্ব পাকিস্তানের ওপর কোন কোন ক্ষেত্রে বৈষম্যের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উক্ত বৈষম্যের ফলেই "পূর্ব পাকিস্তান সর্বদাই পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর নির্ভরশীল ছিল"— মন্তব্যটি মূল পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

৭. একটি রাষ্ট্রের পাঁচটি প্রদেশের মধ্যে জনবহুল প্রদেশটি কেন্দ্রের নিকট থেকে নানা অগণতান্ত্রিক আচরণের শিকার হয়। উক্ত প্রদেশের জনগণের মাতৃভাষা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন অস্বীকার এবং সামরিক বেসামরিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়। এমতাবস্থায় উক্ত প্রদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা তার জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালিয়ে যান। *[ম. বো., দি. বো. ২০২৫]*

ক. বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস কত তারিখে পালন করা হয়?

খ. ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের ঘটনার সঙ্গে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন প্রদেশের বৈষম্যের মিল আছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উক্ত বৈষম্যের কারণ বিশ্লেষণ করো।

৮. ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্সের রাজা ষোড়শ লুইয়ের স্বৈরাচারী শাসন, জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ, অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও বৈষম্যের প্রতিবাদে ফরাসি বিপ্লব সংঘটিত হয়। স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব এ স্লোগানের তিনটি দাবিই হয়ে উঠেছিল ফরাসিদের প্রাণের দাবি। ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে গণমানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন সফল হয় এবং জনগণ মুক্তি পায়। *[ম. বো. ২০২৩]*

ক. যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি প্রতীক কী ছিল?

খ. 'তমদ্দুন মজলিশ' কী? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ফরাসি জাতির প্রাণের দাবির সাথে বাঙালির কোন দাবির মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. তোমার পঠিত উক্ত দাবিই বাংলাদেশের স্বাধীনতার পথকে ত্বরান্বিত করেছিল— বিশ্লেষণ করো।

৯. মিন্দানাও ফিলিপাইনের মূল ভূখণ্ড থেকে একটি বিচ্ছিন্ন প্রদেশ। দেশের উভয় অঞ্চলের মধ্যে বেশ দূরত্ব। এ অবস্থায় মূল ভূখণ্ডে অবস্থিত কেন্দ্রীয় সরকার মিন্দানাও এর জনগণকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। এতে মিন্দানাও এর বিক্ষুব্ধ জনগণ সংসদে ন্যায্য প্রতিনিধিত্ব, আলাদা মুদ্রা ব্যবস্থা ও নিজস্ব আধা-সামরিক বাহিনী গঠনের তিন দফা দাবি তোলে। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার তাদের প্রতি আরও কঠোরতা প্রদর্শন করে। *[ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো. ২০২১]*

ক. পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীতে কোন অঞ্চলের প্রাধান্য ছিল?

খ. পাকিস্তান সরকার আরবি হরফে বাংলা লেখার পায়তারা করেছিল কেন?

গ. উদ্দীপকে মিন্দানাওয়ের ভৌগোলিক অবস্থানের সাথে পাকিস্তানের কোন প্রদেশের অবস্থানের সামঞ্জস্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত তিন দফা দাবির আলোকে বাঙালির ছয় দফা দাবি মূল্যায়ন করো।

১০. এশিয়া মহাদেশের দেশটি উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চল এ দুঅংশে বিভক্ত ছিল। উত্তরাঞ্চল ছিল প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু। নেতৃত্বে ও কর্তৃত্বে এ অঞ্চলের প্রাধান্য ছিল। দক্ষিণাঞ্চল প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠীর অবহেলায় উন্নয়ন বঞ্চিত থেকে যায়। ফলে উভয় অংশে আঞ্চলিক বৈষম্য প্রকট হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে দক্ষিণাঞ্চলে বেঞ্জামিন নামে এক জননেতার উত্থান হয়। তিনি আঞ্চলিক বৈষম্য নিরসনের জন্য ১০ দফা কর্মসূচিভিত্তিক আন্দোলনের ডাক দেন। তাঁর এ আন্দোলনে দক্ষিণাঞ্চলের জনগণ ব্যাপক সমর্থন জানায়। শেষ পর্যন্ত এ আন্দোলন গণঅভ্যুত্থান থেকে সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে রূপ পরিগ্রহ করে। *[সকল বোর্ড ২০১৮]*

ক. তমদ্দুন মজলিশের প্রতিষ্ঠাতা কে?

খ. বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের আন্দোলনের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের কোন আন্দোলনের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত আন্দোলনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো।

১১. ১৯৫৭ সালে ইংল্যান্ডের শাসন ক্ষমতায় আসেন হ্যারল্ড ম্যাকমিলান। সমসাময়িককালে আয়ারল্যান্ডবাসীর জীবনে চরম দুঃখ-দুর্দশা নেমে আসে। এ অবস্থা হতে পরিত্রাণের জন্য এগিয়ে আসেন একজন মহান নেতা— শন ম্যাকব্রাইড। তিনি আয়ারল্যান্ডবাসীর মুক্তির আশায় স্বাধিকার ও স্বায়ত্তশাসনের দাবি তুলে ধরেন। বেশ কিছু দাবি নিয়ে আন্দোলন শুরু হলে চতুর হ্যারল্ড ম্যাকমিলান তাদের দমনে একটি মিথ্যা ষড়যন্ত্রমূলক মামলার আশ্রয় নেন। ফলশ্রুতিতে আন্দোলন আরো বেগবান হয় এবং ১৯৬৩ সালে তিনি পদত্যাগে বাধ্য হন। *[ঢা. বো., ম. বো., দি. বো., চ. বো., সি. বো., ব. বো. ২০২২]*

ক. মৌলিক গণতন্ত্রের আদেশ জারি করেন কে?

খ. একুশে ফেব্রুয়ারি স্মরণীয় কেন?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ষড়যন্ত্রমূলক মামলা তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন মামলার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. পাঠ্যপুস্তকের আলোকে উক্ত মামলাটির কার্যক্রম ও ফলাফল পর্যালোচনা করো।

১২. হোসনি মোবারক মিসরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর সামরিক বাহিনীর সহায়তায় স্বৈরাচারী নীতিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে থাকেন। বিরোধী দলের মতামতকে অগ্রাহ্য করে তিনি দেশের একটি অঞ্চলের ওপর কঠোর দমন নীতি চালু করেন। দেশের আপামর জনসাধারণ তার অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন শুরু করে। সরকার পতনের এ আন্দোলনের মুখে হোসনি মোবারক পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। *[ঢা. বো., রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৩]*

ক. ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের প্রথম শহিদ কে?

খ. পূর্ব পাকিস্তানের ওপর শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্যের বর্ণনা দাও।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারকের সাথে পাকিস্তানের কোন শাসকের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের আন্দোলনের মতো উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ছিল পাকিস্তানের ইতিহাসের সফল ও বড় গণআন্দোলন — ব্যাখ্যা করো।

১৩. "আমাদের দুর্বলতা, ভীরুতা, কলুষ আর লজ্জা
সমস্ত দিয়েছে ঢেকে একখণ্ড বস্ত্র মানবিক;
আসাদের শার্ট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা।"

[সি. বো.; রা. বো.; চ. বো. ২০১৭]

ক. জাতিসংঘের কোন অঙ্গ-সংগঠন একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা দেয়?

খ. ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতকে 'কালরাত' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের কবিতার লাইনগুলি তোমার পাঠ্যবইয়ের যে আন্দোলনের কথা মনে করিয়ে দেয় তার পটভূমি ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উক্ত আন্দোলনের ফলাফল পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন করো।

ঙ. সমন্বিত অধ্যায়ের সৃজনশীল প্রশ্ন

১৪. পশ্চিম আফ্রিকার দেশ নাইজারে ফরাসি কোম্পানি ১৮৩০ এর দশকে ঔপনিবেশিক শাসনের গোড়াপত্তন করে। ফরাসি কোম্পানির শাসনে দেশটির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক ভঙ্গুরতার সৃষ্টি হয়েছিল। এমনকি দেশটির মারাদি, আগাদেজ ও দোসো প্রদেশে কোম্পানি একচ্ছত্র রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভ করে। রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা লাভ করলেও ঐ কোম্পানির কোনো প্রশাসনিক দায়িত্ব ছিল না। এক পর্যায়ে দেশটির রাজনৈতিক ক্ষমতাও ফরাসি কোম্পানির হাতে চলে যায়। এসব কারণে নাইজারবাসী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে পঙ্গু হয়ে পড়ে। ◀ *সমন্বিত অধ্যায় ৪ ও ৫*

ক. কে ফরায়েজি আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন?

খ. মৌলিক গণতন্ত্র বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কোন বিষয়ের মিল লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. তুমি কি মনে কর নাইজারবাসীর মতো পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তানের লোকেরা রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল? যৌক্তিক মত দাও।

১৫. 'ক' একটি বিশাল রাজ্য। এ রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য শক্তিশালী সামরিক বাহিনী ছিল। সামরিক বাহিনীতে বিভিন্ন অঞ্চলের, বিভিন্ন জাতির সৈনিকের সমাবেশ ছিল। এক সময় দেখা গেলো শাসক শ্রেণির জাতিভুক্ত সৈন্যদের ভালো বেতন এবং উচ্চপদ প্রদান করা হচ্ছে। অন্যান্যদের অপেক্ষাকৃত নিচু পদে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। এতে সৈন্যদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তারা বেতন বৈষম্যে বিক্ষুব্ধ হয় এবং এক পর্যায়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ◀ *সমন্বিত অধ্যায় ৪ ও ৫*

ক. স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল কে ছিলেন?

খ. স্বত্ববিলোপ নীতি বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকের সৈন্যদের বিদ্রোহের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন বিদ্রোহের মিল খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর সামরিক বৈষম্যের তুলনামূলক আলোচনা করো।

১৬. জনাব আবদুল হাকিম টিভিতে একটি প্রামাণ্য চিত্র দেখছিলেন। এতে 'ক' অঞ্চলের জনগণের সংগ্রামের ঘটনা দেখাচ্ছিল। ঐ অঞ্চলের সম্পদ ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সরকারের বৈষম্যনীতির কারণে তারা সব ক্ষেত্রে বঞ্চিত ও শোষিত হতে থাকে। তাদের অধিকার আদায়ের জন্য এগিয়ে আসেন এক মহান নেতা। তিনি দাবি জানালেন জনগণের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য, কর ও শুল্ক ধার্য এবং আদায়, আধা সামরিক বাহিনী গঠন ও পরিচালনা প্রদেশের হাতে থাকার। ◀ *সমন্বিত অধ্যায় ৪ ও ৫*

ক. কত সালে ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে?

খ. যুক্তফ্রন্ট কেন গঠন করা হয়েছিল?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত নেতার দাবির সাথে কোন দাবির সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উক্ত দাবির সাথে লাহোর প্রস্তাবের কোনো সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয় কি? মতামত দাও।

১৭. মিসরের এক পুলিশ কর্মকর্তার মুঠোফোন হ্যাক করে খালেদ সাইদ দুর্নীতির এক ভিডিওচিত্র সংগ্রহ করেন। এই ভিডিওচিত্রে মাদক ব্যবসায় পুলিশের জড়িত থাকার বিষয়টি প্রমাণিত হয়। পুলিশ খালেদকে গ্রেফতার করে এবং পুলিশী নির্যাতনের এক পর্যায়ে খালেদ মারা যায়। খালেদকে স্মরণীয় করে রাখতে গুগলের ওরায়েল ঘনিম ফেসবুকে 'উই অল খালেদ' নামে একটি পেজ খোলেন। এভাবেই মিসরে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে এবং এক পর্যায়ে প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারকের পতন ঘটে।

[সূত্র: রাইজিং বিডি. কম] ◀ *সমন্বিত অধ্যায় ৪ ও ৫*

ক. দুদু মিয়ার প্রকৃত নাম কী?

খ. হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন করেনি কেন?

গ. উদ্দীপকের খালেদ সাইদের সাথে তোমার পঠিত তিতুমীরের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন ও উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান একসূত্রে গাঁথা— মন্তব্যটি যথার্থতা বিশ্লেষণ করো।

৬

স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়

Emergence of Independent and Sovereign Bangladesh

তাজউদ্দীন আহমদ

প্রধান প্রধান শব্দ

- সর্বজনীন ভোটাধিকার
- নির্বাচনি ইশতেহার
- অসহযোগ আন্দোলন
- অপারেশন সার্চলাইট
- স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র
- প্রবাসী সরকার
- বুদ্ধিজীবী
- মুক্তিবাহিনী
- নিয়মিত বাহিনী
- অনিয়মিত বাহিনী
- শান্তি কমিটি
- শরণার্থী
- সপ্তম নৌবহর
- মুক্তিযুদ্ধ

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাজনের পর পাকিস্তানের একটি প্রদেশ হলেও পূর্ব বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ে ক্রমাগতভাবে বঞ্চিত হতে থাকে। এরই প্রেক্ষিতে ভাষা আন্দোলন (১৯৫২), শিক্ষা আন্দোলন (১৯৬২), ছয় দফা আন্দোলন (১৯৬৬) এবং গণ-অভ্যুত্থান (১৯৬৯) ছিল মূলত বাঙালি জাতির জাতিসত্তা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার ধারাবাহিক পদক্ষেপ। পরবর্তীতে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল মেনে না নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে ঢাকায় 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে এক ভয়াবহ গণহত্যা চালায়। এর প্রতিক্রিয়ায় শুরু হয় মহান মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ শুরু হওয়া মুক্তিযুদ্ধ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা, সাংগঠনিক রূপদান এবং স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্ব জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে ১০ এপ্রিল গঠন করা হয় প্রবাসী বা মুজিবনগর সরকার। এ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন তাজউদ্দীন আহমদ। মুক্তিযুদ্ধের সময় তাজউদ্দীন আহমদ ধৈর্য ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। ১৯৭১ সালে মুক্তিযোদ্ধারা মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্বে দেশকে পাকিস্তানিদের দখলমুক্ত করার জন্য রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করেছেন, অনেকে আহত হয়েছেন, অনেকে দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন। তাদের অতুলনীয় আত্মত্যাগের বিনিময়ে ৯ মাস পর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর জন্ম নেয় স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ।

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখব

- ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন
- ৭ মার্চের ভাষণ: বিষয়বস্তু ও তাৎপর্য
- ২৫ মার্চের কালরাতের গণহত্যা ও স্বাধীনতা ঘোষণা
- মুজিবনগর সরকার ও মহান মুক্তিযুদ্ধ
- মহান মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতাবিরোধীদের অপতৎপরতা
- স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়

পাঠ পরিকল্পনা	
পাঠ ১	১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন: প্রেক্ষাপট এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলসমূহ
পাঠ ২	১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন ও এর ফলাফল
পাঠ ৩	১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় ও এর প্রতিক্রিয়া
পাঠ ৪	১৯৭০ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য
পাঠ ৫	অসহযোগ আন্দোলন (২-২৫ মার্চ, ১৯৭১)
পাঠ ৬ ও ৭	শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণ এবং এর তাৎপর্য
পাঠ ৮	২৫ মার্চের কালরাতের গণহত্যা
পাঠ ৯ ও ১০	বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা ও মহান মুক্তিযুদ্ধের সূচনা
পাঠ ১১	মুজিবনগর সরকার (অস্থায়ী সরকার)
পাঠ ১২ ও ১৩	মুজিবনগর বা অস্থায়ী সরকারের কার্যক্রম
পাঠ ১৪	মুক্তিবাহিনী গঠন
পাঠ ১৫ ও ১৬	মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা এবং মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিসমূহের কার্যক্রম
পাঠ ১৭ ও ১৮	মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভূমিকা
পাঠ ১৯	একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন দেশ ও জাতিসংঘের ভূমিকা
পাঠ ২০	স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়

পাঠ ১

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন: প্রেক্ষাপট এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলসমূহ (1970 General Election: Background and Participating Political Parties in the Election)

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রেক্ষাপট (Background of 1970 General Election)

১৯৬৯ সালের প্রবল গণঅভ্যুত্থানের মুখে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান সেনাপ্রধান জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে সরে যান। ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় বসেই দেশে পুনরায় সামরিক শাসন জারি করেন। ১৯৬২ সালের সংবিধান বাতিল এবং জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপরও বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। তবে ইয়াহিয়া খান ১৯৬৯ সালের ২৬ মার্চ এক বেতার ভাষণে দেশে খুব দ্রুত একটি নিয়মতান্ত্রিক সরকার গঠন এবং গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনার প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টির প্রতিশ্রুতি দেন। জেনারেল ইয়াহিয়ার ২৬ মার্চের ভাষণ দৃশ্যত সৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হলেও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এতে সংশয় প্রকাশ করেন। তারা অবিলম্বে নির্বাচনের দাবি জানান। অবশেষে ক্ষমতা গ্রহণের ৮ মাস পর, ১৯৬৯ সালের ২৮ নভেম্বর ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন— ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর জাতীয় পরিষদ এবং ২২ অক্টোবর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এ ঘোষণায় তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য এক ইউনিট প্রথা বাতিল এবং এর আগে বিলুপ্ত করা ৪টি প্রদেশ পুনর্বহাল করেন।

আইনগত কাঠামো আদেশ ও এর প্রতিক্রিয়া: ১৯৭০ সালের ২৮ মার্চ ইয়াহিয়া খান বিতর্কিত 'আইনগত কাঠামো আদেশ' (Legal Framework Order) জারি করেন। এই আদেশে জাতীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের গঠনপ্রণালি ও নির্বাচন বিষয়ক বিস্তারিত নির্দেশনা দেওয়া হয়। আইনগত কাঠামো আদেশ ঘোষণার বিশেষ দিকগুলো ছিল—

১. পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট ভেঙে দিয়ে সাবেক প্রদেশগুলো পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

২. ১৩ জন মহিলা প্রতিনিধিসহ ৩১৩ আসনের জাতীয় পরিষদ গঠিত হবে। আর ৬২১ জন সদস্য নিয়ে হবে পাঁচটি প্রাদেশিক পরিষদ।

৩. এই আদেশে এক ব্যক্তি এক ভোট নীতিতে নির্বাচন হবে।

আইনগত কাঠামো আদেশের প্রদেশভিত্তিক আসন বণ্টন ছিল নিম্নরূপ:

প্রদেশের নাম	সাধারণ আসনসংখ্যা	সংরক্ষিত মহিলা আসনসংখ্যা	মোট
পূর্ব পাকিস্তান	১৬২	৭	১৬৯
পাঞ্জাব	৮২	৩	৮৫
সিন্ধু	২৭	১	২৮
বেলুচিস্তান	৪	১	৫
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	১৮	১	১৯
কেন্দ্রশাসিত উপজাতীয় অঞ্চল	৭	০	৭
মোট	৩০০	১৩	৩১৩

আইনগত কাঠামো আদেশের পর পাকিস্তানের প্রাদেশিক আইন পরিষদসমূহে নিম্নরূপ সদস্যসংখ্যা নির্ধারণ করা হয়:

প্রদেশের নাম	সাধারণ আসনসংখ্যা	সংরক্ষিত মহিলা আসনসংখ্যা	মোট
পূর্ব পাকিস্তান	৩০০	১০	৩১০
পাঞ্জাব	১৮০	৬	১৮৬
সিন্ধু	৬০	২	৬২
বেলুচিস্তান	২০	১	২১
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৪০	২	৪২
মোট	৬০০	২১	৬২১

আদেশে বলা হয়, জাতীয় পরিষদ প্রথম অধিবেশনের দিন থেকে ১২০ দিনের মধ্যে সংবিধান প্রণয়ন করবে। যদি তা করতে ব্যর্থ হয়, তবে পরিষদ বাতিল হয়ে যাবে।

ইয়াহিয়ার আইনগত কাঠামো এ আদেশের মাধ্যমে একটি সার্বভৌম পার্লামেন্টের পরিবর্তে প্রেসিডেন্টের ইচ্ছাধীন একটি দুর্বল পার্লামেন্টের রূপরেখা প্রদান করা হয়েছিল। তাই পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো এ আদেশের অগণতান্ত্রিক ধারাসমূহ বাতিলের দাবি জানায়। এ ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে অনুকূল সাড়া না পাওয়ায় ন্যাপ (ভাসানী) ও ন্যাশনাল লীগ নির্বাচন বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়। তবে পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলো শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণে সম্মত হয়।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলসমূহ ও তাদের নির্বাচনি তৎপরতা
Political Parties Participating in the 1970 General Election and their Election Campaigns

সাধারণ নির্বাচন পরিচালনার জন্য প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের বাঙালি বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে প্রধান করে একটি 'নির্বাচন কমিশন' গঠন করেন। কমিশন ভোটার তালিকা প্রণয়নসহ নির্বাচন অনুষ্ঠানের যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করে। পাকিস্তানের দুই অংশের মোট ২৪টি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশ নেয়। পূর্ব পাকিস্তানে অনেক রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের সাথে জোটবদ্ধ হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও শেখ মুজিবুর রহমান তাতে রাজি হননি। ফলে রাজনৈতিক দলগুলো পৃথক পৃথকভাবে নির্বাচনে প্রার্থী মনোনীত করে।

সত্তরের ঐতিহাসিক নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল— (১) আওয়ামী লীগ, (২) পাকিস্তান পিপলস পার্টি (৩) জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, (৪) ইসলামি গণতন্ত্রী দল, (৫) জামায়াত-ই-ইসলামি পাকিস্তান, (৬) জাতীয় গণমুক্তি দল, (৭) কৃষক শ্রমিক পার্টি, (৮) পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, (৯) পাকিস্তান ডেমোক্র্যাট পার্টি, (১০) পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কনভেনশন), (১১) পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাউন্সিল), (১২) পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাইয়ুম), (১৩) পাকিস্তান ন্যাশনাল কংগ্রেস (১৪) পাকিস্তান জাতীয় লীগ ইত্যাদি।

নির্বাচন কমিশন প্রতীক বরাদ্দ করার পরপরই রাজনৈতিক দলগুলো প্রচারণা শুরু করে। দলগুলোকে জাতীয় বেতার ও টেলিভিশনে নির্বাচনি প্রচারণা চালানোর সুযোগ দেওয়া হয়। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান দলীয় নির্বাচনি প্রতীক নৌকা নিয়ে প্রচারণায় নামেন। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়ে আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতেহার প্রকাশ করা হয়। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য রাজনৈতিক দলও তাদের নির্বাচনি ইশতেহার প্রকাশ করে। তবে পাকিস্তানের দুই অংশ মিলিয়ে প্রচার-প্রচারণার ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ ও জুলফিকার আলী ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টির (পিপিপি) অবস্থান ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী। নির্বাচনি প্রচারণার মূল আকর্ষণও ছিলেন দুই নেতা- শেখ মুজিবুর রহমান ও জুলফিকার আলী ভুট্টো। তারা উভয়েই উদ্দীপনামূলক ভাষণের মাধ্যমে নিজ নিজ অঞ্চলের মানুষকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ১৯৬৯ সালে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান কার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন?
২. ১৯৭০ সালের ২৮ মার্চ আইনগত কাঠামো আদেশ জারি করেন কে?
৩. প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কতটি আসনের জাতীয় পরিষদ গঠন করেন?
৪. কাকে প্রধান করে ইয়াহিয়া খান নির্বাচন কমিশন গঠন করেন?
৫. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে কয়টি রাজনৈতিক দল অংশ নেয়?
৬. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পাকিস্তানের দুই অংশ মিলিয়ে কোন কোন দলের অবস্থান শক্তিশালী ছিল?

উত্তরের জন্য ৪১৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের প্রদেশভিত্তিক আসন বিন্যাসের একটি সারণি তৈরি করো।
২. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোর একটি তালিকা তৈরি করো।

পাঠ ২

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন ও এর ফলাফল
1970 General Elections and Its Results

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন (1970 General Election)

১৯৭০ সালের ৫ ও ২২ অক্টোবরে যথাক্রমে পাকিস্তানের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ নির্ধারিত হয়েছিল। তবে পূর্ব পাকিস্তানে আগস্ট মাসে ব্যাপক বন্যা হলে ৭ ডিসেম্বর জাতীয় এবং ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ পুনর্নির্ধারণ করা হয়। নির্বাচনের প্রাক্কালে ১২ নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের উপকূলবর্তী অঞ্চলে স্মরণকালের সবচেয়ে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। ঐ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। সরকারি হিসেবেই ৫ লাখ লোকের মৃত্যুর কথা বলা হয়। তবে ঝড়ের প্রচণ্ডতা এবং ধ্বংসলীলার আলোকে নিহত মানুষের সংখ্যা আরও অনেক বেশি ছিল বলে ধারণা করা হয়। এ ভয়াবহ বিপর্যয়ের পর দেশের পূর্বাঞ্চলের বাঙালির প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের নিস্পৃহতা আবারও স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। বিদেশ সফর থেকে রাওয়ালপিন্ডি ফেরার পথে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকায় এলেও উপকূলের ঘূর্ণিঝড়বিধ্বস্ত এলাকা সফরে যাননি। নির্বাচনের ফলাফলের ওপরও বিষয়টি প্রভাব ফেলে। ১৯৭০ সালের ৭ ও ১৭ ডিসেম্বর যথাক্রমে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তবে পূর্ব পাকিস্তানের ঘূর্ণিঝড় আক্রান্ত অঞ্চলের ৯টি জাতীয় পরিষদ এবং ২১টি প্রাদেশিক পরিষদ আসনে ভোটগ্রহণ হয় একমাস পর ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারি।

নির্বাচনের ফলাফল (Results of the General Election)

নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি (১৬২টি সাধারণ এবং ৭টি সংরক্ষিত মহিলা আসন) আসনের মধ্যে ১৬৭টি লাভ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। অন্য দুটি আসনে নির্বাচিত হন পিডিপি প্রধান জনাব নূরুল আমিন ও চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়। প্রাদেশিক পরিষদের ৩১০টি (৩০০টি সাধারণ এবং ১০টি সংরক্ষিত মহিলা আসন) আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৯৮টি আসন লাভ করে। বাকি ১২টি আসনের মধ্যে ২টি পিডিপি, ১টি নেজাম-ই-ইসলামি, ১টি জামায়াত-ই-ইসলামি, পাকিস্তান, ১টি ন্যাপ ও ৭টি আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী জয়লাভ করে। অন্যদিকে জাতীয় পরিষদে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ১৪৪টি আসনের মধ্যে সে অঞ্চলের প্রধান দল জুলফিকার আলী ভুট্টোর 'পাকিস্তান পিপল্‌স পার্টি' ৮৮টি আসন লাভ করে। বাকি আসনগুলোর মধ্যে পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাউন্সিল) ৭টি, পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাইয়ুম) ৯টি, জমিয়ত উল উলামায়ে ইসলাম ৭টি, মারকাযী জমিয়ত উল উলেমা ই ইসলাম ৭টি, জামায়াত-ই-ইসলামি পাকিস্তান ৪টি, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ওয়ালী) ৭টি, পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কনভেনশন) ২টি, পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি ১টি এবং স্বতন্ত্র ১৪টি আসন পায়। উল্লেখ্য যে, নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানে এবং ভুট্টোর পিপল্‌স পার্টি পূর্ব পাকিস্তানে কোনো আসন পায়নি।

১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদের প্রদেশভিত্তিক ফলাফল

দলের নাম	পূর্ব পাকিস্তান	পাঞ্জাব	সিন্ধু	উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	বেলুচিস্তান	কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল	সংরক্ষিত মহিলা	মোট
আওয়ামী লীগ	১৬০	–	–	–	–	–	৭	১৬৭
পিপিপি	–	৬৪	১৮	১	–	–	৫	৮৮
মুসলিম লীগ (কাইয়ুম)	–	১	১	৭	–	–	–	৯
মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)	–	৭	–	–	–	–	–	৭
জমিয়ত উল উলামায়ে ইসলাম (হাজারভী)	–	–	–	৬	১	–	–	৭
মারকাযী জমিয়ত উল উলেমা ই ইসলাম	–	৪	৩	–	–	–	–	৭
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ওয়ালী)	–	–	–	৩	৩	–	১	৭
জামায়াত-ই-ইসলামি	–	১	২	১	–	–	–	৪

দলের নাম	পূর্ব পাকিস্তান	পাঞ্জাব	সিন্ধু	উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	বেলুচিস্তান	কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল	সংরক্ষিত মহিলা	মোট
মুসলিম লীগ (কনভেনশন)	–	২	–	–	–	–	–	২
পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি	১	–	–	–	–	–	–	১
স্বতন্ত্র	১	৩	৩	–	–	৭	–	১৪
মোট	১৬২	৮২	২৭	১৮	৪	৭	১৩	৩১৩

Source: *Election Commission, Pakistan Report on General Elections in Pakistan, 1970–71 (Islamabad, 1972) P.204–05.*

পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল

দলের নাম	সাধারণ আসন	সংরক্ষিত মহিলা	মোট আসন
আওয়ামী লীগ	২৮৮	১০	২৯৮
পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি (পিডিপি)	২	—	২
জামায়াত-ই-ইসলামি	১	—	১
ন্যাপ (মস্কোপন্থী)	১	—	১
নেজাম-ই-ইসলামি	১	—	১
স্বতন্ত্র প্রার্থী	৭	—	৭
মোট	৩০০	১০	৩১০

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ১৯৭০ সালে জাতীয় পরিষদের নির্বাচন কত তারিখ অনুষ্ঠিত হয়? *[সকল বোর্ড ২০১৯]*

২. ১৯৭০ সালে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন কত তারিখ অনুষ্ঠিত হয়?

৩. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত আসন ছিল কতটি?

৪. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে কয়টি আসন লাভ করে? *[সকল বোর্ড ২০১৬]*

৫. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রাদেশিক পরিষদে কয়টি আসন লাভ করে?

৬. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে পশ্চিম পাকিস্তানে ৮৮টি আসন লাভ করে কোন দল?

উত্তরের জন্য ৪১৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফলের একটি চার্ট তৈরি করো।

গ. বাড়ির কাজ

২০১৫ সালের ৮ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয় মিয়ানমারের ঐতিহাসিক নির্বাচন। এ নির্বাচনে অংসান সুচির দল National League for Democracy পার্লামেন্টের উচ্চ ও নিম্নকক্ষ মিলে মোট ৬৬৪ আসনের মধ্যে ৪৭৬টি আসন লাভ করে। অপরদিকে, সামরিক জান্তাদের নেতৃত্বাধীন দল Union Soliderity and Development Party লাভ করে মাত্র ৭৩টি আসন। সামরিক জান্তা শাসনের বিরুদ্ধে এ নির্বাচন ছিল জনগণের দীর্ঘদিনের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশের এক বিশাল সমারোহ। ফলে নির্বাচনে পরাজিত হয়ে USDP দল ক্ষমতা ত্যাগ করলে ১২ মার্চ ২০১৬ তারিখে NLD দল সরকার গঠন করে। যার ফলে মিয়ানমারের এক নতুন দিগন্তের সূচনা হয়।

১. উদ্দীপকের নির্বাচনের সাথে তোমার পঠিত কোন নির্বাচনের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

২. উক্ত নির্বাচনের সাথে তোমার পঠিত নির্বাচনের পার্থক্যের দিকগুলো বিশ্লেষণ করো।

পাঠ ৩

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় ও এর প্রতিক্রিয়া (Victory of Awami League in the 1970 General Election and Its Reactions)

আওয়ামী লীগের বিজয়ের কারণ (Causes of the Victory of Awami League)

১৯৭০ সালের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। আওয়ামী লীগের এ বিপুল বিজয়ের পেছনে নানা কারণ ছিল—

বঞ্চনা ও শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার: পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী শুরু থেকেই পূর্ব বাংলার মানুষের ওপর অত্যাচার এবং আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে বৈষম্য-বঞ্চনা চালাচ্ছিল, বিক্ষুব্ধ বাঙালি জাতি নির্বাচনে ব্যালটের মাধ্যমে তার জবাব দেয়।

নির্বাচনি ইশতেহার: আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতেহার পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে উঠেছিল। ১১ দফা ঐ ইশতেহারে ছয় দফা এ অঞ্চলের আপামর জনতার প্রাণের দাবি প্রতিফলিত হওয়ায় তারা এর দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়।

তরুণ, যুবক ও ছাত্র সমাজের বিশাল ভূমিকা: ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয়ের পেছনে তরুণ, যুবক তথা ছাত্র সমাজের বিশাল ভূমিকা ছিল। জাতীয়তাবাদী চেতনায় উজ্জীবিত এ তরুণ সমাজ ছয় দফাসহ আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতেহার ও কর্মসূচি ভোটারদের কাছে সাফল্যের সাথে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। তারা এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পক্ষে ভোট প্রদানের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে পূর্ব বাংলার মানুষকে অবহিত করে। এতে করে তারা পাকিস্তানি দুঃশাসন থেকে মুক্তির আশায় আওয়ামী লীগের পক্ষে ভোট দেয়।

ইসলামের আদর্শের প্রতি সম্মান প্রদর্শন: নির্বাচনি প্রচারণায় শেখ মুজিবুর রহমান দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্ম ইসলামের আদর্শের প্রতিও সম্মান দেখান। তাই ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা আওয়ামী লীগকে বিজয়ী করতে ভূমিকা রাখেন।

শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি: আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়ের পেছনে দলীয় প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত ভাবমূর্তিও বিশেষভাবে কাজ করেছিল। তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, নেতৃত্বের গুণাবলি এবং ক্ষুরধার ও প্রাঞ্জল বক্তৃতা মানুষকে সহজেই তার প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। ফলে পূর্ব বাংলার মানুষ তার দল আওয়ামী লীগের প্রতি নিজেদের সমর্থন ব্যক্ত করে।

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে মানুষের পাশে দাঁড়ানো: ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে এ অঞ্চলে জান-মালের ব্যাপক ক্ষতি হয়। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসকবর্গ এ পরিস্থিতি মোকাবেলায় চরম নিস্পৃহতা ও ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ দুর্যোগ কবলিত মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবে সরকারের ব্যর্থতা প্রচার করে নির্বাচনে সফলতা লাভ করেন।

ভুট্টোর অজনপ্রিয়তা: পশ্চিম পাকিস্তানের জনপ্রিয় নেতা ভুট্টো এক-ইউনিটের কথা ঘোষণা করে পাঞ্জাবিদের কাছে জনপ্রিয়তা পেলেও পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশে বিরাগভাজন হন। তিনি সাধারণ মানুষের কল্যাণে সমাজতন্ত্রের কথা ঘোষণা করে পাকিস্তানের পুঁজিপতিদের সমর্থন হারান।

সর্বোপরি, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই ভাষা আন্দোলনসহ বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার বাঙালির মধ্যে যে স্বতন্ত্র জাতীয়তাবাদী চেতনা গড়ে উঠেছিল আওয়ামী লীগের নির্বাচনি বিজয়ে তা সহায়ক হয়।

নির্বাচনি ফলাফলের প্রতিক্রিয়া (Reactions of the General Election Results)

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ব্যাপক সাফল্যে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী শঙ্কিত হয়ে ওঠে। তারা বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা যাওয়া ঠেকাতে জনগণের রায় বানচালের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের নেতা পাকিস্তান পিপল্স পার্টির জুলফিকার আলী ভুট্টো আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিরোধিতা করতে থাকেন। তার পেছনে ছিল সেনাশাসকদের মদদ। প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করতে টালবাহানা শুরু করেন। শেষপর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান দল আওয়ামী লীগের চাপে ইয়াহিয়া ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। এ দিন সারা দেশে হরতাল পালিত হয়। মূলত এ দিন থেকেই বাঙালির অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়ে যায়, যা ২৫ মার্চ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। সারাদেশে নানা উদ্বেগ, উত্তেজনার মধ্যে ৭ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্স ময়দানের বিশাল জনসভায় ভাষণ দেন, যা ছিল জাতির জন্য সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা। মূলত ৭ মার্চের ভাষণ থেকেই এদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় এবং বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়।

জেনে রাখো

এক নজরে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন।
- আওয়ামী লীগ ৬ দফা ও ছাত্রসমাজের ১১ দফার ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশ নেয়।
- মোট ২৪টি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে।
- ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের এবং ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
- আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩১০টি আসনের মধ্যে ২৯৮টিতে জয়ী হয়ে একচেটিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।
- এ নির্বাচনে বিজয়ী দল আওয়ামী লীগকে সরকার গঠন করতে না দেওয়ার ষড়যন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে কোন দলটি বিজয় অর্জন করে? */ম. বো. ২০২৩; সকল বোর্ড ২০২১/*
২. ১৯৭০ সালে বাঙালি জাতি কীসের মাধ্যমে পাকিস্তানিদের শোষণের জবাব দেয়?
৩. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কীসের ভিত্তিতে নির্বাচনি ইশতেহার ঘোষণা করে?
৪. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের তরুণ সমাজ কোন চেতনায় উজ্জীবিত হয়?
৫. ইয়াহিয়া খান কত তারিখে ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন?
৬. জুলফিকার আলী ভুট্টো কীসের কথা বলে পাকিস্তানের পুঁজিপতিদের সমর্থন হারান?

উত্তরের জন্য ৪১৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয়ের পাঁচটি কারণ ছকে উপস্থাপন করো।

পাঠ ৪

১৯৭০ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য
Importance and Significance of the 1970 General Election

পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব অনেক। পাকিস্তানের রাজনীতিতে এ নির্বাচনের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। এতে আওয়ামী লীগের অভূতপূর্ব বিজয় পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর দীর্ঘ ২৩ বছরের নিপীড়ন ও শোষণের হাত থেকে মুক্তির সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। নিচে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরা হলো—

ক. প্রথম সাধারণ নির্বাচন: ১৯৭০ সালের নির্বাচন ছিল জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটের ভিত্তিতে পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন। এ সময় একই সাথে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। একে অবিভক্ত পাকিস্তানের শেষ সাধারণ নির্বাচনও বলা যেতে পারে। এ নির্বাচনটি সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবেশে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

খ. আঞ্চলিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা: ১৯৭০ সালের নির্বাচনে মূলত আঞ্চলিক রাজনীতির প্রাধান্য প্রকাশ পায়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে এবং পাকিস্তান পিপলস পার্টি পশ্চিম পাকিস্তানে একক প্রাধান্য লাভ করে। এ প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দলের কেউই সমগ্র পাকিস্তানের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সক্ষমতা অর্জন করতে পারেনি। আওয়ামী লীগ যেমন পশ্চিম পাকিস্তানে কোনো আসন পায়নি, তেমনই পিপিপিও পূর্ব পাকিস্তানে আসন পেতে ব্যর্থ হয়। এভাবে সত্তরের নির্বাচনের মাধ্যমে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যকার জাতিগত, রাজনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক ব্যবধানের চিত্রটি আরও স্পষ্ট হয়।

গ. বাঙালি স্বাতন্ত্র্যবাদের বিজয়: ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর থেকেই বাঙালি জাতি ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি সব ক্ষেত্রে নিজেদের স্বাতন্ত্র্যবাদ দাবি করে আসছিল। কিন্তু পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী নানা দমনমূলক উপায়ে তাদের থামিয়ে রাখে। অবশেষে ১৯৭০ এর নির্বাচনে বাঙালির বিজয় তাদের স্বতন্ত্র সত্তাকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে।

ঘ. আওয়ামী লীগের সুদৃঢ় অবস্থান: ১৯৭০ সালের নির্বাচনে কৃষক, শ্রমিক, ছাত্রসহ সকল শ্রেণির মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট প্রদান করে আওয়ামী লীগকে বিজয় এনে দেয়। এই নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ জাতীয়ভাবে দেশের শক্তিশালী রাজনৈতিক দল হিসেবে অবস্থান সুনিশ্চিত করে।

ঙ. বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিজয়: রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালির মধ্যে জাতীয়তাবাদের যে বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৬৬ সালের ৬ দফা দাবি এবং উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে তা বিকশিত হয়ে পূর্ণতা পায়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদ সুদৃঢ় রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ভিত্তি পায় এবং বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাই পরবর্তী সময়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙালি বিশ্ববাসীর অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করে।

জেনে রাখো

জাতীয়তাবাদ একটি রাজনৈতিক অভিব্যক্তি। জাতীয়তাবাদী চেতনার কারণে ব্যক্তি নিজেকে একটি নির্দিষ্ট জাতির অন্তর্ভুক্ত মনে করে এবং সেই জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ভৌগোলিক পরিবেশ, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতির সাথে একাত্মবোধ অনুভব করে। সুতরাং যে চেতনার কারণে বাংলাভাষীরা নিজেদের বাঙালি মনে করে এবং বাঙালি জাতির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি লালন করে তাই বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা।

চ. স্বায়ত্তশাসন দাবির বৈধতা প্রমাণ: পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বাঙালির আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা। কিন্তু স্বৈরাচারী সরকার তাদের এ ন্যায়সংগত দাবিকে অবৈধ বলে প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় বাঙালির ছয় দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের দাবির বৈধতা প্রমাণ করে।

ছ. বাঙালি জাতির আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টি: ১৯৭০-এর নির্বাচনে বিপুল বিজয় বাঙালি জাতির আত্মপ্রত্যয় বৃদ্ধি করে। তারা প্রথমবারের মতো নিজেদের ঐক্যবদ্ধ ও রাজনৈতিকভাবে সুসংহত শক্তি হিসেবে প্রমাণ করার সুযোগ পায়। আর এ আত্মপ্রত্যয় বাঙালি জাতিকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে এবং সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জনে সক্ষম করে তোলে।

জ. **বাংলাদেশের স্বাধীনতার বার্তাবাহক:** ১৯৭০ সালের নির্বাচন ছিল ঐক্যবন্ধ পাকিস্তানের পতন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার বার্তাবাহক। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের অপরিসীম ভূমিকা ও প্রভাব ছিল। এ নির্বাচনের ফলে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকেরা পূর্ব পাকিস্তান শাসনের বৈধতা হারায়। উদ্বিগ্ন হয়ে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী আওয়ামী লীগের নির্বাচনি বিজয়কে নস্যাতের চক্রান্ত শুরু করে। বাঙালিরা শান্তিপূর্ণ উপায়ে সংকট সমাধানের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। এমন প্রেক্ষাপটেই ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালি জাতির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাঙালি জাতিও রুখে দাঁড়ায় এবং নয়মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন করে। সত্তরের নির্বাচন এভাবেই বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পথ তৈরি করে।

জেনে রাখো

স্বাধীনতা মানুষের সাথে একান্তভাবে সম্পর্কযুক্ত একটি মৌল রাজনৈতিক ধারণা। স্বাধীনতা শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ Liberty। এটি ল্যাটিন শব্দ Liber থেকে এসেছে, যার অর্থ free বা স্বাধীন। সাধারণভাবে স্বাধীনতা বলতে নিজের ইচ্ছামতো যা খুশি তাই করাকে বোঝায়। কিন্তু এমন স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর। তাই অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে নিজের অধিকার ভোগ এবং কাজ করাকেই স্বাধীনতা বলা হয়। অন্য কথায় অন্যের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে নিজের কর্তব্য পালন করাকেও স্বাধীনতা বলা হয়।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটের ভিত্তিতে পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন কোনটি?
২. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে কীসের প্রাধান্য প্রকাশ পায়?
৩. কোন নির্বাচন বাঙালি স্বাতন্ত্র্যবাদকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে?
৪. কোন নির্বাচনে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিজয় ঘটে?
৫. ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে কীসের বিজয় ঘটে?
৬. কোন নির্বাচনে বাঙালির ছয় দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন দাবির বৈধতা প্রমাণিত হয়?

উত্তরের জন্য ৪১৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১৯৭০ সালের নির্বাচন বাংলাদেশের স্বাধীনতার বার্তাবাহক ছিল—যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করো।

গ. বাড়ির কাজ

২০১৯ সালের ভারতের লোকসভা নির্বাচন সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান এসি নিয়েলসনের সহায়তায় এবিপি নিউজের এক জরিপের ফলাফলে বলা হয়— বিজেপি ও এনডিএ অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। নির্বাচনের মূল আকর্ষণ নরেন্দ্র মোদী ও রাহুল গান্ধী। পাকিস্তানি আমলের শেষের দিকে এদেশের একটি নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও পিপিপি'র শক্তিশালী অবস্থান ছিল। উভয় দলই নিজ নিজ অঞ্চলে জনপ্রিয় ছিল।

ক. উদ্দীপকে পাকিস্তান আমলের কোন নির্বাচনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
খ. উক্ত নির্বাচনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

পাঠ ৫

অসহযোগ আন্দোলন (২-২৫ মার্চ, ১৯৭১)
Non-Cooperation Movement (2-25 March, 1971)

১৯৭০ সালে পাকিস্তানের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন হয়। এতে উভয় পরিষদে আওয়ামী লীগ বিজয় অর্জন করে। তবে প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে বিষয়টি বিলম্বিত করতে কূটকৌশল অবলম্বন করেন। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তারা বুঝতে পারে, পাকিস্তানিরা কিছুতেই বাঙালিকে তাদের ন্যায্য অধিকার দিতে চায় না। তাই বাঙালির স্বায়ত্তশাসনের দাবি দ্রুত স্বাধীনতার দাবিতে রূপ নিতে থাকে। বাঙালি জাতি অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকেরা তাদের অবস্থানে অনড় থাকে। এমনকি বাঙালির দাবিকে চিরতরে স্তব্ধ করতে চালায় গণহত্যা। এতে অনিবার্য হয়ে ওঠে মুক্তিযুদ্ধ।

ক্ষমতা হস্তান্তরে শাসকদের গড়িমসি: ১৯৭০ সালের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের পর জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান না করে ইয়াহিয়া সরকার টালবাহানা শুরু করে। নির্বাচনের পর ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তানে আসেন এবং শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন। ইয়াহিয়া আলোচনা শেষে পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে যাওয়ার আগে ঘোষণা করেন, শেখ মুজিবুর রহমানই হবেন পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়ে সে অঞ্চলের প্রধান দল পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর সাথে আলোচনা করেন। ভুট্টো কেন্দ্রে সরকার গঠনের ক্ষেত্রে তার দলের অংশ থাকা উচিত বলে অন্যায় দাবি করেন। অথচ আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদেও একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল। পিপিপি পশ্চিম পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করায় ভুট্টো কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের সরকার গঠনের কথা মেনে নিতে রাজি হলেন না। এ অবস্থায় শেখ মুজিব প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে ১৯৭১ সালের ১০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করার পরামর্শ দেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৩ ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করেন, ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে। তবে ভুট্টো অধিবেশনে যোগদান করতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ ছয় দফার ভিত্তিতে সংবিধান প্রায় রচনা করে ফেলেছে। সেটি অনুমোদনের জন্য তিনি কিংবা তার দলের সদস্যর ঢাকায় আসতে পারেন না। ইতোমধ্যে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কিছুসংখ্যক সদস্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে ঢাকায় আসেন। ভুট্টো হুমকি দিয়ে বলেন, তার সম্মতি ছাড়া জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসলে পশ্চিম পাকিস্তানের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ধর্মঘট ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হবে। আর তার দলের সদস্যদের ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করার অর্থ হবে পার্লামেন্টকে কসাইখানায় পরিণত করা।

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা ও অসহযোগ আন্দোলন: ১৯৭১ সালের ১ মার্চ ইয়াহিয়া খান হঠাৎ করে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। তার এ ঘোষণার পরপরই পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান হয়ে ওঠে উত্তাল। ঢাকাবাসী স্বতঃস্ফূর্তভাবে মিছিল, পথসভা ও জনসভা করতে থাকে। অনেক মিছিল-সমাবেশে বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্লোগানও ওঠে। আওয়ামী লীগের ডাকে ২ ও ৩ মার্চ সারা দেশে হরতাল পালিত হয়। শেখ মুজিবুর রহমান পরিস্থিতির জন্য পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীকে দায়ী করে বলেন, একটি সংখ্যালঘু দলের মতামতকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করা হয়েছে। তিনি সামরিক সরকারের চক্রান্ত রুখে দাঁড়াবার জন্য জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। গণবিক্ষোভ দমনের জন্য প্রশাসন সান্ধ্য আইন জারি করে। কিন্তু জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সান্ধ্য আইন অমান্য করে। ফলে বিভিন্ন স্থানে সেনাদের গুলিতে বহুলোক হতাহত হয়। ছাত্রসমাজ প্রচণ্ড বিক্ষোভে ঢাকার আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে তোলে। ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ছাত্র-জনতার সমাবেশে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। এ পতাকা উত্তোলন করেন ছাত্রনেতা আ স ম আব্দুর রব। শেখ মুজিবুর রহমান ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় সরকারের বিরুদ্ধে পূর্ণ অসহযোগের আহ্বান জানান। এ সমাবেশেই ছাত্রসমাজের পক্ষে ছাত্রনেতা শাজাহান সিরাজ স্বাধীন বাংলাদেশের ইশতেহার পাঠ করেন। অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে এদিন প্রদেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত, কলকারখানা বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এ কর্মসূচি পালনকালে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক সহিংসতায় বহু

হতাহতের ঘটনা ঘটে। পরিস্থিতির ভয়াবহতা দেখে ইয়াহিয়া খান ৬ মার্চ এক বেতার ভাষণে ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদ অধিবেশন আহ্বান করেন। কিন্তু ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ৭ মার্চের ভাষণে শেখ মুজিবুর রহমান তা প্রত্যাখ্যান করেন। এ ভাষণে তিনি বাঙালিকে স্বাধীনতার জন্য লড়াইয়ের প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দেন। ইয়াহিয়া খান রাওয়ালপিন্ডিতে ১০ মার্চ গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করেছিলেন। শেখ মুজিব সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে বলেন, শহিদের রক্তের ওপর দিয়ে তিনি গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে যাবেন না।

একাত্তরের মার্চের অসহযোগ আন্দোলন বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়ের সূচনা করে। এ উত্তাল আন্দোলনের ফলে পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি কেন্দ্রীয় শাসনের ভিত্তি একেবারেই দুর্বল হয়ে যায়।

মুজিব-ইয়াহিয়া প্রহসনের আলোচনা: ১০ মার্চ পাকিস্তান সরকার এক সামরিক আদেশ জারি করে সব কর্মকর্তা-কর্মচারীকে কর্মস্থলে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দিলেও অসহযোগ আন্দোলন চলতে থাকে। এ পরিস্থিতিতে আলোচনার জন্য ইয়াহিয়া খান পশ্চিম পাকিস্তানি কিছুসংখ্যক নেতাসহ ১৫ মার্চ আবার ঢাকায় আসেন। শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে প্রায় দশদিন তাদের আলোচনা চলে। একপর্যায়ে ভুট্টোও আলোচনায় যোগ দেন। ইয়াহিয়া খানের সাথে শেখ মুজিবুর রহমান ও জুলফিকার আলী ভুট্টোর কখনো ত্রি-পাক্ষিক এবং কখনো বা দ্বি-পাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কোনো কোনো বিষয়ে নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতৈক্য হলেও ৬ দফা প্রশ্নে ভুট্টোর ভিন্নমত ও সংশোধনী প্রস্তাবের কারণে আলোচনায় অচলাবস্থা তৈরি হয়। একসময় এ আলোচনার সাফল্য সম্পর্কে বাংলার মানুষের মনে সংশয় দেখা দেয়। তাই তারা আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে। বাঙালির সংশয়কে সত্যি প্রমাণ করে আলোচনা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। বস্তুত আলোচনা দীর্ঘায়িত করার পেছনে ছিল পাকিস্তানিদের ষড়যন্ত্র। সংলাপের আড়ালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক হামলার প্রস্তুতি নিতে থাকে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রতিদিন বিমানে করে পূর্ব পাকিস্তানে বেসামরিক পোশাকে সামরিক বাহিনীর লোকজন আনা হতে থাকে। এছাড়া জাহাজে করে আসতে থাকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ।

স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতার প্রস্তুতি: ২৩ মার্চ পাকিস্তানের প্রজাতন্ত্র দিবসে পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র পাকিস্তানের পতাকার পরিবর্তে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের সিদ্ধান্ত হয়। এদিন শুধু ক্যান্টনমেন্ট ও প্রেসিডেন্ট হাউসে পাকিস্তানের পতাকা তোলা হয়েছিল। ঢাকার বাড়িতে বাড়িতে সবুজ জমিনে লাল সূর্যের মাঝে পতাকাখচিত বাংলাদেশের প্রথম পতাকা ওঠানো হয়। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ শাসনতন্ত্রের খসড়া তৈরি করার জন্য প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে ডাক আসার জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। কিন্তু সেই ডাক আর আসেনি। বাংলাদেশ এগিয়ে চলে মুক্তিযুদ্ধের পথে। একাত্তরের মার্চজুড়ে বাংলার দিকে দিকে ধ্বনিত হয় 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা', 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর' প্রভৃতি স্লোগান।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ১৯৭০ এর নির্বাচনের পর নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি করেন কে?
২. ইয়াহিয়া খান কখন জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করেন?
৩. স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা প্রথম কবে উত্তোলন করা হয়?
৪. স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা প্রথম উত্তোলন করেন কে?
৫. ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে স্বাধীন বাংলাদেশের ইশতেহার কে পাঠ করেন?
৬. পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের সিদ্ধান্ত হয় কত তারিখে?

উত্তরের জন্য ৪১৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

পূর্ব পাকিস্তানের অসহযোগ আন্দোলনের দাবিসমূহ ছক আকারে লেখো।

পাঠ ৬ ও ৭

শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণ এবং এর তাৎপর্য
7th March Speech of Sheikh Mujibur Rahman and Its Significance

১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে ৭ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান রমনার রেসকোর্স ময়দানে এক সাহস সঞ্চারি ভাষণ দিয়েছিলেন। শেখ মুজিবের ৭ মার্চের ভাষণে ভাব, ভাষা, বাক্য ও শব্দচয়ন রাজনীতিবিদ, ভাষাবিদ, কূটনীতিকসহ সব শ্রেণির মানুষকে অভিভূত করেছে। এ ভাষণ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ বুঝে নেয় শেখ মুজিব কার্যত বাঙালিকে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। ৭ মার্চ বিকেল ৫টা ১৯ মিনিটে শুরু হওয়া ভাষণটি ১৮ মিনিট স্থায়ী হয়।

৭ মার্চের ভাষণ (7th March Speech)

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়ের পরও সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান কর্তৃক নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করায় বাংলার মানুষের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর হয়ে ওঠে। এই সংকটময় প্রেক্ষাপটে অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণটি ছিল দুর্দমনীয় এক জাতীয় স্বাধিকার চেতনার ঘোষণা এবং সুপরিকল্পিত কৌশল ও দিকনির্দেশনা সংবলিত এক ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের রূপরেখা। এই ভাষণে শেখ মুজিবুর রহমান অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থাপন করেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল—

- বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মানুষের মুক্তির দিকনির্দেশনা।
- সরকারি অফিস-আদালত ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনা, কর প্রদান এবং বন্দর ব্যবহারসহ নানা ক্ষেত্রে অসহযোগ কর্মসূচি জোরদার করার নির্দেশনা।
- প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান।
- গ্রাম ও মহল্লাভিত্তিক 'সংগ্রাম পরিষদ' গড়ে তোলার আহ্বান।
- চলমান সামরিক আইন প্রত্যাহারের দাবি।
- নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তরের জোরালো দাবি।
- জাতিকে সংহতি, শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার আহ্বান।
- দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের জন্য তেজোদ্দীপ্ত আহ্বান।
- বাঙালির ওপর চালানো গণহত্যার তদন্ত ও বিচারের প্রয়োজনীয়তা।
- শহিদদের পরিবার ও আহতদের পাশে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি।
- শিল্প মালিকদের অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নেওয়া শ্রমিকদের বেতন প্রদানের নির্দেশনা।

৭ মার্চের ভাষণ শুধু একটি রাজনৈতিক ভাষণ ছিল না, এটি ছিল এক মুক্তিপিপাসু জাতির সংগ্রামের দিকনির্দেশনা। শেখ মুজিবুর রহমানের বজ্রকণ্ঠে উচ্চারিত, "মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম" এই ঘোষণা বাঙালিকে স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করে তোলে। ভাষণটি ছিল একটি জাতিকে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দৃঢ় আহ্বান, যা পরবর্তী সময়ে স্বাধীনতার যুদ্ধে বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ ও উদ্বুদ্ধ করে।

৭ মার্চের ভাষণের তাৎপর্য (Significance of the 7th March Speech)

১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণ ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এ ভাষণ বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসের এক মূল্যবান দলিল। এ ভাষণকে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর (মেমোরি অব দ্যা ওয়াল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টারে) 'বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। বিশ্বের ইতিহাসের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দলিলগুলোকে এ মর্যাদায় ভূষিত করা হয়ে থাকে। এতে প্রাঞ্জল ভাষায় পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্য ও অবিচারের চিত্র তুলে ধরে করণীয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

৭ মার্চের ভাষণের পর পূর্ব পাকিস্তানে অসহযোগ আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। এ ভাষণে শেখ মুজিব পূর্ব বাংলার মানুষের প্রতি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বঞ্চনার ইতিহাস তুলে ধরে তাদের মুক্তির কথা বলেছেন। তিনি এ ভূখণ্ডের সব ধর্মীয় ও জাতিগত গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। সামরিক বাহিনীর সদস্যদের পরামর্শ দিয়েছেন সংঘাত এড়াতে নিজেদের ব্যারাকে অবস্থান করার জন্য। এ বিষয়গুলো বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও নেতৃত্বের গুণকে তুলে ধরে। ৭ মার্চের ভাষণে শেখ মুজিব এদেশের মানুষকে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানান। এ ভাষণের পরপরই বাঙালি সর্বাত্মক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকে। স্বাধীনতাপাগল মানুষের সর্বাত্মক অসহযোগিতার কারণে পূর্ব পাকিস্তানের সরকারি কর্মতৎপরতা প্রায় অচল হয়ে পড়ে। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাদের হামলা শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত শেখ মুজিবসহ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের আদেশেই পূর্ব পাকিস্তানের বেসামরিক প্রশাসন চলতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানভিত্তিক কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ কার্যত অচল হয়ে পড়ে।

৭ মার্চের ভাষণ বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ৭ মার্চের ভাষণের একটাই দিকনির্দেশনা ছিল। আর তা হলো স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ। একটি ভাষণ একটি জাতিকে কতটা উদ্দীপ্ত করতে পারে তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এ ভাষণ। এ ভাষণের মাধ্যমেই ৭ কোটি নিরস্ত্র, শান্তিপ্রিয় বাঙালি সশস্ত্র যোদ্ধায় পরিণত হওয়ার প্রেরণা পায়। তৈরি হয় পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য। শেখ মুজিবের ৭ মার্চের ভাষণ পূর্ব পাকিস্তানের অসহযোগ আন্দোলনের সাফল্যে অপরিসীম অবদান রেখেছিল। আর ঐ আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতিতেই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হয়। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমেই বাঙালি অর্জন করে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান কোথায় ঐতিহাসিক ভাষণ দেন?
২. রেসকোর্স ময়দানের বর্তমান নাম কী?
৩. ৭ মার্চের ভাষণে দিকনির্দেশনা কী ছিল?
৪. অহসযোগ আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতি কী ছিল?
৫. ৭ মার্চের ভাষণকে বিশ্ব-ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয় কোন প্রতিষ্ঠান? *[ঢাবি অধিভুক্ত ৭ কলেজ ২০১৭-১৮; জাবি ২০১৭-১৮]*
৬. ৭ মার্চের ভাষণকে কোন তারিখে মেমোরি অব দ্যা ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে? *[ইবি ২০১৭-১৮]*

উত্তরের জন্য ৪১৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. ৭ মার্চের ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো চিহ্নিত করে ছকে তুলে ধরো।
২. বাঙালির মহান মুক্তিযুদ্ধে ৭ মার্চের ভাষণের প্রভাব বিশ্লেষণ করো।

গ. দলীয় কাজ

শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণের ওপর একটি রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করো।

পাঠ ৮

২৫ মার্চের কালরাতের গণহত্যা
Genocide of the Dark Night of the 25th March

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে বাঙালি তথা পৃথিবীর ইতিহাসে একটি কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সূচনা হয়। এই দিন পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় ঘুমন্ত নিরস্ত্র মানুষের ওপর এক বর্বর হত্যাযজ্ঞ চালায়। নির্বিচার হত্যা ছাড়াও গোলাবর্ষণ ও অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে ঢাকাকে মৃত্যুপুরীতে পরিণত করা হয়। বাঙালির স্বাধিকারের দাবিকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়াই ছিল এর লক্ষ্য। ভয়ঙ্কর সেই রাতটি এদেশে পঁচিশে মার্চের 'কালরাত' নামে পরিচিত। পাকিস্তানি সামরিক কর্তৃপক্ষ নির্মম ঐ অভিযানের সাংকেতিক নাম দিয়েছিল 'অপারেশন সার্চলাইট'। ২৫ মার্চ এ হামলা হলেও মূলত মার্চের প্রথম থেকেই এর পরিকল্পনা করা হয়।

ইয়াহিয়া-মুজিব লোক দেখানো আলোচনায় ২৪ মার্চ পর্যন্ত কোনো ঐকমত্য হয়নি। অবশ্য পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সংকট নিরসনের কোনো অভিপ্রায়ই ছিল না। ইয়াহিয়া খান আলোচনার নামে মূলত কালক্ষেপণ করে পূর্ব পাকিস্তানে নির্মম হামলা চালানোর প্রস্তুতি সম্পন্ন করছিলেন। হামলার প্রস্তুতি শেষ হলে তিনি আলোচনা অসমাপ্ত রেখেই ২৫ মার্চ গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন। যাওয়ার আগে তিনি মেজর জেনারেল টিক্কা খানকে নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর চূড়ান্ত আক্রমণের নির্দেশ দিয়ে যান।

অপারেশন সার্চলাইটের পরিকল্পনা (Planning of the Operation Searchlight)

১৯৭১ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর এক বৈঠকে অপারেশন সার্চলাইটের বিষয়ে প্রস্তাব ওঠে। এর ভিত্তিতে মার্চের শুরুতে অপারেশন সার্চলাইটের মূল পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। পরিকল্পনাটি তৈরি করেন মেজর জেনারেল খাদিম হুসাইন রাজা এবং মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলি। বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, পশ্চিম পাকিস্তানের কোয়েটা থেকে ১৬তম ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন এবং খরিয়ান থেকে ১৯তম ডিভিশনকে ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে যাওয়ার প্রস্তুতি নেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়। পূর্ব পাকিস্তানের দায়িত্বপ্রাপ্ত জ্যেষ্ঠ সেনা কর্মকর্তা লে. জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খান এবং পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ভাইস অ্যাডমিরাল এস এম আহসান সাধারণ বাঙালিদের ওপর সামরিক হামলার বিরোধী ছিলেন বলে অপারেশনের আগে তাদেরকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। নির্মমতার জন্য কুখ্যাত সেনা কর্মকর্তা লে. জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর করে পাঠানো হয়। মার্চের ১৭ তারিখ পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল হামিদ টেলিফোন করে মেজর জেনারেল রাজাকে অপারেশনের পরিকল্পনা করার দায়িত্ব দেন। ১৮ মার্চ সকালে ঢাকা সেনানিবাসের জিওসি কার্যালয়ে বসে মেজর জেনারেল রাজা এবং মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলি অপারেশন সার্চলাইটের পরিকল্পনা তৈরি করেন।

জেনারেল রাও ফরমান আলি ও জেনারেল খাদিম অপারেশনের পরিকল্পনা ও বিভিন্ন সেনা ইউনিটের ওপর সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব বণ্টনের কাজ তদারকি করেন। মনে করা হয়, বাঙালি সেনারা অপারেশন শুরুর সময় বিদ্রোহ করবে এ ধারণা থেকে পরিকল্পনাকারীরা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে আলাপকালে বাঙালি সেনাদের আগেই নিরস্ত্র করার প্রস্তাব দেন। পাশাপাশি তারা বাঙালি রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেফতারেরও প্রস্তাব দেন। সিদ্ধান্ত হয় অপারেশন সার্চলাইট শুরু হবে ঢাকায় ২৫ মার্চ রাতের শেষ প্রহরে। অন্যান্য সেনা গ্যারিসনকে ফোন করে জিরো আওয়ারে (অপারেশন শুরুর নির্ধারিত সময়) কার্যক্রম শুরু করার জন্য সতর্ক করে দেওয়া হয়। ঢাকায় পাকিস্তানি সৈন্যদের কমান্ডে ছিলেন রাও ফরমান আলি। অন্যান্য স্থানের সৈন্যদের কমান্ডে ছিলেন জেনারেল খাদিম রাজা। জেনারেল টিক্কা খান এবং তার কর্মকর্তারা সার্বিক সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যে নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত ছিলেন।

অপারেশন সার্চলাইট ও এর বাস্তবায়নে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ
Operation Searchlight and the Taken Decisions for Its Implementation

পরিকল্পনাকারীদের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, অপারেশন সার্চলাইটের মূল লক্ষ্য ছিল আওয়ামী লীগের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নেতা এবং আওয়ামী লীগকে সমর্থন জানানো সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের নিশ্চিহ্ন করা। অপারেশনের সর্বোচ্চ সাফল্যের জন্য

ধূর্ততা ও দ্রুতগতির ওপর জোর দেওয়া হয়। হামলা পরিচালনাকারীদের সর্বোচ্চ শক্তিপ্রয়োগের ক্ষমতা প্রদান করা হয়। সাধারণ মানুষের বসতি এবং হিন্দুপ্রধান এলাকাগুলোতে তল্লাশি এবং আক্রমণের কর্তৃত্বও দেওয়া হয়। *[সূত্র: বাংলাপিডিয়া]*

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের নির্দেশ মতো পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর সেনা কর্মকর্তা টিক্কা খানের বাহিনী ২৫ মার্চ মধ্যরাতের কিছু আগে ঢাকায় গণহত্যা ও ধ্বংসের তাণ্ডবলীলায় মেতে ওঠে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, রাজারবাগ পুলিশ লাইনস, পিলখানার ইপিআর বাহিনীর (বর্তমানে বিজিবি) ঘাঁটি, পুরনো ঢাকার হিন্দু প্রধান এলাকাসহ ঢাকার অনেক জায়গা এই নির্বিচার হামলার শিকার হয়। নারকীয় আক্রমণের শিকার হয়ে দর্শন বিভাগের গোবিন্দচন্দ্র দেবসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন খ্যাতিমান অধ্যাপক শহিদ হন। ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, জগন্নাথ হল ও জহুরুল হক হলের কয়েকশ আবাসিক ছাত্র ও কর্মচারীকে হত্যা করে সেনারা। সে রাতে নির্মম হত্যাযজ্ঞের শিকার হয় রাস্তার প্রতিবাদী জনতা, সাধারণ পথচারী ও বস্তিবাসীও। দেশি-বিদেশি বিভিন্ন সূত্রমতে, ২৫ মার্চ রাতে শুধু ঢাকায় প্রায় ৭০০০ মানুষকে হত্যা করা হয়। *[সূত্র: বাংলাপিডিয়া]*

২৫ মার্চের কালরাতের গণহত্যা

দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক সংবাদসহ কয়েকটি সংবাদপত্র অফিস পুড়িয়ে দেওয়া হয়। নৃশংস এ গণহত্যার সংবাদ যেন বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে না পড়ে সে জন্য হানাদার বাহিনী ঢাকার শাহবাগে অবস্থিত হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ২৫ জন বিদেশি সাংবাদিককে আটকে রাখে। সেনারা রাত দেড়টায় আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানকে তার ধানমন্ডির বাসা থেকে গ্রেপ্তার করে। তাকে আটক করার পরও সাধারণ মানুষ পাকিস্তানি সেনাদের নির্মমতা থেকে রক্ষা পায়নি।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পূর্ব পাকিস্তানের নিরীহ ও নিরস্ত্র বেসামরিক মানুষের ওপর যে নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়, তা বিশ্বের স্মরণকালের ইতিহাসের অন্যতম নারকীয় ঘটনা। ২৫ মার্চ রাত থেকে টানা ৩৬ ঘণ্টা ধরে ঐ তাণ্ডবলীলা চালানো হয়। বীভৎস হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞে গোটা জাতি বিস্ময় ও আতঙ্কে বিমূঢ় হয়ে পড়ে। পরদিন ২৬ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তানে সব রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধের ঘোষণা করেন।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. পাকিস্তানি সেনারা কত তারিখে পূর্ব পাকিস্তানে হত্যাযজ্ঞ চালায়?
২. ২৫ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানে পরিচালিত পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর অভিযানের নাম কী ছিল?
৩. কারা অপারেশন সার্চলাইটের পরিকল্পনা প্রণয়ন করে?
৪. অপারেশন সার্চলাইটের সময় পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর কে ছিলেন?
৫. ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে শুধু ঢাকায় কত জন মানুষকে হত্যা করা হয়?
৬. ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ২৫ জন বিদেশি সাংবাদিককে কোথায় আটকে রাখা হয়?

উত্তরের জন্য ৪১৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ বাঙালির ওপর পাকিস্তানি সেনাদের গণহত্যা চালানোর পাঁচটি কারণ অনুসন্ধান করো।
২. ২৫ মার্চের অপারেশন সার্চলাইটের ওপর একটি স্লাইড তৈরি করে শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিতে উপস্থাপন করো।

পাঠ ৯ ও ১০

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা ও মহান মুক্তিযুদ্ধের সূচনা (Declaration of Bangladesh Independence and Beginning of the Great Liberation War)

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা (Declaration of Bangladesh Independence)

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অতর্কিতে হামলা চালায় নিরস্ত্র বাঙালির ওপর। 'অপারেশন সার্চলাইট' নামক এ সামরিক অভিযানে তারা নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালায় ইপিআর সদর দপ্তর, রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে। এ ঘটনার পরপরই অর্থাৎ ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন[১] এবং তা সারাদেশে প্রচারের নির্দেশ দেন।[২] এরপর হানাদার বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হন তিনি।

শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাক্ষরিত ঘোষণা বার্তাটি চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রচারের উদ্দেশ্যে তৎকালীন ইপিআর-এর ট্রান্সমিটার ব্যবহার করে প্রেরণ করা হয়। নিরাপত্তা ও কৌশলগত কারণে ঘোষণা বার্তাটি চট্টগ্রাম শহরের অদূরে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ অভিযানের অংশ হিসেবে বেতার কেন্দ্রটির নামকরণ 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র' করা হয়। এই কেন্দ্র থেকেই ২৬শে মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সহযোগী নেতৃবৃন্দ ও বেতার কেন্দ্রের শব্দসৈনিকদের পরামর্শে ২৭শে মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে পুনরায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন তিনি।[৩] এ ঘোষণার সংবাদ ক্রমান্বয়ে বিশ্ব গণমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে স্বতঃস্ফূর্ত মুক্তির সংগ্রাম।

স্বাধীনতা যুদ্ধকে আইনগত ভিত্তি দেওয়ার জন্য বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার ১০ এপ্রিল আইনের ধারাবাহিকতা বলবৎকরণ আদেশসমেত বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র বা সনদ জারি করে।

সপ্তম তফসিল[৪]

[১৫০ (২) অনুচ্ছেদ]

১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র (অনূদিত)

[যেহেতু একটি সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ১৯৭০ সনের ৭ই ডিসেম্বর হইতে ১৯৭১ সনের ১৭ই জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশে অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়,

এবং

যেহেতু এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ ১৬৯ জন প্রতিনিধির মধ্যে আওয়ামী লীগ দলীয় ১৬৭ জনকে নির্বাচিত করেন,

এবং

যেহেতু সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে জেনারেল ইয়াহিয়া খান জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণকে ১৯৭১ সনের ৩রা মার্চ তারিখে মিলিত হইবার জন্য আহ্বান করেন,

এবং

যেহেতু এই আহুত পরিষদ-সভা স্বেচ্ছাচারী ও বেআইনিভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়,

---

[১] হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র*, খণ্ড ৩, (প্রকাশকাল ১৯৮২-৮৩)।

[২] এম. আর. আখতার মুকুল সম্পাদিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র (এক খণ্ডে সংক্ষেপিত), প্রথম মুদ্রণ ১৯৮৮; প্রকাশক: তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

[৩] বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম ও দশম শ্রেণি; ২০২৫ সালের জন্য পরিমার্জিত সংস্করণ (অক্টোবর, ২০২৪); জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ।

[৪] সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ধারা বলে পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম তফসিলগুলি সংযোজিত।

এবং

যেহেতু পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ তাহাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার পরিবর্তে এবং বাংলাদেশের প্রতিনিধিগণের সহিত আলোচনা অব্যাহত থাকা অবস্থায় একটি অন্যায় ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করে,

এবং

যেহেতু এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ তারিখে ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন এবং বাংলাদেশের মর্যাদা ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহবান জানান,

এবং

যেহেতু একটি বর্বর ও নৃশংস যুদ্ধ পরিচালনায় পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ, অন্যান্যের মধ্যে বাংলাদেশের বেসামরিক ও নিরস্ত্র জনগণের ওপর নজিরবিহীন নির্যাতন ও গণহত্যার অসংখ্য অপরাধ সংঘটন করিয়াছে এবং এখনও অনবরত করিয়া চলিতেছে,

এবং

যেহেতু পাকিস্তান সরকার একটি অন্যায় যুদ্ধ চাপাইয়া দিয়া, গণহত্যা করিয়া এবং অন্যান্য দমনমূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতিনিধিগণের পক্ষে একত্রিত হইয়া একটি সংবিধান প্রণয়ন এবং নিজেদের মধ্যে একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে,

এবং

যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ তাহাদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিপ্লবী উদ্দীপনার মাধ্যমে বাংলাদেশের ভূখণ্ডের উপর তাহাদের কার্যকর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে,

সেহেতু আমরা বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতনিধিগণ, বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী জনগণ কর্তৃক আমাদিগকে প্রদত্ত কর্তৃত্বের মর্যাদা রক্ষার্থে, নিজেদের সমন্বয়ে যথাযথভাবে একটি গণপরিষদরূপে গঠন করিলাম, এবং

পারস্পরিক আলোচনা করিয়া, এবং

বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করণার্থে,

সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্ররূপে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করিলাম এবং এতদ্বারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ইতোপূর্বে ঘোষিত স্বাধীনতা দৃঢ়ভাবে সমর্থন ও অনুমোদন করিলাম, এবং

এতদ্বারা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, সংবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি থাকিবেন এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রজাতন্ত্রের উপ-রাষ্ট্রপতি থাকিবেন, এবং

রাষ্ট্রপতি প্রজাতন্ত্রের সকল সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হইবেন,

ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতাসহ প্রজাতন্ত্রের সকল নির্বাহী ও আইন প্রণয়ন ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন,

একজন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ এবং তাঁহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় অন্যান্য মন্ত্রী নিয়োগ ক্ষমতার অধিকারী হইবেন,

কর আরোপন ও অর্থ ব্যয়ন ক্ষমতার অধিকারী হইবেন,

গণপরিষদ আহ্বান ও মুলতবিকরণ ক্ষমতার অধিকারী হইবেন, এবং

বাংলাদেশের জনগণকে একটি নিয়মতান্ত্রিক ও ন্যায়ানুগ সরকার প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সকল কার্য করিতে পারিবেন।

আমরা বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, কোনো কারণে রাষ্ট্রপতি না থাকা বা রাষ্ট্রপতি তাঁহার কার্যভার গ্রহণ করিতে অসমর্থ হওয়া বা তাঁহার ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে অসমর্থ হওয়ার ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রপতির উপর এতদ্বারা অর্পিত সমুদয় ক্ষমতা, কর্তব্য ও দায়িত্ব উপ-রাষ্ট্রপতির থাকিবে এবং তিনি উহা প্রয়োগ ও পালন করিবেন।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, জাতিমণ্ডলীর সদস্য হিসেবে আমাদের উপর যে দায় ও দায়িত্ব বর্তাইবে উহা পালন ও বাস্তবায়ন করার এবং জাতিসংঘের সনদ মানিয়া চলার প্রতিশ্রুতি আমরা দিতেছি।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, স্বাধীনতার এই ঘোষণাপত্র ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, এই দলিল কার্যকর করার লক্ষ্যে এবং রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতির শপথ পরিচালনার জন্য আমরা অধ্যাপক ইউসুফ আলীকে আমাদের যথাযথ ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি নিয়োগ করিলাম।

অধ্যাপক ইউসুফ আলী
বাংলাদেশের গণপরিষদের ক্ষমতাবলে ও
তদধীনে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত
প্রতিনিধি।]

মহান মুক্তিযুদ্ধের সূচনা (The Beginning of the Great Liberation War)

স্বাধীনতা ঘোষণা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ ঘোষণার পরই মাতৃভূমিকে স্বাধীন করার বাসনা নিয়ে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করে বাঙালি জাতি। বাংলার কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র-শিক্ষক, রাজনৈতিক কর্মী, শিল্পী, বুদ্ধিজীবীসহ সব শ্রেণি-পেশার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রথম পর্যায়ে বাঙালির প্রতিরোধ ছিল অসংগঠিত। প্রাথমিকভাবে তাদের হাতে অস্ত্র বলতে ছিল লাঠিসোঁটা, লাইসেন্স করা নগণ্যসংখ্যক ব্যক্তিগত বন্দুক। সেনা, পুলিশ ও ইপিআর সূত্রে কিছু আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়া যায়। থানার অস্ত্রাগার লুট করেও অস্ত্র সংগ্রহ করা হয়। পরবর্তী সময়ে প্রতিবেশী ভারত সামরিক সহায়তা দেয়। তবে মুক্তিযুদ্ধের বড় একটি সময় অসীম সাহসী দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধারা সেকেলে থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল, স্টেনগান ও মেশিনগানের মতো সাধারণ অস্ত্র নিয়েই পাকিস্তানি বাহিনীর জঙ্গি বিমান, ট্যাংক, কামান ও অন্যান্য ভারি আধুনিক অস্ত্রের মোকাবিলা করেছিল। প্রতিরোধ যুদ্ধের সূচনা হয়েছিল ঢাকায়। তবে ক্রমান্বয়ে তা চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, যশোর, খুলনা ও কুষ্টিয়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। আর এভাবেই ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে শুরু হয় আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ। দীর্ঘ নয় মাস বীরবিক্রমে যুদ্ধ করার পর ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে অর্জিত হয় আমাদের মহান বিজয়। বিশ্বমানচিত্রে আত্মপ্রকাশ ঘটে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে কারা বাঙালির ওপর অতর্কিতে হামলা চালায়?
২. কখন বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়?
৩. কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থ্রেকে কোন সামরিক নেতা স্বকণ্ঠে স্বাধীনতার ঘোষণা করেন? *[সকল বোর্ড ২০২৫]*
৪. 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' কোথায় অবস্থিত? *[সকল বোর্ড ২০২১; ২০১৯]*
৫. বাঙালির মহান মুক্তিযুদ্ধ কখন শুরু হয়?
৬. কত মাস বীরবিক্রমে যুদ্ধ করার পর বাঙালি বিজয় অর্জন করে?

উত্তরের জন্য ৪১৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার যৌক্তিকতা সম্পর্কে তোমার মতামত উপস্থাপন করো।

পাঠ ১১

মুজিবনগর সরকার (অস্থায়ী সরকার)
Mujibnagar Government (The Provisional Government)

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন প্রবাসে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী তথা প্রথম সরকার গঠন করা হয়। ইতিহাসে এ অস্থায়ী সরকার 'প্রবাসী' বা 'মুজিবনগর সরকার' নামেও পরিচিত। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে মুজিবনগর সরকার গঠন ছিল একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এ সরকারই মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় নেতৃত্ব দিয়েছিল।

মুজিবনগর সরকার গঠন (Formation of the Mujibnagar Government)

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণ ও নির্বিচার গণহত্যার সময় ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এবং ১৯৭০-৭১ সালে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা একত্রিত হয়ে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল বর্তমান মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলা গ্রামে স্বাধীন বাংলাদেশের একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করেন। দেশ-বিদেশে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সপক্ষে জনমত তৈরি করা, মুক্তাঞ্চলে বেসামরিক প্রশাসন পরিচালনা করা এবং সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে দেশকে দ্রুত পাকিস্তানি হানাদারদের কবলমুক্ত করার লক্ষ্যে এ সরকার গঠন করা হয়। ঐ দিনই অস্থায়ী সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অনুমোদন করে। ১৩ এপ্রিল আগরতলায় অনুষ্ঠিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের এক সভায় স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠন অনুমোদন করা হয় এবং মন্ত্রিসভার সদস্যদের নাম ও তাদের দপ্তর ঘোষণা করা হয়।

অস্থায়ী সরকারের সদস্য ও তাদের দপ্তর
Members and the Departments of the Provisional Government

নং	নাম	দপ্তর
১.	শেখ মুজিবুর রহমান (পাকিস্তান সামরিক শাসকদের হাতে বন্দি)	রাষ্ট্রপতি
২.	সৈয়দ নজরুল ইসলাম	উপ-রাষ্ট্রপতি (রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অনুযায়ী সশস্ত্র বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব গ্রহণ)
৩.	তাজউদ্দীন আহমদ	প্রধানমন্ত্রী
৪.	খন্দকার মোশতাক আহমেদ	পররাষ্ট্র, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী
৫.	ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী	অর্থমন্ত্রী
৬.	এ. এইচ. এম. কামারুজ্জামান	স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, কৃষি মন্ত্রী
৭.	কর্নেল (অব.) এম. এ. জি ওসমানী	প্রধান সেনাপতি
৮.	লে. কর্নেল (অব.) আবদুর রব	চিফ অফ স্টাফ
৯.	গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকার	ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ এবং বিমানবাহিনীর প্রধান

সূত্র: *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, তৃতীয় খণ্ড। পৃষ্ঠা ১৬-১৭; বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম ও দশম শ্রেণি, পাঠ্যপুস্তক ২০২৫, পৃষ্ঠা ১৭২।*

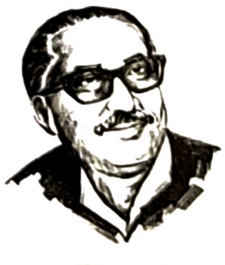
শেখ মুজিবুর রহমান

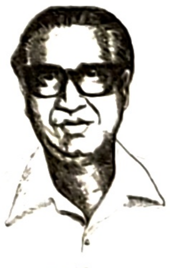
তাজউদ্দীন আহমদ

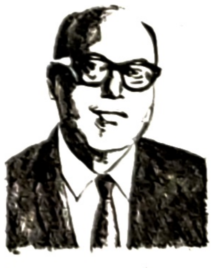
সৈয়দ নজরুল ইসলাম

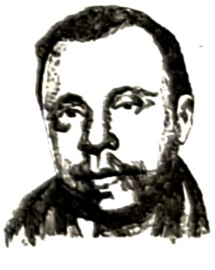
আবুল হাসনাত
মোহাম্মদ কামারুজ্জামান

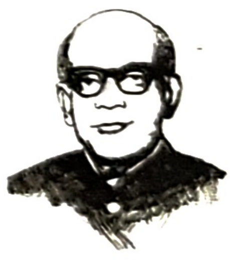
ক্যাপ্টেন
এম. মনসুর আলী

অস্থায়ী সরকারের শপথ অনুষ্ঠান: ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার শপথ গ্রহণ করে। তদানীন্তন কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার (বর্তমানে জেলা) বৈদ্যনাথতলা (বর্তমানে মুজিবনগর) গ্রামের এক আম্রকাননে শতাধিক দেশি-বিদেশি সাংবাদিক, কয়েকজন জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য, কিছুসংখ্যক মুক্তিসেনা এবং হাজার

পাঁচেক সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। শপথবাক্য পাঠ করান জাতীয় পরিষদের আওয়ামী লীগ দলীয় চিফ হুইপ অধ্যাপক ইউসুফ আলী। অনুষ্ঠানে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রও পাঠ করেন। মুজিবনগর সরকারের সদস্যদের শপথ গ্রহণের দুটি বাক্য হচ্ছে— ১. "বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য বিবেচনা করে আমরা বাংলাদেশকে সার্বভৌম গণপ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি এবং এতদ্বারা পূর্বাহ্নে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা অনুমোদন করছি।" ২. "বাংলাদেশের মানুষের শৃঙ্খলাপূর্ণ ও ন্যায়মূলক সরকার প্রদানের জন্য যা যা করা দরকার করবেন।" এ আদেশ বলে বাংলাদেশের ওপর অস্থায়ী সরকারের আইনগত কর্তৃত্ব স্থাপিত হয় এবং মুজিবনগর সরকার গঠনের প্রথম পর্যায় শেষ হয়। মুজিবনগর সরকার গঠনের মাত্র দুই ঘন্টা পর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বোমাবর্ষণ করে মেহেরপুর দখল করে নেয়। অস্থায়ী সরকারের সদর দপ্তর স্থাপন করা হয় কলকাতার ৮ নম্বর থিয়েটার রোডে। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান শেষে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ বিশ্বের সব দেশের প্রতি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান ও মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতার আহ্বান জানান।

উপদেষ্টা পরিষদ গঠন: প্রবাসী সরকারের নীতি নির্ধারণ ও কার্যক্রম পরিচালনায় প্রয়োজনীয় পরামর্শ দানের জন্য ৬ সদস্যের উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। এ পরিষদের সদস্য ছিলেন ন্যাপ নেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, মোজাফ্ফর আহমদ, কমিউনিস্ট পার্টির মণি সিং, কংগ্রেস নেতা শ্রী মনোরঞ্জন ধর, তাজউদ্দীন আহমদ এবং খন্দকার মোশতাক আহমদ।

পরিকল্পনা কমিশন: ড. মুজাফফর আহমদ চৌধুরীকে চেয়ারম্যান করে এবং ড. খান সারওয়ার মুরশিদ, ড. মোশাররফ হোসেন, ড. এস. আর. বোস ও ড. আনিসুজ্জামানকে সদস্য করে একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা কমিশন গঠন করা হয়। স্বাধীন বাংলাদেশের পুনর্গঠনের জন্য দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং দেশের তাৎক্ষণিক পুনর্গঠনের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে সরকার ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে বিশেষ পরামর্শ প্রদান ছিল এ কমিশনের কাজ।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. অস্থায়ী সরকার কখন গঠন করা হয়? */সকল বোর্ড ২০২২/*

২. অস্থায়ী সরকার কোন তারিখে শপথ নেয়? */সকল বোর্ড ২০২৫; চবি ২০১১-১২; ইবি ২০০৯-১০/*

৩. মুজিবনগর সরকারের সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করান কে? */ঢাবি ২০১৫-১৬/*

৪. মুজিবনগরের অবস্থান কোথায়? */রাবি ২০১১-১২; চবি ২০১১-১২/*

৫. অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?

৬. ১৯৭১ সালে অস্থায়ী সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের দায়িত্বে কে ছিলেন? */রাবি ২০০৯-১০/*

উত্তরের জন্য ৪১৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

মুজিবনগর সরকারের সদস্য ও তাদের দপ্তরের একটি তালিকা তৈরি করো।

গ. বাড়ির কাজ

১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল Sudan People's Liberation Movement (SPLM) দক্ষিণ সুদানের স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব নেন। দলের নেতারা স্বাধীনতা অর্জনের সুদৃঢ় শপথ গ্রহণ করেন। SPLM সুষ্ঠুভাবে যুদ্ধ পরচালনার জন্য ১২টি কমিটি গঠন করে। প্রত্যেকটি কমিটিকে যুদ্ধের দায়িত্ব বণ্টন করা হয়। এছাড়াও দলটি বহির্বিশ্বে স্বাধীনতার পক্ষে সমর্থন আদায় করার জন্য ব্যাপক তৎপরতা চালায়। যার ফলশ্রুতিতেই ৯ জুলাই ২০১১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন দক্ষিণ সুদান।

১. উদ্দীপকের সাথে তোমার পঠিত কোন বিষয়ের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা করো।

২. উদ্দীপকে বর্ণিত তৎপরতার মতো কূটনৈতিক তৎপরতাই স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটায়— মতামত দাও।

পাঠ ১২ ও ১৩

মুজিবনগর বা অস্থায়ী সরকারের কার্যক্রম
Activities of Mujibnagar or Provisional Government

মুজিবনগর সরকার মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ প্রশাসন পরিচালনার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ গঠন করে। এছাড়া এ সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন আদায় ও জনমত সংগঠনের উদ্দেশ্যে বহির্বিশ্বে সফল কূটনৈতিক তৎপরতা চালায়। পাশাপাশি সফলভাবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে।

অভ্যন্তরীণ প্রশাসন (Internal Administration)

মুজিবনগর বা অস্থায়ী সরকারের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনে মোট ১২টি মন্ত্রণালয় বা বিভাগ ছিল। এগুলো হচ্ছে: (১) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, (২) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, (৩) অর্থ, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, (৪) মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয়, (৫) সাধারণ প্রশাসন ও সংস্থাপন বিভাগ, (৬) আঞ্চলিক প্রশাসন, (৭) স্বাস্থ্য ও কল্যাণ বিভাগ, (৮) তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়, (৯) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, (১০) সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, (১১) ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ এবং (১২) কৃষি বিভাগ। এসব মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মাধ্যমে অস্থায়ী সরকার মুক্তিযুদ্ধকে সফলতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াসহ জনস্বার্থ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় দেখাশোনা করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়।

মুজিবনগর সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতা (Diplomatic Activities of Mujibnagar Government)

মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিবনগর সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতা ছিল এক বিরাট অধ্যায়। বস্তুত এটি ছিল এক বিশাল কূটনৈতিক যুদ্ধ। বিশ্বের দুই পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের অবস্থানের বিপরীতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বিশ্বজনমতকে সংগঠিত করা সহজ ব্যাপার ছিল না। মুজিবনগর সরকার অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এ কঠিন ও বিশাল কাজটি সম্পাদন করেছিল। এ সরকার বিদেশে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশি মিশনগুলোর কূটনীতিকদের উপযুক্ত নির্দেশনা দিয়ে এবং প্রবাসী বাঙালিদের মাধ্যমে বিভিন্ন তৎপরতা চালিয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পাকিস্তানি মিথ্যা প্রচারণার উপযুক্ত জবাব দেওয়ার চেষ্টা করে। মুজিবনগর সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দুইটি— ক. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন আদায় করা এবং খ. মুক্তিযুদ্ধের জন্য তহবিল সংগ্রহ করা।

১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মেহেরপুর জেলার (তখন কুষ্টিয়া জেলা) বৈদ্যনাথতলায় মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করার পরদিন কলকাতার পাকিস্তানি মিশনের সব বাঙালি কর্মকর্তা বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। কূটনীতিক উপ হাইকমিশনার এম হোসেন আলীর নেতৃত্বে হাইকমিশন অফিস দখল করে সেখানেই মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম শুরু করা হয়। এক পর্যায়ে বাংলাদেশ সরকার তার পররাষ্ট্রনীতি ঘোষণা করে। এ নীতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল—

ক. সবার সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে শত্রুতা নয়।
খ. সব রকম শোষণ ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে অবস্থান।
গ. জোটনিরপেক্ষ, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি।

অতি দ্রুত বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দেশে বাংলাদেশ মিশন স্থাপন করা হয়। কলকাতা, নয়া দিল্লি, লন্ডন, স্টকহোম, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, হংকং, ম্যানিলা, কাঠমান্ডু, বার্ন, টোকিও ইত্যাদি শহরে প্রতিষ্ঠিত হয় কূটনৈতিক মিশনগুলো।

মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন আদায় (Mobilising Support to the Liberation War)

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি আন্তর্জাতিক মহলের সমর্থন আদায় প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে মুজিবনগর সরকার বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে বহির্বিশ্বে বিশেষ দূত হিসেবে নিয়োগ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ১৯৭১ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্য সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় গিয়েছিলেন। ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এ

কারণে আবু সাঈদ চৌধুরী বাংলাদেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত বিদেশে থেকেই এ দেশের পক্ষে নানামুখী তৎপরতা চালান। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সমর্থন আদায়ের জন্য তিনি জেনেভা, লন্ডন, নিউইয়র্ক শহরে ঘুরতে থাকেন। ১৮ এপ্রিল বিচারপতি সাঈদ বিদেশে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে ছাত্র-শিক্ষক ও পেশাজীবীদের নিহত হওয়ার বিবরণ দেন। তার তৎপরতার পরিপ্রেক্ষিতেই ১৪ মে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সর্বসম্মতভাবে এই মর্মে প্রস্তাব পাস হয় যে, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যুক্তরাজ্যের প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রত্যাহার করতে বাধ্য করা উচিত। আবু সাঈদ চৌধুরী স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান এবং পাকিস্তানি সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বিশ্বজনমতের সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে লন্ডনের ট্রাফালগার স্কোয়ারে ১ আগস্ট এক জনসভার আয়োজন করেন। যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে ২০ হাজারেরও বেশি বাঙালি এতে যোগ দিয়েছিলেন। এ জনসভায় বিচারপতি আবু সাঈদ মুজিবনগর সরকারের তিনটি নির্দেশের কথা ঘোষণা করেন—

ক. শীঘ্রই লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশন স্থাপন করা হবে।

খ. বাঙালিরা পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইনসের বিমানে ভ্রমণ করবে না।

গ. পাকিস্তান কিংবা বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশের নাগরিকরা মুজিবনগর সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করলে তারা স্ব স্ব পদে বহাল থাকবেন।

বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর এ ঘোষণার পরপরই যুক্তরাজ্যের পাকিস্তান হাইকমিশনে কর্মরত দ্বিতীয় সেক্রেটারি মহিউদ্দিন আহমদ পাকিস্তান সরকারের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। এরপর একে একে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিকরা পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে মুজিবনগর সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবুর রহমানের গোপন বিচার শুরু করলে ১১ আগস্ট লন্ডনের হাইড পার্কে এ বিচারের প্রতিবাদে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে মে মাসের প্রথম দিকে অধ্যাপক রেহমান সোবহানকে মুজিবনগর সরকার যুক্তরাষ্ট্রে পাঠায়। তিনিই ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়া বাংলাদেশ সরকারের প্রথম প্রতিনিধি। রেহমান সোবহান যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেন। সেপ্টেম্বরে তাকে দ্বিতীয় দফায় যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হয়। রেহমান সোবহান এসময় বিশ্বব্যাংকের বার্ষিক সভায় বাংলাদেশকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার অনুরোধ করেন। এ পর্যায়ে তিনি নভেম্বর পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করে মার্কিন কংগ্রেসে বাংলাদেশের পক্ষে তদবির করেন। তিনি প্রবাসী বাঙালি ও মার্কিন শুভানুধ্যায়ীদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং নিউইয়র্কে জাতিসংঘের বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলে যোগ দেন। নিউইয়র্কে এইড কনসোর্টিয়ামের সদস্য দেশগুলোর প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাৎ করে পাকিস্তানকে কোনো বৈদেশিক সাহায্য না দেওয়ার জন্য জোরালো আবেদন জানান রেহমান সোবহান। তিনি বলেন, ওই সাহায্যের অর্থ বাংলাদেশে বাঙালি নিধনকাজে ব্যবহৃত হবে। তার তৎপরতার ফলেই বিশ্বব্যাংকের একটি প্রতিনিধি দল ১৯৭১ সালের জুন মাসে যুদ্ধপীড়িত বাংলাদেশ সফর করে। ঐ প্রতিনিধি দলের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ২ অক্টোবর ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত দাতাগোষ্ঠীর সভায় পাকিস্তানকে সাহায্য দেওয়া স্থগিত করা হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র সরকার পাকিস্তানকে সমর্থন করে এলেও প্রতিশ্রুত সাহায্য দেওয়া এ সময় স্থগিত করে।

মুজিবনগর সরকার ২৪ মে যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিতীয় প্রতিনিধি হিসেবে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে নিউইয়র্কে পাঠায়। জনাব চৌধুরী সেখানে স্বল্প সময়ের মধ্যেই নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, সৌদি আরব, সিরিয়া, মিসর, জর্ডান, ইরাক, আলজেরিয়া প্রভৃতি দেশের রাষ্ট্রদূতদের সাথে সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশকে সমর্থন দেওয়ার আবেদন জানান। তাছাড়া তিনি জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক প্রেসক্লাবের প্রেসিডেন্ট ড. যোগেন্দ্র কুমার ব্যানার্জির সাথেও সাক্ষাৎ করেন। মুজিবনগর সরকারের এমন তৎপরতায় আন্তর্জাতিক মহল পাকিস্তানের প্রচারণা যে মিথ্যা তা অনুধাবন করে এবং ক্রমেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। পাকিস্তান সরকার জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের দুই স্থায়ী সদস্য যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের সহায়তায় মুক্তিযুদ্ধকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার হিসেবে দেখিয়ে তাদের গণহত্যাসহ সামরিক কর্মকাণ্ডকে বৈধতা দিতে চেয়েছিল। তবে মুজিবনগর সরকারের ব্যাপক কূটনৈতিক তৎপরতার ফলে তাদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। বিশ্বজনমত ক্রমেই বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি বর্বরতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে।

তহবিল সংগ্রহ (Fund Raising)

বিশাল সরকারি প্রশাসন, যুদ্ধ ও শরণার্থী শিবির পরিচালনা এবং বিশ্বজনমত গঠনে প্রচারণার জন্য মুজিবনগর সরকারের বিপুল অর্থের প্রয়োজন ছিল। এজন্য এ সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল তহবিল সংগ্রহ করা। এ লক্ষে মুজিবনগর সরকার বিভিন্ন উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহে সচেষ্ট হয়। এ সরকারের প্রতিনিধিরা ১৯৭১ সালের ৮ মে যুক্তরাজ্যপ্রবাসী বাঙালির গঠিত বিভিন্ন অ্যাকশন কমিটির নেতাদের সাথে জরুরি বৈঠকের আয়োজন করেন। সে বৈঠকে 'বাংলাদেশ ফান্ড' নামে একটি তহবিল গঠন করা হয়। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী এ ফান্ডের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য হন। 'বাংলাদেশ ফান্ড' এর মাধ্যমে ৩,৭৬,৫৬৮ পাউন্ড সংগ্রহ করে মুজিবনগর সরকারকে দেওয়া হয়। এছাড়া মুজিবনগর সরকার বিভিন্ন দেশ থেকে নিম্নলিখিত অঙ্কের অর্থসাহায্য গ্রহণ করেছিল—

জাতিসংঘের মাধ্যমে-

যুক্তরাষ্ট্র	- ৮,৯১,৫৭,০০০ ডলার
যুক্তরাজ্য	- ৩,৮১,১২,১৩২ ডলার
কানাডা	- ২,০২,৬০,৩০৭ ডলার
সোভিয়েত ইউনিয়ন	- ২,০০,০০,০০০ ডলার

বিদেশ থেকে অন্য কিছু সহযোগিতা-

বাহরাইনের বাংলাদেশ ক্লাব থেকে	- ১৪৯৭ পাউন্ড
কাতারের বাংলাদেশ শিক্ষাকেন্দ্র থেকে	- ৩১০০ পাউন্ড
লিবিয়ার বাংলাদেশ শিক্ষাকেন্দ্র থেকে	- ২৩৮২ পাউন্ড

বহির্বিশ্বে মুজিবনগর সরকারের তৎপরতার ফলে বিশ্ববাসী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, পাকবাহিনীর নির্যাতন ও গণহত্যা সম্পর্কে জানতে পেরেছিল। মুক্তিযুদ্ধ ও বাঙালির প্রতি বিশ্ববাসীর যে সহানুভূতি সৃষ্টি হয়েছিল তা ছিল বহির্বিশ্বে মুজিবনগর সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতারই ফল। বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের মিশন স্থাপন, প্রতিনিধি প্রেরণ করে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন আদায়, তহবিল সংগ্রহ করে মুজিবনগর সরকার মুক্তিযুদ্ধকে সফল করে তুলেছিল।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়। মুজিবনগর সরকার আগেই ভুটান ও ভারতের স্বীকৃতি আদায় করতে সক্ষম হয়েছিল। এটিও এ সরকারের একটি বড় কূটনৈতিক সাফল্য। সর্বোপরি বাঙালির মুক্তিসংগ্রাম ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সৃষ্টি বিশ্বব্যাপী যে আলোড়ন ও আবেদন সৃষ্টি করেছিল তা ছিল বহির্বিশ্বে মুজিবনগর সরকারের তৎপরতারই ফল।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মুজিবনগর বা অস্থায়ী সরকারের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনে কতটি মন্ত্রণালয় ছিল? *[সি. বো., ব. বো. ২০২১]*
২. মুজিবনগর সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কয়টি?
৩. মুজিবনগর সরকার কাকে বহির্বিশ্বে বিশেষ দূত হিসেবে নিয়োগ করে?
৪. কোথায় বাংলাদেশের প্রথম হাই কমিশন স্থাপন করা হয়?
৫. যুক্তরাষ্ট্রে নিয়োজিত বাংলাদেশ সরকারের প্রথম প্রতিনিধি কে ছিলেন?
৬. ১৯৭১ সালের ৮ মে যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালির গঠিত 'বাংলাদেশ ফান্ড'-এর ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য হন কে?

উত্তরের জন্য ৪১৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ জাতিসংঘের মাধ্যমে যেসব দেশের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পেয়েছিল সেসব দেশের একটি তালিকা তৈরি করো।
২. মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন আদায়ে মুজিবনগর সরকার যেসব কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়েছে তার একটি চার্ট তৈরি করো।

পাঠ ১৪

মুক্তিবাহিনী গঠন
Formation of the Liberation Force

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ ছিলো বাঙালি জাতির স্বাধিকার অর্জনের চূড়ান্ত সংগ্রাম। ২৫ মার্চ কালরাতে পাক হানাদার বাহিনী 'অপারেশন সার্চলাইট' নামক হত্যাযজ্ঞ শুরু করলে বাঙালির মুক্তির আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর হয়ে ওঠে। পাক বাহিনীর দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে বাঙালিরা সাহসিকতার সাথে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে কোনো পূর্ব প্রস্তুতি, কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ বা সাংগঠনিক রূপ না থাকায় শুরুর দিকের প্রতিরোধ যুদ্ধ ছিল অপরিকল্পিত ও বিচ্ছিন্ন। এ অবস্থায় এপ্রিল মাসে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার (মুজিবনগর সরকার) দায়িত্ব গ্রহণ করেই মুক্তিযুদ্ধকে সঠিকভাবে পরিচালনা ও সফল করে তোলার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ১০ এপ্রিল সারাদেশকে ৪টি সামরিক জোনে ভাগ করে ৪ জন সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়। ১১ এপ্রিল তা পুনর্গঠিত করে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়।

১৯৭১ সালের মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল

মুক্তিবাহিনী গঠন (Formation of the Liberation Force)

বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার কর্নেল (পরে জেনারেল) আতাউল গণি ওসমানীকে সেনাপ্রধান নিযুক্ত করে মুক্তিবাহিনী গঠন করে। এ মুক্তিবাহিনী দুই ভাগে বিভক্ত ছিল যথা— ক. নিয়মিত বাহিনী ও খ. অনিয়মিত বাহিনী।

নিয়মিত বাহিনী: পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সেনাসদস্য এবং তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (ই.পি.আর), পুলিশ ও আনসার বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে গঠন করা হয়েছিল নিয়মিত বাহিনী। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশ সরকার নিয়মিত বাহিনী হিসেবে সেনা, বিমান ও নৌবাহিনী গড়ে তোলে। এছাড়া সেক্টর ট্রুপস গড়ে তোলা হয়। সেক্টর ট্রুপসের সংখ্যা ছিল প্রায় ১০,০০০ জন। নিয়মিত বাহিনীর সদস্যদের সেক্টর ট্রুপস-এ নেওয়া হয়। নিয়মিত বাহিনীর সদস্য ছিল প্রায় ১৮,৬০০ জন।

অনিয়মিত বাহিনী: প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্র, যুবক, কৃষক-শ্রমিক ও বিভিন্ন পেশাজীবীসহ সাধারণ মানুষকে নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের অনিয়মিত বাহিনী। এ বাহিনীর সরকারি নাম দেওয়া হয়েছিল গণবাহিনী বা এফএফ (ফ্রিডম ফাইটার্স বা মুক্তিযোদ্ধা)। এ বাহিনীর সদস্যদের দুই সপ্তাহের প্রশিক্ষণ দেওয়ার পর একজন কমান্ডারের অধীনে বিভিন্ন এলাকায় যুদ্ধের জন্য পাঠানো হতো। অকুতোভয় এই মুক্তিযোদ্ধারা প্রধানত গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করতো। ছোট ছোট দলে অতর্কিতে শত্রুপক্ষের ওপর হামলা করে সরে পড়াই গেরিলা যুদ্ধ। খালবিল, নদ-নদী ও বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ তৎকালীন বাংলাদেশে গেরিলা যুদ্ধ কার্যকর হয়েছিল।

আঞ্চলিক বাহিনী: মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশের বিভিন্ন স্থানে আঞ্চলিক কয়েকটি মুক্তিযোদ্ধা বাহিনী গড়ে উঠেছিল। এসব বাহিনীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বাধীন 'কাদেরিয়া বাহিনী' (টাঙ্গাইল), 'আফসার বাহিনী' (ভালুকা-ময়মনসিংহ), 'হেমায়েত বাহিনী' (গোপালগঞ্জ-বরিশাল), 'হালিম বাহিনী' (মানিকগঞ্জ), 'আকবর বাহিনী' (মাগুরা) ও 'জিয়া বাহিনী' (সুন্দরবন)। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে এসব আঞ্চলিক বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মুজিব বাহিনী: মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী 'বেঙ্গল লিবারেশন ফোর্স' (Bengal Liberation Force অর্থাৎ B.L.F.) 'মুজিব বাহিনী' নামে পরিচিত ছিল। এটি ছিল রাজনৈতিক আদর্শভিত্তিক একটি সংগঠন। আওয়ামী লীগ ও এর ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের কর্মীদের নিয়ে এই বাহিনী গঠিত হয়। ছাত্রনেতা শেখ ফজলুল হক মণি এবং সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বে ছাত্রলীগের নেতাকর্মী ও শিক্ষিত যুবকদের নিয়ে এ বাহিনী গঠন করা হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধকে সংগঠিত ও শক্তিশালী করা এবং যুদ্ধের নেতৃত্ব যাতে কোনো উগ্রপন্থি বা চরমপন্থি দলের হাতে চলে না যায় তা খেয়াল রাখাও মুজিব বাহিনীর কাজ ছিল।

ক্র্যাক প্লাটুন: ক্র্যাক প্লাটুন ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন একটি বিশেষ গেরিলা দল, যারা ১৯৭১ সালে ঢাকা শহরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের দোসরদের বিরুদ্ধে সুনিপুণভাবে গেরিলা আক্রমণ পরিচালনা করে। খালেদ মোশাররফ এবং এটিএম হায়দারের নেতৃত্বে গঠিত এই দলটি ২ নম্বর সেক্টরের আওতায় গণবাহিনীর অংশ হিসেবে কাজ করে। এটি ভারতের মেলাঘর ক্যাম্পে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্যদের নিয়ে গঠিত হয়। তারা 'হিট এন্ড রান' পদ্ধতিতে গেরিলা আক্রমণ পরিচালনা করত। তাদের পরিচালিত উল্লেখযোগ্য অপারেশনগুলোর মধ্যে ছিল অপারেশন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল, অপারেশন ফার্মগেট চেক-পয়েন্ট ইত্যাদি। এই গেরিলা ইউনিটের অধীনে শহীদ জুয়েল, আজম খান (পপ সম্রাট), শাফী ইমাম রুমি, সাদেক হোসেন খোকাসহ আরও অনেক তরুণ যোদ্ধা ঝুঁকিপূর্ণ ও দুঃসাহসিক গেরিলা অভিযান পরিচালনা করে যুদ্ধকে ত্বরান্বিত করেন।

ব্রিগেড ফোর্স: মুক্তিবাহিনীর নিয়মিত সেনাবাহিনীকে তিনটি ব্রিগেড ফোর্সে ভাগ করা হয়। অধিনায়ক মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর কে এম সফিউল্লাহ এবং মেজর খালেদ মোশাররফের নামের আদ্যক্ষর দিয়ে তিনটি ব্রিগেড ফোর্সের নামকরণ করা হয় যথাক্রমে 'জেড ফোর্স', 'এস ফোর্স' এবং 'কে ফোর্স'। নিচে ফোর্সগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো—

জেড ফোর্স: মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের প্রথম ব্রিগেড 'জেড ফোর্স' গঠিত হয় একাত্তরের ৭ই জুলাই। স্বাধীনতা যুদ্ধে 'জেড ফোর্স' বিশেষ অবদান রেখেছে। এই ফোর্সে তিনটি নিয়মিত পদাতিক বাহিনী ছিল— প্রথম ইস্টবেঙ্গল, তৃতীয় ইস্টবেঙ্গল এবং অষ্টম ইস্টবেঙ্গল ব্যাটালিয়ন। স্বাধীনতার প্রেরণায় উজ্জীবিত দেশপ্রেমী মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত করতে অসামান্য ভূমিকা রাখে জেড ফোর্স। ৭ জুলাই থেকে ২৮ জুলাই পর্যন্ত পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে সরাসরি প্রতিরোধ যুদ্ধকে জোরদার করতে প্রায় সারাদিন মেজর জিয়াউর রহমান রণকৌশল শিক্ষা দেন। শুরুতে মেজর জিয়াউর রহমানকে ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলার অপারেশনাল দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি তার বাহিনী দিয়ে প্রথমত তিনটি বড় অপারেশনের দায়িত্ব নেন। এগুলো হচ্ছে কামালপুরের যুদ্ধ, বাহাদুরাবাদ যুদ্ধ ও নকশী বিওপির যুদ্ধ। এ সকল যুদ্ধে জেডফোর্স সাহস ও বীরত্বের স্বাক্ষর রাখে। এছাড়াও রৌমারি মুক্তাঞ্চল (রৌমারি, ফুলছড়ি-সাঘাটা, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা, চিলমারি, কুড়িগ্রাম, নাগেশ্বর, ভুরুঙ্গামারি থানার অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত) পাকিস্তানি বাহিনীর হাত থেকে নিরাপদ রাখা ও সেখানে সৈন্যদের গেরিলা প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং বেসামরিক প্রশাসন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে জেড ফোর্স ও মেজর জিয়াউর রহমানের অসামান্য অবদান ছিল। এই মুক্তাঞ্চল থেকে প্রায় ১৮০০০ গেরিলা যোদ্ধা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। মেজর ওসমানীর নির্দেশে অক্টোবরে জেড ফোর্স চলে যায় সিলেটে। এর তিনটি ব্যাটালিয়ন শ্রীমঙ্গল, ছাতক ও কুলাউড়ায় অবস্থান নিয়ে পাক বাহিনীর বিভিন্ন স্থাপনা ও ক্যাম্পে আক্রমণ চালায়। গোয়াইনঘাট, টেংরাটিলা, গোবিন্দগঞ্জ, সালুটিকর বিমানবন্দর, ধলাই চা বাগান, ধামাই চা বাগান, জকিগঞ্জ, আলি ময়দান, এমসি কলেজ, ভানুগাছ, কানাইয়ের ঘাট, বয়মপুর, ফুলতলা চা বাগান, বড়লেখা, লাতু, সাগরনাল চা বাগান ইত্যাদি স্থানে পাক সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধে নজিরবিহীন সাফল্য অর্জন করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে জেড ফোর্স। ১০ ডিসেম্বর জেড ফোর্স সিলেট আক্রমণ শুরু করে এবং ১৪ তারিখ সিলেটে প্রবেশ করে। ১৫ ডিসেম্বর পাক বাহিনীর ১২৫ জন অফিসার ও ৭০০ জন সৈন্য জেড ফোর্সের অধিনায়ক জিয়াউর রহমানের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

এস ফোর্স: মুক্তিবাহিনীর সদরদপ্তর থেকে এস ফোর্স গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয় সেপ্টেম্বর মাসে। কিন্তু নানাবিধ প্রতিকূলতার কারণে ফোর্স গঠন করা হয় অক্টোবর মাসে। মেজর কে এম সফিউল্লাহকে এই ফোর্সের অধিনায়ক নিযুক্ত করা হয় এবং তার নামের আদ্য অক্ষর দিয়ে ব্রিগেডটির নামকরণ করা হয় এস ফোর্স। নিয়মিত বাহিনীর দুটি ব্যাটালিয়নের সমন্বয়ে এই ব্রিগেডটি গঠিত হয়। এগুলো হলো ২য় ইস্টবেঙ্গল ও ১১তম ইস্টবেঙ্গল। আখাউড়া যুদ্ধ, মুকুন্দ যুদ্ধ, হরশপুর ও আজমপুর রেলওয়ে স্টেশন নিয়ন্ত্রণসহ পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযানে এই ফোর্স সাফল্য অর্জন করে।

কে ফোর্স: ৭ অক্টোবর ২ নম্বর সেক্টরাধীন নিয়মিত বাহিনীর তিনটি ব্যাটালিয়নের সমন্বয়ে মেজর খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে কে ফোর্স গঠন করা হয়। মেজর খালেদের নামের আদ্যক্ষর দিয়েই ব্রিগেডটির নামকরণ করা হয় 'কে ফোর্স'। ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের চতুর্থ, নবম ও দশম ব্যাটালিয়নের সমন্বয়ে এই ব্রিগেড ফোর্সটি গঠিত হয়। কসবা ও শালদা নদী শত্রুমুক্তকরণ, চিথলিয়া ও বেলুনিয়ার যুদ্ধে এবং ফেনীকে শত্রুমুক্ত করতে এই ফোর্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(সূত্র: ১. *"এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম ১৯৪৭-১৯৭১।"* লেখক: লে. কর্নেল (অব.) আবু ওসমান চৌধুরী।
২. *"মুক্তিযুদ্ধে ২ নম্বর সেক্টর এবং কে ফোর্স।"* লেখক: খালেদ মোশাররফ।)

মুক্তিযুদ্ধের সেক্টরসমূহ ও সেক্টর প্রধানদের নাম

সেক্টর	সেক্টর এলাকা	সেক্টর কমান্ডার
১.	চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ফেনী নদী পর্যন্ত এলাকা।	মেজর জিয়াউর রহমান (এপ্রিল-জুন) মেজর মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম (জুন-ডিসেম্বর)
২.	নোয়াখালী, আখাউড়া-ভৈরব রেল লাইন, কুমিল্লা, সিলেটের অংশবিশেষ, ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার অংশবিশেষ।	মেজর খালেদ মোশাররফ (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর) মেজর এ টি এম হায়দার (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর)
৩.	আখাউড়া, ভৈরব রেললাইন থেকে পূর্ব দিকে কুমিল্লা জেলা, সিলেটের অংশবিশেষ, ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ মহকুমা* ও ঢাকা জেলার অংশবিশেষ।	মেজর কে এম সফিউল্লাহ (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর) মেজর নুরুজ্জামান (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর)
৪.	সিলেট জেলার পূর্বাঞ্চল, পূর্ব ও উত্তর দিকে সিলেট ডাউকি রোড পর্যন্ত।	মেজর সি. আর. দত্ত, পরে ক্যাপ্টেন এ রব
৫.	সিলেট জেলার পশ্চিমাঞ্চল, পূর্ব ও উত্তর দিকে সিলেট-ডাউকি রোড থেকে সুনামগঞ্জ-ময়মনসিংহ রোড পর্যন্ত।	মেজর মীর শওকত আলী
৬.	রংপুর জেলা এবং দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁও মহকুমা*।	উইং কমান্ডার এম কে বাশার
৭.	ঠাকুরগাঁও মহকুমা* ছাড়া দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা ও বগুড়া জেলা।	মেজর নাজমুল হক, পরে মেজর কাজী নুরুজ্জামান ও সুবেদার মেজর এ রব
৮.	কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুরের অধিকাংশ ও খুলনার উত্তরাঞ্চল।	মেজর আবু ওসমান চৌধুরী, পরে মেজর এম এ মঞ্জুর
৯	খুলনার দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা।	মেজর এম এ জলিল , পরে মেজর এম এ মঞ্জুর ও মেজর জয়নাল আবেদিন
১০.	অভ্যন্তরীণ নৌপথ, সমুদ্র উপকূল এবং চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দর।	হেডকোয়ার্টারের পরিচালনায় নৌ কমান্ডারবৃন্দ
১১.	কিশোরগঞ্জ মহকুমা* ছাড়া সমগ্র ময়মনসিংহ জেলা ও টাঙ্গাইল।	মেজর আবু তাহের (এপ্রিল-নভেম্বর) স্কোয়াড্রন লিডার এম হামিদুল্লাহ (নভেম্বর-ডিসেম্বর)

সূত্র: ১. এম. আর. আখতার মুকুল, *আমি বিজয় দেখেছি, অষ্টম মুদ্রণ, ঢাকা, বাংলা ১৩৯১, পৃ. ২২-২৩* এবং *বাংলাপিডিয়া অনলাইন*
* মহকুমাগুলি পরে জেলায় উন্নীত হয়। ২. হাসান তৌফিক ইমাম (২০০৪), *'বাংলাদেশ সরকার-১৯৭১* 'আগামী প্রকাশনী।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মুক্তিযুদ্ধের সময় সমগ্র বাংলাদেশকে কয়টি সেক্টরে ভাগ করা হয়?
২. মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা কত নম্বর সেক্টরের অধীনে ছিল? *[জাবি ২০১১-১২]*
৩. অস্থায়ী সরকারের গঠিত মুক্তিবাহিনীর সেনাপ্রধান কে ছিলেন?
৪. অনিয়মিত বাহিনীর সরকারি নাম কী ছিল?
৫. মুক্তিবাহিনীর নিয়মিত সেনাবাহিনীকে কয়টি ব্রিগেড ফোর্সে ভাগ করা হয়?
৬. মুক্তিযুদ্ধের সময় জেড ফোর্সের দায়িত্বে কে ছিলেন?

উত্তরের জন্য ৪১৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর অনুযায়ী সেক্টর কমান্ডারদের নামের একটি চার্ট প্রস্তুত করো।

পাঠ ১৫ ও ১৬

মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা এবং মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিসমূহের কার্যক্রম (Activities of the Liberation Forces and Activities of the Anti-Liberation Forces in Liberation War)

মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্যায় (The First Stage of the Liberation War)

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ প্রথমে ছিল প্রতিরোধ যুদ্ধ। প্রাথমিক পর্যায়ের এ প্রতিরোধ যুদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত থাকলেও তা ছিল অপরিকল্পিত ও বিক্ষিপ্ত। এপ্রিল মাসে মুক্তিফৌজ গঠনের পর সেনাপ্রধান কর্নেল আতাউল গণি ওসমানীর নেতৃত্বে এবং মেজর কে এম সফিউল্লাহ, মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর এম এ জলিল ও মেজর আবু তাহের প্রমুখ জ্যেষ্ঠ সেনা কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে মুক্তিবাহিনী সুসংগঠিতভাবে যুদ্ধ শুরু করে। প্রতিবেশী ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিয়ে সহায়তা করে। জুলাই পর্যন্ত মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা কিছুটা মন্থর থাকলেও আগস্ট মাস থেকে তাদের যুদ্ধ কার্যক্রম জোরদার হয়। বাঙালি সেনা ও ইপিআর সদস্যদের নিয়ে গঠিত নিয়মিত বাহিনীর পাশাপাশি ছাত্র, যুবক, কৃষক, শ্রমিকসহ সাধারণ মানুষকে নিয়ে গঠিত অনিয়মিত মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানি সেনাদের ওপর হামলা চালাতে থাকে। বিশেষ করে মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা আক্রমণে জনসমর্থনহীন পাকিস্তানি বাহিনী ক্রমেই দিশেহারা হয়ে পড়ে। বর্বর পাকিস্তানি সেনারা এ সময় নিরীহ বেসামরিক মানুষের ওপর আক্রমণ করে তাদের নৃশংসভাবে হত্যা করতে থাকে।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সারা বাংলার মানুষ স্বাধীনতার প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ থাকে। কিন্তু পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী জামায়াতে ইসলামি, মুসলিম লীগ, পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি (পিডিপি)সহ কয়েকটি রাজনৈতিক দল ও তাদের নেতাকর্মীদের সহায়তা পায়। এসব দল ও তাদের সহযোগী ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতৃত্বেই তথাকথিত শান্তি কমিটি, রাজাকার, আলবদর ও আল শামস বাহিনী গড়ে ওঠে। এসব বাহিনীর সহায়তায় পাকিস্তানি হানাদাররা এদেশের নিরীহ মানুষের ওপর চরম অত্যাচার চালায়। শান্তি কমিটির লোকজন ও রাজাকার বাহিনী বহু মুক্তিযোদ্ধা ও নিরীহ মানুষকে হত্যা করে।

মুজিবনগর সরকারের পরিচালিত স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব ও সাফল্য এবং পাকিস্তানি বাহিনীর পর্যুদস্ত হওয়ার খবর, দেশাত্মবোধক সংগীত, 'চরমপত্র' ও 'জল্লাদের দরবার' এর মতো জনপ্রিয় কথিকা ও নাটক ইত্যাদি বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচার করে মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ মানুষের মনোবল চাঙ্গা রাখে। মুক্তিবাহিনী ক্রমশই যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে সাফল্য পেতে থাকে। গেরিলা মুক্তিযোদ্ধারা আইয়ুব খানের বহু কু-কর্মের দোসর পূর্ব পাকিস্তানের প্রাক্তন গভর্নর মোনায়েম খানের ঢাকার বাসভবন আক্রমণ করে তাকে হত্যা করে।

জেনে রাখো

গেরিলা (Guerrilla) শব্দটি স্প্যানিশ শব্দ Guerra (গেরার) থেকে এসেছে। এর অর্থ খুদে যুদ্ধ। প্রাচীন চীনের সমরনায়ক সুন সু তার 'দ্য আর্ট অফ ওয়ার' গ্রন্থে সর্বপ্রথম গেরিলা যুদ্ধের কথা বলেন। নিয়মিত সেনাবাহিনীর সদস্য নয় এমন যেসব যোদ্ধা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে শত্রুপক্ষের সাথে যুদ্ধ করে তারাই গেরিলা। এরা শত্রুপক্ষের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় না। বরং লুকিয়ে থেকে সুযোগ বুঝে শত্রুপক্ষের ওপর আকস্মিক আক্রমণ চালায় এবং অল্প সময় যুদ্ধ করে আবার গোপন স্থানে চলে যায়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করে পাকিস্তানি সেনাদের বিপর্যস্ত করে তুলেছিল।

মুক্তিযুদ্ধের মধ্যবর্তী পর্যায় (The Middle Stage of the Liberation War)

অক্টোবর মাস থেকে মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধ তৎপরতা আরও তীব্র হয়। অক্টোবর মাসের শেষ নাগাদ মুক্তিবাহিনীর হাতে কয়েক হাজার পাকিস্তানি আর্মি অফিসার ও সৈন্য নিহত হয়। এ সময়ের মধ্যে মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানিদের এদেশীয় দোসরদেরও অনেককে হত্যা করে। পাশাপাশি নৌবাহিনীর কমান্ডোরা নদী ও সমুদ্র উপকূল এলাকা এবং বন্দরে পাকিস্তানিদের ওপর হামলা চালায়। নৌ-কমান্ডোদের আক্রমণে পাকিস্তানিদের ১২৬ টি জাহাজ ধ্বংস হয়। এতে তাদের অস্ত্র ও রসদ সরবরাহ মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়। বাংলাদেশের সদ্যগঠিত ছোট বিমানবাহিনীও যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মুক্তিবাহিনীর তীব্র

আক্রমণে কোণঠাসা পাকিস্তান সরকার পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর সামরিক কর্মকর্তা টিক্কা খানকে অপসারণ করে তার পদে বাঙালি রাজনীতিক ডা. আবদুল মোত্তালিব মালিককে বসায়। তবে পাকিস্তানি বাহিনীর অবস্থা ক্রমেই সঙ্গীন হয়ে ওঠে। পাকিস্তানি সেনারা গ্রামগঞ্জ ছেড়ে ধীরে ধীরে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ শহর এলাকায় আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। এর ফলে নভেম্বর মাসের মধ্যে দিনাজপুর, কুষ্টিয়া ও যশোরের বিস্তীর্ণ এলাকা শত্রুমুক্ত হয়।

মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায় (The Final Stage of the Liberation War)

মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিকে দিশেহারা পাকিস্তান সরকার উপায়ান্তর না দেখে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে পাক-ভারত যুদ্ধে রূপ দেওয়ার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায় ও ফায়দা লোটার অপচেষ্টা করে। ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বিমানবাহিনী ভারতীয় বিমানবাহিনীর অমৃতসর ও শ্রীনগর ঘাঁটিতে আক্রমণ চালায়। জবাবে ভারতীয় বিমানবাহিনী পাল্টা হামলা চালিয়ে পাকিস্তানের বিমানবাহিনীর সামরিক সক্ষমতা প্রায় সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংস করে দেয়। ভারত ৪ ডিসেম্বর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং ৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ২১ নভেম্বর মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সমন্বয়ে যৌথ কমান্ড গঠন করা হয়েছিল। ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের প্রধান লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা যৌথ কমান্ডের প্রধান নিযুক্ত হন। যৌথবাহিনীর সেনারা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। ভারতীয় বিমান ও নৌ বাহিনীও পাক-বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে যশোর সেনানিবাস, সাতক্ষীরা, মাগুরা, নড়াইল ও ঝিনাইদহ যৌথবাহিনীর দখলে আসে। এ বাহিনী দ্রুতগতিতে ঢাকার দিকে এগোতে থাকে। এ পরিস্থিতিতে ঢাকার শাহবাগে অবস্থিত পাঁচতারকা ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলকে (শেরাটন ও রুপসী বাংলা নামেও পরিচিত) নিরপেক্ষ এলাকা ঘোষণা করে সেখানে কূটনীতিক ও সাংবাদিকসহ বিদেশি নাগরিকদের আশ্রয় দেওয়া হয়। ভারতীয় বিমানবাহিনী জঙ্গিবিমানের হামলার মাধ্যমে ঢাকার আকাশের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। পাকিস্তানি বাহিনীর পরাজয় আসন্ন দেখে তাদের মিত্র যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব পাসের চেষ্টা করে। কিন্তু রাশিয়ার ভেটোর কারণে সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের সমর্থনে বঙ্গোপসাগরে তার সপ্তম নৌবহর পাঠালে জবাবে সোভিয়েত ইউনিয়নও একটি নৌবহর রওয়ানা করিয়ে দেয়। এতে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগ সেখানেই থমকে যায়। ১১-১৪ ডিসেম্বরের মধ্যে যৌথবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে ময়মনসিংহ, হিলি, কুষ্টিয়া, খুলনা, রংপুর, রাজশাহী, দিনাজপুর ও সিরাজগঞ্জ শত্রুবাহিনীর দখলমুক্ত হয় এবং মুক্তিবাহিনী ঢাকার খুব কাছে পৌছে যায়। পরাজয় নিশ্চিত হয়ে উঠলে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী সর্বশেষ নির্মমতায় মেতে ওঠে। রাজাকার ও আল বদর বাহিনীর সহায়তায় তারা ১৪ ডিসেম্বর বাঙালি জাতির খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবীদের অনেককে ধরে নিয়ে বর্বর নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করে। পরে ঢাকার রায়েরবাজারসহ বিভিন্ন বধ্যভূমিতে তাদের ক্ষতবিক্ষত, গলিত লাশ পাওয়া যায়। বাঙালি জাতিকে মেধাহীন করাই ছিল বুদ্ধিজীবী হত্যার উদ্দেশ্য। এ নৃশংস হত্যাযজ্ঞের দুই দিন পরই বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথবাহিনীর দুর্বার আক্রমণের মুখে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। ১৬ ডিসেম্বর বিকেলে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) পাকিস্তানি বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার লে. জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজি ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সেনা ও নাগরিকসহ বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ কমান্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। এভাবে লাখো প্রাণের বিনিময়ে বিশ্বের মানচিত্রে জন্ম নেয় স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ।

মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিসমূহের কার্যক্রম
Activities of the Anti-Liberation Forces in the Liberation War

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি সর্বজনীন জনযুদ্ধ। পাকিস্তানি শোষণ ও শাসন থেকে মুক্তি পাওয়ার এই সংগ্রামে কিছু স্বার্থান্বেষী দল বা ব্যক্তি ছাড়া দেশের প্রায় সব রাজনৈতিক দল এবং আপামর জনতা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিল। মস্কোপন্থি বাম রাজনৈতিক দলসমূহও এতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।[৫] তবে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি চীনের নেতিবাচক ভূমিকার জন্য চীনপন্থি বাম দলসমূহের মধ্যে কিছু সংগঠনের ভূমিকা ছিল বিতর্কিত।[৬]

---

[৫] মস্কোপন্থি দলসমূহের মধ্যে ছিল— বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (মণি সিংহ) এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফ্ফর)

[৬] চীনপন্থি দলসমূহের মধ্যে পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি, পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদ-লেনিনবাদ), পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি (মতিন-আলাউদ্দিন), পূর্ব বাংলা ওয়ার্কার্স এসোসিয়েশন, পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি (সিরাজ শিকদার) ইত্যাদি ছিল উল্লেখযোগ্য।

কিছু ডানপন্থি ও ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিরোধী ভূমিকা পালন করে। এসব দলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল- মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, নেজাম-ই- ইসলাম, জমিয়ত-ই-উলামায়ে ইসলাম, খিলাফত-ই-রব্বানি পার্টি, কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও পিডিপি ইত্যাদি। মুক্তিযুদ্ধের একপর্যায়ে এপ্রিল মাসে পাকিস্তান সরকার মুক্তিযুদ্ধবিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের নেতা-কমী ও সরকার সমর্থকদের নিয়ে দেশব্যাপী তথাকথিত 'শান্তি কমিটি' গঠন করে। কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন কাউন্সিল মুসলিম লীগের খাজা খয়েরুদ্দীন। শান্তি কমিটির কেন্দ্রীয় অফিস ছিল ঢাকার মগবাজারে। এরা পাকিস্তানিদের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছিল। শান্তি কমিটি 'রাজাকার বাহিনী' গঠনেও পাক সরকারকে সহযোগিতা করেছিল। ১৯৭১ সালের ১ জুন লে. জেনারেল টিক্কা খান 'The East Pakistan Razakar Ordinance' নামক এক অধ্যাদেশ বলে সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে পাকিস্তানের অনুসারী ও মুক্তিযুদ্ধবিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের নিয়ে 'রাজাকার' নামক সশস্ত্র সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্ব বাংলায় বসবাসরত উর্দুভাষী মোহাজেরদেরও (ভারত বিভাগের পর পাকিস্তানে আসা মুসলিম) অনেকে রাজাকার বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। সেপ্টেম্বর মাসে মেজর জেনারেল জমশেদকে রাজাকার বাহিনীর প্রধান নিয়োগ করা হয়। মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে গুপ্তচরগিরি করা ছাড়াও রাজাকার বাহিনী দখলদার বাহিনীর দোসর হিসেবে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। পরে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী 'আল বদর' ও 'আল শামস' নামক দুটি সশস্ত্র বাহিনী গঠন করা হয়। এ দুই বাহিনীর সদস্যরা মুক্তিযুদ্ধের একেবারে শেষ দিকে, ১৪ ডিসেম্বর কিছুসংখ্যক খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবীকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে নির্মম অত্যাচারের পর হত্যা করে। এদের মধ্যে ছিলেন কয়েকশত বিশিষ্ট লেখক, শিল্পী, অধ্যাপক, সাংবাদিক, চিকিৎসকসহ পেশাজীবী ও সংস্কৃতিকর্মী। ১৪ ডিসেম্বর তাই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে একটি কালো তথা শোকাবহ দিন। বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও যেন একটি মেধাশূন্য রাষ্ট্রে পরিণত হয় সেই নীল নকশা অনুযায়ী এ হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনী 'পোড়ামাটি নীতি' অনুযায়ী বাংলাদেশের সব সম্পদ ও প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দিতে চেয়েছে। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, মসজিদ, মন্দির কোনো কিছুই রেহাই পায়নি। তাদের লক্ষ্য ছিল এ ভূখণ্ডের মানুষকে হত্যা করে ভূমির দখল নেওয়া। আর তাদের এ কাজে সহায়তা করেছে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী এসব শক্তিসমূহ।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ প্রথমে কেমন যুদ্ধ ছিল?
২. মুক্তিযুদ্ধ কখন সাংগঠনিক রূপ লাভ করে?
৩. মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সমন্বয়ে যৌথ কমান্ড গঠিত হয় কখন? */ইবি '২০১৭-১৮/*
৪. ভারত কত তারিখে বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়? */সকল বোর্ড ২০১৯/*
৫. বুদ্ধিজীবী হত্যার কারণ কী? */সকল বোর্ড ২০২৫/*
৬. 'রাজাকার' নামক সশস্ত্র সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে কে?

উত্তরের জন্য ৪১৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

১. মুক্তিযুদ্ধের সময় গঠিত যৌথ কমান্ডের পাঁচটি কাজ ছক আকারে লেখো।
২. যেসব রাজনৈতিক দল ও সংগঠন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিরোধী ভূমিকা পালন করেছে তা চিহ্নিত করে তাদের কার্যক্রমের ওপর একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করো।

পাঠ ১৭ ও ১৮

মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভূমিকা
Role of the Various Groups in Liberation War

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে নিয়মিত বাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধাদের পাশাপাশি এ দেশের আপামর জনসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ঢাকায় পাকিস্তানি সেনাদের ২৫ মার্চ রাতের হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে বাঙালি পুলিশ ও ইপিআর বাহিনীর (বর্তমান নাম বিজিবি) সদস্যরা বীরত্বের সাথে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। সে রাতে বহুসংখ্যক পুলিশ ও ইপিআর সদস্য লড়াই করে শহিদ হন। পরে সেই কালরাত্রির ভয়াবহতা পেছনে ফেলে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ডাকে সাড়া দিয়ে সব শ্রেণির মানুষ মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে শুরু করে। পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসরদের বর্বর অত্যাচারজনিত ক্ষোভ এবং স্বাধীনতার স্পৃহা এদেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে। ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক, জেলে, কামার-কুমার, শিক্ষক, লেখক, সাংবাদিক, চিকিৎসক, শিল্পীসহ সব পেশার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।

কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা

ছাত্র-ছাত্রী: বাঙালির সব মুক্তি আন্দোলনেই ছাত্রদের অগ্রণী ভূমিকা ছিল। এ কারণে তারা মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। ছাত্ররাই মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি ছিল। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে প্রাথমিক প্রতিরোধ গড়ে তোলায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে তারা। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পাশাপাশি অনেক স্কুলপড়ুয়া বা তাদের সমবয়সী কিশোর নানাভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। ছাত্ররা যুদ্ধের প্রশিক্ষণের জন্য সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে যায়। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনাকারী অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার ভারতের সহায়তায় ছাত্র-যুবকদের জন্য প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রের সংস্থান করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাত্র দুই/তিন সপ্তাহের প্রশিক্ষণ আর হালকা অস্ত্র নিয়ে ভারি অস্ত্রে সুসজ্জিত ও প্রশিক্ষিত পাকিস্তানি সেনাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে দেশপ্রেমিক অসীম সাহসী মুক্তিসেনার দল। পাকিস্তানি বাহিনীর আতঙ্ক ঢাকার গেরিলা বাহিনী ক্র্যাক প্লাটুনের অধিকাংশ সদস্য ছিলেন ছাত্র।

ট্রেনিংরত নারী মুক্তিযোদ্ধা

কৃষক: মুক্তিযোদ্ধাদের একটি বড় অংশ ছিল কৃষক। মুক্তিযুদ্ধে তাদের অবদান ছিল অত্যন্ত গৌরবজনক। দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবনের মায়া ত্যাগ করে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন তারা। এই খেটে খাওয়া মানুষদের কাছে ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতির হিসাব গুরুত্ব পায়নি। তাদের একটাই লক্ষ্য ছিল, যেকোনো মূল্যে দেশকে শত্রুমুক্ত করতে হবে।

নারী: মুক্তিযুদ্ধে নারীদের ভূমিকাও ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৭১ সালের মার্চের প্রথম থেকেই দেশের প্রতিটি অঞ্চলে যে সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় তাতে নারীদের বিশেষ করে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। দেশকে স্বাধীন করতে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় বহু নারী সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। কলকাতায় নারীদের জন্য মুজিবনগর সরকারের খোলা প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে প্রায় ৪০০ জন যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেন। ত্রিপুরার আগরতলায়ও নারীদের আধুনিক অস্ত্রের উচ্চতর ট্রেনিং দেওয়া হয়। নারীরা শুধু প্রশিক্ষণই নেননি, তাদের মধ্যে অনেকে রণাঙ্গনে গিয়ে প্রত্যক্ষ যুদ্ধেও অংশ নিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ দু'জন নারী 'বীর প্রতীক' খেতাব পর্যন্ত অর্জন করেন। একজন তারামন বিবি, অন্যজন ডাক্তার সিতারা বেগম। এছাড়া সারাদেশের অসংখ্য নারী

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় ও খাবার দিয়ে, অস্ত্র লুকিয়ে রেখে বা শত্রুসেনার অবস্থান সম্পর্কে তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন। আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসাসেবা দিয়েছেন অনেক নারী। যুদ্ধের নয় মাসে প্রায় দুই লাখ নারী পাকিস্তানি সেনাদের হাতে সম্ভ্রম হারান। বঙ্গবন্ধু তাদের মমতাভরে 'বীরাঙ্গনা' বলে সম্বোধন করেছিলেন।

শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী: সাধারণ মানুষ ও মুক্তিযোদ্ধাদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা এবং যুদ্ধের অশেষ দুর্ভোগের মধ্যেও মনোবল ধরে রাখায় শিল্পী-সাহিত্যিক-সংস্কৃতিকর্মীসহ বুদ্ধিজীবীরা প্রশংসনীয় অবদান রাখেন। পত্রপত্রিকায় লেখা, স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রে খবর পাঠ, দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন, কবিতা পাঠ, নাটক, কথিকা ইত্যাদির মাধ্যমে তারা মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করেছেন। স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রে সাংবাদিক এম আর আকতার মুকুলের পরিবেশিত কথিকা 'চরমপত্র' ছিল খুবই জনপ্রিয় একটি অনুষ্ঠান। এতে ঢাকার আঞ্চলিক ভাষায় ব্যঙ্গাত্মকভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব ও পাকিস্তানি বাহিনীর দুর্গতির কথা তুলে ধরা হতো। শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের এসব সৃষ্টি ও পরিবেশনা রণক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের মানসিক ও নৈতিক বল ধরে রাখতে সহায়তা করেছে। মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখা অসংখ্য বুদ্ধিজীবীর মধ্যে শহিদ হয়েছে প্রখ্যাত সুরকার আলতাফ মাহমুদ, সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেন, সেলিনা পারভীন, চিকিৎসক ডা. ফজলে রাব্বি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক গিয়াস উদ্দিন আহমদ প্রমুখ। উল্লিখিত বুদ্ধিজীবীসহ শত শত গুণীজনকে হত্যা করেছে পাকিস্তান বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসররা।

জেনে রাখো

১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর মহান মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয়ের প্রাক্কালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার, আল বদর, আল শামস বাহিনী বাঙালি জাতির অনেক শ্রেষ্ঠ সন্তানকে হত্যা করে। স্বাধীনতাবিরোধী চক্র বাঙালি জাতিকে মেধাহীন করতে পরিকল্পিতভাবে এ হত্যাযজ্ঞ চালায়। পৈশাচিকভাবে হত্যা করার পর ঢাকার রায়েরবাজারসহ বিভিন্ন স্থানে ঐ বুদ্ধিজীবীদের লাশ ফেলে রাখা হয়।

১৯৭২ সালে জাতীয়ভাবে প্রকাশিত বুদ্ধিজীবী দিবসের সংকলন, স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত বহুলপ্রচারিত আন্তর্জাতিক সংবাদ সাময়িকী 'নিউজউইক'-এর প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বলা হয়, মুক্তিযুদ্ধে শহিদ বুদ্ধিজীবীর মোট সংখ্যা ১ হাজার ৭০ জন। জাতির এ শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এবং তাদের আত্মত্যাগ থেকে অনুপ্রেরণা পেতে প্রতি বছর ১৪ ডিসেম্বর শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন করা হয়।

গণমাধ্যম: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যমের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। সংবাদপত্র ও স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ২৬ মার্চ চট্টগ্রাম বেতারের শিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মীরা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চালু করেন। পরে এটি মুজিবনগর সরকারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। স্বাধীনবাংলা বেতারকেন্দ্র সংবাদ, দেশাত্মবোধক গান, মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা, শত্রুসেনাদের বিপর্যয়ের খবর ইত্যাদি দেশ ও জাতির সামনে তুলে ধরে মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ মানুষকে সাহস জুগিয়েছে। মুজিবনগর সরকারের প্রচার সেলের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রিকা মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গণমাধ্যম পাকিস্তানি বাহিনীর নৃশংসতা, শরণার্থীদের দুর্ভোগ ও মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বের কাহিনি তুলে ধরে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গঠনে অবদান রেখেছে।

প্রবাসী বাংলাদেশি: প্রবাসী বাংলাদেশিরা মুক্তিযুদ্ধে নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেন। বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত বাংলাদেশিরা মুক্তিযুদ্ধের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছেন। বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন আদায়ে পার্লামেন্ট সদস্যসহ রাজনৈতিক নেতাদের কাছে ছুটে গিয়েছেন বা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেছেন। এছাড়া পাকিস্তানকে অস্ত্র, গোলাবারুদ সরবরাহ না করার জন্য বিভিন্ন দেশের সরকারের কাছে আবেদন করেছেন।

প্রবাসী বাংলাদেশিরা বাংলাদেশ সরকারের অঘোষিত প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন। তারা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের দুর্দিনে সাহায্য করেছেন। বিদেশে পাকিস্তানি দূতাবাসে কর্মরত বাংলাদেশিরা চাকরির মায়া ত্যাগ করে দেশের পক্ষে কাজ করেছেন। সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইরাক, ফিলিপাইন, আর্জেন্টিনা, ভারত ও হংকং দূতাবাসের বাংলাদেশি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্বজনমত গঠনে কাজ করেন। বাংলাদেশের বর্তমান (২০২৫) অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস তখন যুক্তরাষ্ট্রের মিডল টেনেসি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনারত ছিলেন। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে জনমত গঠনে কাজ করেন। প্রবাসী বাংলাদেশিদের সাথে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের জন্য সমর্থন জোগাতে 'বাংলাদেশ ইনফরমেশন সেন্টার' পরিচালনা করেন। তার

নিজ বাড়ি থেকে প্রকাশ করতেন বাংলাদেশ নিউজলেটার। প্রবাসী বাংলাদেশিদের উদ্যোগে ১ আগস্ট লন্ডনের ট্রাফালগার স্কয়ারে এক বিশাল জনসভা হয়। ইউরোপ ও আমেরিকার বড় বড় শহরে প্রবাসী বাংলাদেশির উদ্যোগে এ রকম আরও সমাবেশের আয়োজন করা হয়। মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাংলাদেশির ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠনে তারা আন্তরিকভাবে কাজ করেছেন।

সাধারণ মানুষ: মুক্তিযুদ্ধের মূল নিয়ামক শক্তি ছিল সাধারণ মানুষ। তাদের সীমাহীন ত্যাগ, সাহায্য-সহযোগিতা ও স্বাধীনতার প্রতি ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষার ফলেই মাত্র নয় মাসের যুদ্ধে বাঙালির পক্ষে স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হয়েছিল। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক সহযোগী ছাড়া এদেশের সবাই কোনো না কোনোভাবে মুক্তিযুদ্ধে অবদান রেখেছে। সাধারণ মানুষ মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়েছে, শত্রুর অবস্থান ও চলাচলের তথ্য দিয়েছে, খাবার সরবরাহ করেছে, সাধ্যমতো ওষুধপত্র ও অন্যান্য সেবা দিয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির পাশাপাশি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অনেকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লাখ শহিদের মধ্যে সাধারণ মানুষের সংখ্যাই বেশি। তাদের রক্তের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি লাল-সবুজের পতাকাসমৃদ্ধ স্বাধীন বাংলাদেশ। এছাড়াও ২ লাখ মা-বোনের সম্ভ্রম এবং দেশবরেণ্য বুদ্ধিজীবীদের রক্তের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি লাল সবুজের পতাকাসমৃদ্ধ স্বাধীন বাংলাদেশ, যা বিশ্বের মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটিয়েছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের।

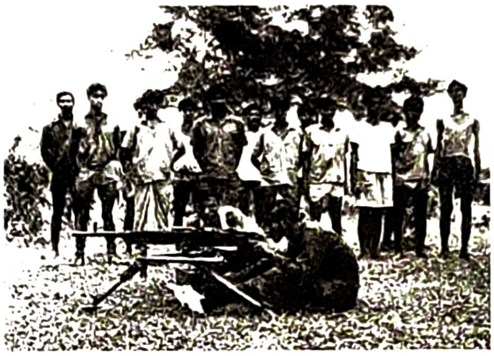

ট্রেনিংরত সাধারণ মানুষ

জেনে রাখো

নৃগোষ্ঠী বা জাতিসত্তা বলতে এমন জনগোষ্ঠীকে বোঝায় যারা আলাদা রাষ্ট্র গঠন করতে পারেনি, কিন্তু তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে। বাংলাদেশে নৃগোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে- চাকমা, গারো, মারমা, সাঁওতাল, মুরং, ত্রিপুরা, হাজং প্রভৃতি। এদের মোট সংখ্যা প্রায় ৮৯,৭৮২৮ জন। এদের বেশিরভাগ পার্বত্য চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, সিলেট, রাজশাহী অঞ্চলে বসবাস করে। বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় নৃগোষ্ঠী হলো চাকমা জনগোষ্ঠী।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাঙালির সব মুক্তি আন্দোলনে কারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে?

২. মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ কতজন নারী 'বীর প্রতীক' খেতাব অর্জন করেন? *[ঢাবি ২০১৪-১৫]*

৩. মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রে পরিবেশিত 'চরমপত্র' অনুষ্ঠানটি কে পাঠ করতেন?

৪. ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চালু করেন কারা?

৫. মুক্তিযুদ্ধের মূল নিয়ামক শক্তি ছিল কারা?

৬. মুক্তিযুদ্ধে কত লাখ মানুষ শহিদ হন?

উত্তরের জন্য ৪১৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা পালনকারী বিভিন্ন গোষ্ঠীর তালিকা তৈরি করে তাদের দুটি করে কাজ লেখো।

পাঠ ১৯

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন দেশ ও জাতিসংঘের ভূমিকা
Role of Different Countries and the UN in the 1971 Liberation War

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বহির্বিশ্বের ভূমিকা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রতিবেশী ভারত ও অন্যতম বিশ্বশক্তি তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নসহ (বর্তমান রাশিয়া) বিভিন্ন দেশের সমর্থন ও সহায়তা বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনকে সম্ভব করেছিল। অন্যদিকে পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনসহ কয়েকটি দেশ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বিরোধিতা করে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বহির্বিশ্বের ভূমিকা নিচে আলোচনা করা হলো—

ভারতের ভূমিকা: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নিকটতম প্রতিবেশী ভারত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন ভারত সরকার বাংলাদেশের প্রায় এক কোটি শরণার্থীকে সেদেশে আশ্রয় দেয়। ভারত সরকার তার দেশে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। ভারত মুক্তিবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য অস্ত্র ও রসদ দিয়ে সহযোগিতা করে। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতায় বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের সদর দপ্তর স্থাপনের অনুমতি দেয়। ভারত সরকার স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র স্থাপনেও সহায়তা করে। মুক্তিযুদ্ধের শেষদিকে নভেম্বর মাসে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনী 'যৌথ কমান্ড' গঠন করে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। এর পর ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বিমান বাহিনী ভারতের কয়েকটি বিমান ঘাঁটি আক্রমণ করলে দেশটির প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ভুটান ও ভারত ৬ ডিসেম্বর সর্বপ্রথম স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত যৌথবাহিনী দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীকে পরাস্ত করতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। বাংলাদেশ-ভারত যৌথবাহিনী ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে ঢাকার উপকণ্ঠে পৌঁছে যায়। যৌথবাহিনী পাকিস্তানি বাহিনীকে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানায়। পাকিস্তানি বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার লে.জেনারেল নিয়াজি বাধ্য হয়ে ১৬ ডিসেম্বর বিকেলে ৯৩ হাজার সৈন্য ও পাকিস্তানি নাগরিকসহ বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমান্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। পাকিস্তানি সেনাদের আত্মসমর্পণ ও চুক্তিস্বাক্ষর অনুষ্ঠানটি হয় ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়াদী উদ্যান)।

সরকারি পর্যায়ের বাইরেও ভারতের অধিকাংশ রাজনৈতিক দল, বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিকর্মী ও সাধারণ মানুষ মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। ভারতের প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ ও সেতারবাদক পণ্ডিত রবি শংকর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে ছিলেন বহুল আলোচিত 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা। এ অনুষ্ঠান থেকে ওঠা প্রায় আড়াই লাখ ডলার ইউনিসেফের মাধ্যমে শরণার্থী শিশুদের জন্য দান করা হয়। এভাবে মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশকে সমর্থন দিয়ে ভারত আমাদের কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের ভূমিকা: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে। সোভিয়েত সরকার একাত্তরের মার্চে পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানি শাসকদের পরিচালিত গণহত্যার নিন্দা করে এবং রক্তপাত ও নির্যাতন বন্ধ করে রাজনৈতিক উপায়ে সংকটের সমাধানের জন্য পাকিস্তান সরকারের কাছে দাবি জানায়। যুদ্ধ শুরুর পরপরই ৩ এপ্রিল সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট পদোগনি গণহত্যা বন্ধের জন্য ইয়াহিয়াকে চিঠি দেন। ১৯৭১ সালের ৯ আগস্ট রুশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থনে ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতার ক্ষেত্র বৃদ্ধি করে। ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান বিমান বাহিনী

ভারতের কয়েকটি বিমান ঘাঁটি আক্রমণ করলে সোভিয়েত ইউনিয়ন এর নিন্দা জানায়। যুদ্ধে বাংলাদেশের বিজয় অনেকটাই নিশ্চিত হয়ে যাওয়ার পর ৪ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব উত্থাপন করলে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেটো দিয়ে তা অকার্যকর করে দেয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবের বিপক্ষে রাশিয়া তিন বার ভেটো প্রদান করে। সোভিয়েত সরকার ভারতে অবস্থানরত বাংলাদেশি শরণার্থীদের ত্রাণ সহায়তা এবং মুক্তিবাহিনীকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে। যুদ্ধের পর বহু নিমজ্জিত জাহাজ, ধ্বংসাবশেষ ও পাকিস্তানি বাহিনীর পেতে রাখা বিপজ্জনক মাইন অপসারণ করে চট্টগ্রাম বন্দরকে আবার ব্যবহার উপযোগী করে সোভিয়েত নৌবাহিনীর সদস্যরা।

জেনে রাখো

'ভেটো' শব্দের অর্থ আমি মানি না। কোনো প্রস্তাবে ভেটো দেওয়া অর্থ এর বিরোধিতা করা। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ৫টি স্থায়ী সদস্য দেশ এ ক্ষমতার অধিকারী। দেশগুলো হলো— যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, ফ্রান্স এবং চীন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের মতোই তার মিত্র তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ যেমনম— কিউবা, যুগোশ্লাভিয়া (অধুনালুপ্ত), পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া (বর্তমানে দুই রাষ্ট্র) ও পূর্ব জার্মানি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতে আশ্রয় নেওয়া বাংলাদেশি শরণার্থীদের সহায়তা দেয় এবং মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে বিশ্বজনমত তৈরিতে অবদান রাখে।

ব্রিটেন ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভূমিকা: বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ব্রিটিশ সরকার বাংলাদেশি শরণার্থীদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছিল। অন্যদিকে যুদ্ধ চলাকালে লন্ডনভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা বিবিসি এবং ব্রিটিশ পত্র-পত্রিকা পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রচার করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে বিশ্বজনমতকে জাগ্রত করেছিল। পশ্চিম জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার সরকারও মানবিক সহায়তা নিয়ে এগিয়ে আসে। ইতিবাচক ভূমিকা রাখে এসব দেশের প্রচারমাধ্যমও।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা: পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি বিরোধিতা করে। যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের সরকার যুদ্ধের পুরো নয় মাস স্বাধীনতা ঘোষণা করা বাংলাদেশের বিপক্ষে পাকিস্তানকে রাজনৈতিক ও সামরিকসহ সব ধরনের সমর্থন দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মুক্তিযুদ্ধকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সমস্যা হিসেবে আখ্যায়িত করে। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে পাকিস্তানি বিমান হামলার প্রতিক্রিয়ায় ভারত এতে সরাসরি জড়িয়ে পড়ে। মার্কিন প্রশাসন তখন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হিসেবে আখ্যায়িত করার অপকৌশল নেয়। বাংলাদেশের বিজয় ক্রমেই নিশ্চিত হয়ে উঠলে মার্কিন উদ্যোগে জাতিসংঘে যুদ্ধ বন্ধের প্রস্তাবও উত্থাপন করা হয়েছিল। তবে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেটোর ফলে তা সম্ভব হয়নি। মস্কো ও দিল্লির ওপর চাপ প্রয়োগের উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্র তার পরমাণু অস্ত্রসজ্জিত সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগরের উদ্দেশ্যে পাঠায়। এর প্রতিক্রিয়ায় ভারতের নৌবহর INS Vikrant থাইল্যান্ডের সমুদ্রসীমা ব্যবহার করে প্রতিরক্ষাবলয় তৈরি করে ও রাশিয়ার অষ্টম নৌবহর বাল্টিক সাগর হতে বঙ্গোপসাগর অভিমুখে যাত্রা করলে সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগর ত্যাগ করে।

তৎকালীন মার্কিন সরকারের নীতি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে থাকলেও সেদেশের ডেমোক্রেটিক দল, বেশ কয়েকজন কংগ্রেসম্যান এবং বুদ্ধিজীবীরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেন। মার্কিন গণমাধ্যম ও সাধারণ মানুষও ছিল বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল। ১৯৭১ সালের ১ আগস্ট নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হয় 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' সঙ্গীতানুষ্ঠান। যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ ব্যাপক উৎসাহ নিয়ে এতে যোগ দেয়। এ অনুষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত অনুদান বাংলাদেশি শরণার্থী শিশুদের জন্য দান করা হয়। প্রখ্যাত মার্কিন কবি অ্যালেন গিনসবার্গ ভারতের পথে পাড়ি জমানো বাংলাদেশি শরণার্থীদের নিয়ে লিখেছিলেন বিখ্যাত 'সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড' কবিতাটি। এটি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে জনমত সৃষ্টিতে অবদান রেখেছিল।

চীনের ভূমিকা: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে চীনের ভূমিকা ছিল স্পষ্টতই নেতিবাচক। মুক্তিযুদ্ধের দুই সমর্থক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের সাথে বৈরী সম্পর্ক এবং পাকিস্তানের সাথে বন্ধুত্বের কারণেই চীন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে। দেশটি যুদ্ধের সময় পাকিস্তানকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রসহ ব্যাপক সহযোগিতা দেয়।

মুসলিম বিশ্বের ভূমিকা: হিন্দুপ্রধান রাষ্ট্র ভারত এবং সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব বাংলাদেশের স্বাধীনতায় সমর্থন দেওয়ায় সৌদি আরব ও তুরস্কসহ মুসলিম বিশ্বের প্রায় সব দেশই মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল। পাকিস্তানের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে দেশগুলোর ধারণা হয় যে, বাংলাদেশ স্বাধীন হলে তা ইসলামের জন্য ক্ষতিকর হবে। এ কারণে মুসলিম বিশ্বের প্রায় সব দেশ হানাদার পাকিস্তানিদের কূটনৈতিক, নৈতিকসহ অন্যান্য সব সহায়তা দিয়েছিল।

জাতিসংঘের ভূমিকা: মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বসংস্থা জাতিসংঘের ভূমিকা মোটেই আশাব্যঞ্জক ছিল না। পাকিস্তানি হানাদারদের নির্বিচার গণহত্যার ঘটনায় জাতিসংঘ নিন্দা বা প্রতিবাদ জানায়নি। পাকিস্তানি বাহিনীর নারকীয় হত্যাযজ্ঞ বন্ধে জাতিসংঘ কোনো কার্যকর উদ্যোগ নেয়নি। বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের প্রতিনিধিকে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে জাতিসংঘে বক্তব্য দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি।

জেনে রাখো

বিশ্বশান্তি এবং নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘ গঠিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫) ভয়াবহতা থেকে বিশ্বের শান্তিকামী নেতাদের উদ্যোগে এ প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলা হয়। এটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় আন্তর্জাতিক সংস্থা। এর সদর দপ্তর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে। বর্তমানে এর সদস্য দেশ ১৯৩টি। জাতিসংঘের বর্তমান মহাসচিব পর্তুগালের নাগরিক আন্তোনিও গুতারেস। বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করাই এর মূল কাজ। বাঙালির মহান মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘের ভূমিকা ইতিবাচক না হলেও ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ এর সদস্যপদ লাভ করে।

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?
২. মুক্তিযুদ্ধের সময় কোন দেশ বাংলাদেশের প্রায় এক কোটি শরণার্থীকে আশ্রয় দেয়?
৩. যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা কে ছিলেন?
৪. জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে কোন দেশ ভেটো দেয়?
৫. পরাশক্তি হিসেবে কোন দেশ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি বিরোধিতা করে?
৬. বাংলাদেশি শরণার্থীদের নিয়ে লেখা 'সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড' কবিতাটির রচয়িতা কে?

উত্তরের জন্য ৪১৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের সময় এর পক্ষে এবং বিপক্ষে যেসব বিদেশি শক্তি কাজ করেছিল ছক আকারে তা উপস্থাপন করো।

গ. দলীয় কাজ

বাঙালির মহান মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘের ভূমিকার ওপর একটি দলীয় আলোচনার আয়োজন করো।

পাঠ ২০

স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়
Emergence of the Independent and Sovereign Bangladesh

স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর সবচেয়ে তাৎপর্যময় দিন। এ দিন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে বিশ্ব মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের।

মুক্তিবাহিনীর চূড়ান্ত বিজয় (The Ultimate Victory of the Liberation Force)

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের গণহত্যার পর নিরীহ, নিরস্ত্র বাঙালি দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সাথে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। ২৬ মার্চ থেকে শুরু হয় বাঙালির মহান মুক্তিযুদ্ধ। তাই ২৬ মার্চ বাঙালির জাতীয় ও স্বাধীনতা দিবস হিসেবে গণ্য। সীমাহীন বীরত্ব আর সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে মাত্র নয় মাসে মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানের শক্তিশালী সেনাবাহিনীকে পর্যুদস্ত করে ফেলে। বিশ্বজনমত ও প্রতিবেশী ভারতসহ বিদেশি বন্ধু রাষ্ট্রের সহায়তা মুক্তিযোদ্ধাদের সাফল্যে বড় ধরনের অবদান রাখে। নভেম্বর মাসে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সমন্বয়ে যৌথ কমান্ড গঠিত হওয়ার পর মুক্তিযুদ্ধের গতি বৃদ্ধি পায়। যৌথ বাহিনীর প্রবল আক্রমণে দিশেহারা বিপর্যস্ত পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অবশেষে আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৫ ডিসেম্বর ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল স্যাম মানেকশ পূর্ব পাকিস্তানে মোতায়েন পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীকে নিরাপত্তাদানের শর্তে তাদের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার লে. জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজিকে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানান। ঐ দিন সন্ধ্যায়ই পশ্চিম পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডি থেকে পাকিস্তানি সেনাপ্রধান জেনারেল আবদুল হামিদ 'প্রদত্ত শর্ত মোতাবেক' যুদ্ধবিরতির জন্য লে. জেনারেল নিয়াজিকে নির্দেশ দেন। ঐ নির্দেশ অনুযায়ী লে. জেনারেল নিয়াজি যুদ্ধবিরতি ও আত্মসমর্পণের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেন। ১৬ ডিসেম্বর বিকেলে ঢাকায় আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বিজয় অর্জিত হয়।

পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান
Surrender Ceremony of Pakistani Army

পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণ চুক্তি

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিকাল চারটার পর ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের প্রধান লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের প্রধান লে. জেনারেল নিয়াজি নিজ নিজ দেশের সেনাবাহিনীর কিছুসংখ্যক উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে উপস্থিত হন। গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকারসহ বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী তথা মুক্তিবাহিনীর কয়েকজন শীর্ষ কর্মকর্তাও সেখানে উপস্থিত হন। এছাড়া মুক্তিযোদ্ধাসহ কয়েক লক্ষ সাধারণ মানুষ এবং বেশ কিছুসংখ্যক দেশি-বিদেশি সংবাদকর্মী রেসকোর্স এলাকায় উপস্থিত ছিলেন। পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন সেনাবাহিনীর ডেপুটি চিফ অব স্টাফ গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার। এ অনুষ্ঠানে মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি আতাউল গণি ওসমানী প্রটোকলজনিত কারণে উপস্থিত থাকতে পারেননি। ১৬ ডিসেম্বর বেলা ৪ টা ৩১ মিনিটে লে. জেনারেল নিয়াজি ৯৩ হাজার সামরিক-বেসামরিক পাকিস্তানি নিয়ে আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করেন। আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে ছিলেন পাকিস্তানের সামরিক, আধা সামরিক বাহিনীর সদস্য এবং বেসামরিক পাকিস্তানি ও উভয়পক্ষের সদস্যরা।

পাকিস্তানি আত্মসমর্পণ দলিল (Pakistani Instrument of Surrender)

আত্মসমর্পণ দলিলের বাংলা অনুবাদ নিম্নরূপ—

পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার পূর্ব রণক্ষেত্রে ভারতীয় এবং বাংলাদেশ যৌথ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক লে. জেনারেল অরোরার কাছে আত্মসমর্পণে সম্মতি প্রদান করছেন। এ আত্মসমর্পণে বাংলাদেশে অবস্থানরত পাকবাহিনীর স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর সব সদস্য, সব আধাসামরিক এবং অসামরিক অস্ত্রধারী সৈনিক অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এসব সৈন্যরা যে যেখানে যেভাবে আছেন সেভাবে অস্ত্র পরিত্যাগ করবেন এবং নিকটস্থ জেনারেল অরোরার অধীন বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করবেন।

এ দলিল স্বাক্ষরিত হওয়ার সাথে সাথে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড জেনারেল অরোরার আদেশাধীনে ন্যস্ত হবে। তার আদেশের বরখেলাপ আত্মসমর্পণ চুক্তি ভঙ্গের সামিল হবে এবং যুদ্ধের সর্বগ্রাহ্য নিয়মাবলি ও বিধি অনুযায়ী অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ আত্মসমর্পণ চুক্তির ব্যাখ্যা সম্পর্কিত কোনো সন্দেহের সৃষ্টি হলে লে. জেনারেল অরোরা এ মর্মে আশ্বাস দেন যে, জেনেভা চুক্তি অনুযায়ী আত্মসমর্পণকারীদের যোগ্য সম্মান ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেওয়া হবে। লে. জেনারেল অরোরার অধীন সেনাবাহিনীর সাহায্যে বিদেশি নাগরিক, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং পশ্চিম পাকিস্তানের বেসামরিক নাগরিকদের নিরাপত্তা প্রদান করা হবে।

স্বাক্ষর/-	স্বাক্ষর/-
জগজিৎ সিং অরোরা	আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজি
লে. জেনারেল	লে. জেনারেল
জি ও সি এবং ভারতীয় পূর্বাঞ্চলীয়	সামরিক আইন প্রশাসক, জোন-বি
বাহিনী ও বাংলাদেশ বাহিনীর	এবং পাকিস্তান বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয়
সর্বাধিনায়ক	কমান্ডের সর্বাধিনায়ক
১৬.১২.১৯৭১	১৬.১২.১৯৭১

উভয়পক্ষের আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষরের মাধ্যমে নয় মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের অবসান ঘটে। বিশ্বমানচিত্রে স্থান পায় স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ। আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে নিরাপত্তার যুক্তি তোলা হলে যুদ্ধবন্দি পাকিস্তানি সেনাদের ভারতে স্থানান্তর করা হয়। যুদ্ধবন্দিদের ব্যাপারে একটি আন্তর্জাতিক নীতিমালা আছে যার নাম জেনেভা কনভেনশন। এর আওতায় বন্দিকে নির্যাতন না করাসহ বিভিন্ন সুরক্ষা দিতে হয়। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ তখন এই কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী দেশ ছিল না বলে মুক্তিবাহিনী সেই নীতিমালা মানতে বাধ্য ছিল না। এজন্য চতুর পাকিস্তানিরা ঝুঁকি নিতে চায়নি। বাঙালির প্রত্যাশা ছিল, স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদের বিচারের আওতায় আনবে। কিন্তু পরে সিমলা চুক্তি অনুযায়ী ভারত সরকার যুদ্ধবন্দিদের পাকিস্তানের কাছে হস্তান্তর করায় সেই প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। পাকিস্তানি বাহিনীর ১৯৫ জন সেনা কর্মকর্তা মুক্তিযুদ্ধের সময় যুদ্ধাপরাধ করার জন্য চিহ্নিত হয়েছিলেন। পাকিস্তান সরকার অভিযুক্তদের বিচার করার অঙ্গীকার করেছিল। পরে জুলফিকার আলী ভুট্টোর গঠিত বিচারপতি হামিদুর রহমান কমিশনও এ বিষয়ে সুপারিশ করে। কিন্তু এ সময়ের পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত সেনাদের বিচারের কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়: ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের অবসান ঘটে এবং বাঙালির বিজয় অর্জিত হয়। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ত্রিশ লাখ লোকের আত্মদান এবং দুই লাখের বেশি মা-বোনের সম্ভ্রমহানির বিনিময়ে বাংলার মানুষ লাভ করে নিজেদের স্বপ্নের স্বাধীন ও সার্বভৌম ভূখণ্ড

বাংলাদেশ। ভেঙে যায় শুধু ধর্মের ভিত্তিতে হাজার মাইলের বেশি দূরত্বের দুই ভূখণ্ডকে নিয়ে গঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্র। সাংস্কৃতিক, নৃতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক সব দিক থেকেই পাকিস্তানের দুই অংশ ছিল ভিন্ন। তাছাড়া রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিকসহ সবক্ষেত্রে পূর্বাঞ্চলের ওপর পশ্চিমাদের সীমাহীন বৈষম্য এবং নিপীড়ন এ ভাঙনকে অনিবার্য করে তোলে। ১৯৭১ সালের ২২ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে প্রবাসী সরকারের মন্ত্রী ও কর্মকর্তারা ঢাকায় এসে স্বাধীন বাংলাদেশের সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি দেশে ফেরেন শেখ মুজিবুর রহমান। ১১ জানুয়ারি তিনি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। আর এর মধ্য দিয়েই শুরু হয় স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের পথচলা।

স্বাধীন বাংলাদেশের মানচিত্র

পাঠ মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশ বিজয় লাভ করে কত তারিখে? */সকল বোর্ড ২০১৯/*

২. পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের প্রধান কে ছিলেন?

৩. ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে মিত্রবাহিনীর প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কে? */রাবি ২০১৬-১৭/*

৪. পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন কে?

৫. ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ৯৩,০০০ লোক নিয়ে কে আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করেন? */সকল বোর্ড ২০২২/*

৬. শেখ মুজিবুর রহমান কবে দেশে ফেরেন? */সকল বোর্ড ২০২১/*

উত্তরের জন্য ৪১৩ পৃষ্ঠা দেখো।

খ. একক কাজ

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে আত্মসমর্পণ দলিলে যারা স্বাক্ষর করেছিলেন তাদের নাম-পরিচয় নিয়ে একটি চার্ট তৈরি করো।

গ. বাড়ির কাজ

মি. নজরুল তাঁর প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের নিয়ে জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শনে যান। সেখানে একটি গ্যালারির কিছু দৃশ্যের ওপর তাদের চোখ আটকে যায়। চিত্রে বহু যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধের খণ্ড চিত্র ধারণ করা হয়েছে। নিরীহ জনগণের ওপর জুলুম, নির্যাতন, তাদের বাড়ি-ঘর ও সহায়-সম্পত্তি ধ্বংস, পাল্টা আক্রমণ এবং অত্যাচারীদের আত্মসমর্পণের দৃশ্য দেখে তারা অত্যন্ত ব্যথিত হওয়ার পাশাপাশি আনন্দিতও হয়।

১. উদ্দীপকে উল্লেখিত চিত্রসমূহ কোন যুদ্ধকে স্মরণ করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা করো।

২. গ্যালারির শেষ প্রান্তের দৃশ্যাবলি দেখে শিক্ষার্থীদের মনে যে আনন্দানুভূতি জাগ্রত হয় তা পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

পাঠ মূল্যায়নের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর

পাঠ ১:	১. সেনাপ্রধান মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান; ২. প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান; ৩. ৩১৩ আসনের (সংরক্ষিত ১৩টি মহিলা আসনসহ); ৪. বিচারপতি আবদুস সাত্তার; ৫. ২৪টি; ৬. আওয়ামী লীগ ও পাকিস্তান পিপলস পার্টি।
পাঠ ২:	১. ৭ ডিসেম্বর; ২. ১৭ ডিসেম্বর; ৩. ১৬৯টি; ৪. ১৬৭টি; ৫. ২৯৮টি; ৬. জুলফিকার আলী ভুট্টোর 'পাকিস্তান পিপল্‌স পার্টি'।
পাঠ ৩:	১. আওয়ামী লীগ; ২. ব্যালটের; ৩. এগারো দফা ও ছয় দফার ভিত্তিতে; ৪. জাতীয়তাবাদী চেতনা; ৫. ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ; ৬. সমাজতন্ত্রের।
পাঠ ৪:	১. ১৯৭০ সালের নির্বাচন; ২. আঞ্চলিক রাজনীতির; ৩. ১৯৭০-এর নির্বাচন ৪. ১৯৭০ সালের; ৫. বাঙালি জাতীয়তাবাদের; ৬. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে।
পাঠ ৫:	১. প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান; ২. ১৯৭১ সালের ১ মার্চ; ৩. ১৯৭১ সালের ২ মার্চ; ৪. ছাত্রনেতা আ স ম আবদুর রব; ৫. ছাত্রনেতা শাজাহান সিরাজ; ৬. ২৩ মার্চ পাকিস্তানের প্রজাতন্ত্র দিবসে।
পাঠ ৬ ও ৭:	১. রেসকোর্স ময়দানে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে); ২. সোহরাওয়ার্দী উদ্যান; ৩. স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতিগ্রহণ; ৪. মুক্তিযুদ্ধের সূচনা; ৫. ইউনেস্কো; ৬. ৩০ অক্টোবর ২০১৭।
পাঠ ৮:	১. ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ; ২. অপারেশন সার্চলাইট; ৩. মেজর জেনারেল খাদিম হুসাইন রাজা এবং মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলি; ৪. কুখ্যাত সেনা কর্মকর্তা লে. জেনারেল টিক্কা খান; ৫. প্রায় ৭০০০; ৬. ঢাকার শাহবাগে অবস্থিত হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে।
পাঠ ৯ ও ১০:	১. পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী; ২. ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে; ৩. মেজর জিয়াউর রহমান; ৪. চট্টগ্রামের কালুরঘাটে; ৫. ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ; ৬. নয় মাস।
পাঠ ১১:	১. ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল; ২. ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল; ৩. আওয়ামী লীগ দলীয় চিফ হুইপ অধ্যাপক ইউসুফ আলী; ৪. মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায়; ৫. তাজউদ্দীন আহমদ; ৬. এ. এইচ. এম. কামারুজ্জামান।
পাঠ ১২ ও ১৩:	১. ১২টি; ২. দুটি, ৩. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে; ৪. লন্ডনে; ৫. রেহমান সোবহান; ৬. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী।
পাঠ ১৪:	১. ১১টি; ২. ২ নম্বর; ৩. জেনারেল আতাউল গণি ওসমানী; ৪. গণবাহিনী বা এফএফ (ফ্রিডম ফাইটার্স বা মুক্তিযোদ্ধা) ৫. তিনটি; ৬. মেজর জিয়াউর রহমান ।
পাঠ ১৫ ও ১৬:	১. প্রতিরোধ যুদ্ধ; ২. মুজিবনগর সরকার গঠিত হওয়ার পর; ৩. ১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর; ৪. ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর; ৫. বাঙালি জাতিকে মেধাহীন করা; ৬. লে. জেনারেল টিক্কা খান।
পাঠ ১৭ ও ১৮:	১. ছাত্র সমাজ; ২. দু'জন (তারামন বিবি এবং ডাক্তার সিতারা বেগম); ৩. এম আর আকতার মুকুল; ৪. চট্টগ্রাম বেতারের শিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মীরা; ৫. সাধারণ মানুষ; ৬. ত্রিশ লাখ।
পাঠ ১৯:	১. ইন্দিরা গান্ধী; ২. ভারত; ৩. ভারতের প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ ও সেতারবাদক পণ্ডিত রবি শঙ্কর; ৪. সোভিয়েত ইউনিয়ন (বর্তমান রাশিয়া); ৫. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র; ৬. প্রখ্যাত মার্কিন কবি অ্যালেন গিনসবার্গ।
পাঠ ২০:	১. ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর; ২. লে. জেনারেল নিয়াজি; ৩. লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা; ৪. গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার; ৫. লে. জেনারেল নিয়াজি; ৬. ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি।

৫ এ অধ্যায়ের প্রধান প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

সর্বজনীন ভোটাধিকার	সর্বজনীন শব্দের অর্থ সবার জন্য প্রযোজ্য। আর ভোটাধিকার শব্দের অর্থ ভোটের অধিকার। কোনো প্রার্থীকে প্রতিনিধিরূপে নির্বাচিত করার নাগরিক অধিকারকে ভোটাধিকার বলে। সুতরাং, সাংবিধানিকভাবে প্রাপ্তবয়স্ক সব নাগরিকের ভোট প্রদানের সুযোগই সর্বজনীন ভোটাধিকার। দেশের প্রাপ্তবয়স্ক জনগণ যাতে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচনে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ভোট প্রদান করতে পারে সেজন্য রাষ্ট্র বা সরকার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। বাংলাদেশে ভোটাধিকার অর্জনের জন্য ১৮ বছর পূর্ণ হতে হয়। ১৯৭০ সালে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পাকিস্তানে প্রথম অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
নির্বাচনি ইশতেহার	ইশতেহার ফারসি শব্দ। ইংরেজি Propaganda শব্দের পারিভাষিক শব্দ হিসেবে ইশতেহার শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞপ্তি, প্রচারপত্র প্রভৃতি। বিস্তারিত অর্থেও ইশতেহারের ব্যবহার রয়েছে। সাধারণত নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক দলগুলো জনগণকে প্রভাবিত করতে তাদের দলীয় কর্মসূচির যে বিস্তারিত বিবরণ জনগণের সামনে তুলে ধরে তাই নির্বাচনি ইশতেহার নামে পরিচিত। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে সংগতি রেখে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নির্বাচনি ইশতেহার তৈরি করে। যেমন— ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ২১ দফাভিত্তিক এবং ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ছয় দফা ও ছাত্রদের এগারো দফাভিত্তিক নির্বাচনি ইশতেহার ঘোষণা ও প্রচার করে বিপুল ভোটে জয় লাভ করে।
অসহযোগ আন্দোলন	সরকারের সব ধরনের কাজে অসহযোগিতা করে প্রশাসনকে অচল করে দিয়ে দাবি আদায়ের আন্দোলনকেই অসহযোগ আন্দোলন বলা হয়। অহিংস বা শান্তির নীতিতে এ আন্দোলন পরিচালিত হয়। ১৯৭১ সালে ২-২৫ মার্চ পর্যন্ত ১৯৭০ সালের নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবিতে শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে এ দেশে অসহযোগ আন্দোলন পরিচালিত হয়। আবার ১৯২০ সালে ইংরেজদের অত্যাচার-নির্যাতনের প্রতিবাদ করে এবং ভারতে স্বরাজ (স্বায়ত্তশাসন) প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। এ সময় ভারতীয়দের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে সামনে রেখে মহাত্মা গান্ধী দেশবাসীকে ব্রিটিশ সরকারের সব কাজে অসহযোগিতা করার নির্দেশ দেন।
অপারেশন সার্চলাইট	অপারেশন সার্চলাইট ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে নিরীহ, নিরস্ত্র বাঙালির ওপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর পরিচালিত একটি নৃশংস অভিযানের নাম। অপারেশন সার্চলাইটের নীলনকশা তৈরি করেন মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা এবং রাও ফরমান আলী। এ ঘৃণ্য অপারেশনে পাক হানাদার বাহিনী ঢাকা নগরীকে মৃত্যুপুরীতে পরিণত করে। রাতের অন্ধকারে শহরের নিরীহ, নিরস্ত্র ও ঘুমন্ত নাগরিকদের সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, রাজারবাগ পুলিশ লাইনস, ধানমন্ডি, কলাবাগান, মোহাম্মদপুর, মিরপুর ও দেশের অন্যত্রও একইভাবে পাক বাহিনী গণহত্যায় মেতে ওঠে। এ রাতে শুধু ঢাকায় তারা প্রায় ৭০০০ বাঙালিকে হত্যা করে। ঢাকার বাইরেও তাদের এ নৃশংস হত্যাযজ্ঞ পরিচালিত হয়।
স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র	১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর পাকিস্তান শাসকদের অধীনে বাঙালি নানা অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার হতে থাকে। অবশেষে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানিদের পরিচালিত নির্মম নৃশংস গণহত্যার প্রেক্ষিতে ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। নিরাপত্তা ও কৌশলগত কারণে ঘোষণা বার্তাটি চট্টগ্রাম শহরের অদূরে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ অভিযানের অংশ হিসেবে বেতার কেন্দ্রটির নামকরণ 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র' করা হয়। এই কেন্দ্র থেকেই ২৬শে মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সহযোগী নেতৃবৃন্দ ও বেতার কেন্দ্রের শব্দসৈনিকদের পরামর্শে ২৭শে মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে পুনরায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন তিনি। স্বাধীনতা যুদ্ধকে আইনগত ভিত্তি দেওয়ার জন্য বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল আইনের ধারাবাহিকতা বলবৎকরণ আদেশসমেত বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র সনদ জারি করে। মূলত ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পরই এদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়।

প্রবাসী সরকার

মুক্তিযুদ্ধকে সুষ্ঠু ও দক্ষতার সাথে পরিচালনার লক্ষ্যে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়। এটি ইতিহাসে 'মুজিবনগর সরকার' বা প্রবাসী সরকার নামেও পরিচিত। মুক্তিযুদ্ধকে গতিময় ও সুসংহত করার জন্য জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা একত্রিত হয়ে ১০ এপ্রিল স্বাধীন বাংলাদেশের একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করেন। এ সরকার শপথ গ্রহণ করে ১৭ এপ্রিল কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথ তলা (বর্তমানে মুজিবনগর) গ্রামে। এ সরকারের সদর দপ্তর স্থাপিত হয় কলকাতার ৮ নম্বর থিয়েটার রোডে। প্রবাসে বসে এ সরকারের কার্যক্রম পরিচালিত হয় বলে একে প্রবাসী সরকার বলা হয়। এ সরকারের ১২টি বিভাগ বা মন্ত্রণালয় ছিল। যুদ্ধকালে সামরিক ও বেসামরিক যাবতীয় প্রশাসন পরিচালনা করে মুজিবনগর সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বুদ্ধিজীবী

বুদ্ধিজীবী (Intellectual) বলতে এমন ব্যক্তিদের বোঝায় যারা সমাজ সম্পর্কিত জটিল চিন্তা, গবেষণা ও প্রভাব-বিস্তারে জড়িত থাকেন এবং সমাজের মূল সমস্যাগুলোর সমাধান করা ও সমাধানের পদ্ধতির প্রস্তাব দেন। এরা সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সংকটকালে বৌদ্ধিক পরামর্শ দানের মাধ্যমে যথার্থ দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকেন। এ সম্প্রদায়ের লোকদের বোঝাতে রাশিয়ায় উনিশ শতকের ষাটের দশকে প্রথম intelligentsia শব্দটি ব্যবহৃত হয়। বুদ্ধিজীবীরা কোনো বাস্তব বিষয়কে রক্ষা বা সমর্থন বা অন্যায়-অবিচারের প্রতিবাদ করার জন্য কোনো মতবাদকে প্রত্যাখ্যান, সৃষ্টি অথবা সম্প্রসারণ করে থাকেন। সাধারণত লেখক, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, শিল্পবোদ্ধা ব্যক্তিত্বরা বুদ্ধিজীবীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তারা বিভিন্ন গণমাধ্যমে তাদের ধ্যান-ধারণা অথবা সমালোচনাধর্মী চিন্তা-চেতনার যথার্থ প্রতিফলন প্রকাশ করে থাকেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ১৪ ডিসেম্বর বাঙালি জাতিকে মেধাশূন্য করে দিতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী রাজাকারদের সহায়তায় এদেশের অসংখ্য বুদ্ধিজীবীকে ধরে নিয়ে গিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে।

মুক্তিবাহিনী

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার কর্নেল (পরে জেনারেল) আতাউল গণি ওসমানীকে সেনাপ্রধান নিযুক্ত করে মুক্তিবাহিনী গঠন করে। এ মুক্তিবাহিনী দুই ভাগে বিভক্ত ছিল যথা- ক. নিয়মিত বাহিনী ও খ. অনিয়মিত বাহিনী।

নিয়মিত বাহিনী

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সেনাসদস্য এবং তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (ইপিআর), পুলিশ ও আনসার বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে গঠন করা হয়েছিল নিয়মিত বাহিনী। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশ সরকার নিয়মিত বাহিনী হিসেবে সেনা, বিমান ও নৌবাহিনী গড়ে তোলে।

অনিয়মিত বাহিনী

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্র, যুবক, কৃষক-শ্রমিক ও বিভিন্ন পেশাজীবীসহ সাধারণ মানুষকে নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের অনিয়মিত বাহিনী। এত বাহিনীর সরকারি নাম দেওয়া হয়েছিল গণবাহিনী বা এফএফ (ফ্রিডম ফাইটার্স বা মুক্তিযোদ্ধা)। এই মুক্তিযোদ্ধারা প্রধানত গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করতো। ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে অতর্কিতে শত্রুপক্ষের ওপর হামলা করে সরে পড়াই হলো গেরিলা যুদ্ধ। খালবিল, নদ-নদী ও বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ তৎকালীন বাংলাদেশে গেরিলা যুদ্ধ কার্যকর হয়েছিল।

শান্তি কমিটি

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে দেশে বিরাজমান পরিস্থিতিতে পাকিস্তান প্রশাসনকে সহযোগিতা করতে ঢাকা শহরের মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল টিক্কা খানের পৃষ্ঠপোষকতায় গঠিত হয় শান্তি কমিটি। এটি মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে গঠিত মুক্তিযুদ্ধবিরোধী প্রথম সংগঠন। কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির আহবায়ক ছিলেন খাজা খয়েরুদ্দীন। মহান মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতা বিরোধী অপতৎপরতায় শান্তি কমিটি দখলদার বাহিনীর সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। অত্যাচার, উৎপীড়ন, ধর্ষণ ও গণহত্যার মতো জঘন্যতম অপরাধ করে তারা পাকিস্তানি বাহিনীকে সহায়তা করেছিল।

শরণার্থী	শরণার্থী বা উদ্বাস্তু (Refugee) বলতে নিজ ভূমি ছেড়ে অথবা আশ্রয়ের সন্ধানে অন্য দেশে অস্থায়ীভাবে অবস্থানকারীদের বোঝায়। জাতিগত সহিংসতা, ধর্মীয় উগ্রতা, জাতীয়তাবোধ, রাজনৈতিক আদর্শগত কারণে সমাজবদ্ধ জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তাহীনতাই এর প্রধান কারণ। যারা শরণার্থী বা উদ্বাস্তুরূপে স্থানান্তরিত হন, তারা আশ্রয়প্রার্থী হিসেবে পরিচিত হন। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় এদেশের কয়েকশ জনগোষ্ঠী শরণার্থী হিসেবে ভারতে আশ্রয় লাভ করেন। আবার সাম্প্রতিক সময়ে জাতিগত সহিংসতার শিকার হয়ে মিয়ানমারের প্রায় পাঁচ লাখ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছেন। আফগানিস্তান, ইরাক, সিয়েরালিওন, মায়ানমার, সোমালিয়া, দক্ষিণ সুদান এবং ফিলিস্তিন বিশ্বের প্রধান শরণার্থী উৎসস্থল হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে।
সপ্তম নৌবহর	নৌবহর সাধারণত নির্দিষ্ট সাগর বা মহাসাগরের জন্য নির্ধারিত থাকে ও সেই নামেই ডাকা হয়। তবে যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীতে সংখ্যা দিয়ে এগুলোকে চিহ্নিত করা হয়, যেমন সপ্তম নৌবহর। একটি নৌবহর সাধারণত একজন এডমিরালের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়, তবে অনেক ক্ষেত্রেই ভাইস এডমিরাল বা এমনকি রিয়ার এডমিরালও এর দায়িত্বে থাকতে পারেন। সপ্তম নৌবহর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মূল ভূখণ্ডের বাইরে সবচেয়ে বড় নৌবহর। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌবহরের একটি অংশ। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে নস্যাৎ করে দিতে আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট নিক্সন 'সপ্তম নৌবহর'কে ভিয়েতনাম থেকে বঙ্গোপসাগরের দিকে রওনা হওয়ার আদেশ দেন। বঙ্গোপসাগরে 'সপ্তম নৌবহর' পাঠানোর নির্দেশ ভারতের জন্যও স্পষ্ট সতর্কবার্তা ছিল। তবে তার এ উদ্দেশ্য সফল হয়নি। বর্তমানে সপ্তম নৌবহর গ্যারিসন ঘাঁটি জাপানের ইয়োকোসুকায়। এ নৌবহরের অধীনে রয়েছে ৬০ থেকে ৭০টি যুদ্ধ জাহাজ, ২০০-৩০০টি যুদ্ধ বিমান, প্রায় ৪০,০০০ নৌসেনা।
মুক্তিযুদ্ধ	সাধারণভাবে মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে একটি জাতি বা গোষ্ঠীর মুক্তি বা স্বাধীনতা লাভের লড়াই। এ লড়াই একটি ঔপনিবেশিক শক্তিকে অথবা কোনো স্বৈরশাসককে উৎখাতের জন্য হতে পারে। এ যুদ্ধ দুটি সাধারণ বাহিনীর মধ্যকার যুদ্ধের মতো নয়। এর বিস্তৃতি ব্যাপক। যেমন— বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ শুরু হয় এবং ঐ বছর ১৬ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধে বিজয় লাভের মধ্য দিয়ে এর সমাপ্তি ঘটে। এই সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রাম ছিল বহুবিধ ঘটনা, বিরূপ পরিস্থিতি, অসম আর্থিক বন্টন ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক কর্তৃত্বের বঞ্চনাসহ গুরুতর বিষয়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্কের ক্রমাবনতির চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ। দেশের আপামর জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে মাত্র নয় মাসে দেশ স্বাধীন করে। মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহিদের আত্মত্যাগ আর ২ লাখ নারীর সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত হয় লাল-সবুজের পতাকাসমৃদ্ধ বাংলাদেশ।

▶ অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ সাল ও ঘটনা

সাল	ঘটনা
১৯৭০	ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
১৯৭১	৭ মার্চের ভাষণ, ১০ এপ্রিল মুজিনগর সরকার গঠন, মহান মুক্তিযুদ্ধ বা স্বাধীনতা যুদ্ধ ও স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।
৭ মার্চ ১৯৭১	পাকিস্তানি শাসকদের ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে শেখ মুজিব ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক যুগান্তকারী ঐতিহাসিক ভাষণ দেন, যা ইতিহাসে ৭ মার্চের ভাষণ নামে পরিচিত। এ ভাষণকে জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠন ইউনেস্কো ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর 'বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।
২৫ মার্চ ১৯৭১	১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের নিরীহ বাঙালির ওপর নৃশংস গণহত্যা চালায়, যা পৃথিবীর ইতিহাসে কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সূচনা করে। ওই রাতে পাকবাহিনী নিরস্ত্র নিরীহ-স্বাধীনতাকামী বাঙালি জনসাধারণের ওপর গুলি চালিয়ে নির্বিচারে হত্যা করে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এ হত্যাযজ্ঞের নাম দেয় 'অপারেশন সার্চলাইট'।
১০ এপ্রিল ১৯৭১	মুক্তিযুদ্ধকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য ১০ এপ্রিল গঠিত হয় বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার, ১৭ এপ্রিল মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথ তলায় অস্থায়ী সরকারের শপথ পাঠ অনুষ্ঠিত হয়। শেখ মুজিবকে ঐ সরকারের প্রধান করা হয়। তার নামানুসারে বৈদ্যনাথতলার নাম হয় মুজিবনগর।
২৬ মার্চ ১৯৭১-১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১	১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাঙালির মহান মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান লাভ করে।

সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

ক. জ্ঞানমূলক

■ ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন

প্রশ্ন-১. আইনকাঠামো আদেশ-এর রূপরেখা কে তুলে ধরেন?

উত্তর: আইনগত কাঠামো আদেশ-এর রূপরেখা তুলে ধরেন ইয়াহিয়া খান।

প্রশ্ন-২. ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় কত সালে? *[সকল বোর্ড ২০১৮]*

উত্তর: ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭০ সালে।

প্রশ্ন-৩. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে কয়টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে?

উত্তর: ১৯৭০ সালের নির্বাচনে ২৪টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে।

প্রশ্ন-৪. ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচন কত তারিখে অনুষ্ঠিত হয়?

উত্তর: ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন ৭ ও ১৭ ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন-৫. ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতেহারের ভিত্তি কী?

উত্তর: ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতেহারের ভিত্তি ছিল বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা এবং ছাত্রদের ১১ দফা দাবি।

প্রশ্ন-৬. ১৯৭০ সালে পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা ছিলেন কে?

উত্তর: ১৯৭০ সালে পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা ছিলেন জুলফিকার আলী ভুট্টো।

প্রশ্ন-৭. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে কোন দল বিজয়ী হয়? *[ম. বো. ২০২৩; সকল বোর্ড ২০২১]*

উত্তর: ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয়।

প্রশ্ন-৮. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনি প্রতীক কী ছিল?

উত্তর: ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনি প্রতীক ছিল নৌকা।

প্রশ্ন-৯. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কয়টি আসন লাভ করে?

উত্তর: ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে ১৬৭টি এবং প্রাদেশিক পরিষদে ২৯৮টি আসন লাভ করে।

প্রশ্ন-১০. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাঙালির কীসের বিজয় হয়?

উত্তর: ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনার বিজয় হয়।

প্রশ্ন-১১. কত তারিখে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়?

উত্তর: ১৯৭১ সালের ২ মার্চ স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়।

প্রশ্ন-১২. কোন নির্বাচন বাঙালির স্বাধীনতার বার্তাবাহক ছিল?

উত্তর: ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন বাঙালির স্বাধীনতার বার্তাবাহক ছিল।

■ ৭ মার্চের ভাষণ: বিষয়বস্তু ও তাৎপর্য

প্রশ্ন-১৩. পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে কে 'অসহযোগ আন্দোলন'-এর ডাক দেন? *[সকল বোর্ড ২০১৯]*

উত্তর: শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে 'অসহযোগ আন্দোলন'-এর ডাক দেন।

প্রশ্ন-১৪. বাঙালির অসহযোগ আন্দোলন চলে কত তারিখ পর্যন্ত?

উত্তর: ১৯৭১ সালের ২-২৫ মার্চ পর্যন্ত বাঙালির অসহযোগ আন্দোলন চলে।

প্রশ্ন-১৫. ৭ মার্চের ভাষণে শেখ মুজিবুর রহমান কীসের আহ্বান জানিয়েছেন?

উত্তর: ৭ মার্চের ভাষণে শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালিকে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রশ্ন-১৬. শেখ মুজিবুর রহমান কত তারিখে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন?

উত্তর: শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন।

প্রশ্ন-১৭. ৭ মার্চের ভাষণ দেওয়া হয়েছিল কোথায়?

উত্তর: ৭ মার্চের ভাষণ দেওয়া হয়েছিল ঢাকার রমনার রেসকোর্স ময়দানে।

প্রশ্ন-১৮. রেসকোর্স ময়দানের বর্তমান নাম কী?

উত্তর: রেসকোর্স ময়দানের বর্তমান নাম সোহরাওয়ার্দী উদ্যান।

প্রশ্ন-১৯. স্বাধীন বাংলাদেশের পাতাকা প্রথম উত্তোলন করেন কে?

উত্তর: ১৯৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে ডাকসুর ভিপি আ স ম আবদুর রব স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন।

প্রশ্ন-২০. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ভবনে প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়?

উত্তর: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা ভবনে প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়।

প্রশ্ন-২১. বাঙালির অসহযোগ আন্দোলনের সাফল্যে কোনটি ভূমিকা রেখেছিল?

উত্তর: বাঙালির অসহযোগ আন্দোলনের সাফল্যে ৭ মার্চের ভাষণ ভূমিকা রেখেছিল।

প্রশ্ন-২২. ইউনেস্কো কত তারিখে ৭ মার্চের ভাষণকে 'বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়?

উত্তর: ইউনেস্কো ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর ৭ মার্চের ভাষণকে 'বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

■ ২৫ মার্চের কালরাতের গণহত্যা ও স্বাধীনতা ঘোষণা

প্রশ্ন-২৩. অপারেশন সার্চলাইট কখন শুরু হয়?

উত্তর: অপারেশন সার্চলাইট শুরু হয় ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে।

প্রশ্ন-২৪. বাঙালির ওপর অপারেশন সার্চলাইট পরিচালনা করে কারা?

উত্তর: বাঙালির ওপর অপারেশন সার্চলাইট পরিচালনা করে পাকিস্তান সেনাবাহিনী।

প্রশ্ন-২৫. ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতের গণহত্যার নীল নকশা তৈরি করে কারা?

উত্তর ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতের গণহত্যার নীল নকশা তৈরি করেন মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা এবং রাও ফরমান আলী।

প্রশ্ন-২৬. অপারেশন সার্চলাইট কী?

উত্তর: ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পশ্চিম পাকিস্তানের হানাদার বাহিনী বাঙালির ওপর যে নৃশংস হত্যাযজ্ঞ চালায় তাই 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে পরিচিত।

প্রশ্ন-২৭. বাঙালির ইতিহাসে কোন রাত কালরাত হিসেবে চিহ্নিত?

উত্তর: ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত বাঙালির ইতিহাসে কালরাত হিসেবে চিহ্নিত।

প্রশ্ন-২৮. বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস কত তারিখে পালন করা হয়? *[ম. বো., দি. বো. ২০২৫]*

উত্তর: ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়।

■ মুজিবনগর সরকার ও মহান মুক্তিযুদ্ধ

প্রশ্ন-২৯. অস্থায়ী বা মুজিবনগর সরকার কখন গঠিত হয়? *[ম. বো. ২০২৩]*

উত্তর: ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল অস্থায়ী বা মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়েছিল।

প্রশ্ন-৩০. প্রবাসে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার কী নামে পরিচিত ছিল?

উত্তর: প্রবাসে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার 'মুজিবনগর সরকার' নামে পরিচিত ছিল।

প্রশ্ন-৩১. বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন?

উত্তর: বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের রাষ্ট্রপতি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

প্রশ্ন-৩২. মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রীর নাম কী ছিল? *[ম. বো. ২০২৩; সকল বোর্ড ২০১৮]*

উত্তর: মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রীর নাম তাজউদ্দীন আহমদ।

প্রশ্ন-৩৩. মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন? *[ঢা. বো., রা. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫]*

উত্তর: মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি ছিলেন কর্নেল (পরে জেনারেল) মুহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানী।

প্রশ্ন-৩৪. মুজিবনগর দিবস কত তারিখে?

উত্তর: মুজিবনগর দিবস ১৭ এপ্রিল।

প্রশ্ন-৩৫. মুজিবনগর সরকারের শপথবাক্য কে পাঠ করান?

উত্তর: মুজিবনগর সরকারের শপথবাক্য পাঠ করান অধ্যাপক ইউসুফ আলী।

প্রশ্ন-৩৬. অস্থায়ী সরকারের মন্ত্রিসভায় অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন কে?

উত্তর: অস্থায়ী সরকারের মন্ত্রিসভায় অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম।

প্রশ্ন-৩৭. বর্তমান মুজিবনগরের পূর্বনাম কী ছিল?

উত্তর: বর্তমান মুজিবনগরের পূর্বনাম ছিল বৈদ্যনাথতলা।

প্রশ্ন-৩৮. কাকে বাংলাদেশের সেনাপ্রধান নিযুক্ত করে মুক্তিবাহিনী গঠন করা হয়?

উত্তর: কর্নেল (পরে জেনারেল) আতাউল গণি ওসমানীকে বাংলাদেশের সেনাপ্রধান নিযুক্ত করে মুক্তিবাহিনী গঠন করা হয়।

প্রশ্ন-৩৯. মুক্তিযুদ্ধকে জোরদারের লক্ষ্যে সমগ্র রণাঙ্গণকে কয়টি সেক্টরে ভাগ করা হয়? *[ঢা. বো., রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৩; সি. বো., ব. বো. ২০২১; ঢা. বো., রা. বো., চ. বো. ২০১৭]*

উত্তর: মুক্তিযুদ্ধকে জোরদারের লক্ষ্যে সমগ্র রণাঙ্গণকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়।

প্রশ্ন-৪০. গেরিলা (Guerrilla) শব্দটি কোন শব্দ থেকে এসেছে?

উত্তর: গেরিলা (Guerrilla) শব্দটি স্প্যানিশ শব্দ Guerra (গেরার) থেকে এসেছে।

প্রশ্ন-৪১. অস্থায়ী মুজিবনগর সরকারের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনে মোট কয়টি মন্ত্রণালয় ছিল? *[সি. বো., ব. বো. ২০২১]*

উত্তর: অস্থায়ী মুজিবনগর সরকারের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনে মোট ১২টি মন্ত্রণালয় ছিল।

প্রশ্ন-৪২. বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে কোন সরকার নেতৃত্ব দিয়েছে?

উত্তর: বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর সরকার নেতৃত্ব দিয়েছে।

প্রশ্ন-৪৩. ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় নোয়াখালী কত নম্বর সেক্টরের অধীনে ছিল?

উত্তর: ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় নোয়াখালী ২ নম্বর সেক্টরের অধীনে ছিল।

প্রশ্ন-৪৪. বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে জেড ফোর্সের প্রধান কে ছিলেন?

উত্তর: বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে জেড ফোর্সের প্রধান ছিলেন মেজর জিয়াউর রহমান।

প্রশ্ন-৪৫. বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় কখন?

উত্তর: ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়।

প্রশ্ন-৪৬. মুক্তিযুদ্ধের সময় গঠিত তহিবল বাংলাদেশ ফান্ডের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য কে ছিলেন?

উত্তর: মুক্তিযুদ্ধের সময় গঠিত তহিবল বাংলাদেশ ফান্ডের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ছিলেন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী।

■ মহান মুক্তিযুদ্ধে- মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা ও বিভিন্ন গোষ্ঠী ও দেশের ভূমিকা

প্রশ্ন-৪৭. মুক্তিযুদ্ধের নিয়ামক শক্তি ছিল কারা?

উত্তর: মুক্তিযুদ্ধের নিয়ামক শক্তি ছিল সাধারণ মানুষ।

প্রশ্ন-৪৮. বাঙালির সব আন্দোলনে কারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে?

উত্তর: বাঙালির সব আন্দোলনে ছাত্ররা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

প্রশ্ন-৪৯. 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' কী?

উত্তর: ১৯৭১ সালের ১ আগস্ট বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের জন্য তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্য নিউইয়র্ক শহরে আয়োজিত সংগীতানুষ্ঠানই কনর্সাট ফর বাংলাদেশ।

প্রশ্ন-৫০. মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী 'যৌথ কমান্ড' গঠন করেছিল কবে?

উত্তর: মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী 'যৌথ কমান্ড' গঠন করেছিল ১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর।

প্রশ্ন-৫১. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের যাত্রা শুরু হয় কোথায়?

উত্তর: স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের যাত্রা শুরু হয় চট্টগ্রামের কালুরঘাটে অবস্থিত বেতার উপকেন্দ্রে।

প্রশ্ন-৫২. মুক্তিযুদ্ধের সময় 'চরমপত্র' কে পাঠ করতেন?

উত্তর: মুক্তিযুদ্ধের সময় 'চরমপত্র' পাঠ করতেন এম আর আখতার মুকুল।

প্রশ্ন-৫৩. কার প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ বিমানবাহিনী গঠিত হয়?

উত্তর: গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকারের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ বিমানবাহিনী গঠিত হয়।

প্রশ্ন-৫৪. কত সালে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়? *[সকল বোর্ড ২০১৯]*

উত্তর: ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন-৫৫. কোন দেশ সর্বপ্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়?
[ঢা. বো., রা. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫; সকল বোর্ড ২০১৬]

উত্তর: ভুটান বাংলাদেশকে সর্বপ্রথম স্বীকৃতি দেয়।

প্রশ্ন-৫৬. ভারত সরকার কবে বাংলাদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়? *[সকল বোর্ড ২০১৯]*

উত্তর: ভারত সরকার বাংলাদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয় ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১।

■ মহান মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতাবিরোধীদের অপতৎপরতা

প্রশ্ন-৫৭. মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতাকারী একটি রাজনৈতিক দলের নাম লেখো। *[ঢা. বো., য. বো., রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো. ও য. বো. ২০২১]*

উত্তর: মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতাকারী একটি রাজনৈতিক দলের নাম হলো নেজামে ইসলামী।

প্রশ্ন-৫৮. কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির আহবায়ক কে ছিলেন?

উত্তর: কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির আহবায়ক ছিলেন খাজা খয়েরুদ্দিন।

প্রশ্ন-৫৯. পাকিস্তানি বাহিনী বাংলাদেশকে মেধাশূন্য করার উদ্দেশ্যে নির্মম হত্যাকাণ্ড কবে ঘটায়?

উত্তর: পাকিস্তানি বাহিনী বাংলাদেশকে মেধাশূন্য করার উদ্দেশ্যে নির্মম হত্যাকাণ্ড ঘটায় ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর।

প্রশ্ন-৬০. বুদ্ধিজীবী দিবস কবে পালিত হয়?

উত্তর: বুদ্ধিজীবী দিবস ১৪ ডিসেম্বর পালিত হয়।

■ স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়

প্রশ্ন-৬১. বাংলাদেশের জাতীয় দিবস কত তারিখে পালিত হয়?
[ঢা. বো., য. বো., দি. বো., চ. বো., সি. বো., ব. বো. ২০২২]

উত্তর: বাংলাদেশের জাতীয় দিবস ২৬ মার্চ পালিত হয়।

প্রশ্ন-৬২. বাংলাদেশ কবে বিজয় লাভ করে?

উত্তর: ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ বিজয় লাভ করে।

প্রশ্ন-৬৩. জেনারেল নিয়াজি কতজন সদস্যসহ আত্মসমর্পণ করেন?

উত্তর: জেনারেল নিয়াজি প্রায় ৯৩ হাজার সদস্যসহ আত্মসমর্পণ করেন।

প্রশ্ন-৬৪. প্রবাসী সরকারের মন্ত্রী ও কর্মকর্তারা কখন স্বাধীন বাংলাদেশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন?

উত্তর: প্রবাসী সরকারের মন্ত্রী ও কর্মকর্তারা ১৯৭১ সালের ২২ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন-৬৫. বাংলাদেশের সাংবিধানিক নাম কী?
[ঢা. বো., য. বো., দি. বো., চ. বো., সি. বো., ব. বো. ২০২২]

উত্তর: বাংলাদেশের সাংবিধানিক নাম 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ'।

প্রশ্ন-৬৬. মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বোচ্চ খেতাব কী?
[য. বো., দি. বো. ২০২৫]

উত্তর: মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বোচ্চ খেতাব বীরশ্রেষ্ঠ।

খ. অনুধাবনমূলক

প্রশ্ন-১. 'আইনগত কাঠামো আদেশ' কী? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: পাকিস্তানের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের জন্য ১৯৭০ সালের ৩০ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খান যে আদেশ জারি করেন তাই 'আইনগত কাঠামো আদেশ' নামে পরিচিত।

এই আদেশে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের গঠনপ্রণালি ও নির্বাচন বিষয়ক বিস্তারিত নির্দেশনা দেওয়া হয়। এ আদেশে 'এক ব্যক্তি এক ভোট' নীতিতে নির্বাচন হবে বলে ঘোষণা দেওয়া হয়। জাতীয় পরিষদের আসন সংখ্যা নির্ধারণ করা হয় ৩১৩টি (১৩টি সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ)। পূর্ব পাকিস্তানে আসন বণ্টন করা হয় ১৬৯টি। আদেশে বলা হয় যে, জাতীয় পরিষদ প্রথম অধিবেশনের দিন হতে ১২০ দিনের মধ্যে সংবিধান প্রণয়ন করবে। যদি তা করতে ব্যর্থ হয়, তবে পরিষদ বাতিল হয়ে যাবে।

প্রশ্ন-২. সর্বজনীন ভোটাধিকার বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: সাংবিধানিকভাবে প্রাপ্তবয়স্ক সকল নাগরিকের ভোট প্রদানের সুযোগকে সার্বজনীন ভোটাধিকার বলে।

দেশের প্রাপ্তবয়স্ক জনগণ যাতে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচনে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ভোট প্রদান করতে পারে সেজন্য রাষ্ট্র বা সরকার কর্তৃক সুযোগ দানকেই সর্বজনীন ভোটাধিকার বলে। বাংলাদেশে ভোটাধিকার অর্জনের জন্য ১৮ বছর পূর্ণ হতে হয়।

প্রশ্ন-৩. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়ের কারণ সংক্ষেপে লেখো। *[ঢা. বো., রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব.বো. ২০২৩; রা. বো., কু. বো., য. বো. ২০২২; সকল বোর্ড ২০১৯, ২০১৫]*

উত্তর: ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়ের প্রধান কারণ ছিল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্য ও নির্যাতন থেকে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে মুক্ত করার অঙ্গীকার।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ নানাভাবে শোষিত ও নির্যাতিত হতে থাকে। শুরু থেকেই আওয়ামী লীগ তাদেরকে এ নির্যাতন থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করে। অবশেষে ১৯৭০-এর নির্বাচনে ৬ দফা ও ছাত্র সমাজের ১১ দফা দাবির ভিত্তিতে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশ নেয় ফলে ১৯৭০ সালের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। এই নির্বাচনে হেরে যাওয়ার মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকেরা পূর্ব পাকিস্তান শাসনের বৈধতা হারায়।

প্রশ্ন-৪. ইয়াহিয়া সরকার শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেনি কেন? *[সি. বো. ২০২৩; ঢা. বো., ম. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো. ২০২১]*

উত্তর: বাঙালিদেরকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য ইয়াহিয়া সরকার শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেনি।

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বাঙালির আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা। কিন্তু স্বৈরাচারী সরকার তাদের এ দাবিকে অবৈধ বলে প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় বাঙালির স্বায়ত্তশাসন দাবির বৈধতা প্রমাণ করে। বাঙালি তাদের নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে ভেবে ইয়াহিয়া সরকার উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। এ অধিকার যাতে প্রতিষ্ঠিত না হয় এ কারণেই ইয়াহিয়া ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা শুরু করে।

প্রশ্ন-৫. ১৯৭০ সালের নির্বাচনকে স্বাধীনতার বার্তাবাহক বলা হয় কেন?

উত্তর: ১৯৭০ সালের নির্বাচন স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পথকে প্রশস্ত করেছিল বলে একে স্বাধীনতার বার্তাবাহক বলা হয়।

১৯৭০ সালের নির্বাচন ছিল ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের পতন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার বার্তাবাহক। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের অপরিসীম ভূমিকা ও প্রভাব ছিল। এ নির্বাচনের ফলে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকেরা পূর্ব পাকিস্তান শাসনের বৈধতা হারায়। উদ্বিগ্ন হয়ে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী আওয়ামী লীগের নির্বাচনি বিজয়কে নস্যাতের চক্রান্ত শুরু করে। বাঙালিরা শান্তিপূর্ণ উপায়ে সংকট সমাধানের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। এমন প্রেক্ষাপটেই ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালি জাতির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাঙালি জাতিও রুখে দাঁড়ায় এবং নয়মাস যুদ্ধ করে ১৬ ডিসেম্বর অর্জন করে স্বাধীন বাংলাদেশ। সত্তরের নির্বাচন এভাবেই বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পথ তৈরি করে।

প্রশ্ন-৬. ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে ধারণা দাও।

উত্তর: ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ পল্টনে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আয়োজিত এক সমাবেশে শেখ মুজিবুর রহমান সরকারের সব কাজে অসহযোগিতা করে অহিংস বা শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলনের ডাক দেন। তাই ইতিহাসে অসহযোগ আন্দোলন নামে পরিচিত।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে ইয়াহিয়া খান নানা টালবাহানা শুরু করে। তিনি আওয়ামী লীগের চাপে ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করলেও ১ মার্চ অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। এ ঘোষণার প্রতিবাদে 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' ৩ মার্চ পল্টনে ছাত্র জনতার এক সমাবেশ করে। এ জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

প্রশ্ন-৭. কোন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঐতিহাসিক ভাষণ দেন? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে যখন রাজনৈতিক অঙ্গান উত্তপ্ত সেই প্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের সুদীর্ঘ পটভূমি বিদ্যমান। ১৯৪৭ সাল থেকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা কুক্ষিগত করে পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করতে থাকে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাঙালিদের প্রতিনিধি বিজয়ী হলেও সামরিক সরকার ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখার লক্ষ্যে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেনি। ফলে পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গানে এক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। এরকম উদ্বেগ, উত্তেজনার মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে ভাষণ দেন, যা ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে।

প্রশ্ন-৮. ৭ মার্চের ভাষণ বাঙালি জাতির ইতিহাসে অবিস্মরণীয় কেন? ব্যাখ্যা করো। *[রা. বো., কু. বো., য. বো. ২০২২; সি. বো., ব. বো. ২০২১; ঢা. বো., রা. বো., চ. বো. ১৭]*

উত্তর: ৭ মার্চের ভাষণে মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছিলো তাই এটি বাঙালি জাতির ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

১৯৭১ সালে ৭ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণের পরদিন থেকে সমগ্র দেশে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়। তার নির্দেশনা অনুযায়ী দেশের স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, কল-কারখানা সব বন্ধ হয়ে যায়। সমগ্র জনতা বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানি বাহিনীর সদস্যদের প্রতিহত করতে থাকে। মূলত তার এ ভাষণে ছিল মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান। এ আহ্বানে সাড়া দিয়েই মুক্তিকামী বাঙালি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এজন্য ৭ মার্চের ভাষণ বাঙালি জাতির ইতিহাসে অবিস্মরণীয়।

প্রশ্ন-৯. অপারেশন সার্চলাইট কী? ব্যাখ্যা করো।

[সি. বো., ব. বো. ২০২১; সকল বোর্ড ২০১৮]

উত্তর: ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরীহ, নিরস্ত্র বাঙালির ওপর যে হত্যাযজ্ঞ চালায় তা অপারেশন সার্চলাইট নামে পরিচিত।

অপারেশন সার্চলাইটের নীল নকশা তৈরি করেন মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা এবং রাও ফরমান আলী। এ ঘৃণ্য অপারেশনে পাক হানাদার বাহিনী ঢাকা নগরীকে মৃত্যুপুরীতে পরিণত করে। রাতের অন্ধকারে শহরের নিরীহ, নিরস্ত্র ও ঘুমন্ত নাগরিকদের সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, রাজারবাগ পুলিশ লাইনস, ধানমণ্ডি, কলাবাগান, মোহাম্মদপুর, মিরপুর ও দেশের অন্যত্রও একইভাবে পাক বাহিনী গণহত্যায় মেতে ওঠে। এ রাতে তারা শুধু ঢাকায় প্রায় ৭০০০ বাঙালিকে হত্যা করে। ঢাকার বাইরেও তাদের এ নৃশংস হত্যাযজ্ঞ পরিচালিত হয়।

প্রশ্ন-১০. ২৫ মার্চকে কালরাত বলা হয় কেন?

[ঢা. বো., রা. বো., চ. বো. ২০১৭]

উত্তর: ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরীহ, নিরস্ত্র বাঙালির ওপর নৃশংস হত্যাযজ্ঞ চালায়। তাই এ রাতটি কালরাত হিসেবে পরিচিত।

কালরাতে হত্যাযজ্ঞের নীলনকশা তৈরি করেন মেজর জেনারেল খাদিম হুসাইন রাজা এবং রাও ফরমান আলী। ২৫ মার্চ রাতের শেষ প্রহরে অপারেশন শুরু হয়। এ ঘৃণ্য অপারেশনে পাক হানাদার বাহিনী ঢাকা নগরীকে মৃত্যুপুরীতে পরিণত করে। রাতের অন্ধকারে শহরের নিরীহ, নিরস্ত্র ও ঘুমন্ত নাগরিকদের সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, রাজারবাগ পুলিশ লাইনস, ধানমণ্ডি, কলাবাগান, মোহাম্মদপুর, মিরপুর ও দেশের অন্যত্রও একইভাবে পাক বাহিনী গণহত্যায় মেতে ওঠে। এ রাতে শুধু ঢাকায় তারা প্রায় ৭০০০ বাঙালিকে হত্যা করে।

প্রশ্ন-১১. 'অপারেশন সার্চলাইট'- এর ঘটনা মুক্তিযুদ্ধের সূচনা করেছিল— ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের অপারেশন সার্চলাইটের নৃশংস হত্যাযজ্ঞ মুক্তিযুদ্ধের সূচনা করেছিল।

১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের পর রাজনৈতিক সংকট আরো তীব্র হয়। অন্যদিকে সংকট নিরসনের চেষ্টা না করে ইয়াহিয়া খান আলোচনার নামে কালক্ষেপণ করে পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে তিনি টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানে গণহত্যা পরিচালনার নির্দেশ দেয়। নির্দেশ মোতাবেক টিক্কা খান অপারেশন সার্চলাইট নামে খ্যাত অভিযানের মাধ্যমে ২৫শে মার্চ রাতে পূর্ব পাকিস্তানের নিরস্ত্র মানুষের ওপর নৃশংস হত্যাযজ্ঞ চালায়। এ ঘটনার প্রতিবাদে ২৬ মার্চ থেকে বাঙালির মহান মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়।

প্রশ্ন-১২. কোন প্রেক্ষিতে এদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছিল? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ বাঙালির ওপর পাকিস্তানি শাসকদের পরিচালিত নৃশংস হত্যাযজ্ঞের প্রেক্ষিতে ২৬ মার্চ এদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালির ওপর নানা অত্যাচার নির্যাতন করে। বাঙালির ন্যায়সংগত অধিকারকে ভূলুণ্ঠিত করে তারা বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করে। তাদের এ অন্যায়ের প্রতিবাদে বাঙালি বিভিন্ন সময়ে প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তোলে। কিন্তু পাকিস্তানিরা তাদের সিদ্ধান্তে অনড় থাকে। অবশেষে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিজয় অর্জন করেও যখন বাঙালি সরকার গঠনে ব্যর্থ হয়, তখন শেখ মুজিবের আহবানে তারা অসহযোগ আন্দোলন গড়ে তোলে। বাঙালির এ আন্দোলনকে নস্যাৎ করতে তারা ২৫ মার্চ রাতে বাঙালির ওপর গণহত্যা চালায়। এ প্রেক্ষিতে ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়।

প্রশ্ন-১৩. মুজিবনগর সরকার কেন গঠিত হয়? ব্যাখ্যা করো।

[সকল বোর্ড ২০১৮, ২০১৬]

উত্তর: মুক্তিযুদ্ধকে সুষ্ঠু ও দক্ষতার সাথে পরিচালনা করে দ্রুত দেশকে পাকিস্তানি হানাদারদের কবল থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয়। মুক্তিযুদ্ধকে গতিময় ও সুসংহত করা, ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী লক্ষ লক্ষ বাঙালির দেখাশোনা এবং বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সপক্ষে জনমত তৈরি করা ছিল মুজিবনগর সরকার গঠনের অন্যতম উদ্দেশ্য। এছাড়া মুক্তাঞ্চলে প্রশাসন পরিচালনা করার বিষয়টিও এ সরকার গঠনের পেছনে কারণ হিসেবে কাজ করেছিল।

প্রশ্ন-১৪. ব্রিগেড ফোর্স কী? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়, যা ব্রিগেড ফোর্স নামে পরিচিত।

মুক্তিযুদ্ধের সময় ১১টি সেক্টর ও বেশকিছু সাব সেক্টর ছাড়াও সারা বাংলাদেশকে তিনটি ব্রিগেড ফোর্সে বিভক্ত করা হয়। মেজর জিয়াউর রহমান 'জেড ফোর্সের', মেজর কে এম শফিউল্লাহ 'এস ফোর্সের' এবং মেজর খালেদ মোশাররফ 'কে ফোর্সের' দায়িত্ব পালন করেন।

প্রশ্ন-১৫. মহান মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: বাঙালির মহান মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরপরই মুজিবনগর সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বেতার সম্প্রচার কেন্দ্রকে বোঝায়। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রটি চট্টগ্রামের কালুরঘাট কেন্দ্র থেকে প্রাথমিক যাত্রা শুরু করে। তাছাড়া স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সংবাদ, দেশাত্মবোধক গান, মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা দেশ ও জাতির সামনে তুলে ধরে। এভাবে এই বেতার কেন্দ্র সাধারণ মানুষকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত করে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস জুগিয়ে বিজয়ের পথ সুগম করে।

প্রশ্ন-১৬. মহান মুক্তিযুদ্ধে রাজাকার, আল-বদর বাহিনীর ভূমিকা কী ছিল? ব্যাখ্যা করো। */য. বো. ২০২৩; ঢা. বো., য. বো., দি. বো., চ. বো., সি. বো., ব. বো. ২০২২/*

উত্তর: ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে রাজাকার, আল-বদর বাহিনীর কার্যক্রম ছিল অমানবিক, বর্বরোচিত এবং ঘৃণ্য।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন এদেশের বিভিন্ন স্বাধীনতা বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্যরা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সহযোগীর ভূমিকা পালন করে। তারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সহায়তায় স্বাধীনতাকামী মানুষের বাড়ি-ঘরে অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, এমনকি ধর্ষণ ও হত্যার মতো মানবতাবিরোধী অপরাধে লিপ্ত হয়। রাজাকার, আল-বদর ও আল-শামস নামক সশস্ত্র স্বাধীনতাবিরোধী গোষ্ঠীসমূহ মুক্তিযুদ্ধের সময় ভয়াবহ অপরাধ করে। তারা মুক্তিযোদ্ধা, সংখ্যালঘু ও বুদ্ধিজীবীদের বিশেষভাবে টার্গেটে পরিণত করে। সর্বোপরি, বাংলাদেশ নামক স্বাধীন রাষ্ট্র যেন কোনোভাবে আত্মপ্রকাশ করতে না পারে, স্বাধীনতা বিরোধী শক্তিরা সেজন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা চালায়।

প্রশ্ন-১৭. 'শান্তি কমিটি' বলতে কী বোঝ?

উত্তর: সর্বপ্রথম মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী যে সংগঠনটির সৃষ্টি হয় তা হলো শান্তি কমিটি।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে দেশে বিরাজমান পরিস্থিতিতে পাকিস্তান প্রশাসনকে সহযোগিতা করতে ঢাকা শহরের মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল টিক্কা খানের পৃষ্ঠপোষকতায় গঠিত হয় শান্তি কমিটি। মহান মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীনতা বিরোধী অপতৎপরতায় শান্তি কমিটি দখলদার বাহিনীর সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। অত্যাচার, উৎপীড়ন, ধর্ষণ ও গণহত্যার মতো জঘন্যতম অপরাধ করে তারা পাকিস্তানি বাহিনীকে সহায়তা করেছিল।

প্রশ্ন-১৮. মুক্তিযুদ্ধের অনিয়মিত বাহিনী বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: মুক্তিযুদ্ধের অনিয়মিত বাহিনী বলতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্র, যুবক, বিভিন্ন পেশাজীবী ও কৃষক-শ্রমিক সাধারণ জনতার সমন্বয়ে গড়ে তোলা বাহিনীকে বোঝায়।

অনিয়মিত বাহিনীর সরকারি নামকরণ করা হয়েছিল 'ফ্রিডম ফাইটার্স' বা 'গণবাহিনী'। এই বাহিনীর সদস্যদের দুই সপ্তাহের প্রশিক্ষণ প্রদানের পর একজন কমান্ডারের অধীনে বিভিন্ন এলাকায় যুদ্ধের জন্য প্রেরণ করা হতো। তারা গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করত বলে তাদেরকে গেরিলা বাহিনীও বলা হতো।

প্রশ্ন-১৯. গেরিলা যুদ্ধ কী? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: শত্রু বাহিনীর ওপর অতর্কিত হামলা চালানোর যুদ্ধকৌশলই গেরিলা যুদ্ধ নামে পরিচিত।

গেরিলা যুদ্ধে সৈনিকেরা অভ্যন্তরীণ রণাঙ্গনে বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে সংগঠিত হয়ে থাকে। এ ধরনের যুদ্ধে আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য যোদ্ধারা নানা কৌশলে শত্রুবাহিনীর ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। হামলা করার পূর্বপর্যন্ত তারা শত্রু বাহিনীকে নিজেদের অবস্থান টের পেতে দেয় না। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করে পাকিস্তানিদের বিপর্যস্ত করে তুলেছিল।

প্রশ্ন-২০. মহান মুক্তিযুদ্ধে জেড ফোর্সের ভূমিকা কী ছিল? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: স্বাধীনতা যুদ্ধে 'জেড ফোর্স' বিশেষ অবদান রেখেছে।

মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের প্রথম ব্রিগেড 'জেড ফোর্স' গঠিত হয় একাত্তরের ৭ই জুলাই। এই ফোর্সে তিনটি নিয়মিত পদাতিক বাহিনী ছিল— প্রথম ইস্টবেঙ্গল, তৃতীয় ইস্টবেঙ্গল এবং অষ্টম ইস্টবেঙ্গল ব্যাটালিয়ন। স্বাধীনতার প্রেরণায় উজ্জীবিত দেশপ্রেমী মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত করতে অসামান্য ভূমিকা রাখে জেড ফোর্স। ৭ জুলাই থেকে ২৮ জুলাই পর্যন্ত পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে সরাসরি প্রতিরোধ যুদ্ধকে জোরদার করতে প্রায় সারাদিন মেজর জিয়াউর রহমান রণকৌশল শিক্ষা দেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে পাক সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধে নজিরবিহীন সাফল্য অর্জন করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে জেড ফোর্স। ১০ ডিসেম্বর জেড ফোর্স সিলেটে আক্রমণ শুরু করে এবং ১৪ তারিখ সিলেটে প্রবেশ করে। ১৫ ডিসেম্বর পাক বাহিনীর ১২৫ জন অফিসার ও ৭০০ জন সৈন্য জেড ফোর্সের অধিনায়ক জিয়াউর রহমানের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

প্রশ্ন-২১. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে গণযুদ্ধ বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: মুক্তিযুদ্ধে এদেশের সব শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করে, তাই এটিকে গণযুদ্ধ বলা হয়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কৃষক, শ্রমিক, কারিগর, ছাত্র, শিক্ষক, যুবক, নারী, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, চিকিৎসক, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীসহ সর্বশ্রেণির বাঙালি জনতা অংশ নেয়। তারা সব ধরনের বৈষম্য ভুলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করে বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। এ কারণেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে গণযুদ্ধ বলা হয়।

প্রশ্ন-২২. প্রতিরোধ যুদ্ধ কী? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: প্রাথমিকভাবে পূর্ব প্রস্তুতি ও সাংগঠনিক দিক নির্দেশনা ও তৎপরতা ছাড়াই হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম তাই প্রতিরোধ যুদ্ধ হিসেবে পরিচিত।

পাকিস্তানি বাহিনীর অন্যায় নিপীড়ন, নির্যাতনের বিরুদ্ধে এবং প্রবল দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হয়ে বাঙালি যোদ্ধারা সাধারণ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ট্যাঙ্ক ও ভারী কামানসহ অত্যাধুনিক অস্ত্রের মোকাবিলা করতে থাকে। প্রতিরোধ যুদ্ধের সূচনা প্রথম হয়েছিল ঢাকায়। তবে ক্রমান্বয়ে তা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। প্রাথমিক এই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এবং ক্ষুদ্র খণ্ড প্রতিরোধ যুদ্ধই পরবর্তীকালে ক্রমান্বয়ে একটি জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করে।

প্রশ্ন-২৩. ১৪ ডিসেম্বর বিখ্যাত কেন? ব্যাখ্যা করো। *[সি. বো., ব. বো. ২০২১]*

উত্তর: ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর পাকবাহিনী অনেক বুদ্ধিজীবীকে নির্মমভাবে হত্যা করে। এ কারণে ১৪ ডিসেম্বর বিখ্যাত।

১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর পাক-হানাদার গোষ্ঠী বুঝতে পারে তাদের পরাজয় নিশ্চিত। তখন তারা বাঙালি জাতিকে মেধাশূন্য করার এক নির্মম ধ্বংসখেলায় মেতে ওঠে। তারা বেশকিছু খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবীকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যায়। পরে নির্মম অত্যাচার করে তাদেরকে হত্যা করে। এদের মধ্যে ছিলেন লেখক, শিল্পী, অধ্যাপক, সাংবাদিক, চিকিৎসক ও সংস্কৃতিকর্মীসহ অনেকে। পরে ঢাকার রায়ের বাজারসহ বিভিন্ন বধ্যভূমিতে তাদের ক্ষতবিক্ষত লাশ পাওয়া যায়। এ কারণেই ১৪ ডিসেম্বর শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস হিসেবে বিশেষ পরিচিত।

প্রশ্ন-২৪. স্বাধীনতা সংগ্রামে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

সাধারণ মানুষ ও মুক্তিযোদ্ধাদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা এবং যুদ্ধের অশেষ দুর্ভোগের মধ্যেও মনোবল ধরে রাখায় বুদ্ধিজীবীরা প্রশংসনীয় অবদান রাখেন। পত্রপত্রিকায় লেখা, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে খবর পাঠ, দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন, কবিতা পাঠ, নাটক, কথিকা ইত্যাদির মাধ্যমে তারা মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করেছেন। শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের এসব সৃষ্টি ও পরিবেশনা রণক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের মানসিক ও নৈতিক বল ধরে রাখতে সহায়তা করেছে।

প্রশ্ন-২৫. মুক্তিযোদ্ধারা কেন জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান? ব্যাখ্যা করো।
[ম. বো., দি. বো. ২০২৫; সি. বো., ব. বো. ২০২১]

উত্তর: মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ পেয়েছি। এ কারণে তারা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে যারা লড়াই করেছেন তারাই মুক্তিযোদ্ধা। পুরো নয় মাস এ যোদ্ধারা নিজেদের জীবন বাজি রেখে এদেশ থেকে বর্বর হানাদারদের বিতাড়িত করেছেন। এতে কেউ হাত হারিয়েছেন, কেউ পা, কেউ অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। আবার কারো জীবনটাই চলে গেছে। কেউবা মা-বাবা, ঘর-বাড়ি হারিয়েছেন। তাদের এ মহান আত্মত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীন দেশে স্বাধীন পতাকা উড়ছে। এ কারণে মুক্তিযোদ্ধারা এদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান।

প্রশ্ন-২৬. মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান সংক্ষেপে লেখো।
[সকল বোর্ড ২০১৯]

উত্তর: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নিকটতম প্রতিবেশী ভারত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন ভারত সরকার বাংলাদেশের প্রায় এক কোটি শরণার্থীকে সেদেশে আশ্রয় দেয়। ভারত সরকার তার দেশে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। ভারত মুক্তিবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য অস্ত্র ও রসদ দিয়ে সহযোগিতা করে। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতায় বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের সদর দপ্তর স্থাপনের অনুমতি দেয়। এছাড়া শরণার্থীদের সহায়তা করতে ভারত সরকার তার নাগরিকদের ওপর কর পর্যন্ত আরোপ করে। সরকারি পর্যায়ের বাইরেও ভারতের অধিকাংশ রাজনৈতিক দল, বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিকর্মী ও সাধারণ মানুষ মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে। এভাবে মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশকে সমর্থন দিয়ে ভারত আমাদের কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছে।

প্রশ্ন-২৭. কনসার্ট ফর বাংলাদেশ কী? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' হলো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এর সমর্থনে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত একটি সঙ্গীতানুষ্ঠান।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তৎকালীন মার্কিন সরকার এর বিপক্ষে থাকলেও মার্কিন গণমাধ্যম ও সাধারণ মানুষ ছিল মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সহানুভূতিশীল। যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ মুক্তিযুদ্ধে উৎসাহ দেওয়ার জন্য ১৯৭১ সারের ১ আগস্ট নিউইয়র্ক শহরে আয়োজন করে 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' নামে একটি সঙ্গীতানুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠান থেকে প্রায় ১০ লাখ ডলার ওঠে যা বাংলাদেশি শরণার্থী শিশুদের জন্য দান করা হয়। এ অনুষ্ঠানের আয়োজক ছিলেন জর্জ হ্যারিসন ও রবি শংকর।

প্রশ্ন-২৮. আত্মসমর্পণ দলিল কী? ব্যাখ্যা করো।
[ঢা. বো., রা. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫]

উত্তর: ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ভারতীয় সেনবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান লে. জগজিৎ সিং আরোরা ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান ও পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লে. জেনারেল আমীর আব্দুল্লাহ খান নিয়াজির মধ্যে সম্পাদিত যে চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অবসান ঘটে সেটাই আত্মসমর্পণ দলিল।

দীর্ঘ নয় মাস মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিকাল ৪ টার পরে রেসকোর্স ময়দানে লে. জেনারেল আমীর আব্দুল্লাহ খান নিয়াজি ৯৩ হাজার পাকিস্তানি এবং বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্রসহ পাকিস্তান সরকার ও সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করেন। ফলে বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পাকিস্তানে প্রথম অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হয় কত সালে?
ক. ১৯৬৯ খ. ১৯৭০
গ. ১৯৭১ ঘ. ১৯৭৫

২. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে কয়টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে?
ক. ১০টি খ. ২০টি
গ. ২৪টি ঘ. ৪০টি

৩. কোন নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের জয় হয়েছিল?
ক. ১৯৬০ সালের খ. ১৯৭০ সালের
গ. ১৯৭৮ সালের ঘ. ১৯৮৫ সালের

৪. ২৫ মার্চের রাতের গণহত্যা কী নামে পরিচিত?
ক. অপারেশন জ্যাকপট খ. অপারেশন ক্লিনহার্ট
গ. অপারেশন সার্চলাইট ঘ. অপারেশন রেবেল হান্ট

৫. ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের অন্যতম লক্ষণীয় দিক ছিল—
ক. বাঙালির ধর্ম রক্ষার প্রতিজ্ঞা
খ. বাঙালির কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির প্রত্যাশা
গ. বাঙালির মুক্তির ঘোষণা
ঘ. বাঙালির শিক্ষার উন্নতির ঘোষণা

৬. কত তারিখে বাংলাদেশে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়?
ক. ২৬ মার্চ খ. ২৭ মার্চ
গ. ২৮ মার্চ ঘ. ২৯ মার্চ

৭. বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?
ক. সৈয়দ নজরুল ইসলাম
খ. তাজউদ্দীন আহমদ
গ. এ.এইচ.এম কামারুজ্জামান
ঘ. ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী

৮. অস্থায়ী মুজিবনগর সরকারের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনে মোট কতটি মন্ত্রণালয় বা বিভাগ ছিল?
ক. ১০ খ. ১২
গ. ১৪ ঘ. ১৬

৯. মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশকে কয়টি বিগ্রেড ফোর্সে ভাগ করা হয়েছে?
ক. তিনটি খ. পাঁচটি
গ. নয়টি ঘ. এগারোটি

১০. মুজিবনগর সরকারের সেনাপ্রধান কে ছিলেন?
ক. এম. এ. জি. ওসমানী খ. মেজর সফিউল্লাহ
গ. এ. কে. খন্দকার ঘ. মেজর জলিল

১১. মুজিবনগর সরকারের শপথ বাক্য পাঠ করান কে?
ক. অধ্যাপক ইউসুফ আলী
খ. তাজউদ্দীন আহমদ
গ. সৈয়দ নজরুল ইসলাম
ঘ. খন্দকার মোশতাক আহমেদ

১২. মুক্তিযুদ্ধ সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য গঠিত মুক্তিবাহিনী কয়টি ভাগে বিভক্ত ছিল?
ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ৫

১৩. মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য সমগ্র দেশকে কয়টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়েছিল?
ক. ১০ খ. ১১
গ. ১২ ঘ. ১৩

১৪. ১৯৭১ সালে অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয় কেন?
ক. ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য
খ. ক্ষমতার অপপ্রয়োগের জন্য
গ. মুক্তিযুদ্ধকে সাংগঠনিক রূপ দেওয়ার জন্য
ঘ. শাসকগোষ্ঠীর কল্যাণার্থে

১৫. বৈদ্যনাথতলার বর্তমান নাম কী?
ক. স্বাধীননগর খ. মুজিবনগর
গ. জিয়ানগর ঘ. সোহরাওয়াদীনগর

১৬. কত তারিখে বুদ্ধিজীবী দিবস পালন করা হয়?
ক. ২১ ফেব্রুয়ারি খ. ২৬ মার্চ
গ. ১৪ ডিসেম্বর ঘ. ১৬ ডিসেম্বর

১৭. বাংলাদেশ কত সালে স্বাধীনতা লাভ করে?
ক. ১৯৫২ খ. ১৯৬৬
গ. ১৯৭০ ঘ. ১৯৭১

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন

১৮. মুজিবনগর সরকার গঠনের উদ্দেশ্য ছিল—
i. বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা বাস্তবায়ন করা
ii. মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠন ও প্রশিক্ষণ দান করা
iii. বিদেশি রাষ্ট্রের স্বীকৃতি অর্জন ও সহযোগিতা লাভ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৯. ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক হানাদারদের দোসর ছিল কারা?
i. রাজাকার বাহিনী
ii. আল বদর বাহিনী
iii. বিহারি সম্প্রদায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২০ ও ২১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন গেটিসবার্গ নামক স্থানে আমেরিকাবাসীর উদ্দেশ্যে এক ভাষণ দিয়েছিলেন। যে ভাষণ আমেরিকাবাসীকে ঐক্যবদ্ধ ও উজ্জীবিত করে। ফলে আধুনিক ও গণতান্ত্রিক আমেরিকা প্রতিষ্ঠিত হয়।

২০. উক্ত নেতার ভাষণের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন নেতার ভাষণের সাদৃশ্য রয়েছে?
ক. এ. কে. ফজলুল হক
খ. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ
গ. মওলানা ভাসানী
ঘ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

২১. উক্ত ভাষণের তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলো—
i. বাঙালিদের স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করে
ii. বাঙালি জাতিকে বীরের জাতিতে রূপান্তরিত করে
iii. ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২২ ও ২৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
১৯৪৫ সালে ড.সুকর্ণের নেতৃত্বে ইন্দোনেশিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে। দীর্ঘদিনের ডাচ (হল্যান্ডের অধিবাসী) অধীনতা থেকে মুক্তি পেতে ইন্দোনেশিয়াবাসী অনেক দিন ধরে প্রচেষ্টা চালায়। অবশেষে ইন্দোনেশিয়ান ন্যাশনাল পার্টি সংগঠনের নেতৃত্বে তারা স্বাধীন হয়। ১৯৪৯ সালে হল্যান্ড ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেয়।

২২. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংগঠনটি পাঠ্যবইয়ে বর্ণিত কোন সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করে?
ক. মুজিবনগর সরকার
খ. রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ
গ. তমদ্দুন মজলিশ
ঘ. মৌলিক গণতান্ত্রিক সরকার

২৩. উদ্দীপকের সাথে উক্ত সংগঠনের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়—
i. স্বাধীনতা লাভে সহায়তা করার দিক দিয়ে
ii. জনগণকে সংগঠিত করার দিকে দিয়ে
iii. উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার দিক দেয়ে
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক. i ও ii গ. i ও iii
খ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

খ. বোর্ড পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৪. ১৯৭০ সালে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়— */সকল বোর্ড ২০১৯/*
ক. ৬ অক্টোবর খ. ১২ নভেম্বর
গ. ৭ ডিসেম্বর ঘ. ১৭ ডিসেম্বর

২৫. ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে কতটি আসন লাভ করে? */সকল বোর্ড ২০১৬/*
ক. ১৬৫ খ. ১৬৬
গ. ১৬৭ ঘ. ১৬৮

২৬. ১৯৭১ সালের কত তারিখ 'কালরাত' হিসেবে পরিচিত? */সকল বোর্ড ২০২৩/*
ক. ২৫ মার্চ খ. ২৬ মার্চ
গ. ২৩ মার্চ ঘ. ২৪ মার্চ

২৭. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত? */সকল বোর্ড ২০২৩, ২০২১; ২০১৯/*
ক. আগ্রাবাদ খ. কালুরঘাট
গ. মুজিবনগর ঘ. মেহেরপুর

২৮. মুজিবনগর সরকার কত তারিখে গঠিত হয়? */সকল বোর্ড ২০২২/*
ক. ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ খ. ১৫ এপ্রিল, ১৯৭১
গ. ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১ ঘ. ২০ এপ্রিল, ১৯৭১

২৯. অস্থায়ী সরকার কত তারিখে শপথ গ্রহণ করে? */সকল বোর্ড ২০২৫; ২০২৩/*
ক. ২৬ মার্চ খ. ১৭ এপ্রিল
গ. ১০ এপ্রিল ঘ. ২৭ এপ্রিল

৩০. বুদ্ধিজীবী হত্যার কারণ কী? */সকল বোর্ড ২০২৫/*
ক. ব্যক্তিগত শত্রুতা
খ. জাতিকে মেধাশূন্য করা
গ. শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে ফেলা
ঘ. মুক্তিযোদ্ধাদের ভীতি প্রদর্শন

৩১. ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে পাক হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করে কত তারিখে? */সকল বোর্ড ২০১৯/*
ক. ১৩ ডিসেম্বর খ. ১৪ ডিসেম্বর
গ. ১৫ ডিসেম্বর ঘ. ১৬ ডিসেম্বর

৩২. ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর পক্ষে আত্মসমর্পণ দলিলে কে স্বাক্ষর করেন? */সকল বোর্ড ২০২২/*
ক. মেজর জেনারেল জমশেদ
খ. লে. জেনারেল নিয়াজি
গ. রিয়ার এডমিরাল শরিফ
ঘ. ব্রিগেডিয়ার বকর সিদ্দিক

৩৩. কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে কোন সামরিক নেতা স্বকণ্ঠে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন? */সকল বোর্ড ২০২৫/*
ক. মেজর জিয়াউর রহমান
খ. মেজর খালেদ মোশাররফ
গ. মেজর শফিউল্লাহ
ঘ. কর্নেল তাহের

৩৪. মুজিবনগর সরকারের সেনাপ্রধান কে ছিলেন? *[সকল বোর্ড ২০২১]*

ক. এম. এ. জি. ওসমানী খ. মেজর সফিউল্লাহ
গ. এ. কে. খন্দকার ঘ. মেজর জলিল

৩৫. 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' কোথায় অবস্থিত? *[সকল বোর্ড ২০২৩; ২০২১; ২০১৯]*

ক. মুজিবনগর খ. মেহেরপুর
গ. আগ্রাবাদ ঘ. কালুরঘাট

৩৬. ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে সাধারণ নির্বাচনের গুরুত্ব— *[সকল বোর্ড ২০১৮]*

i. বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিজয়
ii. ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি
iii. পাকিস্তানের ভাঙনের সূচনা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩৭ ও ৩৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

মেয়েকে মুক্তিযুদ্ধের গল্পের ফাঁকে বাবা শরিফ ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনের কথা বলছিলেন। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের পরও কীভাবে বাঙালিদের সরকার গঠন হতে বিরত রাখা হয়। সর্বশেষ নিরীহ জনতার ওপর রাতের আঁধারে সামরিক অভিযান চালিয়ে সম্পন্ন হয় ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাযজ্ঞ। *[সকল বোর্ড ২০১৮]*

৩৭. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনাকে বলা হয়—

ক. অপারেশন জ্যাকপট খ. অপারেশন সার্চলাইট
গ. অপারেশন ঢাকা সিটি ঘ. অপারেশন হলি লাইট

৩৮. বাঙালিদের উপর নির্বিচার আক্রমণের ফলাফল—

i. প্রত্যক্ষ যুদ্ধের সূত্রপাত হয়
ii. অগণিত নারী ও শিশু হত্যার শিকার হয়
iii. বাঙালিরা অবদমিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩৯ ও ৪০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন সবাই। হঠাৎ গুলির শব্দ। দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের এ দিনটির কথা মিশু আজও ভুলতে পারছে না। *[সকল বোর্ড ২০২১]*

৩৯. মিশু কোন রাতের কথা ভুলতে পারছে না?

ক. ৭ই মার্চ রাত খ. ১৪ই মার্চ রাত
গ. ২১শে মার্চ রাত ঘ. ২৫শে মার্চ রাত

৪০. উক্ত হত্যাকাণ্ড থেকে রেহাই পায় নাই—

i. ছাত্র
ii. শিক্ষক
iii. বিভিন্ন পেশাজীবী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ৪১ ও ৪২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

যুগোশ্লাভিয়ার বসনিয়া বহুকাল থেকেই মুসলিম প্রধান অঞ্চল। কিন্তু একই অঞ্চলের খ্রিষ্টান আধিপত্যের কারণে মুসলমানরা খ্রিষ্টান প্রশাসন দ্বারা নির্যাতিত ও শোষিত হতে থাকে। ফলে মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা অর্জনে সচেষ্ট হয়। খ্রিষ্টানরা তাদের দমন করতে গণহত্যা চালায়। *[সকল বোর্ড ২০১৭]*

৪১. উদ্দীপকের নির্যাতন ও গণহত্যার সাথে নিচের কোন ঘটনার সাদৃশ্য রয়েছে?

ক. পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের নির্যাতন
খ. পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের নির্যাতন
গ. পশ্চিম বাংলার প্রতি ব্রিটিশদের নির্যাতন
ঘ. পূর্ব বাংলার প্রতি ব্রিটিশদের নির্যাতন

৪২. উক্ত গণহত্যার উদ্দেশ্য ছিল—

i. জাতিকে মেধাশূন্য করা
ii. জাতিকে নেতৃত্বহীন করা
iii. নিজেদের বীরত্ব প্রকাশ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

'ক' রাষ্ট্রের মুক্তিযুদ্ধের সময় বিপদগ্রস্ত ও আশ্রয়হীন মানুষ প্রতিবেশী 'খ' রাষ্ট্রে ব্যাপকহারে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় গ্রহণ করে। *[সকল বোর্ড ২০১৮]*

৪৩. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন 'খ' রাষ্ট্রের অনুরূপ ভূমিকা পালন করে—

ক. ভারত খ. নেপাল
গ. ভুটান ঘ. বার্মা (মিয়ানমার)

উদ্দীপকটি পড়ে ৪৪ ও ৪৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

বরগুনার হাসু ও পটুয়াখালীর বাবলু মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ। তারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে সমাজসেবায় নিজেদের নিয়োজিত করেছেন। তারা একটি অসাম্প্রদায়িক সমাজ গড়তে চান। *[সকল বোর্ড ২০১৬]*

৪৪. হাসু ও বাবলুর এলাকা মুক্তিযুদ্ধে কোন সেক্টরের অধীনে ছিল?

ক. ৩ খ. ৪
গ. ৯ ঘ. ১১

৪৫. উক্ত সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন—

i. মেজর নাজমুল হক
ii. মেজর এম. এ জলিল
iii. মেজর এম এ মঞ্জুর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উত্তরমালা

১	খ	২	গ	৩	খ	৪	গ	৫	গ	৬	ক	৭	খ	৮	খ	৯	ক	১০	ক	১১	ক	১২	ক
১৩	খ	১৪	গ	১৫	খ	১৬	গ	১৭	ঘ	১৮	ঘ	১৯	ক	২০	ঘ	২১	ক	২২	ক	২৩	ক	২৪	গ
২৫	গ	২৬	ক	২৭	খ	২৮	ক	২৯	খ	৩০	খ	৩১	ঘ	৩২	খ	৩৩	ক	৩৪	ক	৩৫	ঘ	৩৬	খ
৩৭	খ	৩৮	ক	৩৯	ঘ	৪০	ঘ	৪১	খ	৪২	ক	৪৩	ক	৪৪	গ	৪৫	গ						

গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ১৯৭০ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো।

২. ১৯৭১ সালে কেন অসহযোগ আন্দোলন সংঘটিত হয়?

৩. ৭ মার্চের ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো উল্লেখ করো।

৪. অপারেশন সার্চলাইট সম্পর্কে ধারণা দাও।

৫. মুজিবনগর সরকার সম্পর্কে ধারণা দাও।

৬. মুজিবনগর সরকারের অভ্যন্তরীণ প্রশাসন সম্পর্কে লেখো।

৭. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি সর্বজনীন জনযুদ্ধ— ব্যাখ্যা করো।

৮. মুক্তিযুদ্ধে নারী সমাজের ভূমিকা কীরূপ ছিল?

৯. বাঙালির মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।

১০. বাঙালির সব আন্দোলন-সংগ্রামে ছাত্রদের অংশগ্রহণ ছিল অগ্রগণ্য— ব্যাখ্যা করো।

ঘ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ১৯৯০ সালে মিয়ানমারে এক ঐতিহাসিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ নির্বাচনে গণতন্ত্রপন্থি নেত্রী অংসান সুচির দল 'ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসি' বিপুল ভোটে জয়লাভ করলেও ক্ষমতাসীন জান্তা সরকার সুচির হাতে ক্ষমতা ছেড়ে না দিয়ে বরং তাকে উল্টো রাষ্ট্রদ্রোহী বলে গৃহবন্দি করে রাখে। *[ঢা. বো., রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৩]*

ক. কখন বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা করা হয়?

খ. আগরতলা মামলার উদ্দেশ্য কী ছিল? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মিয়ানমারের উক্ত নির্বাচনের সাথে বাংলাদেশের কোন ঐতিহাসিক নির্বাচনের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. তুমি কি মনে কর, উক্ত নির্বাচন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে ত্বরান্বিত করে? তোমার মতামত বিশ্লেষণ করো।

২. নির্বাচনে হামাসের কাছে ফিলিস্তিনের ক্ষমতাসীন পার্টি পিএলও হেরে গেলেও প্রেসিডেন্ট ইসমাইল হানিয়া ক্ষমতা ছাড়তে অস্বীকার করে। ফলে ইসরাইলের দুইদিকে ফিলিস্তিনের দুই অংশ পশ্চিম তীর ও গাজা প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। হামাসের অধীনে গাজা শাসিত হয় এবং পিএলও'র অধীনে থাকে পশ্চিম তীর। তবে উভয়ই ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের অধীনে থাকে। *[ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো. ২০২১]*

ক. মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী একটি রাজনৈতিক দলের নাম লেখো।

খ. ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চায়নি কেন?

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত ফিলিস্তিনের নির্বাচনের সাথে পাকিস্তানের কোন নির্বাচনের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা দাও।

ঘ. উদ্দীপকের নির্বাচন পরবর্তী অবস্থা পাকিস্তানের অবস্থার মতো ছিল না— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো।

৩. ২০২০ সালের নভেম্বর মাসের মিয়ানমারের জাতীয় নির্বাচনে অংসান সুচির দল ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসি (এনএলডি) একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু সে দেশের ক্ষমতাশীন জান্তা সরকার নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ এনে নির্বাচন বাতিল করে। জনরায়ের প্রতি সম্মান না দেখিয়ে এনএলডি প্রধানকে গ্রেফতার করে গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা ব্যাহত করে। সামরিক জান্তা সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির কারণে জনগণ ঐক্যবন্ধ হয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু করে। *[ম. বো. ২০২৩]*

ক. বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর নাম কী?

খ. আমাদের মুক্তিযুদ্ধে আঞ্চলিক বাহিনীগুলোর ভূমিকা কী ছিল?

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত নির্বাচনটির সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ে পঠিত কোন নির্বাচনের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উক্ত নির্বাচনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

৪. মধ্যপ্রাচ্যের ফিলিস্তিন একটি মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই দখলদার ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইলের নিকট অঞ্চলটির জনগণ শোষিত ও অত্যাচারিত হয়ে আসছে। ফলে ফিলিস্তিনের জনগণ ঐক্যবন্ধ হয়ে ইসরাইল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করে। এতে ইহুদি রাষ্ট্রটি ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী জনগণকে দমনে নারী ও শিশুসহ সাধারণ নাগরিকের উপর নৃশংসভাবে গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। এসবের পরেও ফিলিস্তিনের জনগণ তাদের স্বাধীনতা ফিরে পেতে সংগ্রাম চালিয়ে যায়। *[ঢা. বো., রা. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৫]*

ক. মুক্তিযুদ্ধে প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন?

খ. মুক্তিযুদ্ধে 'সেক্টর' কী? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের সাথে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের কোন ঘটনার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. পাঠ্যবইয়ের আলোকে উক্ত ঘটনার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করো।

৫. গত শতাব্দীর মাঝামাঝিতে ভিয়েতনামের দুই অংশের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধের একপর্যায়ে দক্ষিণ ভিয়েতনামের একজন সামরিক কর্মকর্তার নির্দেশে উত্তর ভিয়েতনামের একটি অংশে ঘৃণ্য ও বর্বর হর্তাকাণ্ড চালানো হয়। এ জঘন্য হত্যাকাণ্ডটি তাদেরকে বিশ্ববাসীর নিকট ঘৃণার পাত্রে পরিণত করে। *[ঢা. বো., রা. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২০]*

ক. কোন দেশ বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি দেয়?

খ. 'আত্মসমর্পণ দলিল' কী? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত হত্যাকাণ্ডটি তৎকালীন দুই পাকিস্তানের কোন হত্যাকাণ্ডকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উক্ত হত্যাকাণ্ডটি মহান মুক্তিযুদ্ধের একটি খণ্ডিত চিত্রমাত্র— বিশ্লেষণ করো।

৬. ১৯৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত ASEAN এর অন্যতম সদস্য রাষ্ট্র হলো পূর্ব তিমুর যা একসময় ইন্দোনেশিয়ার প্রদেশ হিসেবে পরিগণিত হতো। তবে স্বাধীনতাকামী FRETILIN দলের নেতা জানানা গুসামাও দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন দেশটির স্বাধীনতা। তিনি অবারিত অনীলে ছড়িয়ে দেন মুক্তিকামী মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক স্বাধীনতার ঘোষণার সেই বাণী। অবশেষে ২০০২ সালে আত্মপ্রকাশ ঘটে স্বাধীন পূর্ব তিমুর রাষ্ট্রের।

ক. রেসকোর্স ময়দানের বর্তমান নাম কী?

খ. ১৯৭০ সালের নির্বাচন পাকিস্তান জাতীয়তাবাদের ধারণা বিপর্যস্ত করে কীভাবে?

গ. উদ্দীপকের ঘটনায় তোমার পঠিত কোন বিষয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. তুমি কি মনে কর, দুটি ঘোষণার ফলাফলই একই ধারায় প্রবাহিত? মতের পক্ষে যুক্তি দাও।

৭. অটোমান শাসনাধীনে থাকা বুলগেরিয়ার মানুষ জাতীয়তাবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তুর্কি সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সুযোগে ১৮৭৬ সালে তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তুরস্কের সুলতান এ বিদ্রোহ কঠোর হাতে দমন করেন। একরাত্রে প্রায় ৫০,০০০ হাজারের বেশি দেশপ্রেমিক বুলগারদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এ নির্মম হত্যাকাণ্ড বুলগেরিয়ার ইতিহাসে 'বুলগেরিয়ান এট্রোসিটিস' নামে অভিহিত, যা বুলগেরিয়ার দেশপ্রেমী মানুষকে পরবর্তী সময়ে স্বাধীনতা অর্জনে অনুপ্রেরণা দিয়েছে।

ক. ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার আসামি কয়জন ছিল?

খ. ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার বিচার প্রক্রিয়া কীরূপ ছিল?

গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে তোমার পঠিত কোন বিষয়টির সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের ঘটনার মতো উক্ত ঘটনাই বীর বাঙালিকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে অনুপ্রাণিত করেছিল— মূল্যায়ন করো।

৮.

[ঢা. বো., ম. বো., দি. বো., চ. বো., সি. বো., ব. বো. ২০২২]

ক. কে ফোর্সের অধিনায়ক কে ছিলেন?

খ. ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান কী? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের চিত্রগুলো আমাদের জাতীয় জীবনের কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. "উদ্দীপকের উক্ত ঘটনাই আমাদের স্বাধীনতার পথকে ত্বরান্বিত করেছিল"— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো।

৯. মনীষা নাসির উদ্দীন ইউসুফ পরিচালিত গেরিলা চলচ্চিত্রটি দেখছিল। মুভিটিতে সে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্নে বাঙালিদের ওপর পাক-বাহিনীর নির্মম হত্যাযজ্ঞ দেখে বিস্মিত হয়। সিনেমায় দেখানো হচ্ছিল কীভাবে নিরপরাধ বাঙালিদের ধরে হত্যা করছে পাক-বাহিনী। তাছাড়া বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা যুবসমাজকে কীভাবে আত্মত্যাগে উজ্জীবিত করেছিল তা খুব সাবলীলভাবে মুভিতে ফুটিয়ে তুলেছেন এর শিল্পীরা। *[সি. বো., ব. বো. ২০২১]*

ক. মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা একটি গেরিলা ফোর্সের নাম লেখো।

খ. অপারেশন সার্চলাইট বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের 'গেরিলা' চলচ্চিত্রে মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্নের কোন হত্যাযজ্ঞের চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. "বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা বাঙালিদের আত্মত্যাগে উজ্জীবিত করেছিল"— তোমার মতামত দাও।

১০. ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল Sudan People's Liberation Movement (SPLM) দক্ষিণ সুদানের স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব নেন। দলের নেতারা স্বাধীনতা অর্জনের সুদৃঢ় শপথ গ্রহণ করেন। SPLM সুষ্ঠুভাবে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য ১২টি কমিটি গঠন করে। প্রত্যেকটি কমিটিকে যুদ্ধের দায়িত্ব বণ্টন করা হয়। এছাড়াও দলটি বহির্বিশ্বে স্বাধীনতার পক্ষে সমর্থন আদায় করার জন্য ব্যাপক তৎপরতা চালায়। যার ফলশ্রুতিতেই ৯ জুলাই ২০১১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন দক্ষিণ সুদান।

ক. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের যাত্রা শুরু হয় কোথায়?

খ. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা কীরূপ ছিল? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পঠিত কোন বিষয়ের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত তৎপরতার মতো কূটনৈতিক তৎপরতাই স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটায়— মতামত দাও।

১১. "মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি
মোরা একটি মুখের হাসির জন্য অস্ত্র ধরি
মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি।"

[ম. বো., দি. বো. ২০২৫]

ক. মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বোচ্চ খেতাব কোনটি?

খ. মুক্তিযোদ্ধারা কেন জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে কোন ফুলকে বাঁচানোর কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের আত্মত্যাগের তাৎপর্য মূল্যায়ন করো।

১২. বসনিয়া ছিল এক সময় সার্বিয়ার একটি প্রদেশ। বসনিয়ানরা রাষ্ট্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও রাষ্ট্র ক্ষমতা সার্বিয়ানদের হাতে ছিল। তারা বসনিয়ানদের ওপর বৈষম্য ও শোষণ নীতি গ্রহণ করলে বসনিয়াবাসী স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু দফা ঘোষণা করে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সার্বিয়া আন্দোলনকারীদের দমন করতে গেলে সেখানে গণআন্দোলনের সৃষ্টি হয়। শাসকগোষ্ঠীর হাতে বহু ছাত্র-জনতা হতাহত হয়। যার ফলশ্রুতিতে বসনিয়া স্বাধীনতা অর্জন করে। *[ঢা. বো., রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৩]*

ক. মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশকে কতটি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল?

খ. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়ের কারণ ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের বসনিয়ানদের স্বায়ত্তশাসন দাবির আন্দোলনের সাথে বাঙালির কোন আন্দোলনের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের বসনিয়ানদের আন্দোলনের মতো বাঙালির উক্ত আন্দোলনও স্বাধীনতার পথ সুগম করেছিল— বিশ্লেষণ করো।

১৩. স্বাধীনতা, তোমার জন্যে
মোল্লাবাড়ির এক বিধবা দাঁড়িয়ে আছে
নড়বড়ে খুঁটি ধরে দগ্ধ ঘরের।
স্বাধীনতা, তোমার জন্যে
হাড্ডিসার এক অনাথ কিশোরী শূন্য থালা হাতে
বসে আছে পথের ধারে।
তোমার জন্যে,
সগীর আলী শাহবাজপুরের সেই জোয়ান কৃষক,
কেষ্টদাস, জেলে পাড়ার সবচেয়ে সাহসী লোকটা,
মতলব মিয়া, মেঘনা নদীর দক্ষ মাঝি, ...
সবাই অধীর প্রতীক্ষা করছে তোমার জন্যে হে স্বাধীনতা।

ক. অস্থায়ী সরকারের সদরদপ্তর কোথায় ছিল?

খ. মুজিবনগর সরকারের অভ্যন্তরীণ প্রশাসন কীরূপ ছিল?

গ. উদ্দীপকের প্রথম অংশ মহান মুক্তিযুদ্ধে কাদের অবদানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. মহান মুক্তিযুদ্ধে উদ্দীপকের দ্বিতীয় অংশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণদের অবদান বিশ্লেষণ করো।

১৪. আলজেরিয়ার স্বাধীনতা সম্পর্কিত একটি নিবন্ধে পারুল জানতে পারে, আলজেরিয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধ ৮ বছর আগে শুরু হয়েছিল। এ যুদ্ধে আলজেরিয়ান ন্যাশনাল ফ্রন্ট নেতৃত্ব দেয়। এ ফ্রন্ট যুদ্ধ পরিচালনার জন্য পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র মিসরের কায়রোতে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করে। ওই সরকারের মূল দায়িত্ব ছিল কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে আলজেরিয়ার স্বাধীনতার প্রতি বিশ্ব জনমত সৃষ্টি।

ক. ছয় দফা কী?

খ. অপারেশন সার্চলাইট কী? ব্যাখ্যা করো।

গ. আলজেরিয়ার অন্তর্বর্তী সরকারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকার গঠন প্রক্রিয়া বর্ণনা করো।

ঘ. উদ্দীপকে আলজেরিয়ার সরকারের ভূমিকা ও বাংলাদেশের ওই সরকারের ভূমিকা কি একই রূপ? যুক্তিসহ মূল্যায়ন করো।

১৫. মায়ানমার সেনাবাহিনী তাদের দেশের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে শুধু ধর্মের দোহাই দিয়ে নির্যাতন করতে থাকে। ফলে সে দেশের প্রায় ১২ লক্ষ রোহিঙ্গা শরণার্থী হিসেবে বাংলাদেশে

আশ্রয় গ্রহণ করে। বিতাড়নের পূর্বে সেনাসদস্যরা তাদের বাড়িঘরে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। নির্বিচারে গণহত্যা করে। যুবতী নারীদের ধরে শ্লীলতাহানী করে। স্থানীয় বৌদ্ধরা রোহিঙ্গাদের বাড়িঘরে লুটতরাজ করে। *[ঢা. বো., য. বো., রা. বো. দি. বো. কু. বো. চ. বো. ব. বো. ২০২১]*

ক. বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস কবে পালিত হয়?

খ. ৭ মার্চের ভাষণ বিখ্যাত কেন? ব্যাখ্যা করো।

গ. বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের সাথে মুক্তিযুদ্ধকালীন কোন বাঙালি জনগোষ্ঠীর মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নৃশংসতার বর্ণনা দাও।

১৬. বেসরকারি একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে কাজ করছেন জনাব আরমান সাহেব। তিনি তার এক পাকিস্তানি বন্ধুকে ই-মেইলে একটি চিঠি পোস্ট করে। এ চিঠিতে তিনি ব্যতিক্রমী কিছু তথ্য তুলে ধরেন তার বন্ধুর কাছে। যার অংশবিশেষ হলো, বন্ধু আজ এমন একটি রাত যে রাতে আমি আমার বাবাকে হারিয়েছি। তোমার দেশের এক শাসক ১৯৭১ সালের এ রাতে গণহত্যার আদেশ দিয়ে ঢাকা ত্যাগ করে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যায়। ঐ কালরাতেই আমার বাবাকে আমার সামনে থেকে কাপুরুষ সেনা সদস্যরা ধরে নিয়ে যায়। এরপর আর বাবাকে দেখতে পাই না। বাবার স্মৃতি আজও আমাকে কাঁদায়।

ক. মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় কত তারিখে?

খ. মুক্তিযুদ্ধে নারীদের অবদান উল্লেখ করো।

গ. উদ্দীপকের আরমান সাহেব তার বন্ধুর কাছে যে গণহত্যার চিত্র তুলে ধরেছেন সে গণহত্যার বর্ণনা দাও।

ঘ. এ ধরনের গণহত্যা সম্পর্কিত অপারেশনের নির্দেশনা বিশ্লেষণ করো।

১৭.

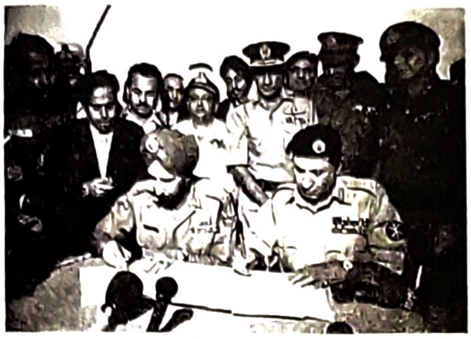

[ঢা. বো., রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৩; ঢা. বো., য. বো., দি. বো., চ. বো., সি. বো., ব. বো. ২০২২]

ক. ভুটান কখন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে?

খ. মুক্তিযুদ্ধে নারীদের অবদান লেখো।

গ. উদ্দীপকের চিত্রটি কোন ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী? আলোচনা করো।

ঘ. উক্ত ঐতিহাসিক ঘটানার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

১৮. ইউটিউবে প্রাপ্ত সাড়াজাগানো একটি চিঠি বিশ্ববাসীর অশ্রু বিসর্জনের কারণ হয়ে দাঁড়ালো। বারো বছরের একটি রোহিঙ্গা বালক চিঠির মাধ্যমে অংসান সুচির কাছে জানতে চাইলো কেন তারা জেলে? বাবাকে অত্যাচার করে ঘরে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারা হলো কেন? কেন মিয়ানমার সেনারা তার মাকে জঙ্গলে ধরে নিয়ে গেল। মায়ের গুলিবিদ্ধ লাশকে কেন মাটি চাপা দিতে হলো। সেনা অত্যাচারের বিভীষিকায় ভাইবোনদের হারিয়ে সে কেন বাংলাদেশে আশ্রয় নিলো।

ক. কোন দেশ প্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়?

খ. স্বাধীনতা যুদ্ধে অনিয়মিত বাহিনীর কার্যক্রম ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের চিঠির বক্তব্য আমাদের কোন সময়ের কথা মনে করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উক্ত গণহত্যার প্রতিবাদে বাঙালিরা কি যথাযথ পদক্ষেপ নিতে পেরেছিল? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

ঙ. সমন্বিত অধ্যায়ের সৃজনশীল প্রশ্ন

১৬. পৃথিবীর ইতিহাসে যুগে যুগে অনেক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে সংঘটিত ভারতবর্ষের একটি যুদ্ধ আজও প্রতিটি বাঙালির হৃদয়ে নাড়া দেয়। ভাগীরথী নদীর তীরে সংঘটিত এ কপট যুদ্ধ ছিল বাংলার ভাগ্য নির্ধারণের যুদ্ধ। বাংলার সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতার জন্য এ যুদ্ধে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার মহান অধিপতি চরমভাবে পরাজিত হন।

◄ সমন্বিত অধ্যায় ৪ ও ৬

ক. কত সালে পলাশির যুদ্ধ সংঘটিত হয়?

খ. বঙ্গভঙ্গকে মুসলিমরা স্বাগত জানিয়েছিলেন কেন?

গ. উদ্দীপকের ইঙ্গিতকরা যুদ্ধ বঙ্গভারতে কোন শাসনের ভিত্তি তৈরি করেছিল? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. বাংলার ঐ সেনাপতির মতো কিছু জনগোষ্ঠীই ১৯৭১ সালে বাঙালির মহান মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল — বিশ্লেষণ করো।

১৭. কানাডার নাগরিক জনসন বিশ্বখ্যাত একটি টেলিভিশন চ্যানেলে 'যুদ্ধ এবং সংঘর্ষ' বিষয়ে কাজ করেন। তিনি গত সপ্তাহে তার এক রিপোর্টে দক্ষিণ এশিয়ার একটি রাষ্ট্রের স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণ উল্লেখ করেন। দেশটি মুসলিম

অধ্যুষিত এবং দুটি অঞ্চলে বিভক্ত। একটি অঞ্চলের হাতেই অন্য অঞ্চলের সব অর্থ-সম্পদ ব্যবহৃত হতো। শোষিত অঞ্চলের মধ্যে তাদের অর্জিত সম্পদের মাত্র ১৬% ব্যয় হতো। এ ধরনের বৈষম্যের কারণেই বৃহৎ দেশটি ভেঙে শোষিত অঞ্চলটি একটি স্বাধীন দেশে রূপ নেয়।

◀ সমন্বিত অধ্যায় ৫ ও ৬

ক. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস কত তারিখে পালিত হয়?

খ. অপারেশন সার্চলাইট বলতে কী বোঝ?

গ. জনসনের রিপোর্ট তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন যুদ্ধের প্রতিচ্ছবি? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. জনসনের বর্ণিত কারণটি ছাড়াও আরও অনেকগুলো কারণে বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে— বিশ্লেষণ করো।

১৮. মন্টেগোমারির ৭০ শতাংশ বাসযাত্রী ছিল কালো আমেরিকান। কিন্তু কালোদের সবসময়ই সাদাদের আসন ছেড়ে দিতে হতো। ১৯৫৫ সালের ১ ডিসেম্বর বাসে বসা নিয়ে রোজা পার্ক নামের এক কালো আমেরিকান একজন সাদা বাসযাত্রীকে আসন ছেড়ে দিতে অস্বীকৃতি জানান। এ কারণে তাকে গ্রেফতার করা হয়। এর প্রতিবাদে কালোরা বাসযাত্রা বয়কট করে এবং প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। এ ঘটনার এক বছর পর যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট এক রায়ে ঘোষণা করে— আসন নিয়ে সাদা-কালোর প্রভেদ করা যাবে না। *◀ সমন্বিত অধ্যায় ৫ ও ৬*

ক. বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ সংবিধানের কত নম্বর তফসিলের অন্তর্ভুক্ত?

খ. ১৯৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করেছিল কেন?

গ. উদ্দীপকের ঘটনাটির সাথে তোমার পঠিত ভাষা আন্দোলনের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো।

ঘ. অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে মানুষ আন্দোলনের পথ বেছে নেয়— উদ্দীপক ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

১৯. আমেরিকায় ব্রিটিশদের ঔপনিবেশিক শাসন, শোষণ থেকে মুক্তির জন্য জর্জ ওয়াশিংটন ঐতিহাসিক এগারো দফা ঘোষণা করেন, যা সমগ্র আমেরিকার মানুষকে ঐক্যবদ্ধ ও স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল। *◀ সমন্বিত অধ্যায় ৫ ও ৬*

ক. যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন কত সালে অনুষ্ঠিত হয়?

খ. মৌলিক গণতন্ত্র কী? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের সাথে বাঙালির ইতিহাসের কোন ঘটনার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উক্ত ঘটনা পরবর্তী একজন মহান নেতার ভাষণ ছিল বাঙালির স্বাধীনতার ভিত্তি— বিশ্লেষণ করো।

২০. দক্ষিণ আফ্রিকার অবিসংবাদিত নেতা নেলসন মেন্ডেলা একজন বিশ্বনন্দিত ব্যক্তিত্ব। এক সময় তাঁর দেশ ছিল ইংরেজদের অধীন। ইংরেজরা তখন দক্ষিণ আফ্রিকানদের বিভিন্নভাবে নির্যাতন করত। এমনকি তাদের পিতা-মাতার দেওয়া নামটি পর্যন্ত পরিবর্তন করতে বাধ্য করত। স্কুলে ভর্তি হতে হলে ইংরেজদের হুকুম মতো তাদের ইংরেজি নাম থাকা ছিল বাধ্যতামূলক। পরবর্তী সময়ে ইংরেজ শাসনের অবসান হলেও তাদের রেখে যাওয়া শ্বেতাঙ্গরাই ছিল রাষ্ট্রের সর্বেসর্বা। তারাও স্থানীয় কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকার বঞ্চিত করত। নেলসন মেন্ডেলা তাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রাম চালিয়ে দেশে সকলের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।

◀ সমন্বিত অধ্যায় ৫ ও ৬

ক. ঐতিহাসিক ছয় দফা কে পেশ করেন?

খ. শেখ মুজিবুর রহমানকে কেন 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দেওয়া হয়েছিল? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে দক্ষিণ আফ্রিকানদের ওপর ইংরেজ শাসনের সাথে পাকিস্তানি শাসকদের কোন বিষয়টির মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. দক্ষিণ আফ্রিকানদের মতো বাঙালিরাও তাদের অধিকার আদায়ে সক্ষম হয়েছিল— উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

২১. দক্ষিণ সুদানের তেল, গ্যাস ও কয়লা ইত্যাদি সম্পদ থেকে প্রাপ্ত আয়ের একটি বৃহৎ অংশ উত্তর সুদানে ব্যয় হতো। রাষ্ট্রীয় সুবিধা লাভের ক্ষেত্রেও দক্ষিণ সুদানের লোকজন নানা হয়রানির শিকার হতো। এরূপ বৈষম্য আর বঞ্চনা তৎকালীন সুদানের জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস সৃষ্টি করে। এরই ধারাবাহিকতায় সংঘাত সৃষ্টি হয়। দুই দশকের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয় এবং এর ভিত্তিতে ২০১১ সালে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। উভয় পক্ষ গণভোট মেনে নেয় এবং জাতিসংঘের সহায়তায় দক্ষিণ সুদান স্বাধীনতা লাভ করে। *◀ সমন্বিত অধ্যায় ৫ ও ৬ [সকল বোর্ড ২০১৫]*

ক. মোহামেডান লিটারারি সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?

খ. দ্বিজাতি তত্ত্ব কী? ব্যাখ্যা করো।

গ. স্বাধীনতার পূর্বে দক্ষিণ সুদানের অর্থনৈতিক বৈষম্য ও বঞ্চনার সাথে পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) কী মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও দক্ষিণ সুদানের স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে প্রক্রিয়াগত ভিন্নতা রয়েছে— বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

সহায়ক গ্রন্থসমূহ (Reference Books)

ক. ইংরেজি বই

1. Al-Biruni, Abu Raihan., *Kitab al Hind* (Tr. into English by E.C. Sachau), 2 Vols. London, 1990
2. Elliot, H. & J. Dowson, *History of India as told by its own Historians,* Vols. I-VI, London, 1976
3. Habib, Muhammad and K.A. Nizami, *A Comprehensive History of India,* Vol. V, New Delhi, 1972
4. Habibullah, A.B.M., *The Foundation of Muslim Rule in India,* Revised edition, Allahabad, 1976
5. Husain, Agha Mahdi., *The Rise and Fall of Muhammad bin Tughlaq,* London, 1938
6. Prasad, Ishwari., *A Short History of Muslim Rule in India,* Allahabad, 1939
7. Smith, V.A., *Oxford History of India,* Oxford, 1970
8. Abul Fazl, *Ain-i-Akbari,* 3 vols, Translated and edited by H. Blochmann and H.S. Jarrett
9. Abul Fazl, *Akbar Nama,* 3 vols, Translated by H. Beveridge, Calcutta: Asiatic
10. Babur, Zahiruddin, *Tuzuk-i Baburi,* Translated by A.S. Beveridge, 2 vols, London, 1922
11. Gulbadan Begum, *Humayun Nama,* Translated by A.S. Beveridge, London, 1902
12. Nur-al-Deen Jahangir. *The Tuzuk-i-Jahangiri* (Autobiography of Jahangir), 2
13. Qanungo, K.R. *Sher Shah and His times,* Calcutta, 1965
14. Sarkar, Jadunath. *History of Aurangzeb,* 5 Vols, Calcutta, 1912-24
15. Saksena, B.P. *History of Shah Jahan of Delhi,* Allahabad, 1973
16. Ali, Mohammad Mohar., *A. Brief Survey of Muslim Rule in India,* Dacca, 1969
17. Sarkar, J.N., *History of Bengal,* vol-2. Dhaka University Pres, 1948
18. Karim, K.M., *The Provinces of Bihar and Bengal under Shah Jahan,* Dhaka, 1974
19. Ahmed, Sufia., *Muslim Community in Bengal,* Reprint, Dhaka, 1974.
20. Hunter, W.W., *The Indian Musalmans,* London, 1922.
21. Momen , Humaira., *Muslim Politics in Bengal,* Dhaka, 1972.
22. Sarkar, Sumit., *The Swadeshi Movement in Bengal,* 1903-08, New Delhi, 1973
23. Mahajan. V. D. *History of Medieval India,* New Delhi, 1991
24. Sharma. L. P., *History of Mediaval India,* 1000-1740, Delhi, 1987
25. Srivastava, A. L, *The Mughal Empire,* Agra, 1957

খ. বাংলা বই

১. আলীম, এ.কে.এম. আবদুল, *ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস,* ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৭৩
২. আফতাবচী, জওহর, *তাজকিরাতুল ওয়াকিয়াত* (বাংলা অনুবাদ), ঢাকা, ১৯৬৪
৩. হক, মুহাম্মদ এনামুল, *ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাস,* ঢাকা, ২০০১
৪. আবদুলাহ্, মুহম্মদ, নওয়াব সলীমুল্লাহ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮৬
৫. আহমদ, ওয়াকিল, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা,* ২য় খণ্ড, ঢাকা ১৯৮৩
৬. ইসলাম, সিরাজুল, *বাংলার ইতিহাস: উপনিবেশিক শাসন কাঠামো,* বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৪
৭. ইসলাম, সিরাজুল, *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১),* ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড, ঢাকা, ১৯৯৩
৮. রশিদ, হারুন-অর, *বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০১৮,* নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা ২০০১
৯. করিম আবদুল, *ভারত উপমহাদেশে মুসলিম শাসন,* বাংলা একাডেমি, ঢাকা-১৯৮৭
১০. শাহনেওয়াজ এ. কে. এম, *ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ, সুলতানি ও মোগলপর্ব,* ঢাকা, ২০০২
১১. খান, মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান, মুঘল ভারতের ইতিহাস, ইতিবৃত্ত প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৯

পরিশিষ্ট

বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র

সকল বোর্ড ২০২১

সেট: খ
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি দ্বিতীয় পত্র
বিষয় কোড | ২ | ৬ | ৮ |
সময় — ৩০ মিনিট
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন
পূর্ণমান — ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: — সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. 'আরবদের সিন্ধু বিজয় একটি নিষ্ফল উপাখ্যান'— উক্তিটি কার?
(ক) ঈশ্বরী প্রসাদ (খ) স্টেনলি লেন পুল
(গ) পি. কে. হিট্টি (ঘ) এ. বি. এম হবিবুল্লাহ

২. মুহাম্মদ ঘুরি ছিলেন—
i. উদ্যমী ii. দক্ষ সংগঠক
iii. উচ্চাকাঙ্ক্ষী
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩. 'তমদ্দুন মজলিশ' কোন ধরনের সংগঠন?
(ক) রাজনৈতিক (খ) সাংস্কৃতিক
(গ) অর্থনৈতিক (ঘ) ধর্মীয়

৪. ঐতিহাসিক ছয় দফা কত খ্রিষ্টাব্দে উত্থাপিত হয়?
(ক) ১৯৬৪ (খ) ১৯৬৬ (গ) ১৯৬৮ (ঘ) ১৯৭০

৫. আগরতলা মামলার প্রধান আসামি কে ছিলেন?
(ক) শের-ই-বাংলা এ. কে. ফজলুল হক
(খ) সার্জেন্ট জহুরুল হক
(গ) শেখ মুজিবুর রহমান
(ঘ) আইনজীবী আ. সালাম খান

৬. 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' কত তারিখে পালিত হয়?
(ক) ২১ ফেব্রুয়ারি (খ) ২৩ ফেব্রুয়ারি
(গ) ২০ ফেব্রুয়ারি (ঘ) ১৮ ফেব্রুয়ারি

৭. ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম কারণ—
i. ইহা বাঙালির বাঁচার দাবি
ii. ইহা ছিল বাংলার অধিকার প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ
iii. এর মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানিদের ঐক্য দৃঢ় হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৮. যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি প্রতীক কী ছিল?
(ক) বাতি (খ) নৌকা (গ) বাঘ (ঘ) গোলাপ

৯. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত ছিল?
(ক) আগ্রাবাদ (খ) কালুরঘাট
(গ) মুজিবনগর (ঘ) কুমিল্লা

১০. শেখ মুজিবুর রহমান কবে দেশে ফিরে আসেন?
(ক) ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ সাল
(খ) ১২ জানুয়ারি ১৯৭২ সাল
(গ) ১৫ জানুয়ারি ১৯৭২ সাল
(ঘ) ২০ জানুয়ারি ১৯৭২ সাল

১১. মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?
(ক) সৈয়দ নজরুল ইসলাম
(খ) এ. এইচ. এম কামারুজ্জামান
(গ) তাজউদ্দিন আহমদ
(ঘ) এম মনসুর আলী

১২. মুজিবনগর সরকারের সেনাপ্রধান কে ছিলেন?
(ক) এম. এ. জি. ওসমানি (খ) মেজর সফিউল্লাহ
(গ) এ. কে. খন্দকার (ঘ) মেজর জলিল

উদ্দীপকটি পড়ে ১৩ ও ১৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
'ক' দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে। আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা তখন কারাগারে। বিকল্প নেতার নেতৃত্বে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের তীব্রতায় রাজপথ রক্তে রঞ্জিত হয়। নিহতদের আত্মত্যাগে শেষ পর্যন্ত এ আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়।

১৩. উদ্দীপকের অনুরূপ ৬৯'র গণঅভ্যুত্থানে নিহতরা হলেন—
(ক) ড. শামসুজ্জোহা ও আসাদ
(খ) মতিউর রহমান ও বাবুল মিয়া
(গ) সার্জেন্ট জহুরুল হক ও ওয়াজিউল্লাহ
(ঘ) মনু মিয়া ও রফিক আহমেদ

১৪. উক্ত আন্দোলনের ফলাফল ছিল—
i. শেখ মুজিবুর রহমানের কারামুক্তি
ii. আইয়ুব খানের পতন
iii. গণতান্ত্রিক শাসন কায়েম
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৫. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদের কতটি আসন লাভ করে?
(ক) ১৬৭টি (খ) ১৬০টি
(গ) ২৬০টি (ঘ) ২৫৮টি

১৬. কত খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধু বিজয় করেন?
(ক) ৭১০ (খ) ৭১২ (গ) ৭১৩ (ঘ) ৭১৪

১৭. তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ কত খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়?
(ক) ১১৯২ (খ) ১১৯৪ (গ) ১১৯৬ (ঘ) ১১৯৮

উদ্দীপকটি পড়ে ১৮ ও ১৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন সবাই। হঠাৎ গুলির শব্দ। দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের এ দিনটির কথা মিশু আজও ভুলতে পারছে না।

১৮. মিশু কোন রাতের কথা ভুলতে পারছে না?
(ক) ৭ মার্চ রাত (খ) ১৪ মার্চ রাত
(গ) ২১ মার্চ রাত (ঘ) ২৫ মার্চ রাত

১৯. উক্ত হত্যাকাণ্ড থেকে রেহাই পায় নাই—
i. ছাত্র
ii. শিক্ষক
iii. বিভিন্ন পেশাজীবী
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২০. সোমনাথ মন্দির কোথায় অবস্থিত?
(ক) দিল্লি (খ) রাজস্থান
(গ) উত্তর প্রদেশ (ঘ) গুজরাট

২১. ভারতবর্ষের প্রাচীনতম অধিবাসী কারা?
(ক) আর্য (খ) শক (গ) হুন (ঘ) দ্রাবিড়

২২. তরাইনের প্রথম যুদ্ধে কে জয়লাভ করে?
(ক) মুহাম্মদ ঘুরি (খ) কুতুবউদ্দিন আইবেক
(গ) পৃথ্বিরাজ (ঘ) জয় চাঁদ

উদ্দীপকটি পড়ে ২৩ ও ২৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
সুলতানপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান উচ্চাভিলাষী ও ক্ষমতাশালী ছিলেন। তিনি তার পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নের ওপর আক্রমণ করে প্রচুর অর্থ-সম্পদ লুট করেন।

২৩. উদ্দীপকের চেয়ারম্যানের কর্মকাণ্ডের সহিত পাঠ্যবইয়ের কোন শাসকের কর্মকাণ্ড সাদৃশ্যপূর্ণ?
(ক) মুহাম্মদ বিন কাসিম
(খ) সুলতান মাহমুদ
(গ) মুহাম্মদ ঘুরি
(ঘ) কুতুবউদ্দিন আইবেক

২৪. উক্ত শাসকের এরূপ কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য ছিল—
i. রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিধান করা
ii. রাষ্ট্রকে সমৃদ্ধশালী করা
iii. বিশ্ব দরবারে পরিচিতি লাভ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৫. 'কিতাব-উল-হিন্দ' গ্রন্থের রচয়িতা কে?
(ক) ইবনে হায়সাম (খ) আল বেরুনি
(গ) আমির খসরু (ঘ) আল রাজি

২৬. মুসলিম বিজয়ের পূর্বে সিন্ধুর রাজা কে ছিলেন?
(ক) হর্ষবর্ধন (খ) শশাঙ্ক
(গ) পৃথ্বিরাজ (ঘ) দাহির

২৭. 'স্বর্গীয় বধূ' মসজিদের নির্মাতা কে ছিলেন?
(ক) মুহাম্মদ বিন কাসিম
(খ) আল-ওয়ালিদ
(গ) সুলতান মাহমুদ
(ঘ) কুতুবউদ্দিন আইবেক

২৮. 'ক' নামক এলাকায় বহুবিবাহ প্রচলিত থাকলেও বিধবা বিবাহ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ছিল। এটি প্রাচীন ভারতের কোন অবস্থার ইঙ্গিত বহন করে?
(ক) সামাজিক (খ) রাজনৈতিক
(গ) ধর্মীয় (ঘ) অর্থনৈতিক

২৯. ভারতের নিম্নবর্ণের হিন্দুরা কেন ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়?
i. ইসলামের সাম্য ও শান্তির বার্তা পেয়ে
ii. আরব বণিকদের সাথে ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে
iii. শাসকদের নিপীড়ন থেকে মুক্তি লাভের আশায়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩০. 'ইয়ামিন-উদ-দৌলা' ও 'আমির-উল-মিল্লাত' কার উপাধি?
(ক) মুহাম্মদ বিন কাসিম
(খ) মুহাম্মদ ঘুরি
(গ) সুলতান মাহমুদ
(ঘ) কুতুবউদ্দিন আইবেক

উত্তর	১	খ	২	ক	৩	খ	৪	খ	৫	গ	৬	ক	৭	খ	৮	খ	৯	খ	১০	ক	১১	গ	১২	ক	১৩	ক	১৪	ক	১৫	ক
	১৬	খ	১৭	ক	১৮	ঘ	১৯	ঘ	২০	ঘ	২১	ঘ	২২	গ	২৩	খ	২৪	ঘ	২৫	খ	২৬	ঘ	২৭	গ	২৮	ক	২৯	গ	৩০	গ

ঢাকা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, দিনাজপুর, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও যশোর বোর্ড ২০২১

সময় — ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **সৃজনশীল প্রশ্ন** পূর্ণমান — ৭০

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যে কোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১.▶ প্রাচীনকাল হতেই দেশের শিল্প নগরীর সাথে ছোট শহর-বন্দরের মধ্যে নৌপথে বাণিজ্যিক পণ্য পরিবহনের পাশাপাশি একটা সাংস্কৃতিক যোগাযোগও গড়ে ওঠে। ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় বড় ব্যবসায়ী ইসমত সাহেব নরসিংদী শহর থেকে সাতটি জাহাজে করে শিল্পের কাঁচামাল, কিছু শ্রমিক, উপঢৌকন ও ব্যবসায়ের অর্থ ঢাকায় পাঠাচ্ছিলেন। জাহাজগুলো নারায়ণগঞ্জ আসলে একদল ডাকাত কর্তৃক মালামাল লুণ্ঠিত হয়। ইসমত সাহেব নারায়ণগঞ্জ প্রশাসনের কাছে এর আশু বিচারসহ ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। কিন্তু এর যথাযথ জবাব ও ক্ষতিপূরণ লাভে তিনি ব্যর্থ হন। এতে মালামাল গ্রহীতার মনে ক্ষোভ দেখা দেয়।

ক. আরবদের সিন্ধু বিজয়ী বীরের নাম কী? ১
খ. রাজা দাহিরের স্ত্রী 'জওহর ব্রত' পালন করেন কেন? ব্যাখ্যা দাও। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনাটি প্রাক-সালতানাত যুগের কোন বিজয়াভিযানের সাথে সংগতিপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত বিজয়কে কি 'নিষ্ফল বিজয়' বলে আখ্যায়িত করা যায়? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

২.▶ মোঙ্গল নেতা কুবলাই খান মধ্য এশিয়ায় বারবার অভিযান পরিচালনা করতেন। কিন্তু তিনি সেসব অভিযানে বিজয়ী হয়ে সেখানে আধিপত্য বিস্তার না করে বরং সেখানকার ধন-সম্পদ লুটতরাজ করে নিয়ে রাজধানী পিকিংকে সমৃদ্ধশালী করতেন। কুবলাই খান শিল্প-সাহিত্যের সমঝদার ছিলেন। তিনি একজন কবিকে দিয়ে কাব্যগ্রন্থ লিখিয়ে তার পারিশ্রমিক ওয়াদামতো প্রদান করেননি।

ক. সুলতান মাহমুদ কোথাকার সুলতান ছিলেন? ১
খ. সুলতান মাহমুদের সোমনাথ মন্দির বিজয় ইতিহাসে বিখ্যাত কেন? ২
গ. উদ্দীপকের মহাকাব্য বিষয়ক ঘটনাটি সুলতান মাহমুদের কোন ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, কুবলাই খানের মতো সুলতান মাহমুদও একই উদ্দেশ্যে বারবার ভারত অভিযান পরিচালনা করেছিলেন? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩.▶ অটোমান সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ ইউরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের সম্মিলিত শক্তির নেতৃত্বদানকারী হাঙ্গেরির বিখ্যাত সেনাপতি হুনিয়াদির কাছে যুদ্ধে হেরে যান এবং সন্ধি করতে বাধ্য হন। পরে ইউরোপীয় শক্তিবর্গ সন্ধি ভঙ্গ করেন এবং ভার্না নগরী অবরোধ করেন। সুলতান মুরাদ হুনিয়াদিকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার জন্য চল্লিশ হাজার সৈন্য নিয়ে ভার্নায় উপস্থিত হন। ১৪৪৪ খ্রিস্টাব্দে উভয় বাহিনীর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হুনিয়াদি পরাস্ত হন এবং হাঙ্গেরির রাজা নিহত হন। এভাবে সুলতান মুরাদ প্রথম যুদ্ধে হুনিয়াদির কাছে হেরে যাওয়ার প্রতিশোধ নিলেন। ফলে উত্তর ইউরোপীয় অটোমান অংশ আশঙ্কামুক্ত হলো।

ক. পৃথ্বিরাজ কোন বংশের রাজা ছিলেন? ১
খ. রাজা পৃথ্বিরাজের সাথে রাজা জয়চন্দ্রের দ্বন্দ্বের কারণ ব্যাখ্যা করো।২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ভার্নার যুদ্ধের সাথে মুহাম্মদ ঘুরি পরিচালিত কোন যুদ্ধের মিল খুঁজে পাও? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের যুদ্ধের ফলাফলের সাথে মুহাম্মদ ঘুরির উক্ত যুদ্ধের ফলাফলের পার্থক্য ছিল— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৪.▶ পৃথিবীর দীর্ঘ সময় ঘটা ভাষা আন্দোলনের মধ্যে মানভূমের বাংলা ভাষা আন্দোলন একটি। ১৯৪৮ হতে ১৯৫৬ সালের মধ্যে এই আন্দোলন তীব্রভাবে ছড়িয়ে পড়ে মানভূমের বাঙালিদের মধ্যে। ১৯৫৬ সালের আগে পুরুলিয়া জেলা বিহারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেই সময় রাজনৈতিকভাবে স্কুল-কলেজ ও সরকারি দপ্তরে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। জাতীয় কংগ্রেসের বাংলাভাষী সদস্যদের দ্বারা হিন্দির বিরুদ্ধে আন্দোলনের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। গঠিত হয় 'লোকসেবক সংঘ' নামে জাতীয়তাবাদী দল। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি এতে যোগদান করে। আন্দোলনে হাজার হাজার বাংলাভাষী কারাবরণ করে। ফলে ১৯৫৬ সালে ভারত সরকার মানভূম জেলা ভেঙে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সঙ্গে পুরুলিয়া নামে একটি নতুন জেলা সংযুক্ত করতে বাধ্য হয়।

ক. একজন ভাষা শহিদের নাম লেখো। ১
খ. শহিদ মিনার নির্মাণের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত মানভূমের ভাষা আন্দোলনের সাথে তোমার পঠিত কোন আন্দোলনের সাদৃশ্য খুঁজে পাও? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত আন্দোলনে 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ নিহিত ছিল'— পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৫.▶ ১৯৬৯ সালে ভারতের ৪র্থ লোকসভায় অন্তর্কলহের কারণে ইন্দিরা গান্ধী দল থেকে বহিষ্কৃত হন। ফলে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। গরিষ্ঠ সংখ্যক কংগ্রেস সদস্য ও স্বীয় তৃণমূল সমর্থকদের নিয়ে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (আর) বা মূল কংগ্রেস গঠিত হয়। অপরদিকে মোরারজি দেশাই-এর নেতৃত্বে মাত্র ৩২ জন কংগ্রেস সদস্য নিয়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (অর্গানাইজেশন) গঠিত হয়। ১৯৭১ সালে ভারতের সাধারণ নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধীর দল ৫১৮টি আসনের মধ্যে ৩৫২টি লাভ করে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। অন্যদিকে মোরারজি দেশাই এর দল অর্ধেক আসন হারায়।

ক. যুক্তফ্রন্ট কী? ১
খ. উর্দুকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার মূল উদ্দেশ্য কী ছিল? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে ১৯৭১ সালে ভারতের সাধারণ নির্বাচনের সাথে তোমার পঠিত কোন নির্বাচনের মিল খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত নির্বাচনে ঐক্যজোটের বিজয় অর্জনের ফলে রাজনৈতিক নেতৃত্বে যে পরিবর্তন এসেছিল তা মূল্যায়ন করো। ৪

৬.▶ চীনের উত্তর-পশ্চিমে শিনচিয়াং উইগুর স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলটি অবস্থিত। এখানে দক্ষিণ শিনচিয়াং (তারিন বেসিন)-এ ৪৫.২১% তুর্কি মুসলিম এবং উত্তর শিনচিয়াং (জাজ্ঞারিয়া)-এ ৪০.৫৭% হান ও হুই নামের মূল চীনারা বসবাস করে। তিয়ানশান পর্বতমালা দ্বারা এই দুই অঞ্চল বিভক্ত। উইগুর মুসলিমরা মূল চীনা হিসেবে নিজেদের দাবি করে এবং তারা তাদের স্বতন্ত্র ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে নিজেদের স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত। কিন্তু চীন সরকার তাদের স্বাধীনতা দিতে নারাজ। যুগ যুগ ধরে হান ও হুই চীনাদেরকে উইগুর মুসলিমদের থেকে আলাদা করা হয়েছে এবং শিক্ষা-সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিকভাবে সর্বাত্মক সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে উইগুরের মুসলিমদের উপরে চলে শোষণ, ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা আর শিক্ষা-সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক বৈষম্য।

ক. যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি প্রতীক কী ছিল? ১
খ. '১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয় ছিল মূলত বাঙালি জাতীয়তাবাদেরই বিজয়'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত উইগুরের মুসলিমদের প্রতি যে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয় তা তোমার পঠিত কোন ঘটনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে কর? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত বৈষম্যের বিভিন্ন দিকের ওপর তুলনামূলক আলোচনা করো। ৪

৭.▶ মিন্দানাও ফিলিপাইনের মূল ভূখণ্ড থেকে একটি বিচ্ছিন্ন প্রদেশ। দেশের উভয় অঞ্চলের মধ্যে বেশ দূরত্ব। এ অবস্থায় মূল ভূখণ্ডে অবস্থিত কেন্দ্রীয় সরকার মিন্দানাও এর জনগণকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। এতে মিন্দানাও এর বিক্ষুব্ধ জনগণ সংসদে ন্যায্য প্রতিনিধিত্ব, আলাদা মুদ্রা ব্যবস্থা ও নিজস্ব আধা-সামরিক বাহিনী গঠনের তিন দফা দাবি তোলে। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার তাদের প্রতি আরও কঠোরতা প্রদর্শন করে।

ক. পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীতে কোন অঞ্চলের প্রাধান্য ছিল? ১
খ. পাকিস্তান সরকার আরবি হরফে বাংলা লেখার পায়তারা করেছিল কেন?২
গ. উদ্দীপকে মিন্দানাওয়ের ভৌগোলিক অবস্থানের সাথে পাকিস্তানের কোন প্রদেশের অবস্থানের সামঞ্জস্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত তিন দফা দাবির আলোকে বাঙালির ছয় দফা দাবি মূল্যায়ন করো। ৪

৮.▶ দক্ষিণ আফ্রিকার অবিসংবাদিত-কৃষ্ণাঙ্গ নেতা ছিলেন নেলসন ম্যান্ডেলা। রাজপরিবারে জন্ম হলেও বর্ণবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রামের কারণে তিনি দীর্ঘ আটাশ বছর কারাবাস খেটেছেন। ছাত্রজীবনে বর্ণবাদী আচরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিস্কৃত হন। তার আদর্শে গড়া দল এএনসি (আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস)— কে এক পর্যায়ে নিষিদ্ধ করা হলে শ্বেতাঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে তিনি সশস্ত্র সংগ্রামের ডাক দেন। ১৯৬২ সালে তাকে বন্দি করে প্রথমে পাঁচ বছর ও পরে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। সত্তরের দশকে 'ব্ল্যাক কনসাসনেস মুভমেন্ট' নামে জঙ্গি আন্দোলন শুরু হয়। কারাগারে স্টিভ বিকো নামে এক শিক্ষার্থীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে নেলসন ম্যান্ডেলাসহ সকল রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিতে গণআন্দোলন শুরু হয়। পরিশেষে বর্ণবাদী সরকার ১৯৯০ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি আলোচনায় বসে এবং ১১ ফেব্রুয়ারি ম্যান্ডেলাকে মুক্তি দেয়। লাখো জনতার উদ্দেশ্যে কেপটাউনের টাউন হলের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ভাষণ দেন। ১৯৯৪ সালের গণতান্ত্রিক নির্বাচনে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

ক. ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে কোন দল বিজয়ী হয়? ১
খ. আগরতলা মামলা (১৯৬৮ খ্রি.) কেন করা হয়েছিল? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিতে সংঘটিত গণআন্দোলনের সাথে তোমার পঠিত বইয়ের কোন ঘটনার মিল খুঁজে পাও? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত আন্দোলনের ফলাফল পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

৯.▶ নির্বাচনে হামাসের কাছে ফিলিস্তিনের ক্ষমতাসীন পার্টি পিএলও হেরে গেলেও প্রেসিডেন্ট ইসমাইল হানিয়া ক্ষমতা ছাড়তে অস্বীকার করে। ফলে ইসরাইলের দুইদিকে ফিলিস্তিনের দুই অংশ পশ্চিম তীর ও গাজা প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। হামাসের অধীনে গাজা শাসিত হয় এবং পিএলও'র অধীনে থাকে পশ্চিম তীর। তবে উভয়ই ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের অধীনে থাকে।

ক. মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী একটি রাজনৈতিক দলের নাম লেখো। ১
খ. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চায়নি কেন? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত ফিলিস্তিনের নির্বাচনের সাথে পাকিস্তানের কোন নির্বাচনের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা দাও। ৩
ঘ. উদ্দীপকের নির্বাচন পরবর্তী অবস্থা পাকিস্তানের অবস্থার মতো ছিল না— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১০.▶ ভিয়েতনাম যুদ্ধ শুরুর অব্যবহিত পূর্বে নেতা হো চি মিন জনগণের উদ্দেশ্যে যে ভাষণ দেন তাতেই যুদ্ধের প্রস্তুতির সবকিছু তুলে ধরেন। এই ভাষণ থেকেই ভিয়েতনামি জনগণ যুদ্ধ-জয়ের মূলমন্ত্র পেয়ে যান। ফলে যুদ্ধ শুরুর আগেই দেশের প্রতিটি অঞ্চলে জনতা ঐক্যবদ্ধ হয়ে শত্রুকে প্রতিরোধের প্রস্তুতি নেয়।

ক. মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তানের রাজধানী কোথায় ছিল? ১
খ. অস্থায়ী সরকার কেন গঠিত হয়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত ভাষণের সাথে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ পূর্ববর্তী কোন ভাষণের সামঞ্জস্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত ভাষণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। ৪

১১.▶ মায়ানমার সেনাবাহিনী তাদের দেশের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে শুধু ধর্মের দোহাই দিয়ে নির্যাতন করতে থাকে। ফলে সে দেশের প্রায় ১২ লক্ষ রোহিঙ্গা শরণার্থী হিসেবে বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। বিতাড়নের পূর্বে সেনাসদস্যরা তাদের বাড়িঘরে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। নির্বিচারে গণহত্যা করে। যুবতী নারীদের ধরে শ্লীলতাহানী করে। স্থানীয় বৌদ্ধরা রোহিঙ্গাদের বাড়িঘরে লুটতরাজ করে।

ক. বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি কে? ১
খ. বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির পিতা বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের সাথে মুক্তিযুদ্ধকালীন কোন বাঙালি জনগোষ্ঠীর মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নৃশংসতার বর্ণনা দাও। ৪

সিলেট ও বরিশাল বোর্ড ২০২১

সময় — ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **সৃজনশীল প্রশ্ন** পূর্ণমান — ৭০

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যে কোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১.▶ ছাতক ও ভোলাগঞ্জে চলাচলকারী পাথরবাহী নৌকাগুলো ডাকুয়াবিল এলাকায় প্রায়ই ডাকাতদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়। এতে ছাতকের পাথর ব্যবসায়ীরা মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হলে ছাতক ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ডাকুয়াবিল এলাকার চেয়ারম্যানের কাছে জড়িতদের শাস্তি দাবি করেন। কিন্তু তিনি এর কোনো প্রতিকার না পেয়ে শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে পুলিশের সহায়তায় ডাকাতদের আক্রমণ করেন। ফলে উভয়পক্ষের সংঘর্ষে ডাকাত প্রধান নিহত হয় এবং তার অনুসারীরা পালিয়ে যায়। উক্ত অভিযান ডাকুয়াবিল এলাকার মানুষের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।

ক. সোমনাথ মন্দির কোথায় অবস্থিত? ১
খ. মুহাম্মদ বিন কাসিমের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ছাতক ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের অভিযানের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন অভিযানের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, উক্ত বিজয় সাদৃশ্যপূর্ণ অঞ্চলের অধিবাসীদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করছিল? যুক্তি দাও। ৪

২.▶ সুন্দরবনের বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী বাকুড়া ও হিজলডাঙ্গার অধিবাসীদের মধ্যে শত্রুতা দীর্ঘদিনের। বাকুড়ায় হঠাৎ করে মহিম নামে এক সাহসী যোদ্ধার আবির্ভাব হয়। তার নেতৃত্বে বাকুড়াবাসী হিজলডাঙ্গায় অসংখ্যবার আক্রমণ চালায় এবং প্রত্যেকবারই হিজলডাঙ্গাবাসীকে পরাজিত করে ব্যাপক লুটতরাজ চালিয়ে প্রচুর ধনসম্পদ হস্তগত করে। লুণ্ঠিত সম্পদ দ্বারা মহিম বাকুড়াকে সুন্দর করে গড়ে তোলেন।

ক. 'শাহনামা' মহাকাব্যের রচয়িতা কে? ১
খ. আলাউদ্দিন হোসেনকে 'জাহানসুজ' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের মহিমের অভিযানের সাথে প্রাক-সালতানাত যুগের কোন শাসকের অভিযানের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. সাদৃশ্যপূর্ণ শাসক শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যেই অভিযান পরিচালনা করেছিলেন— বিশ্লেষণ করো। ৪

৩.▶ খসরুশাহ সিনাই রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করে উত্তরের হেলমান্দ রাজ্যে বেশ কয়েকবার অভিযান পরিচালনা করে প্রত্যেকবারই ব্যর্থ হন। পরে তিনি রাজ্যজয়ের নেশায় দক্ষিণের হিরাত সাম্রাজ্য আক্রমণ করে প্রথমবার পরাজিত হন। কিন্তু দ্বিতীয়বার অভিযান পরিচালনা করে হিরাত সাম্রাজ্যের সম্রাট বিজয় সিংহকে পরাজিত ও নিহত করে হিরাত অধিকার করে সেখানে শাসন প্রতিষ্ঠা করে।

ক. কোন মুসলিম সেনাপতি সর্বপ্রথম সিন্ধু বিজয় করেন? ১
খ. 'শাহনামা' কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের খসরুশাহের হেলমান্দ ও হিরাত অভিযানের সাথে প্রাক-সালতানাত যুগের কোন শাসকের অভিযানসমূহের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. খসরুশাহের মতো সাদৃশ্যপূর্ণ শাসকও অধিকৃত অঞ্চলে স্থায়ী শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন— উক্তিটি মূল্যায়ন করো। ৪

৪.▶ অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে বসবাসরত বাঙালিরা প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসের একটি বিশেষ দিন উদযাপন করেন। তারা দিনের শুরুতে "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো" গানটি পরিবেশনের মাধ্যমে দিবসের কার্যক্রমের সূচনা করেন। তারপর তারা খালি পায়ে প্রভাত ফেরি করে একটি বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। অপরাহ্নে তারা মাতৃভাষার চেতনায় দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সকল শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ার শপথের মাধ্যমে দিবসের কার্যক্রমের সমাপ্তি করেন।

ক. তমদ্দুন মজলিশের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১
খ. কালরাত কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের কর্মকাণ্ডে বাঙালির কোন আন্দোলনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত আন্দোলনের চেতনা পরবর্তী সকল আন্দোলনে প্রেরণা যুগিয়েছিল— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৫.▶ ভারতের জাতীয় নির্বাচনে জোটবন্ধ রাজনীতির সূচনা হয় ১৯৭৭ সালে ষষ্ঠ সাধারণ নির্বাচনে। এ নির্বাচনে ভারতীয় জনসংঘ, ভারতীয় লোকদল, সংগঠন কংগ্রেস ও সংযুক্ত সোশ্যালিস্ট পার্টিকে নিয়ে জনতা পার্টি গঠিত হয়েছিল। উক্ত নির্বাচনে মোরারজি দেশাইয়ের নেতৃত্বে সংযুক্ত জোট "জনতা পার্টি" ইন্দিরা গান্ধির নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস দলকে পরাজিত করে। কংগ্রেসের জনবিচ্ছিন্নতা ও জনতা পার্টির গ্রামীণ উন্নয়ন নীতি নির্বাচনে তাদের বিজয়ের প্রধান কারণ বলে ধারণা করা হয়।

ক. যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি প্রতীক কী ছিল? ১
খ. ১৪ ডিসেম্বর বিখ্যাত কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে ভারতের জোটবন্ধ নির্বাচন পাকিস্তান আমলের কোন নির্বাচনকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. জাতীয় নির্বাচনে জনতা পার্টির বিজয়ের কারণ ও উক্ত জোটের বিজয়ের কারণ ছিল ভিন্ন— বিশ্লেষণ করো। ৪

৬.▶ ১৯৫৬ সালের ১ জানুয়ারি সুদান ব্রিটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। ভৌগোলিকভাবে সুদান উত্তর ও দক্ষিণ এ দুভাগে বিভক্ত। গোটা সুদানের খনিজ তেলের শতকরা ৭৫ ভাগই দক্ষিণ সুদানে অবস্থিত। সুদানের রাজস্বের ৯৮ ভাগ আসে দক্ষিণ সুদানের এই খনিজ তেলের অর্থ থেকে। সুদানের ভূখণ্ডের উত্তর অংশের বেশির ভাগ এলাকা মরুভূমি। কিন্তু দক্ষিণ সুদান অনেক উর্বর ও প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। অথচ এই প্রাকৃতিক ও কৃষিজাত সম্পদ থেকে অর্জিত আয়ের বৃহৎ অংশ উত্তর সুদানের উন্নয়নে ব্যয় হয়। এছাড়াও সামরিক ও প্রশাসনিক বৈষম্যের ফলে দুই অঞ্চলের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বাধে। পরবর্তীতে ২০১১ সালের ৯ জুলাই সুদান ভেঙে 'গণতান্ত্রিক দক্ষিণ সুদান' নামে আরেকটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

ক. মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশকে কয়টি সেক্টরে ভাগ করা হয়? ১
খ. মুক্তিযোদ্ধাদের জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সুদানের বৈষম্যের সাথে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার কোন কোন বৈষম্যের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের দক্ষিণ সুদানের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির তুলনায় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছিল অর্থনৈতিকভাবে আরো বেশি সমৃদ্ধ— বিশ্লেষণ করো। ৪

৭.▶ নেলসন ম্যান্ডেলা তার জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠায় আপসহীন একজন ব্যক্তি ছিলেন। বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনের কারণে তাকে ১৯৬৩-১৯৯০ সাল পর্যন্ত ২৭ বছর জেলে থাকতে হয়েছে। বাংলাদেশেও এরূপ একজন মহান নেতার জন্ম হয়েছিল যাকে এদেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনের বেশির ভাগ সময় জেলে কাটাতে হয়েছে। তিনি পাকিস্তান সামরিক সরকারের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক বৈষম্য থেকে বাংলার মানুষের মুক্তির জন্য একটি ঐতিহাসিক প্রস্তাব পেশ করেন, যা ইতিহাসে বাঙালির মুক্তির সনদ নামে পরিচিত।

ক. যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার প্রথম দফা কী ছিল? ১
খ. যুক্তফ্রন্ট কেন গঠন করা হয়েছিল? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত নেলসন ম্যান্ডেলার সাথে বাংলার কোন মহান নেতার জীবনের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত নেতার উত্থাপিত প্রস্তাবের পথ ধরে আমাদের স্বাধীনতা অর্জিত হয়— উক্তিটির স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৮.▶ মহিষখলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সরকার থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দের বেশির ভাগ অর্থ তার নিজ এলাকার উন্নয়নে ব্যয় করেন। ফলে ইউনিয়নের উন্নয়ন বঞ্চিত অঞ্চলের লোকজন ক্ষুব্ধ হয়ে সুজাউদ্দিনের নেতৃত্বে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলেন। এ ন্যায্য আন্দোলন বন্ধ করার জন্য চেয়ারম্যান সাহেব সুজাউদ্দিনের বিরুদ্ধে প্রতারণার মামলা দায়ের করে তাকে গ্রেফতার করান। কিন্তু পরবর্তীসময়ে জনগণের আন্দোলনে বাধ্য হয়ে চেয়ারম্যান তার মামলা প্রত্যাহার করে তাকে মুক্তির ব্যবস্থা করেন।

ক. ভাষা আন্দোলন কত সালে সংঘটিত হয়? ১
খ. ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছিল কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মামলার সাথে পাকিস্তান আমলের কোন মামলার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আন্দোলনটি ছিল উদ্দীপকের আন্দোলন অপেক্ষা অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ— উক্তিটি মূল্যায়ন করো। ৪

৯.▶ নিচের সারণিটি লক্ষ করো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

দলের নাম	পূর্ব পাকিস্তানের প্রাপ্ত আসন সংখ্যা	পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাপ্ত আসন সংখ্যা
আওয়ামী লীগ	১৬০	০০
পিপিপি	০০	৮৩
মুসলিম লীগ (কাইয়ুম)	০০	০৯
মুসলিম লীগ (কনভেনশন)	০০	০২
মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)	০০	০৭
জমিয়ত-উল-উলমা	০০	০৭
মারকাযী জমিয়ত-উল-উলেমা	০০	০৭
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি	০০	০৬
জামাতে ইসলামি	০০	০৪
পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি	০১	০০
স্বতন্ত্র	০১	১৩

ক. আগরতলা মামলার আসামি কতজন ছিলেন? ১
খ. ৭ মার্চের ভাষণ ইতিহাসে স্মরণীয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের সারণিটি পাকিস্তানি আমলের কোন নির্বাচনকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বাংলাদেশের ইতিহাসে উক্ত নির্বাচনের গুরুত্ব পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১০.▶ "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

ক. মহান মুক্তিযুদ্ধের সেনাপ্রধান কে ছিলেন? ১
খ. ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের উক্তিটিতে ১৯৭১ সালের কোন ঘটনার চিত্র ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত ঐতিহাসিক ঘটনার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ৪

১১.▶ মনীষা নাসির উদ্দীন ইউসুফ পরিচালিত গেরিলা চলচ্চিত্রটি দেখছিল। মুভিটিতে সে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্নে বাঙালিদের ওপর পাক-বাহিনীর নির্মম হত্যাযজ্ঞ দেখে বিস্মিত হয়। সিনেমায় দেখানো হচ্ছিল কীভাবে নিরপরাধ বাঙালিদের ধরে হত্যা করছে পাক-বাহিনী। তাছাড়া বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা যুবসমাজকে কীভাবে আত্মত্যাগে উজ্জীবিত করেছিল তা খুব সাবলীলভাবে মুভিতে ফুটিয়ে তুলেছেন এর শিল্পীরা।

ক. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে কোন দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে? ১
খ. অপারেশন সার্চলাইট বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের 'গেরিলা' চলচ্চিত্রে মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্নের কোন হত্যাযজ্ঞের চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা বাঙালিদের আত্মত্যাগে উজ্জীবিত করেছিল" — তোমার মতামত দাও। ৪

সকল বোর্ড ২০২২

সেট: ক

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি দ্বিতীয় পত্র

বিষয় কোড: | ২ | ৬ | ৮ |

সময় — ২০ মিনিট

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

পূর্ণমান — ১৫

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: — যে কোনো পনেরোটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. আরব কর্তৃক সিন্ধু বিজিত হয় কত খ্রিষ্টাব্দে?
(ক) ৭১০ (খ) ৭১১ (গ) ৭১২ (ঘ) ৭১৩

২. সিন্ধুরাজ দাহিরের রাজধানী ছিল—
(ক) আলোর (খ) ব্রাহ্মণাবাদ
(গ) মুলতান (ঘ) সিস্তান

৩. সিন্ধু বিজয়ের প্রত্যক্ষ কারণ কোনটি?
(ক) ভারতে ধন-সম্পদ লাভের আকাঙ্ক্ষা
(খ) রাজা দাহির কর্তৃক আরব বিদ্রোহীদের আশ্রয়দান
(গ) ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসার
(ঘ) সিন্ধু জলদস্যু কর্তৃক আরব জাহাজ লুণ্ঠন

৪. সোমনাথ মন্দির কোথায় অবস্থিত?
(ক) সিন্ধু (খ) গুজরাট
(গ) দিল্লি (ঘ) লাহোর

উদ্দীপকটি পড়ে ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
গ্রিক বীর আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণ ভারতের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। পারস্য ও আফগানিস্তান তার দখলে এলে তিনি ভারতের দিকে দৃষ্টি দেন এবং ঝিলাম নদী ও সিন্ধু নদের বেশকিছু অঞ্চল তার অধিগত হয়।

৫. উদ্দীপকের গ্রিক বীর আলেকজান্ডারের সাথে কোন শাসকের তুলনা করা যায়?
(ক) সুলতান মাহমুদ (খ) সবুক্তগীন
(গ) আলপ্তগীন (ঘ) মুহাম্মদ ঘুরি

৬. উক্ত শাসক ছিলেন—
i. দিগ্বিজয়ী বীর ii. দক্ষ সমর সংগঠক
iii. শ্রেষ্ঠ শাসক
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৭. ভারতীয় উপমহাদেশে স্থায়ী মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন কে?
(ক) মুহাম্মদ বিন কাসিম (খ) সুলতান মাহমুদ
(গ) মুহাম্মদ ঘুরি (ঘ) সুলতান গিয়াসউদ্দীন

৮. তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয় কত খ্রিষ্টাব্দে?
(ক) ১১৯০ (খ) ১১৯১ (গ) ১১৯২ (ঘ) ১১৯৩

৯. মুহাম্মদ ঘুরির সামরিক অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল—
i. ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপন
ii. নিজ রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষা
iii. সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশ সাধন
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১০. ভারতের ইতিহাসে কে সর্বপ্রথম কামানের ব্যবহার করেন?
(ক) সুলতান মাহমুদ (খ) মুহাম্মদ ঘুরি
(গ) ইব্রাহিম লোদি (ঘ) সম্রাট বাবর

১১. পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবরের সাফল্যের কারণ—
i. ভারতবর্ষে তার অধিক জনপ্রিয়তা ছিল
ii. তার সেনারা ছিল অধিক দক্ষ ও সুশিক্ষিত
iii. তিনি ছিলেন বিজ্ঞ ও সুনিপুণ সেনানায়ক
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১২. 'তুযুক-ই-বাবুরি' বা বাবুরনামা কোন ধরনের গ্রন্থ?
(ক) কল্পকাহিনি নির্ভর
(খ) আত্মজীবনীমূলক
(গ) ধর্মীয় অনুশাসনভিত্তিক
(ঘ) বিজ্ঞানভিত্তিক

উদ্দীপকটি পড়ে ১৩ ও ১৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
মধ্যগড়ের রাজা ভূমি সংস্কারের অংশ হিসেবে প্রজাদের জমির মালিকানা সত্ত্ব স্বীকার করে তাদের দলিল প্রদান করেন এবং প্রজারাও নিয়মিত খাজনা প্রদান করবেন মর্মে অঙ্গীকারনামা দেন।

১৩. উদ্দীপকের ভূমি সংস্কার কোন শাসকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?
(ক) বাবর (খ) শেরশাহ
(গ) আকবর (ঘ) জাহাঙ্গীর

১৪. উক্ত শাসক ছিলেন—
i. একজন সাহসী বীর
ii. সমরকুশলী সেনানায়ক
iii. একজন সুদক্ষ শাসক
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৫. শের শাহের বাল্যনাম কী?
(ক) কাশিম (খ) মাহমুদ
(গ) ফরিদ (ঘ) বাহরাম

১৬. সম্রাট হুমায়ুন কত খ্রিষ্টাব্দে ভারতে মুঘল আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন?
(ক) ১৫৫৫ (খ) ১৫৫৬
(গ) ১৫৫৭ (ঘ) ১৫৫৮

১৭. 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থের রচয়িতা কে?
(ক) টোডরমল (খ) আবুল ফজল
(গ) বীরবল (ঘ) মানসিংহ

উদ্দীপকটি পড়ে ১৮ ও ১৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
বর্তমান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা নববর্ষ আরও জমকালোভাবে উদযাপিত হচ্ছে। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এটি একটি জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে। ফলে সকলের মাঝে আন্তরিকতা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও একতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১৮. উদ্দীপকে সম্রাট আকবরের কোন নীতিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে?
(ক) রাজস্ব নীতি (খ) দাক্ষিণাত্য নীতি
(গ) ধর্মীয় নীতি (ঘ) রাজপুত নীতি

১৯. সম্রাট আকবরের উক্ত নীতি প্রবর্তনের উদ্দেশ্য ছিল—
i. ধর্মীয় মতবিরোধের অবসান
ii. মুঘল সাম্রাজকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা
iii. একটি জাতীয় ধর্মমত প্রতিষ্ঠা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২০. সম্রাট জাহাঙ্গীর প্রবর্তিত 'দস্তুরুল আমল'-এ কয়টি আইন ছিল?
(ক) ১০টি (খ) ১২টি (গ) ১৪টি (ঘ) ১৬টি

২১. নুরজাহানের প্রকৃত নাম কী?
(ক) মেহের-উন-নিসা (খ) লাডলী বেগম
(গ) নূরমহল (ঘ) আরজুমান্দ বানু

২২. কোন সম্রাটকে 'The Prince of Builders' আখ্যা দেওয়া হয়েছে?
(ক) সম্রাট আকবর (খ) সম্রাট জাহাঙ্গীর
(গ) সম্রাট শাহজাহান (ঘ) সম্রাট আওরঙ্গজেব

২৩. 'তাজমহল' নির্মাণে কত বছর সময় লেগেছিল?
(ক) ১৬ বছর (খ) ১৮ বছর
(গ) ২০ বছর (ঘ) ২২ বছর

২৪. সম্রাট আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্য নীতি গ্রহণ করেছিলেন, কারণ—
i. বিজাপুর ও গোলকুন্ডা রাজ্য মুঘল সাম্রাজ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ ছিল
ii. শিবাজির নেতৃত্বে মারাঠা জাতির উত্থানে ভবিষ্যৎ ক্ষতির আশঙ্কা ছিল
iii. অর্থনৈতিকভাবে সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী করার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ২৫ ও ২৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
"আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি"।

২৫. উদ্দীপকের চরণ দুটি কোন আন্দোলনকে স্মরণ করিয়ে দেয়?
(ক) ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন
(খ) ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন
(গ) ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন
(ঘ) ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলন

২৬. উক্ত আন্দোলনের ফলে—
i. পূর্ব বাংলার হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়
ii. ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে
iii. জাতীয় চেতনার সূত্রপাত ঘটায়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৭. ২৫ মার্চের গণহত্যা কী নামে পরিচিত?
(ক) অপারেশন রেবেল হান্ট
(খ) অপারেশন সার্চলাইট
(গ) অপারেশন ক্লিন হার্ট
(ঘ) অপারেশন জ্যাকপট

২৮. কত তারিখে মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়?
(ক) ৮ এপ্রিল, ১৯৭১ (খ) ৯ এপ্রিল, ১৯৭১
(গ) ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ (ঘ) ১১ এপ্রিল, ১৯৭১

২৯. ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে পাক-বাহিনীর দোসর ছিল—
i. রাজাকার বাহিনী
ii. আল-বদর বাহিনী
iii. আলশামস বাহিনী
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩০. ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর পক্ষে আত্মসমর্পণ দলিলে কে স্বাক্ষর করেন?
(ক) মেজর জেনারেল জমশেদ
(খ) লে. জেনারেল নিয়াজি
(গ) রিয়ার এডমিরাল শরিফ
(ঘ) ব্রিগেডিয়ার বকর সিদ্দিক

উত্তর	১	গ	২	ক	৩	ঘ	৪	খ	৫	ক	৬	ঘ	৭	গ	৮	গ	৯	ক	১০	ঘ	১১	গ	১২	খ	১৩	খ	১৪	ঘ	১৫	গ
	১৬	ক	১৭	খ	১৮	গ	১৯	ক	২০	খ	২১	ক	২২	গ	২৩	ঘ	২৪	ক	২৫	ক	২৬	ঘ	২৭	খ	২৮	গ	২৯	ঘ	৩০	খ

ঢাকা, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর, চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল বোর্ড ২০২২

সেট: ০৩ **ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি দ্বিতীয় পত্র** বিষয় কোড: | ২ | ৬ | ৮ |

সময় — ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট **সৃজনশীল প্রশ্ন** পূর্ণমান — ৪০

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যে কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১.▶ ফরাসি সরকারের সেনাপতি নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দে মিসর বিজয় করেন। কিন্তু নেপোলিয়ন ও ফরাসিরা বেশিদিন মিসরে অবস্থান করতে পারেননি। তবে মিসরের ইতিহাসে এ বিজয় ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এর ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী।

ক. রাজা দাহিরের স্ত্রীর নাম কী? ১
খ. ভিনসেন্ট স্মিথ ভারতবর্ষকে 'নৃতত্ত্বের জাদুঘর' বলেছেন কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. সম্রাট নেপোলিয়নের মিসর বিজয়ের সাথে আরবদের কোন অভিযানের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত বিজয়ের ফলাফল উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

২.▶ অটোমান সুলতান অরখান জেনিসারি বাহিনী গঠন করে বিভিন্ন রাজ্যে অভিযান পরিচালনা করেন। এসব রাজ্য থেকে অর্থ-সম্পদ লুণ্ঠন করে তিনি নিজ দেশের উন্নয়ন ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন। তিনি একটি দ্বীপের সুসজ্জিত ও সুরক্ষিত উপাসনালয়ে সংরক্ষিত মূল্যবান অর্থ-সম্পদের সন্ধান পেয়ে সেটি আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। স্থানীয় অধিবাসীরা প্রাণপণ চেষ্টা করেও উপাসনালয়টিকে লুণ্ঠনের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেননি। তবে তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও স্থাপত্য শিল্পের একজন উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

ক. 'শাহনামা' মহাকাব্যের রচয়িতা কে ছিলেন? ১
খ. আল বিরুনির পরিচয় দাও। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত উপাসনালয়টি আক্রমণের সাথে সুলতান মাহমুদের কোন অভিযানের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের সুলতানের মতো তোমার পঠিত সুলতান মাহমুদও একই উদ্দেশ্যে সম্পদ সংগ্রহ করেন— উক্তিটি মূল্যায়ন করো। ৪

৩.▶ চীন ও তিব্বতের মধ্যবর্তী একটি স্থানের নাম মঙ্গোলিয়া। এই স্থানে বিখ্যাত এক বীরের জন্ম হয়। মধ্য এশিয়ার ইতিহাসে অনন্যসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন এই মঙ্গোলিয়ান বীর হালাকু খানের নাম সর্বাগ্রে। তিনি তার পিতা টুলি খানের কাছ থেকে ১২৫৬ খ্রিষ্টাব্দে উক্ত অঞ্চলের শাসন ক্ষমতা লাভ করেন এবং ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদে অভিযান পরিচালনা করে তা ধ্বংস করেন। পরবর্তীতে সেখানে তিনি একটি নতুন এবং স্থায়ী রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। তার প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের নামকরণ করা হয় ইলখানি রাজবংশ।

ক. 'জাহানসুজ' কার উপাধি? ১
খ. সতীদাহ প্রথা কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের মঙ্গোলিয়ান বীর হালাকু খানের মাধ্যমে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন বীরের/শাসকের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? আলোচনা করো। ৩
ঘ. তোমার পঠিত উক্ত বীর/শাসক কর্তৃক ভারতে একটি স্থায়ী মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার বিবরণ দাও। ৪

৪.▶ প্রাথমিক জীবনে তৈমুর লঙ সিস্তান অভিযানকালে নির্বিঘ্নে রাজধানীতে প্রবেশ করেন। সিস্তান অধিপতি রাজধানী ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নেন। তৈমুর যখন নিশ্চিন্তে রাজধানীতে বিশ্রামরত তখন সিস্তানের সৈন্যরা তাকে ঘিরে ফেলে। এরূপ অতর্কিত আক্রমণে তৈমুর লঙ পরাজিত হয়ে কোনোমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যান। এমনকি কিছু দিনের জন্য তিনি রাজ্যহারা হন।

ক. 'বাবর' শব্দের অর্থ কী? ১
খ. কবুলিয়ত ও পাট্টা বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের সিস্তান অভিযানের সাথে মুঘল সম্রাট হুমায়ুনের কোন অভিযানের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত যুদ্ধের ফলাফল মূল্যায়ন করো। ৪

৫.▶ খলিফা আল হাকিম তার রাজ্যের সকল ধর্মাবলম্বীকে একই পতাকাতলে আনার জন্য একটি নতুন ধর্মমতের প্রচলন করেন। কিন্তু সর্বসাধারণের মধ্যে এই ধর্মমত জনপ্রিয় না হওয়ায় অনেকেই প্রত্যাখ্যান করেন। তার জীবদ্দশায় কতিপয় ব্যক্তি এই ধর্মমত গ্রহণ করলেও তার মৃত্যুর সাথে সাথে এর ইতি ঘটে। তথাপি ইতিহাসে তাকে 'Al-Hakim the Great' নামে অভিহিত করা হয়।

ক. পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ কত খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়? ১
খ. 'মনসবদারি প্রথা' কী? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত শাসকের সাথে কোন মুঘল শাসকের মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে উক্ত মুঘল শাসকের ধর্মনীতি পর্যালোচনা করো। ৪

৬.▶

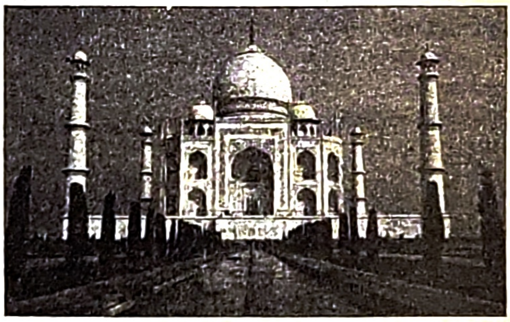

ক. নূরজাহান এর প্রকৃত নাম কী? ১
খ. 'বাবুরনামা' কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের চিত্রটি কোন মুঘল সম্রাটের স্থাপত্যকর্মের নিদর্শন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. স্থাপত্য শিল্পে উক্ত শাসকের অবদান মূল্যায়ন করো। ৪

৭.▶ জহিরুল ইসলাম সাহেব একটি স্বনামধন্য কোম্পানির মালিক। তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে কোম্পানির মালিকানা নিয়ে তার পুত্রদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এক ভাই অন্য ভাইয়ের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে পিতার মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। পরবর্তীকালে ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব প্রকট আকার ধারণ করে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে রূপ নেয়। পরবর্তীতে বিজয়ী ভ্রাতা কোম্পানিটিকে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন।

ক. সর্বশেষ মুঘল সম্রাটের নাম কী? ১
খ. 'ময়ূর সিংহাসন' কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব মুঘল আমলের কোন সম্রাটের রাজত্বকালের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে সম্রাটের বিজয়ী পুত্রের সফলতা উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৮.▶ ১৯৫৭ সালে ইংল্যান্ডের শাসন ক্ষমতায় আসেন হ্যারল্ড ম্যাকমিলান। সমসাময়িককালে আয়ারল্যান্ডবাসীর জীবনে চরম দুঃখ-দুর্দশা নেমে আসে। এ অবস্থা হতে পরিত্রাণের জন্য এগিয়ে আসেন একজন মহান নেতা— শন ম্যাকব্রাইড। তিনি আয়ারল্যান্ডবাসীর মুক্তির আশায় স্বাধিকার ও স্বায়ত্তশাসনের দাবি তুলে ধরেন। বেশ কিছু দাবি নিয়ে আন্দোলন শুরু হলে চতুর হ্যারল্ড ম্যাকমিলান তাদের দমনে একটি মিথ্যা ষড়যন্ত্রমূলক মামলার আশ্রয় নেন। ফলশ্রুতিতে আন্দোলন আরো বেগবান হয় এবং ১৯৬৩ সালে তিনি পদত্যাগে বাধ্য হন।

ক. মৌলিক গণতন্ত্রের আদেশ জারি করেন কে? ১

খ. বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বলা হয় কোনটিকে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ষড়যন্ত্রমূলক মামলা তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন মামলার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. পাঠ্যপুস্তকের আলোকে উক্ত মামলাটির কার্যক্রম ও ফলাফল পর্যালোচনা করো। ৪

৯.▶

ক. 'কে' ফোর্সের অধিনায়ক কে ছিলেন? ১

খ. ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের চিত্রগুলো আমাদের জাতীয় জীবনের কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের উক্ত ঘটনাই আমাদের স্বাধীনতার পথকে ত্বরান্বিত করেছিল" — উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১০.▶ দক্ষিণ আফ্রিকার গণতান্ত্রিক ইতিহাসে নেলসন ম্যান্ডেলা একটি স্মরণীয় নাম। রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি বিশ্বে অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। কৃষ্ণাঙ্গ হয়েও তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট পদে আসীন হন। স্বৈরাচারী শাসকের শোষণের হাত থেকে তিনি নিপীড়িত মানুষকে মুক্তি দিয়েছেন। পৃথিবীর গণতন্ত্র ও মুক্তিকামী মানুষের কাছে আজও তিনি অমর এবং চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

ক. বাংলাদেশের সাংবিধানিক নাম কী? ১

খ. মুক্তিযুদ্ধে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত নেলসন ম্যান্ডেলার কর্মকাণ্ডের সাথে তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন মহান নেতার কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তোমার পঠিত উক্ত মহান নেতার বলিষ্ঠ ও আপসহীন নেতৃত্বে বাঙালি জাতি স্বাধীনতা লাভ করেছে— পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১১.▶

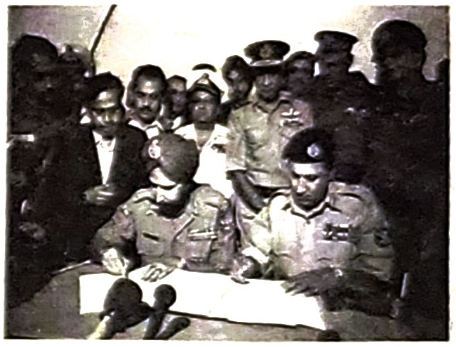

ক. বাংলাদেশের জাতীয় দিবস কত তারিখে পালন করা হয়? ১

খ. আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে রাজাকার, আল-বদর বাহিনীর ভূমিকা কী ছিল? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের চিত্রটি কোন ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী? আলোচনা করো। ৩

ঘ. উক্ত ঐতিহাসিক ঘটানার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ৪

রাজশাহী, কুমিল্লা ও যশোর বোর্ড ২০২২

সেট: ০১

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি দ্বিতীয় পত্র

বিষয় কোড: ২ ৬ ৮

সময় — ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান — ৪০

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যে কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১.▶ জনাব ইমরান চৌধুরী দক্ষিণাঞ্চলের বন্যা দুর্গতদের সাহায্য করার জন্য লঞ্চে ত্রাণ সামগ্রী পাঠায়। পথিমধ্যে দুর্বৃত্তরা ত্রাণবাহী লঞ্চ ছিনতাই করে। অভিযোগ পেশ করার পরও দুর্বৃত্তদের গ্রেফতার ও মালামাল উদ্ধার হয়নি। তাই তিনি স্থানীয় জেলা প্রশাসনের কাছে এর আশু বিচারসহ ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। এর যথাযথ জবাব ও ক্ষতিপূরণ লাভে ব্যর্থ হলে তার মনে ক্ষোভের সঞ্চার হয়।

ক. গজনি বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? ১

খ. তরাইনের প্রথম যুদ্ধ কেন হয়েছিল? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনায় মুসলমানদের কোন অভিযানের চিত্র ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত ঘটনাকে কি 'নিষ্ফল বিজয়' বলে আখ্যায়িত করা যায়? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

২.▶ সুলতান আলম বারবার অন্য দেশে অভিযান পরিচালনা করেন। প্রায় প্রতিবারই তিনি জয়লাভ করে প্রচুর ধন-সম্পদসহ নিজ রাজ্যে ফিরে আসেন। তার রাজ্যকে একটি সমৃদ্ধশালী রাজ্যে পরিণত করাই ছিল এই অভিযানসমূহের মূল উদ্দেশ্য।

ক. ভারতে স্বাধীন মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন কে? ১

খ. আরবদের সিন্ধু বিজয়ের কারণ কী? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনার সাথে তোমার পঠিত কোন শাসকের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উক্ত শাসক শুধু সেনানায়কই ছিলেন না, একটি রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন"— বিশ্লেষণ করো। ৪

৩.▶ সুলতান নাসিরউদ্দিন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ সকল সমস্যা সমাধান করেন। তিনি অন্য একটি রাজ্যকে জয় করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। প্রথম যুদ্ধে তিনি প্রতিপক্ষের নিকট পরাজিত হন। এই পরাজয়ের গ্লানি মোচনের জন্য তিনি পরবর্তী বছর দ্বিতীয় যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। প্রতিপক্ষের সৈন্য সংখ্যা অধিক হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। তিনি বিজয়ীর গৌরব অর্জন করেন এবং স্থায়ী রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।

ক. সোমনাথ মন্দির কোথায় অবস্থিত? ১
খ. সিন্ধু বিজয়ের প্রকৃত কারণ কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত যুদ্ধ তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন যুদ্ধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের দ্বিতীয় যুদ্ধ ছিল 'চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকারী যুদ্ধ'— বিশ্লেষণ করো। ৪

৪.▶ আশরাফ চৌধুরী পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলের অধিপতি ছিলেন। কিন্তু নিকট আত্মীয়দের ষড়যন্ত্রের কারণে ঐ রাজ্য তার হাতছাড়া হয়ে যায়। পরবর্তীতে তিনি অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পার্শ্ববর্তী রাজ্য আক্রমণ করেন। উন্নত রণকৌশল ও কামান ব্যবহার করে তিনি প্রতিবেশীর বিশাল সেনাবাহিনীকে যুদ্ধে পরাজিত করতে সক্ষম হন। একটি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার গৌরব অর্জন করেন।

ক. হুমায়ুন কত সালে সিংহাসনে বসেন? ১
খ. গ্রান্ড-ট্রাঙ্ক রোড সম্পর্কে টীকা লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের সাথে ভারতবর্ষের কোন শাসকের মিল খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত শাসকের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করো। ৪

৫.▶ এক মুঘল সম্রাটের নামের অর্থ ছিল সৌভাগ্যবান। সম্রাট হিসেবে রাষ্ট্র পরিচালনায় তিনি প্রথম জীবনে ব্যর্থ হয়েছিলেন। পরবর্তীতে আফগান নেতা সোলায়মানের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে ভারতবর্ষ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। তবে জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ক. পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়? ১
খ. 'দ্বীন-ই-ইলাহি' বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের সাথে ভারতবর্ষের কোন যুদ্ধের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মুঘল-আফগান যুদ্ধে শেরশাহের সফলতার কারণসমূহ বিশ্লেষণ করো। ৪

৬.▶ সালমান সাহেব একজন চেয়ারম্যান ছিলেন। তার এলাকার অধিকাংশ মানুষ ছিল ভিন্ন ধর্মাবলম্বী। তিনি বুঝতে পারলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে অসন্তুষ্ট রেখে এলাকার উন্নয়ন করা সম্ভব নয়। তাই তিনি ভিন্ন ধর্মের এক রমণীকে বিয়ে করলেন এবং উক্ত সম্প্রদায়ের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের সুব্যবস্থা করে দিলেন। ফলে উক্ত সম্প্রদায়ের সাথে সালমান সাহেবের সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে।

ক. কোন শব্দ থেকে 'মুঘল' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে? ১
খ. কবুলিয়ত ও পাট্টা কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে কোন মুঘল সম্রাটের কোন নীতির কথা ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত নীতির ফলাফল বিশ্লেষণ করো। ৪

৭.▶ জামান চৌধুরীর শাসনকালের শেষদিকের অবস্থা ভালো ছিল না। তার চার পুত্রের মধ্যে সিংহাসনের উত্তরাধিকারকে কেন্দ্র করে ব্যাপক দ্বন্দ্ব হয়। পুত্রদের মধ্যে একজন ক্ষমতা দখল করে চৌধুরী সাহেবকে বন্দি করেন। বন্দি অবস্থায় দশ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ক. নূরজাহানের প্রকৃত নাম কী? ১
খ. সম্রাট আওরঙ্গজেবকে 'জিন্দাপির' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে মুঘল সম্রাটের সময়ের উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বের মিল রয়েছে— ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে উক্ত উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বের মূল কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

৮.▶ সুমনের বাবা বলল, শহিদ মিনার, প্রভাতফেরি এসব অর্থহীন আনুষ্ঠানিকতা বা লৌকিকতা নয়। এর রয়েছে অধিকার প্রতিষ্ঠার বিরাট এক গৌরবময় ইতিহাস। সেই ইতিহাস রক্ত দানের। রক্ত ঢেলে দিয়েছিল— সালাম, বরকতসহ আরও অনেক সংগ্রামী যুবক।

ক. বঙ্গভঙ্গ রদ হয় কত সালে? ১
খ. লাহোর প্রস্তাবের মূল বিষয় কী ছিল? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের কোন আন্দোলনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহ সংক্ষেপে বর্ণনা করো। ৩
ঘ. উক্ত আন্দোলনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ৪

৯.▶পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানিদের ওপর চরম নির্যাতন চালাত। তারা সকল প্রকার ব্যাংক, বিমা ও বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলো পশ্চিম পাকিস্তানে গড়ে তুলেছিল। পূর্ব পাকিস্তানের সস্তা কাঁচামাল দিয়ে তাদের অধিকাংশ বাণিজ্য কেন্দ্র ও কলকারখানা চালাত। ফলে সহজেই সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হয়ে যেত। এ কারণেই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ কখনোই আলোর মুখ দেখেনি।

ক. কত সালে আওয়ামী লীগ গঠিত হয়? ১
খ. 'আগরতলা মামলা' বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে পূর্ব পাকিস্তানের ওপর কোন কোন ক্ষেত্রে বৈষম্যের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত বৈষম্যের ফলেই "পূর্ব পাকিস্তান সর্বদাই পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর নির্ভরশীল ছিল"— মন্তব্যটি মূল পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১০.▶ জনৈক ব্যক্তির জন্ম ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের একটি নির্দিষ্ট তারিখে। উক্ত তারিখে তার বাবাসহ শত শত বাঙালিকে পাকিস্তানি সৈন্যরা গণহত্যা করেছিল। দুঃখের সেই স্মৃতি তাকে কাঁদায়। ছাত্র, শিক্ষক, ডাক্তার, সাংবাদিকসহ কোনো বুদ্ধিজীবীই গণহত্যা থেকে রেহাই পায়নি।

ক. ছয় দফা কে উত্থাপন করেন? ১
খ. ১৯৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করেছিল কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. 'উক্ত হত্যাকাণ্ডের সাথে তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন হত্যাকাণ্ডের মিল রয়েছে? বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. 'উক্ত হত্যাকাণ্ড ছিল জাতিকে মেধাশূন্য করার নীল নকশা'— বিশ্লেষণ করো। ৪

১১.▶ আমাদের এই মাতৃভূমিকে ভালোবাসে না এমন একটি মানুষও পাওয়া যাবে না। তবে কেউ কেউ মাতৃভূমিকে অনেক বেশি ভালোবেসেছেন। শহিদ তিতুমীর তেমনি একজন ব্যক্তিত্ব। দেশমাতৃকার জন্য তাদের অবদান চিরস্মরণীয়। তাদের আত্মত্যাগ, দেশপ্রেম আমাদের জন্য অনুকরণীয়। তিনি নিজের জীবন দিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

ক. প্রথম কোন দেশ বাংলাদেশকে স্বাধীন হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করে? ১
খ. বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ বাংলার ইতিহাসে অবিস্মরণীয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. তিতুমীরের জীবনের ঘটনাবলির সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কোন ঘটনাবলির সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'তিতুমীরের মতো বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছেন'— এ উক্তিটি তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

সকল বোর্ড-২০২৩

সেট: গ

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি দ্বিতীয় পত্র

বিষয় কোড ২ ৬ ৮

সময় — ৩০ মিনিট

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

পূর্ণমান — ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: — সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. শের শাহের সাম্রাজ্য কয়টি সরকারে বিভক্ত ছিল?
(ক) ৪৭টি (খ) ৪৫টি
(গ) ৪৩টি (ঘ) ৪১টি

২. সম্রাট জাহাঙ্গীর কেন 'Bell of Justice' টাঙিয়ে দেন?
(ক) আজান দেওয়ার জন্য
(খ) সম্রাটের ফরমান ঘোষণা করতে
(গ) রাজস্ব আদায়ের আপডেট নিতে
(ঘ) নিরীহ প্রজাদের অভিযোগ শুনতে

৩. 'ময়ূর সিংহাসন' কে নির্মাণ করেন?
(ক) সম্রাট বাবর
(খ) সম্রাট আকবর
(গ) সম্রাট শাহজাহান
(ঘ) সম্রাট আওরঙ্গজেব

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

আসামের মুখ্যমন্ত্রী স্যার বিমল প্রসাদ ঘোষণা করেন 'অসমিয়া' হবে আসামের একমাত্র রাজ্য ভাষা। এ ঘোষণার প্রতিবাদ করে আসামের জনগোষ্ঠীর একাংশ। তারা 'কাছাড় সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে হরতালের ডাক দেয়।

৪. উদ্দীপকের কাছাড় সংগ্রাম পরিষদের সাথে নিচের কোনটির সাদৃশ্য রয়েছে?
(ক) তমদ্দুন মজলিশ
(খ) সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ
(গ) যুক্তফ্রন্ট
(ঘ) ভাষা সংগ্রাম পরিষদ

৫. উদ্দীপকের মতো তোমার পাঠ্যবইয়ের আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্ব হচ্ছে—
i. জাতীয় চেতনা বৃদ্ধি
ii. বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির উন্নতি
iii. অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে শেখা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৬. কত সালে বাংলা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করে?
(ক) ১৯৫৩ (খ) ১৯৫৪
(গ) ১৯৫৫ (ঘ) ১৯৫৬

৭. ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের ফলাফল ছিল—
i. শেখ মুজিবুর রহমানের কারামুক্তি
ii. আইয়ুব খানের পতন
iii. গণতান্ত্রিক শাসন কায়েম
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৮. কয়টি দলের সমন্বয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়?
(ক) ২টি (খ) ৩টি
(গ) ৪টি (ঘ) ৫টি

৯. ১৯৭১ সালের কত তারিখ 'কালরাত' হিসেবে পরিচিত?
(ক) ২৫ মার্চ (খ) ২৬ মার্চ
(গ) ১৪ ডিসেম্বর (ঘ) ১৬ ডিসেম্বর

১০. মুজিবনগর সরকার কত তারিখে শপথ গ্রহণ করে?
(ক) ১০ এপ্রিল, ৭১ (খ) ১৭ এপ্রিল, ৭১
(গ) ২০ এপ্রিল, ৭১ (ঘ) ২৭ এপ্রিল, ৭১

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১১ ও ১২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

মিয়ানমারের সামরিক সরকার রোহিঙ্গাদের ওপর গণহত্যা, গণধর্ষণ, নির্যাতন, ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটসহ সকল প্রকার অমানবিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। গণহত্যার হাত থেকে বাঁচতে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে।

১১. উদ্দীপকের নির্যাতন ও গণহত্যার সাথে নিচের কোন ঘটনার সাদৃশ্য রয়েছে?
(ক) পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের নির্যাতন
(খ) পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের নির্যাতন
(গ) পশ্চিম বাংলার প্রতি ব্রিটিশদের নির্যাতন
(ঘ) পূর্ব বাংলার প্রতি ব্রিটিশদের নির্যাতন

১২. উক্ত গণহত্যার উদ্দেশ্য ছিল—
i. জাতিকে মেধাশূন্য করা
ii. জাতিকে নেতৃত্বহীন করা
iii. নিজেদের বীরত্ব প্রকাশ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৩. শেখ মুজিবুর রহমান কত তারিখে স্বদেশে ফিরে আসেন?
(ক) ৮ জানুয়ারি ১৯৭২ (খ) ৯ জানুয়ারি ১৯৭২
(গ) ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ (ঘ) ১১ জানুয়ারি ১৯৭২

১৪. স্বাধীনতা দিবসের গুরুত্ব হচ্ছে—
i. পাক শোষক শ্রেণির পরাজয়
ii. স্বাধীনতা বিরোধীদের জয়
iii. স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৫. 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' কোথায় অবস্থিত?
(ক) মুজিবনগর (খ) মেহেরপুর
(গ) আগ্রাবাদ (ঘ) কালুরঘাট

১৬. নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় অবস্থিত ছিল?
(ক) মালবে (খ) আজমিরে
(গ) বিহারে (ঘ) গুজরাটে

১৭. 'সূর্যদেবী ও পরিমলদেবী' কে ছিলেন?
(ক) সিন্ধু ও মুলতানের রানি
(খ) রাজা দাহিরের কন্যা
(গ) রাজা দাহিরের স্ত্রীদ্বয়
(ঘ) দেবল ও আলোরের রানি

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৮ ও ১৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

মুসলিম বিজয়ের আগে স্পেনে বর্ণ ও জাতিভেদ প্রথা প্রবল আকার ধারণ করে। সমাজে ঐক্য ও সংহতি চরমভাবে বিনষ্ট হয়। ধর্মীয় ও সামাজিক নিপীড়ন থেকে মুক্তি পেতে নিম্নবর্ণের জনগণ মুক্তির পথ খোঁজে। ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে মুসা ও সেনাপতি তারিক বিন জিয়াদ অত্যাচারী রাজা রডারিককে পরাজিত করে স্পেনে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮. উদ্দীপকের ঘটনাটির সাথে ভারতের মুসলমানদের কোন অভিযানের সাদৃশ্য রয়েছে?
(ক) সোমনাথ অভিযান
(খ) সিন্ধু অভিযান
(গ) উত্তর ভারত অভিযান
(ঘ) গুজরাট অভিযান

১৯. মুসলমানদের উক্ত অভিযানের কারণ ছিল—
i. সাম্রাজ্যবাদী নীতি
ii. রাজা দাহিরের ঔদ্ধত্য
iii. হিন্দু বিরোধী নীতি
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২০. গজনি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?
(ক) সুলতান মাহমুদ (খ) আলপ্তগীন
(গ) সবুক্তগীন (ঘ) সুলতান মাসুদ

২১. 'ইয়ামিন-উদ-দৌলা' কার উপাধি ছিল?
(ক) মুহাম্মদ বিন কাসিম
(খ) সুলতান মাহমুদ
(গ) মুহাম্মদ ঘুরি
(ঘ) হাজ্জাজ বিন ইউসুফ

২২. মুহাম্মদ ঘুরির ভারত অভিযানের কারণ ছিল—
i. সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা
ii. ইসলাম প্রচার
iii. নিজ রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৩. বাংলায় কত খ্রিষ্টাব্দে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়?
(ক) ১২০২ (খ) ১২০৩
(গ) ১২০৪ (ঘ) ১২০৫

২৪. বাবর কাদের আমন্ত্রণে ভারতীয় উপমহাদেশে অভিযান পরিচালনা করেন?
(ক) আলম খান ও দৌলত খান
(খ) আলম খান ও তাজ খান
(গ) দৌলত খান ও দাউদ খান
(ঘ) তাজ খান ও ইসা খান

২৫. পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবরের জয়লাভের কারণ—
i. বাবরের উচ্চাশা
ii. কামান ও গোলা বারুদের ব্যবহার
iii. অদম্য সাহস
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৬. সম্রাট হুমায়ুন কাকে একদিনের জন্য দিল্লির সিংহাসন উপহার দিয়েছিলেন?
(ক) মীর আব্বাসকে
(খ) আজম খানকে
(গ) ভিস্তিওয়ালা নিজামকে
(ঘ) মির্জা কামরানকে

২৭. ১৫৩৯ খ্রিষ্টাব্দে একটি যুদ্ধে মুঘল সম্রাট হুমায়ুন পরাজিত হয় এবং পালাতে গিয়ে গঙ্গা নদীতে ডুবে মরার উপক্রম হয়। এ যুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কিত হলো—
i. চৌসার যুদ্ধ
ii. বিলগ্রামের যুদ্ধ
iii. শের খানের 'শেরশাহ' উপাধি লাভ

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৮. শেরশাহের বংশের নাম কী?
(ক) খিলজি বংশ (খ) পাঠান বংশ
(গ) মুঘল বংশ (ঘ) শূর বংশ

২৯. 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থের রচয়িতা কে?
(ক) শেখ মোবারক (খ) আবুল ফজল
(গ) সম্রাট আকবর (ঘ) ফৈজী

৩০. সম্রাট আকবরের কোন উপদেষ্টা 'খান-ই-খানান' উপাধি প্রাপ্ত হন?
(ক) শাহবাজ খান (খ) বাহাদুর খান
(গ) আদম খান (ঘ) বৈরাম খান

উত্তর	১	ক	২	ঘ	৩	গ	৪	খ	৫	ঘ	৬	ঘ	৭	ক	৮	ঘ	৯	ক	১০	খ	১১	খ	১২	ক	১৩	গ	১৪	খ	১৫	ঘ
	১৬	গ	১৭	খ	১৮	খ	১৯	ক	২০	গ	২১	খ	২২	ঘ	২৩	গ	২৪	ক	২৫	ঘ	২৬	গ	২৭	খ	২৮	ঘ	২৯	খ	৩০	ঘ

ঢাকা, রাজশাহী, দিনাজপুর, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, সিলেট, যশোর ও বরিশাল বোর্ড ২০২৩

সেট: ০২ **ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি দ্বিতীয় পত্র** বিষয় কোড ২ ৬ ৮
সময় — ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **সৃজনশীল প্রশ্ন** পূর্ণমান — ৭০

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যে কোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১.▶ যমুনার এক পাশে টাঙ্গাইল ও অন্য পাশে সিরাজগঞ্জ জেলা অবস্থিত। টাঙ্গাইলের এলেঙ্গাচরের লোকেরা অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির ছিল। একদিন সিরাজগঞ্জের এক জেলে নদীতে নৌকা দিয়ে মাছ ধরছিল। এমন সময় এলেঙ্গাচরের কিছু লোক এসে নৌকাসহ মাছ লুট করে নিয়ে যায়। ঘটনাটি সিরাজগঞ্জের সদর উপজেলা চেয়ারম্যানকে জানালে তিনি এলেঙ্গাচরের উপজেলা চেয়ারম্যানের কাছে ক্ষতিপূরণ এবং ডাকাত দলকে হস্তান্তরের দাবি জানান। এলেঙ্গাচরের উপজেলা চেয়ারম্যান জানান ডাকাতদের ওপর তার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। তিনি ক্ষতিপূরণ ও ডাকাত দলকে হস্তান্তরের দাবি অস্বীকার করেন। ফলে সিরাজগঞ্জ এলাকার লোকজন এলেঙ্গাচরবাসীর ওপর হামলা চালায়।

ক. সিন্ধু বিজয়ী মুসলিম সেনাপতির নাম কী? ১
খ. রাজা দাহিরের স্ত্রী 'জওহর ব্রত' পালন করেন কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে তোমার পাঠ্য বিষয়ের কোন ঘটনার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত ঘটনার সুদূরপ্রসারী ফলাফল বিশ্লেষণ করো। ৪

২.▶ আফ্রিকার একটি উপজাতি সূর্যদেবতার মন্দিরকে সবচেয়ে নিরাপদ ও শক্তির আধার মনে করে তাদের সকল ধন-সম্পদ সেখানে গচ্ছিত রাখে। তাদের বিশ্বাস শত্রু যত শক্তিশালীই হোক সূর্যদেবতা তাদের রক্ষা করবে। মন্দিরে ধন-সম্পদ গচ্ছিত রাখার বিষয়ে একটি ইউরোপীয় অভিযাত্রী দল অবগত হয়। তাদের স্বপ্ন ছিল হাওয়াই দ্বীপে তারা একটি অবকাশ কেন্দ্র স্থাপন করবে। এ জন্য মন্দির লুণ্ঠন করার মনস্থির করে। অভিযাত্রীরা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে মন্দির আক্রমণ করে। উপজাতিরা প্রাণপণ লড়াই করেও পরাজিত হয়। অভিযাত্রীরা মন্দির থেকে প্রচুর ধন-সম্পদ হস্তগত করে।

ক. শাহনামার রচয়িতা কে? ১
খ. আল-বিরুনির পরিচয় দাও। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'সূর্য দেবতার' মন্দির আক্রমণের সাথে সুলতান মাহমুদের কোন অভিযানের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের অর্থনৈতিক দিকটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৩.▶ অটোমান সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে সুলতান উসমানের নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এশিয়া মাইনরে বিদ্রোহ দমনের পর তিনি একে একে সমগ্র উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল জয় করেন। এরপর তিনি নাইমিয়া, ব্রুসা, কারাসাই, পেরগোমস প্রভৃতি বিজয় করেন। আর ১৩৩৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি নিকোমেডিয়ার প্রথম যুদ্ধে সাময়িক পরাজিত হলেও ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি নিকোমেডিয়ার দ্বিতীয় যুদ্ধে বিজয় অর্জন করে সমগ্র এশিয়া মাইনরে তুর্কি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এভাবে উন্নত সামরিক কৌশল, শত্রুপক্ষের বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা প্রভৃতিই এশিয়া মাইনরে সুলতান উসমানকে স্থায়ীভাবে তুর্কি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছিল।

ক. মুহাম্মদ ঘুরির প্রকৃত নাম কী? ১
খ. তরাইনের প্রথম যুদ্ধ কাদের মধ্যে সংঘটিত হয়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের শাসকের সাথে তোমার পঠিত কোন শাসকের সাথে মিল লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত শাসকের সামরিক সফলতার কারণগুলো উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৪.▶ উসমানের পূর্ব পুরুষরা গোবি মরুভূমির একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসক ছিলেন। যেখানে শত্রুপক্ষের শক্তির কারণে সুবিধা করতে না পেরে তারা এশিয়া মাইনরে চলে আসেন। এশিয়া মাইনরে বহুদিন ধরে সেলজুকরা শাসন করলেও উত্তরাঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেশ কিছু স্বাধীন ও শক্তিশালী গ্রিক রাজ্য বিদ্যমান ছিল। উসমান শেষ সেলজুক সুলতান আলাউদ্দিনের পতন ঘটিয়ে সেখানে উসমানীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শক্তিশালী গ্রিক রাজাদেরও পরাজিত করে যে বিশাল উসমানীয় সাম্রাজ্য গঠন করেন তা কয়েক শতাব্দী স্থায়ী হয়েছিল।

ক. পানিপথের প্রথম যুদ্ধ কবে সংঘটিত হয়? ১
খ. তাজমহল কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উসমানীয়দের এশিয়া মাইনরে আগমনের সাথে ভারতে কোন মুঘল শাসকের আগমনের সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় উক্ত শাসকের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করো। ৪

৫.▶ শিখ ধর্মের প্রবর্তক গুরু নানক পাকিস্তানের লাহোরে এক হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্মের বাইরে গিয়ে এক নতুন ধর্মমত প্রচার করেন। হিন্দুধর্ম ও ইসলাম ধর্মের সংমিশ্রণে একেশ্বরবাদী শিখ ধর্ম অনেকেই গ্রহণ করে। এ ধর্মের গ্রন্থসাহেব নামে একটি ধর্মগ্রন্থ রয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বর্তমানে অনেক শিখ ধর্মানুসারীরা বসবাস করছে।

ক. ভারতীয় উপমহাদেশে কে প্রথম কামানের ব্যবহার করেন? ১
খ. মনসবদারি প্রথা বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের গুরু নানকের সাথে কোন মুঘল সম্রাটের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের ধর্মমত এখনো টিকে থাকলেও উক্ত শাসকের ধর্মমতটি তার মৃত্যুর সাথে সাথেই বিলুপ্ত হয়"— উক্তিটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৬.▶ কীর্তিপাশার জমিদার মহিম রায় চৌধুরী খুবই রুচিবান ও শৌখিন মানুষ ছিলেন। তিনি জমিদারি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি জাঁকজমকপূর্ণ দরবারহল নির্মাণ করেছিলেন। পাশাপাশি তার নির্মিত কাচারি বাড়ি নায়েব মহল আজও স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে আছে। একই সময়ে নির্মিত নাট মন্দিরটি এখনও ধর্মীয় কাজে ব্যবহৃত হয়। তাঁর স্ত্রী কমলাদেবী অনিন্দ্য সুন্দরী ও বিদুষী রমনী ছিলেন। জমিদার মহিম রায় চৌধুরীর স্ত্রীর প্রতি ছিল অপরিসীম ভালোবাসা। কিন্তু এক দুর্ঘটনায় পড়ে কমলাদেবী অকালে মৃত্যুবরণ করলে জমিদার খুবই মুষড়ে পড়েছিলেন। তিনি স্ত্রীর স্মৃতি রক্ষার্থে বহু অর্থ ব্যয়ে যে সৌধটি নির্মাণ করেন, আজও তা বিদ্যমান রয়েছে।

ক. সম্রাট শাহজাহানের পিতার নাম কী? ১
খ. সম্রাট শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে সংঘটিত উত্তরাধিকার যুদ্ধের প্রধান কারণটি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের কমলাদেবীর সাথে কোন মুঘল সম্রাটের মহীয়সীর সামঞ্জস্য রয়েছে? বিশ্লেষণ করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের জমিদার মহিম রায় চৌধুরীর কর্মকাণ্ডের আলোকে উক্ত সম্রাটের স্থাপত্যকীর্তির মূল্যায়ন করো। ৪

৭.▶ "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো, একুশে-ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি?"

ক. আবুল বরকত কে ছিলেন? ১
খ. 'তমদ্দুন মজলিশ' কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের চরণ দুটি তোমার পঠিত কোন আন্দোলনকে স্মরণ করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত আন্দোলন বাঙালিকে যে চেতনায় উজ্জীবিত করেছিল তা পর্যালোচনা করো। ৪

৮.▶ হোসনি মোবারক মিসরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর সামরিক বাহিনীর সহায়তায় স্বৈরাচারী নীতিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে থাকেন। বিরোধী দলের মতামতকে অগ্রাহ্য করে তিনি দেশের একটি অঞ্চলের ওপর কঠোর দমননীতি চালু করেন। দেশের আপামর জনসাধারণ তার অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন শুরু করে। সরকার পতনের এ আন্দোলনের মুখে হোসনি মোবারক পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

ক. ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের প্রথম শহিদ কে? ১
খ. পূর্ব পাকিস্তানের ওপর শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্যের বর্ণনা দাও। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারকের সাথে পাকিস্তানের কোন শাসকের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আন্দোলনের মতো উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ছিল পাকিস্তানের ইতিহাসের সফল ও বড় গণআন্দোলন—ব্যাখ্যা করো। ৪

৯.▶ ১৯৯০ সালে মিয়ানমারে এক ঐতিহাসিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ নির্বাচনে গণতন্ত্রপন্থি নেত্রী অংসান সুচির দল 'ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসি' বিপুল ভোটে জয়লাভ করলেও ক্ষমতাসীন জান্তা সরকার সুচির হাতে ক্ষমতা ছেড়ে না দিয়ে বরং তাকে উল্টো রাষ্ট্রদ্রোহী বলে গৃহবন্দি করে রাখে।

ক. কখন বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়া হয়? ১
খ. আগরতলা মামলার উদ্দেশ্য কী ছিল? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মিয়ানমারের উক্ত নির্বাচনের সাথে বাংলাদেশের কোন ঐতিহাসিক নির্বাচনের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, উক্ত নির্বাচন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে ত্বরান্বিত করে? তোমার মতামত বিশ্লেষণ করো। ৪

১০.▶ বসনিয়া ছিল এক সময় সার্বিয়ার একটি প্রদেশ। বসনিয়ানরা রাষ্ট্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও রাষ্ট্র ক্ষমতা সার্বিয়ানদের হাতে ছিল। তারা বসনিয়ানদের ওপর বৈষম্য ও শোষণ নীতি গ্রহণ করলে বসনিয়াবাসী স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু দফা ঘোষণা করে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সার্বিয়া আন্দোলনকারীদের দমন করতে গেলে সেখানে গণআন্দোলনের সৃষ্টি হয়। শাসকগোষ্ঠীর হাতে বহু ছাত্র-জনতা হতাহত হয়। যার ফলশ্রুতিতে বসনিয়া স্বাধীনতা অর্জন করে।

ক. মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশকে কতটি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল? ১
খ. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়ের কারণ ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের বসনিয়ানদের স্বায়ত্তশাসন দাবির আন্দোলনের সাথে বাঙালির কোন আন্দোলনের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের বসনিয়ানদের আন্দোলনের মতো বাঙালির উক্ত আন্দোলনও স্বাধীনতার পথ সুগম করেছিল— বিশ্লেষণ করো। ৪

১১.▶

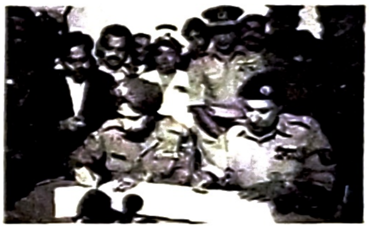

ক. এ দেশ কত তারিখে স্বাধীন হয়? ১
খ. মুক্তিযুদ্ধে নারীদের অবদান লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের চিত্রটি কোন ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী? ব্যাখ্যা দাও। ৩
ঘ. তোমার পাঠ্যবই-এর আলোকে উক্ত ঘটনার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ৪

ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৩

সেট: ০৪ **ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি দ্বিতীয় পত্র** বিষয় কোড ২ ৬ ৮
সময় — ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **সৃজনশীল প্রশ্ন** পূর্ণমান — ৭০

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যে কোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১.▶ কৃষ্ণ সাগরে বিভিন্ন দেশের বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল করে। রাশিয়ার পণ্যবাহী জাহাজের মালামাল ও নাবিকরা অপহৃত হলে প্রতিবেশী দেশ ইউক্রেনকে দায়ী করে ক্ষতিপূরণ দাবি করা হয়। ইউক্রেন ক্ষতিপূরণে অস্বীকৃতি জানালে উক্ত ঘটনা ও অন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দুপক্ষের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। ফলে রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণ করে।

ক. সুলতান মাহমুদ কোথাকার সুলতান ছিলেন? ১
খ. রাজা দাহিরের স্ত্রী জওহর ব্রত পালন করেন কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনাটি তোমার পঠিত কোন ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে তোমার পঠিত ঘটনার ফলাফল বিশ্লেষণ করো। ৪

২.▶ মধ্যযুগে ধর্মাশ্রিত ইউরোপের চার্চগুলো পুরোহিতদের নির্দেশনা অনুযায়ী পরিচালিত হতো। চার্চের প্রধানরা রাজনৈতিকভাবে বেশ ক্ষমতাশীল হওয়ায় সাধারণ জনগণ তাদের কষ্টার্জিত সম্পদ চার্চের ভিতর গচ্ছিত রাখতো। চার্চগুলো জমাকৃত সম্পদের কারণে বহিঃশত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হতো।

ক. কিতাব-আল-হিন্দ গ্রন্থটির রচয়িতা কে? ১
খ. ভিনসেন্ট স্মিথ ভারতবর্ষকে নৃতত্ত্বের জাদুঘর বলেছেন কেন? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত চার্চগুলো বহিঃশত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার ঘটনাটির সাথে তোমার পঠিত কোন মন্দির অভিযানের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত মন্দির অভিযানের কারণ ও ফলাফল বিশ্লেষণ করো। ৪

৩.▶ আহমদ শাহ ১৭৪৮ খ্রিষ্টাব্দে সিরহিন্দ আক্রমণ করেন। কিন্তু সিরহিন্দের শাসক মইন-উল-মুলক মানপুরের প্রথম যুদ্ধে তাকে পরাজিত করেন। আহমদ শাহ ১৭৪৯ খ্রিষ্টাব্দে শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে ২য় যুদ্ধে সিরহিন্দের শাসনকর্তাকে পরাজিত করেন। আহমদ শাহ বিজয়ী অঞ্চলে তার সেনাপতিকে দায়িত্ব প্রদান করে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

ক. মুহাম্মদ ঘুরির প্রকৃত নাম কী? ১
খ. আলাউদ্দিন হোসেনকে জাহানসুজ বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত ঘটনার সাথে তোমার পঠিত কোন ঘটনার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আহমদ শাহর মতো মুহাম্মদ ঘুরিও বিজয়ীর বেশে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন— তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

৪.▶ একটি ছোট রাজ্যের রাজার মৃত্যুর পর তার বড় ছেলে ফাহমিদ সিংহাসনে বসেন। ফাহমিদ অল্প বয়সী ও অনভিজ্ঞ হওয়ার কারণে নিকটআত্মীয় ও আমির-ওমরাহদের ষড়যন্ত্রে পিতার রাজ্য থেকে বিতাড়িত হন। ফাহমিদ বিচলিত না হয়ে নতুন উদ্যমে আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেকে নিয়োজিত করে। ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য একটি নতুন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

ক. সর্বশেষ মুঘল সম্রাটের নাম কী? ১
খ. 'মনসবদারি প্রথা' কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত ফাহমিদের সাথে তোমার পঠিত কোন মুঘল শাসকের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ভারতে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠায় উক্ত শাসকের অবদান মূল্যায়ন করো। ৪

৫.▶ আহমিদ বিমাতার অত্যাচারে পিতৃগৃহ ত্যাগ করে এক সামন্তরাজার অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন। অল্প দিনে রাজার প্রিয়পাত্র হয়ে রাজকীয় ও কূটনৈতিক গুণাবলি অর্জন করেন। অর্জিত কূটনৈতিক জ্ঞান ও উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে একটি বিশাল এলাকার অধিপতি হয়ে যোগাযোগ ও ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসে বৈপ্লবিক পরিবর্তন করেন।

ক. 'হুমায়ুন' শব্দের অর্থ কী? ১
খ. 'গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড' কী? সংক্ষেপে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত আহমিদের সাথে তোমার পঠিত কোন শাসকের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ভূমি রাজস্ব ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে তোমার পঠিত উক্ত শাসকের অবদান উদ্দীপকের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

৬.▶ মুসলিম স্পেনের বিখ্যাত শাসক ৩য় আব্দুর রহমান স্থাপত্য শিল্পের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রাজধানী কর্ডোভাকে রূপকথার নগরী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তিনি ১০০ প্রাসাদ, ৩০০ মসজিদ, ৩৮০টি হাম্মাম খানা নির্মাণ করেন। রাজধানী শহরের তিন মাইল অদূরে নিজ স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসার নিদর্শনস্বরূপ আজ-জোহরা প্রাসাদ নির্মাণ করে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন।

ক. তাজমহলের স্থপতি কে? ১
খ. দস্তুরুল আমল কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত ৩য় আব্দুর রহমানের সাথে তোমার পঠিত কোন মুঘল শাসকের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. স্থাপত্য শিল্পে উক্ত শাসকের অবদান মূল্যায়ন করো। ৪

৭.▶ মায়ানমারের জান্তা সরকার রোহিঙ্গাদের শত বছরের সংস্কৃতিকে অস্বীকার করে জাতিগতভাবে উচ্ছেদ করার পরিকল্পনা করছে। রোহিঙ্গারা মাতৃভাষা ও বর্ণমালা ব্যবহার করে যাতে শিক্ষা গ্রহণ ও মনের ভাব প্রকাশ করতে না পারে সে জন্য রাষ্ট্র এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। শত বছরের ইতিহাস, ঐতিহ্যকে যেনো বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে না পারে তাই তাদের জোরপূর্বক নিজভূমি থেকে উচ্ছেদ করে বিশ্বের সবচেয়ে নিগৃহীত জাতিতে পরিণত করেছে।

ক. যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন কত সালে হয়েছিল? ১
খ. শহিদ মিনার নির্মাণের উদ্দেশ্য কী ছিল? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত বিষয়টি তোমার পঠিত কোন বিষয়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে উক্ত আন্দোলনের প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

৮.▶ ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্সের রাজা ষোড়শ লুইয়ের স্বৈরাচারী শাসন, জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ, অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও বৈষম্যের প্রতিবাদে ফরাসি বিপ্লব সংঘটিত হয়। স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব এ স্লোগানের তিনটি দাবিই হয়ে উঠেছিল ফরাসিদের প্রাণের দাবি। ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে গণমানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন সফল হয় এবং জনগণ মুক্তি পায়।

ক. যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি প্রতীক কী ছিল? ১
খ. 'তমদ্দুন মজলিশ' কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ফরাসি জাতির প্রাণের দাবির সাথে বাঙালির কোন দাবির মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তোমার পঠিত উক্ত দাবিই বাংলাদেশের স্বাধীনতার পথকে ত্বরান্বিত করেছিল— বিশ্লেষণ করো। ৪

৯.▶ ভিয়েতনাম যুদ্ধের পূর্বে নেতা হো চি মিন জনগণের উদ্দেশ্যে যে ভাষণ দেন তাতেই যুদ্ধ প্রস্তুতির সবকিছু তুলে ধরেন। এ ভাষণ থেকেই ভিয়েতনামবাসী যুদ্ধ জয়ের মূলমন্ত্র পেয়ে যায়। ফলে যুদ্ধ শুরুর পূর্বেই জনগণ প্রতিটি এলাকায় গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলে।

ক. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে কোন দল বিজয়ী হয়? ১
খ. আগরতলা মামলার উদ্দেশ্য কী ছিল? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত ভাষণের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ভাষণের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত ভাষণে বাঙালি জাতি কীভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিল? বিশ্লেষণ করো। ৪

১০.▶ বর্তমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটিশদের উপনিবেশ ছিল। আঠারো শতকের ব্রিটিশ উপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে আমেরিকানরা স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করে। এ আন্দোলনে খাদ্য ও রসদ দিয়ে সহায়তা করে ব্রিটিশদের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ফ্রান্স। ফরাসিদের সহায়তায় ১৭৭৬ সালে আমেরিকা স্বাধীনতা লাভ করে। ঘটনাটি বিশ্ব ইতিহাসের যুগান্তকারী অধ্যায়।

ক. মুজিবনগর সরকার কত তারিখে গঠিত হয়? ১
খ. ইয়াহিয়া সরকার কেন ক্ষমতা হস্তান্তর করেনি? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত ফ্রান্সের মতো কোন দেশ আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে সহায়তা করেছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তোমার পঠিত উক্ত দেশের অবদান মূল্যায়ন করো। ৪

১১.▶ ২০২০ সালের নভেম্বর মাসের মিয়ানমারের জাতীয় নির্বাচনে অংসান সুচির দল ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসি (এনএলডি) একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু সে দেশের ক্ষমতাশীন জান্তা সরকার নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ এনে নির্বাচন বাতিল করে। জনরায়ের প্রতি সম্মান না দেখিয়ে এনএলডি প্রধানকে গ্রেফতার করে গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা ব্যাহত করে। সামরিক জান্তা সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির কারণে জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু করে।

ক. বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর নাম কী? ১
খ. আমাদের মুক্তিযুদ্ধে রাজাকার, আল-বদর বাহিনীর ভূমিকা কী ছিল? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত নির্বাচনটির সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ে পঠিত কোন নির্বাচনের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত নির্বাচনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ৪

বি. দ্র. ২০২৪ সালের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি প্রথম পত্র বিষয়টির এইচএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি।

সকল বোর্ড ২০২৫

সেট: ক **ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি দ্বিতীয় পত্র** বিষয় কোড | ২ | ৬ | ৮ |

সময় — ৩০ মিনিট **বহুনির্বাচনি প্রশ্ন** মান — ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: — সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. **ভারতের কোন অঞ্চলে প্রথম মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়?**
(ক) সিন্ধু (খ) পাঞ্জাব
(গ) দিল্লি (ঘ) বাংলা

২. **সিন্ধু অভিযানের প্রত্যক্ষ কারণ কোনটি?**
(ক) খলিফার নির্দেশ
(খ) বিদ্রোহীদের আশ্রয়দান
(গ) দাহিরের দুঃশাসন
(ঘ) জলদস্যু কর্তৃক জাহাজ লুণ্ঠন

৩. **সিন্ধু বিজয়ে মুসলমানরা কোন ক্ষেত্রে বেশি লাভবান হয়েছে?**
(ক) রাজনৈতিক (খ) অর্থনৈতিক
(গ) সাংস্কৃতিক (ঘ) সামাজিক

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

সিজার রাজ্য বিস্তারের অভিলাষে সমৃদ্ধশালী স্পেনে বারবার সামরিক অভিযান পরিচালনা করে বিজয় অর্জন করলেও সেখানে স্থায়ী শাসন প্রতিষ্ঠা করেননি। বরং সম্পদ সংগ্রহ করে চলে এসেছেন।

৪. **উদ্দীপকের সিজারের সাথে ভারত বিজয়ী কোন মুসলিম বীরের সামঞ্জস্য রয়েছে?**
(ক) মুহাম্মদ বিন কাসিম
(খ) সুলতান মাহমুদ
(গ) মুহাম্মদ ঘুরি
(ঘ) কুতুবউদ্দিন আইবেক

৫. **সিজারের মতো কর্মকাণ্ড পরিচালনার কারণে উক্ত ভারত বিজয়ী মুসলিম বীর ইতিহাসে কী হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন?**
(ক) সাম্রাজ্যবাদী (খ) লুণ্ঠনকারী
(গ) অত্যাচারী (ঘ) উগ্রবাদী

৬. **তরাইনের যুদ্ধে ভারতীয় বাহিনীর নেতৃত্ব কে দিয়েছিলেন?**
(ক) রাজা দাহির (খ) জয়পাল
(গ) পৃথ্বিরাজ (ঘ) জয়চাঁদ

৭. **তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের বিশেষত্ব কী?**
(ক) মুসলিম শক্তির বিজয়
(খ) ভারতীয়দের অনৈক্য
(গ) মুহাম্মদ ঘুরির যুদ্ধ কৌশল
(ঘ) ভারতে স্থায়ী মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা

৮. **মুঘল শাসকগণ কত বছর ভারত শাসন করেন?**
(ক) দুইশত বছর (খ) তিনশত বছর
(গ) চারশত বছর (ঘ) পাঁচশত বছর

৯. **বাবর তার আত্মজীবনী কোন ভাষায় লিখেছিলেন?**
(ক) আরবি (খ) ফারসি
(গ) তুর্কি (ঘ) সংস্কৃত

১০. **কথিত কাহিনি অনুযায়ী বাবরের মৃত্যুর কারণ কী?**
(ক) অতিরিক্ত নেশাগ্রস্ততা
(খ) পুত্র বাৎসল্য
(গ) আততায়ীর ছুরিকাঘাত
(ঘ) দুরারোগ্য ব্যাধি

১১. **বাদশাহ হুমায়ুনকে ভাগ্যবিড়ম্বিত বলার কারণ—**
i. পিতার অকাল মৃত্যু
ii. পা পিছলে নিজের মৃত্যু
iii. ভিস্তিওয়ালার সাহায্য গ্রহণ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১২ ও ১৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

বাংলা নববর্ষসহ বিভিন্ন লোকজ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্ম ও জাতিগোষ্ঠীর মানুষ একাত্ম হয়ে আনন্দ-উৎসব করে থাকে। এতে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি আরও সুন্দর হয়। রাষ্ট্র এক্ষেত্রে নিরাপত্তা রক্ষার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

১২. **উদ্দীপকে উল্লেখিত সম্প্রীতির এই সম্পর্কটি কোন মুঘল সম্রাটের সময় বেশি পরিলক্ষিত হয়?**
(ক) বাবর (খ) আকবর
(গ) শাহজাহান (ঘ) আওরঙ্গজেব

১৩. **উদ্দীপক ও পাঠ্যবইয়ের উক্ত সম্প্রীতির ফলে—**
i. সহনশীলতা বৃদ্ধি পাবে
ii. জননিরাপত্তা বাড়বে
iii. শাসকের অবস্থান সুদৃঢ় থাকবে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৪. **কে বাদশাহ আকবরের অভিভাবক নিযুক্ত হয়েছিলেন?**
(ক) মাহাম আনাগা (খ) বৈরাম খান
(গ) রাজা মানসিংহ (ঘ) আবুল ফজল

১৫. **দ্বীন-ই-ইলাহি প্রতিষ্ঠার কারণ কী?**
(ক) পয়গম্বর হওয়ার বাসনা
(খ) ইসলামের প্রতি বিতৃষ্ণা
(গ) সভাসদদের অনুরোধ
(ঘ) সাম্রাজ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা

১৬. **'মুহতাসিব' কী দায়িত্ব পালন করতেন?**
(ক) বিচারকার্য সম্পাদন
(খ) আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা
(গ) অনৈতিক কার্যকলাপ রোধ
(ঘ) রাজস্ব আদায়

১৭. **'মনসব' শব্দের অর্থ কী?**
(ক) পদ বা মর্যাদা (খ) সেনাপতি
(গ) বিচারপতি (ঘ) সৌভাগ্যবান

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৮ ও ১৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

ব্যবসা-বাণিজ্য করতে গিয়ে ফরাসিরা একসময় মরক্কোর একজন উদার শাসকের নিকট থেকে বিনা শুল্কে বাণিজ্য সুবিধা লাভ করে। আর তারই ধারাবাহিকতায় একদিন পরবর্তী দুর্বল শাসকদের উৎখাত করে ফরাসিরা মরক্কোর শাসন ক্ষমতা দখল করে নেয়।

১৮. **উদ্দীপকের উদার শাসকের সাথে কোন মুঘল বাদশাহর সামঞ্জস্য রয়েছে?**
(ক) আকবর (খ) হুমায়ুন
(গ) জাহাঙ্গীর (ঘ) আওরঙ্গজেব

১৯. **ফরাসিদের মতো কোন ইউরোপীয় শক্তি ভারতে তাদের আধিপত্য বিস্তার করেছিল?**
(ক) পর্তুগিজ (খ) ডাচ
(গ) ইংরেজ (ঘ) ফ্রেঞ্চ

২০. **বাদশাহ শাহজাহানের নির্মিত কোন স্থাপনাটির প্রবেশ দ্বারে নিম্নোক্ত শ্লোকটি ফার্সি ভাষায় আজও লিপিবদ্ধ আছে?**
"স্বর্গ যদি ধরা মাঝে থাকে কোনখানে
তা এইখানে, তা এইখানে, তা এইখানে।"
(ক) তাজমহল (খ) লাল কেল্লা
(গ) মোতি মসজিদ (ঘ) দিওয়ান-ই-খাস

২১. **বাদশাহ আওরঙ্গজেব কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?**
(ক) দাক্ষিণাত্যে (খ) দিল্লিতে
(গ) আগ্রায় (ঘ) বাংলায়

২২. **যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন কে?**
(ক) শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক
(খ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
(গ) মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী
(ঘ) আবুল মনসুর আহমদ

২৩. **যুক্তফ্রন্ট গঠনের মূল উদ্দেশ্য কী ছিল?**
(ক) ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা
(খ) মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে জয়লাভ করা
(গ) প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন আদায় করা
(ঘ) রাজনৈতিক অনৈক্য দূর করা

২৪. **১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানে পুলিশের গুলিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান (আসাদ) কত তারিখে শহিদ হয়?**
(ক) ২০ জানুয়ারি (খ) ২১ জানুয়ারি
(গ) ২২ জানুয়ারি (ঘ) ২৩ জানুয়ারি

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৫ ও ২৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

সরকারি চাকরি প্রাপ্তিতে একটি জেলার প্রাধান্য বাকি জেলাসমূহের চাকরি প্রার্থীরা মেনে নিতে পারেনি। কোটার বৈষম্যের শিকার তরুণ সমাজ এর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলে সরাসরি সরকারের পতন ঘটায়।

২৫. **উদ্দীপকের আন্দোলনটি পাকিস্তান সরকার বিরোধী কোন আন্দোলনের সমতুল্য?**
(ক) ৫২'র ভাষা আন্দোলন
(খ) ৬২'র শিক্ষা আন্দোলন
(গ) ৬৬'র ছয় দফা আন্দোলন
(ঘ) ৬৯'র গণঅভ্যুত্থান

২৬. **উদ্দীপকে উল্লেখিত আন্দোলনের মতো পাকিস্তান বিরোধী সেই আন্দোলনের পরিণতিতে বাঙালি অর্জন করেছিল—**

i. স্বাধীনতা
ii. স্বায়ত্তশাসন
iii. বৈষম্যের চিরমুক্তি

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii
(খ) i ও iii
(গ) ii ও iii
(ঘ) i, ii ও iii

২৭. **১১ দফা দাবি কাদের ছিল?**

(ক) মওলানা ভাসানীর
(খ) বাম সংগঠনের
(গ) ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের
(ঘ) আওয়ামী লীগের

২৮. **অস্থায়ী সরকার শপথ গ্রহণ করে ১৯৭১ সালের কত তারিখ?**

(ক) ২৬ মার্চ
(খ) ২৭ মার্চ
(গ) ১০ এপ্রিল
(ঘ) ১৭ এপ্রিল

২৯. **বুদ্ধিজীবী হত্যার কারণ কী?**

(ক) ব্যক্তিগত শত্রুতা
(খ) জাতিকে মেধাশূন্য করা
(গ) শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে ফেলা
(ঘ) মুক্তিযোদ্ধাদের ভীতি প্রদর্শন

৩০. **কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে কোন সামরিক নেতা স্বকণ্ঠে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন?**

(ক) মেজর জিয়াউর রহমান
(খ) মেজর খালেদ মোশাররফ
(গ) মেজর শফিউল্লাহ
(ঘ) কর্নেল তাহের

উত্তর	১	ক	২	ঘ	৩	গ	৪	খ	৫	খ	৬	গ	৭	ঘ	৮	খ	৯	গ	১০	খ	১১	ঘ	১২	খ	১৩	ঘ	১৪	খ	১৫	ঘ
	১৬	গ	১৭	ক	১৮	গ	১৯	গ	২০	ঘ	২১	ক	২২	ক	২৩	খ	২৪	ক	২৫	ঘ	২৬	খ	২৭	গ	২৮	ঘ	২৯	খ	৩০	ক

ঢাকা, রাজশাহী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, সিলেট, যশোর ও বরিশাল বোর্ড ২০২৫

সেট: ০৪

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি দ্বিতীয় পত্র

বিষয় কোড ২ ৬ ৮

সময় — ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

মান — ৭০

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো। এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যে কোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১.▶ রাজিব যে সমাজে বসবাস করত সে সমাজটি নানা জাতিভেদ প্রথা ও শ্রেণিবৈষম্যে বিভক্ত ছিল। যেখানে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত এর চার শ্রেণির মানুষ বাসবাস করত। সমাজে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য ছিল প্রকট। অধিকাংশ লোক নিম্নমধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণিতে বসবাস করলেও তাদের তেমন কোনো অধিকার বা সামাজিক মর্যাদা ছিল না। প্রথম দুই শ্রেণিই সমাজের সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত এবং তাদের হাতেই ছিল মূলত সকল ক্ষমতা।

ক. মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে সিন্ধুর রাজধানী কোথায় ছিল? ১
খ. ভারতবর্ষকে 'নৃতত্ত্বের জাদুঘর' বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সমাজের সাথে প্রাক-মুসলিম ভারতের কোন সমাজের বৈষম্যের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত সমাজের অবস্থা যেন প্রাক-মুসলিম ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক চিত্র— পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

২.▶ অটোমান সিংহাসনে আরোহণ করে সুলতান সুলেমান সুসজ্জিত সামরিক বাহিনী গঠন করেন। তিনি সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি ও সীমান্ত অঞ্চলের নিরাপত্তাসহ নানা কারণে পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহে অনেকবার অভিযান পরিচালনা করেন। প্রত্যেক অভিযানে তিনি জয়লাভ করলেও স্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা না করে বরং বিপুল পরিমাণ ধনসম্পদ নিয়ে নিজ সাম্রাজ্যে ফিরে আসেন। এতে করে একদিকে যেমন তার সাম্রাজ্য নানাভাবে সমৃদ্ধশালী হয়, তেমন অন্যদিকে সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলো তার বশ্যতা স্বীকার করে নেয়।

ক. মুহাম্মদ বিন কাসিম কত খ্রিষ্টাব্দে সিন্ধু বিজয় করেন? ১
খ. আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রত্যক্ষ কারণ কী ছিল? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত সুলতান সুলেমানের সাথে তোমার পঠিত কোন শাসকের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত শাসকের মতো তোমার পাঠ্যবইয়ের শাসকও একই উদ্দেশ্যে অভিযান পরিচালনা করেন— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৩.▶ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ভারতবর্ষের এক শাসকের সাথে পার্শ্ববর্তী মুসলিম শাসকের যুদ্ধ হলে প্রথমে মুসলিম শাসক পরাজিত হন। দ্বিতীয় বার যুদ্ধ হলে মুসলিম বাহিনীর নিকট ভারতের সম্মিলিত বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। ফলে উক্ত মুসলিম শাসক ভারতবর্ষে একটি নতুন ও স্থায়ী মুসলিম রাজত্বের ভিত্তি স্থাপনের গৌরব অর্জন করেন।

ক. 'জওহর ব্রত' কী? ১
খ. 'শাহনামা' কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের যুদ্ধের সাথে তোমার পঠিত কোন যুদ্ধের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠায় উক্ত শাসকের অবদান পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

৪.▶ সুলতান উসমান পিতার সিংহাসনে আরোহণ করে অল্প দিনের মধ্যেই ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে রাজ্য ছাড়া হন। পরবর্তীতে তিনি পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সেখানে আক্রমণ করেন। উন্নত সমরাস্ত্রের সাহায্যে তিনি প্রতিবেশীর বিশাল সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। অতঃপর ঐ রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের ওপর একটি নতুন সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করার গৌরব অর্জন করেন।

ক. 'হুমায়ুন' শব্দের অর্থ কী? ১
খ. 'দ্বীন-ই-ইলাহি' কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের শাসকের সাথে কোন মুঘল শাসকের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. নতুন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় উক্ত শাসকের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করো। ৪

৫.▶ সুলতান ওরহান সামরিক ক্ষেত্রে কতগুলো সংস্কার সাধন করেন। তিনি অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর সমন্বয়ে স্থায়ী সামরিক বাহিনী গঠন করেন। আকিঞ্জী নামে একটি অনিয়মিত অশ্বারোহী বাহিনীও গঠন করেন। জেনিসারি নামে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত একটি নতুন বাহিনী গড়ে তুলেন।

ক. পানিপথের প্রথম যুদ্ধ কত খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়? ১
খ. মুঘলদের পরিচয় দাও। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত শাসকের সামরিক সংস্কারের সাথে কোন মুঘল সম্রাটের সামরিক সংস্কারের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত শাসকের সামরিক সংস্কার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করো। ৪

৬.▶ সুলতানা তারুব তার সৌন্দর্য ও বুদ্ধিমত্তার কারণে আমির দ্বিতীয় আব্দুর রহমানের প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। হেরেম থেকে শুরু করে বিচারকার্য প্রায় সকল ক্ষেত্রেই তিনি স্ত্রীর প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন। রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে স্ত্রীর সিদ্ধান্তকেই চূড়ান্ত বলে গণ্য করতেন। সুলতানার নির্দেশেই আমির-উমরাদের পদায়ন, পদচ্যুতি এবং নিকট আত্মীয়দের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করা হতো। তবে শাসন ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণের ইচ্ছা তার ছিল না।

ক. 'আকবরনামা' কে রচনা করেন? ১
খ. 'কবুলিয়ত ও পাট্টা' বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের সুলতানার কর্মকাণ্ডের সাথে কোন মুঘল সম্রাজ্ঞীর সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মুঘল সম্রাটের ওপর উক্ত সম্রাজ্ঞীর প্রভাব আলোচনা করো। ৪

৭.▶

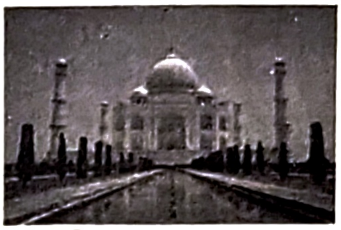

ক. 'মনসব' শব্দের অর্থ কী? ১
খ. সম্রাট আওরঙ্গজেবকে 'জিন্দাপির' বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের চিত্রটি কোন মুঘল সম্রাটের স্থাপত্যকর্মের নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মুঘল স্থাপত্য শিল্পে উক্ত শাসকের অবদান মূল্যায়ন করো। ৪

৮.▶

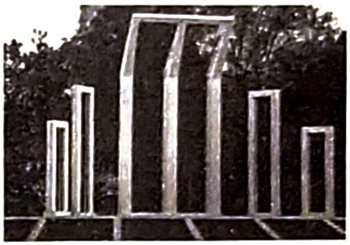

ক. 'তমদ্দুন মজলিশ' কে প্রতিষ্ঠা করেন? ১
খ. 'যুক্তফ্রন্ট' কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের চিত্রটি ইতিহাসের কোন ঘটনাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত ঘটনায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ নিহিত ছিল—মূল্যায়ন করো। ৪

৯.▶ আফ্রিকার একটি দেশ হলো সুদান। সুদানের উত্তরাঞ্চলের আয়তন দক্ষিণাঞ্চলের চেয়ে অনেক বড় হলেও জনসংখ্যা ছিল তুলনামূলক কম। এছাড়া উত্তরাঞ্চলে নদী-নালা কম থাকার কারণে ভূমি ছিল অনুর্বর এবং কোথাও কোথাও মরুময়। অন্যদিকে নদীবিধৌত দক্ষিণ সুদান ছিল উর্বর এবং খনিজ সম্পদে ভরপুর। রাষ্ট্র ক্ষমতায় উত্তর সুদানের একচ্ছত্র আধিপত্য থাকায় দক্ষিণ সুদানকে অর্থনীতিসহ নানাভাবে বঞ্চিত করা হয়। পরবর্তীতে দক্ষিণ সুদান সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতার ডাক দিলে দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একটি নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়।

ক. ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কয় দফা ঘোষণা করে? ১
খ. উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকের দেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন দেশের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. পাঠ্যবইয়ের আলোকে উক্ত দেশের অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্র আলোচনা করো। ৪

১০.▶ মধ্যপ্রাচ্যের ফিলিস্তিন একটি মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই দখলদার ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইলের নিকট অঞ্চলটির জনগণ শোষিত ও অত্যাচারিত হয়ে আসছে। ফলে ফিলিস্তিনের জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইসরাইল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করে। এতে ইহুদি রাষ্ট্রটি ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী জনগণকে দমনে নারী ও শিশুসহ সাধারণ নাগরিকের উপর নৃশংসভাবে গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। এসবের পরেও ফিলিস্তিনের জনগণ তাদের স্বাধীনতা ফিরে পেতে সংগ্রাম চালিয়ে যায়।

ক. মুক্তিযুদ্ধে প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন? ১
খ. মুক্তিযুদ্ধে 'সেক্টর' কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের সাথে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের কোন ঘটনার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. পাঠ্যবইয়ের আলোকে উক্ত ঘটনার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করো। ৪

১১.▶ গত শতাব্দীর মাঝামাঝিতে ভিয়েতনামের দুই অংশের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধের একপর্যায়ে দক্ষিণ ভিয়েতনামের একজন সামরিক কর্মকর্তার নির্দেশে উত্তর ভিয়েতনামের একটি অংশে ঘৃণ্য ও বর্বর হত্যাকাণ্ড চালানো হয়। এ জঘন্য হত্যাকাণ্ডটি তাদেরকে বিশ্ববাসীর নিকট ঘৃণার পাত্রে পরিণত করে।

ক. কোন দেশ বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি দেয়? ১
খ. 'আত্মসমর্পণ দলিল' কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত হত্যাকাণ্ডটি তৎকালীন দুই পাকিস্তানের কোন হত্যাকাণ্ডকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত হত্যাকাণ্ডটি মহান মুক্তিযুদ্ধের একটি খণ্ডিত চিত্রমাত্র— বিশ্লেষণ করো। ৪

ময়মনসিংহ ও দিনাজপুর বোর্ড ২০২৫

সেট: ০২ **ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি দ্বিতীয় পত্র** বিষয় কোড ২ ৬ ৮

সময় — ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **সৃজনশীল প্রশ্ন** মান — ৭০

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যে কোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১. সুলতান নিজামুল হক একটি দেশের রাজা। প্রায় প্রতি বছরই তিনি অন্য দেশে অভিযান পরিচালনা করেন। প্রতি বছরই তিনি জয়লাভ করে প্রচুর ধন-সম্পদসহ নিজ রাজ্যে ফিরে আসেন। এসব ধন-সম্পদ দ্বারা তিনি তার রাজধানীকে প্রাচ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগরীতে পরিণত করেন।

ক. 'শাহনামা' মহাকাব্যের রচয়িতা কে? ১
খ. আল-বিরুনির পরিচয় দাও। ২
গ. উদ্দীপকের সুলতানের অভিযানের সাথে তোমার পাঠ্যবিষয়ের কোন সুলতানের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত ঘটনার সুদূরপ্রসারী ফলাফল বিশ্লেষণ করো। ৪

২.▶ সুলতান শাহরিয়ার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর স্বীয় কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করে পার্শ্ববর্তী রাজাদের বিরুদ্ধে সমর প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। পার্শ্ববর্তী রাজাদের মধ্যে একজন এ আক্রমণ সম্প্রসারণকে তার রাজ্যের প্রতি হুমকিস্বরূপ মনে করেন। সুলতান পার্শ্ববর্তী রাজার বিশাল বাহিনীর নিকট প্রথম যুদ্ধে পরাজিত হলেন। পরের বছর পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলার উদ্দেশ্যে এবং রাজ্য বিস্তারের আশায় এক বিশাল বাহিনী নিয়ে রণক্ষেত্রে পুনরায় শিবির স্থাপন করেন। প্রতিপক্ষের সৈন্য সংখ্যা অধিক হওয়া সত্ত্বেও অসীম বীরত্ব, উন্নত মানের যুদ্ধ কৌশল এবং সাংগঠনিক ক্ষমতার দ্বারা বিজয়ীর গৌরব অর্জন করেন।

ক. মুহাম্মদ ঘুরির প্রকৃত নাম কী? ১
খ. আলাউদ্দিন হুসাইনকে কেন 'জাহানসুজ' উপাধি দেওয়া হয়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের শাসকের সাথে তোমার পঠিত কোন শাসকের মিল লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত শাসকের সামরিক সফলতার কারণগুলো উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৩.▶ আজম খান পৈতৃক সূত্রে একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলের অধিপতি ছিলেন। কিন্তু নিকট আত্মীয়দের ষড়যন্ত্রের কারণে ঐ রাজ্য তার হাতছাড়া হয়ে যায়। পরবর্তীকালে তিনি রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ভৌগোলিক নৈকট্য ও অরাজকতাপূর্ণ অবস্থার সুযোগ নিয়ে পার্শ্ববর্তী রাজ্য আক্রমণ করেন। উন্নত রণকৌশল ও কামান ব্যবহার করে তিনি প্রতিবেশীর বিশাল সেনাবাহিনীকে যুদ্ধে পরাজিত করতে সক্ষম হন। আজম খানের সাফল্যের মূলে ছিল সামরিক দক্ষতা এবং অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ বাহিনীর বিজ্ঞানসম্মত সমন্বয়। তিনি একটি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার গৌরব অর্জন করেন।

ক. মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১

খ. বাবরনামা কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন মুঘল শাসকের মিল খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত শাসকের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করো। ৪

৪.▶ কাশেম খান মসনদে অধিষ্ঠিত হয়ে জনকল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত হন। তিনি মাত্র পাঁচ বছর শাসন করেন। বহু রাস্তাঘাট, সরাইখানা, সেতু ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেন। জমি জরিপ, সামরিক সংস্কার, পুলিশ ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, ডাক বিভাগ ইত্যাদি সংস্কারমূলক কাজের জন্য ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

ক. পানিপথের প্রথম যুদ্ধ কত খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়? ১

খ. আওরঙ্গজেবকে জিন্দাপির বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের শাসকের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন শাসকের কার্যকলাপের মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত শাসকের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করো। ৪

৫.▶ শাসক রাশেদ উত্তরাধিকারসূত্রে সিংহাসনে আরোহণ করে নানা বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হন এবং তার অনুচরবর্গের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন। বারবার তাকে যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হয় এবং সব শত্রুকে তিনি নির্মূল করতে পারেননি। এক যুদ্ধে তিনি গুরুত্বপূর্ণ একটি শহর দখল করেন এবং ঐ শহরের নাম পরিবর্তন করে নতুন নামকরণ করেন। শাসক রাশেদ আট মাস এ শহরে বিলাস-ব্যসনে কাটান। এ সুযোগে তার শত্রু সংগঠিত হয়ে আবার আক্রমণ করেন। ফলে শাসক রাশেদ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। নিকট আত্মীয়দের সাহায্য-সহযোগিতা না পেয়ে তিনি পার্শ্ববর্তী দেশের রাজার সাহায্য লাভ করেন। অবশেষে রাজ্যহারা হয়ে নির্বাসিত হন।

ক. 'বাবর' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. 'গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড' কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে তোমার পঠিত মুঘল সাম্রাজ্যের কোন সম্রাটের কর্মকাণ্ডের মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত সম্রাটের পরাজয়ের কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

৬.▶ সর্বধর্ম মতবাদের প্রবক্তা শ্রী আনন্দ স্বামী। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীতে ত্রিপুরা জেলার সরাইল পরগনার কালিস্থ গ্রামে এক কৌলীন জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। জমিদারের দায়িত্ব পালনকালে প্রজাদের ধর্মভিত্তিক বিভাজন ও আন্তঃধর্মবিবাদ তাকে চিন্তামগ্ন করে তোলে। ধর্ম নিয়ে হত্যা, হানাহানি, রক্তপাত নিরসন ও শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি ইসলাম, সনাতন ও খ্রিষ্ট ধর্মের সমন্বয়ে 'সর্বধর্ম' মতবাদ প্রবর্তন করতে সক্রিয় হন। তার এ সর্বধর্ম মতবাদে প্রকৃত মানবতার আহ্বান থাকলেও তিনি ধর্মভীরু মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেননি। তবে এর মাধ্যমে তিনি সকল শ্রেণির মানুষের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হন।

ক. 'মনসব' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ সম্পর্কে একটি টীকা লেখো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আনন্দ স্বামীর সাথে কোন মুঘল সম্রাটের নীতির সাদৃশ্য পাওয়া যায়? উক্ত নীতির মতবাদসমূহ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত নীতির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ৪

৭.▶ স্পেনের উমাইয়া আমিরাতের শাসক আমির দ্বিতীয় আব্দুর রহমান। তার স্ত্রী সুলতানা তারুবার রূপ, যৌবন যেমন ছিল অতুলনীয় তেমনি ছিলেন বুদ্ধিমতী ও উচ্চাভিলাষী। তিনি রাজ্যের প্রশাসন ব্যবস্থার ওপর তার প্রভাব বিস্তার করেন। রাজকার্যে তার প্রভাব এত বেশি ছিল যে, জনগণ তার মাধ্যমে আমিরের কাছে যে আবেদন করতেন আমির তা পূর্ণ করতেন।

ক. 'আইন-ই-আকবরীর' রচয়িতা কে? ১

খ. বৈরাম খানের পরিচয় দাও। ২

গ. উদ্দীপকের সুলতানা তারুবার সাথে মুঘল আমলের কোন মহীয়সী নারীর মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত মহীয়সী নারীর কৃতিত্ব পর্যালোচনা করো। ৪

৮.▶ এক সাম্রাজ্যের শাসক তার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে অধিক ভালোবাসতেন। তার কনিষ্ঠ পুত্র শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-গরিমায় জ্যেষ্ঠ পুত্র অপেক্ষা অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও জ্যেষ্ঠপুত্রকে তার পরবর্তী উত্তরাধিকার ঘোষণা করেন। ফলে কনিষ্ঠ পুত্র এটা মেনে নিতে পারেননি বিধায় বড় ভাইয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে এক প্রত্যক্ষ যুদ্ধে তার বড় ভাইকে পরাজিত করে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

ক. তাজমহল কে নির্মাণ করেন? ১

খ. ময়ূর সিংহাসন কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের বর্ণিত ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের সাথে তোমার পঠিত মুঘল আমলের কোন ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের মিল আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কনিষ্ঠ পুত্রের যোগ্যতাই তার সফলতার মূল কারণ—উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৯.▶

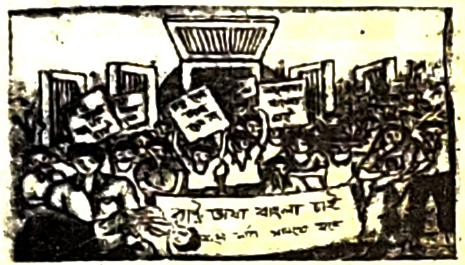

ক. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস কত তারিখে পালন করা হয়? ১

খ. রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের চিত্রটি ইতিহাসের কোন ঘটনাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত ঘটনায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ নিহিত ছিল—বিশ্লেষণ করো। ৪

১০.▶ একটি রাষ্ট্রের পাঁচটি প্রদেশের মধ্যে জনবহুল প্রদেশটি কেন্দ্রের নিকট থেকে নানা অগণতান্ত্রিক আচরণের শিকার হয়। উক্ত প্রদেশের জনগণের মাতৃভাষা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন অস্বীকার এবং সামরিক বেসামরিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়। এমতাবস্থায় উক্ত প্রদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা তার জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালিয়ে যান।

ক. বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস কত তারিখে পালন করা হয়? ১

খ. উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনার সঙ্গে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন প্রদেশের বৈষম্যের মিল আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত বৈষম্যের কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

১১.▶ "মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি
মোরা একটি মুখের হাসির জন্য অস্ত্র ধরি
মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি।"

ক. মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বোচ্চ খেতাব কোনটি? ১

খ. মুক্তিযোদ্ধারা কেন জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে কোন ফুলকে বাঁচানোর কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের আত্মত্যাগের তাৎপর্য মূল্যায়ন করো। ৪

অক্ষর-পত্র প্রকাশনী প্রকাশিত একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যবইসমূহ

আবশ্যিক বইসমূহ

• বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি • তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

প্রথম পত্রের বইসমূহ

বিজ্ঞান শাখা

• পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্র • রসায়ন প্রথম পত্র • জীববিজ্ঞান প্রথম পত্র • উচ্চতর গণিত প্রথম পত্র
• উচ্চতর গণিত সমাধান প্রথম পত্র • গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্র • গাণিতিক রসায়ন প্রথম পত্র

ব্যবসায় শিক্ষা শাখা

• ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা প্রথম পত্র • হিসাববিজ্ঞান প্রথম পত্র • ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা প্রথম পত্র
• উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন প্রথম পত্র

মানবিক শাখা

• পৌরনীতি ও সুশাসন প্রথম পত্র • সমাজকর্ম প্রথম পত্র • সমাজবিজ্ঞান প্রথম পত্র • ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি প্রথম পত্র
• ভূগোল প্রথম পত্র • ইসলাম শিক্ষা প্রথম পত্র • যুক্তিবিদ্যা প্রথম পত্র • ইতিহাস প্রথম পত্র • অর্থনীতি প্রথম পত্র

ঐচ্ছিক

• মনোবিজ্ঞান প্রথম পত্র • গার্হস্থ্য বিজ্ঞান প্রথম পত্র • কৃষিশিক্ষা প্রথম পত্র • পরিসংখ্যান প্রথম পত্র

দ্বিতীয় পত্রের বইসমূহ

বিজ্ঞান শাখা

• পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র • রসায়ন দ্বিতীয় পত্র • জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র • উচ্চতর গণিত দ্বিতীয় পত্র
• উচ্চতর গণিত সমাধান দ্বিতীয় পত্র • গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র • গাণিতিক রসায়ন দ্বিতীয় পত্র

ব্যবসায় শিক্ষা শাখা

• ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা দ্বিতীয় পত্র • হিসাববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র • ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা দ্বিতীয় পত্র
• উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন দ্বিতীয় পত্র

মানবিক শাখা

• পৌরনীতি ও সুশাসন দ্বিতীয় পত্র • সমাজকর্ম দ্বিতীয় পত্র • সমাজবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র • ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি দ্বিতীয় পত্র
• ভূগোল দ্বিতীয় পত্র • ইসলাম শিক্ষা দ্বিতীয় পত্র • যুক্তিবিদ্যা দ্বিতীয় পত্র • ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র • অর্থনীতি দ্বিতীয় পত্র

ঐচ্ছিক

• মনোবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র • গার্হস্থ্য বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র • কৃষিশিক্ষা দ্বিতীয় পত্র • পরিসংখ্যান দ্বিতীয় পত্র

ব্যবহারিক বইসমূহ

• ব্যবহারিক পদার্থবিজ্ঞান প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র • ব্যবহারিক রসায়ন প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র • ব্যবহারিক জীববিজ্ঞান প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র
• ব্যবহারিক উচ্চতর গণিত প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র • ব্যবহারিক ভূগোল প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র • ব্যবহারিক গার্হস্থ্য বিজ্ঞান প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র
• ব্যবহারিক কৃষিশিক্ষা প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র

অক্ষর-পত্র প্রকাশনী
www.akkharpatra.com

BNS 2507-02-04-1040-0
2507020410400